ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী

মধ্যপ্রাচ্য অতীত ও বর্তমান

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান

ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী

মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক
অনূদিত

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

মুদ্রণক্রম

প্রথম মুদ্রণ : ১৯৭৮ বাংলা একাডেমি, ঢাকা
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৯৮৪ বাংলা একাডেমি, ঢাকা
তৃতীয় মুদ্রণ : ১৯৯৩ বাংলা একাডেমি, ঢাকা
চতুর্থ মুদ্রণ : ২০০০ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
পঞ্চম মুদ্রণ : ২০০৭ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ২০১৬ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী

মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক অনূদিত

প্রকাশক : মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, ফোন : ৭১১১৯৬৯। বর্ণবিন্যাস : ইমারত কম্পিউটারস, ৩৮/বি নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : দি হক অফসেট প্রেস, ঢাকা-১১০০।
প্রকাশকাল : ষষ্ঠ মুদ্রণ অগস্ট ২০১৬ইং

পরিবেশক : সুমনা বই ঘর, ৩৭/১ বাংলাবাজার (সরকার মার্কেট), ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ৬০০.০০ টাকা মাত্র।

MADAYAPRACHYA : ATIT-O-BARTAMAN— 'Bangali Translation of Yahaya Armajani's Middle East Past & Present'. Translated by Muhammad Inam-ul-Haque. Published By Morshed Alam, Jatiya Grantha Prakashan, 67 Pyari Das Road, Dhaka-1100. Bangladesh. Phone : 7111969. Copy Right : Author. Date of Publication, 6th Edition August, 2016.

Price Tk. 600.00 Only. US $ 20.

ISBN 984-560-122-7

অনুবাদকের কথা (প্রথম সংস্করণ)

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাভাষা চালু করিবার ফলে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইয়াহইয়া আরমাজানী প্রণীত 'Middle East Past & Present' গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করা হইল। মাতৃভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ সহজলভ্য করিবার জন্য বাংলা একাডেমী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী এই গ্রন্থ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বস্তুত বাংলা ভাষায় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর গবেষণা চালাইতে হইলে প্রাথমিকভাবে এই ভাষায় বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজন; অথচ বাংলাভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ বিরল। মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসের উপর অনুবাদ হইলেও, এই গ্রন্থখানিই সম্ভবত বাংলাভাষায় প্রথম পুস্তক। ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় যথেষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থ রহিয়াছে। সেই গ্রন্থগুলি অনুবাদ করিয়া লইতে পারিলেও বাংলাভাষায় গবেষণার কাজ সহজতর হইবে। তাই এই ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগ যথার্থই প্রশংসনীয়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবসরপ্রাপ্ত ইরানী অধ্যাপক ইয়াহইয়া আরমাজানী বিশ বৎসর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস শিক্ষা দান করেন, তাই অত্র অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান রহিয়াছে। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের উপর তাঁহার সন্নিবেশিত তথ্যাবলী অতি প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিক। বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর তিনি যথার্থ ও সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গতানুগতিক ইতিহাস পরিহার করত তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ মানুষ যাহা চিন্তা করে তাহাই পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত ইতিহাস, বিশেষত খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ সম্পর্কে লেখক কর্তৃক বিবৃত মতামতের সহিত সবাই একমত নাও হইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমরের সমস্ত কার্যক্রমকে তিনি ইরানী দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করিয়াছেন। বস্তুত ইসলাম যেহেতু তখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে আরবিভাষী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেইহেতু তৎকালে ইসলামের জন্য কৃত সমস্ত কাজই আরবীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এ ব্যাপারে তিনি মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতানুসারী বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাও বোধ হয় অসত্য নহে যে, কোনো কোনো আরব সেনাপতি অনারব ভূমিতে কিছুটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। যুদ্ধের ডামাডোলে কোনো সভ্যতা বা জনপদ ধ্বংস হওয়া এক কথা, নিয়মিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া সভ্যতা ধ্বংস করা আরেক কথা। উদাহরণস্বরূপ, দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল-বিরুনীর একটি বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা আল-বিরুনীর জন্মভূমি খোরেজম ধ্বংস করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'খোরেজমী লিপির লেখক, শিক্ষক ও খোরেজমী ভাষাতাত্ত্বিক সবাইকে কুতাইবা নিহত করে খোরেজমী সংস্কৃতির নামগন্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন; খোরেজমের জ্ঞানী পণ্ডিতদেরকে হত্যা করে সমস্ত লিখিত পুস্তকাদি পুড়িয়ে ও সমস্ত লিপি-চিহ্ন ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে খোরেজমের লোক সবাই নিরক্ষর হয়ে রইল এবং স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর ছিল না।' আল-বিরুনী আরও বলেন: 'আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম একটি বই লিখেছেন আরবেতর ইরানীদের উপরে আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে। তাতে তিনি

বলেছেন, নক্ষত্রবিদ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আরবরা শ্রেষ্ঠ। আমি বুঝতে পারি না তিনি কি সত্যই বিষয়টি জানেন না, না না-জানার ভান করছেন। এ রকম উক্তি থেকে ইরানীদের বিরুদ্ধে তাঁর (আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিমের) আক্রোশই প্রমাণিত হয়। আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য ইরানীকে হীন ও ঘৃণ্য জাতি বলে উপস্থাপিত করতে হবে, তাদেরকে কাফির, ইসলাম বিরোধীও বলতে হবে এবং সেইসব দোষ তাদের উপর আরোপ করতে হবে যেসব দোষের জন্য কোরআনে বেদুঈন আরবদেরই নিন্দা করা হয়েছে।'*

অবশ্য ইহাও সত্য যে সেনাপতি কুতাইবা কর্তৃক আল-বিরুনীর জন্মভূমি খোরেজম ধ্বংস করিবার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। মধ্য এশিয়ার সঘদিয়ানদের সহিত মুসলমান বিজয়ীদের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে সঘদিয়ানগণ রীতিমতো কর প্রদানপূর্বক মুসলমানদের আমিলদিগকে সাদরে গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কুতাইবার পূর্ববর্তী ইয়াজীদ বিন মুহাল্লাবের স্থলে কুতাইবাকে মধ্য এশিয়ার সেনাপতি নিযুক্ত করা হইলে সঘদিয়ানগণ তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করত আমিলদিগকে তাড়াইয়া দেয় এবং অনেক মুসলমান বসতিস্থাপনকারীকে হত্যা করে। ফলে কুতাইবা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্থলে ধ্বংসলীলা চালাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করেন।** সে যাহাই হউক, কুতাইবা বা এই ধরণের আরব সেনাপতিদের দূর্ব্যবহারের ঘটনা উমাইয়া শাসনামলের ঘটনা। কিন্তু লেখক খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়াদের শাসনব্যবস্থাকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়াছেন।

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে লেখক ১৯৬৭ সালের আরব-ইসারাইলী যুদ্ধ পর্যন্ত টানিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের সীমান্ত পশ্চিমে সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে সমগ্র জেরুজালেম দখল করিয়া তাহারা জর্দান নদী বরাবর সীমান্ত টানিয়া আনে। সিরিয়া সীমান্তে তাহারা গোলান পার্বত্য এলাকাসহ বেশ কিছু কৌশলগত এলাকা দখল করে। ইসরাইলের সীমান্তবর্তী আরব রাষ্ট্রবর্গ বেশ কোণঠাসা হইয়া পড়ে। স্বীয় পরাজয়ের গ্লানিতে এবং সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্ট নাসের পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া তিনি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ১৯৭০ সালে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার সাদাত প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ভিন্ন প্রকৃতির লোক। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিসরীয় সেনাবাহিনীকে বেশ চাঙ্গা করিয়া তোলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইলী যুদ্ধে হৃত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়া মিসরকে নূতন অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে। ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সহিত আর একটি যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনী ইসরাইলী প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করিয়া সিনাই মরুভূমিতে ঢুকিয়া পড়ে এবং বেশ কিছু এলাকা দখল করিয়া লয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তথায় অস্ত্রবিরতি হয়। আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সহিত আলোচনায় বসিতে সম্মত হন। আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইল সিনাই এলাকা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয় এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে একটি আপোসরফার সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানিয়া লয়। সিরিয়া এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

---

* *অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ অনূদিত আল-বিরুনীর 'ভারত তত্ত্ব' গ্রন্থের অনুবাদকের ভূমিকা, পৃ. ২৩।*

** *Syed Amir Ali : A Short History of the Saracens, PP. 103, 104.*

এদিকে দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা বেশ জোরদার হইয়া উঠে। অচিরেই লেবাননের ডানপন্থী খ্রিষ্টানদের সহিত ফিলিস্তিনীদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সংঘর্ষে সিরিয়া খ্রিষ্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। উনিশ মাস স্থায়ী এই দাঙ্গায় ষাট হাজার লোক প্রাণ হারায়। প্যালেস্টাইনিগণ খ্রিষ্টান প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রাঞ্জীর পদত্যাগ দাবি করে। লেবাননের সরকারি সেনাবাহিনীর খ্রিষ্টান অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে প্রধানমন্ত্রী রশীদ কারামী ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। লেবাননের এই গৃহযুদ্ধে খ্রিষ্টানগণ কোণঠাসা হইয়া পড়িলে মিসরীয় সেনাবাহিনী তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে। বেশ কয়েকবার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পর আরব লীগের মধ্যস্থতায় লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সার্কিজ ঘোষণা করেন যে লেবানন মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয়েরই মাতৃভূমি। তিনি সশস্ত্র বাহিনী, নিরাপত্তাবাহিনী ও অর্থনীতি পুনর্গঠনসহ নয়া লেবানন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট সার্কিজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অর্থনীতিবিদ সেলিম আল-হোসের নাম ঘোষণা করেন। জনাব হোসের বয়স ৪৬। তিনি লেবাননের শিল্প ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি সুন্নী মুসলমান। আরব লীগের চার জাতি কমিটি ৭ই জানুয়ারি ১৯৭৭ -এর মধ্যে সকল পক্ষকে ভারি অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সহিত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে রাজি। তাঁহার মতে ২৮ বৎসর আগে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে। ইহার অবসানকল্পে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা উচিত। আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে সমগ্র আরব বিশ্বের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের তিনি পক্ষপাতী। ইসরাইল কিংবা সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এই শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৬৭ সালের পরে দখলকৃত আরবভূমি হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রস্তাব দেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন করিতেই হইবে। জর্দান নদীর পশ্চিম তীর আর গাজা উপত্যকা এই ভূখণ্ড দুইটিকে একটি করিডোর দ্বারা যুক্ত করিয়া প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। তবে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ও জর্দানের সম্পর্ক কি হইবে তাহা লইয়া একটি চুক্তির প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার উপস্থিতি মানিয়া জেনেভায় মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে যোগদানে ইসরাইলের অসম্মতি ঘোষণা করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে অর্থবহ আপোস রফার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার মতে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিলে তৎপূর্বে ইসরাইল ও জর্দানের মধ্যে অবশ্যই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

দামেস্কে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং গাজা এলাকা লইয়া আপাত স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে পৃথক পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের স্থলে একটিমাত্র আরব প্রতিনিধিদল প্রেরণ সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাব সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ কর্তৃক সমর্থিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে সংকট নিষ্পত্তির প্রারম্ভিক উপায় হিসাবে এই সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি, দুইদিন পূর্বেও যাঁহাদের মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থে তাঁহাদের ঐক্যমতে পৌছান নিঃসন্দেহে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দুইটি প্রস্তাবে এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আরবরা সংকট নিরসনে অধিকতর বাস্তব পন্থা অনুসরণে চেষ্টিত। তাহারা ইসরাইলকে অস্বীকার করার স্থলে পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই অঞ্চলের শান্তিস্থিতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আরবদের বাস্তব পথ অনুসরণে প্রেসিডেন্ট সাদাতের অবদান যে সমধিক

তাহা অনস্বীকার্য। মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তির ডিক্টেশনের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম সোচ্চার হইয়াছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য- সংকট নিরসনে স্বীয় ভূমিকা পালনের সুযোগও প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বল্প সময়ে এবং একবারেই মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ন্যায় বহু পুরাতন বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ কিসিঞ্জারের পর্যায়ক্রমিক শান্তি প্রচেষ্টা সম্ভবত সেই কারণেই সাদাত কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল এবং তিনি ইসরাইলের সহিত সমঝোতাভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুয়েজের পূর্ব তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে আরব কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হইবার কথা। সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের কায়রো আগমনের প্রাক্কালে মিসরীয় পত্রিকা 'আল-আহরাম' এই তথ্য প্রকাশ করে। এই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভেও সমর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বলাই বাহুল্য, ইসরাইল ফিলিস্তিনী অধিকার স্বীকার করুক বা না করুক সে অবস্থায় অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং অধিকৃত গাজা উপত্যকা প্রত্যর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না এবং জাতিসংঘে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি অধিকতর সহজ হইবে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইম আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের সামগ্রিক নিষ্পত্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তিনি বলেন, সকল পক্ষই জেনেভা সম্মেলন পুনরায় আহ্বান করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী এবং জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ও গাজা এলাকায় একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আরব বিশ্বের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ফিলিস্তিনীদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তকে তিনি বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করেন।

মিসর ও সিরিয়ার তরফ হইতে একটি যৌথ কমাণ্ড গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। উভয় দেশের প্রতিরক্ষা, কূটনীতি, তথ্য, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিষয় এই যৌথ কমান্ডের আওতাধীন থাকিবার প্রস্তাব করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে, সম্প্রতি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ মিসর সফরে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই সফরকালেই মিসর ও সিরিয়ার মধ্যকার এই যৌথ কমান্ড গঠনের বিষয়টি স্বাক্ষরিত ও প্রকাশিত হয়। মাত্র কিছুকাল পূর্বেও আরব বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই দুইটি দেশ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লেবাননের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া উভয় দেশের সম্পর্ক এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রেসিডেন্ট আসাদ কায়রো শীর্ষ বৈঠক বর্জন করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরিশেষে সৌদি আরবের বাদশাহ খালেদের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতায় ও সফল মধ্যস্থতায় মিসর-সিরিয়ার বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবাদ নিষ্পত্তির ফলে লেবাননে গৃহযুদ্ধের অবসানও ত্বরান্বিত হয়। বলা বাহুল্য, মিসর-সিরিয়া সম্পর্কের উন্নতি ও অবনতি ইতিহাসাশ্রিত। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সময় মিসর-সিরিয়া একত্রীকরণের মধ্য দিয়াই একটি যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র রূপ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার জীবদ্দশাতেই সেই ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া যায়। তথাপি মিসর আজও 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' নামটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। পরবর্তীকালে সাদাতের আমলেও মিসর, লিবিয়া ও সুদান সমবায়ে লুজ ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গঠনের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

[নয়]

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আগমনের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নূতন দিগন্তের উন্মোচন হয়। ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে ইহা মার্কিন ইহুদী সম্প্রদায় এবং মার্কিন সরকারের উপর নির্ভর করিয়া চলে। আরবদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ইসরাইলকে অস্ত্র প্রদানই ছিল প্রত্যেক মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। কিন্তু জিমি কার্টার আসেন নূতন অভিব্যক্তি লইয়া 'ফিলিস্তিনীদের আবাসভূমির' প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি পুনরুল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সাময়িকী 'টাইম' উল্লেখ করে, 'এই প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিলেন।' যৎসামান্য সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হইতে ইসরাইলের অপসারণের কথা কার্টার উল্লেখ করেন। প্রচলিত আরব দাবি ছাড়াইয়া গিয়া তিনি ফিলিস্তিনী আরব উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করেন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ও প্রেসিডেন্ট কার্টারের সহিত আলোচনায় নিরুৎসাহ লক্ষ্য করিয়া আরবগণ চমকিত হয়। ইহার অর্থ হইল মার্কিন সরকার ইহুদীদিগকে আর সরাসরি সমর্থন দিতে প্রস্তুত নহে। প্রেসিডেন্ট সাদাত জিমি কার্টারের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তাঁহার মতামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত জেনেভা সম্মেলনের প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গকে তাগাদা দিলে অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের শান্তির ব্যাপারে একটি যুক্ত ইশতাহার ঘোষণা করে। তাহারা নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য পুনরায় তুলিয়া ধরে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে অধিকৃত আরব এলাকা প্রত্যর্পণের পর শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিবার অধিকার ইসরাইলের রহিয়াছে। যুক্ত ইশতাহারে ফিলিস্তিনীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথাও পুনরুল্লেখ করা হয়। এই যুক্ত ইশতাহার মার্কিন ইহুদী প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য ইসরাইলী সমর্থক দলসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কার্টার ইহাতে পিছপাও হন এবং যুক্ত ইশতাহার প্রত্যাহার করেন। মার্কিন ইহুদীদের শক্তি লক্ষ্য করিয়া সাদাত তাঁহার কর্মসূচি পুনর্বিবেচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ৯ই নভেম্বর তিনি ইসরাইল গমন করিয়া ইহুদীদের সহিত সরাসরি আলোচনা করিবার প্রস্তাব দেন। পরবর্তী ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন তাঁহাকে এক আমন্ত্রণের মাধ্যমে এই প্রস্তাবে সাড়া দেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইল সফর করেন এবং ২০শে নভেম্বর ইসরাইলী পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। পরে বেগিনও মিসর সফর করেন এবং সাদাতের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের ফলাফল এখনও অস্পষ্ট। ইতিমধ্যে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আলজিরিয়া ও প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এই একক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। কিন্তু সৌদী আরব ও জর্দান এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আনোয়ার সাদাত ইসরাইলী ও আরবদিগকে জেনেভার শান্তি সম্মেলনে বসাইতে সক্ষম হইলেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আর কতদূর? কার্টার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে সবকিছু সঠিক পন্থায় অগ্রসর হইলেও মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার নিষ্পত্তির পথ বন্ধুর ও সুদূরপরাহত। জেনেভায় ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করা গেলেও, একটি সামগ্রিক আরব-ইসরাইলী চুক্তির দ্বার এখনও পূর্ববত রুদ্ধ। বিশেষত দুইটি মৌলিক প্রশ্নে এখনও উভয়পক্ষ অনড়। প্রথমটি হইল, আরবদের দাবি, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব এলাকা হইতে ইহুদী সৈন্যাপসারণ। অপরদিকে ইহুদী নেতৃবৃন্দ

মিসরীয় সিনাই -এর কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ এলাকা হইতে সৈন্যাপসারণ করিতে রাজি। কিন্তু সিরিয়ার গোলান উচ্চভূমি অথবা জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হইতে সম্পূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয়ত আরব দাবি অনুযায়ী জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা লইয়া ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এই ধরনের প্রস্তাব ইসরাইল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাহাদের মতে ইহা হইবে বিভিন্ন গোলযোগের কেন্দ্রস্থল এবং ইহুদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বিরাট হুমকি। তাই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা নেতৃবৃন্দ সাদাতের এই শান্তি প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই প্রচেষ্টায় জেনেভায় আলোচনা আরম্ভ হইলে মিসর ইসরাইলের সহিত সামগ্রিক নিষ্পত্তির পরিবর্তে এটি পৃথক সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হইবে।

বিগত মার্চ মাসে সংঘটিত ঘটনাবলী পুনরায় প্রমাণ করিয়াছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এখনও সুদূরপরাহত। ১৯৭৮ সালের ২৯শে মার্চ ইসরাইলী বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু শিবিরে হানা দেয়। অতি প্রত্যুষে পরিচালিত এই হামলাকে স্মরণাতীত কালের সবচাইতে বড় হামলা বলিয়া অভিহিত করা হয়। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু গ্রামসমূহ এই অতর্কিত হামলার শিকার হয়। জলেস্থলে অন্তরীক্ষে প্রায় ২৫,০০০ ইসরাইলী সৈন্য এই সম্প্রসারণবাদী হামলায় অংশগ্রহণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইসরাইলীরা লেবানন সীমান্তের ৬ মাইলের মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা তৈয়ার করে। বিমান হইতে বোমার আঘাতে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি গুঁড়াইয়া দেওয়া হয়।

অতর্কিত আক্রমণে সাধারণ ফিলিস্তিনীরা দিশাহারা হইয়া পড়িলেও পি, এল, ও বাহিনী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনী লেবাননের রাজধানী বৈরুত অভিমুখে পাড়ি জমায়। এই হামলার বিরুদ্ধে যখন ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরু তখনই প্রস্তাব আসে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের।

ইসরাইলে সম্প্রসারণবাদী আক্রমণে ফিলিস্তিনীরা শুধু উৎখাত হয় নাই, সেই সঙ্গে লাঞ্চিত হইয়াছে লেবাননের সার্বভৌমত্ব। লাঞ্ছিত লেবাননের বুক এখনও শান্তিরক্ষী বাহিনীর পদভরে কম্পিত। দীর্ঘ ২০ মাসের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লেবাননে এমনিতে ৩০ হাজার মিসরীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী রহিয়াছে। ইহাদের আনয়ন করিয়াছে আরবলীগ। পুনরায় জাতিসংঘের প্রায় ৪০০০ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হইয়াছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিহীন পরিস্থিতির দায়ভার জোর করিয়া লেবাননের উপর চাপান হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী লেবানন নামের ছোট্ট দেশটি কাহার? এই প্রশ্ন আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে দেখা দিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের মাত্র ৪০১৫ বর্গ মাইল আয়তনের এই দেশটিকে এক সময়ে মধপ্রাচ্যের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করা হইত। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের অনেকেই স্বস্তির অন্বেষায় ঘুরিয়া আসিত লেবানন।

১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত দেশটির পরিস্থিতি মোটের উপর শান্ত ছিল। সত্তরের দশকের সূত্রপাত হইতেই শুরু হয় এই দেশের অশান্ত পরিস্থিতি। জাতিগত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া সূত্রপাত ঘটে অশান্তির । ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের কনভেনশন অনুযায়ী খ্রিষ্টানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহাদেরই বেশি। সেই-সুবাদে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ছিল বেশি। ১৯৭০ এ খ্রিষ্টানদের

সংখ্যালঘিষ্ঠতা শাসনতান্ত্রিক এই পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তোলে।

১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারীতে দেখা যায় লেবাননের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ মুসলমান। অন্যদিকে খ্রিষ্টান জনসংখ্যার হার মাত্র ৪১ শতাংশ বাকি ৩ শতাংশ দুরুজি সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব, মুসলমানরা জনসংখ্যার হারে সুবিধা দাবি করিলে শুরু হয় গণ্ডগোল। ফলে ১৯৭৫ সাল হইতে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ১৯ মাসের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটে। আর্থিক ক্ষতি এবং ব্যাপক প্রাণহানি ছাড়াও লুণ্ঠিত হয় লেবাননের সার্বভৌমত্ব। ইহার পর হইতে বার বার এই দেশটির সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠিত হইতেছে। তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ জাতিসংঘ পর্যন্ত লেবাননের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হইতেছে। এই জন্যই প্রশ্ন উঠিয়াছে লেবানন দেশটি কাহার? লেবানন কি লেবাননবাসীর অথবা মধ্যপ্রাচ্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর, নাকি ইসরাইলের তাবেদার লেবাননের দক্ষিণপন্থী ফালাঞ্জী খ্রিষ্টান বাহিনীর?

ইসরাইলের এই বারের আক্রমণ দীর্ঘদিনের চিন্তাপ্রসূত। ১৯৭২ সালেই এই ধরনের একটি পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মিসর ও সিরিয়ার দরুন ইহা সম্ভবপর হয় নাই। এই দুইট রাষ্ট্রই ইসরাইলের যে কোনো ধরনের সৈন্য পরিচালনার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রেসিডেন্ট সাদাতের একতরফা শান্তি প্রস্তাব এবং ফলে আরব ঐক্যে যে ফাটল ধরিয়েছে তাহারই সূত্র ধরিয়া এই আক্রমণ পরিচালনা করা হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, সাদাতের শান্তি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ ফিলিস্তিনীদের উৎসাহ যোগাইলেও সিরিয়ার ইহুদী আক্রমণের মুখে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকেন।

ইসরাইলী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে অতি সম্প্রতি তেলআবিবে সংঘটিত ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত ইহুদীদের আত্মার শান্তির জন্যই এই আক্রমণ। আরও বলা হইয়াছে লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের ফিলিস্তিনী শিবির হইতেই আক্রমণ চালানো হইয়াছিল। তাই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্যই এই আক্রমণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলের বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার মোক্ষম উপায় হিসাবে তেলআবিবের ঘটনাকে বাছিয়া লওয়া হয়। ইসরাইলের লেবানন আক্রমণের মূল লক্ষ্য হইল ফিলিস্তিনীদিগকে সর্বশেষ এলাকা হইতেও উৎখাত করা।

এবারের যুদ্ধ আরেকটি বিষয় প্রমাণ করিয়াছে যে, ফিলিস্তিনীরাও লড়িতে জানে। দক্ষিণ লেবাননের লিতানী নদী বরাবর অগ্রসর হইলেও ইসরাইলকে ইহার জন্য প্রচুর খেসারত দিতে হইয়াছে। প্রতিটি ইঞ্চি এলাকা দখল করিতে তাহারা প্রচণ্ড ফিলিস্তিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বর্হমান অবস্থানেও তাহারা প্রচণ্ড ফিলিস্তিনী আক্রমণের সম্মুখীন। তাই প্রথমত নিশ্চয়তা ছাড়া এ এলাকা ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেও ইসরাইল এখন জাতিসঘের আহ্বানের ছত্রচ্ছায়ায় সৈন্যাপসারণে সম্মত হইয়াছে।

বি. বি. সি. ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননের পূর্বতন প্রান্ত আরকূপের ১২ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চলের ৭ টি অবস্থান হইতে ইসরাইলী বাহিনী সরিয়া গিয়াছে (১১.৪.৭৮)। জাতিসংঘ বাহিনীর নরওয়ের ইউনিট আরকূপে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যাঞ্চল হইতেও তাহারা সরিয়া যাইবে বলিয়া খবরে প্রকাশ। আশা করা যাইতেছে যে, অতি শীঘ্র ইসরাইলী বাহিনী সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করিবে।

এদিকে লেবাননে নূতনভাবে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। বৈরুতে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের খণ্ডযুদ্ধ মোকাবিলার জন্য আরব শান্তিরক্ষী বাহিনী রাজপথে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় মাত্র ৪ দিনে ১৭ ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব বৈরুতে সংঘর্ষে লিপ্ত দুই সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে আরব বাহিনী ট্যাঙ্ক লইয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। বি. বি. সি. জানায়, দাঙ্গা উপদ্রুত কয়েকটি এলাকার ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলিতে দেখা গিয়াছে। সংঘর্ষ অবসানের জন্য উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা শুরু হইয়াছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার তাগিদ দিতেছেন। যুদ্ধবিরতি না হইলে সহসাই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

লেবাননে বড় রকমের একটি যুদ্ধ বাধিবার সবকয়টি লক্ষণই নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রাজধানী বৈরুত হইতে দলে দলে লোক অপসারণের কাজ শুরু হইয়াছে। বৈরুতে স্থায়ী বসবাসকারী বহু আরব ও খ্রিষ্টান শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ইদানীং কূটনৈতিক মিশন হইতেও লোক অপসারণ শুরু হইয়াছে। বৈরুত হইতে ইতিমধ্যেই সিরিয়া ও সোভিয়েত মিশনের লোকজনদের সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া বৈরুতে অবস্থানকারী তাহার সকল নাগরিককে অবিলম্বে লেবানন ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, সিরিয়ার ভারি গোলন্দাজ বহর এবং অন্যান্য বাহিনী রাজধানী বৈরুতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তর সীমান্তে ইসরাইলী বাহিনীও সতর্ক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে।

লেবাননের এহেন পরিস্থিতি খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের নিছক জমি ও অবস্থান দখলের সংঘাত বলিলে অবশ্যই ভুল হইবে। বিষয়টির বহিরঙ্গে এই রকম একটি ছাপ দেওয়া হইয়াছে বটে, তবে ইহা আর গোপন নাই যে, লেবাননের খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে সীমান্তের পরপার হইতে অস্ত্র ও পরামর্শ যোগাইতেছে আরব স্বার্থের চরম শত্রু ইসরাইল। লেবাননের গৃহযুদ্ধও তাই আসলে সার্বিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যারই একটি প্রতিফলন। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা হইতে ইহাকে কোনো প্রকারেই ভিন্ন করিয়া দেখা যায় না।

অতি সম্প্রতি লেবাননের প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সার্কিজ ও সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে লেবাননে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরব শান্তি বাহিনী হিসাবে সিরীয় সৈন্যদের স্থলে সৌদী ও ইরানী সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে।

বিগত ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮, আফগানিস্থানে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়াছে। নাদির খানের সর্বশেষ বংশধর প্রেসিডেন্ট দাউদের পতন হইয়াছে এবং সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতায় বসিয়াছেন নূর মোহাম্মদ তারাকী। দাউদ ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া তাঁহার ভাই এবং ভগ্নিপতি বাদশাহ জহীর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানকে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ক্ষমতায় আসিবার পর হইতে গত বৎসর পর্যন্ত তিনি ঘোষণার মাধ্যমেই আফগানিস্তানের শাসন পরিচালনা করেন। গত বৎসর তিনি প্রথম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করিয়া সংবিধান চালু করেন।

প্রেসিডেন্ট দাউদের ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিয়া এক হইলেও ঘটনা ভিন্নতর হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট দাউদ ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন বাদশাহ জহীর শাহকে সরাইয়া এবং তাই ঐ অভ্যুত্থান ছিল রক্তপাতহীন, কিন্তু বর্তমান অভ্যুত্থান হইয়াছে রক্তক্ষয়ী, যাহাতে

প্রেসিডেন্ট দাউদ স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। কাবুলের রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন নাই।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাদশাহ্ জহীর শাহকে উৎখাতের সময় দাউদ বলিয়াছিলেন, আধুনিক জগতে রাজতন্ত্র চলিতে পারে না। জহীর শাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে দীর্ঘ ১০ বৎসর (১৯৫৩ হইতে ১৯৬৩) তিনি জহীর শাহের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও তিনি প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করিতেন। এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে তিনি পদচ্যুত হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই সেনাবাহিনীর সোভিয়েত ঘেঁষা জেনারেলদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে। ১৯৭৩ সালে ইহাদের সাহায্যেই তিনি ক্ষমতারোহণ করেন।

১৯৭৭ সালে প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষণার মাধ্যমে দাউদ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈধ ক্ষমতাবান পুরুষ হিসাবে আবির্ভূত হন। ১৯৭৮ সালের অভ্যুত্থানের সহযোগী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর শুরু হয়। এইসব সামরিক অফিসাররা আরও অধিক সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে দাউদ চাহিতেন সবাইর নিকট হইতে সমদূরত্বে অবস্থান করা। নূতন ক্ষমতাবান বিপ্লবী কাউন্সিল ইতিমধ্যে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বের সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলাম, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেশের অগ্রগতি হইবে মৌলনীতি।

সম্প্রতি দক্ষিণ ইয়ামানে সোভিয়েত, কিউবান এবং পূর্ব জার্মানীর সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতির জন্য আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে দক্ষিণ ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী মস্কোপন্থী এক অভ্যুত্থানে আটক হন এবং দুইদিন পরে তাঁহাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়। রুবাইয়া আলীকে উৎখাতের মধ্য দিয়া এখন দক্ষিণ ইয়ামানে ক্ষমতায় বসিয়াছেন আলী নাসের। আলী নাসের মস্কোপন্থী। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট নেতা ইসমাইল। নিহত প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কিছুটা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আলী নাসেরের সাহায্যে সোভিয়েত মহল বেশ তৎপর। দক্ষিণ ইয়ামানের রাজধানী এডেন তৈল রফতানীর প্রধান বন্দর এবং আরব সাগরের প্রবেশপথ।

এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের দুইদিন পূর্বে দক্ষিণ ইয়ামানের প্রেসিডেন্টের একজন বিশেষ দূত একটি ব্রিফকেস হাতে উত্তর ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট আহমদ হোসেন আল-ঘাসমির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু ব্রিফকেসে রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে প্রেসিডেন্ট ঘাসমি এবং দূত উভয়েই মারা যান। ব্রিফকেসের মধ্যে রক্ষিত বোমা সম্পর্কে দূত কিছুই জানিতেন না বলিয়া প্রকাশ। এই ষড়যন্ত্রে বিদেশী শক্তির হাত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শাহানশাহ্ রেজা শাহ্ পাহ্লভীর প্রশ্রয়ে ইরান সম্প্রতি খোলামেলা রাজনৈতিক বিতর্কের এক নূতন যুগে প্রবেশ করিতেছে। দেশটিতে হয়ত একদলীয় শাসনই বহাল থাকিয়া যাইবে তবে সরকারি দলের মধ্যকার বিভিন্ন উপদল এবং বাহিরের ছোট ছোট দলগুলি সরকারকে সমালোচনা করিবার অধিক স্বাধীনতা পাইবে। অবশ্য শাহের সমালোচনা করা যাইবে না কিছুতেই।

অভিযোগ উঠিয়াছে, ইরানের সিকিউরিটি ফোর্স এবং পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর কারণে অকারণে অতি নির্দয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। আইন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের স্বার্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইরানের রাজকীয় সরকার শিক্ষার নামে দেশে ও সমাজে পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতা আমদানি করিয়াছেন। মেয়েরা পর্দার বাহিরে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। নগ্ননৃত্য, দেহপ্রদর্শনী, অনাচার ও ব্যাভিচারে সারাদেশ আচ্ছন্ন। ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের শিক্ষা ও আইনের বিশেষ কোনো প্রতিফলন নাই, যদিও দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক মুসলমান। ইরান যদিও তেলসমৃদ্ধ দেশ, তেলের সূত্রে প্রচুর অর্থের মালিক, তবু গত এক যুগের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা উপরের দিকে উঠিল না। ইরানের মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার ডলারের মত হইলেও সাধারণ মানুষের একটা অংশ আজও প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে মানবেতর জীবন যাপন করে।

কিছুদিন পূর্বে তেহরানের ৭৫ মাইল দূরবর্তী কোম শহরে শাহের বিরুদ্ধবাদী ওলামাগণ এক বিশাল বিক্ষোভে ফাটিয়ে পড়ে। এই বিক্ষোভ মিছিল ছিল বন্যার মত করালগ্রাসী এবং সমুদ্রগর্জনের মতো ভয়াবহ। শাহের সিকিউরিটি ফোর্স এই মিছিলের উপর বেপরোয়া গুলি বর্ষণ করে। মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইকের সংবাদাতা স্মিট লিখিয়াছেন, দাঙ্গা- হাঙ্গামা স্তব্ধ হইলেও কোমের বড় মসজিদে নামায পড়ার কার্পেটে রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই। কোম মসজিদের ইমাম ৮১ বছরের বৃদ্ধ আয়াত উল্লাহ শরিয়ত মাদারী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছেন, 'আমাদের দাবি-দাওয়া যদি মানিয়া লওয়া না হয় তবে আমার যারা অনুসারী তাহাদিগকে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিবার আদেশ দিতেই হইবে।' আয়াত উল্লাহ্‌র দাবি: শাসনতন্ত্র যে-কোনো ব্যক্তি, এমন কি শাহেরও উপরে। কেউ তাহার সুবিধামতো কিছুটা শাসনতন্ত্র কিছুটা ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়ালখুশি অনুসরণ করিবে তাহা হইতে পারে না। দেশকে চালাইতে হইবে শুধু শাসনতন্ত্রেরই নির্দেশে।

শুধু কোম শহরে নহে, এই দাবি ইরানের আরও ৫০টি শহরে উঠিয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইয়া গিয়াছে। পাঁচ মাস ব্যাপী এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সরকারি হিসাবেই মৃতের সংখ্যা ৪০ জন।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়াই ইরানে রাজনীতির নূতন মোড় পরিবর্তন। গত জুন মাসে (১৯৭৮) পার্লামেন্টের সাতজন ডেপুটি একটি সরকারী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এমন ঘটনা এই প্রথম। শাহ এবং সাধারণভাবে ইরানীরা মনে করেন যে, তিন বৎসর পূর্বে চালু করা একদলীয় ব্যবস্থায় এখন আর কাজ হইতেছে না। তাই কিছু রদবদল আবশ্যক। সরকার স্পষ্ট বলিয়াছে, আইন বদলাইতে না হয় এমন গঠনমূলক সমালোচনা আদৃত হইবে। রাজতন্ত্রের ভূমিকার উপর অবাধ বিতর্ক চালাইতে পারিবে এমনটি কেহই আশা করে না, তবে রাজনৈতিক দলগুলি বিরোধী দল হিসাবে জনমত তুলিয়া ধরিবার সুযোগ পাইবে।

সরকারি বক্তব্যে ইহা মনে করা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক তৎপরতা রাস্তখিজ দলের কাঠামোর মধ্যেই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রুপগুলি চাহিলে তাহাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। এতকাল রবার স্ট্যাম্পরূপে গণ্য পার্লামেন্ট এবং রাস্তখিজ জনমতের ব্যাপকতর প্রতিধ্বনি করুক শাহ্ এখন তাই চান। ইহারই আলোকে প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তখিজ সেক্রেটারি জেনারেল জমশেদ আমুজগারসহ দলীয় নেতারা দলের প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের জন্য একটি নূতন ভূমিকা অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের সরকারের

ব্যর্থতার সমালোচনা করিবার এবং নিজেদের অফিস ও প্রাদেশিক শাখা খুলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কিছু সদস্য নূতন দল গঠন করার উদ্দেশ্যে রাস্তখিজ ছাড়িয়াছেন। পার্লামেন্টে ডানপন্থী উপদলের নেতা মোহসিন পিজেশপুর বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার ৩৭ বৎসর আগের দলটি পুনরুজ্জীবিত করিবেন। পার্লামেন্টের ভিতর ও বাহিরের আরো দুইটি উপদলও রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়াছে। একটি দল হইবে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলগুলির আদলে, আর অপরটির লক্ষ্য হইবে আমূল সংস্কার। অবশ্য আগামী জুনের পার্লামেন্টের নির্বাচনের পূর্বে ইরানে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হইবে কিনা তাহা বলার সময় এখনও আসে নাই। বহুদলীয় পদ্ধতির সম্ভাবনা লইয়া এখন বিতর্ক চলিতেছে। একমাত্র নিষিদ্ধ দল কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর বিরোধী উপদলগুলি পূর্ণাঙ্গ দলের মতোই কাজ চালাইতেছে। কম্যুনিস্টদের হয়তো শুধু গ্রুপেই থাকিয়া যাইতে হইবে। অন্যথায় রাস্তখিজের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে।

তথ্যমন্ত্রী দারিয়ুস হুমাউন গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের জানান, একদলীয় ব্যবস্থার ছায়াতলে আমরা বিভিন্ন গ্রুপ ও শাখাকে অধিকতর সুযোগ দিতে চলিয়াছি।

* * * *

যুদ্ধবিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জন্য শান্তির নীল নকশায় স্বাক্ষর দানের মধ্য দিয়া ওয়শিংটন হইতে হেলিকপ্টারযোগে ৩৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের রেস্ট হাউস ক্যাম্প ডেভিডে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কার্টারের মধ্যস্থতায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠক সম্প্রতি সমাপ্ত হয়। ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হইতে সৈন্য প্রত্যাহার, তথায় ইসরাইল, জর্দান ও ফিলিস্তিনীদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গঠন এবং তিন মাসের মধ্যে সিনাই প্রশ্নে মিসরের সহিত শান্তিচুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছে। বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তারিখে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন দলিল দুইটিতে স্বাক্ষর দান করেন। চৌদ্দ দিনে দারুণ আশা ও হতাশার মধ্যে অব্যাহত আলোচনা শেষে সম্পাদিত দলিল দুইটি হইল 'মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাঠামো' এবং 'মধ্যপ্রাচ্যে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের রূপরেখা'। এই দলিল মোতাবেক জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরাইল, জর্দান ও ফিলিস্তিনীদের যৌথ সার্বভৌমত্বের ব্যবস্থা থাকিবে, তবে স্বায়ত্তশাসনের পাঁচ বৎসরের অর্ন্তবর্তীকালীন মেয়াদে সেখানে বিশেষ কয়েকটি স্থানে সামান্য কিছু চুক্তি সম্পাদনের পর তিন হইতে নয় মাসের মধ্যে ইসরাইল মিসরের সিনাই হইতে অধিকাংশ সৈন্য সরাইয়া নিবে। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দুই দেশের মধ্যে 'যুদ্ধ নয়-শান্তি'র অবস্থা ঘোষণা করা হইবে। ইহার দুই হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ইসরাইল সিনাই হইতে সর্বশেষ সৈন্য সরাইয়া লইবে।

সম্পাদিত নীল নকশার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসরাইলের জনগণ ইহাকে স্বাগত জানাইলেও কায়রো ও সৌদী বেতার বিনা মন্তব্যে এই খবর পরিবেশন করে। কায়রোর পথচারীদের একাংশকে উল্লসিত দেখা যায় আবার পি. এল. ও. এবং সিরিয়া ইহা প্রত্যাখ্যান করে। পি. এল.ও. মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পি,এল, ও কে ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে

শান্তি অসম্ভব। ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা দলিলে পি. এল,ও-র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। সমঝোতাকে পি, এল, ও, নিছক দ্বিপক্ষীয় ব্যাপার এবং অধিকৃত অঞ্চলে ইসরাইলের দখলদার আরও পাঁচ বৎসর মানিয়া নেওয়ার পরাজয় বলিয়া উল্লেখ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমঝোতাকে সাদাতের আত্মসমর্পণ বলিয়া উল্লেখ করে। ইসরাইল সত্যিকারভাবে সৈন্য অপসারণ করিবে কিনা সে ব্যাপারে মস্কো সন্দিগ্ধ। জর্দানের মতে, এই সমঝোতা শান্তির দ্বার উন্মোচিত করিলেও আরবদের অনৈক্য আরও ঘনীভূত করিবে। জেরুজালেম ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে আরব শহরগুলির পৌর নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করেন। ফিলিস্তিনীদের অধিকারের প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া, পি, এল, ও-র প্রতি উপেক্ষা এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্ত্বশাসনের টোপও পূর্ণ ইসরাইলী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা না থাকার সমঝোতাটি মিসর-ইসরাইল রফায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়া আরব পৌর নেতৃবৃন্দ মনে করেন। অপরদিকে দামেস্ক সম্মেলনে যোগদানকারী সাদাতবিরোধী আরব দেশগুলি মিসরের সহিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। আলজিরিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়ামান ও পি, এল, ও-কে লইয়া গঠিত আপোসবিরোধী আরব ফ্রন্ট ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল নস্যাৎ করার সংকল্প ঘোষণা করে। এই জোটের ইশতাহারে আরব লীগের সদর দপ্তর কায়ারো হইতে অন্য কোনো আরব দেশে স্থানান্তরের দাবি জানায়।

এদিকে ষোলটি আরব দেশ বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছে। এই বাগদাদ সম্মেলনের উদ্যোক্তা হইতেছে ইরাক। সিরিয়াসহ ইরাক, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও দক্ষিণ ইয়ামান আরব জাহানের বুকে রুশপন্থী হিসাবে খ্যাত। এই ৪টি রাষ্ট্রই প্রধানত প্রেসিডেন্ট সাদাতের সরাসরি আলোচনার বিরোধী। অবশ্য খোদ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থাও ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। এদিকে সৌদি আরব এবং জর্দানও এইবারের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনায় তেমন সন্তুষ্ট নহে। ইরাকের আহ্বানে বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ বৈঠকে উপরোক্ত রুশপন্থী রাষ্ট্র কয়টি বাদেও বাকি যে ডজন খানেক রাষ্ট্র যোগ দিতে যাইতেছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, যেসব মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্র এতকাল যাবৎ মার্কিন উদ্যোগে মিসর-ইসরাইল আলোচনায় কিছু একটা সুফল প্রত্যাশা করিতেছিল তাহারা হতাশ হইয়াছে। সুতরাং বাগদাদ বৈঠকে তাহাদের যোগদান যতটা না মিসর বা মার্কিন বিরোধিতা তাহার চাইতে অধিক এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ। তাহাছাড়া এই বৈঠকে তাহাদের যোগদানের অর্থ ইহাও নহে যে, মধ্যপন্থী এইসব রাষ্ট্র রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তবে জর্দান কিংবা সৌদী আরবের এবারের মনোভাবকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করিবে। এমনিতেই সাদাতের মুখ রক্ষা করিতে কার্টার প্রশাসন যথেষ্ট দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তবুও যে পর্যায়ে আসিয়া ক্যাম্প ডেভিডের ফলাফল স্তিমিত হইতেছে এবং সাদাতের অবস্থা নাজুক ও তাঁহার বিরোধিতা জোরদার হইতেছে সেই পর্যায়টি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, আরব জাহানের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি এখন শুধু আমেরিকার উপরই নির্ভরশীল নহে বরং আমেরিকা, মিসর, ইসরাইল, রাশিয়া, ফিলিস্তিনী সংস্থা , রুশ সমর্থক গ্রুপ এবং মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্রবর্গ সকলের সম্মিলিত প্রয়াস যে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরি তাহাই আর একবার প্রমাণিত হইয়া গেল। তবে প্রত্যেকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মিলের চাইতে গরমিল বেশি।

মোটামুটি ইহাই বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা-প্রবাহের সংক্ষিপ্ত রূপ। যাহা হউক, এই দেশের মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মীয় দিক হইতে আপত্তিকর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমি সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদান করিয়াছি। তবে অতি দ্রুত অনুবাদ করিবার ফলে সর্বত্র টীকা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। আশা করি, এই আনুবাদ আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর বাংলা ভাষায় গবেষণার কাজে সহায়তা করিবে।

এই গ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপারে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক ডঃ মুঈউদ্দীন আহমদ খানের নিকট হইতে সর্বদাই উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। তিনি এই অনুবাদটি সম্পাদনা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উপদেশ না পাইলে এত শীঘ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। ইহাছাড়া আমার অগ্রজ অধ্যাপক খায়ের-উল-বশরের নিকট হইতেও আমি এই গ্রন্থের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ লাভ করিয়াছি। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসের ধারাবিবরণী সমকালীন পর্যায় টানিয়া আনিতে গিয়া আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমি উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদকমন্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় — মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

১-১০-৭৮

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণে মধপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে আমরা ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত টানিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আলোচ্য এলাকায় অনেক ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে। তাই এই সংস্করণে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে বিন্যাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

১৯৭৫ ও ১৯৭৬ সালে সংঘটিত লেবাননের গৃহযুদ্ধ শান্ত হইবার পর লেবাননে কিছুদিনের জন্য শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু যতটুকু শান্তি লেবাননে আসিয়াছিল, ১৯৮২ সালের জুন মাসে ইসরাইল কর্তৃক লেবাননে হামলা পরিচালনায় সমস্ত শান্তি বিনষ্ট হয়। ইসরাইলিগণ প্রকাশ্যে ফালাঞ্জিদের পক্ষাবলম্বন করে এবং ফালাঞ্জি অধ্যুষিত লেবানন বাহিনীর নেতা বশীর জামায়েল লেবাননের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইলে ইহুদীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে। অভিষেক অনুষ্ঠালের নয় দিন পূর্বে বশীর জামায়েল নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা আমিন জামায়েল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। লেবাননে ৩৮,০০০ হাজার হানাদার বাহিনীর উপস্থিতিতে ইসরাইল তথায় একটি শান্তি চুক্তি চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করে। লেবানন ইহা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে দুই দেশ বিগত মে মাসে (১৯৮৩) যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত ফিলিপ হাবিবের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। চুক্তি অনুসারে ইসরাইল - লেবানন সীমান্তে মালপত্র, উৎপন্ন দ্রব্য ও লোকজন পারাপারের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ আলোচনা চালাইতে লেবানন সম্মত হয় এবং ইহুদীরাও লেবানন হইতে সৈন্য প্রত্যাহারে সম্মত হয়। পরবর্তীকালে ইহুদীরা বাঁকিয়া বসে এই শর্তে যে, পি. এল.ও. ও সিরীয়দেরকে একই সঙ্গে লেবানন হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে। সমগ্র বেকা উপত্যকা এবং উভয় লেবাননের অধিকাংশ এলাকা সিরীয়দের দখলে ছিল। সিরীয়গণ সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানাইলে ইহুদীরাও অস্বীকৃতি জানায়।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাহেম বেগিন অভিযোগ করেন যে, যুদ্ধ বিরতি অনুযায়ী পি.এল. ও. যোদ্ধাগণ বৈরুত ত্যাগ করিলেও আরও প্রায় ২,০০০ পি. এল. ও. বৈরুতে রহিয়াছে। কিন্তু ইহুদীরাও হাবিব-চুক্তি লংঘন করে। চুক্তি ছিল পি. এল. ও. যোদ্ধাগণ বৈরুত ত্যাগ করিলেও তাহাদের পরিবারবর্গ বৈরুতে অবস্থান করিবে এবং ইহুদী বাহিনী তাহাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে তাহারা ৮০,০০০ ফিলিস্তিনী পরিবারবর্গকে শাতিলা ও সাবরা নামক উদ্বাস্তু শিবিরে রুদ্ধ করিয়া শিবিরদ্বয় খ্রিষ্টান মিলিশিয়াদের নিকট হস্তান্তর করে। শুধু তাই নয়, রাত্রের অন্ধকারে তাহারা আলো জ্বালাইয়া খ্রিষ্টানদিগকে হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া যাইতে সংকেত দেয় (Newsweek, 27th September '83)। অতঃপর রাত্রের অন্ধকারে খ্রিষ্টানরা ঐ শিবিরদ্বয়ের হাজার হাজার নিরস্ত্র অসহায় ফিলিস্তিনীদিগকে নির্বিচারে গুলি করিয়া হত্যা করে। শিবিরের বাহিরে তখন ট্যাংকে অবস্থানরত ইহুদিগণ পৈশিচাক আনন্দে উন্মত্ত। অতঃপর স্বদেশী ও বিদেশীদের ধিক্কার ও ঘৃণার মুখে ইহুদী বাহিনী বৈরুত ও সাউফ পর্বতমালা হইতে দক্ষিণে আরও সুদৃঢ় অবস্থানে সৈন্য প্রত্যাহার করে। ইহুদীদের পর লেবাননী বাহিনী ঐ এলাকার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে।

[উনিশ]

ইসরাইলিগণ কিছুটা দক্ষিণে সরিয়া গেলেও লেবাননে আওয়ালী নদী বরাবর তাহাদের অবস্থান ঠিকই রাখে। অপরদিকে ইসরাইলী আক্রমণের মুখে পি. এল. ও. গেরিলারা বৈরুত ছাড়িয়া গেলেও তাহারা আবার ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। এই পটভূমিতে পুনরায় (সেপ্টেম্বর '৮৩) শীয়া দ্রুজ ও খ্রিষ্টান ফালাঞ্জিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। তবে উভয় দলের কেউই ঠিকমত বলিতে পারে না কখন সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। উভয়েই অপর পক্ষকে প্রথম আঘাত হানিবার জন্য দায়ী করে। প্রাথমিক সংঘর্ষ আরম্ভ হয় জিম্মি আটকের মধ্য দিয়া এবং শীঘ্রই সুক আল-ঘারব ও আয়তাত গ্রামদ্বয় পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ নেয়। এমতাবস্থায় বৈরুত হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের কাজ তদারকির জন্য আগত মার্কিন, ফরাসি, ইতালিয়ান ও বৃটিশ সৈন্যগণ এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। কারণ লেবাননের গৃহযুদ্ধে তাহাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নাই কিন্তু যুদ্ধের গোলাগুলি হইতে তাহারা নিরাপদ নহে। সংঘাতের এক পর্যায়ে দ্রুজদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ হইতে দ্রুজ অবস্থানসমূহের উপর গোলাও নিক্ষেপ করা হয়। এদিকে সাউফে এবং আরও পূর্বে সুক আল-ঘারবের নিয়ন্ত্রণ লইয়া দ্রুজ ও লেবাননী সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ চলিতে থাকে। অতঃপর মার্কিন দূত ম্যাকফারলেন ও সৌদী বিশেষ দূত যুবরাজ বন্দর বিন সুলতানের মধ্যস্থতায় একটি যুদ্ধ বিরতি স্বাক্ষরিত হয়। নয়া চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধ বিরতি তদারক করিবার জন্য লেবাননের সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি, খ্রিষ্টান মিলিশিয়ার প্রতিনিধি, দ্রুজ নেতা ওয়ালিদ জুম্বলাত, সাবেক প্রধানমন্ত্রী রশীদ কারামী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রানজিকে লইয়া একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইবে এবং কমিটিতে বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও থাকিবেন। পরবর্তী পর্যায়ে লেবাননে ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নও আলোচিত হইবে বলিয়া ঠিক করা হয়।

এমনি এক সময়ে লেবাননে অবস্থানরত মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যদের বসবাস স্থলে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাইয়া প্রায় ২০০ মার্কিন ও ফরাসি সৈন্যকে হত্যা করা হয় (২৩শে অক্টোবর '৮৩)। শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত মার্কিন নৌ সেনা ও ফরাসি ছত্রী সেনারা বৈরুত বিমান বন্দরের নিকটবর্তী তাহাদের ভবনে ঘুমাইয়া ছিল। তখন কমান্ডোদের আত্মঘাতী স্কোয়াডের বিস্ফোরক ভর্তি দুইটি ট্রাক নিরাপত্তা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গিয়া বিস্ফোরিত হয়। ফলে ভবন দুইটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং প্রায় ২০০ মার্কিন ও ফরাসি সৈন্য প্রাণ হারায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধাবসানের পর এমন বিপুলসংখ্যক মার্কিন সৈন্য আর কোথাও নিহত হয় নাই। বৈরুতে মার্কিন ঘাঁটির উপর আক্রমণ ইহাই প্রথম নহে। ইতিমধ্যে দ্রুজদের রকেট হামলায় ছয়জন মার্কিন নৌসেনা নিহত হইয়াছে। আর একবার মার্কিন দূতাবাসে হামলায় একজন নিহত হইয়াছে।

এই বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করিয়া আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের ঝড় উঠা স্বাভাবিক, কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে পরিণতিতে লেবানন নামের দেশটির কোনো অস্তিত্ব থাকবে কি? তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে পি. এল. ও.-র বক্তব্য, ভাল্লুকের আস্তানায় ঢুকিলে কিছু আঁচড় খাইতেই হইবে। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, লেবাননে মার্কিন ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তির সশস্ত্র উপস্থিতির প্রধান লক্ষ্য ছিল, প্রথমত প্রেসিডেন্ট জামায়েল সরকার ও সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা, দ্বিতীয়ত সিরীয় ও ফিলিস্তিনীদের প্রভাব প্রতিরোধ এবং তৃতীয়ত ইহুদীদিগকে এই মর্মে আশ্বস্ত করা যে, লেবাননে তাহাদের স্বার্থ পরোক্ষভাবে হইলেও রক্ষা করা হইবে। অতএব

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে বিদ্যমান সংঘর্ষের এবং বিদেশী সৈন্য অবস্থিতির একটি কূটনৈতিক সমাধানের খোঁজ করে। (Time : September, '83)। কমান্ডো হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারো কাহারো মতে, পশ্চিমা শক্তির সশস্ত্র উপস্থিতির বিলোপ সাধন এবং বিদ্যমান দলগুলির নিজেদের বাহুবলে ক্ষমতা দখল করিয়া রাখিবার প্রবণতা হইতে এই বিস্ফোরণের সূত্রপাত। আবার কাহারো মতে মার্কিন ও ফরাসি বাহিনীকে সমুদ্রে অবস্থানের দিকে ঠেলিয়া দিবার জন্য এই বিস্ফোরণ।

যাই হোক, রাশিয়া কর্তৃক দক্ষিণ কোরীয় যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংসের ঘটনা, বার্মায় বোমা বিস্ফোরণে দক্ষিণ কোরীয় মন্ত্রীদের মৃত্যু এবং বৈরুতে পশ্চিমা সৈন্যদের উপর কমান্ডো আক্রমণ এই তিন ঘটনাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্র দেশগুলি আরও শক্ত নীতি গ্রহণের পক্ষে যুক্তিজাল বিস্তার করিতে পারে। লেবানন হইতে পশ্চিমা শক্তিবর্গের পশ্চাদপসারণের সঙ্গে সঙ্গে জামায়েল সরকারের পতন ঘটিবে এবং সিরিয়ার আধিপত্য বৃদ্ধি পাইবে। পরিণামে অত্র অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব অবিসংবাদিত হইবে, যাহা যুক্তরাষ্ট্র কখনও হজম করিতে পারে না। লেবাননের গৃহবিবাদ সম্পর্কে সুক আল-ঘারবের একজন পাদ্রী ফাদার পলিকার্পোর বক্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন : "এই যুদ্ধে অন্তরে ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছে। এই সবের উর্ধ্বে উঠা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এই আত্মকলহ অতি পুরাতন, কিন্তু আমরা এক সময় শান্তিতে বসবাস করিয়াছি। প্রতি ২০ বৎসর বা অনুরূপ সময় পরপর এইরূপ ঘৃণার উদ্রেক হয়। তখন যুদ্ধ হয় এবং পুনরায় ঘৃণা প্রদর্শিত হয়। পূর্বের ন্যায় এই যুদ্ধও একদিন থামিয়া যাইবে" (Time : September 19, '83)।

লেবাননে বিবাদমান দলসমূহের খতিয়ান

বিগত ১৯৭০ এর মাঝামাঝি সময়ে লেবাননে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এক জরিপ চালায়। ইহাতে দেখা যায় লেবাননে রহিয়াছে ৩টি সেনাবাহিনী, ২২টি আধাসামরিক (মিলিশিয়া) বাহিনী এবং ৪০টির অধিক রাজনৈতিক দল। ইহাদের প্রত্যেকটিই গোষ্ঠীগত ও ধর্মীয় সূত্রে আবদ্ধ। বর্তমানে এই বিধ্বস্ত দেশে ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষিদের তালিকা করা দুরূহ ব্যাপার। তবে প্রধান প্রধান গ্রুপগুলি নিম্নরূপ:

মেরোনাইট খ্রিষ্টান · ১৯৩২ সালে পরিচালিত আদম শুমারি অনুযায়ী খ্রিষ্টানগণ লেবাননে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এই শুমারি অচল, কারণ মুসলমানদের জন্মহার অধিক বিধায় খ্রিষ্টানগণ অনেক পূর্বেই সংখ্যালঘু হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করা হয় না বলিয়াই লেবাননে বার বার গৃহবিবাদ বাধে। যাহা হউক সেই পুরাতন শুমারি অনুযায়ী মেরোনাইট খ্রিষ্টানগণ পার্লামেন্ট ও সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েল একজন মেরোনাইট এবং সেনাবাহিনী প্রধান ইব্রাহিম তানাউসও একজন মেরোনাইট। জামায়েল সরকারের বিরোধীরা ২৪,০০০ সংখ্যা বিশিষ্ট লেবাননী সেনাবাহিনীকে মেরোনাইট খ্রিষ্টানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী হিসাবে আখ্যায়িত করে। তদুপরি এই বাহিনী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র লাভ করে।

ফ্যালাঞ্জিগণ : ইহা একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল যাহার মূল রহিয়াছে মেরোনাইট সম্প্রদায়ের মধ্যে। ১৯৩০ সালের দিকে আমিন জামায়েলের পিতা এই ফালাঞ্জি দল গঠন করেন। ফালাঞ্জি দল সুসজ্জিত ও সুশৃংখল একটি মিলিশিয়া বাহিনীর অধিকারী, যাহাদিগকে

লেবাননী বাহিনী বলা হয়। উহাদের নিকট ১০,০০০ নিয়মিত সৈন্য ও ১৫,০০০ রিজার্ভ সৈন্য রহিয়াছে বলিয়া দাবি করা হয়।

দ্রুজ : ইহা একটি ইসলামি ধর্মীয় সম্প্রদায়- শীয়া উপদল। ২,৫০,০০০ সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রুজগণ প্রধানত বৈরুতের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত সাউফ পাহাড় ও এ্যালি পর্বতমালায় বাস করে। লেবাননে একদা অতি শক্তিশালী দ্রুজগণ বিগত যুগগুলিতে আরও অধিক সংখ্যার অধিকারী মেরোনাইটদের নিকট প্রভাব হারাইয়া আসিতেছে।

দ্রুজদের রাজনৈতিক দলের নাম প্রগ্রেসিভ সোস্যালিস্ট পার্টি এবং তাহাদের মিলিশিয়া বাহিনীতে ৪,০০০ সৈন্য রহিয়াছে। ইহাদিগকে সিরিয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। ওয়ালিদ জুম্বলাত তাহাদের দল ও মিলিশিয়ার অধিনায়ক।

সুন্নী মুসলমানগণ : ইসলামের প্রধান বিশ্বাসী সুন্নীগণ লেবাননের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তাহাদের মিলিশিয়ার নাম মোরাবেতুন এবং ইহাতে প্রায় ৫০০০ সৈন্য রহিয়াছে।

শীয়া মুসলমানগণ : ১০ লক্ষ জনসংখ্যার অধিকারী শীয়াগণকে লেবাননের সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় বলিয়া মনে করা হয়। আমল নামীয় মিলিশিয়াগণ তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করে। ইহারাও সিরিয়া কর্তৃক ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত (Newsweek: Sept 19, '83)।

আফ্রিকার সাহারা মুরুভূমির উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ শাদ। ইহার উত্তরে লিবিয়া, পূর্বে সুদান, পশ্চিমে ক্যামেরুন, নাইজার ও নাইজেরিয়া এবং দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র। সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী শাদের আয়তন ৪,৯৫,৭৫০ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা মাত্র ৪৫ লক্ষ। শাদে নিওলিথিক সভ্যতার চিহ্ন ও সুপ্রাচীন কৃষি সভ্যতার চিহ্নও বিদ্যমান। আজও কৃষিই মানুষের প্রধান জীবিকা। তাছাড়া পশু চারণকারী মরুচর বেদুঈনও তথায় বিচরণ করে। নিজের নিয়মেই শাদে আপন ভংগিমায় শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। রাজা আর সর্দাররা দেশ শাসন করিতেন। মধ্যযুগে আরব দাস ব্যবসায়ীরা শাদে আসিয়া হানা দিত।

১৯০০ সালে ফ্রান্স শাদ দখল করে এবং একটি উপনিবেশ গড়িয়া তোলে। ঔপনিবেশিক যুগে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ কোন সুবিবেচনা ছাড়াই এই শূন্য ও চতুর্দিকে স্থলবেষ্টিত দেশটির সৃষ্টি করে। বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলির মধ্যে শাদ একটি। জনগণের মাথাপিছু গড় আয় বাৎসরিক ১১০ ডলার। ইহার সীমান্তে মরুভূমিও রহিয়াছে, উর্বর এলাকাও রহিয়াছে। উত্তরে রহিয়াছে বেদুঈন মুসলমান, দক্ষিণে রহিয়াছে অসভ্য মানুষ ও খ্রিষ্টানগণ এবং রহিয়াছে অসংখ্য কলহ সৃষ্টিকারী গোত্রসমূহ।

চারি বৎসর পর তুরস্কে আবার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হইতে চলিয়াছে। সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল কেনান এবরান নূতন সরকর গঠনের বিষয় লইয়া নির্বাচনে বিজয়ী মাদারল্যান্ড পার্টির নেতা তুরগোত ওজালের সাথে ইতিমধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে মতবিনিময় করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে দিন কয়েকের মধ্যেই তুরস্কে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিবে এবং নির্বাচনের ফলশ্রুতির ভিত্তিতে মাদারল্যান্ড পার্টি একটি শক্তিশালী জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনে সফলকাম হইবে। জেনারেল কেনান এবরান স্বয়ং এই প্রশ্নে সকল সংশয়ের অবসান ঘটাইয়াছেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলিয়াছেন,

গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা রহিয়াছে বলিয়াই সামরিক সরকার নির্বাচন দিয়াছে। সুতরাং একই অনুভূতি লইয়া নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিও তাহারা সম্মান প্রদর্শন করিবেন। জেনারেল কেনানের এই অভিমত জনমতের প্রতি তুরস্কের সামরিক শাসকদের অকপট আস্থা এক অবিমিশ্র এবং সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনী। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, ধর্মীয় শ্রেণীগত সংঘাতের দরুন ১৯৭৯ সালে তুরস্কের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক সংকট এবং বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, গণতন্ত্রের শুভ সূচনার ফলে উহার স্তিমিত হইয়া আসা প্রভাব পুরাপুরি অতিক্রম করিয়া তুর্কি জাতি রাজনৈতিক ঐক্য ও স্থিতিশীলতার মধ্যে নব উদ্দীপনা লইয়া আগাইয়া যাইতে সক্ষম হইবে। চার বৎসর পূর্বে শ্রেণীগত বৈষম্য এবং ডান বাম সংঘাতকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত দেশব্যাপী দাঙ্গার পটভূমিতেই বলবৎ হইয়াছিল সামরিক শাসন। ক্ষমতা গ্রহণের সময় সামরিক শাসক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ১৯৮৪ সালে মধ্যে তাহারা দেশে সাধারণ নির্বাচন দিবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে। নির্ধারিত সময়সীমার এক বৎসর পূর্বেই তাহারা নির্বাচন দিলেন আর মসৃণ করিয়া দিলেন জাতির গণতন্ত্রে উত্তরণের পরিবেশ। নিঃসন্দেহে এই দৃষ্টিভঙ্গি অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, তুরস্কের চারিশত আসন বিশিষ্ট জাতীয় পার্লামেন্টের দুইশত বারোটি আসন দখল করিয়া নির্বাচনে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে তুরগোত ওজালের মাদারল্যান্ড পার্টি। মধ্যপন্থী পপুলিস্ট পার্টি এবং ডানপন্থী ন্যাশনাল ডেমোক্রেট পার্টি পাইয়াছে যথাক্রমে একশত সতেরো ও একাত্তরটি আসন। তুগ্রু ও সুনাপের ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সামরিক শাসকগণ। কিন্তু নির্বাচনে তাহারা অনেক কম ভোট পাইয়াছেন। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোটারদের রায়ই চূড়ান্ত।

আফগান কমিউনিস্ট পর্টির 'খালক' গ্রুপের নেতা নূর মোহাম্মদ তারাকী ১৯৭৮ সালের ২৭শে এপ্রিল এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট দাউদ খানকে হত্যা করিয়া আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসেন। কাবুলের রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হয়।

আফগানিস্তানের পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক লীগের দুইটি গ্রুপ 'খালক' ও 'পারচম' নামে পরিচিত। এই দুইটি বিবাদমান কমিউনিস্ট পার্টি পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক লীগের আওতায় একীভূত হয়। 'পারচম'কে প্রধানত রুশপন্থী হিসাবে অভিহিত করা হয়, অপরদিকে 'খালক' এর নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদী। শিক্ষিত আফগানগণ 'পারচম'কে ঠাট্টা করিয়া 'রাজকীয় কমিউনিস্ট পার্টি' বলিয়া সম্বোধন করেন। অপরদিকে 'পারচম' নেতৃবৃন্দ 'খালক'কে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সি. আই. এ'র এজেন্ট বলিয়া আখ্যায়িত করেন। 'খালক' নেতা হাফিজ উল্লাহ আমিনকে তাহারা 'সি. আই. এ'র এজেন্ট মনে করেন। নূর মোহাম্মদ তারাকী সম্পর্কেও তাহাদের একই ধারণা। তাহারা ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য বারবাক কারমালের দিকে তাকাইয়া থাকেন।

অচিরেই উপজাতীয় লোকজন তারাকীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে সোভিয়েত জঙ্গী বিমান হইতে তাহাদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা হয়। পাকিস্তানে আগত আফগান উদ্বাস্তু শিবিরের উপরও বোমা বর্ষিত হয়। অতঃপর ১৯৭৮ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর অপর এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা হাফিজ উল্লাহ আমিন ক্ষমতায় আসেন এবং তারাকী সংঘর্ষে আহত হইয়া মারা যান। কিন্তু আমিনের কার্যকলাপে সোভিয়েত রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়। ১৯৭৯ সালে ২৭শে ডিসেম্বর অপর এক অভ্যুত্থানে হাফিজ উল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন এবং

বারবাক কারমাল আফগানিস্তানের ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করিবার জন্য রাশিয়া এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করে। সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষত মুসলিম বিশ্ব হইতে রাশিয়ার এই কার্যকলাপের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ইসলামি সম্মেলন সংস্থা আফগানিস্তান হইতে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়। আন্তর্জাতিক জুরী কমিশন ইহাকে সোভিয়েত কর্তৃক জাতিসংঘ সনদ লংঘন বলিয়া মত প্রকাশ করে। কিন্তু অপরদিকে সোভিয়েত রাশিয়া অভিযোগ করে যে, হাজার হাজার বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী আফগানিস্তানে প্রবেশ করিয়াছে। তাই কারমাল সরকারের অনুরোধে বাধ্য হইয়া রাশিয়া সীমিতসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। তাহাদের মতে ১৯৭৮ সালে বিপ্লবের পর আফগানিস্তানে এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে। জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক পার্টি সম্মেলনে দেশের সার্বিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হয়। ইহাতে আরও উল্লেখ করা হয় যে, দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হইতে সামন্তবাদী শ্রেণী ও বড় বড় মহাজন শ্রেণীকে উৎখাত করা হইয়াছে। দেশের সমস্ত দেশাত্মবোধক গ্রুপসমূহের মধ্যে ক্রমশ পরস্পর সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক শিকড় গড়িয়া উঠিতেছে (New Times, March, '82)।

মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গ ইহাকে রাশিয়ার আগ্রাসন হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছে। তাহাদের সহায়তায় আফগান মুজাহিদ বাহিনী আফগানিস্তানে গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রবল নিন্দা ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও সোভিয়েত বাহিনী এখনও আফগানিস্তানে অবস্থান করিতেছে।

১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইরানের মোহাম্মদ রেজা শাহের সরকারের প্ররোচণায় ফ্রান্সে নির্বাসিত ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বিরুদ্ধে এক মানহানিকর প্রবন্ধ পত্রিকায় ছাপা হয়। ইরানি জনগণ বিশেষত কোমের অধিবাসীরা প্রবল প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে। সরকার দমননীতি গ্রহণ করিলে তাব্রীজেও এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ক্রমশ সরকার বিরোধিতা তুঙ্গে উঠে। বিক্ষোভ মিছিলে উত্তাল তরঙ্গ সারাদেশে। জালেহ্ স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভে শাহের সেনাবাহিনীর গুলিতে ৪৪৯০ জন ইরানি নিহত হয়। অতঃপর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইমাম খোমেনীকে ইরানে ফিরাইয়া আনিবার দাবিতে মিছিল বাহির করে। সৈন্যবাহিনীর গুলিতে ৬৫ জন ছাত্র নিহত হয়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গণআন্দোলনে বেসামাল হইয়া পড়িলে রেজা শাহ দেশত্যাগ করেন এবং মিসরে প্রাণত্যাগ করেন। শাপুর বখতিয়ার যদিও কিছু কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের ওয়াদা করেন তবুও জনগণ তাহাকে বিশ্বাস করিল না। বরং ইমাম খোমেনীকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য জনগণের পক্ষ হইতে দাবি উঠে।

১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি ইমাম খোমেনী ইরানে ফিরিয়া আসেন। বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও উষ্ণ আন্তরিকতায় জনগণ তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। ইমাম সেইদিন যে সম্বর্ধনা পাইয়াছিলেন তাহা ছিল অভূতপূর্ব। এক সপ্তাহ পর ইমাম খোমেনী জনগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক ঘোষণায় সামরিক আইনের প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপ না করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, সেইদিন বিকাল হইতে সামরিক আইন জারি হইবার কথা ছিল। ইমামের আহ্বানে সমস্ত অফিস আদালতে তাঁহার সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। অতঃপর

ইমাম খোমেনী কোন প্রশাসনিক পদ গ্রহণ না করিয়া ইসলামি শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার উপদেষ্টা স্বরূপ কোমে অবস্থান করেন। তাঁহার প্রদর্শিত আদর্শ অনুযায়ী দেশের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রিসভা নির্বাচিত হন এবং ইসলামি সংস্কারমূলক কার্যাবলী চালাইয়া যান। বিগত নির্বাচনে আলী খোমেনী ইরানের প্রেসিডেন্ট এবং মোহাম্মদ মোসাভী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ : ইরান ও ইরাক এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত। কিছুকাল পূর্বে মিসর এবং সিরিয়াও এই ধরনের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু তা এত দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। ইরাক-ইরান যুদ্ধ অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হইবার কোনো লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। এই যুদ্ধের ফলে দুই দেশের জন ও সম্পদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে। দুইটি দেশই বিপুল তৈল সম্পদের অধিকারী। সুতরাং এই ক্ষতি শুধু দুই দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না। অপরদিকে ইরাক আরবিভাষী এবং ইরান ফারসিভাষী হইবার দরুন যুদ্ধটি অতি প্রাচীন আরবি-ফার্সি দ্বন্দ্বের রূপ নেওয়াটাও বিচিত্র নহে।

একটি পুরাতন পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার জন্য ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন তৎপর হন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালে ইরাক সরাসরি ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়া বসে। ১৯৭৫ সালের ৬ই মার্চ আলজিয়ার্স চুক্তির মাধ্যমে ইরাককে ইরানের হাতে এক গ্লানিকর পরাজয় মানিয়া লইতে হয়। সামরিক শক্তির দিক হইতে প্রাধান্যের অধিকারী তৎকালীন ইরান সরকারের সাথে ইরাক এই চুক্তিটি সম্পাদন করিতে বাধ্য হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধের শর্তে ইরাক হরমুজ প্রণালীর মুখে তিনটি দ্বীপের উপর ইরানি কর্তৃত্ব মানিয়া লয়। আর শাতিল আরবের মধ্যস্রোতকে দুই দেশের সীমান্ত হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ইরাক সর্বদা শাতিল আরবকে ইরাকের নিজস্ব জলধারা বলিয়া দাবি করে এবং উহার পূর্ব তীরকে সীমান্ত বলিয়া মনে করে। কিন্তু তৎকালীন শাহের শক্তিশালী সেনা বাহিনীর চাপে এবং ইরান কর্তৃক ব্যবহৃত কুর্দিদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় ইরান কর্তৃক চাপাইয়া দেওয়া এই সীমান্ত ব্যবস্থা ইরাক মানিয়া লয়। কুর্দি সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দরুন ইরাকের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। একটি সমৃদ্ধশালী তৈল রফতানীকারক দেশ হইয়াও ইরাক তাহার সামরিক অবস্থান সুদৃঢ় করিতে পারে নাই। ১৯৭৫ সালের আলজিয়ার্স চুক্তির ফলে ইরাক কিছুটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সে বেশ চাঙ্গা করিয়া তোলে। সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের দ্বারা ইরাক একটি অত্যাধুনিক করিতকর্মা সামরিক বাহিনী গড়িয়া তোলে এবং একটি পারমাণবিক গবেষণা প্রকল্প স্থাপন করে।

ইরানের শাহের পতন এবং ইরানি সামরিক বাহিনী হইতে বিপুলসংখ্যক মার্কিন ঘেঁষা অফিসার ও সৈন্য ছাঁটাইয়ের ফলে ইরানের সামরিক ক্ষমতা বেশ হ্রাস পায়। নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা ৪,০৫,০০০ হইতে ১,৪০,০০০ এ নামিয়া আসে। অবশ্য বিপুলসংখ্যক অনিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয়। এইসব বাহিনী ইরানের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করিতে সক্ষম হইলেও ইরাকের এই অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না বিবেচনা করিয়া ১৯৮০ সালে ইরাক ইরান আক্রমণ করে। প্রথম ধাক্কাতেই শাতিল আরবের পূর্বতীর দখল করিয়া সে ইরানের বেশ অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে। হরমুজ প্রণালীর নিকটস্থ দ্বীপগুলির উপরও ইরাক তাহার কর্তৃত্ব

পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু একটি আধুনিক যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় এবং পরাজয় নির্ধারিত হয় না। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয় উভয় পক্ষকেই। এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ইরানের জন্য বেশি হইলেও ইরাকের জন্য তা একেবারেই নগণ্য। ইতিমধ্যে ইরান উহার প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, যদিও শাতিল আরবের পূর্বতীর হইতে ইরাকীদিগকে হটাইতে সে ব্যর্থ হইয়াছে। অপরদিকে ইরাকের অর্থনীতির উপর যুদ্ধের প্রভাব খুব গভীর না হইলেও একেবারেই উড়াইয়া দিবার মত নহে। ইতিমধ্যে ইরান-ইরাক যুদ্ধের ডামাডোলে ইসরাইলী জঙ্গীবিমান বহর এক অতর্কিত হামলায় ইরাকের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি ধ্বংস করিয়া দেয়। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে ইরাক-ইরান যুদ্ধে কাহারা লাভবান হইতেছে। এই যাবৎ ইসলামি সম্মেলন সংস্থা, আরব লীগ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন, জাতিসংঘ ইত্যাদি সংস্থা হইতে বহুবার প্রচেষ্টা চালাইয়াও এই যুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। ইরাক কিছুটা নমনীয় ভাব দেখাইলেও ইরান কিছুতেই অস্ত্র সংবরণ করিতে রাজি নহে।

ইসলামি সম্মেলন সংস্থাঃ ১৯৬৪ সালে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামি দুনিয়ার জন্য একটি সংস্থা গঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হন। ১৯৬৯ সালে বর্বর ইহুদীদের হাতে মস্‌জিদুল আকসার অবমাননা এবং অগ্নি সংযোগের ঘটনায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ক্ষোভ এবং নিন্দায় ফাটিয়া পড়ে। যাহার ফলে সেই বৎসর ২২ থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে ২৪টি মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ শীর্ষ সন্মেলনে মিলিত হন। ফলশ্রুতিতে ১৯৭০ সালে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ও, আই, সি.র) জন্ম হয়। ইসলামি সম্মেলন , তিনটি প্রধান শাখায় উহার কাজ পরিচালনা করে। প্রথমত মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, দ্বিতীয়ত মুসলিম পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন, তৃতীয়ত ইসলামি সেক্রেটারিয়েট এবং ইহার পার্শ্ব সংগঠন।

১৯৭২ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে ও. আই, সির খসড়া চার্টার অনুমোদন করা হয়। এই ঐতিহাসিক চার্টারের ভূমিকায় মুসলিম সরকারগুলি স্বীকার করে যে, ইসলামি জনতার সাধারণ বিশ্বাসই মুসলিম দেশসমূহের সংহতি ও পুনর্মিলনের বুনিয়াদ। ইহাকে সামনে রাখিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, রাষ্ট্রগুলি ইসলামের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে সযতনে সংরক্ষণ করিবে আর ইহা হইবে মানবতার অগ্রগতির জন্য তাহাদের একটি গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চার্টারের ১৪ টি আর্টিকেলস বা অধ্যায়, সংগঠনের ৭ টি লক্ষ্য এবং সদস্য রাষ্ট্রের ৫ টি আচরণ বিধি লিপিবদ্ধ করা হয়। চার্টারের অনুমোদনের পর গত ১১ বৎসরে ৪টি ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন হইয়াছে ১১টি। বিশেষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সমাবেশ হইয়াছে ৩টি। ৪৩টি ইসলামি দেশ, ১৮টি ইসলামি সংস্থা চতুর্দশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে যোগ দিয়াছে। ইহাতে ৪৮টি স্বাধীন দেশের ৬০ কোটি, ১২টি স্বাধীন দেশের ৭ কোটি ৭০ লাখ, অমুসলিম দেশসমুহের ২৩ কোটি সংখ্যালঘু মোট ৯০ কোটি সত্তর লাখ মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছে। এই পটভূমিতে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার চতুর্দশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত চতুর্দশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল - আফগান সমস্যা, প্যালেস্টাইন ও মধ্যপ্রাচ্য, আল-কুদস কমিটি (আল-কুদস তহবিল ও ওয়াকফ),

ইস্‌রাইল বয়কট, ইসলামিক ব্যুরো, ফিলিস্তিনের সহিত সামরিক সহযোগিতার জন্য গঠিত ইসলামিক ব্যুরো, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, নামিবিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিকামী জনগণকে সমর্থন দান, ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা ও সংহতি, মায়টের কনোরো দ্বীপ, দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলমানদের সমস্যা, ও আই সি'র সদস্য নহে এমন দেশগুলিতে মুসলমানদের সমস্যা, ও আই সি এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা, তথ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি ইসলামিক আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (ইনা) ও ইসলামিক ব্রডকাস্টিং সংস্থা। পঞ্চদশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। ১৬ই জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে মরক্কোর ক্যাসাব্ল্যাংকায় অনুষ্ঠিতব্য ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের আলোচ্য সূচি নির্ধারনের জন্য এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই জানুয়ারি ১৯৮৪ সালে চতুর্থ ইসলামি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লেবাননের বিরুদ্ধে ইসরাইলী আগ্রাসন এবং লেবাননে তাহার অব্যাহত উপস্থিতি, অমীমাংসিত প্যালেস্টাইন সমস্যা, আল-কুদস আল- শরীফে অব্যাহত ইহুদীবাদী দখল, ইরান-ইরাকের ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ এবং আফগানিস্তানের বিদেশী সৈন্যের অব্যাহত উপস্থিতির মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

বিগত ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৩ সাইপ্রাসের তুর্কি অধিবাসিগণ নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ফলে সাইপ্রাস সমস্যা পুনরায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার অন্যতম শীর্ষ বিষয়ে পরিণত হয়। গণপরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে তুর্কি সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট জনাব রউফ দেংতাস স্বাধীনতা সংক্রান্ত প্রস্তাব পাঠ করিলে পরিষদ সদস্যগণ তুমুল করতালির মাধ্যমে প্রস্তাবের প্রতি তাহাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, নূতন এই প্রজাতন্ত্র সৃষ্টির ফলে বিগত ১০ বৎসর ধরিয়া তুর্কি ও গ্রীক সাইপ্রাসের একত্রীকরণের যে প্রয়াস চলিয়াছিল তাহা রুদ্ধ হইয়া গেল। স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তুরস্ক ১৫ তারিখের নূতন এই প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়কে স্বাগত জানাইয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। অপরদিকে গ্রীস, বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সসহ বেশ কিছু দেশ ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছে। স্মরণ করা যাইতে পারে, তুর্কি সাইপ্রাসের তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলমান এবং গ্রীক সাইপ্রাসের খ্রিষ্টানদের সম্প্রদায়গত বিরোধ এবং গৃহযুদ্ধের এক নাজুক পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালে তুরস্ক সাইপ্রাসে সামরিক অভিযান চালাইলে সাইপ্রাস দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে এবং উত্তরাংশে মুসলমান এবং দক্ষিণাংশে খ্রিষ্টান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হইতে দুই অংশে দুইটি পৃথক সরকার শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। এই সঙ্গে মুসলমান-খ্রিষ্টান মিলন তথা দুই সাইপ্রাসকে এক করিবার প্রচেষ্টাও চলিয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা কোন ফলপ্রসূ অবদান রাখিতে পারে নাই। এমতাবস্থায় তুর্কি সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ঘোষণাকে একেবারে আকস্মিক ঘটনা মনে করিবার কোন যুক্তি নাই। কারণ তুর্কি সাইপ্রাস বরাবরই বলিয়া আসিয়াছে উভয় অংশ ও সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে এমন গ্রহণযোগ্য নীতি কার্যকর না হইলে তুর্কি সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া বিকল্প পথ থাকিবে না। বলাই বাহুল্য এই পর্যন্ত দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রশাসনিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার সুষম বন্টনের ক্ষেত্রে যত প্রচেষ্টা চালানো হইয়াছিল তাহার সকল প্রচেষ্টাই গ্রীক সাইপ্রাসের খ্রিষ্টানদের বাধার মুখে নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। এমনকি জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে তুর্কিসাই প্রয়টদের বক্তব্য

পেশের অধিকারকেও নানাভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে।

সুতরাং আজ যখন সাইপ্রাস সমস্যা লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা হইতেছে, তখন আলোচনাকারীদের অবশ্যই তুর্কি সাইপিএয়টরা কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করিল তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখিতে হইবে। তুর্কি সাইপ্রিয়টরা কোনকালেই দেশ ভাগ করিয়া ফেলিবার পক্ষপাতী ছিল না। তাহারা সবসময় ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার নীতিকেই গুরুত্ব দিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সদিচ্ছাকে এতকাল দুর্বলতা ভাবা হইয়াছে। সত্য বটে, মুসম অংশীদায়িত্ব সম্পন্ন রাষ্ট্রনীতি যদি প্রতিষ্ঠিত হইত, যদি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি নির্মাণের বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গৃহীত হইত তাহা হইলে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা এইভাবে অসম্ভবের পথে হারাইয়া যাইত না। বস্তুত একটি অনিবার্য পরিস্থিতিই অদ্যকার তুর্কি সাইপ্রিয়টদের ঐ চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করিয়াছে।

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২০শে জানুয়ারি ১৯৮৪।

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত পরিবেশন করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে মধ্যপ্রাচ্য তথা পূর্ব-পশ্চিম শক্তিবলয়ে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজতান্ত্রিক বা সোভিয়েত ইউনিয়নে আদর্শগত যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা পূর্ব-পশ্চিমের স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটাইতে সহায়তা করে। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় বসিয়াই উপলব্ধি করেন যে সমাজতন্ত্র বর্তমান বিশ্বে উহার গ্রহণযোগ্যতা হারাইতে বসিয়াছে। সে কারণেই ১৯৮৫ সালে ক্ষমতাসীন হইয়াই তিনি ঘোষণা করেন পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত বা সংস্কার ও উন্মুক্ততার কথা। তিনি সমাজতান্ত্রিক সমাজে সংস্কার সাধনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। এই পুনর্বিন্যাস কর্মসূচি তিনি ধীরে ধীরে নিজ দেশে পরিচালনা করেন এবং সাথে সাথে তিনি এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন সোভিয়েত বলয়ভুক্ত পূর্ব-ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকেও। বলিতে গেলে গর্বাচেভের সূচিত সেই পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্তের ফলেই একে একে হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া হইতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিধরগণ পূর্ব-পশ্চিমের দুই পরাশক্তির প্রভাব বলয়ে নিজ নিজ অবস্থান নির্ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি শক্তির পতনের ফলে বা অন্য কথায় শক্তি দুইটির আপোসকামীতার মধ্যদিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিবলয়েও বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। অপরদিকে উপসাগরীয় যুদ্ধ এতদিন পর্যন্ত লালিত আরব মরুয়াতের (গর্ব) মূলে আঘাত হানে। অতঃপর বিবদমান দুই আরবি পক্ষের সংঘর্ষে আরবলীগ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি) উহাদের গুরুত্ব হারাইবার উপক্রম হয়। এতদিন আরব শাসকবর্গের পার্থক্য ছিল অনেকটা আদর্শ ভিত্তিক- রক্ষণশীল রাজা বাদশা বনাম প্রগতিশীল বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। কিন্তু এই যুদ্ধ তাহাদিগকে মার্কিন স্বার্থ সমর্থক বনাম মার্কিন স্বার্থ বিরোধী- এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দেয়। এই পটভূমিতেই অত্র এলাকার ঘটনাবলী আবর্তিত হইয়াছে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ ঃ

১৯৮০ সালে সূচিত ইরাক-ইরান যুদ্ধ উভয় পক্ষে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। অনেক পুরাতন একটি অপমানজনক সীমান্ত চুক্তি নস্যাৎ করিবার জন্য ইরাক প্রথমে ইরান আক্রমণ করিয়াছিল। অপরদিকে ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের পতনের লক্ষ্যে ইরান উহার ভূখণ্ড হইতে যুদ্ধ খোদ ইরাকি ভূখণ্ডে ঠেলিয়া দেয় এবং বেশ কিছু ইরাকি যুদ্ধ বন্দী হত্যা করে। কিন্তু যুদ্ধের কোন মোড় পরিবর্তনে ব্যর্থ হইয়া ইরান কর্তৃক লক্ষ লক্ষ প্রায়-প্রশিক্ষণহীন অল্প বয়সী এমনকি বাচ্চা ছেলেদিগকেও যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলিয়া দিবার অভিযোগ উঠে। তৎপরিবর্তে ইরাক যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠায়। ইতিমধ্যে এই অভিযোগও উত্থাপিত হয় যে ইরাক বিষাক্ত রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু অস্ট্রিয়া ও সুইডেনে পাঠানো দগ্ধ রুগীদের পরীক্ষা করিয়া এই অভিযোগ সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই। ইরাকের বসরা দখল করিয়া দক্ষিণের তেল ক্ষেত্রগুলির পথ বন্ধ করিবার জন্য ইরান ক্রমাগতভাবে

চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। ইরাকের কিছু অংশ দখল করিয়া বাগদাদকে গোলন্দাজ সীমানায় আনয়ন করিতে পারিলে সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে রাজধানী ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না- এই তত্ত্ব সামনে রাখিয়া ইরান লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু ইরাক উহার বিমান বাহিনীর সাহায্যে এগুলিকে হটাইয়া দেয়। এইভাবে ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের এক পর্যায়ে ইরান উহার দক্ষিণাঞ্চলে হরমুজ প্রণালীর মুখে সৈন্য মোতায়েন করে যাহাতে প্রয়োজনে উপসাগরে চলাচলকারী পাশ্চাত্য তেলবাহী জাহাজে আক্রমণ চালাইয়া প্রণালী বন্ধ করা যায়। (Time March 19, 1984)

১৯৮৮ সালের ৩রা জুলাই ইরানের একটি যাত্রীবাহী বিমান (ফ্লাইট-৬৫৫) ২৯০ জন যাত্রী লইয়া ইহার নিয়মিত যাত্রায় বন্দর আব্বাস বিমান বন্দর হইতে উপসাগরে পশ্চিম তীরে অবস্থিত দুবাই যাইবার পথে মার্কিন রণতরী ভিনসেনস (U.S.S Vincennes) হইতে নিক্ষিপ্ত দুইটি মিসাইলের আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া উপসাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। বিমানটির ক্রু সমেত সবাই নিহত হয়। ইরাকি টেলিভিশনে এই হত্যাযজ্ঞের দৃশ্য দেখিয়া বিশ্ববাসী হতবাক হয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে বলা হয় যে রণতরীটি উপসাগরে তৈলবাহী জাহাজ পাহারা দিবার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল; কুয়েতি জাহাজগুলিকে মার্কিন পতাকা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। মার্কিন নৌবাহিনী অবশ্য স্বীকার করে যে ভুলক্রমে এই যাত্রীবাহী বিমানটিকে এফ-১৪ টম ক্যাট (F-14 Tom Cat fighter) জঙ্গী বিমান মনে করিয়া আঘাত করা হইয়াছিল (Time, July 18, 1988)। দৈর্ঘে ১৭৭ ফুট যাত্রীবাহী বিমানটিকে কিভাবে ৬২ফুট দৈর্ঘের কথিত জঙ্গী বিমানের সহিত তুলনা করা হইল তাহা আজও রহস্য রহিয়া গিয়াছে। কারণ এই মার্কিন রণতরীতে সংযুক্ত র‍্যাডার ব্যবস্থা এত নিখুঁত যে ১৫০ মাইল দূরত্বের একটি বাস্কেট বলকে ইহা সহজেই চিহ্নিত করিতে পারে এবং উপরের দিকে ১০০০ মাইল দূরত্বের একটি বিমানকে সনাক্ত করিতে সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র সরকারিভাবে দোষ স্বীকার করে এবং ২৯০ জন যাত্রীর সবাইর ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। ইরান এই ঘটনাটিকে যুদ্ধের ভয়াবহতম অপরাধ বলিয়া বর্ণনা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের কথা বলিলেও উপসাগরে চলমান কোন মার্কিন রণতরী বা জাহাজে আঘাত হানিবার মত মনোবল বা শক্তি ইরানের ছিল না। অপরদিকে সাবধানী ইরানি নেতৃবৃন্দ ধৈর্যধারণ করিবার উপদেশ দেন; বিশেষত ইরানের ক্ষমতাসীন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হাশেমী রাফসানজানী যে কোনো খামখেয়ালি ব্যবস্থা হইতে বিরত থাকিবার পরামর্শ দেন। প্রতিদানে ইরান আশা করে যে বিশ্বব্যাপী ধিক্কারের ফলে সে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব লইতে পারিবে এবং পারস্য উপসাগর হইতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফিরাইয়া আনিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী তেমন জোরালো প্রতিবাদ না উঠায় ইরান তাহার জগৎজোড়া নিঃসঙ্গ অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে সচেষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া সে বৃটেন, কানাডা, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ স্থাপন করে। (Time-ঐ)।

ইরান তাহার নিঃসঙ্গ অবস্থা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যখন সে দুইবার জাতিসংঘে বিমান ধ্বংস বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব লইতে ব্যর্থ হয়। ইরান তাহার প্রস্তাবনায় বলে যে যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিয়াই এই আঘাত হানিয়াছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র এই বক্তব্য নাকচ করিয়া বলে যে ইরান যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে গৃহীত ৫৯৮ নম্বর প্রস্তাব না মানিবার ফলেই উদ্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ ইরাক যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব মানিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র আরও বলে যে ইরান একটি বেসামরিক যাত্রীবাহী বিমান শত্রুভাবাপন্ন একটি দেশের যুদ্ধ

জাহাজের উপর দিয়া উড়াইবার ফলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে নিজ দায়িত্ব এড়াইতে পারে না।

অবশেষে ১৮ই জুলাই, ১৯৮৮ ইরানি প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী জাতিসংঘের মহাসচিব জ্যাভিয়ার প্যারেজ দি কুইলারের নিকট এক পত্রে আট বৎসর স্থায়ী ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসানে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নম্বর ৫৯৮ মানিয়া লইবার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরদিন ইরাকি বিমান বাহিনী বুশাইরে অবস্থিত ইরানি পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করে। তিন দিন পর ইরাক উহার ৭৩০ মাইল দীর্ঘ সীমান্তে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করে; উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার- যত এলাকা দখল করা যায়।

ইমাম খোমেনী ঘোষণা দিয়াছিলেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়া যুদ্ধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার এই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা স্বভাবতই অনেক প্রশ্নের জন্ম দেয়। কারণ হিসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, তেহরান ভালোভাবে উপলব্দি করিয়াছে, সামরিকভাবে এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নহে। অপরদিকে এইরূপ জল্পনা কল্পনাও চলে যে ৮৮ বৎসর বয়স্ক ইমাম খোমেনীর স্বাস্থ্যের অবনতিই এই যুদ্ধ বিরতির মূল কারণ। খবরে প্রকাশ তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত এবং মস্তিষ্কে টিউমার ও লিভারের পীড়াসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। সে যাহাই হউক, ইরানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সবাইকে বিস্মিত করে।

যুদ্ধবিরতি কার্যকর করিবার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব উভয় দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদেরকে নিউইয়র্কে ডাকিয়া পাঠান। বাগদাদ ও তেহরানে দুইটি জাতিসংঘ দল পাঠানো হয়। তাহাদের একটি উভয় পক্ষের প্রায় ৭০,০০০ যুদ্ধবন্দীর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অপর দলটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে। এ ভাবে সাত বৎসর স্থায়ী ইরাক-ইরান যুদ্ধ শেষ হয়।

যুদ্ধ শেষে ইরাকের মনোবল বাড়িয়া যায়। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকি বাহিনী তাহাদের হারানো সমস্ত এলাকা দখল করিয়া লয়, তন্মধ্যে ফাও উপদ্বীপ, বসরার পূর্ববর্তী এলাকা এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মুখে অবস্থিত তৈল সমৃদ্ধ মজনূন উপদ্বীপসমূহ অন্তর্ভুক্ত। এই দখল রোধ করিবার জন্য খোমেনী অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হন। ইরাকের জনসংখ্যা ইরানের এক তৃতীয়াংশ হইলেও ইরাকের সৈন্য সংখ্যা ইরান হইতে অনেক বেশি (ইরাক দশ লক্ষ, ইরান ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)। ইহা ছাড়াও ইরাকের রহিয়াছে ট্যাংক প্রশিক্ষণ ও বিমান বাহিনীর প্রাধান্য। ইরানের সৈন্য তালিকাভুক্তির সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পায়। ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর সহিত সংযুক্ত নির্ধারিত তিন লক্ষ বাসেজির (স্বেচ্ছাসেবক) সংখ্যা এক তৃতীয়াংশে নামিয়া আসে। ২৯০ জন যাত্রী সমেত বিধ্বস্ত ইরানি যাত্রীবাহী বিমানের ঘটনা তাহাদের মনোবল সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া দেয়।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের ভয়াবহতা স্তিমিত হইয়া আসিলে ইরান সঙ্গোপনে এবং দৃঢ়ভাবে তাহার সশস্ত্র বাহিনী আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে মনোনিবেশ করে। এই প্রক্রিয়ায় তাহারা বিশেষত ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ, বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি এবং পদাতিক বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, ইরান উত্তর কোরিয়া হইতে মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থা প্রায় সম্পন্ন করিয়াছে- যাহা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য উভয়ের জন্যই হুমকি স্বরূপ। সি. আই. এ. ও পেন্টাগণ কর্মকর্তার বরাত দিয়া পত্রিকায় বলা হয় মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রে আঘাত হানিবার আওতা ৬০০ মাইল (New York Times, April, 8.93)। এদিকে ভারত ও মিশর ইরানের এই সমর সজ্জায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে।

পশ্চিম তীর হইতে জর্দানের দাবি প্রত্যাহার ঃ

১৯৮৮ সালের মধ্য জুলাই জর্দানের বাদশাহ হোসেন ঘোষণা করেন যে, প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (পি.এল.ও) ও আরব রাষ্ট্রবর্গের ইচ্ছানুযায়ী ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর হইতে জর্দানের আইনগত ও প্রশাসনিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হইল। এই ঘোষণা বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করে এবং আসন্ন আরব-ইসরাইলী শান্তি পরিকল্পনার ভিত্তি নস্যাৎ করিয়া দেয়। চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত বাদশাহ হোসেনের ঘোষণা পরিমাপ করিবার জন্য তাঁহার ৪৫১ সদস্য বিশিষ্ট প্যালেস্টাইন জাতীয় কাউন্সিলের সভা ডাকেন। ইসরাইলী নেসেট (জাতীয় সংসদ) জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়। ওয়াশিংটনে কেউ কেউ বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ উদ্ভাবিত মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা নস্যাৎ হইয়া গেল, আবার কেউ কেউ বলেন বরং ইহার দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠার গতি সঞ্চারিত হইবে। বাদশাহ হোসেন পশ্চিম তীরে অবস্থানরত তাঁহার আট লক্ষ নাগরিকের সহিত তিনি কিভাবে সম্পর্ক ছেদ করিবেন সে ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করেন নাই। ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৬৭ সালে ৬ দিনের আরব ইসরাইলী যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখল করা পর্যন্ত জর্দান এই এলাকা শাসন করিত। ঘোষণায় তিনি অবশ্য ফিলিস্তিনীদেরকে ত্যাগ করেন নাই বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু মুক্তি সংস্থা পশ্চিম তীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করিবার দাবি উত্থাপন করায় তিনি এই ব্যবস্থা নিলেন, তবে সংস্থা ব্যর্থ হইলে তিনি এই এলাকার হাল পুনরায় ধরিবেন বলিয়া আভাস দেন।

বাদশাহর এই পন্থা শক্তি পরিচালিত হউক বা হতাশা পরিচালিত হউক, এই ঘোষণা তাঁহার ক্রমাগত নিরুৎসাহের বহিঃপ্রকাশ। বিগত আট মাসের ফিলিস্তিনী ইন্তিফাদাহ বা বিক্ষোভের দ্বারা পশ্চিম তীরে তাঁহার প্রভাব খর্ব হয়। পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনী জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত তাঁহার কর্মপন্থার স্বীকৃতি আরবরা দেয় নাই। পশ্চিম তীরের পক্ষে জর্দানের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে আরবরা এই বলিয়া সমালোচনা করে যে বাদশাহ মুক্তি সংস্থার ভূমিকা দখল করিতে চান। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সূচিত শান্তি পরিকল্পনাতে তিনি উৎসাহ প্রদান করিলে সরোষে অভিযোগ করা হয় যে তিনি ফিলিস্তিনীদের পক্ষে কথা বলিতে চান। ১৯৮৮ সালের জুন মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আরব শীর্ষ সম্মেলনে বাদশাহ সরাসরি বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টাকে প্রতিযোগিতা বলিয়া অপব্যাখ্যা করা হয়।" উল্লেখ্য, তিন দিন স্থায়ী আলজিয়ার্স সম্মেলনে বাদশাহ পশ্চিম তীরের জন্য ব্যয়কৃত বাৎসরিক সাত লক্ষ ডলারের মধ্যে কিছু সাহায্য চাহিলে তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়।

এই ঘোষণার পর জর্দান পশ্চিম তীরের জন্য গৃহীত ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলারের পঞ্চশালা উন্নয়ন প্রকল্প বাতিল করে, জর্দানের ৬০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্ন পরিষদ বাতিল করিয়া দেয়। এই পরিষদের অর্ধেক সদস্য পশ্চিম তীরের প্রতিনিধিত্ব করিত। চারি দিন পর জর্দান পশ্চিম তীরের ২১০০০ বেসামরিক কর্মচারীদের ছাটাই করে বা অবসর দান করে। এই কর্মচারিদের মধ্যে ছিল শিক্ষক এবং স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সেবামূলক কাজের কর্মচারি। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামীর ইহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থাকে এই দায়িত্ব গ্রহণে বাধা প্রদান করেন। তবে জর্দান পশ্চিম তীরের ৭,৫০,০০০ ফিলিস্তিনীদের জর্দানি পাসপোর্ট বাতিল করে নাই এবং যে দুইটি পুল পশ্চিম তীর ও জর্দানকে সংযুক্ত করিয়াছে সেইগুলিও বন্ধ করে নাই।

পশ্চিম তীরের কোনো কোনো প্যালেস্টইনী মনে করে, জর্দানের পশ্চাদপসারণ ফিলিস্তিনীদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পথে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তাহারা আরও মনে

করে, ইসরাইলী দখলীকৃত আরব ভূমির জন্য যুক্তিসম্মত একটি প্রবাসী সরকার গঠনের ইহাই উপযুক্ত সময়। আবার অনেকে এই ব্যাপারে নিশ্চিত নহে। ইতিমধ্যে ইসরাইলী টেলিভিশনে সচিত্র খবর প্রচার করা হয় যে, ইসরাইল পশ্চিম তীরে একটি 'স্বাধীনতার ঘোষণা' অংকুরেই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। অনেক ফিলিস্তিনী এই আশংকা ব্যক্ত করে যে বাদশাহ হোসেন ইসরাইল কর্তৃক পশ্চিম তীর দখল করিয়া লইবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন (Time, August 15, 1988)।

ইন্তিফাদাহ্ (গণ বিক্ষোভ)

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকায় মুক্তিকামী ফিলিস্তিনী অধিবাসীদের দ্বারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে পরিচালিত গণ বিক্ষোভকে ইন্তিফাদাহ্ বলে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এই বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। ইন্তিফাদাহ্-য় অংশগ্রহণকারী ফিলিস্তিনী ছাত্র জনতা আলোচ্য এলাকায় ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিক্ষোভ পরিচালনা করে। ইসরাইলী পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী পাইলেই তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করে। ইসরাইলী সশস্ত্র বাহিনী প্রতিশোধ গ্রহণ করে, মারধর করে, গ্রেফতার করে ও হত্যা করে। কিন্তু ইহার দ্বারা ফিলিস্তিনী যুবকরা নব উদ্যম লাভ করে। এই আন্দোলন শুরু হইবার এক বৎসরের মধ্যে ইসরাইলী সৈন্যরা নৃশংসভাবে ৩১৮ জন ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে, ৭০০০ জনেরও অধিক আহত হয়, ১৫ হাজার ফিলিস্তিনীকে গ্রেফতার করা হয়। তন্মধ্যে ১২০০০ ফিলিস্তিনীকে জেলে দেয়া হয় এবং ৩৪ জনকে দেশ হইতে বহিষ্কার করা হয়। অপরদিকে ১১ জন ইসরাইলী সৈন্য জনতার রোষে পতিত হইয়া নিহত হয়। স্বাধীনতার জন্য ফিলিস্তিনী জনগণ প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং এই উদ্দীপনাই ইন্তিফাদাহ্কে সরগরম রাখিয়াছে। এই বিদ্রোহ-বিক্ষোভ প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক বিষয়ের সম্মুখভাবে আনয়ন করিয়াছে। ইসরাইলী বাহিনীর নৃশংসতায় বিশ্ববাসীকে ফিলিস্তিনীদের সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই বিষয়টি ইসরাইলী কর্তৃপক্ষের জন্য মহাবিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে, কিন্তু ফিলিস্তিনীরা উৎসাহিত হইতেছে।

ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ তাহাদের সেনাবাহিনীর নৃশংসতম উচ্চপদস্থ জেনারেলদিগকে পশ্চিম তীর ও গাজায় প্রেরণ করে ইন্তিফাদাহ্ দমন করিবার জন্য। সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত বিক্ষোভকারীদের মৃতদেহ তাহারা ফেরত দেয় না বরং কোনো প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়াই লাশগুলিকে ইসরাইলের গোপন "সন্ত্রাসকারী" কবরস্থানে দাফন করে। জেনারেল আইজ্যাক মোরদেশাই নামক এক জঘন্যতম সেনাপতিকে অধিকৃত অঞ্চলে প্রেরণ করিলে তিনি ১২ লক্ষ ফিলিস্তিনীকে এই মর্মে হুশিয়ার করিয়া দেন যে সেনাবাহিনী তাহাদিগকে আর লালন করিবে না, তাহারা যদি আবারও বাধা প্রদান করে তবে তাহারা উহার জন্য দুঃখ করিবে। অপরদিকে ৬৫,০০০ ইহুদী বসতি স্থাপনকারীদিগকে তিনি শান্তির বাণী দ্বারা আশ্বস্ত করেন। অতঃপর যে কোনো আরবকে ১২ মাস পর্যন্ত বিনা দোষে জেলে রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। মুখে কোনো আবরণ দিলেই তিনি গুলি করিবার হুকুম দেন- বিক্ষোভ করুক আর না করুক। ফলে অনেক নিরীহ আরব যাহারা প্রখর রৌদ্রের জন্য মাথায় 'কাফিয়া' পরিধান করে তাহারা হত্যার শিকার হয়। (Newsweek, September 18, '87)। এই নৃশংস বাহিনী একবার নাবলুসের 'ইত্তেহাদ হাসপাতাল তিন ঘণ্টার জন্য অবরুদ্ধ রাখিলে ভিতরে আহত ও জখমপ্রাপ্ত রোগীদের করুণ চিৎকারে এক ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

[তেত্রিশ]

কিন্তু সমগ্র ইসরাইলে পশ্চিম তীরের দায়িত্বকে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া অভিহিত করা হয়। 'জেরুজালেম পোস্ট' পত্রিকা পশ্চিম তীরে বদলি হওয়াকে "নিশ্চিত ব্যর্থতার কাজ" হিসাবে বর্ণনা করে। ইহুদী দমন নীতি যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে বিক্ষোভকারীদের উৎসাহ ততই ব্যাপকতর হইতে থাকে।

ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (Israili Defence Forces I. D. F) লোকেরা এখন এই বিক্ষোভ দমন করাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে "এখানে আমাদের দায়িত্ব পালনের সময় আমরা পছন্দ করি আর না করি আমরা যে মৌলিক নৈতিকতার উপর বড় হই তার পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রত্যেকদিন ছেলেরা আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেনা প্রধান বলেন আরও সময় লাগবে। কিন্তু সময় অনেক দীর্ঘ এবং এর মূল্য অতি উচ্চ"। আরেক জন বলেন, "লোকেরা আমাকে ভয় পাক এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য আমি নিষ্ঠুরভাবে তাদের সাথে আচরণ করি। এটি আমার কর্তব্য, কিন্তু আমার আচরণের দ্বারা আমি অপমানিত বোধ করি।" আরেকজন বলেন, "ব্যক্তি হিসাবে একাজ আমাকে বিদীর্ণ করে আর আরবদেরকে শক্তিশালী করে। একমাত্র রাজনৈতিক সমাধানই আমাদেরকে এই অপমান থেকে রক্ষা করতে পারে।" (Time, January 30, '89)।

বিক্ষোভ দমনকারী সৈন্যদের আক্ষেপ হইল অধিকাংশ বিক্ষোভকারী ছোট ছোট বালক এবং প্রধান অস্ত্র তাহাদের পাথর নিক্ষেপ। তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে। পাথর নিক্ষেপের জন্য জেল পাঁচ বৎসর, তাহার পিতার এক হাজার ডলার বা তদূর্ধ্ব জরিমানা, তাহাদের পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং তাহা সত্ত্বেও তাহাদের বাড়িঘর জ্বালাইয়া দেওয়া। তাহারা মনে করে টিকিয়া থাকিবার জন্য পাথর নিক্ষেপকারীদিগকে ভয়াবহ শাস্তি দিতে হইবে। কিন্তু ট্যাংক ও গ্রেনেডের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রিজার্ভ সৈন্য যখন পাথরধারী বালকদের ধাওয়া করে তখনই বড় বিরক্তিপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে তখন মন্তব্য করে, "আমি কোন ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে লড়াই করছি না, আমার শত্রু একটি বার বছরের বালক।"

কিন্তু তবুও ইন্তিফাদাহ্ থামে না। ইসরাইল বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে পারে না পাথর নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কেন লাঠি ব্যবহার না করিয়া গুলি বর্ষণ করিতে হইবে। ইসরাইলী পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় সদস্যরা প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে এবং মন্তব্য করে "এই হত্যার নীতির দ্বারা ফিলিস্তিনীদিগকে হত্যা করিতেছে না বরং ইসরাইলীদের আত্মাকে হত্যা করিতেছে।"

ইন্তিফাদাহ্ এখনও চলিতেছে এবং ভবিষ্যতেও চলিবে বলিয়া মনে হইতেছে। এই ইন্তিফাদাহ্ পি. এল. ও. নেতা ইয়াসির আরফাতকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি পৌছাইয়াছে এবং তাঁহাকে জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

গত ৩০শে মার্চ '৯৩ ফিলিস্তিনীরা অধিকৃত গাজা ও পশ্চিম তীরে ভূমি দিবস পালন করে। গাজা এলাকায় ২জন ইহুদী হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে ইসরাইলী বসতি স্থাপনকারীরা গত ৩০শে মার্চ সেখানকার একটি মসজিদে গুলি বর্ষণ করে ও পরে উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইসরাইলী সৈন্যরা অতঃপর গাজা এলাকা সীল করিয়া দেয়। অপরদিকে পশ্চিম তীরে ২ জন ইসরাইলী পুলিশ নিহত হইবার পর পশ্চিম তীরও সীল করিয়া দেওয়া হয়।

লেবাননের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা

১৯৪৩ সাল হইতে প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক আইন অনুসারে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদিগকে সংখ্যায় অর্ধেক অর্ধেক বিবেচনা করিয়া ক্ষমতার ভাগাভাগিতে খ্রিষ্টানরা পায় দেশের প্রেসিডেন্ট আর মুসলমানেরা পায় প্রধানমন্ত্রী। ইহাই মূলত লেবাননের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মূল কারণ। ১৯৮৪ সালে সুইজারল্যান্ডের ল্যুজানে অনুষ্ঠিত লেবাননের বিভিন্ন উপদলসমূহের এক সম্মেলনে এই ব্যাপারটি প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। লেবাননের প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েলের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রুজ নেতা ওয়ালিদ জুম্বলাত এবং শিয়া আমল মিলিশিয়া নেতা নবীহ বারী লেবাননের ৯৯ সদস্য বিশিষ্ট মৃতপ্রায় পার্লামেন্টের জন্য এমন একটি নূতন নির্বাচনী ব্যবস্থা চান যাহাতে জাতীয় ভিত্তিতে সংসদে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব থাকে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলে মুসলমানদের সুবিধা হইবে, কারণ বর্তমানে লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ হইতে ৬০ শতাংশ। তদুপরি জুম্বলাত ও নবীহ বারী লেবাননের সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিসের উপরের তলায় মেরোনাইট খ্রিষ্টানদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করিতে চান। এইসব প্রস্তাবনা উপলব্ধি করিয়া মেরোনাইটদের ক্রম-বর্ধমান একটি অংশ লেবাননকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিভক্ত করাকে স্বাগত জানায়। খ্রিষ্টান মিলিশিয়া বাহিনীর একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হুমকিই দিয়া বসেন যে, অনুরূপ অসন্তোষজনক কিছু হইলে ল্যুজান সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী বাস্তবায়িত হইবে না এবং শেষ পর্যন্ত তাহাই হইয়াছে।

* * * *

রাজধানী বৈরুত তথা সমগ্র লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা লাভ একটি অকল্পনীয় বিষয়ে পরিণত হইতে চলিয়াছে। লেবাননের বিবদমান-দলগুলির সংঘাত কিছুটা স্তিমিত হইয়া আসিলে দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইল নূতন করিয়া সংঘাতের সৃষ্টি করে। যেমন কিছুদিন পূর্বে ইসরাইল হিজবুল্লাহ নেতা শেখ ওবায়দকে বিনা উস্কানীতে অপহরণ করিয়া এই অঞ্চলে পুনরায় সংঘাতের আগুন বাড়াইয়া দেয়।

লেবাননে সংঘাতের আরেক দিগন্ত উন্মোচিত হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী খ্রিষ্টান নেতা জেনারেল আউনকে কেন্দ্র করিয়া। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। লেবাননের বেকা উপত্যকা হইতে সিরীয় বাহিনীর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার পর্যন্ত তিনি যে কোন ধরনের আলোচনা নাকচ করিয়া দেন। কিছুদিন পূর্বে প্রেসিডেন্ট আমিন জামায়েল ক্ষমতা ত্যাগ করিলে আগস্ট ১৯৮৯তে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা দেন। তিনি মনে করেন শক্তির জোরে তিনি সিরীয় বাহিনীকে তাড়াইতে পারিবেন, অন্যান্য সামরিক দলগুলিকে নিরস্ত্র করিতে পারিবেন এবং মুসলমানদের ন্যায়সংগত দাবি অগ্রাহ্য করিয়া লেবাননের একক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন। এ সমস্ত অসংলগ্ন কথা বার্তার দরুন লেবাননে সংঘাত বৃদ্ধি পায় এবং মৃতের হারও বাড়ে। সিরীয় বাহিনী জেনারেল মোয়াল্লার নেতৃত্বে আউন বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। দ্রুজ মিলিশিয়া এবং সিরিয়া সমর্থিত ফিলিস্তিনীরাও ইহাতে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সিরিয়ার পক্ষে আউনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নহে, কারণ সেইক্ষেত্রে পশ্চিমা শক্তি এবং ইসরাইল তাঁহার সমর্থনে আগাইয়া আসিবে। তাই সিরিয়া চায় লেবাননের অভ্যন্তরীণ দলগুলিকে আউনের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া তাহাকে শায়েস্তা করিতে। এই উদ্দেশ্যে সিরিয়া লেবাননের প্রধান প্রধান মুসলিম দলের নেতা যথা -দ্রুজ নেতা ওয়ালিদ জুম্বলাত, শিয়া আমল মিলিশিয়া

নেতা নবিহ বারি এবং ইরান সমর্থিত হিজবুল্লাহর শীর্ষস্থানীয় নেতাদিগকে লইয়া দামেস্কে এক বৈঠকে মিলিত করিয়া জেনারেল আউন বিরোধী এক কোয়ালিশন গঠনে সম্মত করান। এই খবর পাইবার পর জেনারেল আউন ঘোষণা করেন যে তিনি লেবাননবাসীর পক্ষে যুদ্ধ করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমগ্র লেবাননবাসী দূরে থাকুক সংখ্যালঘিষ্ট খ্রিষ্টানদের কিছু কিছু অংশও তাঁহার পক্ষে নাই। যেমন খ্রিষ্টান ফ্রাঞ্জেইহ উপদলের নেতা সোলাইমান ফ্রাঞ্জেইহ স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা প্রয়োজনে জেনারেল আউনের বিরুদ্ধেই লড়াই করিবেন। প্রথম হইতেই আউনকে মেরোনাইট খ্রিষ্টানদের বিরোধীতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, হয়ত ভবিষ্যতেও হইতে হইবে। বেশিদিনের কথা নয়, জেনারেল আউন খ্রিষ্টান মিলিশিয়া লেবানীজ ফোর্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। জেনারেল আউন জানেন, তাঁহার শক্তির উৎস কোথায়, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র এবং উহার মিত্র ইসরাইল। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার তৎপরতাকে "সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন" বলিয়া অভিহিত করে। পোপ এই যুদ্ধকে গণহত্যার সঙ্গে তুলনা করেন। ইতিমধ্যে ফরাসির রণতরী লেবাননের উপকণ্ঠে টহল দেওয়া শুরু করে। সমগ্র বিশ্ব হইতে ও. আই. সি. কে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানায়।

লেবাননে জেনারেল আউনের দ্বারা সৃষ্ট যুদ্ধ যতই তীব্রতর হয় ততই বিশ্ববাসী আউনকে ইহার জন্য দায়ী করে। ইহার মধ্যে ইসরাইলের মুসলিম নেতা ওবায়দকে অপহরণ এবং পশ্চিমা জিম্মি সংকট এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তোলে। তবে এই ঘোলাটে অবস্থায় অধিক লাভবান হয় ইসরাইল। কারণ সে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি লেবাননে নিবদ্ধ রাখিয়া পশ্চিম তীরের গণঅভ্যুত্থান হইতে দূরে সরাইয়া রাখে। ইসরাইল সেখানে অবলীলায় নির্যাতন চালাইতে সক্ষম হয়।

১৫ আগস্ট, '৮৯ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এক বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল আউনকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানানো হয়। তিনি তাহা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু কতদিন এই যুদ্ধ বিরতি টিকে তাহাই দেখিবার বিষয়।

জেনারেল আউনকে ফ্রান্সে সরাইয়া লইবার মধ্য দিয়া লেবাননে কিছুকাল শান্তি বিরাজ করিলেও সম্প্রতি ইরান প্রভাবিত হেজবুল্লাহ গেরিলা দলের সহিত চলতি বৎসরের অক্টোবর মাসে ইসরাইলী টহল দলের এক ঘোরতর সংঘর্ষ বাধে। হেজবুল্লাহ গেরিলাদের এক চোরা গোপ্তা হামলায় দক্ষিণ লেবাননে ৫ জন ইসরাইলী সৈন্য নিহত এবং ৫ জন আহত হইলে ইসরাইলী গোলন্দাজ বাহিনী ও জঙ্গী হেলিকপ্টার বহর লেবাননের বেকা উপত্যকায় প্রতি মিনিটে অন্তত দুইটি করিয়া সেলের আঘাত হানিতে আরম্ভ করে। তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

জাতিসংঘে আরাফাত

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে ইন্তিফাদাহ্ প্যালেস্টাইন সমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচ্য বিষয়ে প্রাধান্য দান করিয়াছে। ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে একটি আরব প্রস্তাবে পি. এল. ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁহার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র উহার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজের পরামর্শে মার্কিন নিরাপত্তার খাতিরে ইয়াসির আরাফাতকে ভিসা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের গোড়াপত্তনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের মধ্যে যে চুক্তি হয় উহাতে বলা হইয়াছে, জাতিসংঘের কাজে যে কোনো লোকের সদর দপ্তর নিউইয়র্ক গমনে যুক্তরাষ্ট্র বাধা

প্রদান করিবে না। কিন্তু এই চুক্তিটি মার্কিন কংগ্রেসে পাস হইবার সময় শর্ত আরোপ করা হয় যে সে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে যে কোনো বিদেশীর ভ্রমণ যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবে। অতঃপর বিশ্ববাসীর সমালোচনার মুখে জেনেভায় জাতিসংঘের এক পরিপূর্ণ অধিবেশনে আরাফাতকে তাঁহার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়। আরাফাতকে ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতির ফলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় উঠে। এমনকি ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের অতি আপন বন্ধুরাও সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার বন্ধু রাষ্ট্রবর্গ কিভাবে পি.এল. ও. নেতাকে জাতিসংঘে বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ করিয়া দিল তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ১৯৭৫ সালের মধ্যভাগে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সঙ্গে এই মর্মে চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে যুক্তরাষ্ট্র পি. এল. ও. -র সহিত কোনো আলোচনা টেবিলে বসিবে না বা স্বীকৃতি দিবে না যতক্ষণ না পি. এল. ও. ইসরাইলের টিকিয়া থাকিবার অধিকার স্বীকার করে। ওয়াশিংটন পরে আরেকটি শর্ত আরোপ করে যে, পি. এল. ও. সন্ত্রাসবাদীকে নিন্দা করিতে হইবে। মার্কিনীরা সেই চুক্তি এই যাবৎ মানিয়া আসিয়াছে। বর্তমানে এই শর্তাবলী পুরাপুরি না মানা হইলেও পশ্চিম তীরের ইন্তিফাদাহ -এর দরুন যুক্তরাষ্ট্র অনুভব করে যে, পি. এল. ও. -র সহিত বৈঠকে বসা প্রয়োজন। ইহাছাড়াও নভেম্বর ১৯৮৮ সালে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল কাউন্সিলের (পি.এন.সি) অধিবেশনে জাতিসংঘের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইসরাইলের টিকিয়া থাকিবার অধিকার স্বীকার করা হয়। দ্বিতীয়ত ইন্তিফাদাহ পি. এল. ও-কে কিছুটা নমনীয় করিয়াছে। কেননা বিক্ষোভকারীরা ইসরাইলের সহিত শান্তিতে সহাবস্থান চায়। অধিকন্তু দীর্ঘকাল এই বিক্ষোভের স্থায়িত্বের দরুন প্যালেস্টাইন সমস্যাটিকে আর আলোচনা না করিয়াও পারা যাইতেছে না। তৃতীয়ত ইদানীংকালে পি. এল. ও. ফিলিস্তিনীদের একমাত্র মুখপাত্র হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছে। পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার মধ্য হইতে পি. এল. ও. বিহীন অন্য নেতৃত্ব জাগিয়া উঠিবার ইসরাইলী আশা দূরাশায় পরিণত হইয়াছে। চতুর্থত বাদশাহ হোসেন কর্তৃক পশ্চিম তীর হইতে তাঁহার দাবি প্রত্যাহারের ফলে বাদশাহকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি বানাইবার আশাও বিলীন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চমত অধিকাংশ আরব দেশ কর্তৃক আকারে ইঙ্গিতে ইসরাইলের টিকিয়া থাকিবার অধিকার স্বীকার করিবার ফলে পি. এল. ও. -র সহিত আলোচনায় বসিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে (Time, December 12, 1988)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করিয়াছে, আরাফাতের সহিত সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের সহাবস্থানকে অনেক দূরে আগাইয়া নিতে পারে। একান্তই যদি আলোচনা ব্যর্থ হয় তবে বাহির হইয়া আসিবার পথ তো খোলাই আছে।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ পি. এল. ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের পরিপূর্ণ অধিবেশনে ঘোষণা করেন, "আরব-ইসরাইলী সংঘাতে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তৎসহ প্যালেস্টাইন ও ইসরাইল রাষ্ট্র এবং অন্যান্য প্রতিবেশীর মধ্যে পি. এল. ও. এমন একটি গ্রহণযোগ্য মিমাংসা খুঁজে বের করবে যাতে সবাই শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করবার অধিকার ও নিশ্চয়তা লাভ করে।" পরদিন ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৮৮ তিনি পুনরায় বলেন, "আমার গতকালের বক্তৃতায় পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে, আমরা বুঝি ... মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষে জড়িত সকল পক্ষের এবং আমি যেমন উল্লেখ করেছি, তৎসহ প্যালেস্টাইন, ইসরাইল রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিবেশীদের শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করবার অধিকার আছে"

(Time, December 26, 1988)।

এইভাবে জেনেভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পি. এল. ও. নেতা আরাফাত ইসরাইল ও অন্যান্য প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের শান্তিতে বসবাস করিবার ঘোষণা দিবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পি. এল. ও-র সহিত সরাসরি আলোচনার আয়োজন করে। ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গ এবং আরব দেশসমূহ এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জনাইলেও ইসরাইল ইহাতে অসন্তুষ্ট হয়। মার্কিন প্রতিনিধি হিসাবে তিউনিসিয়াস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে চারিজন পি. এল. ও প্রতিনিধির সহিত ৯০ মিনিট স্থায়ী এক বৈঠকে মিলিত হন। উভয় পক্ষ বৈঠকটিকে "বাস্তবধর্মী" বলিয়া অভিহিত করে। পূর্বের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে যে, পি. এল. ও. 'সন্ত্রাসবাদ' বর্জন করুক। ইহা পি. এল. ও-র দায়িত্ব কিভাবে তাহারা ইসরাইলকে শান্তি বৈঠকের জন্য আশ্বস্ত করিবে। সিরীয় পন্থী আবু মুসা ব্যতীত পি. এল. ও-র সকল গ্রুপ এই ফলাফলটিকে স্বাগত জানায়। তবে কোন কোন সন্ত্রাসপ্রিয় দলের নিকট ইহা শ্রুতিমধুর নাও হইতে পারে। যেমন অধিকৃত এলাকায় আরাফাত বিরোধীচক্র আবার গণ্ডগোলের আয়োজন করে শুধু ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে তাহারা এই প্রচেষ্টার সহিত একমত নহে। আবার ইসরাইলের প্রধান বিরোধীদল আলোচনার বিরোধিতা করিবার জন্য হত্যাযজ্ঞের আশ্রয়ও লইতে পারে। তাছাড়া আরাফাত স্বয়ং নিহতও হইতে পারেন।

তবে আরাফাতের ব্যক্তিগত যাহা লাভ হইল তাহা তাহার ঝুঁকিকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন ধরিতে গেলে পি. এল. ও-কে ফিলিস্তিনীদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল। ইহা ইয়াসির আরাফাতের জন্য একটি বিরাট জয়। তিনি অনেক সময় পতিত হইয়াছেন কিন্তু কখনও বহিষ্কৃত হন নাই। তাঁহার সংগঠন বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হইয়াছে এবং তাঁহার সেনাবাহিনী জর্দান হইতে ইসরাইল পর্যন্ত বিভিন্ন সেনাবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে কিন্তু কখনও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। তাঁহার জনগণকে তিনি অনেক ওয়াদা করিয়াছেন কিন্তু কিছুই দিতে পারেন নাই। ১৯৮২ সালে তাঁহাকে একবার লেবানন হইতে উদ্ধার করা হয়। মাত্র এক বৎসর পূর্বে একটি আরব শীর্ষ বৈঠকে তাঁহাকে প্রায় অবহেলা করা হয় এবং প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গ আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি পুনরায় উপরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন। অধিকৃত এলাকার বিক্ষোভও তাঁহাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং একটি ঝুঁকি লইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। সন্ত্রাসবাদ পরিত্যাগ করিবার ব্যাপারে তাঁহার ওয়াদা ছিল দ্ব্যর্থহীন; "লিপিবদ্ধ করবার জন্য আমি পুনরায় বলছি আমরা সকল প্রকারের সন্ত্রাসবাদ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করি।" ইসরাইলের সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানেও তাঁহার ঘোষণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। কিন্তু এই ঘোষণায় বেকায়দায় পড়িয়াছে ইসরাইল। তাহাদের কূটনীতিবিদগণ এই ঘোষণার কোনো পূর্ব পরিকল্পনা করিতে পারেন নাই। এখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে হয়ত আলোচনার টেবিলে বসিতে হইবে। অপরদিকে পি. এল. ও.-র আন্তরিকতা যাচাই করিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কিছুই হারাইতে হইবে না। তাহারা পরিকল্পনা করিয়াছিল জর্দানের বাদশাহ হোসেনকে মধ্যস্থতা করিয়া আলোচনায় বসিবে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে তিনি পশ্চিম তীর ছাড়িয়া দিলে সে পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। যাহোক, আগামী দিনগুলির কার্যাবলী প্রমাণ করিবে এই আলোচনায় কাহারা লাভবান হইল।

কিন্তু শান্তির সমস্ত আশা-আশাঙ্ক্ষা পদদলিত করিয়া ইসরাইল তাহার নিজস্ব পরিকল্পনায় অনড় থাকে। তাহারা আলোচনা টেবিলের দিকে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হয় নাই। বিরক্ত হইয়া আরাফাত পশ্চিম তীরে বিক্ষোভ আরো বাড়াইয়া দেন। ইসরাইলের সহিত সমস্ত

যোগাযোগ তিনি বিচ্ছিন্ন করিতে নির্দেশ দেন। তবে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির পশ্চিম তীর ও গাজায় নূতন নির্বাচনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু আরাফাত ইহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ উহার অর্থ হইল ইন্তিফাদাহ্‌র বিনাশ সাধন করা। যুক্তরাষ্ট্র আরাফাতকে আরও ধৈর্য ধরিবার পরামর্শ দেন। যাহার অর্থ হইল বিষয়টি পুনরায় হিমাগারে প্রেরণ করা হইল।

সাইপ্রাস সমস্যা

বিগত ২৮ বৎসর যাবৎ সাইপ্রাস দ্বীপের উত্তরাংশে অবস্থিত উত্তর সাইপ্রাস তুর্কি প্রজাতন্ত্র (North Cyprus Turkish Republic) এবং দক্ষিণে গ্রীক সাইপ্রাসের মধ্যবর্তী স্থানে জাতিসংঘ বাহিনী মোতায়েন রহিয়াছে। ১৯৭৪ সালে গ্রীক সাইপ্রিয়টরা দ্বীপটিকে গ্রীসের সহিত একীভূত করিবার মানসে সামরিক বিপ্লবের চেষ্টা করিলে তুর্কি সরকার বাধা প্রদান করে। উত্তর সাইপ্রাসে তুর্কি সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং কিছুকাল পরে ১৯৮৩ সালের ১৫ই নভেম্বর, তুর্কি সাইপ্রিয়টরা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেই হইতে আজ পর্যন্ত অবস্থা একই রহিয়া গিয়াছে। বিগত ৩-৪ঠা জানুয়ারি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিকমত জেতিন তুর্কি সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র সফর করেন এবং সেই দেশের প্রেসিডেন্ট রাউফ দেংতাসের সহিত আলোচনা সভায় মিলিত হন। আংকারায় ফিরিয়া আসিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সাইপ্রাসের জনগণের রাজনৈতিক অংশীদারিত্বের দ্বারাই একমাত্র সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং এই অংশীদারিত্বের প্রশ্নে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইতে হইবে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের ৬৪৯ নং সিদ্ধান্তের মধ্যেই সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের কাঠামো রহিয়াছে।

উপসাগরীয় যুদ্ধ

১৯৯০ সালের ৯ই আগস্ট রাত ২টায় ইরাকের ট্যাংক বহর পার্শ্ববর্তী তৈলসমৃদ্ধ দেশ কুয়েত দখল করিয়া লয়। রাজপ্রাসাদে স্বল্প সংঘর্ষের পর কুয়েতের আমীর শেখ জাবির আল-আহমদ আল সাবাহ্ হেলিকপ্টার যোগে পার্শ্ববর্তী সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কুয়েত দখলের পর ইরাকের প্রেসিভেন্ট সাদ্দাম হোসেন হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন, কেউ বাধা প্রদান করিলে সমগ্র এলাকা ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে।

পশ্চিমা শক্তিবর্গ এই দখলে অস্থির হইয়া উঠে, কারণ সাদ্দাম হোসেনকে হয়তো কাবু করা যাইবে, কিন্তু তাহা অত সহজে নহে। এই ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়, উপসাগরীয় তৈলসমৃদ্ধ পাশ্চাত্যের মিত্র রাষ্ট্রগুলি আতংকগ্রস্ত হয়। মধ্যপন্থী রাষ্ট্রবর্গ যথা সিরিয়া ও মিসরের অহমিকায় আঘাত লাগে এবং সর্বোপরি ইসরাইলের জন্য সামরিক হুমকির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। সংক্ষিপ্ত সময়ের ব্যবধানে সাদ্দাম হোসেন আরব বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্ষমতাধরে পরিণত হন। বিশ্বের তৈলের বাজারে তিনি অদ্বিতীয় তৈল নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে আবির্ভূত হন। ইতিমধ্যে ইরাকি বাহিনী সমগ্র কুয়েত দখল করত দক্ষিণে সৌদি আরবের সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়।

প্রতিক্রিয়া হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের সহিত বাণিজ্য অবরোধ গড়িয়া তোলে এবং ইরাক ও কুয়েতের ৩০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইউরোপীয় গোষ্ঠী ইরাক ও কুয়েতের সবধরনের তৈলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অবিলম্বে কুয়েত হইতে ইরাকের সৈন্য প্রত্যাহার দাবি করে এবং সাদ্দাম তাহাতে কর্ণপাত না করিলে শাস্তি বিধানের হুমকি দেয়। ইরাকের সর্ববৃহৎ অস্ত্রসরবরাহকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন হঠাৎ ইরাকের সহিত তাহার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। ঘটনার একদিন পর যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিকভাবে ইরাকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের ডাক দিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভাবিতভাবে উহাতে সমর্থন দেয় (Newsweek, August 13, 1990)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ তাৎক্ষণিকভাবে ঐ অঞ্চলে মোতায়েন তিনটি বিমানবাহী জাহাজকে কুয়েতের দিকে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেন। আরব লীগ এই ঘটনায় ইরাকের নিন্দা করে, অবশ্য ২১ সদস্যের মধ্যে ৮ জন বিরত থাকে বা বিপক্ষে ভোট দেয়।

কুয়েত দখলের কারণ হিসাবে ইরাকের বক্তব্য হইল যুগ যুগ ধরিয়া কুয়েত নামক এলাকাটি বর্তমান ইরাক এবং প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার অংশ হিসাবে বিদ্যমান ছিল। তাই বসরা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কুয়েতকে ইরাক ইতিপূর্বেও তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দাবি করিয়াছে। ১৯৩০ এর দশকে ইরাকের সহিত বৃটেনের যেইসব বিষয়ে মতবিরোধ ছিল তন্মধ্যে একটি হইল তৈলসমৃদ্ধ কুয়েত অঞ্চলের মালিকানা সম্পর্কীয়। তখন উভয়ে ঐ অঞ্চলের মালিকানা দাবি করিতেছিল। অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ সালের জুন মাসে যখন কুয়েতের উপর ১৮৯৯ সালের চাপানো বৃটিশ হুকুমনামা (Mandate) উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তৈলসমৃদ্ধ এই দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে তৎকালীন ইরাকের সামরিক শাসক জেনারেল করিম কাশেম কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহা অধিকার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহার সাহায্যার্থে কোন আরব দেশ বিশেষত মিসর আগাইয়া না আসায় সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বর নাগাদ বৃটিশ সৈন্য কুয়েত ত্যাগ করিলে মিসর, জর্দান ও সৌদি আরবের সম্মিলিত বাহিনী কুয়েত রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয় (মূল গ্রন্থ-পৃ ৪২৬ দ্রষ্টব্য)। পরবর্তীকালে বৃটেন তাহার নিজস্ব স্বার্থে কুয়েত নামক এই এলাকাটিকে পৃথক একটি রাষ্ট্র হিসাবে সৃষ্টি করে। কুয়েত দখলের অর্থনৈতিক কারণগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বিগত ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরাক প্রায় ষাট বিলিয়ন বা ততোধিক ডলার ধার করে। কুয়েত ইরাকের এই যুদ্ধ চালাইবার জন্য পনের বিলিয়ন ডলার সুদহীন ঋণ ইরাককে প্রদান করিয়াছিল। এখন ইরাক চায় কুয়েত ঐ ঋণ মওকুফ করিয়া দিক। শুধু তাহাই নহে, ইরাক অভিযোগ উত্থাপন করে যে, তৈল রপ্তানিকারক সংস্থা (OPEC) কুয়েতকে যে পরিমাণ তৈল উত্তোলন করিবার সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিল, কুয়েত উহা হইতে আরও অধিক তৈল উত্তোলন করিয়াছে। এই বাড়তি তৈল উত্তোলনের ফলে ইরাকের চৌদ্দ বিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে ইরাকের দাবি অনুযায়ী তৈল রফতানিকারক সংস্থা তৈলের মূল্য প্রতি ব্যারেল ১৮ হইতে ২১ ডলারে বৃদ্ধি করিতে রাজি হইয়াছিল, কিন্তু ইরাকের দাবি হইল ২৫ ডলার। ইরাক আরব স্বার্থে ইরানের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, এখন যুক্তিসংগতভাবে সে চায় তাহার আরব প্রতিবেশীরা তাহার যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি চাঙ্গা করিতে সহায়তা করুক।

কুয়েত দখলের ভৌগলিক কারণ হইল কুয়েত ইরাকের পারস্য উপসাগরে প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পারস্য উপসাগরে ইরাকের একমাত্র বন্দর উম্মে কাসরের মুখে কৌশলগত অবস্থানে বিদ্যমান দুইটি দ্বীপ কুয়েতের নিকট ইজারা হিসাবে ইরাক দাবি করে। কিন্তু তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়। ইরাকের অপর নদীপথ হইল শাত-আল-আরব-যাহার জন্য ইরাক ইরান আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু উহার গতিপথ তখনও যুদ্ধের ডুবন্ত জঞ্জালের জন্য বন্ধ ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাককে শায়েস্তা করিবার জন্য বিভিন্ন পন্থা লইয়া চিন্তা ভাবনা করে, কারণ এ ব্যাপারে ত্বরিৎ কোন ব্যবস্থা না লইলে তাহাদের মতে সদ্য 'সমাজতন্ত্র' বিমুক্ত

সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাদের আশংকার আরেকটি কারণ হইল ৩০ দিনের মধ্যে কিছু একটা করিতে না পারিলে ইরাক সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত তৈলক্ষেত্রগুলি দখল করিয়া লইবে। সামরিক ব্যবস্থার কথাও যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করিয়াছে কিন্তু দুর্ধর্ষ এক লক্ষ ইরাকি বাহিনীর বিরুদ্ধে একাকী লড়িবার কথা সে ভাবিতেও ভয় পায় (Newsweek, August 13, 1990); তবে সামরিক ও রাজনৈতিক যৌথ ব্যবস্থার বিষয় চিন্তা করা যায়। ইরাক ও দখলকৃত কুয়েতের তৈল রফতানি বন্ধ করিতে পারিলে কাজ হইতে পারে, অবশ্য তুরস্ক ও সৌদি আরব ইরাকের পাইপ লাইন বন্ধ করিতে রাজি হইলে। তৎসঙ্গে উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে ইরাকি তৈলবাহী জাহাজের সংকীর্ণ জলপথ বন্ধ করিবার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে লইতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্র ইহাও চিন্তা করিয়াছে, সামরিক ব্যবস্থার ব্যাপারে অধিকাংশ সামরিক শক্তির সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার প্রেসিডেন্ট বুশের সহিত পরামর্শক্রমে ঘোষণা করেন, "সমগ্র বিশ্ব মেরুদণ্ড খাড়া রাখিতে পারিলে সাদ্দামের বিরুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধের (Crusade) আয়োজন করিতে বেশি সময় লাগিবে না" (Newsweek ঐ)।

ইসরাইল উহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে এই বলিয়া যে ইরাকের বৈরী মনোভাব সম্পর্কে তাহারা সময়মত সতর্ক সংকেত দিয়াছিল কিন্তু কেউ কর্ণপাত করে নাই। তবে ইহুদীবাদীরা স্বস্তির নিঃশ্বাষ ফেলিয়াছে, কারণ বিশ্বের দৃষ্টি প্যালেস্টাইন হইতে সরিয়া গেল। তাহাদের বক্তব্য হইল মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানে নহে বরং বৈরী ও শক্তিসম্পন্ন আরব রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার মধ্যে নিহিত। তাই ইতিমধ্যে ১৯৮১ সালে ইসরাইল আসিরাকে অবস্থিত ইরাকের পারমাণবিক স্থাপনা ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ইরাকের আক্রমণাক্ষম স্থাপনাসমূহ অন্তত দুই ডজন স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং সেইগুলি পাহারা দিতেছে রুশ নির্মিত SAM- ১৩ ও SAM- ১৪। ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে ইসরাইল মিসর ও সিরিয়ার শতকরা ৯০ ভাগ জঙ্গী বিমান ধ্বংস করিয়াছিল, কিন্তু ইরাকের সব ধ্বংস করিলেও শতকরা ৯০ ভাগ অক্ষত থাকিবে যদ্দারা সে তেল আবিবে অগ্নি বৃষ্টি বর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে। তবে ইরাক যদি জর্দানের উপর দিয়া সৈন্য পরিচালনা করত ইসরাইল আক্রমণ করিয়া বসে সেইক্ষেত্রে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া ইসরাইলের আর কোন বিকল্প থাকিবে না।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক ও কুয়েতি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার পর ইরাক তাহার বিদেশী কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের ইরাক ত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পাশ্চাত্য জগতের সমর প্রস্তুতির জবাবে শুধু মন্তব্য করেন "যুদ্ধ সারি সারি মৃতদেহ ফেলিয়া যাইবে।" মার্কিন জনগণ মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্য মোতায়েনের ব্যাপারে বুশ পরিকল্পনা অনুমোদন করিলেও কূটনীতিকদের মুক্তির ব্যাপারে আরও সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়, কারণ ইহাতে হাজার হাজার জীবন বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব, যুক্তরাষ্ট্র কূটনীতিকদের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে এবং অতিদ্রুত সৌদি আরব ও পারস্য উপসাগরে সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধিতে তৎপর হয়। এ দিকে সে সৌদি আরবের উত্তর সীমান্তে মোতায়েনযোগ্য ইরাকের চারি ডিভিশন সৈন্যদিগকে সামাল দিবার জন্য এফ-১৫ বোমারু জঙ্গী বিমান সজ্জিত রাখে, অপরদিকে কুয়েত দখলের জন্য কমান্ডো বাহিনী, প্যারাস্যুট বাহিনী এবং স্থল বাহিনী মোতায়েন করে। ইরাকি বাহিনী যাহাতে কুয়েতে উহার সৈন্য আনিতে না পারে তজ্জন্য সে বিমান বন্দর, স্কাড-বিক্ষেপণাস্ত্র স্থল এবং র‍্যাডার

যোগাযোগ স্থল ধ্বংসের পরিকল্পনা হাতে লয়।

অতঃপর কুয়েত দখলের দুই মাসের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১,২৫.০০০ সৈন্য সৌদি আরবে প্রেরণ করে। নৌ বাহিনীতে থাকে তিনটি বিমানবাহী জাহাজ, প্রত্যেকটিতে ৬০টি করিয়া জঙ্গী বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সহকারে একটি ফ্লোটিলা। বিমান বাহিনীতে ২০০ জঙ্গী বিমান সৌদি আরব পৌছে। ইহার মধ্যে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমানও অন্তর্ভুক্ত। ইহাছাড়া ৩৩,০০০ নৌ-সেনা রাখা হয় একমাসের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতাদানের জন্য। অপরদিকে ইরাকের হাতে থাকে ১০ লক্ষ নিয়মিত সৈন্য, ৫,৫০০ ট্যাংক, যথেষ্ট ক্ষেপণাস্ত্র, ৫০০ জঙ্গী বিমান এবং বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক অস্ত্র।

জিম্মি সমস্যা ঃ ১৯৮০ সালে তেহরানে ৫২ জন মার্কিন নাগরিক জিম্মি হিসাবে আটক হওয়ায় প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের পতন হইয়াছিল। লেবাননে ছয়জন মার্কিন নাগরিক উদ্ধার করিতে যাইয়া প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে ইরান-কন্ট্রা কেলেংকারিতে জড়াইতে হইয়াছিল। এখন প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাকে আটক ৩৫০০ মার্কিন নাগরিকের উদ্ধারের ব্যাপারে গলদঘর্ম হইতে হয়। ইহারা ছাড়াও ইরাকের হাতে আরও হাজার হাজার বৃটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় নাগরিক আটক হয়[১], যাহার দরুন কুয়েতে সামরিক অভিযান প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইরাকি প্রেসিডেন্ট তাহাদিগকে জিম্মি বলিয়া আখ্যায়িত না করিলেও কার্যত বাগদাদের আল-রশীদ হোটেলে ৩৮ জন, কুয়েতে ৩০০০ এবং ইরাকে কর্মরত ৫৮০ জন মার্কিন নাগরিকের ন্যায় আরও হাজার হাজার ইউরোপীয় নাগরিক জিম্মির মতোই কালাতিপাত করে।

এইদিকে ক্রমাগত মার্কিন প্রস্তুতি এবং জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধের মুখে ইরাক হুশিয়ারি উচ্চারণ করে যে, তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করিলে সে মার্কিন ও অন্যান্য জিম্মিদিগকে তাহার বিমানঘাটিগুলিতে আবদ্ধ রাখিবে যাহাতে শত্রু বিমান আক্রমণের ধাক্কা তাহাদের উপর দিয়া যায়। তাহাছাড়া খাদ্যশস্য আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইরাকি সৈন্য ও বেসামরিক লোকদের খাদ্য সরবরাহের পর উদ্বৃত্ত খাদ্য জিম্মিদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। এই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিদেশী পরিবারের শিশুদের উপরও প্রযোজ্য হইবে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের তৈল রপ্তানী এবং উপসাগরের কুয়েতি প্রবেশ পথে এবং আকাবা উপসাগরের মুখে অবরোধ আরোপ করে, ফলে ইরাক সম্পূর্ণভাবে বহির্বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এইদিকে ১৮ই নভেম্বর আটককৃত সকল বিদেশী জিম্মিকে মুক্তিদানের কথা ইরাক বিবেচনা করে। তবে আটককৃত জিম্মিদের মধ্যে প্রায় তিন চতুর্থাংশ ইতিমধ্যে ছাড়া পাইয়া যায়।

ইরাকের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ত্র ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করিবার পরও যুক্তরাষ্ট্র একা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় শংকা প্রকাশ করে এবং তাই সে বিশ্বের অন্যান্য দেশের নিকট সামরিক সাহায্য চাহিয়া পাঠায়। প্রত্যুত্তরে, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া, বাংলাদেশ, মিশর, কানাডা এবং মরক্কো যুক্তরাষ্ট্রের ডাকে সাড়া দেয়। পরে তুরস্ক এবং ইতালি তাহাদের বিমান ঘাটি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে। ইহাছাড়া আরব লীগের অধিকাংশ সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে তাহাদের মতামত ব্যক্ত

---

১. *বৃটিশ ৪৭০০ : ফরাসি ঃ ৫৬০ ; জাপানি ঃ ৫০৮ ; সোভিয়েত ঃ ৮৭১০ ; অন্যান্য ইউরোপীয় ঃ ৩১০৭ (Newsweek. 29 August 1990)* ।

করে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ট্রেজারি মন্ত্রী এই যুদ্ধের জন্য ২৫ বিলিয়ন ডলার নগদ ও পণ্যে প্রয়োজন বলিয়া উল্লেখ করেন। কে এই বিপুল খরচ বহন করিবে? সৌদি সরকার মধ্যপ্রাচ্যে ব্যয়কৃত সমস্ত খরচ (যানবাহন, পানি, জ্বালানি) বহন করিতে রাজি। নির্বাসিত কুয়েত সরকার ৫ বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়। বৃটেন সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে রাজি হয়। জাপান ইতিমধ্যে এক বিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয় এবং আরও দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয় (Time, September 17, 1990)।

অপরদিকে ইরাকের পক্ষে থাকে জর্দান, সুদান, তিউনিশিয়া, লিবিয়া এবং ইয়েমেন। অনারব দেশের মধ্যে শক্তিশালী ইরান ইরাকের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এবং প্রয়োজনবোধে সৈন্য পাঠাইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। শুভেচ্ছা স্বরূপ ইরাক শাত- আল-আরবের উপর তাহার দীর্ঘদিনের দাবি ছাড়িয়া দেয়।

নিরাপত্তা পরিষদের ৬৭৮ নম্বর সিদ্ধান্তের ফলে উপসাগরীয় যুদ্ধ এক নূতন অধ্যায়ে পদার্পণ করে। এই সিদ্ধান্তে উল্লেখ রহিয়াছে যে ইরাক যদি এই পর্যন্ত গৃহীত নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত মানিয়া না লয় তবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তার খাতিরে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে যাহারা কুয়েতকে সহায়তা দিতেছে তাহারা ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ইরাককে ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯১ পর্যন্ত সময় বাধিয়া দেওয়া হয়। অপরদিকে কুয়েত ত্যাগ করিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্যও ইরাকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ১৯৫০ সালের কোরিয়া সমস্যার পর এই প্রথম জাতিসংঘ জোরপূর্বক এলাকা দখলের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিলো। (Newspot, Turkey, December 6, 1990)।

কুয়েত পুনরুদ্ধারে মার্কিন স্বার্থ ঃ ১৯৬৭ সালে ইসরাইল কর্তৃক ফিলিস্তিনী এলাকা দখল, ১৯৭৬ সালে সিরিয়া কর্তৃক লেবাননের অধিকাংশ এলাকা দখল করা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী তোলপাড় হয় নাই। তবে ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল করিবার পর বিশ্বব্যাপী এত আলোড়ন সৃষ্টি হইল কেন? এই আলোড়নের প্রেক্ষিতেই ১৯৯০-এর সেপ্টেম্বরে হেলসিংকিতে দুই পরাশক্তির মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইল। ইদানিংকালে বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় সার্বীয়দের দ্বারা মুসলিম নিধনের মধ্যেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ববিবেক অনেকটা নির্বিকার, কিন্তু কুয়েতের ব্যাপারে এত হৈ চৈ কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত ও সৌদি আরব রক্ষার জন্য লক্ষ কোটি ডলার মূল্যের বিশালকায় সেনা নৌ ও বিমান বহর সম্বলিত ডেজার্ট শিল্ড (Desert Shield) বা মরু বর্ম অভিযান পরিচালনা করে। অথচ লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনীদিগকে অসহায়ভাবে তাহাদের ঘর দুয়ার হইতে বিতাড়িত করিতে সে সহায়তা করিয়াছে- কিন্তু কেন?

ইহার উত্তর মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ। ইহার কারণ এই নহে যে যুক্তরাষ্ট্র তাহার জ্বালানি চাহিদার অর্ধেক আমদানি করে বরং এইজন্য যে বিশ্বের মোট তৈল উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ এই অঞ্চলে উৎপাদিত হয়। ইরাকের কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করিয়া যে সংকটের সৃষ্টি হইল তাহা এমনিতেই হইত। এই সংকট উত্তরণের পরে মার্কিন সৈন্যগণ এই এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তাহা ভাবা ভুল। আরব ভূখণ্ডে পশ্চিমা তৈল কোম্পানিসমূহের শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থই জড়িত নহে বরং পশ্চিমের ধনশালী দেশসমূহ মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের উপর চরমভাবে নির্ভরশীল। তাই এই এলাকায় যে কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তন পশ্চিমা পুঁজিবাদী গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান রাজনৈতিক ভারসাম্য পশ্চিমা বিশ্বের তৈল-

নির্ভর দেশসমূহের স্বার্থ রক্ষা করে বলিয়া তাহারা এই অবস্থা বিঘ্নিত হউক তাহা চায় না। ইরাকের কুয়েত দখলের ফলে পশ্চিমা গোষ্ঠীর স্বার্থ এবং স্থিতি অবস্থা বিঘ্নিত হইবার সমূহ আশংকাই মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের বর্তমান প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত কারণ। অতএব এই কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, মার্কিন সরকার শুধু কুয়েতের রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই আগাইয়া আসে নাই। এই ঘটনার সমকক্ষ ধরা যায় ১৯৪৭ সালের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কর্তৃক কমিউনিজমের বিরুদ্ধে গ্রীসকে সাহায্য করিবার ঘটনাকে, যাহার পরিণতিতে ন্যাটো (NATO) সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময় সমস্যা ছিল কমিউনিজম ঠেকানো, আর বর্তমান সমস্যা হইল তৈল এলাকার নিয়ন্ত্রণ লাভ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈল আমদানি বাদ দিলেও পাশ্চাত্য জগত প্রায় সম্পূর্ণভাবে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের উপর নির্ভরশীল-ফ্রান্স শতকরা ৩৫ ভাগ, ইতালি ৩২ ভাগ, জাপান ৬৪ ভাগ এবং এইরূপ অন্যান্য দেশ। কোন দুর্ঘটনায় তৈল বন্ধ হইলে উহা ইউরোপ, জাপান এবং আরও অনেক উন্নয়নশীল দেশকে পঙ্গু করিয়া দিবে। অর্থনৈতিকভাবে পারস্পরিক নির্ভরশীল বিশ্বে অন্যান্য দেশ পঙ্গু হইয়া গেলে ইহা যুক্তরাষ্ট্রকেও পংগু করিয়া দিবে। বিভিন্ন দেশ ধর্ম, নৃতত্ত্ব ও ইতিহাসের নিরীখে পৃথকীকৃত। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে একে অপরের সহিত বাঁধনযুক্ত। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের জন্য এই পৃথকী অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যে যেরূপ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে অন্য কোথায়ও অনুরূপ করে না। সমস্যা হইল তৈল রপ্তানিকারক সংস্থা (OPEC) কে নিয়ন্ত্রণ করিবে? সাদ্দাম চান তৈলের দাম বাড়াইতে আর যন্ত্রপাতিও অন্যান্য রসদপত্রের দাম কমাইতে আর যুক্তরাষ্ট্র চায় ইহার উল্টোটা। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক বাদশাহ এবং আমীরগণও মার্কিন লাইনে কথা বলেন। অতএব সাদ্দাম এইখানে উপলক্ষ মাত্র বা বলা যাইতে পারে সর্বশেষ শত্রু যে তালিকায় পূর্বে ছিলেন আয়াতুল্লাহ খোমেনী, সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ এবং ইয়াসির আরাফাত। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাবকে নূতন ধাঁচে বিন্যস্ত করিবার প্রেক্ষাপটে এবং অভ্যন্তরীণ তীব্র অর্থনৈতিক সংকট কাটাইয়া উঠিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ঐ অঞ্চলে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াও কোনো কোনো রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৮৯-৯০ অর্থ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাটতি ছিল ২৪,১৭০ কোটি ডলার । এই ঘাটতি ১৯৮৬ সালের ঘাটতিকেও হার মানাইয়াছে। ৮০-র দশকে দুইটি পরাশক্তির স্নায়ু যুদ্ধের অবসানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ব্যবসা কমিয়া আসে। ১৯৯১ সালের শুরুতে এই ঘাটতি আরও প্রকট হইয়া উঠে। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত মার্কিন অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ৬০ বিলিয়ন ডলার (৬ হাজার কোটি ডলার)-এর অস্ত্র বিক্রয় করিয়াছে, যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হইলে অস্ত্র ব্যবসায়ীরা আরও লাভবান হইবে- জয় পরাজয় যেইদিকে যাক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র সমরাস্ত্র ও টেকনোলোজির ক্ষেত্রে যে বড় ধরনের সাফল্য আনিয়াছে বর্তমান যুদ্ধ সেইসব উন্নত প্রযুক্তি যাচাইয়েরও একটি সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। পেন্টাগনের একজন সমরাস্ত্র প্রকৌশলী উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত লেজার বোমা, টমাহক এবং পেট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ও এম-১, এম-১, এ-১ প্রভৃতি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র পরীক্ষার একটি যোগ্যক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের দীর্ঘদিন পর যুক্তরাষ্ট্র এই প্রথমবারের মতো উপসাগরীয় যুদ্ধে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার তিনটি নূতন পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই তিনটি পরিকল্পনা হইল: (১) ইসরাইল-আরববিরোধ নিরসনের নূতন দিক নির্দেশ করা (২) মধ্যপ্রার্চ্যে মার্কিন নিয়ন্ত্রিত নূতন আঞ্চলিক পরিকল্পনা গড়িয়া তোলা এবং (৩) স্নায়ু

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীকে নূতন মার্কিন ধাঁচে গড়িয়া তোলা। নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী মিসর, ইসরাইল, উত্তর ইরাক, তুরস্ক এবং সিরিয়াসহ একটি নূতন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করা যাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হইবে। এই পরিকল্পনা ইসরাইলকে এমন এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারে যাহা যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প নির্ধারক শক্তি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে; যাহাতে তিনটি মহাদেশ ও দুইটি মহাসাগরের সংযোগস্থল এবং সামরিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ ও পৃথিবীর ৭০ ভাগ তৈল সরবারহকারী এই অঞ্চলের উপর যুক্তরাষ্ট্র তাহার নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখিতে পারে।

অতএব মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্র বা ওপেক এর উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করিতে হইবে, এবং নিয়ন্ত্রণ লাভ করিবার জন্য সাদ্দাম হোসেনকে বাধা দিতে হইলে একা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভবও নহে আর যুক্তিযুক্তও নহে। কারণ সেই ক্ষেত্রে সকলের আক্রোস যুক্তরাষ্ট্রের উপর নিপতিত হইবে। নিউজ উইকের নিবন্ধকারের মতে মার্কিন সৈন্যরা যদি সাদ্দামকে দমন করিয়া ফিরিয়া আসে তবে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে ইহাও হইবে এক চরম বোকামী। আরব সামরিক শক্তিগুলি হয়তো কিছুটা বোঝা হালকা করিতে পারে। কিন্তু সৌদি আরব ও কুয়েতকে রক্ষা করিবার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করিতে হইবে অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিকে, এবং প্রয়োজনবোধে ন্যাটো, জাতিসংঘ বা এই ধরনের নূতন চুক্তির দ্বারা পাশ্চাত্য শান্তি মিশন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ীভাবে রাখিতে হইবে (Newsweek, August 20, 1990)।

১৬ই জানুয়ারি ১৯৯১, ২৭টি দেশের সম্মিলিত বাহিনীর প্রথম জঙ্গী বিমান বহর বাগদাদে হামলা চালায়। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল নরম্যান সোয়ার্জকফ (Norman Schwarzkopf) এই অভিযানের নাম দেন ডেজার্ট স্টর্ম (Desert Storm) বা 'মরুঝড়'। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মোতায়েনকৃত ৪,৫০,০০০ সৈন্য ছাড়াও তাহার নেতৃত্বে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও উহার ২৬টি বন্ধুরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক বিমান ও নৌ বহর। সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও গোলন্দাজ ইউনিটসমূহ বিশ্বের যে কোন বাধা দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া ফেলিবার শক্তি লইয়া বাগদাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। অপরদিকে ইরাকের রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী যথেষ্ট পরিমাণ রসদ, গোলাবারুদ, ট্যাংক এবং বিমান বিধ্বংসী কামান লইয়া মাটির তলায় শক্ত বাংকারের নিচে লুক্কায়িত। যুদ্ধের প্রাথমিক বিমান আক্রমণের পর অতর্কিতে এইগুলিকে বাহির করিয়া শত্রু মহলে ভীতি সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য। প্রতিনিয়ত বি-৫২ মার্কিন বোমারু বিমানের টন টন বোমা নিক্ষেপের দ্বারা ইরাকি বাহিনীর মনোবল ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা, যেমনটি হইয়াছিল ১৯৬৭ সালে আরব ইসরাইলী যুদ্ধের সময় মিসরীয় বাহিনীর। কিন্তু ইরাকি বাহিনী পর্বতসম অটল। অবসরপ্রাপ্ত একজন মার্কিন সেনা-অফিসারের মতে "শক্তিশালী আক্রমণ চালাইয়া আপনি তাহাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিতে পারেন, কিন্তু উহারা ইরাকি জাতি, যুদ্ধ তাহারা করিবেই (Newsweek January 28,1991)।

মনে হইল বিষয়টি খুবই সহজ। মার্কিন বিমানের গোলা সঠিক লক্ষ্য বস্তুতে একের পর এক পড়িতে লাগিল। অপরদিকে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরে অবস্থিত যুদ্ধ জাহাজ হইতে ক্রুজ মিজাইল ও কামানের গোলাসমূহ অনবরত বাগদাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে পড়িতে লাগিল। একদিকে আকাশ সীমানায় বোমা ফাটার কড় কড় নিনাদ, অপরদিকে ইরাকের বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় রাত্রির অন্ধকার বিলীন হওয়া

মহাপ্রলয়ের ভয়াবহতাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ডেজার্ট শীল্ড (মরুবর্ম) ডেজার্ট স্টর্মে (মরুঝড়ে) রূপান্তরিত হইবার পর আকাশ যুদ্ধ মনে হইল চৌকাঠ পার হইয়া নূতন প্রজন্মে প্রবেশ করিল। একদিকে ইরাকের স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র সৌদি আরব ও তেলআবিবে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে অপরদিকে মার্কিন সেনাবাহিনীর পেট্রিয়েট ক্ষেপণাস্ত্র আকাশ পথে বিপক্ষ বাহিনীর ক্ষেপণাস্ত্রকে কোন কোন ক্ষেত্রে আঘাত করিতে সক্ষম হয়। মোট কথা এই যাবৎকালের যত অপরীক্ষিত অস্ত্র ছিল সবই বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের এক খতিয়ানে দেখা যায়, প্রথম ১৪ ঘণ্টায় সম্মিলিত বাহিনী ইরাকে ১০০০টি বিমান হামলা চালায়। প্রথম ১৪ ঘন্টায় তাহারা প্রায় ২২৩২ টন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক নিক্ষেপ করে। ২০০০ বিমান হামলায় তাহাদের ৮টি বিমান ভূপাতিত হয় (Newsweek, January 28,1991)। প্রথমে নয় দিনের বিমান হামলার পরিকল্পনা লওয়া হইলেও ইরাকি মনোবল বা স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের তেমন কোনো ক্ষতি হইতেছে বলিয়া মনে হইল না।

পেন্টাগন মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিল সাদ্দাম হোসেনের রিপাবলিকান গার্ড খতম করিবার জন্য, যে গার্ডরা বিদ্যুৎ গতিতে কুয়েত দখল করিয়াছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব ডিক চেনীর মতে "সাঁজোয়া, পদাতিক এবং বিশেষ অভিযান চালাইবার উপযোগী আট ডিভিশন সৈন্য সম্বলিত রিপাবলিকান গার্ড সাদ্দামের সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রাণ কেন্দ্র। ইহার লোকবল ১,৫০,০০০ পর্যন্ত।" ইহাকে অকেজো করিতে পারিলে জয় সুনিশ্চিত, তবে তাহা যদি অতি সহজ হইত। মার্কিন সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে বি-৫২ বোমারু বিমান দ্বারা এক সপ্তাহের কার্পেট সাদৃশ্য বোমার আঘাতের পরও "রিপাবলিকান গার্ডদের তেমন কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এইসব গার্ড সুরক্ষিত, অত্যাধুনিক অস্ত্র সজ্জিত, সম্মানিত ও উচ্চ বেতনভুক। তাহাদের যুদ্ধ কৌশল অতি উন্নত মানের, পাল্টা আক্রমণে সুদক্ষ এবং শত্রুর এবং শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়।" (Newsweek January 28,1991) অতএব এই জাতীয় একটি বাহিনীর মোকাবেলা করিবার জন্য সম্মিলিত বাহিনী আরও শক্তিশালী আক্রমণের ধারা রচনায় ব্যপৃত হয়।

কিন্তু যে গতি ও সময়সীমার মধ্যে ইরাককে পদদলিত করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল দেখা গেল তাহা সুদূর পরাহত। তাই মুখে উচ্চারণ না করিলেও প্রেসিডেন্ট বুশ সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যে স্থলে সাদ্দাম অবস্থান করিতেছিলেন তথায় একটি বিমান হামলা খারাপ আবহাওয়ার দরুন ব্যর্থ হয়। মার্কিন প্রশাসন অস্বীকার করিলেও জেনারেল কলিন পাওয়েলের ভাষায় "বাগদাদ হইতে আগত যুদ্ধ পরিকল্পনার স্নায়ু কেন্দ্রে আঘাত করো" (Newsweek January 4,1991)। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সৌদি-কুয়েতি সীমান্তে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া সম্মিলিত বাহিনীর গাড়ি, ট্যাংক, সৈন্য ও সাঁজোয়া বহরে মনে হইল স্থলযুদ্ধ অত্যাসন্ন; কিন্তু এই স্থল যুদ্ধ আরম্ভ হইতে আরও প্রায় দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়া গেল। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ ইরাকি বাহিনী সৌদি উপকূলীয় শহর খাফজির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া তাহা দখল করিয়া লয়। এই হঠাৎ আক্রমণে মিত্র বাহিনী হতভম্ব হইয়া যায়। প্রায় ৩৬ ঘন্টা অবস্থানের পর মিত্রবাহিনীর বেপোরোয়া কামানের গোলা বর্ষণের পর ইরাকি বাহিনী খাফজি ছাড়িয়া যায় এবং মিত্রবাহিনীর জন্য এই শিক্ষা রাখিয়া যায় যে, ইরাকি বাহিনী "সুশৃঙ্খল ও অতি উত্তম।" ইরাকি বাহিনীকে হটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও মিত্রবাহিনী তথা বিশ্ববাসীর

নিকট এই কথা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, তিন সপ্তাহের প্রচণ্ড গোলা বর্ষণের পরও ইরাকি বাহিনীর আক্রমণের ক্ষমতা বিনষ্ট করা সম্ভব হয় নাই।

খাফজিতে ইরাকি আক্রমণকে একটি উস্কানিমূলক ঘটনা হিসাবেও বিবেচনা করা হইয়া থাকে। ইরাকি পরিকল্পনা মতে খাফজি হইতে পশ্চাদপসারণের পর মিত্রবাহিনী স্থলযুদ্ধ আরম্ভ করিলে তাহাদের ভরাডুবির আশংকা ছিল; কারণ ইরাকি রিপাবলিকান গার্ডরা তখনও সতেজ, কিন্তু মিত্রবাহিনী সে ফাঁদে পা দেয় নাই। তাহারা আরও দুই সপ্তাহ বাগদাদে তথা ইরাকের আনাচেকানাচে বিরামহীন বিমান ও গোলন্দাজ আক্রমণ চালাইয়া সাদ্দাম হোসেনকে খতম করিতে না পারিলেও তাঁহার আক্রমণের অস্ত্র ভোতা করিয়া দেয়। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইলে যাহাতে মিত্রবাহিনীর হতাহতের সংখ্যা কমিয়া যায়।

ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের আরেকটি চমকপ্রদ ঘটনা হইল ইরাকি বিমান বাহিনীর প্রায় ৯০ টি জঙ্গী বোমারু ও সংকেত প্রদানকারী বিমানের ইরানে অবতরণ। মিত্রবাহিনী ইরানকে হুশিয়ার করিয়া দেয় যে সেই দেশ হইতে কোনো বিমান হামলা হইলে ইরান মিত্রবাহিনীর আক্রমণের শিকার হইবে। কিন্তু পরে দেখা গেল মিত্রবাহিনীর আঘাতে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এইগুলিকে ইরানে পাঠানো হইতেছে।

২০ ফেব্রুয়ারি '৯১ একটি হোটেলের ভূগর্ভস্থ বেসামরিক আশ্রয় কেন্দ্রে মার্কিন বোমা আঘাত করে। মার্কিনীরা দাবি করে যে, ইহা একটি সামরিক কম্যান্ড পোস্ট, কিন্তু পরে তদন্তে দেখা গেল ইহা সত্যিই একটি বেসামরিক আশ্রয় কেন্দ্র। ধ্বংসস্তূপ হইতে ৩০০টি গলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। এই সংবাদে বিশ্ববাসী বিস্মিত হয় এবং ইরাকি প্রেসিডেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে কুয়েত ত্যাগের ঘোষণা দেন। নিরাপত্তা পরিষদের ৬৬০ নম্বর সিদ্ধান্ত তিনি মানিয়া লন। এই সিদ্ধান্তে ইরাককে তাৎক্ষণিক ও নিঃশর্তভাবে কুয়েত হইতে উহার সৈন্য প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি ইরাক এই ঘোষণা প্রেরণ করে; ঘোষণায় মিত্রবাহিনীর কুয়েত আক্রমণকে সন্ত্রাসবাদী ইহুদী উপনিবেশবাদীদের ইরাক ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়। ঘোষণায় দাবি করা হয় যে এক মাসের প্রবল প্রতিরোধের পর ইরাকি বাহিনী জয়লাভ করিয়াছে। কুয়েত হইতে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের সঙ্গে কতকগুলি শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হয়। এইগুলি হইল ঃ অধিকৃত আরব ভূখণ্ড হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার, উপসাগর হইতে সমস্ত পাশ্চাত্য সৈন্য বাহিনীর অপসারণ এবং কুয়েতের রাজপরিবারের স্থলে একটি নূতন সরকার গঠন। বাগদাদ আরও দাবি করে যে ইরাকের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত অবশিষ্ট ১১টি প্রস্তাব* নাকচ করা হউক এবং বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ তুলিয়া লওয়া হউক। ইরাক দাবি করে যে মিত্রবাহিনীর বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত ইরাকের স্থাপনাদি মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ইরাকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কুয়েত ও ইরাকে স্থলযুদ্ধের জন্য মিত্রবাহিনী ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এদিকে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের মধ্যস্থতা মানিতে ইরাক সম্মতি জ্ঞাপন করায় ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলী আকবর বেলায়েতী, ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোনাল্ড ডুমাস, ইরাকি প্রধানমন্ত্রী সাদুন হাম্মাদী এবং

---

* *কুয়েত দখলের পর হইতে ২২ ফেব্রুয়ারি '৯১ পর্যন্ত ইরাকের বিরুদ্ধে ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১২টি প্রস্তাব :*

পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজ সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভের সহিত মস্কোতে দেখা করেন। গর্বাচেভের প্রতিনিধি প্রিমাকভ সাদ্দাম হোসেনের সহিত দেখা করেন। সবাই আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে শীঘ্রই একটি সমাধান বাহির হইয়া আসিবে। গর্বাচেভের শান্তি পরিকল্পনায় কি আছে তাহা দেখিবার জন্য অথবা স্থলযুদ্ধের পরিকল্পনা গোপন রাখিয়া ইরাকি বাহিনীকে বিভ্রান্তে ফিলিবার জন্য জর্জ বুশ তাহার স্থলযুদ্ধের দিনক্ষণ গোপন রাখেন।

---

১. ২রা আগস্ট '৯০ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পারিষদে ৬৬০ নম্বর প্রস্তাবে ইরাকের কুয়েত দখলের নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ইরাকি বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

২. ৬ই আগস্ট ৬৬১ নম্বর প্রস্তাবে ইরাকের বিরুদ্ধে ঔষধ ও খাদ্য ছাড়া সকল ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

৩. ৯ই আগস্ট সর্বসম্মতিক্রমে ইরাকের কুয়েত দখলকে বাতিল করিয়া দেয়।

৪. ১৮ই আগস্ট ৬৬২ নম্বর প্রস্তাবে ইরাক ও কুয়েত হইতে বিদেশী নাগরিকদের চলিয়া আসিবার অনুমতি দিতে ইরাকের প্রতি দাবি জানানো হয়।

৫. ২৫শে আগস্ট ৬৬৫ নম্বর প্রস্তাবে অর্থনৈতিক অবরোধ নিশ্চিত করিতে যুক্তরাষ্ট্রকে সীমিত নৌ শক্তি ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়।

৬. ১৩ই সেপ্টেম্বর ইরাক ও কুয়েতে কেবলমাত্র মানবিক কারণে জাহাজে খাদ্য পাঠাইবার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়।

৭. ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬৬৭ নম্বর প্রস্তাবে অধিকৃত কুয়েতে ফরাসি ও অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনসমূহে ইরাকি হামলার নিন্দা করা হয়।

৮. ২৪শে সেপ্টেম্বর ৬৬৯ নম্বর প্রস্তাবে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে যেইসব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের কিভাবে সাহায্য করা যায় এ ব্যাপারে পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

৯. ২৫শে সেপ্টেম্বর ইরাকের সঙ্গে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়।

১০. ১০ই অক্টোবর ৬৭৪ নম্বর প্রস্তাবে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতি ২রা আগস্টের পূর্ববর্তী কুয়েতের একটি জনসংখ্যা রেজিস্টার সংরক্ষণের আহ্বান জানানো হয়।

১২. ২৯শে নভেম্বর ৬৭৮ নম্বর প্রস্তাবে বলা হয় ১৫ই জানুয়ারি ১৯৯১ এর পূর্বে যদি ইরাক কুয়েত ত্যাগ না করে তবে ইরাকের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

শেষ পর্যন্ত বহু প্রতিক্ষিত স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ৩রা মার্চ রবিবার ভোর ৪ ঘটিকায় মিত্রবাহিনীর ট্যাংক বহর এবং উহার ছত্র ছায়ায় স্থল বাহিনী কুয়েতে প্রবেশ করে। প্রেসিডেন্ট বুশ আদেশ দিলেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে তাঁহার সেনাবাহিনীকে খতম করিয়া দিতে। ইরাকি দূত তারেক আজিজ নিষ্ফলভাবে বাগদাদ ও মস্কোর মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিলেন সময় ক্ষেপণের জন্য। মিখাইল গর্বাচেভও কয়েকবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট বুশের সহিত কথা বলার চেষ্ট করিলেন। তখন যা ঘটিবার তাহা ঘটিয়া গিয়াছে। শেষবারের মতো সাদ্দাম তেল আবিবে একটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন এবং তাহাতে ইসরাইলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে ইসরাইল প্রতিশোধ লওয়া হইতে বিরত থাকে। বিশাল মিত্রবাহিনীর সামনে বিধ্বস্ত ইরাকি বাহিনী টিকিয়া থাকিবার কথা নয়, তারপরও মিত্রবাহিনী ঘোরতর যুদ্ধের আশংকা করিয়াছিল এবং ব্যাপক হতাহতের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কিছুই হয় নাই। প্রথম দিনেই মিত্রবাহিনী প্রায় বিনা বাধায় কোন

ক্ষেত্রে ২০ মাইল এবং কোন ক্ষেত্রে ৭০ মাইল ভিতরে প্রবেশ করে। পশ্চাদপসারণকারী ইরাকি বাহিনী প্রায় ৫০০ কুয়েতি তৈল ক্ষেত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। মিত্রবাহিনী প্রাথমিক পর্যায়ে ৫৫০০ যুদ্ধবন্দী আটক করে (Newsweek March 4,1991)।

ইরাকি প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা ঃ ইরাক তিনটি স্তরে তাহার প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে। (ক) সম্মুখ ভাগ, (খ) আরও পিছনে একটি কৌশলগত রিজার্ভ, (গ) কুয়েতের উত্তর সীমান্তে বা দক্ষিণ ইরাকে মূল যুদ্ধক্ষেত্রের রিজার্ভ। মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনা ছিল তিনটি স্তরে একসঙ্গে আঘাত করা। রিপাবলিকান গার্ড বাহিনীকে রাখা হইয়াছিল দক্ষিণ ইরাক সীমান্তে মূল যুদ্ধক্ষেত্রের রিজার্ভ হিসাবে। ইহাদের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনী তাহাদের সেরা কোর-সপ্তম কোর মোতয়েন করে। ইহাতে ছিল ৫টি মার্কিন ডিভিশন এবং বৃটেনের প্রথম সাঁজোয়া ডিভিশন যাহা "ডেজার্ট র‍্যাট" নামে খ্যাত। কিন্তু এই কোর রিপাবলিকান গার্ডকে পার্শ্বে রাখিয়া পূর্ব-কুয়েত দিয়া ইরাকি ভূখণ্ডে প্রবেশ করে এবং ইরাকি পরাজয় ত্বরান্বিত করে। অপরদিকে অষ্টাদশ কোর কুয়েতের আরও পশ্চিমে রিপাবলিকান গার্ডকে পূর্বে রাখিয়া ইরাকে প্রবেশ করে।

স্থলযুদ্ধ শুরু হইবার পর ঠিক ১০০ ঘন্টায় যুদ্ধ শেষ হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ এককভাবে সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন এবং একটি শান্তিনীতি প্রদান করেন। ছয় সপ্তাহ পূর্বে "ডেজার্ট" স্টর্ম নামে খ্যাত এবং বিমান হামলা দিয়া সূচিত যুদ্ধে প্রেসিডেন্ট বুশ বিরাট জয়লাভ করেন। তাঁহার অগণিত শত্রু নিহত হয় এবং তাহার স্বপক্ষের সৈন্য কদাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু এতদসত্ত্বেও জর্জ বুশের চেহারা মলিন, কারণ তখনও পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে "সাদ্দাম জীবিত... এখনও আমাদের যুদ্ধ বন্দীরা আবদ্ধ রহিয়াছে। আমাদের লোকদের ক্ষয়ক্ষতি এখনও নিরূপণ করা হয় নাই।"

অতঃপর মিত্রবাহিনী যাহা স্থির করিল তাহা হইলঃ

১. পাশ্চাত্যের বেশ কিছু সৈন্য আগামী কয়েক মাস অত্র অঞ্চলে অবস্থান করিবে।

২. ইরাকের উপর জাতিসংঘ আরোপিত অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকিবে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকিবে কিনা তাহা নির্ভর করিবে সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকিবেন কিনা তাহার উপর।

৩. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। ইরাকি যুদ্ধবন্দী ধরিয়া আনিবার সময় মিত্রবাহিনী যুদ্ধাপরাধীদের ধরিবার জন্যও প্রচেষ্টা চালায়। তাহাদের অপরাধ খুঁজিবারও চেষ্টা চালানো হয়। তবে এই ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়, কারণ বেশি বাড়াবাড়ি করিলে ইরাকের হাতে বন্দী মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবন্দীদেরও বিচার করা হইবে। ইহাছাড়াও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে আরব দেশসমূহের মধ্যেও মতপার্থক্য রহিয়াছে। কুয়েত ও সৌদি আরব বিচার করিতে চায় কিন্তু মিসর চায় না।

৪. যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান। কুয়েত সরকার ও জনগণের প্রাপ্য হইবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। কুয়েতে কর্মরত ফিলিস্তিনী ও অন্যান্য বিদেশীদের দাবি হইবে কয়েকশত বিলিয়ন ডলার। অথচ ইরাকের তৈল হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় বাৎসরিক মাত্র ১৪ বিলিয়ন ডলারের কিছু উপরে। ইতিমধ্যে দেশটির বিদেশী ঋণের পরিমাণ রহিয়াছে ৭৫ বিলিয়ন ডলার। ইহার উপর ইরাক

পুনর্গঠনের জন্য খরচ হইবে শত শত বিলিয়ন ডলার। মিত্রবাহিনী এইসব হিসাব কষে শুধু এইকথা বলিবার জন্য যে সাদ্দাম হোসেন সরিয়া গেলে সকল দেনা এমনিতেই পরিশোধিত হইয়া যাইবে। কিন্তু মিত্রবাহিনীর দৃষ্টিতে পরিতাপের বিষয় হইল এত কিছুর পরেও ইরাকের ভবিষ্যতের উপর সাদ্দামের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ রহিয়াছে (Newsweek March 11, 1991)।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে মিত্রবাহিনীর সামরিক ইউনিটসমূহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাদিগকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানানো হয়। এই বিজয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরাজয়ের গ্লানি মুছিয়া ফেলিতে সহায়তা করে। প্রেসিডেন্ট বুশ যুদ্ধ ফেরত সৈন্যদিগকে জাতীয় টেলিভিশন মারফত গভীর ধন্যবাদ জানান। অপরদিকে মিত্রবাহিনীর বোমার আঘাতে ইরাকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরাক অন্ধকারে নিমজ্জিত, পানি সরবরাহ বন্ধ এবং নগরীসমূহ পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে। বিপর্যস্ত সেনাবাহিনীর এই অবস্থায় শিয়া মুসলিমরা বিদ্রোহ করে এবং কুর্দিরা ইরাকের উত্তরাঞ্চলে গোলযোগের সৃষ্টি করে।

কুর্দি বিদ্রোহীরা ইরাক-তুরস্ক সীমান্তের প্রধান সড়কে তাহাদের লাল ও সবুজ রং-এর পতাকা উত্তোলন করে।

কুর্দি বিদ্রোহঃ

ইরাকের উত্তরাঞ্চলে তুরস্ক ও ইরানের সীমান্ত লাগোয়া ইরাকি কুর্দিস্তান অবস্থিত। উল্লেখ্য, এই কুদিস্তানের কিছু অংশ পড়িয়াছে তুরস্কে এবং কিছু অংশ পড়িয়াছে ইরানে। উপসাগরীয় যুদ্ধের সুযোগে ইরাকি কুর্দিরা তাহাদের একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি ফ্রন্ট গঠন করে। ইরাকি কুর্দিস্তান আয়তনে হাঙ্গেরীর সমান এবং ত্রিশ লক্ষ কুর্দির আবাসস্থল। এই সংখ্যা ইরাকের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। মার্চ '৯১-এর প্রথম দিকে ইরাকি বাহিনী পশ্চাদপসারণের ঘোষণা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচণায় কুর্দিরা সক্রিয় হইয়া উঠে এবং উত্তর ইরাকের শতকরা ৯৫ ভাগ দখল করিয়াছে বলিয়া দাবি করে। বিদ্রোহীরা সমগ্র ইরানি ও তুর্কি সীমান্ত নিয়ন্ত্রন করে এবং প্রধান তৈলকেন্দ্র কিরকুক অবরোধ করে। ইরাকি সৈন্যরা ৫,০০০ কুর্দি ধরিয়া আনিয়াছে বলিয়া দাবি করে।

দাঙ্গার মাধ্যমে আরম্ভ হইলেও কুর্দি বিদ্রোহ বহু যুদ্ধ পরীক্ষিত সংগঠনের উপর নির্ভর করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটিশ সরকার কুর্দিদিগকে তাহাদের নিজস্ব আবাসভূমি দিতে অস্বীকার করিলে কুর্দিরা গড়ে প্রতি এক যুগ পরপর বাগদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বাগদাদ কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করে এবং হাজার হাজার কুর্দিকে বহিষ্কার করে। উপসাগরীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ৯০ এর জানুয়ারি মাসে হাজার হাজার কুর্দি তাহাদের ইরান, সিরিয়া ও তুরস্কে ঘাটিসমূহ হইতে ইরাক প্রত্যাবর্তন করে এবং সাদ্দামের পতন হইলে ইরাকে আঘাত হানিবার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু যুদ্ধ চলাকালে কুর্দি নেতা মাসুম বার্জানী (মোস্তফা বার্জানীর পুত্র) সাদ্দামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, পাছে তিনি পাল্টা আঘাত হানেন। ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জার ওয়াদা করিয়াছিলেন যে কুর্দিরা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে তাহাদিগকে মার্কিন ও ইরানি সাহায্য দেওয়া হইবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ইরান ও ইরাকের মধ্যে আলজিয়ার্স চুক্তির দ্বারা সমঝোতা সৃষ্টি হইলে যুক্তরাষ্ট্র ঐ ওয়াদা প্রত্যাহার করে এবং হাজার হাজার কুর্দি পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

কুর্দিদের ব্যাপারে তুরস্কের নীতির পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বিদ্রোহে কুর্দিরা উৎসাহ পায়। তুর্কিরা সরকারিভাবে কুর্দি সম্প্রদায়কে স্বীকার করিয়া লয়, যদিও ইতিপূর্বে তাহারা আট বৎসর কুর্দিদের সহিত নিজ ভূমিতে যুদ্ধ করিয়াছে। তুর্কি প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজাল লন্ডন হইতে কুর্দি নেতাদিগকে আংকারায় আনয়ন করিয়া মার্কিন,বৃটিশ ও ফরাসিদের ন্যায় ইরাকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মাতিয়া ওঠেন। উত্তরের বিদ্রোহের খবর শুনিয়া জেলে আবদ্ধ কুর্দিরা পুলিশদের কাবু করিয়া বিদ্রোহে যোগ দেয়।

শিয়া বিদ্রোহঃ

সুযোগ বুঝিয়া ইরান সরকারও শিয়াদের সমর্থনে আগাইয়া আসে। ইরান হইতে সরবরাহকৃত অথবা ইরাকি সৈন্যদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অস্ত্র লইয়া শিয়ারা আয়াতুল্লাহ খোমেনীর ছবি সহকারে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে। ইরানের জঙ্গী বিমান বাগদাদে অতি নিচু দিয়া উড়িয়া যায়। প্রেসিডেন্ট হাসিমী রাফসানজানী বলেন, "সাদ্দামের ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, জনগণের রক্তে তাহার মেয়াদের শেষ পৃষ্ঠা লেখা উচিত নহে।" কিন্তু ইরানের প্রাধান্য আবার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথাব্যাথার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা চায় একটি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাদ্দাম অপসারিত হউক। তাহা হইলে সংখ্যালঘু সুন্নী মুসলমানদের হাতে ইরাকের ক্ষমতা থাকিবে এবং তাহারা ইরানের ক্ষমতা বিস্তারে প্রবল বাধা হিসাবে অবস্থান করিবে। তাহাদের মূল কথা হইল সাদ্দাম হোসেন সরিয়া যাক কিন্তু তাহার সরকার টিকিয়া থাকুক। একজন মার্কিনী সিনেটরের অভিযোগে "হিটলারের পতন হউক কিন্তু নাজীরা ক্ষমতায় থাকুক।"

তিনদিন পর সাদ্দামের সৈন্যগণ দেশ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। ইরাকিরা এই বিদ্রোহকে আধুনিককালের সর্ববৃহৎ ও ভয়াবহ ষড়যন্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত করে। ট্যাংক গোলন্দাজ ও ক্ষেপণাস্ত্রের বেপরোয়া ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা পরিস্থিতি শান্ত হইয়া আসে। রিপাবলিকান গার্ডরা এই ভয়াবহ অবস্থায় সাদ্দামকে ত্যাগ করে নাই বরং বিদেশি উস্কানিতে সৃষ্ট এইসব বিদ্রোহ অতি দৃঢ়তার সহিত দমন করে।

এদিকে মুক্ত কুয়েতে রাজ পরিবার এবং জনসাধারণ ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে। স্বভাবতঃই কুয়েতে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি উঠে। ১৯৮৬ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের অজুহাতে কুয়েতের সীমিত গণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড রহিত করা হইয়াছিল। অতএব যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার পুর্ণপ্রতিষ্ঠার বিষয়টিও উঠিয়া আসে। কুয়েতের রাজধানীতে একটি প্রবাদ ভাসিয়া বেড়ায়, তাহা হইল, ' ডেজার্ট স্টর্ম ' কার্যক্রম কুয়েতের সাবাহ রাজপরিবারকে মুক্ত করিয়াছে- জনগণকে নহে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, কুয়েতের আমীর তথায় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অক্টোবর '৯২ এর নির্বাচনে আমীর বিরোধী দলসমূহ জয়লাভ করে, অপরদিকে মহিলারা ভোটাধিকারের জন্য সভা-মিছিল করে। কিন্তু সংবিধান সংশোধন না করা পর্যন্ত আপাতত কিছু করিবার নাই।

মিত্র বাহিনীর সাহায্য সম্ভার ঃ

পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল ইরাকের বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রধান সামরিক শক্তি। তবে এই দেশই একমাত্র লড়াকু দেশ নহে। অন্যান্য ৩৭টি দেশ এবং একটি বহুজাতিক গ্রুপ, উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (Gulf Co-operation Council) সৈন্য হইতে

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মোজা পর্যন্ত সরবরাহ করিয়াছে। সম্মিলিত দেশ সমূহ যাহা সরবরাহ করিয়াছে উহার একটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

১. **মিসর** ঃ ২টি সাঁজোয়া বহর এবং ৪ শতেরও অধিক ট্যাংকসহ ৩০,০০০ সৈন্য।

২. **ফ্রান্স** ঃ গোলন্দাজ, সাঁজোয়া বহর ও হেলিকপ্টার রেজিমেন্টসহ ১৬,০০০ সৈন্য, ৪০টি জঙ্গী বিমান এবং ৯-১০টি যুদ্ধ জাহাজ।

৩. **সৌদি আরব** ঃ ৪৫,০০০ সৈন্য, ৫০০ ট্যাংক এবং ৩০০ জঙ্গী বিমান। ১৬.৮ বিলিয়ন ডলার এবং জ্বালানি খরচের জন্য ১.৭ বিলিয়ন ডলার।

৪. **যুক্তরাজ্য** ঃ ২৫,০০০ স্থল সৈনিকসহ ৪০,০০০ সামরিক লোকজন, শত শত ট্যাংক, ৮০টিরও অধিক জঙ্গী বিমান এবং ২৬টি যুদ্ধ জাহাজ।

৫. **কানাডা** ঃ ২২০০ সামরিক লোক, ২টি ডেস্ট্রয়ার, ২৪টি সি. এফ. -১৮ জেট জঙ্গী বিমান, একটি ট্যাংকার এবং বহু সরবরাহ বিমান।

৬. **জার্মানি** ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য ৭১টি কেমিক্যাল বাইওলোজিক্যাল স্কাউট যান এবং এইগুলি চালাইবার জন্য ২০০ জনবল; ৫টি মাইন পরিষ্কারকারী জাহাজ, তুরস্কে মোতায়েন ১৮টি সামরিক বিমান। ইহাছাড়া ৬.৬ বিলিয়ন ডলার প্রদানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ওয়াদাবদ্ধ।

৭. **উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ** (Gulf Co-operation Council) ঃ সৌদি আরবের উত্তরাঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের যুক্ত তত্ত্বাবধানে প্রদত্ত ১০,০০০ সামরিক লোকজন। কাতার হইতে এক স্কোয়াড্রন মিরেজ জঙ্গী বিমান।

৮. **ইতালি** ঃ ১০ খানি টর্নেডো জঙ্গী বিমান, ৩ খানি ফ্রিগেট, ৪ খানি মাইন সুইপার এবং ১ খানি সরবরাহ জাহাজ।

৯. **কুয়েত** ঃ ৩০-৪০টি ট্যাংকসহ ১১,৫০০ সামরিক লোকজন, ১৫ খানি মিরেজ জঙ্গী বিমান, ৩৪ খানি হেলিকপ্টার, ১৬ বিলিয়ন ডলার।

১০. **পাকিস্তান** ঃ সৌদি কমান্ডে ১১,০০০ শক্তিশালী পদাতিক সৈন্য।

১১. **স্পেন** ঃ মার্কিন বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য ২টি বিমান ঘাটি, তুরস্কে নিয়োজিত এফ-১৬ মার্কিন জঙ্গী বিমানের যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং ৩ খানি ফ্রিগেট।

১২. **সিরিয়া** ঃ ২০,০০০ সৈন্য এবং প্রায় ৩০০ ট্যাংক।

১৩. **তুরস্ক** ঃ প্রায় ১০০টি জঙ্গী বিমানের জন্য ঘাটি ব্যবহারের সুবিধা প্রদান, ৩ খানি ডেস্ট্রয়ার, ২ খানি ডুবো জাহাজ এবং একখানি মাইন সুইপার।

১৪. **আফগানিস্তান** ঃ ২০০০ মুজাহিদ।

১৫. **আর্জেন্টিনা** ঃ ১০০ জন স্থল সৈন্য, ২ খানি যুদ্ধ জাহাজ, ২ খানি বিমান।

১৬. **অস্ট্রেলিয়া** ঃ ১ খানি ডেস্ট্রয়ার, ১ খানি ফ্রিগেট, ১ খানি সরবরাহ বিমান।

১৭. **বাংলাদেশ** ঃ প্রতিরক্ষার জন্য ২,৩০০ সৈন্য।

১৮. **বেলজিয়াম** ঃ ৬ খানি সি-১৩০ বিমান, ১ খানি মাইন সুইপার, অবতরণ ও সরবরাহ জাহাজ।

১৯. **বুলগেরিয়া ঃ** সেনা প্রকৌশলীদের একটি দল।

২০. **ডেনমার্ক ঃ** ১ খানি যুদ্ধ জাহাজ এবং কয়েকখানি সরবরাহ জাহাজ।

২১. **গ্রীস ঃ** ১ খানি ফ্রিগেট।

২২. **হন্ডুরাস ঃ** ১৫০ জন সৈনিক।

২৩. **মরক্কো ঃ** ১৩০০ সৈন্য।

২৪. **নেদারল্যান্ডস ঃ** কয়েকটি ফ্রিগেট, একটি সরবরাহ জাহাজ এবং ৪০ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল।

২৫. **নিউজিল্যান্ড ঃ** ৩ খানি সরবরাহ বিমান, ১০০ জনবলের সাহায্যকারী দল এবং একটি চিকিৎসক দল।

২৬. **নিগার ঃ** ৫০০ জন সৈন্য।

২৭. **নরওয়ে ঃ** একখানি নেভী কাটার এবং কিছু সৈন্য।

২৮. **সেনেগাল ঃ** ৫০০ সৈন্য।

২৯. **সিয়েরা লিয়ন ঃ** ২০০ সৈন্যের অঙ্গীকার।

৩০. **চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ** একটি রাসায়নিক দূষণমুক্তকারী দল।

৩১. **জাপান ঃ** শত শত অকেজো গাড়ি, জেনারেটর, চিকিৎসা সামগ্রী, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। ১৩ বিলিয়ন ডলার প্রদানের অঙ্গীকার।

৩২. **হাঙ্গেরী ঃ** একটি চিকিৎসক দলের অঙ্গীকার।

৩৩. **পোলান্ড ঃ** ১৭ সদস্যের চিকিৎসা দল এবং একটি হাসপাতাল জাহাজ।

৩৪. **পর্তুগাল ঃ** একটি সাহায্যকারী জাহাজ।

৩৫. **সিঙ্গাপুর ঃ** বৃটিশ আর্মি হাসপাতালে ৩৫ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল প্রদান।

৩৬. **দক্ষিণ কোরিয়া ঃ** ১৫৪ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল, মিত্রবাহিনীর জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রদান।

৩৭. **শ্রীলঙ্কা ঃ** বেসামরিক আসবাবপত্র বহনকারী জাহাজের জন্য পুনঃতৈল গ্রহণের সুবিধা প্রদান।

৩৮. **সুইডেন ঃ** ৫২৫ জনবল এবং ৩৫০ শয্যার একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে ব্যবহার্য সেনা হাসপাতাল (Newsweek March 4, 1991)।

এই শক্তিশালী সামরিক জোটের বিরুদ্ধে যিনি একা লড়াইয়ে অবতরণ করিলেন তিনি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। ইরাকের জনগণের নিকট তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব যিনি আরবদিগকে তথা মুসলিম বিশ্বকে মার্কিন-ইহুদী জাতাকল হইতে মুক্তিদানের জন্য আগমন করিয়াছেন। উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হইবার সাথে সাথে সাদ্দাম হোসেন সমস্ত মুসলিম দেশে কিংবদন্তির নায়ক হিসাবে আবির্ভূত হন। কুয়েত দখলের পর তাঁহার সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইলেও সৌদি আরব মার্কিন সাহায্য চাহিলে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব প্রতিবাদে ফাটিয়া পড়ে এবং ক্রমশ জনসমর্থন সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে চলিয়া যায়। ইসরাইলের বিরুদ্ধে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত এবং সাময়িক খাফজা দখল তাঁহার শত্রুর মনেও শ্রদ্ধাবোধ জাগাইয়া তোলে। সাদ্দামের অনেক আরবি সমালোচক তাঁহার প্রশংসা করে শুধু এই জন্যই যে তিনি

তাঁহার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। আধুনিককালে মধ্যপ্রাচ্যে সাহসী পুরুষের নিতান্ত অভাবের দিনে সাদ্দাম টিকিয়া থাকিতে না পারিলেও তাহার ক্ষমতার প্রবাদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য হিসাবে যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজ করিবে।

সাদ্দাম হোসেন তাঁহার মার্কিন- ইহুদী বিরোধী ভূমিকাকে ইসলামের প্রতি তাঁহার খেদমত হিসাবে উপস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ফলে জর্দানের রাজধানী আম্মানের ন্যায় মুসলিম বিশ্বের অসংখ্য স্থানের ছোট ছোট ছেলেরা তাহাদের কৃত্রিম যুদ্ধ খেলায় সাদ্দামকে সাত-আট শত বছরের পূর্বের ক্রুসেড খ্যাত সালাহউদ্দিনের সহিত তুলনা করে এবং আশা করে যে সালাহউদ্দিনের ন্যায় তিনিও ইহুদী-মার্কিন বাহিনীকে শায়েস্তা করিতে সক্ষম হইবেন। সাদ্দাম শুধু প্রতিবেশী আরবদেরকেই অনুপ্রাণিত করেন নাই বরং সুদূর ইন্দোনেশীয়দিগকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, ফলে যুদ্ধের প্রথম দুই সপ্তাহে ১৮ জন ইন্দোনেশীয় নবজাতকের নাম রাখা হয় সাদ্দাম হোসেন। দক্ষিণ লেবাননে তথা প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশে যে কোনো শক্তিশালী ও প্রলয়ংকরি বস্তুকে স্কাড হিসাবে অভিহিত করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে সাদ্দামের ছবি বিক্রয়ের ধুম পড়িয়া যায়। একদিকে প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ চলে অপর দিকে নায়ক বেশি সাদ্দামের ছবি। পপগায়িকা মেডোনার একটি ছবির সঙ্গে ৫০টি সাদ্দামের প্রতিকৃতি বিক্রয় হয়। কিশোরদের নিকট সাদ্দাম সকল কালের কাংক্ষিত বীর। আম্মানের একজন ১৫ বৎসরের কিশোরীর ধারণা সাদ্দাম হোসেন যুদ্ধে মারা গেলেও তাহার আরদ্ধ কাজ শেষ করিবার জন্য অনেকেই থাকিয়া যাইবে। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খাল আক্রমণ করিয়া পশ্চিমাগণ প্রেসিডেন্ট নাসেরকে এক মহামানবে পরিণত করিয়াছিল। ৩৪ বৎসর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করিয়া সাদ্দাম হোসেনকে আরব জাহানের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে পরিণত করিয়া দিল। মৃত কিংবা জীবিত সাদ্দাম হোসেনের ইহাই রাজনৈতিক বিজয়।

নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত যুদ্ধ বিরতির শর্তসমূহ এমনভাবে তৈয়ার করা হইল যাহাতে সাদ্দাম হোসেন চাপের মুখে থাকেন এবং ফলশ্রুতিতে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। অন্যান্য শর্তসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিরাট অংকের বোঝা চাপানো এবং আন্তর্জাতিক তদারকিতে ইরাকের পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ খুলিয়া ফেলা বা ধ্বংস করা। এইসব শর্ত না মানা পর্যন্ত ইরাকের উপর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখা হয়। ইরাকের জাতীয় সংসদ অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইগুলি মানিয়া লয়। পরবর্তীকালে অনেক বাক বিতণ্ডা, অবরোধের হুমকি ইত্যাদির মুখে ইরাকের সামরিক স্থাপনাসমূহ এবং স্কাড ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ ধ্বংস করা হয়।

ইহার পরও ইরাকের বাগদাদস্থ কৃষি মন্ত্রণালয়ে অস্ত্র তল্লাশিতে জাতিসংঘ দলের প্রবেশের ব্যবস্থায় ইরাক আপত্তি জানায়, ফলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এদিকে বিগত ২রা আগস্ট '৯২ ইরাকের কুয়েত দখলের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে ইরাকি পত্র-পত্রিকায় দৃঢ়তার সাথে কুয়েতকে ইরাকের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া প্রচার করা হয়। জাতিসংঘের ২২ সদস্যের অনুসন্ধানী দল ইরাক পৌছিলে তাহাদিগকে কোনো মন্ত্রণালয়ে অনুসন্ধানের জন্য প্রবেশে ইরাক বাধা প্রদান করে। ইরাকি ও কুয়েতি বাহিনী সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হয়। মার্কিন বাহিনী ইরাকের দিকে অগ্রসর হয়। ইরাক সরকার এই তল্লাশিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া আখ্যায়িত করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তল্লাশিকাজ চালাইয়া যাইবার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং বোমা হামলার হুমকি প্রদান করে। তাহারা নয়টি লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করে যাহার মধ্যে

সর্বপ্রথম হইল সামরিক শিল্প কারখানা। ইরাক সর্বশক্তি দিয়া হামলা প্রতিরোধ করিবার সংকল্প ব্যক্ত করে।

এইদিকে ইরান অভিযোগ করে যে, ইরাক দক্ষিণের শিয়া অঞ্চলে নাপাম বোমা নিক্ষেপ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে ইরাকি বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ করে। ইরাক এই ঘোষণাকে তাহার দেশ খণ্ড বিখণ্ড করিবার অংশ বলিয়া উল্লেখ করে। তাহারা আরও বলে যে সর্বশেষ মার্কিন প্রস্তাবের সহিত জাতিসংঘ সিদ্ধান্তের কোন মিল নেই। সে আরও উল্লেখ করে যে মার্কিন, বৃটিশ ও ফ্রান্সের পরিকল্পনায় ইরান সহায়তা করিতেছে। তবে জর্দান এই পদক্ষেপের নিন্দা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির প্রত্যুত্তরে ইরাক ২৯শে আগস্ট দক্ষিণ ইরাকের শিয়া অঞ্চলে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা মানিয়া লয়। অতঃপর তিন দেশের (মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসি) বিমান ঐ এলাকায় টহল দিতে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র বিমান আক্রমণের হুমকি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি সত্ত্বেও সাদ্দামের নেতৃত্বে কোনো ফাটল ধরাইতে সক্ষম হয় নাই। একজন বিদেশী কূটনীতিক বলেন যে, আট বৎসরে ইরাক-ইরান যুদ্ধ এবং কুয়েতকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩০ জাতির সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাদ্দাম হোসেন কাবু হন নাই। শিয়াদিগকে রক্ষা করিবার নামে বিমান উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করিয়া যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের বিমান টহল দিয়াও সাদ্দামকে কাবু করিতে পারিবে না। সাদ্দাম হোসেন কাবু হওয়া দূরে থাকুক তিনি ক্রমাগত জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইরাকিদের মনোবল চাঙ্গা করিবার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ইরাকের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিবার কথা ঘোষণা করেন।

এত কিছুর পরও সাদ্দামকে উৎখাত করিতে ব্যর্থ হইয়া গত ৪ঠা অক্টোবর '৯২ যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রস্তাবে সিদ্ধান্ত লয় যে, বিদেশে প্রাপ্ত ইরাকি সম্পদ আটক করা হইবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র, সৌদি আরব ও তুরস্কে ইরাকের ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইরাক ইহাকে টেক্সাস মার্কা ব্যাংক ডাকাতি বলিয়া আখ্যায়িত করে। শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায়ই আছেন আর এদিকে ৩রা নভেম্বর অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জর্জ বুশ শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন।

যুদ্ধে ইরাকের বিপর্যয় ঃ একটি পর্যালোচনা

ইরাক যেইভাবে তাহার কুয়েত অভিযান সফল করিয়াছিল এবং পরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল তাহাতে ধারণা করা হইয়াছিল, সে কিছুতেই কুয়েত ত্যাগ করিবে না। কিন্তু পরে কেন সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইল সেই সম্পর্কে যুদ্ধ বিশ্লেষকগণ নিম্নলিখিত সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় করিয়াছেন ঃ

১. সবচাইতে বড় ভুল ছিল কুয়েত দখল করিবার পর সৌদি সীমান্তে থামিয়া যাওয়া। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন সাদ্দাম যদি দাহরাম এবং দাম্মাম পোর্ট দখল করিয়া লইতেন এবং সৌদির পূর্বাঞ্চলীয় তৈলক্ষেত্রগুলি অধিকার করিতেন তবে সম্মিলিত বাহিনী এত বিশাল সমরসজ্জা করিতে পারিত না।

২. সাদ্দাম হোসেন শুধু কুয়েতের প্রতিরক্ষা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, দক্ষিণ ইরাকের প্রতিরক্ষার কথা চিন্তাও করেন নাই। ফলে মিত্রবাহিনী সরাসরি কুয়েত ফ্রন্টে

স্থলযুদ্ধে না গিয়া দক্ষিণ ইরাক দিয়া প্রবেশ করে এবং ইরাকি বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

৩. ভিয়েতনাম যুদ্ধ হইতে সাদ্দাম হোসেনের ধারণা ছিল মার্কিন বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অকেজো এবং তাই স্থলযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাদিগকে সহজে কাবু করা যাইবে। কার্যত মার্কিন বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া গিয়াছে এবং রিপাবলিকান গার্ডদের চোখে ধূলা দিয়া ইরাকে প্রবেশ করিয়াছে।

৪. ইরাকের নিজেদের অস্ত্রের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহা ভুল প্রমাণিত হইল এবং সোভিয়েত কর্তৃক যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ভরাডুবি হইল।

৫. ইরাক রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেনি, কেন করেনি তাহা এখনও নির্ণয় করা যায়নি।

৬. কুয়েত দখলের জন্য ইরাকের সময় নির্ধারণ সঠিক হয় নাই। পূর্ব ইউরোপে কমিউনিজম বিরোধী গণজাগরণ এবং খোদ সোভিয়েত রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কুয়েত আক্রমণ ঠিক হয় নাই।

* * * *

নব নির্বাচিত ডেমোক্রেট দলীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের ক্ষমতায় আসীন হইবার পর হইতে ইরাকের ব্যাপারে মার্কিন ও বৃটিশনীতির নমনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে। নিউ ইয়র্ক হইতে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ ক্লিনটন প্রশাসন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করিবার জন্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বুশের গৃহীত গোপন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য এ ব্যাপারে প্রশাসন একটি নিম্নমানের কর্মসূচি অব্যাহত রাখিবে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সাদ্দামকে উৎখাত করিবার জন্য বুশ প্রশাসন দেড়কোটি ডলারের এক গোপন পরিকল্পনা হাতে লইয়াছিলেন। এই অংশ পরে ৪ কোটি ডলারে উন্নীত হয়। ক্লিনটন প্রশাসন ইহাকে অর্ধেকে নামাইয়া আনেন (New York Times, April 11, 1993)। কিন্তু গত ৯ই এপ্রিল শুক্রবার উত্তর ইরাকে একটি সামরিক স্থাপনার উপর মার্কিন বিমান হামলায় ইরাক হতাশা ব্যক্ত করিয়াছে।

এদিকে ইরাকের বিরুদ্ধে অবরোধে অংশগ্রহণকারী মিসর ইরাকের সাথে আপোস রফায় রাজি হইয়াছে। ইরানের ভয়ে ভীত ওমান এবং বাহরায়েনও ইরাকের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উপর জোর দিতেছে। তুরস্ক পুনরায় বাগদাদে তাহার দূতাবাস খুলিয়াছে। ইরান ও জর্দান ইরাককে তৈল রপ্তানি সুবিধা প্রদান করিয়াছে। ইরাক তৈল চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টায় ফরাসি ও অন্যান্য কতিপয় পশ্চিমা তৈল কোম্পানির সাথে যোগাযোগ জোরদার করিয়াছে। ফ্রান্সের এলফ ও টোটাল তৈল কোম্পানিসহ পশ্চিমা ও অন্যান্য কোম্পানির প্রতিনিধিরা অবরোধ প্রত্যাহারের পর সম্ভাব্য অনুকূল চুক্তি এবং অশোধিত তৈল বিক্রয়ের ব্যাপারে বাগদাদ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করিয়াছেন (Time, March 29, 1993)।

মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন

উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পরাজয়ের পর মধ্যপ্রাচ্যে একটি স্থায়ী শান্তি পরিবেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক পরিকল্পনা হাতে লয়। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ১৯৯১

সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস বেকার ইসরাইলসহ বিভিন্ন আরব দেশ সফর করেন এবং নেতাদের সাথে মতবিনিময় করেন। আরব-ইসরাইলী শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত জানিয়াও যুক্তরাষ্ট্র এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। বেকার উভয় পক্ষকে বাগ্মিতা ছাড়িয়া প্রকৃত সমস্যা সমাধানের পথে আগাইয়া আসিবার আমন্ত্রণ জানান। উভয়পক্ষ নীতিগতভাবে শান্তি প্রস্তাব মনিয়া লয়। সর্বশেষ আরব প্রস্তাব হইল এই ব্যাপারে একটি 'আন্তর্জাতিক মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন' আহ্বান করা হউক।

শান্তি সম্মেলন সফল হইবার পথে দুইটি বাধা পর্বত প্রমাণ দন্ডায়মান। উহার একটি হইল পি এল ও'র অংশগ্রহণ এবং অপরটি হইল পশ্চিম তীরে ইহুদী বসতি স্থাপনের বিষয়টি। ইসরাইল পি এল ওকে সম্মেলনে সম্পৃক্ত করিতে মোটেই রাজি নহে, আবার পি এল ও প্রতিনিধি ছাড়া সম্মেলন কতটুকু সফল হইবে তাহাও ভাবিবার বিষয়। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক শামির পি এল ওকে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন মনে করে। তাই যুক্তরাষ্ট্র পি এল ও-কে সম্মেলন হইতে বাদ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পি এল ও-র উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কোনো গুরুত্ব নাই। ১৯৭৩ সালে সংগঠিত ইয়ম কিপুর যুদ্ধের পর জাতিসংঘের উদ্যোগে জেনেভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু পি এল ও এবং সিরিয়া ইহাতে যোগ না দেওয়ায় কোনো ফলাফল ছাড়াই সম্মেলন শেষ হয়। পি এল ও চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত মার্কিন শান্তি প্রচেষ্টাকে একটি চক্রান্ত বলিয়া অভিযোগ করেন। বেকারের মধ্যপ্রাচ্য সফরের প্রতি সমর্থন দানের জন্য তিনি আরব রাষ্ট্রগুলির পরোক্ষ সমালোচনা করেন। তিনি মার্কিন উদ্যোগকে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন বলিয়া জানান। জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করিয়াছে, যাহা তাহারা হারাইতে চায় না। অপরদিকে পূর্ব জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনীরা মাতৃভূমি হিসাবে দেখিতে চায়। তবে আরবরা ইহাতে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করিবে বলিয়া জানানো হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় বাধা পশ্চিম তীরে ইহুদী বসতি স্থাপন। এই সম্পর্কে ইসরাইল অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছে। এই কার্যক্রম বন্ধ রাখিয়া তাহারা শান্তি সম্মেলনে বসিতে নারাজ।

অবশেষে ১৯৯১ সালের ৩০শে অক্টোবর স্পেনের মাদ্রিদে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি সম্মেলনের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনী মহিলা হান্নান আশরাফী ফিলিস্তিনীদের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মাদ্রিদ সম্মেলন অগ্রগতি ছাড়াই সমাপ্ত হয়। দীর্ঘদিন বিরতির পর বিগত ২৫শে আগস্ট '৯২ ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলের প্রতিনিধিরা ওয়াশিংটনে প্রথম দফা সরাসরি আলোচনায় মিলিত হন। ইসরাইলের নির্বাচনে লিকুদ পার্টি ও প্রধানমন্ত্রী শামীরের পতনের পর লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে এবং অপেক্ষাকৃত উদার মনোভাবাপন্ন রবিন প্রধানমন্ত্রী হন। ক্ষমতায় আসিয়াই তিনি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রক্রিয়া জোরদার করিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং তাহারই ফলশ্রুতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধিকৃত গাজায় ও পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনীদের জন্য ইসরাইল স্বায়ত্তশাসনের নূতন প্রস্তাব লইয়া আসে। ইসরাইল অনেকটা নমনীয় মনোভাব লইয়া আসে বিধায় তাহারা পি এল ও প্রতিনিধি হিসাবে খ্যাত সায়েব এরিকট সম্পর্কে কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই। এরিকট ফিলিস্তিনী প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করিতেছেন। পি এল ও সরকারিভাবে সম্মেলনে যোগদান না করিলেও চারিজন পি এল ও নেতা ওয়াশিংটনে অবস্থান করিয়া ফিলিস্তিনী দলের সমন্বয় সাধন ও তিউনিসের সদর দফতরের সহিত যোগাযোগ রাখেন। ফিলিস্তিনী সদস্যরা মোটামুটি সন্তুষ্ট, কারণ ইসরাইল অধিকৃত ভূখণ্ডে সাধারণ নির্বাচন দিয়া একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক পরিষদ প্রতিষ্ঠায়

সম্মত হইয়াছে। ইহাকে ইসরাইল স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসনিক পরিষদ নামে আখ্যায়িত করিয়াছে। ইহার মেয়াদ হইবে পাঁচ বৎসর। ফিলিস্তিনী প্রতিনিধিরা এই পরিষদের আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী ক্ষমতা দাবি করিয়াছে।

ইসরাইলের এই প্রস্তাব ইতিবাচক হইলেও তাহাদের সদিচ্ছা সম্পর্কে ফিলিস্তিনীরা সন্দিহান। হান্নান আশরাফী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য ঘোষণা করায় এবং রবিন সরকার অধিকৃত এলাকায় ইসরায়েলী বসতি বন্ধ হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াও ১১,০০০ গৃহনির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখায় ইসরাইলের সদিচ্ছা সম্পর্কে ফিলিস্তিনীদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি ১১ হাজার ঘরকে শান্তির পথে ১১ হাজার বাধা বলিয়া উল্লেখ করেন।

এদিকে জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত এক সম্মেলনে ভাষণদানকালে পি এল ও প্রধান ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের নূতন প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এই প্রস্তাবে সীমিত স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু ফিলিস্তিনীদের দাবি পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণা ধিকার। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাসীর জানা উচিত যে, ফিলিস্তিনীদের লাশের উপর মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। আবার জেরুজালেম সমস্যার সমাধান ছাড়াও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

অপরদিকে সিরীয়রা জাতিসংঘের ২৪২ নং প্রস্তাব কার্যকরী করিবার জন্য চাপ দেয়। ঐ প্রস্তাবে অধিকৃত আরব এলাকা ছাড়িয়া দিবার কথা বলা হইয়াছে। ইসরাইল গোলান মালভূমি আংশিক ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া নমনীয় অবস্থানে আছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী রবিন ইসরাইলী সংসদে বলেন যে, ইসরাইল ঐ উপত্যকার কিছু অংশ ছাড়িয়া দিবার কথা বলিতেছে- সম্পূর্ণ নহে। তবে সিরিয়া গোলানের সকল কৌশলগত জায়গা হইতে ইসরাইলকে সরিয়া আসিবার দাবি জানাইয়াছে। সমস্ত কিছু মিলিয়া ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বৈঠক আরব ইসরাইলী সমঝোতার দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

চলতি বৎসরের (১৯৯২) অক্টোবর মাসে শান্তি সম্মেলনের সপ্তম দফা বৈঠক সম্প্রতি ওয়াশিংটনে আরম্ভ হয়। সূচনাতেই দক্ষিণ লেবাননে ইরানপন্থী হেজবুল্লাহ গেরিলা দলের চোরাগুপ্তা হামলায় ৫জন ইসরাইলী সৈন্য নিহত ও ৫জন আহত হইলে ইসরাইলী গোলন্দাজ ও জঙ্গী হেলিকপ্টারসমূহ লেবাননে হেজবুল্লাহ অবস্থানের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। ইহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠানরত শান্তি সম্মেলনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের জন্য সম্মেলন ১ সপ্তাহের বিরতি ঘোষণা করে এবং ৯ই নভেম্বর সম্মেলন পুনরায় আরম্ভ হইবে।

* * * *

ইসরাইল অধিকৃত পশ্চিম তীর হইতে সরকার ৪১৫ জন ফিলিস্তিনীকে তথায় গোলযোগ সৃষ্টির অভিযোগে বহিষ্কার করিলে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি সম্মেলন বাধাগ্রস্ত হয়। বহিষ্কৃত ব্যক্তিগণ উত্তরে লেবাননে প্রবেশের চেষ্টা করিলে ইসরাইলী সৈন্যদের গোলা বর্ষণে তাহারা মাঝপথে আটকাইয়া যায়। জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড শীতে তাহারা উন্মুক্ত আকাশের নিচে কালাতিপাত করে। তাহাদের রসদ ফুরাইয়া গেলে লেবানন হইতে গোপনে তাহাদিগকে অতিকষ্টে রসদ সরবরাহ করা হয়। বিশ্ব জনমতের চাপে ইসরাইল তাহাদের কয়েকজনকে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেও বহিষ্কৃত ব্যক্তিবর্গ দাবি করে যে, সবাইকে না লওয়া পর্যন্ত তাহারা

এককভাবে যাইবে না। এদিকে ইসরাইলী আদালত তাহাদের বহিষ্কারকে অবৈধ ঘোষণা করিয়াছে। ৪ মাস অতিবাহিত এই সংকটের পর গত ২০শে এপ্রিল ওয়াশিংটনে পুনরায় বৈঠকে বসিবার পূর্বে ফিলিস্তিনী প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করে যে বহিষ্কৃত ফিলিস্তিনীদিগকে ইসরায়েল ফেরত না লওয়া পর্যন্ত তাহারা বৈঠকে অংশগ্রহণ করিবে না। অতঃপর ইসরাইল তাহাদিগকে ফেরত লইবার আশ্বাস দিলে শান্তি সম্মেলন পুনরায় আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ইসরাইল ১৫ জন বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে ফেরত লইয়াছে। ইহাকে ফিলিস্তিনীরা একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সম্মেলন চলিতেছে। তবে ইসরাইল যেভাবে একগুঁয়েমি মনোভাব দেখায় তাহাতে এই সম্মেলন কতদিন চলে তাহা নির্ণিত করিয়া কিছুই বলা যায় না।

পি. এল. ও - ইসরাইল শান্তিচুক্তি ঃ

ওয়াশিংটনে আরব-ইসরাইল পক্ষদ্বয় যখন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তির ফর্মূলা ও দর কষাকষি লইয়া ব্যস্ত ঠিক সে সময় বিবদমান দুই পক্ষ- পি.এল. ও ও ইসরাইল সমগ্র বিশ্বকে তাক লাগাইয়া এক বিস্ময়কর শান্তিচুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দীর ঘৃণা ও শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলীরা পরস্পরকে স্বীকৃতি দিয়া এক স্বায়ত্তশাসন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ চত্বরে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দেশী ও আন্তর্জাতিক অতিথিদের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের উপস্থিতিতে ইসরাইলী পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করেন ইসরাইলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পিরেজ আর চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের উপস্থিতিতে পি. এল. ও-র পক্ষে স্বাক্ষর করেন পি. এল. ও প্রতিনিধি মাহমুদ আব্বাস।

এই দুই পক্ষের গোপন বৈঠক হয় নরওয়ের রাজধানী অসলোতে। প্রথমে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে এক ইসরাইলী অধ্যাপক ইয়ার হার্সফেল্ড এর উদ্যোগে লন্ডনের এক হোটেলে প্রথম গোপন বৈঠক বসে। অধ্যাপক হার্সফেল্ড পি.এল. ও-র অর্থবিষয়ক প্রধান আহমদ ক্রিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। এই বৈঠক ব্যর্থ হইলেও ইহাই ছিল প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ। অতঃপর অসলোতে প্রায় তের চৌদ্দটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক হার্সফেল্ড ইসরাইলী উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়োসি বেইলিনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং লেবার পার্টি ক্ষমতায় বসিলে শিমন পিরেজও ইহার সহিত জড়িত হন। অতঃপর নরওয়ে সরকার সমস্ত সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়। বিগত ২৭শে আগস্ট ১৯৯৩ দলিলের চূড়ান্ত খসড়া তেরির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাহা জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে তাহা সমর্থন করে।

এই চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল অধিকৃত গাজা উপত্যকা এবং জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরকে পাঁচ বছরের জন্য সীমিত স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। এই দুইটি ভূখণ্ড হইতে ইসরাইল তাহার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া লইবে। ফিলিস্তিনীরা দশ মাসের মধ্যে একটি কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করিবে এবং ঐ কর্তৃপক্ষই স্বায়ত্তশাসিত ভূখণ্ড দুইটির প্রশাসন পরিচালনা করিবে। বিশ হাজার ফিলিস্তিনী পুলিশের একটি বাহিনী গাজা ও জেরিকোর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবে। জেরিকো ও গাজাকে একটি করিডর দ্বারা সংযুক্ত করা হইবে।

১৩ই অক্টোবর ১৯৯৩ এই স্বায়ত্তশাসন চুক্তি কার্যকর হইবে। এই বছর ১৩ ই ডিসেম্বর গাজা ও জেরিকো হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য পি. এল, ও ইসরাইল আরেকটি

চুক্তি স্বাক্ষর করিবে। এই চুক্তির আওতায় ভূখণ্ড দুইটিতে ফিলিস্তিনী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যাপারে চূড়ান্ত আলোচনা শুরু হইবে। (Newsweek, Sept. 13, 93).

চুক্তির বিশেষ বিশেষ দিক হইল শিক্ষা ও সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, কর ব্যবস্থা ও পর্যটন- এই বিষয়গুলি ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই অঞ্চলে ফিলিস্তিনী পুলিশ মোতায়েন করা হইবে। ইসরাইল-প্যালেস্টাইন লিয়াজোঁ কমিটি, অর্থনৈতিক সহযোগিতা কমিটি, ১৯৬৭ সালে উচ্ছেদকৃত ফিলিস্তিনীদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য কয়েকটি কমিটি গঠিত হইবে। দুই মাস পর গাজা-জেরিকো হইতে ইসরাইলী সৈন্য, প্রশাসন প্রত্যাহার করিয়া সীমিত স্বায়ত্ত্বশাসন শুরু হইবে। ছয় মাস পর ইসরাইলী নিরাপত্তা বাহিনীর সম্পূর্ন প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ঘোষণা করা হইবে। ফিলিস্তিনী কাউন্সিল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হইবে নয়মাস পর। তারপর কাউন্সিলের গঠন, আকার, ক্ষমতা, বিভাগীয় কর্তৃত্ব, বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব সম্পর্কে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনীরা তাহাদের প্রার্থী নির্বাচন এবং ভোট দিবার অধিকার পাইবে।

চুক্তির প্রতিক্রিয়াঃ এই চুক্তির ব্যাপারে ফিলিস্তিন, ইসরাইল ও আরববিশ্বে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। চুক্তি সমর্থক একজন প্যালেস্টইনীর নিকট এই চুক্তির অর্থ ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্য প্রথম ছোট পদক্ষেপ। ইয়াসির আরাফাতের কাছেও তাহাই। জার্মান সাপ্তাহিকীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ইতিমধ্যেই তিনি বলিয়াছেন, 'পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করিয়া শীঘ্রই প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হইবে।' চুক্তি সমর্থক একজন ইসরাইলীর কাছে এই চুক্তির অর্থ হইতেছে 'শান্তি ক্রয় করিবার জন্য ফিলিস্তিনীদের সীমিত স্বায়ত্তশাসন লাভ।' প্রধানন্ত্রি আইজ্যাক রবিনের কাছেও তাহাই। চুক্তির বিরোধী ফিলিস্তিনীদের নিকট এই চুক্তির অর্থ হইতেছে বিশ্বাসঘাতকতা।

১৮ জনের নির্বাহী কমিটি হইতে ৫জন পি, এল, ও নেতা ইতিমধ্যেই চুক্তির বিরোধিতা করিয়া পদত্যাগ করিয়াছেন। চরমপন্থী ফিলিস্তিনীদের ৭ টি সংগঠন এবং হামাসসহ পি.এল, ও বহির্ভূত তিনটি সংগঠন চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছে। ইসরাইলী পক্ষে চরম বিরোধিতা অসিতেছে ইহুদি অভিবাসীদের তরফ হইতে। একটি সূত্র মতে, ফিলিস্তিনী স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করিবার চেষ্টা করা হইলে প্রায় ১০ হাজার অভিবাসী অস্ত্র হাতে ইসরাইল প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারে (Newsweek, 13 Sept. 1993)। দীর্ঘ ৫০ বছরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস এবং ইহুদিবাদী চিন্তার প্রভাব সহজেই মুছিয়া যাইবে ইহা পর্যবেক্ষকরা মনে করেন না। বিশ্বকে সাক্ষী রাখিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলেও ইসরাইলী চরমপন্থী এবং অভিবাসীরা চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক বাধা প্রদান করিবে বলিয়া কূটনৈতিক মহল মনে করে।

আরবরাষ্ট্রগুলির মধ্যে সিরিয়ান নেতা হাফেজ-আল-আসাদ প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও গোলান মালভূমি ফিরিয়া পাইবার আগে ফিলিস্তিনীরা পশ্চিম তীর ফিরিয়া পাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি বলিয়াছিলেন, পি, এল, ও সিরিয়া ও জর্ডন একই গতিতে আলোচনা করিয়া ইসরাইলের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে। লিবিয়া সরাসরি চুক্তির বিরোধিতা করিয়াছে এবং আলজেরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়াকে অনুরোধ করিয়াছে এই চুক্তিতে সমর্থন না দিতে। ইসরাইলের অভ্যন্তরে আরব-ইসরাইলীদের অনেকেই এই চুক্তিকে স্বাগত জানাইয়াছে। কিশোর তরুণদের মধ্যে চুক্তির সমর্থক অনেক বেশি।

এই চুক্তির ভালমন্দ পরিণতি সম্পর্কে কিছু বলার সময় এখনও আসে নাই। আরবদিগকে যেভাবে ফিলিস্তিনের বাসভূমি হইতে একদা বিতাড়ন করা হইয়াছে, যেভাবে ইসরাইল জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থার শান্তির প্রস্তাব একের পর এক প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহা স্মরণ করিলে ইহা ভাবা দুরূহ ব্যাপার যে ইসরাইল এই শান্তি চুক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। পশ্চিম তীরসহ সমগ্র ইসরাইলে ইহুদীবাদীরা যেভাবে ইহুদী অভিবাসন কাজ সম্পাদন করিয়াছে তাহাতে মনে হয় দেশের বাহিরে বসবাসরত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুরা চিরকাল উদ্বাস্তুই থাকিয়া যাইবে; তবে আশার কথা ইসরাইল অত সহজে এই চুক্তির দিকে অগ্রসর হয় নাই। অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজায় অনুষ্ঠানরত ইন্তেফাদা বা গণবিক্ষোভ এবং ইসরাইলসহ সমগ্র বিশ্বে পি. এল.ও গেরিলাদের ইহুদী হত্যাযজ্ঞের কষাঘাতে রবিন সরকার অনেকটা বাধ্য হইয়া এই শান্তিচুক্তির প্রতি অগ্রসর হইয়াছে। ইসরাইলের এমন কোনো পরিবার নাই যাহার এক বা একাধিক সদস্য ফিলিস্তিনী গেরিলাদের হাতে প্রাণ দেয় নাই। অতএব দুর্বিষহ এক জীবন হইতে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে ইসরাইল এই চুক্তির প্রতি অগ্রসর হইয়াছে - কোন মানবতা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে নহে। অপরদিকে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার লোকজনও এক অসম যুদ্ধের হাত হইতে নিস্তার লাভের উদ্দেশ্যে এই চুক্তির প্রতি অগ্রসর হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নাই। তাছাড়া বিগত উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাকের পক্ষাবলম্বনের দায়ে প্রায় সমস্ত বাদশাহ ও আমীর শেখ পি. এল. ও. র. উপর বিরক্ত। অপরদিকে ইরানপন্থী হেজবুল্লাহ গ্রুপ আরেক কূটনীতি লইয়া ব্যস্ত যাহা ফিলিস্তিনী স্বার্থকে ব্যাহত করিবে বলিয়া কেউ কেউ মনে করেন। এই চুক্তির ফলে লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী তাহাদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার লাভ করিবে। ইতিমধ্যে তাহাদের এক পুরুষ তাবুর অধিবাসী হিসাবে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছে। হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু সফলতার মুখ দেখে নাই। তাহারা এক ক্যাম্প হইতে অন্য ক্যাম্পে তাড়া খাইয়া ফিরিয়াছে। তাহাদের নারী, শিশু, বৃদ্ধ অকাতরে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে। তাই এই চুক্তি তাহাদের জন্য কিছুটা হইলেও আশার আলো প্রদর্শন করিয়াছে। তাছাড়া ইহাও সত্য, হাওয়ার উপর মানুষ অনেক আস্ফালন করিতে পারে; কিন্তু মাটিতে পা ঠেকাইতে না পারিলে সেই আস্ফালন বা হাত পা ছুঁড়িবার কোনো অর্থ নাই। সবকিছু ঠিকমত অগ্রসর হইলে এই চুক্তি ফিলিস্তিনীদের জন্য আশীর্বাদ বহিয়া আনিবে বলিয়াই মনে হয়। ১৯২০ সাল হইতে ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইন হইতে বিতাড়িত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও খোদ ইসরাইলে বসবাসরত ফিলিস্তিনীদের সংখ্যা প্রায় ৫৪ লক্ষ। তাহাদের একটি খতিয়ান নিম্নরূপঃ ("যায় যায় দিন"-এর সৌজন্যে)।

লেবানন ঃ ৩,৩৮,৯০০;
ইসরাইল ঃ ৬,৪০,০০০;
গাজা উপত্যকা ঃ ৭,২১,০০০;
পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম ঃ ১১,০০,০০০;
জর্ডান ঃ ১৫,৭০,০০০;
সৌদি আরব ঃ ১,৫৬,৬০০;
সিরিয়া ঃ ৩,০১,০০০;
ইরাক ঃ ২৪,০০০;

সংযুক্ত আরব আমিরাত ঃ ৫০,০০০;
কুয়েত ঃ ৫০,০০০;
কাতার ঃ ৩৩,৫০০;
কানাডা ঃ ১৫,০০০;
লিবিয়া ঃ ২৪,০০০;
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ ২,১০,০০০;
বিশ্বের অন্যান্য স্থানে ঃ ১,২১,৩০০।

আফগানিস্তান

আফগান কম্যুনিস্ট পার্টি বা আফগান পিপল্স্ ডেমোক্রেটিক লীগের নেতা ডঃ নজিবুল্লাহ্ বারবাক কারমাল হইতে ক্ষমতা দখল করিয়া সোভিয়েত সহায়তায় দেশ পরিচালনা এবং বিদ্রোহী আফগান মুজাহিদীনদের মোকাবেলায় রত। সোভিয়েত রাশিয়া লক্ষাধিক সৈন্য লইয়া আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মত্ত। মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গ ইহাকে মস্কোর আগ্রাসন বলিয়া আখ্যায়িত করে এবং অর্থ ও অস্ত্রসস্ত্র দিয়া পাকিস্তানে গঠিত মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করে।

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ ক্ষমতায় আসিবার পর তিনি আফগান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এই নিষ্ফল যুদ্ধের বাতুলতা উপলব্ধি করেন। একদিকে সোভিয়েত লোকক্ষয় অপরদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সোভিয়েত প্রেসিডেন্টকে আফগানিস্তান হইতে সৈন্য সরাইয়া আনিবার সিদ্ধান্তে উৎসাহিত করে। ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত নীতির ভ্রান্তির কথা স্বীকার করেন। একটি আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের কথা বলা হইলেও আফগানিস্তান হইতে সোভিয়েত সৈন্য ফেরত আনা আরম্ভ হইয়া যায়। তবে গ্রহণযোগ্য কোনো বিকল্প না পাওয়া পর্যন্ত কিছু সৈন্য কাবুলে রাখিয়া যাইবার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। কাবুলে অবস্থানরত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিকোলাই ইয়োগেবীচেভ বলেন, "কমিউনিস্ট ও মুজাহিদ সম্বলিত একটি সমঝোতামূলক সরকারের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান নিহিত"। তিনি আরও বলেন, "সামরিক ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে না। একমাত্র রাজনৈতিকভাবেই ইহার সমাধান করিতে হইবে"।

অতঃপর আফগানিস্তান, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৮ সালে জেনেভায় যে সমঝোতায় উপনীত হয়, তাহাতে ১৯৮৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত সৈন্য সম্পূর্ণভাবে ফেরত যাইবার সময়সীমা বাধিয়া দেওয়া হয়। সোভিয়েত পররাষ্ট্র বিষয়ক মুখপাত্রসহ আরও অনেকেই নজিবুল্লাহ সরকারকে একলা ফেলিয়া যাইবার বিপদের কথা উল্লেখ করেন, কিন্তু পরে দেখা গেল নজিবুল্লাহর সৈন্যরা আশাতিরিক্ত সফলতা প্রদর্শন করিতেছে। তবে ১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে রুশ সৈন্য অপসারণ করা শুরু হইলে ক্রমশ সরকারি সৈন্য নিস্তেজ হইয়া আসে এবং বিভিন্ন এলাকা মুজাহিদদের দখলে চলিয়া যায়। যতই সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ হয় ততই মুজাহিদদের শক্তি বাড়িয়া যায়। শেষের দিকে মুজাহিদদের গঠিত মজলিশে শূরায় নজিবুল্লাহ সরকারের প্রতিনিধিত্বের একটি দাবি মুজাহিদরা প্রত্যাখ্যান করে। সোভিয়েত বাহিনী মুজাহিদদের হাতে আত্মসমর্পণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অতিদ্রুত অপসারণের কাজ সম্পন্ন করে বিধায় শূরায় নজিবুল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দাবি তেমন গুরুত্ব পায় নাই। ১৫ই ফেব্রুয়ারি শেষ সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের পর জালালাবাদের দখল লইয়া মুজাহিদদের সাথে সরকারি বাহিনীর রক্তক্ষয়ী

সংঘর্ষ হয়। উভয়পক্ষে বিপুল লোকক্ষয়ের বিনিময়ে মুজাহিদ বাহিনী জালালাবাদ দখল করিয়া লয়।

অতঃপর কাবুলের পথে মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হইতে থাকে। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, উজবেক নেতা আহমদ শাহ্ মাসুদের গেরিলা লোকজন অপর একটি গেরিলা দল হেজবে ইসলামী নেতা গুলবদ্দিন হেকমতিয়ারের লোকজন দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। শাহ মাসুদের সশস্ত্র দলটি পথিমধ্যে আক্রান্ত হইলে ৩০ জন সংগ্রামীকে হেজবে ইসলামীর লোকেরা হত্যা করে। ঘটনাটি বিক্ষিপ্ত হইলেও ইহা একটি অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতনের মধ্য দিয়া নজিবুল্লাহ সরকার তথা সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান হয়। নজিবুল্লাহ্ কাবুল হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু কাবুল দখলের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন মুজাহিদ দলগুলির মধ্যে পরস্পর গুলিবিনিময় হয়।

২৮শে এপ্রিল '৯২ অধ্যাপক সিবঘাত উল্লাহ্ মোজাদ্দেদী অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। যদিও কাবুল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে আরম্ভ করে কিন্তু তবুও মোজাদ্দেদীর সমর্থকদের সহিত হেজবে ইসলামী প্রধান গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের বাহিনীর প্রচণ্ড গোলা বিনিময় হয়। তাজিক নেতা কমান্ডার আহমদ শাহ মাসুদ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে ইতিমধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক মুজাদ্দেদী মুজাহিদদের একটি ছোট গ্রুপের নেতা। তিনি ধর্মীয় গোঁড়ামি বিবর্জিত একজন ধর্মীয় পণ্ডিত। ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে তিনি প্রথমে প্রবাসী সরকারের এবং কাবুল দখলের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসাবে নির্বাচিত হন। কাবুলে তাঁহার ক্ষমতার মেয়াদকাল মাত্র দুইমাস। পরে তিনি ক্ষমতা তুলিয়া দিবেন জামাতে ইসলামীর বুরহানউদ্দিন রব্বানীর হাতে। তিনি চারমাস ক্ষমতায় থাকিবেন এবং সেই সময় দেশের নির্বাচনও দিবেন। এদিকে গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের দল হইতে ওস্তাদ ফারুকীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হইতে হেকমতিয়ারের বাহিরে থাকাটা অনেক জল্পনা-কল্পনার জন্ম দেয়। হেকমতিয়ার বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত পাখতুনদের নেতা। তবে ওস্তাদ ফারুকী প্রধানমন্ত্রী হইলেও প্রকৃত ক্ষমতা হেকমতিয়ারের হাতেই থাকে।

নূতন সরকার আফগানিস্তানকে ইসলামী রিপাবলিক হিসাবে ঘোষণা দিয়াছে তবে বিশ্বের সামনে এই দেশের প্রগতিশীল চেহারা তুলিয়া ধরিবার ঘোষণাও দিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও জতিসংঘসহ বিশ্বের যাহারাই মুজাহিদদের সাহায্য করিয়াছে তাহাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং তাহাদের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

রাজনৈতিক বন্ধনের চাইতে উপজাতীয় বন্ধন আফগান সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানে গোত্র ও গোত্রপ্রধান একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকার অধিকারী। অনুগত জিরগাই আধুনিক পার্লামেন্টের ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক পরিচয়ের চেয়ে গোত্রীয় পরিচয় এখানে মুখ্য। মুজাদ্দেদী কিংবা রব্বানী বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত এই আফগানিস্তানকে কিভাবে এক রাখিবেন সেইটা এখন বড় প্রশ্ন। রব্বানী নিজে তাজিক উপজাতির লোক। আহমদ মাসুদও তাই। এরা সংখ্যালঘু কিন্তু হেকমতিয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীন পাখতুনরা সংখ্যাগুরু। মুজাদ্দেদী বা রব্বানী উভয়েই ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান কিন্তু কিভাবে তা বাস্তবায়িত করিবেন তাহাই প্রশ্ন। ইরানের ন্যায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন আফগানিস্তানে সম্ভব নহে,

কারণ এদেশের জনগণ ইরানের ন্যায় রাজনীতি সচেতন নহে। তাছাড়া ইরানের অর্থনৈতিক অবস্থাও স্বচ্ছল ছিল যাহা আফগানিস্তানের ক্ষেত্রে নহে। অধিকন্তু ১৩ বৎসরের সশস্ত্র সংঘাত এদেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করিয়া দিয়াছে। অপরদিকে প্রতিবেশী তুর্কমেনিস্তান, তাজিকিস্তান বা উজবেকিস্তানও চায় না যে, এ দেশ একটি গোঁড়া ইসলামী দেশে পরিণত হোক। আরেকটি বিষয়, পাকিস্তান এবং সৌদি আরব এই দেশের ব্যাপারে আগ্রহী। মুজাদ্দেদীর ক্ষমতা গ্রহণের একদিন পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ কাবুল সফর করেন। তাহার সহিত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আসিফ নেওয়াজও ছিলেন। পাকিস্তানই প্রথম দেশ যে কাবুল সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। আফগানিস্তানে একটি গোঁড়া ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হইলে ইসলামী ব্লকের স্বার্থে আঘাত করিতে পারে, তাই এই ব্লকে পাকিস্তানকে অনেকটা বাধ্য করিয়াছে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার হইতে সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লইতে। সৌদি আরবের স্বার্থ পাকিস্তানের মতোই প্রায়। অধিকন্তু হেকমতিয়ারের মতো রাজতন্ত্র বিরোধী কোনো মহলকে সৌদি আরব সমর্থন করিতে পারে না।

কিন্তু কাবুলে ক্ষমতা গ্রহণের দুই সপ্তাহের মধ্যে মুজাহিদদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির ভিতর ব্যাপক সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। হেজবে ইসলামী দলের নেতা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ার বাহিনীর ক্রমাগত রকেট হামলায় প্রায় দুই হাজার রোক নিহত হয় এবং আহত হয় প্রায় দশ হাজার লোক। বৃষ্টির ন্যায় অঝোরে বর্ষণরত গুলিবিনিময়ের মধ্যে বিদেশী কূটনৈতিকসহ প্রায় দুই লক্ষ লোক কাবুল ত্যাগ করে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের পর হেকমতিয়ার অন্তর্বর্তী সরকারকে তিনটি শর্ত দিয়াছিল। এইগুলি ছিল- (১) দুই মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা; (২) এক বৎসরের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দেওয়া; (৩) উজবেক মিলিশিয়াদেরকে রাজধানী কাবুল হইতে দ্রুত প্রত্যাহার করা। সিবঘাত উল্লাহ্ সরকার এইসব শর্ত বাস্তবায়নে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন, কারণ গত ১৩ বৎসরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দরুন দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত। পরবর্তীতে শক্তিশালী গেরিলা সংগঠন হেজবে ইসলামীর সহিত সরকারের দ্বন্দ্ব অন্যান্য দলগুলির মধ্যে ব্যাপক অবিশ্বাস ও রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি একটি যৌথ শান্তিবাহিনী গঠনের উদ্যোগ নেয়। দশ দিন আলোচনার পর সরকার ও হেকমতিয়ারের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বিরতির চুক্তির কথা ঘোষণা করা হয়। ৫ হইতে ৭ হাজার সদস্য লইয়া গঠিত শান্তিবাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করিবে এবং কাবুলসহ তিনটি প্রদেশের সেনা কর্মকর্তারা বিশেষ ভূমিকায় থাকিবেন। অতএব কাবুলে সাময়িক জনসমাগম দেখা দেয় এবং দোকানপাট খুলিতে আরম্ভ করে।

মধ্যস্থতাকারী পাকিস্তান সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত স্থিতিশীলতার কথা বলিলেও শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের পর তাহা আশানুরূপ কার্যকর হয় নাই। হেকমতিয়ার তাহার লোকদের মধ্যে পুনরায় অস্ত্র বিতরণ করেন, নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নগরীতে প্রবেশের পথে গেরিলারা অস্ত্র বহন করে এবং কাবুলের প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রশিদ দোস্তামির মিলিশিয়া বাহিনীকে আক্রমণের পরিকল্পনা করে। জালালাবাদ শহরের ডেপুটি গভর্নর ডঃ আশিক হেকমতিয়ার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করিলে সমঝোতার কাঠামো আরও নড়বড়ে হইয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে দীর্ঘ ১৩ বৎসরের সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষা এবং লোক ক্ষয়ের পরেও

দেশে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে বাধা কোথায়। গত যুদ্ধে মোট আফগান জনগোষ্ঠীর ১ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে ২০ লক্ষ লোক নিহত হয়। পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি ৮ জনে ১ জন নিহত এবং প্রতি ৮ জনে একজন পঙ্গু হইয়াছে। একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের দিকে বর্তমান সরকার অগ্রসর হইলেও বিশেষত দুইটি কারণে তাহা সম্ভর হইতেছে না। প্রথমত গত ১৩ বৎসরে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভাঙ্গিয়া একটি অখণ্ড জাতিসত্তা ভিত্তিক দেশ গঠনের উদ্যোগ লওয়া হইলেও বিভিন্ন কারণে তাহা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। গেরিলা দলগুলির সরকার বিরোধী রক্তক্ষয়ী ধর্মভিত্তিক যুদ্ধ আফগান উপজাতিসমূহের হাজার বৎসরের পুরাতন বিরোধকে বরং বহুগুণে উস্কাইয়া দিয়াছে। একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রাচীন ধ্যান-ধারনা তাহাদিগকে একক জাতি সত্তায় একত্রিত হইতে বাধা প্রদান করিয়াছে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দল উপজাতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত হইয়া নজিবুল্লাহ্ সরকারের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে-একক মুজাহিদ বাহিনী হিসাবে নহে। তাজিক গোত্রীয় নেতা আহমদ শাহ মাসুদ উত্তর আফগানিস্তানের তাজিক নেতা হিসাবে পরিচিত। দক্ষিণ অঞ্চলের নেতা গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার একজন পাখতুন নেতা হিসাবে সমধিক পরিচিত। পূর্ব হইতেই সরকারি মিলিশিয়া বাহিনীতে এবং সেনা ও বিমান বাহনীতে তাজিকদের প্রাধান্য ছিল। এই সুবাদেই আহমদ শাহ মাসুদের সাথে আরেক তাজিক নেতা জেনারেল দোস্তামের গোপন সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষণাঞ্চলে নিয়োজত জেনারেল দোস্তাম এবং তৎসহ আহমদ শাহ মাসুদ সর্বত্র তাজিক প্রাধান্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট হন। এই সঙ্গে তাহারা সংখ্যাগুরু পাখতুন ও তাহাদের নেতা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে বাধা দিতে তৎপর হন। পরবর্তীতে হেকমতিয়ার জেনারেল দোস্তামকে সাবেক সরকারের সহযোগী হিসাবে চিহ্নিত করিয়া তাহাকে কাবুল হইতে সরিয়া যাইবার শর্ত জুড়িয়া দেন। এই শর্ত বর্তমান সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আহমদ শাহ মাসুদ বরাবরই প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছেন। তাজিক ও পাখতুন গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান কালজয়ী সংঘাতই বর্তমান আফগান বাহিনীকে পরিচালিত করিতেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিসত্তায় রূপান্তরিত হইতে বাধা দিতেছে।

সিবঘাতুল্লা মুজাদ্দেদী দুইমাস অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান থাকিবার পর বোরহানুদ্দীন রব্বানী আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। নজিবুল্লাহ্ সরকার পতনের পর ইহারা সবাই আফগানিস্তানকে একটি আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে চান, যাহার অগ্রযাত্রা আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত হইবে। কিন্তু হেকমতিয়ারের সহিত তাহাদের বিরোধ এই জায়গাতেই। হেকমতিয়ার কাবুলে একটি পূণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করিতে চান। প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দীন রব্বানী আধুনিক ধারায় একটি আফগান মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় আফগান জনগণের সমর্থন লাভ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ পাখতুন গোত্রীয় নেতারা তাহাদের গোত্রীয় প্রাধান্যের দ্বারা আফগান জনগণকে ইসলামের নামে একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিতে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ; তাই জনগণ আর সেই পথে যাইতে রাজী নহে।

১৯৮৪ সালে আফগানিস্তানের সামন্তীয় ভূমি ব্যবস্থাকে ভাঙ্গিয়া সংস্কারের উদ্যোগ লওয়া হয়, এর ফলে সরকার দীর্ঘদিনের বঞ্চিত ও উপেক্ষিত কিছু জনগণের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আফগান ভূ-স্বামীরা এই সংস্কারের বিরোধীতা করেন। ফলে সরকার বিরোধী

আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ১৯৮৭ সালে ইউ এস এ(দি ইসলামিক ইউনিয়ন অব আফগান মুজাহেদিন) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল ইসলামের নামে তাহাদের শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধারে অধিক নিয়োজিত থাকে। মৌলবাদী কিছু মুজাহিদদের সঙ্গে ইহারা একান্ত হইয়া কাজ করে। নজিবুল্লাহ্ সরকারের পতনের পর আফগানিস্তানের সমাজ বিন্যাস প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। ১৩ বৎসর দেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন হওয়ায় সামন্তপতিদের অনুকূলে বর্তমান সরকারের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ লওয়া সম্ভব হইতেছে না। হেজবী ইসলামী দলের প্রধান হেকমতিয়ারের অসন্তোষ মূলত এইখানেই। তবে হেকমতিয়ার যতই শক্তি প্রদর্শন করুক ফলাফল একই হইবে। তাই বর্তমান অবস্থা মানিয়া সরকারের সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টিই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে বলিয়া পর্যবেক্ষণগণ মনে করেন।

আফগানিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী সংগঠনসমূহ ঃ

কাবুলে সোভিয়েত প্রভাবাধীন ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান (ডি আর এ) গঠিত হইবার পর ইসলাম পন্থী আফগান জনগণ বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়ে। এই জনগণ মূলত পাকিস্তান ও ইরানে শিকড় গাড়িয়া উপজাতীয় ভিত্তিতে গঠিত ৮টি গেরিলা দলে বিভক্ত হইয়া সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে। সবগুলিকে একত্রে মোজাহিদ বাহিনীও বলা হয়। এই ৮টি ইসলামী গেরিলা দল নিম্নরূপ ঃ

১. **জমিয়ত-ই- ইসলামী, আফগানিস্তান** (ইসলামিক সোসাইটি) এই দলের সৈন্যরা আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই দলের প্রধান আহমেদ শাহ মাসুদ বর্তমানে কাবুল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

২. **হেজবে- ইসলামী** (ইসলামি পার্টি) গোঁড়া ধর্মীয় নেতা গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারের নেতৃত্বাধীন এই দলটিকে সবচাইতে সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত বিদ্রোহী গ্রুপ বলিয়া মনে করা হয়। গত ১৩ বৎসরে এই দলটি সবচাইতে বেশি পরিমাণে মার্কিন সাহায্য পাইয়াছে। এই দলের একটি অংশ দল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহারাও হেজব-ই- ইসলামী নামে পরিচিত। আফগানস্তানের পূর্বাঞ্চলে তাহাদের সৈন্যদের অবস্থান সীমিত।

৩. **ইত্তেহাদে -ইসলামী** (ইসলামিক ইউনিটি)। ইন্টারন্যাশনাল মুসলিম ব্রাদারহুড নামে একটি জঙ্গী আন্তর্জাতিক গ্রুপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এই দলটি সৌদি আরবের গোঁড়া ইসলামী দলগুলির নিকট হইতে প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকে। এই দলটি আফগানিস্তানে তেমন শক্তিশালী নহে বলিয়া ধারণা করা হয়।

৪. **হরকত-ই-ইনকিলাব-ই-আফগানিস্তান** (মুভমেন্ট ফর ইসলামী রেভুল্যুশন)। মুসলিম ধর্মীয় নেতা মৌলভী নবী মোহাম্মদীর নেতৃত্বাধীন এই দলটি এক সময়ে আফগানিস্তানে সবচাইতে শক্তিশালী প্রতিরোধ গ্রুপগুলির অন্যতম ছিল। কিন্তু ব্যাপক দুর্নীতির কারণে এই দলের প্রভাব হ্রাস পায়।

৫. **মাহাজ-ই-মিলি-এ ইসলামী** (ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্ট অব আফগানিস্তান)। এই দলটি আফগানিস্তানের সুফীবাদীদের ধর্মীয় নেতা সৈয়দ আহমদ গেইলানীর নেতৃত্বাধীন। আফগান রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত এই নেতা প্রাক্তন বাদশাহ জহির শাহের প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় সমর্থক।

৬. **জেভা-ই-নেজাত-ই-মিলি** (আফগান ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট)। কাবুল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী দর্শন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সিবঘাতুল্লাহ মুজাদ্দেদীর নেতৃত্বাধীন এই দলটি আফগানিস্তানের ক্ষুদ্রতম বিদ্রোহী গ্রুপগুলির অন্যতম।

৭. **হেজব-ই-ওয়াহদাত** (ইসলামিক কোয়ালিশন কাউন্সিল অব আফগানিস্তান) ইহা ইরানভিত্তিক ৮ টি প্রধান গেরিলা গ্রুপের একটি কোয়ালিশন। এই গ্রুপগুলির অধিকাংশই আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু শিয়াদের লইয়া গঠিত। ইরানের দৃঢ় সমর্থন পুষ্ট এই কোয়ালিশনের শক্তি আফগানিস্তানের পশ্চিমে ও মধ্যাঞ্চলে সীমিত।

৮. **হরকত-ই-ইসলামী আফগানিস্তান** (ইসলামিক মুভমেন্ট অফ আফগানিস্তান) এবং গুরু-ই-ইত্তেফাকে ইসলামিয়া: এই দুইটি শিয়া প্রধান ছোট গ্রুপের সদর দফতর পাকিস্তানে; বর্তমানেও ইহাদের তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে।

*   *   *   *

আফগানিস্তানে সরকারি বাহিনী এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের হেজবে ইসলামী দলের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। প্রচণ্ড গোলাগুলিতে শত শত লোক নিহত হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ আফগানিস্তানের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দীন রাব্বানী এবং গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে এক আলোচনা সভায় একত্রিত করেন। উভয়ের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি হয় এবং চুক্তি মোতবেক গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারকে আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

আলজেরিয়া

মূল গ্রন্থে আলজেরিয়াকে আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য এলাকার বাহিরে বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং তাই এই রাষ্ট্র সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয় নাই। তবে আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আলজেরিয়া অত্যাধুনিক এবং সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভকারী একটি মুসলিম দেশ হিসাবে এইস্থলে ভূমিকায় এই দেশ সম্পর্কে যৎসামান্য তথ্য দেওয়া হইল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য এলাকার ন্যায় আলজেরিয়াও ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুদ্ধ শেষে ইহা ফ্রান্সের উপনিবেশ হিসাবে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে আলজেরিয়ার জনগণ ফরাসি উপনিবেশিক নাগপাস হইতে মুক্তি পাইবার লক্ষ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করে। ফরাসি সরকার আন্দোলন দমন করিবার কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করে। কিন্তু যতই শাসকবর্গ আন্দোলন থামাইবার জন্য কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করে, ততই স্বাধীনতাকামীদের আন্দোলনের ধার তীব্রতর হইতে থাকে। অতঃপর ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (এফ এল এন) পতাকাতলে সমস্ত মুক্তিকামী জনগণ একত্রিত হয় এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পরিশেষে ১৯৬২ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং ফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া আলজেরিয়া ত্যাগ করে। স্বাধীনতা লাভের পর আহমদ বেন বেল্লাহ আলজেরিয়ার ক্ষমতায় বসেন। চীনের সহিত সেইসময় আলজেরিয়ার গভীর সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। কিন্তু ১৯৬৫ সালে এক সোভিয়েত সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে বেন বেল্লাহ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং তাহার জায়গায় কর্নেল হুয়েরি বুমেদীন ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৬৭ সালে আলজেরিয়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক চুক্তিস্বাক্ষর করে। আলজেরিয়ার ক্ষমতা মঞ্চে আবির্ভূত হয় একদলীয় সমাজতান্ত্রিক সরকার। কিন্তু

সমাতজন্ত্রের প্রতি দুর্বল এই সরকার আলজেরিয়াতে ক্ষুধা এবং বেকারত্ব সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান দিতে পারে নাই। এমনি পরিস্থিতিতে ইসলামিক স্যালেভেশন ফ্রন্ট নামে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ঘটে।

নেতৃবৃন্দের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট নামে এই ধর্মীয় দলটি তাহাদের অবস্থান ধীরে ধীরে দৃঢ় করিয়া তোলে এবং ধর্মের প্রতি দুর্বল জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভ করে। ফলশ্রুতিতে গত ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৯১তে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের প্রথম দফায় ২৩১টি আসনের মধ্যে স্যালভেশন ফ্রন্ট ১৮৮টি আসন লাভ করে। পরবর্তী ১৬ই জানুয়ারির দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে তাহাদের সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৯৯ টি আসনের মধ্যে মাত্র ২৮টি আসনের। অনুমান করা হইল এই আসনগুলি তাহারা সহজেই দখল করিয়া লইবে। কিন্তু উহার আগেই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়া যায়। প্রেসিডেন্ট বেনজাদীদ পদত্যাগ করিবার পর নূতন করিয়া সংকটের সৃষ্টি হয়। বেনজাদীদ পদত্যাগ করিবার পর ক্ষমতা চলিয়া যায় সামরিক বাহিনীর হাতে। প্রবাসী একজন জাতীয়তাবাদী নেতা মোহাম্মদ বদিয়াফকে সরকার প্রধান করিয়া বেসামরিক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বেন বেল্লাহ তাঁহাকে রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর জেলে থাকিবার পর বাদিয়াফ স্বেচ্ছা নির্বাসন লইয়া মরক্কো চলিয়া যান এবং ২৭ বৎসর পর এই প্রথম দেশে ফিরিয়া আসেন।

উপদেষ্টা পরিষদ প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন বাতিল করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। এই অবস্থায় স্যালভেশন ফ্রন্টের নেতারা প্রথমে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিষয়ে চিন্তা করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সমস্ত বিরোধীদলকে একত্রিত করিয়া গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলা যাইবে। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হওয়ায় স্যালভেশন ফ্রন্ট সহিংস আন্দোলনে জড়াইয়া পড়ে। সরকার ফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে দমন নীতি প্রয়োগ করে এবং বহু কর্মীকে জেলে পাঠায়। সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রিত উপদেষ্টা পরিষদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে। এই পরিষদ হাঙ্গামার আশংকায় গত ১৭ই জানুয়ারি রাজধানী আলজিয়ার্সের প্রধান মসজিদে হাজার হাজার মুসল্লীকে নামাজ আদায় করিতে দেয় নাই। নজিরবিহীন সেনা বেষ্টনীর মাধ্যমে তাহারা মসজিদ ঘেরাও করিয়া রাখে।

মুসল্লীদের নামাজ আদায়ে বাধা দেয়ায় তাহারা ক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। অপরদিকে ক্ষমতাসীন পরিষদ কিছুতেই জনগণের কোন ধরনের জমায়েতকেই মানিয়া লইতে পারিতেছে না। তাহারা গণ-অভ্যুত্থানের আশংকা করিতেছে। অনুমান করা যায়, গোটা পৃথিবীতে পরিবর্তনের হাওয়া আলজেরিয়াকেও নাড়া দিয়াছে। জনগণ এখন চাপাইয়া দেওয়া যে-কোনো পরিস্থিতির বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক। সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রেসিডেন্ট সাদলি বেনজাদিদকে জোর করিয়া সরাইয়া দিবার বিষয়টি সেখানকার জনগণ মানিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অপরদিকে আপামর জনসাধারণ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রন্টের পতাকাতলে আসিয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

ইসলামী স্যালভেশন ফ্রন্ট যদি ক্ষমতায় আসিয়া দেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তবে কি আলজেরিয়ার মূলগত সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে? এই দলের মধ্যেই এই ব্যাপারে দুইটি ধারা বিদ্যমান। একটি অংশ মনে করে আলজেরিয়ার জনগণই ঠিক

করিবে দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইবে কি না। অন্যদিকে কট্টরপন্থী অংশ মনে করে দেশে এখনই ইসলাম কায়েম হওয়া প্রয়োজন।

অধুনা আলজেরিয়াকে শান্ত মনে হইলেও কতদিন এই অবস্থা বিরাজ করিবে তাহা বলা কঠিন। সেনাবাহিনী এই পরিস্থিতিতে জোর করিয়া ক্ষমতা ধরিয়া রাখিতে থাকিলে বর্তমান শাসকগণ একটি গণ-অভ্যুত্থানের মুখোমুখী হইতে পারেন।

ইরিত্রিয়া

ইসলামের প্রাথমিক যুগের আবিসিনিয়া বর্তমানের ইরিত্রিয়া। লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত আবিসিনিয়ায় মুসলমানরা প্রথম হিজরত করেন। বাদশাহ নাজ্জাশী তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ৬২২ সালে মহানবীর (সঃ) সাথে মুসলমানেরা মদীনায় হিজরত করিলে আবিসিনিয়ার ইতিহাস মুসলিম ঐতিহাসিকদের অনেকটা আড়ালে চলিয়া যায়।

মধ্যযুগের অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ইরিত্রিয়া স্বাধীন দেশ হিসাবে টিকিয়া থাকে। আধুনিককালে ইতালি প্রথমে পার্শ্ববর্তী ইথিওপিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করে এবং ১৯৩৫ সালে হঠাৎ ইরিত্রিয়া অধিকার করিয়া ইহাকে ইথিওপিয়ার সহিত মিলাইয়া লয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বৃটেন পরাজিত ইতালির নিকট হইতে দুইটি দেশই দখল করিয়া লয়। পরে ১৯৫২ সালে ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাশী সংবিধান সংশোধন করিয়া ইরিত্রিয়াকে ইথিওপিয়ার অঙ্গ হিসাবে একীভূত করেন। ইহার পর হইতে বস্তুত মুসলিম প্রধান এই দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় যদিও ১৯৬১ সাল হইতে এই আন্দোলন বিশ্ববাসীর নজরে আসে। হাইলে সেলেশীর পর কর্নেল হাইলে মরিয়ম ইরিত্রিয়ায় রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত করিয়াও তথায় স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিতে ব্যর্থ হন।

১৯৬১ সালে সূচিত ঘনঘোর স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯৯১ সালের মে মাসে ইরিত্রিয় গেরিলা বাহিনীর ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারা দখলের মধ্য দিয়া শেষ হয়। তারপর হইতে গেরিলারা দেশ শাসন করিলেও স্বাধীনতাকে বৈধ রূপ দেওয়ার জন্য তাহারা গণভোটের ব্যবস্থা করে। এইভাবে ৯৮.৮৫ ভাগ ইরিত্রিয়বাসী স্বাধীনতার স্বপক্ষে ভোট দেয়। স্বাধীনতার জন্য ইরিত্রিয়ার লোকেরা চরম মূল্য দিয়াছে। দীর্ঘ ৩০ বছরের গেরিলা যুদ্ধে ১ লক্ষ ৬০ হাজার গেরিলা এবং ৪০ হাজার বেসামরিক লোকের আত্মদানের মধ্যদিয়া ইরিত্রিয়াবাসী প্রমাণ করিয়াছে যে স্বাধীনতার চাইতে মূল্যবান আর কিছু নাই।

ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র

মুসলিম বিশ্বের সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দেশ ইয়েমেন - উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন নামে সুদীর্ঘকাল দ্বিধা-বিভক্ত থাকিবার পর ১৯৯০ সালের মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে তাহাদের একত্রীকরণ সম্পন্ন করে। দেশটির নূতন নামকরণ হয় ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র। উত্তর ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আইন পরিষদের নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদ লইয়া দেশের নবযাত্রা শুরু হয়। সানা সংযুক্ত ইয়েমেনের রাজধানীর সম্মান লাভ করে এবং এডেন পরিগণিত হয় বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে।

এই অন্তর্বর্তীকালীন সংসদের তিন বৎসর কার্যক্রম চলিবার পর গত ২৭শে এপ্রিল '৯৩ সংযুক্ত ইয়েমেনের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১লা মে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ঘালি আবদুল্লাহ

সালেহ্-এর জেনারেল পিপলস্ কংগ্রেস (জি পি সি) বৃহত্তম দল হিসাবে আবির্ভূত হয়। সংসদের ৩০১টি আসনের মধ্যে জি পি সি পাইয়াছে ১২১টি আসন, ইসলামী দল আল ইসলাহ পাইয়াছে ৬২টি আসন। জি পি সি'র শরীক দল দ্য ইয়েমেন সোশ্যালিস্ট পার্টি জিতিয়াছে ৫৬টি আসনে। ইহা ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পাইয়াছে ৪৭টি আসন, ইরাক সমর্থিত বাথ ইসলামী দল আল হক ৩টি এবং নাসের পন্থী দল লাভ করিয়াছে ১২টি আসন।

নির্বাচনের স্বল্প আসনে জয়ী দলগুলি কারচুপি ও সহিংসতার অভিযোগ উত্থাপন করিলেও ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র নির্বাচনী পথ ধরিয়া গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হইতেছে ইহাই আশার কথা।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন

সম্প্রতি পাকিস্তানের করাচী নগরীতে ও আই সি'র ২১তম পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হইল। ৫১ সদস্যবিশিষ্ট এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের নব নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী বলখশের মাজারী। বিশ্ব মুসলিমদের সমস্যাবলী লইয়া কুড়িটিরও বেশি প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে রহিয়াছে বসনিয়া-হারজেগোভিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান, যদিও সংস্থার সদস্যদের তরফ হইতে কোনো উদ্যোগের বিষয় উল্লেখ নাই। সম্মেলনে বসনিয়ায় মুসলিম নিধন তদন্তের জন্য একটি আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তবে প্রস্তাবটিকে কার্যকর করিবার জন্য যে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো দরকার ও আই সি'র পক্ষ হইতে তাহা করা হইবে কিনা তাহার কোনো উল্লেখ নাই। অপর এক প্রস্তাবে কুয়েত আক্রমণের দায়ে সম্মেলন ইরাকের নিন্দা করিয়াছে এবং কুয়েতকে ক্ষতিপূরণ দিতে ইরাকের প্রতি দাবি জানানো হইয়াছে। কাশ্মীরী মুসলমানদের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্যও জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে। সোমালিয়ার দুর্গত মানবতার বিষয়টি সম্মেলনে উল্লিখিত হইলেও মৃত্যু পথযাত্রী লক্ষ লক্ষ সোমালিয়কে রক্ষা করিবার জন্য ও আই সি'র বড় ধরনের কোনো তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। সম্মেলনে ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গিবার নিন্দা করা হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনেতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপেরও সুপারিশ করা হয়।

করাচি বৈঠকে মুসলিম মৌলবাদী তৎপরতা সম্পর্কে মিসর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া ও তুরস্ক রীতিমত সোচ্চার ছিল। তবে এই ব্যাপারে কোন প্রস্তাব না লওয়া হইলেও ভবিষ্যতে এই বিষয় লইয়া আরও আলোচনা অনুষ্ঠানের আভাস পাওয়া গেল।

তবে সবচাইতে হতাশাব্যঞ্জক বিষয় হইল মুসলিম বিশ্ব বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সন্ত্রাসী সমস্যায় নিমজ্জিত থাকিলেও সদস্য রাষ্ট্রগুলির এই ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হইল না। সবকিছুতেই জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া দায় সারা গোছের প্রস্তাব লওয়া হইল, যদিও সদস্যরা জানেন যে জাতিসংঘের দ্বারা মুসলমানদের কোনো সমস্যার সমাধান হইবে কিনা এই ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। এইভাবে চলিতে থাকিলে মুসলিম উম্মাহ এই সংস্থার উপর অচিরেই আস্থা হারাইয়া ফেলিবে।

ডঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৩ই অক্টোবর, ১৯৯৩

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

অত্র গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত পরিবেশন করা হইয়াছিল। ১৯৯৩ সালে ইরাক-ইরান যুদ্ধের অবসান, পিএলও- ইসরাইল শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসান ও ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে সম্মিলিত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ও তাহাদের সাহায্যদাতাগণ কর্তৃক জাতিসংঘের মাধ্যমে নিরস্ত্র করিবার দ্বারা ধারণা করা হইয়াছিল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির সুপ্রভাত অত্যাসন্ন। কিন্তু বৎসর ঘুরিবার পূর্বেই দেখা গেল এইগুলি মরুভূমির মরীচিকা মাত্র। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি এখনো সুদূর পরাহত। ইসরাইলী এক আততায়ীর হাতে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবীনের হত্যাকাণ্ড এবং নির্বাচনে চরমপন্থী বেনজামিন নেতানিয়াহুর প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় ফিলিস্তিন শান্তিচুক্তি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অপরদিকে তুরস্ক, আলজেরিয়া, মিশর, ফিলিস্তিন, লেবানন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে ইসলামী চরমপন্থীদের জনসমর্থন এবং তাহাদের সশস্ত্র কার্যকলাপের দ্বারা পাশ্চাত্য জাতি ও তাহাদের মিত্ররা চরম অস্বস্তির মধ্যে নিপতিত। এই পটভূমিতে বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহের উপর সীমিত আকারে আলোকপাত করা হইল।

ইরাক (উপসাগরীয় যুদ্ধ) ঃ

১৯৯৩ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত যুদ্ধ বিরতির শর্তসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হইল আন্তর্জাতিক তদারকিতে ইরাকের পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসমূহ খুলিয়া ফেলা বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইরাকের এই অস্ত্র পরিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া ইরাক-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব সম্প্রতি একটি মারাত্মক সংঘাতের দিকে মোড় নেয়। ১৯৯১ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর আক্রমণের মুখে ইরাক সাময়িকভাবে পিছু হটিলেও তাহা উপসাগরীয় এলাকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতিকে ঠাণ্ডা করিতে পারে নাই। বরং যুক্তরাষ্ট্র-ইরাক সংঘাত নূতন রূপ লাভ করিয়াছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কর্তৃক সূচীত উপসাগরীয় যুদ্ধের পর তিনি নির্বাচনে পরাজয়বরণ করিলে ডেমোক্র্যাট দলীয় বিল ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট হিসাবে জয়লাভ করিলেও মার্কিন নীতিতে কোন পরিবর্তন আসে নাই।

১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পরপরই জাতিসংঘে ইরাক সংক্রান্ত একটি বিশেষ কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনের কাজ হইল ইরাকের হাতে মজুদ মারাত্মক বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্রসম্ভারের ধ্বংস নিশ্চিত করা। কিন্তু অস্ত্র পরিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া ইরাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বিরোধের অবসান গত সাত বৎসরেও হয় নাই। বরং বিষয়টিকে লইয়া খোদ মার্কিন মিত্রদের মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। ইরাক চেষ্টা করিয়াছে অস্ত্র পরিদর্শন সংক্রান্ত কমিশনের ক্ষমতাকে কাট ছাট বা সীমিত করিতে। সেই ক্ষেত্রে তাহারা সফল হইলে ইরাক অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার ঘনিষ্ট মিত্র হিসাবে

পরিচিত বৃটেন নাজুক অবস্থায় পড়িবে। আর উহার ফলে নিশ্চিতভাবেই জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কর্তৃত্বকারী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতভিন্নতার সৃষ্টি হইবে, যাহার পরিণতিতে হয়তো গোপন অস্ত্র কর্মসূচি বাদ না দিলেও ইরাকের উপর হইতে জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার পথ প্রসারিত হইবে।

পশ্চিমা কূটনীতিক বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলিতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ইরাকের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক অথবা সীমিত সামরিক ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ থাকিবে। এই ধরনের ব্যবস্থার ফলে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে হয়তো অন্য কোন অভিযান হইতে নিবৃত রাখা যাইবে, কিন্তু দুর্বল করা যাইবে না। তাহাদের মতে এই জন্য প্রয়োজন সাদ্দামের বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিবার লক্ষ্যে একটি সর্বাত্মক আক্রমণ।

বর্তমানে ইরাকের অস্ত্র পরিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া এক ধরনের চোর-পুলিশ খেলা চলিতেছে। সাত বৎসর পূর্বে অস্ত্র পরিদর্শন শুরু করিবার পর হইতেই এই বিপজ্জনক খেলা চলিতেছে। কিন্তু ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত্র পরিদর্শকগণ প্রথমবারের মত ইরাকের গোপন অস্ত্র কর্মসূচি সনাক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। খবরে প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট কিছু ভবনের নিচে ইরাকী গোয়েন্দা বিভাগের ট্যাংকসমূহ এবং সাদ্দাম হোসেনের প্রতি অনুগত রেভল্যুশনারী গার্ড-এর ইউনিটগুলিতে গোপন অস্ত্র কর্মসূচি চলিতেছে। গোয়েন্দা সংস্থার ঘাটি ও গার্ড ক্যাম্পগুলিতে দলিলপত্র, অস্ত্র উৎপাদনের সরঞ্জাম, অস্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মজুদ ও তৈয়ারী ফিনিসড অস্ত্র হাতে নাতে ধরা পড়িয়াছে।[১] পরিদর্শকদের মতে এই গোপন স্থানগুলিতে এমন কিছু দলিলপত্র পাওয়া যায় যাহাতে দেখা যায় সাদ্দাম হোসেন মিসাইলের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির চেষ্টা করিতেছেন। নার্ভ-গ্যাস উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত কি কি জিনিস আমদানি করা হইয়াছে তাহারও একটি বিস্তারিত দলিল পরিদর্শকগণ খুঁজিয়া পান বলিয়া প্রকাশ। এই ঘটনার মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্বে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকগণ তাহাদের নিয়মিত পরিদর্শনের অংশ হিসাবে বাগদাদের একটি ল্যাবরেটরীতে যান। তাহারা দেখিয়া অবাক হন সেখানে লোকজন ব্যাগে করিয়া জীবন-বিধ্বংসী বায়োলজিক্যাল এজেন্ট বহন করিতেছে। এই বায়োলজিক্যাল এজেন্টস ল্যাবরেটরীতে লইয়া গিয়াছেন পরীক্ষার জন্য।

ইরাক সংক্রান্ত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ কমিশন অনেক আগে হইতেই মনে করে ইরাক যে পথে আগাইতেছে তাহা সুবিধাজনক নহে। ইহা খোদ ইরাকের জন্যই বিপর্যয় ডাকিয়া আনিতে পারে। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকদের লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোড়া হইয়াছে, তাহাদিগকে নানাভাবে হয়রানি করা হইয়াছে বলিয়া কমিশন অভিযোগ করিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত অভিযোগ যাচাই করিবার সুযোগ খুবই সীমিত। কারণ ইরাক বরাবরই এইসব অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। এইদিকে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইরাকের প্রতি সহানুভূতিশীল এক ব্যক্তি জাতিসংঘের একটি হেলিকপ্টার হাইজ্যাক ও তাহা মাটিতে নামাইতে বাধ্য করে।

অস্ত্র পরিদর্শন কমিশন আরও অভিযোগ করিয়াছে যে, ইরাকের পক্ষ হইতে ওজর আপত্তির কারণে সংক্ষিপ্ত নোটিশে পরিদর্শনের কর্মসূচির প্রায় অর্ধেকই বাতিল করিতে হইয়াছে। পরবর্তী সময়ে অস্ত্র পরিদর্শকগণ অস্বীকার করেন যে, তাহাদের সহিত প্রতারণা

---

১. *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত এইসব পরিদর্শকদের মতামত কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তাহা বিতর্কের বিষয়।*

ও শঠতার জন্য ইরাক একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া তৈয়ার করিয়াছে। তাহারা একটি মুরগির খামার হইতে এক বাক্স বোঝাই স্পর্শকাতর দলিল দস্তাবেজ উদ্ধার করিয়াছেন। এই দলিলগুলি এইখানে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া তাহারা অভিযোগ করেন। অপরদিকে আরও অন্যান্য কাগজপত্র কূটনৈতিক ইমিউনিটির সুযোগ লইয়া বাগদাদের ফিলিস্তিনী দূতাবাসে রাখা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে।

পরিদর্শকদল আরও অভিযোগ করিয়াছে যে, ইরাক ইতোমধ্যে নূতন কৌশলের আশ্রয় লইতেছে। তাহারা বলিতেছে জাতিসংঘের ইরাক সংক্রান্ত বিশেষ কমিশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। ইরাকের বক্তব্য হইতেছে, তাহাদের সকল অস্ত্র ধ্বংস করিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কমিশন মূলতঃ তাহাদের সবচাইতে গোপন ঘাটিগুলির উপর গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য কাজ করিতেছে। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর মাসে ইরাক আকস্মিকভাবে ঘোষণা করে যে, তাহারা অস্ত্র পরিদর্শক হিসাবে আর মার্কিন নাগরিকদের উপস্থিতি অনুমোদন করিবে না। কমিশনের সাবেক প্রধান রলফ ইকিউজের মতে, ইহার মাধ্যমে ইরাক একটি বিকল্প কৌশল অবলম্বন করিতে চাইতেছে। যাহার ফলে সবচেয়ে গোপন অস্ত্র কর্মসূচি বাদ না দিয়াও জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যাপারে কথাবার্তা বলা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

কমিশনের সাবেক প্রধানের মত পরবর্তী চেয়ারম্যান রিচার্ড বাটলারকেও শক্ত রশির উপর দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে অনিশ্চিতভাবে হাঁটিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেন উভয়েই ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা ভাঙিয়া পড়িবার ব্যাপারে শংকিত। সুযোগ পাইলেই তাহারা ইরাকী নেতার উপর তাহাদের আস্থাহীনতার কথা বলিবার চেষ্টা করে। সাদ্দাম যতদিন ক্ষমতায় থাকিবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ততদিন ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখিতে চায়। এই ক্ষেত্রে কমিশন কি খুঁজিয়া পাইল না পাইল তাহা ব্যাপার নহে। কিন্তু গত বৎসরের আগস্টে বৃটেনের প্রভাবশালী সংবাদপত্র গার্ডিয়ানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাটলার এই ধরনের সম্ভাবনার কথা দৃঢ়ভাবে বাতিল করিয়া দেন।

ইতোমধ্যে ইরাকের কূটকৌশল ও ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ইরাক প্রশ্নে মার্কিন নীতি আন্তর্জাতিকভাবে বিরোধিতার মুখে পড়ে। এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায় ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের ভূমিকায়। এই তিনটি দেশ বর্তমানে প্রকাশ্যে ইরাক সংক্রান্ত মার্কিন অবস্থানের বিরোধিতা করে।

গত জুন ১৯৯৭ অস্ত্র পরিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া ইরাক ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক সংঘাতময় বিরোধের সৃষ্টি হয়। ইরাক তাহার দেশে অস্ত্র পরিদর্শনের নামে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া অস্ত্র পরিদর্শন বন্ধ করিয়া দেয়। ইরাক দাবি করে অস্ত্র পরিদর্শক দলে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ি সদস্যদের সংখ্যা সমান থাকিতে হইবে। উল্লেখ্য, অস্ত্র পরিদর্শক দলে প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন–ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের ঐ দলে কোন প্রাধান্য নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপসাগরে বাড়তি বিমানবাহী জাহাজ এবং সৈন্য প্রেরণ করে। কিন্তু একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন অপরদিকে ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়ার মধ্যকার মতপার্থক্যের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে আমেরিকার আরব মিত্রদের মনোভাব শুধু অস্পষ্টই নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে বৈরীও। যাহার ফলে মার্কিন প্রভাবিত নিরাপত্তা পরিষদ শুধু হাল্কা ধরনের অবরোধের হুমকি দেয় এবং তাও পরে বাতিল হয়। পরিদর্শন কমিশন ইরাকে পুনরায় বাড়াবাড়ি করিলে ইরাক পুনরায় তাহাদের পরিদর্শনে বাধা

প্রদান করে। এইবার যুক্তরাষ্ট্র অবরোধের প্রস্তাবকে অভিযানে পরিণত করিবার সুপারিশ করে। চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্স এই প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করে। রাশিয়া ও ফ্রান্স এখনো অবশ্য মনে করে সাদ্দামকে অবশ্যই জাতিসংঘের ইরাক সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনকে পরিদর্শনের কাজ করিতে দিতে হইবে। কিন্তু তাহারা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের বিপক্ষে।

ইরাকী তেল রফতানির উপর নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকী অর্থনীতি ভাঙিয়া পড়িয়াছে। মানুষ এখন দুর্ভিক্ষ অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইলে ইরাক সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের সার্টিফিকেট দরকার হইবে। টাইগ্রিস তীরের মানুষের কাছে ইরাক সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ কমিশন হইতেছে ক্ষুধা, শিশুমৃত্যু ও দুঃসহ জীবন যন্ত্রণার অপর নাম। রাশিয়া ও ফ্রান্সের বক্তব্য হইতেছে মার্কিন ও বৃটিশ নীতিতে অবরোধের অবসানের কোন লক্ষন দেখা যাইতেছে না। ফলে সাদ্দাম ভাল আচরণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অপরদিকে তাহারা বলিতেছে সাদ্দামকে ক্ষমতা হইতে সরাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয় অনাগ্রহী অথবা অক্ষম। অতএব তাহারা ইরাকের সহিত সম্পর্ক স্বাভাবিক করিবার পক্ষে। নিরাপত্তা পরিষদের বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার ফলে ইরাকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহও কমবেশি হয়রানির শিকার হইতেছে। এই ব্যাপারে কায়রো ভিত্তিক যুক্তরাষ্ট্রের টাইম সাময়িকীর ব্যুরো প্রধান ডীন ফিসারের সহিত এক সাক্ষাৎকারে জর্দানের বাদশাহ হোসেন বলেন, এতদঞ্চলের সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা যে সহযোগিতা ও দায়বদ্ধতা দেখাইয়াছি তাহাতে আমাদের প্রতি যে ব্যবহার করা হইতেছে তাহা যৌক্তিকতা প্রমাণ করে না। বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার ফলে জর্দানের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্যগত অনেক বাজার হারাইয়াছি। ইনসিউরেন্সের প্রিমিয়াম দেওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। আমাদেরকে এমনকি জাহাজ পরিদর্শনের ফিসও প্রদান করিতে হয়। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বহির্নোঙ্গরের এই পরিদর্শন ও পাকড়াও করিবার কাজ গতবারের তুলনায় কমিবার চাইতে বরং বাড়িয়াছে। আমাদের সমুদ্রে প্রবেশের একমাত্র পথ আকাবা বন্দরে গমনাগমনকারী ও একই ধরনের ১৬টি নিয়মিত জাহাজ কোম্পানি আমরা হারাইয়াছি। এই পর্যন্ত আমরা একশত কোটি ডলার গচ্ছা দিয়াছি। সমস্যা আরম্ভ হইবার পর হইতে এই পর্যন্ত যতগুলি জাহাজ থামানো হইয়াছে তাহাদের একটিতেও বেআইনী কোন কিছু পাওয়া যায় নাই। আমরা বুঝি না কেন ইহা এখনো বলবৎ রহিয়াছে। ইহা কি নিরাপত্তা পরিষদের দ্বারা? ইহাকি যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা? কে এই নীতি চাপাইয়া রাখিয়াছে এবং এতদিন আমরা কেন ইহা সহ্য করিব? এই ধরনের ব্যবহার আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। (Time, April, 18, 1994)

তবে বাণিজ্যিক বাস্তবতা হইতেছে ফরাসি ও রাশিয়ান কোম্পানিগুলি ইতোমধ্যে তেল খাতে সম্ভাবনাময় বেশ কিছু লোভনীয় চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ আরোপিত অবরোধ প্রত্যাহার হইবার পর এইসব চুক্তির কাজ আরম্ভ হইবে। ইরাকের বর্তমান বন্ধুগণ আশা করিতেছেন তাহারা ভবিষ্যতে বাগদাদের নিকট হইতে আরও অর্থনৈতিক সুবিধা পাইবেন। বিশেষ করিয়া ইরাক যখন তেল খাত হইতে দৈনিক ছয় কোটি ডলার আয় করিবে।

পশ্চিমা দেশসমূহ জানে নিরাপত্তা পরিষদের ইরাক সংক্রান্ত বিশেষ কমিশনের কাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ১৯৯০ সালে আগস্ট মাসের কুয়েত অভিযানের আগ পর্যন্ত তাহারা ইরাকী সমরসজ্জায় নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। ইরানের সঙ্গে আট বৎসরের

যুদ্ধকালে ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্রের ৪৭ শতাংশ তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ২৮ শতাংশ ফ্রান্স সরবরাহ করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট, জার্মানি, সুইডেন ও বৃটেনের কোম্পানিগুলির ভূমিকাও এই ক্ষেত্রে কম নহে।

ইতোমধ্যে সাদ্দাম হোসেন সফলভাবে তাহার বিরুদ্ধে সংঘটিত কমপক্ষে দুইটি অভ্যুত্থান ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। দেশের অভ্যন্তরে তাহার অবস্থান এখন ক্রমাগত উন্নত হইতেছে। ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে কুর্দিদের নিজেদের মধ্যকার ভাঙ্গণকে ব্যবহার করিয়া সাদ্দাম উত্তর ইরাকে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। এই অভিযানে ইরাকী বিমানবাহিনী ছায়া (আমব্রেলা) হিসাবে কাজ করিয়াছে। ইহার পূর্বে সম্মিলিত বাহিনী উত্তর ইরাকের ঐ অঞ্চলে ইরাকী বাহিনীকে ঢুকিবার অনুমতি দেয় নাই। কিন্তু কুর্দিদের বিরুদ্ধে অভিযান চলাকালে সম্মিলিত বাহিনী কোন পাল্টা আক্রমণ চালায় নাই। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্য ইরাকের বিমান বাহিনী ঘাটিতে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাইলে সাদ্দাম দ্রুত তাহার বাহিনী প্রত্যাহার করেন। তবে ঐ অঞ্চলের উপর তাহার প্রভাব কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। (যায় যায় দিন, ২০/১/৯৮ বৃটিশ সাংবাদিক মার্টিনের প্রতিবেদন অবলম্বনে)।

ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ইরাক পুনরায় পরিদর্শক দলকে কাজ করিবার অনুমতি প্রদানের পর নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয় প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসমূহে তাহাদের পরিদর্শনের পরিকল্পনা লইয়া। ইরাক এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর পরিদর্শক দল ইরাক ত্যাগ করিয়াছে। এইদিকে জাতিসংঘের প্রধান অস্ত্র পরিদর্শক হিসাবে রিচার্ড বাটলারের ভূমিকায় কথিত অপব্যবহারের জন্য ফ্রান্স তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। বাটলার একটি মার্কিন পত্রিকাকে ইরাকের জীবানু অস্ত্র সম্পর্কে তথ্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। এদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়েভগেনি প্রিমাকভ ও ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হুবার্ট ভেদরাইন জাতিসংঘের সহিত ইরাকের সাম্প্রতিক বিরোধের একটি কূটনৈতিক সমাধান খুজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদের সরকারের অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করিয়াছেন।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন, তেল আবিবকে উড়াইয়া দিবার জন্য ইরাকের কাছে পর্যাপ্ত জীবাণু অস্ত্র রহিয়াছে বলিয়া বাটলার যে বিবৃতি দিয়াছেন সে বিবৃতির তথ্য তিনি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে দেন নাই। মুখপাত্র আরও বলিয়াছেন বাটলার এই তথ্য অবশ্যই জাতিসংঘকে জানাইতে হইবে। এই ধরনের তথ্য প্রদান করিয়া তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন।

এইদিকে ইরাকী প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসমূহ পরিদর্শনের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিবার বিষয়টি লইয়া ইরাক মার্কিন সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটাইয়াছে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসমূহ পরিদর্শনে অস্বীকৃতি প্রদানের শাস্তিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরাকে সামরিক হামলার জন্য উপসাগরে তাহাদের তিনটি বিমানবাহী জাহাজ প্রেরণ করে। উপসাগরে মোতায়েন ২৪০০ সৈন্যের সঙ্গে আরও ২০০০ সৈন্য প্রেরণ করা হয়। বৃটেন উপসাগরে একটি বিমানবাহী জাহাজ প্রেরণ করে।

অপরদিকে ইরাকে মার্কিন হামলার জন্য আরব জাহান বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সৌদি আরব, মিশর, জর্দান, তুরস্ক এবং বাহরাইন ইরাকের বিরুদ্ধে তাহাদের বিমান ঘাটি ব্যবহার করিতে দিবে না বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়া দেয়। ইরানও এই হামলার বিরোধিতার কথা

জানায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ইরাককে হুঁশিয়ার করিয়া বলেন যে কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধান না হইলে দ্রুত সাদ্দাম হোসেনের সময় ফুরাইয়া আসিতেছে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন অভিযোগ করেন, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাম্প্রতিক যৌন কেলেংকারী হইতে মার্কিন জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরাইবার জন্য ক্লিনটন নানান ছলছুতায় ইরাকে বোমা হামলার জন্য মরিয়া হইয়া ইরাকের উপর এমন সব দাবি উত্থাপন করিতেছেন যেইগুলি মান্য করা ইরাকের পক্ষে সম্ভব নহে। অব্যাহত হুমকির মুখ সাদ্দাম হোসেন আরও বলেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সংঘাতের ফল যাহাই হোক না কেন তিনি তাহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত। তুরস্কের বিশেষ দূত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল সেমকে তিনি জানান "আমাদের তকদিরকে আমরা মানিয়া লইব। আজ আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন করিলেও আগামী কাল তাহা তিনি পূরণ করিয়া দিবেন।"

রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন শক্তি প্রয়োগের ঘোর বিরোধী। তাই তাহারা কূটনৈতিক সমাধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাইয়া যায়। রুশ প্রেসিডেন্ট বরিশ ইয়েলিৎসিন সম্প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হইলে তাহা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। নিরাপত্তা পরিষদে ইরাকী সামরিক হামলার সিদ্ধান্ত লইতে গেলে রাশিয়া ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে বলিয়াও আগাম জানাইয়া দেওয়া হয়।

রাশিয়ার কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে ইরাক শর্ত সাপেক্ষে উহার সন্দেহজনক সকল প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ পরিদর্শন করিতে দিতে সম্মত হয়। ইরাক শর্ত দেয় যে, এক মাসের মধ্যে জাতিসংঘের অবরোধ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সন্দেহজনক স্থানগুলিতে একবার মাত্র পরিদর্শন কাজ চালাইবার অনুমোদন দেওয়া হইবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলে ইরাক নিঃশর্তভাবে সন্দেহজনক সকল স্থানে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের প্রবেশ করিতে দিতে হইবে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন মনে করে ইরাকের কাছে এখনো ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রহিয়াছে, কিন্তু রুশ রাষ্ট্রদূত বলেন এই পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে মনে হয় না ইরাকের নিকট আর কোন ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র রহিয়াছে। এইদিকে পরিদর্শনের বিশেষ কমিশনের কর্মকর্তারা অভিযোগ করেন রাশিয়া তাহাদের কাজে বাধা দিতেছে। তাহারা মনে করেন রাশিয়া ইরাকের সমর্থনকারী এবং জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে চায়। (ইনকিলাব-৭/২/৯৮)

সমস্ত বিশ্বের দৃষ্টি এখন উপসাগরে নিবদ্ধ। আশংকা করা হইতেছে আরব মিত্রবর্গ সম্মতি দিলে যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে। অপরদিকে সাদ্দাম হোসেন হাজার হাজার ইরাকীকে সম্ভাব্য যুদ্ধ মোকাবিলার জন্য দিন রাত্রি প্রশিক্ষণ দিয়া যাইতেছে। সাদ্দাম হোসেন ও ইরাকের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন উপসাগরে তিনটি নৌবহর ও অন্যান্য সামরিক সম্পদ মোতায়েন করিয়াছে। এইদিকে ইরাক কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা নস্যাৎ করিয়া যুদ্ধের দামামা বাজাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করিয়াছে। ইরাকের সরকারি আল-কাদেসিয়া পত্রিকা বলিয়াছে যখন সামরিক হামলা এড়াইবার জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চলিতেছে তখন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী উইলিয়াম কোহেনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ উসকাইয়া দিবার অভিযোগ উঠিতেছে। জাতিসংঘ প্রধান কফি আনান কর্তৃক বাগদাদে প্রেরিত শান্তি মিশনের প্রতি কঠোর শর্ত আরোপ করিয়া কোহেন জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেলকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মচারী কিংবা পেন্টাগনের একজন বাহক হিসাবে কাজ করাইতে চান। এদিকে জাতিসংঘে ইরাকের

রাষ্ট্রদূত নাজির হামদুন বলিয়াছেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে তাহা হইলে ইরাকে জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শন কর্মসূচি বন্ধ হইয়া যাইবে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিমাকভ বলেন, সামরিক শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে কূটনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সময় এখনো রহিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি উপসাগরে যে শক্তি মোতায়েন করিয়াছে তাহা নিম্নরূপঃ

- ২টি বিমানবাহী জাহাজ ঃ ইউএসএস জর্জ ওয়াশিংটন ও ইন্ডিপেনডন্স।
- ১৮টি জাহাজ ঃ এইগুলির মধ্যে ক্রুজ মিসাইল সহ ৮টি জাহাজ সশস্ত্র।
- ১৭৬টি জঙ্গী বিমান (১৩৩টি স্ট্রাইক বিমানসহ) ২৪টি এফ-১৪ টোমাক ফাইটার, ৭০টি এফ/এ-১৮ এ্যাটাক ফাইটার।
- ১৯২০০ জন নৌ সেনা ও নাবিক, স্থল বাহিনী ঃ ১০,৪০০ জন।
- ২৮০০ সেন সদস্য- কুয়েতে ১৫০০ জন, অবশিষ্ট সৌদি আরবে।
- ৭৬০০ জন বৈমানিক।
- ১০০০ মার্কিন সৈন্য তুরস্কে মোতায়েন।
- সৌদি আরবে ৯৩টি জংগী বিমান।
- কুয়েতে ৬টি এফ-১১৭ গোয়েন্দা জঙ্গী বিমান, ৬টি এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান।
- বাহরাইনে ২টি বি-১ বোমারু বিমান, ৩০টি এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান।
- উপসাগরে (দেশের নাম অজানা) ৬টি এফ-১১৭ গোয়েন্দা জঙ্গী বিমান, ১টি বি-১ বোমারু বিমান, ৬টি এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান, ৫টি কেসি-১০ ট্যাংকার প্লেন।
- তাহা ছাড়াও ৫০টি বিমান তুরস্কে মোতায়েন কৌশলগত বাহিনী হিসাবে।
- ১৮টি বি-৫২ বোমারু বিমান ভারত মহাসাগরের ডিয়াগো গার্সিয়াতে মোতায়েন। এইগুলি ক্রুজ মিসাইল সমেত, ৭টি কেসি-১০ ট্যাংকার বিমান।

এইদিকে একটি জনপ্রিয় মার্কিন সাপ্তাহিক সাময়িকী নিউজ উইক-এর এক সমীক্ষায় দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যের একেবারে সাধারণ লোক হইতে বুদ্ধিজীবী মহলের সর্বত্র জনগণের মধ্যে মার্কিন বিরোধী একটি মনোভাব লক্ষণীয়। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ও আরব-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর পর যেখানে আমেরিকার প্রাধান্য সর্বজনবিদিত সেখানে আরবদের মধ্যে মার্কিন বিরোধী এই মনোভাব তাহার বিপরীত, অথচ আমেরিকার উদ্যোগের ফলে এই অঞ্চলে যে নয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে উহার সুযোগ কাজে লাগাইবার জন্য সবাই চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। আমেরিকার লওয়া এই উদ্যোগকে অনেকেই যৌক্তিক বলিয়া মনে করে। যুদ্ধের পর আমেরিকা বিধি-নিষেধের মাধ্যমে ইরাককে পুরাপুরি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং চিরশত্রু আরব ও ইসরাইলকে সরাসরি আলোচনার টেবিলে সমবেত করিয়াছে। কায়রো হইতে দামেস্কে অথবা কাসাব্লাংকা পর্যন্ত সর্বত্র লোকজন মনে করে যে, যুক্তরাষ্ট্র একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র মানিয়া লইতে ইসরাইলকে রাজি করিয়াছে। জনগণ আমেরিকার এই কৃতিত্ব স্বীকার করিলেও তাহারা ইরাক প্রশ্নে আমেরিকার নীতি সমর্থন করিতেছে না। ইরাককে নিরস্ত্রীকরণ করিবার ব্যাপারে মার্কিন উদ্যোগ তাহাদের মোটেই স্পর্শ করিতেছে না। ইরাক প্রসঙ্গ বাদে আরবদের মধ্যে এই ধারণা ছিল, আমেরিকা হয়তো যৌক্তিক নীতিই অনুসরণ করিয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া আরব ইসরাইলের চির বিরোধ অবসানে যে শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ লওয়া হয় তাহাতে আরব সরকারগুলি মনে করে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই সামাজিক উত্তেজনা হ্রাস পাইবে এবং একই সঙেগ অভ্যন্তরিক রাজনৈতিক বিরোধীতাও সামাল দেওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ হইবে।

আরব বিশ্বে মার্কিন বিরোধী পরিবেশের কারণ ঃ

কিন্তু বর্তমানে আমেরিকাকে অন্য চোখে দেখা যাইতেছে। বেশির ভাগ আরবই আমেরিকার বর্তমান নীতি অবস্থানকে অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। রাস্তার একজন সাধারণ লোক হইতে অনেক বুদ্ধিবীবীই মনে করেন, বেনজামিন নেতানিয়াহুর ইসরাইলী সরকার শান্তি প্রক্রিয়াকে অচল করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা আরও মনে করে, ইসরাইলকে শান্তির পথে ফিরাইয়া আনিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশটির উপর চাপ সৃষ্টি করিতেছে না। বরং যুক্তরাষ্ট্রের উস্কানী পাইয়াই ইসরাইল ঔদ্ধত্য দেখাইয়া চলিয়াছে। আমেরিকা যেখানে অসলো চুক্তির সূচনায় ইসরাইলকে রাজী করাইয়াছে, কিন্তু আজ দেশটি যখন শান্তি প্রক্রিয়াকে অচল করিয়া দিয়াছে তখন আমেরিকা তাহাকে শাস্তি দিতেছে না। অথচ ইরাককে শাস্তি দিবার নামে আমেরিকা বাড়াবাড়ি করিতেছে। এই বাড়াবাড়িই আরব জনগণকে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে ইরাক জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করায় দেশটির উপর একের পর এক শাস্তি নামিয়া আসিতেছে। গণ বিধ্বংসী অস্ত্র ধ্বংসের দাবিতে দেশটির উপর কঠোর বিধি-নিষেধ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা অব্যাহত রাখা হইয়াছে। এই নিষেধাজ্ঞায় গোটা ইরাকী জনগণকে চরম খেসারত দিতে হইতেছে। খাদ্যের অভাবে লোকজন অনাহারে মারা যাইতেছে। ঔষধের অভাবে বিনা চিকিৎসায় লোকজন মারা যাইতেছে ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে। পুষ্টির অভাবেও লোকজন মারা যাইতেছে ও পঙ্গু হইতেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে অসহায় শিশু, কিশোর ও বয়স্ক লোকজন। দেশটির উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সেখানকার জনগণের বাঁচিয়া থাকিবার মৌলিক অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে। অথচ ইসরাইল একের পর এক জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করিলেও আমেরিকা ইহুদি রাষ্ট্রটির প্রতি চোখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইসরাইলের অস্ত্রাগারে রহিয়াছে বিশ্বের সব অত্যাধুনিক ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র। এইসব অস্ত্র গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে রাখিয়াছে। অথচ ইসরাইলের গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোন উদ্বেগ নাই। যুক্তরাষ্ট্রের এই একচোখা ও পরস্পরবিরোধী নীতিই আরব জনগণকে মার্কিন বিরোধী করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে আরব ও মুসলমান সাদ্দাম হোসেনকে ধ্বংস করিবার জন্য আমেরিকা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলকে আমেরিকা তোষণ করিয়া চলিতেছে। ইহাই হইতেছে আরবদের মধ্যে মার্কিন বিরোধী মনোভাবের মূল কারণ।

সাদ্দাম হোসেন নিজেও তাহার প্রতি আরবদের এই মনোভাব সম্পর্কে জানেন। ইতোমধ্যে তিনি তাহার পুরাতন জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তিনি এমন এক নীতি প্রতিহত করিয়া চলিয়াছেন যে নীতিকে একজন মিশরীয় ট্যাক্সি ড্রাইভার, সিরিয়ার একজন কলেজ ছাত্র অথবা মরক্কোর একজন ব্যবসায়ী অন্যায় ও অন্যায় বলিয়া মনে করে। তাহাদের কাছে একটাই প্রশ্ন, জাতিসংঘ প্রস্তাবের দোহাই দিয়া আমেরিকা ইরাকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে চায়। অপরদিকে জন্মের পর হইতে ইসরাইল একের পর এক জাতিসংঘ প্রস্তাব লংঘন করিয়া আসিতেছে এবং এই ব্যাপারে আমেরিকার নিকট হইতে প্রতিনিয়ত

প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। আমেরিকার এই দ্বৈতনীতি আরব জনগণ আর মানিয়া লইতে রাজি নহে। ইরাক সংকট আরব জনগণের মার্কিন বিরোধী পুঞ্জিভূত ক্ষোভ প্রকাশে সাহায্য করিয়াছে মাত্র।

আরব সরকারগুলি শান্তির যথার্থতা সমর্থন করে, তাহারা তাহাদের নিজেদেরকে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার উপায় হিসাবে বিবেচনা করে কিন্তু দেশগুলি এখন লক্ষ্য করিতেছে যে, তাহাদের হাত পা বাঁধা। শান্তি প্রক্রিয়া এখন অচল এবং আঞ্চলিক সমৃদ্ধি তেমন দৃশ্যমান নহে। একই সময়ে ইসরাইল বিরোধী মনোভাব এখন জনগণের মধ্যে বাড়িতেছে। শান্তি প্রক্রিয়া যখন আগাইয়া যাইতেছিল তখন ইসরাইলের প্রতি আরব দেশসমূহের মনোভাব যথেষ্ট নমনীয় ছিল। গত অক্টোবর (৯৭) দোহায় অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে ইসরাইলের সহিত আরব দেশ সমূহেরও অংশ গ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু আরব দেশসমূহের সরকার প্রধানগণ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে নাই। মামুলি প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে মাত্র। শুধু তাহাই নহে, দোহা সম্মেলন ব্যর্থ হইবার কয়েক সপ্তাহ পর ওআই সির শীর্ষ সম্মেলন অত্যন্ত জাকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল ভ্রূকুটির মধ্যে তেহরানেই এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা মোটেই কামনা করে না যে তাহার মিত্র আরব দেশসমূহ ইরানের সহিত সম্পর্ক রাখুক। কিন্তু উহার বিপরীতে দোহা সম্মেলন বর্জনকারী তাহার মিত্ররা আরও সোৎসাহে তেহরান সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে। এই সম্মেলনে ইরাকও যোগদান করে। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া মুসলিম দেশসমূহ পরস্পরের আরও কাছে আসে। গতকালের শত্রুরা এই সম্মেলনের মাধ্যমে আজকের বন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। এই শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম দেশগুলি যে অবস্থান গ্রহণ করে তাহা ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিপরীতে। ১৯৯১ সালে ইরাক বিরোধী যুদ্ধে আমেরিকা যেভাবে একটি সামরিক জোট গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল আজকের পরিস্থিতি তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জোটের অন্তর্ভুক্ত অনেক আরব ও মুসলিম দেশ ইরাকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছে এবং সম্ভাব্য মার্কিন হামলার বিরোধিতা করিতেছে।

১৯৯৮ সাল ১৯৯১ সাল নহে। আমেরিকা হামলা করিলে এইবার তাহার অনেক আরব মিত্র যে তাহার বিরোধিতা করিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। গতবারের ন্যায় এইবার মার্কিন জঙ্গী বিমানসমূহ বোমা হামলার জন্য ইরাকের আশে পাশে কোন ঘাটি পাইবে না। এইবার হামলা করিতে হইলে স্থল বাহিনী ব্যবহারের পরিকল্পনা বাদ দিতে হইবে। মার্কিন সমর বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন, সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করিতে হইলে স্থল বাহিনী ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং স্বয়ং সাদ্দাম হোসেনও এই কথা জানেন। আমেরিকা যদি ইরাকে আঘাত হানে তাহা হইলে যে যুদ্ধ বাধিবে তাহাতে জয়লাভ করা আমেরিকার জন্য সহজ হইবে না। শুধু বিমান হামলা দ্বারা জয়লাভ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে আরও অধিক আরব দেশ ইরাকের সহিত ঘনিস্ট সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে। অপরদিকে সাধারণ আরব জনগণের মদ্যে সাদ্দাম হোসেন আরও সাহসী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হইবেন এবং সেই অবস্থাটি হইবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও বেশি অস্বস্তিকর ও বিপজ্জনক (নিউজ উইক, ফেব্রুয়ারি ১৬, ১৯৯৮)

আমেরিকা বৃটেনের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং সম্ভাব্য হামলার মুখে লক্ষ লক্ষ ইরাকী জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্য দিয়া বিশ্ব যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত সেই

সময় জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান স্বয়ং বাগদাদে গমন করিয়া প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে এই সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বাগদাদের পথে তিনি ফ্রান্সে যাত্রাবিরতি করেন এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক সিরাকের সঙ্গে আলোচনা করেন। ফরাসি একটি বিমানে করিয়া তিনি ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বাগদাদ পৌছেন। প্রথম দিন দুই দফায় তিনি ১০ ঘন্টা আলোচনা করেন ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তারেক আজিজের সঙ্গে। এই বৈঠকে একটি চুক্তির মূল কাঠামো তৈয়ার হয়। ইহার পর তিন ঘন্টা স্থায়ী রুদ্ধদ্বার বৈঠক হয় প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সহিত। এই একান্ত বৈঠকের পরই স্বাক্ষরিত হয় বাগদাদ চুক্তি-১৯৯৮। চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান এবং ইরাকের পক্ষে উপ-প্রধানমন্ত্রী তারেক আজিজ। চুক্তির পূর্ণ বিষয়বস্তু নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমঝোতা স্মারকে বলা হয়ঃ-

(১) ইরাক সরকার ১৯৯৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি স্বাক্ষরিত চুক্তির ৬৮৭ নম্বর প্রস্তাব এবং ১৯৯১ সালের ১১ই অক্টোবর স্বাক্ষরিত চুক্তির ৭১৫ নম্বর প্রস্তাব সহ নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সকল প্রস্তাব মানিয়া চলিতে তাহার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করিয়াছে। ইরাক সরকার জাতিসংঘ বিশেষ কমিশন (আনসকম)[১] ও আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ)[২] এর সহিত পূর্ণ সহযোগিতার ব্যাপারে তাহার প্রতিশ্রুতি ও পুনরুল্লেখ করিয়াছে।

(২) জাতিসংঘ ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের ব্যাপারে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করিয়াছে।

(৩) ইরাক সরকার অনুচ্ছেদ ১-এ উল্লিখিত প্রস্তাব মতে 'আনসকম' ও আইএই'কে অস্ত্র পরিদর্শনের জন্য নিঃশর্ত ও বাধাহীন প্রবেশের অনুমতি দিবে। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের অধীনে ক্ষমতাবলে 'আনসকম ইরাকের জাতীয় নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ন্যায্য সম্মান প্রদর্শন করিবে।

(৪) জাতিসংঘ ও ইরাক সরকার ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের আটটি এলাকায় প্রবেশের ব্যাপারে বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণে ঐকমত্যে পৌছিয়াছে। বর্তমান চুক্তিতে এই বিশেষ পদ্ধতি নিম্নবর্ণিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে-

(ক) 'আনসকম'এর নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং আইএই'র মহাপরিচালকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতিসংঘ মহাসচিব একটি বিশেষ দল গঠন করিবেন। এই দলে মহাসচিব নিযুক্ত ঊর্ধ্বতন কূটনৈতিকবৃন্দ এবং 'আনসকম' ও 'আই,এ,ই'র বিশেষজ্ঞবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত থাকিবেন। মহাসচিব কর্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার এই দলের প্রধান হইবেন।

(খ) এই পরিদর্শন কাজ পরিচালনার সময় বিশেষ দল 'আনসকম' ও আইএই'র নির্ধারিত পদ্ধতি এবং প্রেসিডেন্টের আবাসিক এলাকার বিশেষ প্রকৃতিগত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত পদ্ধতির পাশাপাশি নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাদি অনুসরণ করিবে।

(গ) 'আনসকম'-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিশেষ গ্রুপের কার্যক্রম ও প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন মহাসচিবের মাধ্যমে নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করিবেন।

---

১. *UNSCOM : United Nations Special Commission on the Middle East.*
২. *IAEA : International Atomic Energy Association.*

(৫) জাতিসংঘ ও ইরাক সরকার আরও ঐকমত্যে পৌঁছিয়াছে যে, 'আনসকম' পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গতি সাপেক্ষে অন্যান্য সকল বিষয়, সুযোগ-সুবিধা, যন্ত্রপাতি, রেকর্ডপত্র ও পরিবহন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকিবে।

(৬) জাতিসংঘ ও ইরাক সরকার ১৯৯১ সালের ৬৮৭ নম্বর প্রস্তাবের ২২ অনুচ্ছেদের অধীনে শর্তাবলী অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট পেশের কর্মসূচি দ্রুততর করিবার সুবিধার্থে সকল প্রকার সুবিধা প্রদানে ঐকমত্য হইয়াছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইরাক সরকার ও আনসকম ১৯৯৭ সালের ২১শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত জরুরি বৈঠকের প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারিত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করিবে।

(৭) সঙ্গত কারণেই ইরাকের জনগণ ও সরকারের জন্য অবরোধ প্রত্যাহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতিসংঘ মহাসচিব বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের গোচরিভূত করিবার ব্যাপারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাইবেন।

এই চুক্তির ফলে শান্তিপ্রিয় বিশ্ব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা বিশ্ব এক ব্যাপক ধ্বংসলীলা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ফ্রান্স, বৃটেন ও রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই চুক্তিটিকে স্বাগত জানাইয়াছে। ফরাসি টেলিভিশনের সহিত এক স্বাক্ষাৎকারে সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনান বলেন ইরাকে অস্ত্র পরিদর্শন সম্পর্কে স্বাক্ষরিত চুক্তিটি যথেষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিরাপত্তা পরিষদে ইহার উপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইলে তাহার বিশ্বাস বিতর্ক বেশি জটিল হইবে না। উল্লেখ্য, চুক্তিটি নিরাপত্তা পরিষদে পাশ হইবার পর কার্যকরী হইবে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিতে গিয়া ইরাকী উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক আজিজ বলেন, জাতিসংঘের অবরোধ দ্রুত প্রত্যাহারের বিষয়টি এখন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে। (ইত্তেফাক-ফেব্রুয়ারি ২৬, ১৯৯৮)। তবে মার্কিন মনোভাব এখনো অস্পষ্ট। ক্লিনটন প্রশাসন জানাইয়াছে, চুক্তির বিশদ বিবরণ না জানিয়া না শুনিয়া কিছু বলা হইবে না।

গত ৩রা মার্চ '৯৮ ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসমূহে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের অবাধ প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত কফি আনান ও বাগদাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি যাহা 'বাগদাদ চুক্তি' নামে পরিচিত তা নিরাপত্তা পরিষদ অনুমোদন করিয়াছে এবং সেই সাথে চুক্তি ভঙ্গের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হইয়াছে। চুক্তি ভঙ্গ করিলে ইরাকের উপর হামলার একটি মার্কিন-বৃটেন প্রস্তাব চীন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের দাবির মুখে নাকচ হইয়াছে এই বলিয়া যে ইরাকের উপর হামলা করিতে হইলে নিরাপত্তা পরিষদের পূর্ব অনুমোদন লাগিবে। জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের ইরাকের পারমাণবিক ও রাসায়নিক অস্ত্র রাখিবার সকল সন্দেহজনক স্থানে অবাধে প্রবেশ করিতে দিবার ব্যাপারে ইরাককে বাধ্য করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক হামলার যে হুমকি দেখা দিয়াছিল মহাসচিব কফি আনানের শেষ মুহূর্তের মিশন আপাতত হইলেও তাহা ঠেকাইতে পারিয়াছে।

ইরাকী উপ-প্রধানমন্ত্রী তারিক আজিজ বলেন, ইরাকের উপর হইতে অবরোধ প্রত্যাহার করা হইলে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাথে তাহার দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হইবে। ইরাকের উপর জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধের শিকার ৩৩টি শিশুর লাশের গণদাফন ৩রা মার্চ '৯৮ বাগদাদে সম্পন্ন হয়। ইরাক যুক্তরাষ্ট্রকে ঔদ্ধত্য ও ঘৃণাপূর্ণ আচরণের দায়ে অভিযুক্ত করিয়া বলিয়াছে ইরাকের প্রতি বৈরিতাই হইতেছে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির একটি অপরিবর্তনীয় দিক। এইদিকে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত প্রকাশ সাহাকে বাগদাদের

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি মনোনীত করা হইয়াছে।

পূর্বাপর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া পর্যবেক্ষকগণ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সর্বদা ইরাকের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব জিয়াইয়া রাখিতে সচেষ্ট। ইহার দ্বারা উহার দ্বিমুখী উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে। প্রথমত ইহা উপসাগরে তথা মধ্যপ্রাচ্যে তাহাকে এমন সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করিতে সহায়তা করিবে যা দ্বারা সে মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতে পারে। দ্বিতীয়ত ১৯৯১ সালের যুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী সময়ে সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকার প্রচেষ্টা হিসাবে সাদ্দাম হোসেনকে চাপের মুখে রাখা যাহাতে ইরাকের মৃতপ্রায় অর্থনীতি লইয়া সে যেন আর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে না পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই মার্কিন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার সমূহ সম্ভাবনা। কারণ উপসাগরে মোতায়েন মার্কিন ও তাহাদের মিত্রদের সৈন্য বাহিনীর বিপুল খরচ কে যোগাইবে তাহা লইয়া মার্কিন কংগ্রেসে ইতোমধ্যে কথা উঠিয়াছে। আরব বিশ্ব যেহেতু ইরাকের পক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং সর্বশেষ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কোন সমর্থন প্রদান করে নাই, তাই তাহারা যে মিত্র বাহিনীর এই খরচ যোগাইবে না তাহা একজন অতি সাধারণ মানুষও বলিতে পারে। অপরদিকে ইতোমধ্যে মিশর, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রভৃতি আরব দেশ হইতে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী লইয়া ট্রাকের বহর বাগদাদের দিকে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাদ্দাম হোসেন এখনো ইরাকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এই বাস্তবতার নিরীখে যে বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে তাহা হইল ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই কড়াকড়ি প্রদর্শন করিতেছে ততই আরব বিশ্বে মুসলিম জাহানে সাদ্দাম হোসেন একজন অবিসংবাদিত ও শক্তিশালী নেতা হিসাবে আবির্ভূত হইতেছেন। অধিকন্তু এইবার এই সংকট নিরসন করিতে যাইয়া সেক্রেটারী জেনারেল কফি আনানের কঠোর মনোভাবের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ তার হৃতগৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে। এই বিবেচনা হইতে একটি বিষয় স্পষ্ট হইতেছে– ভবিষ্যতে সম্ভবত কূটনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে কিংবা সীমিত সামরিক এ্যাকশনের মাধ্যমেই সংকটের সমাধা হইবে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই লাভবান হইবেন সাদ্দাম হোসেন।

ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদসমূহে অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রবেশকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট উত্তেজনা বাগদাদ চুক্তির মাধ্যমে নিরসনের পর ৩০শে জুন '৯৮ মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি এফ-১৬ জঙ্গীবিমান দক্ষিণ ইরাকের একটি রাডার কেন্দ্রের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। পেন্টাগন সূত্রে বলা হয় ইরাকের উড্ডয়ন নিষিদ্ধ আকাশ সীমায় নিয়মিত টহলরত বৃটিশ জেট বিমানের প্রতি ইরাকী রাডারগুলি লক্ষ্যস্থির করায় প্রতিশোধ হিসাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়। ফ্লোরিডাস্থ মার্কিন কেন্দ্রীয় কমাণ্ড এবং বৃটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যুগপৎ এই হামলার কথা স্বীকার করা হয়। এই হামলাকে তাহারা আত্মরক্ষামূলক হামলা বলিয়া উল্লেখ করে। তবে ইরাকী রাডারের এই লক্ষ্যস্থির করিবার অর্থ ইরাকী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পূর্বাভাস কি না সে ব্যাপারে অবশ্য স্পষ্ট কিছু বলা হয় নাই। (বিএনএস,সিএনএন)

এই ক্ষেপনাস্ত্র হামলা এমন এক সময়ে সংঘটিত হইল যখন ইরাক ও মার্কিন নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বাহিনীর মধ্যে উত্তেজনা হ্রাস পাইতেছিল এবং জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকগণ অস্ত্র পরিদর্শনের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল। জাতিসংঘের পক্ষ হইতে

ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সম্ভাবনার কথাও শোনা যাইতেছিল। উল্লেখ্য ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধের পর ইরাকের দক্ষিণে শিয়া মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ইরাক সরকারের হামলা বন্ধের লক্ষ্যে এই "নো ফ্লাই জোন" বা উড্ডয়ন নিষিদ্ধ আকাশসীমা নির্ধারণ করা হয়। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে কুর্দি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায়ও অনুরূপ উড্ডয়ন নিষিদ্ধ আকাশ সীমা রহিয়াছে। ইরাক প্রতিনিয়ত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিয়া আসিতেছিল। আগামী তিন মাসের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করিলে ইরাক বিকল্প ব্যবস্থারও হুমকি দিয়া আসিতেছিল। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত উদ্যোগের পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাকের মধ্যে সম্পর্ক আনেকটা নমনীয় হইয়া আসিবার প্রেক্ষাপটে এই ক্ষেপনাস্ত্র হামলা মধ্যপ্রাচ্যে পুনরায় উত্তেজনা সৃষ্টির কারন হইল বলিয়া বিশেষজ্ঞ সূত্রে উল্লেখ করা হয়।

মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র হামলাকে ইরাক একটি নগ্ন ও অযৌক্তিক কর্ম বলিয়া নিন্দা করিয়াছে। ইরাকের একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র বসরার উম্মে কাসর বন্দরের কাছে যে স্থানটি লক্ষ করিয়া নিক্ষেপ করা হয়, সেখানে কয়েকটি পানি সংরক্ষণাগার রহিয়াছে। এই এলাকায় কোন সামরিক ইউনিট নাই। তিনি বলেন এই হামলা যুক্তরাষ্টের আগ্রাসী মনোভাব এবং অন্যদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিবার একটি প্রমাণ। (বিএনএস, এএফপি)

জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণাংশে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কর্তৃক আরোপিত উড্ডয়ন নিষিদ্ধ এলাকা (No Fly Zone) ইরাক কখনও স্বীকার করে নাই। ঐ এলাকায় মার্কিন ও বৃটিশ জঙ্গীবিমান নিয়মিত টহল দেয়, কিন্তু ইরাকী জঙ্গীবিমান ঐসব টহলদানকারীদের চ্যালেঞ্জও করে, যদিও এই পর্যন্ত তাহারা একটি টহলকারী বিমানও ভূপাতিত করিতে পারে নাই। অপরদিকে ইরাকি অস্ত্র পরিদর্শনে আগত টীমকে ইরাক আর প্রবেশ করতে দেয় নাই। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন মানবিক কারণে ইরাককে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় তেল বিক্রয়ের অনুমতি দানের পক্ষপাতি। এই পর্যায়ে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালূ হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী খাদ্য ও ঔষধসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য মানবিক কারণে বাগদাদকে সীমিত পরিমাণে অপরিশোধিত তেল রফতানির অনুমতি দেওয়া হয়। সাধারণত এই কর্মসূচীর মেয়াদ ছয়মাস করিয়া বাড়ানো হয়।

তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে যে এই মেয়াদ এক সপ্তাহের জন্য সম্প্রসারণ করা হউক। রাশিয়ার প্রবল বিরোধিতার মুখে এই প্রস্তাব কোন প্রকারে পাস হয়। ফ্রান্স ভোট দানে অস্বীকৃতি জানায়। নিরাপত্তা পরিষদে এই ভোটাভোটিতে ইরাকের ব্যাপারে সদস্যদের বিভক্তি প্রকট হইয়া উঠে। তবে পরিষদ ইরাকের প্রশ্নে একটি নয়া ব্যাপক নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ইরাক এক সপ্তাহ সম্প্রসারণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এই মেয়াদ ছয় মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হইলে ইরাক রাজি আছে বলিয়া জানায়, তবে সেই সঙ্গে তাহারা কর্মসূচির পরিবর্তনেরও দাবি জানায়।

ইরাকের উপর আরোপিত অবরোধ শিথিল বা প্রত্যাহারের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন,

রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয়। তবে শিথিল করিবার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের দাবি, শিথিল করিবার পূর্বে বাগদাদকে অবশ্যই জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শকদের তথায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দিতে হইবে। অস্ত্র বিরস্ত্রকরণের শর্তসমূহ বাগদাদকে পূরণ করিতে হইবে এবং বাগদাদকে নূতন পরিদর্শকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিতে হইবে। এই সব কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন। অপরদিকে রাশিয়া ও ফ্রান্স এখনই অবরোধ শিথিল করিবার পক্ষপাতী, চীনের মতও তাই।

অপরদিকে গত ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ নিরাপত্তা পরিষদ ইরাকের তেল বিক্রয়ের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। এই প্রস্তাবে জরুরি সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইরাককে ৬ মাসে ৫শত ২০ কোটি ৬০ লাখ ডলারের তেল বিক্রয়ের অনুমতি দেয়া হয়। (Baghdad, December 13.19.'99, A.P)

নিরাপত্ত পরিষদ শুক্রবার (১৭/১২/৯৯) ইরাকের ব্যাপারে এক প্রস্তাব পাস করিয়াছে এই মর্মে যে, বাগদাদে দ্রুত জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শন টীম পাঠানো হইবে এবং উহার বদলে ৪ মাসের জন্য ইরাকের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে-আর ৪ মাস পর এই প্রত্যাহার ব্যবস্থা নবায়ন করা হইবে।

ইরাক নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সৌদি আরবের সংবাদপত্রগুলি অবশ্য ইরাককে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে যে নয়া জাতিসংঘ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে ইরাক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ফিলিস্তিন ঃ

ইসরাইল ও পিএলও'র বর্তমান অবস্থা হইতে স্বভাবতই মনে হয় মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দুই পক্ষের মধ্যে গত পাঁচ বৎসরে যেটুকু মৈত্রী ও সমঝোতার ক্ষীণ-সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে যে কোন মূহুর্তে। অবস্থা এমন যে, ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৩ সালে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের আগের অবস্থানে ফিরিয়া যাওয়ার বাধ্যবাধকতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন কয়েকদিন আগে। ক্ষুব্ধ চিত্তে তিনি বলিয়াছেন, শান্তির মৌল বিষয়গুলি মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে ইসরাইল উহার জেদ, অস্বীকৃতি এবং টালবাহানা অব্যাহত রাখিলে ফিলিস্তিনীদের পক্ষে পুনরায় ইন্তেফাদা আন্দোলন শুরু করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না।

প্রাথমিক পর্বে শান্তির মৌল বিষয় ছিল দুইটি (১) পশ্চিম তীরে নূতন ইহুদী বসতি বন্ধ করা। (২) পশ্চিম তীর হইতে দখলদার ইসরাইলী বাহিনী দ্রুত প্রত্যাহার করিয়া নেওয়া। ১৯৯৩ সালে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ইসরাইল ও পিএলও'র মধ্যে বহু কাঙ্ক্ষিত যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, সেই চুক্তিতে এই দুইটি বিষয় দ্ব্যর্থহীনভাবে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এবং শান্তি চুক্তির প্রবক্তা আইজ্যাক রবিন এক ইহুদি চরমপন্থীর হাতে নিহত হন। ফলে যাত্রাতেই শান্তি চুক্তি এক ধাক্কা খায়। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী, শ্রমিক দলের শিমন পেরেজ শান্তি চুক্তির অন্যতম প্রধান মৌল বিষয় পশ্চিম তীরে নূতন ইহুদি বসতি স্থাপন না করার ধারা মানিয়া চলিতে শুরু করিয়াছিলেন। এমন কি শিমন পেরেজের আমলে পশ্চিম তীরে অর্ধ-সমাপ্ত বা প্রায় সমাপ্ত ইহুদি বসতির নির্মাণ কাজও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শান্তি চুক্তির দ্বিতীয় ধারা অর্থাৎ পশ্চিম তীর হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের শর্তটি প্রতিপালনে অবশ্য

পেরেজ তেমন কোন সক্রিয়তা দেখান নাই। সৈন্য প্রত্যাহারের গতি ছিল খুবই শ্লথ এবং সৈন্য প্রত্যাহার কর্মসূচি হইয়া পড়িয়াছিল খুবই অনিশ্চিত।

ইহার পরও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু নির্বাচনে শিমন পেরেজের পরাজয় এবং বেনজামিন নেতানিয়াহু প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শান্তির সম্ভাবনা ক্ষীন এমনকি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরে নূতন ইহুদি বসতি নির্মাণের কাজ আবার জোরে শোরে শুরু করিবার সবুজ সংকেত দিয়াছেন। সৈন্য প্রত্যাহার দ্রুত করিবার নির্দেশ দেওয়া দূরে থাকুক, সৈন্য প্রত্যাহারে রীতিমত অস্বীকৃতি জানাইয়াছেন। নেতানিয়াহু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, পশ্চিম তীরে স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই আসে না। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনীরা বসবাস করিতে পারে বড়জোর সীমিত স্বায়ত্তশাসন রুপরেখার আওতায়। সেই ক্ষেত্রেও ফিলিস্তিনীদের গ্যারান্টি দিতে হইবে যে, পিএলও পশ্চিম তীরে হামাস প্রমুখ চরমপন্থী সংগঠন সমূহের সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কাজ কর্ম বন্ধ করিবে।

এই সবই আগের কথা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি মধ্যস্থতায় পিএলও এবং ইসরাইলের মধ্যে শান্তি আলোচনা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা চলিতেছে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সহিত আলাদাভাবে দেখা করিয়াছেন নেতানিয়াহু এবং ইয়াসির আরাফাত। আশা করা গিয়াছিল, পশ্চিম তীরে নূতন ইহুদি বসতি নির্মাণ না করা এবং ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করার বিষয়ে নেতানিয়াহু তাহার সরকারের চরম অবস্থান তুলিয়া নিবেন এবং দুই পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া আবার শুরু হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইসরাইল উহার কট্টর ভূমিকায় এখনও অনড়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ হইতে ইসরাইলকে বলা হইয়াছে কয়েকটি পর্যায়ে পশ্চিম তীর হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিয়া নিতে এবং পাশাপাশি প্রতিটি পর্যায়ে পিএলও-কে স্থানীয় পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে। কিন্তু ইসরাইল ইহাতেও রাজি আছে বলিয়া মনে হয় না (ইত্তেফাক, ৩/২/৯৮)।

পরিস্থিতি বাহির হইতে বিস্ফোরনমুখ বলিয়াই মনে হয়। তবে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা মার্কিন মধ্যস্থতা সঠিক পথেই চলিয়াছে। তবে ইহার মধ্যে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন একটি যৌন কেলেংকারীতে জড়িত হইয়া পড়ায় ইহুদিদের উপর তাহার চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা কিছুটা হ্রাস পাইতে পারে বলিয়া কেউ কেউ মনে করেন। এতদসত্ত্বেও সময় হয়তো বেশি দূরে নহে যখন উভয় পক্ষ একটি অবস্থানে আসিয়া সন্ধি করিতে সম্মত হইবে। ইসরাইলের দর কষাকষির ধরনটা একটু কড়া বটে, তবে শান্তি তাদেরও প্রয়োজন। সেই বাস্তবতা অস্বীকারের উপায় ইসরাইলেরও নাই।

এইদিকে ৯ই ফেব্রুয়ারি '৯৮ ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানিয়া লইতে রাজি হন। তিনি তাহার ভাষায় 'একটি স্বতন্ত্র আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠাকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত। মূলত ইহার মাধ্যমে নেতানিয়াহু ফিলিস্তিনীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকেই মানিয়া লইলেন। জর্দানের বাদশাহ হোসেনের কাছে লেখা এক গোপন চিঠিতে নেতানিয়াহু এই কথা জানান বলিয়া জেরুজালেম হইতে প্রকাশিত 'মারেভ' পত্রিকা জানায়। ইতোপূর্বে নেতানিয়াহু এই ধরনের রাষ্ট্রের স্বীকৃতি প্রকাশের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

এইদিকে এক সাক্ষাৎকারে জর্দানের বাদশাহ হোসেন বলেন, আমরা যাহা (আলজেরিয়া, মিশর ও তুরস্কে) দেখিতেছি তাহা বিশ্বের অন্যান্য জায়গায়ও অবলোকন করিতেছি। ইউরোপে সাবেক পূর্বাঞ্চলীয় বলয়ে (কমিউনিস্ট ব্লক) এবং পৃথিবীর বিভিন্ন

অংশে অস্থিতিশীলতা বিরাজমান। আমি মনে করি, এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার মূল কারণ হইতেছে আরব-ইসরাইলী সমস্যা। এই সমস্যা পরিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হইলে ইহা অস্থিরতা, আশাভঙ্গ এবং ক্ষোভ ও নিরাশা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য যথেষ্ট অবদান রাখিবে। শান্তি স্থাপনের সাথে সাথে এই এলাকার মানুষের গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনে নবযুগের সূচনা হইবে। নিকট অতীতে এই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হইয়াছে এইগুলির প্রত্যেকটির মূল কারণ হিসাবে কাজ করিয়াছে ফিলিস্তিন সংকট। বিভিন্ন সময় এই সমস্যা অনেক দুঃসাহসিকের ক্ষমতারোহণের সোপান হিসাবেও কাজ করিয়াছে। এই সংকট সম্পর্কে আমাদের বলিতেই হইবে (Time, April, 18, 1994)।

ফিলিস্তিনের সর্বশেষ খবর হইল ফিলিস্তিন নেতা ইয়াসির আরাফাত এই বলিয়া সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, ইসরাইলের একগুঁয়ে মনোভাবের কারণে শান্তি প্রক্রিয়া পিছাইয়া যাইতেছে। তিনি ইহুদি এই রাষ্ট্রটির সঙ্গে আরব রাষ্ট্রগুলির কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত তাহা পর্যালোচনার জন্য একটি জরুরি আরব শীর্ষ বৈঠকের আহ্বান জানাইয়াছেন।

ফিলিস্তিনী আইন পরিষদের ১৯৯৮ সালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরাফাত স্বীকার করেন যে, স্বশাসিত সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি বলেন আমরা একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছি এবং শান্তি প্রক্রিয়ার মৃত্যু হইতে চলিয়াছে। শান্তি প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে ইসরাইলী সরকারের সৃষ্ট প্রতিবন্ধতাকে দায়ি করিয়া তিনি বলেন, শান্তি প্রক্রিয়া সামনের দিকে আগাইতেছে না বরং পিছনের দিকে যাইতেছে।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সমগ্র জেরুজালেমকে লইয়া একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পশ্চিম তীর হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে তিনি অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ফলে ইসরাইল-ফিলিস্তিনী শান্তি প্রক্রিয়ার কোন শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছেনা। ফিলিস্তিনী নেতা ইয়াসির আরাফাত ইসরাইলের বৃহত্তম জেরুজালেম পরিকল্পনা গ্রহণের পর সৃষ্ট সংকট রোধে একটি জরুরি আরব শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের জন্য নূতন করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি বলেন এই পরিকল্পনা শুধু ফিলিস্তিনী জনগণের বিরুদ্ধে নহে, আরব এবং ইসরাইলী বিশ্বের বিরুদ্ধেও একটি চক্রান্ত। তিনি শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করিবার সাহায্যার্থে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের ফরাসি-মিশরীয় প্রস্তাব লাইয়াও বাহরাইনের আমির শেখ ইশা বিন সালমান আল-খলিফার সঙ্গে আলাচনা করেন (এএফপি)।

সর্বশেষ প্রতিবেদন ঃ

ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউজে গত শুক্রবার (২৩/১০/৯৮) অন্তর্বর্তীকালীন ফিলিস্তিন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু, ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত, জর্দানের বাদশাহ হোসেন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার ১৯ মাসের অচলাবস্থার অবসান হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূখণ্ড ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবে। অপরদিকে আরাফাত পিএলও সনদ হইতে ইসরাইল বিরোধী ধারাটি বাদ দিবার নিমিত্তে ভোট গ্রহণের জন্য ফিলিস্তিনী জাতীয় পরিষদের সম্মেলন ডাকিবেন। তবে পশ্চিম তীরের ১৩ শতাংশ ভূমি প্রত্যর্পণের পূর্ব শর্ত

হিসাবে নেতানিয়াহু পিএলও সনদ পরিবর্তনকে রাখিয়াছে (এএফপি, ইনকিলাব)।

বিগত ২৩/১০/৯৮ তারিখে অন্তবর্তীকালীন একটি ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইলেও ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম তীরের বসতি স্থাপনকারীদের চাপের মুখে সেই চুক্তি পালন করেন নাই। কিন্তু ১৯৯৯ সালের মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত ইসরাইলের নির্বাচনে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পরাজয় এবং লেবার পার্টির ইহুদ বারাকের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইবার মধ্যদিয়া ফিলিস্তিনে পুনরায় শান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়। শান্তির অন্বেষায় ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার ঘোষণা দিয়া তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করেন। অতএব নেতানিয়াহুর পরাজয় এবং ইহুদ বারাকের জয়ল্যাভের মধ্য দিয়া ইসরাইলী জনগণ শান্তির স্বপক্ষে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন ধরিয়া লওয়া যায়। ক্ষমতায় আগমনের পর পরই তিনি শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে লাগিয়া যান।

রবিবার ২৮শে নভেম্বর ১৯৯৯ ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় মার্কিন ইহুদি সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দের প্রতি শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান এবং এই ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান। বারাক ফিলিস্তিনের সাথে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় ইসরাইলী উদ্যোগের ঘোর বিরোধী ডানপন্থী বিভিন্ন ইহুদি সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানে শান্তি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হইবার আহ্বান জানান।

অপরদিকে পিএলও'র নির্বাহী কমিটি নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়িয়া তুলিবার জন্য পিএলও'র সকল গ্রুপ 'পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন' ভূখণ্ডের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির পর গত আগস্টে প্রথমবারের মত আরাফাতের ফাতাহ গ্রুপের সাথে আলোচনায় মিলিত হয়। গ্রুপটি ইসরাইলের সাথে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। স্বায়ত্তশাসন চুক্তির বিরোধি অপর গ্রুপ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা শুরু করিয়াছে।

সর্বশেষ খবর, ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। জেরুজালেমের মর্যাদা, সীমান্ত নির্ধারণ ও উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনের মত বিতর্কিত বিষয়গুলির মীমাংসা হয় নাই। সম্প্রতি সংঘটিত ইসরাইল-হেজবুল্লাহ সংঘর্ষের পর শান্তি আলোচনা অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে।

মিশর ঃ

বেশ কিছুদিন ধরিয়া গুজব চলিবার পর শেষ পর্যন্ত কায়রো হইতে ৩৫০ কিঃমিঃ দক্ষিণে সিফফা নামক এক গ্রামে বন্দুকধারীরা একটি পুলিশের গাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালাইয়া পাঁচজন অফিসারকে হত্যা এবং সাত জনকে আহত করে। মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক রাগতস্বরে ব্যাপক প্রতিশোধের আদেশ জারি করেন। মুবারকের মুখপাত্র আবদেল মোনেম বলেন "সন্ত্রাসীরা লাল সীমারেখা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। আমরা তাহাদের ধ্বংস করা পর্যন্ত দমন নীতি চালাইয়া যাইব।" মৌলবাদীদের পাকাপোক্ত আস্তানা আসিয়াও অঞ্চলের মধুবন ও ইক্ষু ক্ষেতে অবস্থিত সন্ত্রাসীদের গোপন ঘাটিসমূহ সনাক্ত করিবার জন্য সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারসমূহ আকাশে উড়াল দেয়। কায়রো হইতে বাড়তি ৩০০০ গেরিলা যোদ্ধা লইয়া পুলিশ সমস্ত এলাকা চষিয়া ফেলে এবং এক গোরস্থানে সম্মুখ যুদ্ধে

সাত জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করে এবং বহু সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করে।

মিশরে এই পর্যন্ত সংঘটিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপে পর্যবেক্ষকগণ আশংকা ব্যক্ত করেন যে, দেশটি হয়তো আরেক আলজেরিয়া হইতে চলিয়াছে। আলজেরিয়ার মৌলবাদী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে এই পর্যন্ত প্রায় ৪০০০ লোক প্রাণ হারাইয়াছে। মিশরে আলজেরিয়ার মত এত ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত না হইলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৯২ সাল হইতে এই পর্যন্ত ৩৩০ জন মিশরীয়, অধিকাংশ পুলিশ ও সন্ত্রাসী গুপ্ত হত্যার শিকার হইয়াছে অথবা সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও চারিজন পর্যটক নিহত হইয়াছেন এবং ৩১ জন আহত হইয়াছেন। ফলে মিশরীয় অর্থনীতির একটি প্রধান উৎস পর্যটন খাতে আয় ১৯৯২ সালে ২০০.২০ কোটি ডলার হইতে গত বছর ১০০.৩০ কোটি ডলারে নামিয়া আসে।

মিশরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পটভূমিকা আলজেরিয়ার মতই প্রকট অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান পার্থক্য, সরকারি দূর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক স্থবিরতা লইয়া গণ অসন্তোষ। তবে এই দুই দেশের অবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। আলজেরিয়ানদের বিপরীতে মিশরীয়রা ফেরাউনের যুগ হইতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অভ্যস্ত এবং ধর্মীয় চরমপন্থীদের তরফ হইতে স্বততঃ চ্যালেঞ্জের মুখে, ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। মিশরের সেনাবাহিনীও কোন রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে না। অন্ততপক্ষে বর্তমানে সেনাবাহিনীর লোকদিগকে মৌলবাদীদের দমন করিবার কাজে নিয়োজিত করা হয় না। চরমপন্থীরা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিতে পারে এবং বৈদশিক মুদ্রা আয় হ্রাস করিতে পারে। কিন্তু তাহারা সরকার উৎখাত করিতে পারে না, মন্তব্য করেন কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অব পলিটিক্যাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের পরিচালক আলী ফেসৌকী। "রাষ্ট্র ভারসাম্যপূর্ণ।"

পাশ্চাত্য চায় ইহা একইভাবে থাকুক। একজন সিনিয়র পেন্টাগন কর্মকর্তা বলেন, "আরব বিশ্বে মিশর অত্যন্ত প্রভাবশালী দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন বন্ধু" –এইজন্য মোটেই নয় যে কায়রোও ওয়াশিংটনের মধ্যপ্রাচ্য নীতিতে নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে। মুবারক সরকার কোন মৌলবাদী স্রোতে আক্রান্ত হইলে ইসরাইল ও আরবদের মধ্যকার শান্তির আশা ধুলিস্যাৎ হইয়া যাইবে। অধিকন্তু মরক্কো হইতে সৌদি আরব পর্যন্ত সমস্ত মধ্যপন্থী আরব সরকারসমূহ হুমকির সম্মুখীন হইবে।

আপাতত হয়তো হোসনি মুবারক সন্ত্রাসীদের দমন করিয়া রাখিতে পারিবেন, কিন্তু কিছুসংখ্যক মিশরীয় উদ্বিগ্ন এই জন্য যে প্রাপ্ত সময়ে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন না। এই সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবেন। যাহাতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করা যায়। কিন্তু তিনি এই সাক্ষাৎকারে ইসলামী মৌলবাদীদের বিশেষতঃ প্রধান দল মুসলিম ব্রাদারহুড (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ)-কে আমন্ত্রণ জানান নাই। এই কাজে তিনি ইসলামিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ উভয় গ্রুপের বুদ্ধিজীবীদের সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। কারণ তাহারা মনে করেন, এই সম্মিলনীর দ্বারা যে সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে তিনি তাহার সরকারের সমর্থকগোষ্ঠীর ভিত্তি এবং গণতন্ত্রকে আরও সম্প্রসারণ করিতে পারিতেন।

[আটআশি]

সমস্যাতো সরকার ও ইসলামী দলগুলির মধ্যে নহে, একজন স্বতন্ত্র ইসলাম পন্থী ফাহ্‌মী হাওয়েজী বলেন, "সমস্যা হইল সরকার এবং ক্ষমতা বঞ্চিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ইসলামীদের মধ্যে। ইবনে খালদূন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের পরিচালক সা'দ আলদীন ইব্রাহিমও এই মত সমর্থন করেন। অবাধ নির্বাচনের শূন্যতা একটি ক্রমবর্দ্ধমান বিপদ।"

বিদেশী ও স্থানীয় পর্যবেক্ষক উভয়ের মতে গণতান্ত্রিক ব্যাপক ভিত্তি প্রদান করা ছাড়াও সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার ও শিল্পকারখানার ব্যক্তি মালিকানা ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। কারণ এইগুলি উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরি। কর্মসংস্থানের সৃষ্টিতে ব্যর্থতার দরুন দেশের ক্রুদ্ধ যুব শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে এবং ফলে মুবারকের নেতৃত্বের প্রতি তাহারা আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। মেট্রোপলিটান কায়রোর একটি অঞ্চল গীর্জার গভর্নর আবদুল রহিম শেহাতার মতানুযায়ী মিশরের অসন্তোষ দূরীভূত করিবার প্রধান উপায় হইতেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা ব্যাপকতরকরণ এবং মিশরের বুর্জোয়া লোকদের জন্য কর্মসংস্থান করা। মুসলিম চরমপন্থীদের এককালীন শক্ত ঘাটি ইম্‌বাবার অধিবাসী শেহাতা উন্নয়নের অনুরোধ পাইয়া উৎসাহ বোধ করেন। কারণ ইহার অর্থ হইল জনগণ এখনও সরকারের উপর আস্থা হারায় নাই (Times, April, 1, 1994)।

মিশরে বিদেশী পর্যটকদের উপর আবার হামলা হইয়াছে। কিন্তু কোন সংগঠন ইহার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে নাই। আক্রমণটি মনে হয় পূর্ব পরিকল্পিত। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী দুইজন বন্দুকধারী পর্যটন বিভাগের গাইড ও ড্রাইভারের সাদা শার্ট ও টাই পরা অবস্থায় ছিল। তাহারা সর্বোচ্চ সফলতা লাভের উদ্দেশ্যে সঠিক সময় ও স্থানে আঘাত হানে—দুপুর বেলায় কায়রো নগরীর তাহের স্কোয়ারে পৌরাণিক বাদশাহ্‌ তাউতের ধন-সম্পাদ রক্ষিত যাদুঘরের আংগিনায়। একদল জার্মান পর্যটক যাদুঘরের সামনে দণ্ডায়মান বাসে আরোহণ করিবা মাত্রই হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ হয়। আক্রমণকারীরা বাসে গুলিবর্ষণ করে এবং দুইটি মলোটভ ককটেল মারিয়া বাসটিতে আগুন ধরাইয়া দেয়। মিশরীয় পুলিশ পাল্টা আক্রমণ করে। হাঙ্গামা থামিলে দেখা যায়, নয় জন জার্মান ও তাহাদের ড্রাইভার মৃত এবং আরও এক ডজন লোক আহত।

মিশরের কাঙ্ক্ষিত পর্যটন ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে সরকার জোর দিয়া বলে যে এই ঘটনার সহিত দেশের ইসলামী বিদ্রোহী গ্রুপের কোন সম্পর্ক নাই। উল্লেখ্য, ইসলামী বিদ্রোহী গ্রুপের হাতে বিগত পাঁচ বৎসরে ২৬ জন বিদেশী পর্যটক সহ ১১০০ জন লোক প্রাণ হারায়। কর্মকর্তাগণ বলেন, তাহের স্কোয়ারের ঘটনায় দুইজন বন্দুকধারীকে পুলিশ আহত অবস্থায় গ্রেফতার করে। তাহাদের একজনের নাম সাবের আবু আল-আলা। গত সপ্তাহে তাহাকে একটি মানসিক হাসপাতাল হইতে ছাড়া হইয়াছে। চারি বৎসর পূর্বে দুইজন মার্কিন ও একজন ফরাসি লোককে হত্যার অপরাধে তাহাকে ঐ হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। অপর আটক ব্যক্তিকে তাহার ভাই মাহামুদ বলিয়া পুলিশ সনাক্ত করে। প্রতিবেশীগণ জানান, সাবের-আল-আলা একজন ভাবুক ও একাকী জীবনযাপনকারী, তাহার সহিত ইসলামী সংগ্রামীদের কোন সম্পর্ক নাই এবং সে এমনকি ইসলামী আচার অনুষ্ঠান পালনকারীও নহে। ইহা কোন রাজনৈতিক বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নহে বরং মানসিক প্রতিবন্ধীকজন অপরাধী ও তাহার ভাইয়ের কাজ, পর্যটন মন্ত্রী বলেন।

তবে সরকারের সমালোচকদের সন্দেহ রহিয়াছে। কায়রো নগরীর মধ্যস্থলে এই ধরনের হত্যাকাণ্ড কোন মানসিক প্রতিবন্ধীর কাজ হইতে পারে না-পত্রিকা কলামিস্ট মোহাম্মদ সিদ আহমদ বলেন, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সরকার মনে করে নিরাপত্তাজনিত সমস্যা তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। একটি নৃশংস হামলার দ্বারা ইসলামী বিপ্লবীদের ঠাণ্ডা করা হইয়াছে। গত সপ্তাহে একটি আদালত ৭২ জন মুসলিম চরমপন্থীকে দোষী সাব্যস্ত করে এবং তাহাদের মধ্য হইতে চারিজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং আট জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। বিদেশী পর্যটকদের সংখ্যা ১৯৯৩ সালের ২৫ লক্ষ হইতে এই বৎসর পরিকল্পিত ৪২ লক্ষে উন্নীত হয়। এই আক্রমণের আগের দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বক্তৃতায় গর্ব করিয়াছিলেন, সন্ত্রাসীদের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে এবং কয়েকজন পলাতক ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নাই।

রক্তপাত ঘটাইবার জন্য কয়েকজন মাথা গরম লোকই যথেষ্ট। কেউ গত সপ্তাহের হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব স্বীকার না করিলেও ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন পর্যটক তাহাদের পরিকল্পনা বাতিল করিয়াছেন। মিউনিখ ট্র্যাভেল এজেন্ট রবার্ট ফউফম্যান বলেন, পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ পর্যটকের সংখ্যা কম থাকিবে এবং ইহার মধ্যে অন্য কোন ঘটনাও না ঘটিলে পর্যটন ব্যবসা পুনরায় চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। "কিন্তু ইতোমধ্যে একটি ঘটনাও ঘটিলে ব্যবসা সত্যিই মার খাইবে" এবং ইহাই হোসনী মুবারকের বিরোধীরা চান (Newsweek, Sept. 2, 1997)।

আফগনিস্তান ঃ

পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইলে কিছুদিন অবস্থা শান্ত থাকে। কিন্তু শীঘ্রই প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানীর সহিত তাহার মতবিরোধ হয় এবং তিনি কাবুল অবরোধ করেন। ইতোমধ্যে তালেবান যোদ্ধাদল কাবুল দখল করিয়া উত্তর দিকে মাজার-ই-শরীফের দিকে অগ্রসর হয়। মাজার-ই-শরীফ একমাত্র প্রধান নগরী যাহা এখনও তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে আসে নাই। ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ কান্দাহারে তাহাদের ঘাটি হইতে নির্গত হইয়া তালেবান (ছাত্রদল) ইসলামী যোদ্ধারা প্রায় সমগ্র আফগানিস্তান জয় করিয়া মাজার-ই-শরীফের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহারা আফগানিস্তান শাসনকারী জমিয়তে ইসলামীর নেতা প্রেসিডেন্ট বোরহানুদ্দিন রব্বানীর নিকট হইতে জাতীয় রাজধানী কাবুল দখল করিয়া উত্তরে মাজার-ই-শরীফের উপর আঘাত হানে। মাজার-ই-শরীফ যে অঞ্চলের রাজধানী তাহাতে উহার নিজস্ব মুদ্রা ও নিজস্ব বিমান সার্ভিস রহিয়াছে এবং অতীত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মধ্য এশিয়ার জাতিসমূহের সাথে সাংস্কৃতিক বন্ধনও রহিয়াছে। কিন্তু মাজার-ই-শরীফ দেশের সর্বশেষ স্বাধীন জমিদারীর চাইতেও বেশি কিছু। তালেবানদের হাত হইতে পলাতক হাজার হাজার মহিলা ও শিক্ষিত লোকের জন্য ইহা একটি আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ কাবুলের উপর তালেবানদের নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কঠোর হইয়া আসিতেছে। তালেবান নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের ন্যায় এইখানে এখনও মহিলাদের পর্দাপ্রথা তেমন কড়াকড়ি নহে। এখনো তাহারা এইখানে পর্দা ছাড়া স্কুল কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাইতে পারে এবং ঘরেও পর্দাবিহীন খোলা জানালা রাখিতে পারে।

গত বসন্তকালের বাদাম ও কিসমিশের নব কিশলয় মাজার-ই-শরীফের অধিবাসীদের

জন্য ভয়াবহ বিপদের বার্তা লইয়া আসে। এমনকি প্রচণ্ড শীতের সময় তালেবান যোদ্ধারা দক্ষিণাঞ্চলের হালকা পোশাক, কখনো কখনো খালি গায়ে বরফের উপর দিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে মাজার-ই-শরীফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকা দখল করিয়া আসে। এখন গরম আবহাওয়ায় নূতন আক্রমণ তাহাদের জন্য আরামপ্রিয়। তালেবানদের চূড়ান্ত বিজয় "সময়ের ব্যাপার মাত্র"– মন্তব্য করেন তালেবান সর্বাধিনায়ক মোল্লা মোহাম্মদ ওমর।

নগরীর প্রতিরক্ষাকারী আবদুর রশিদ দোস্তাম সোভিয়েত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একমাত্র জীবিত এবং একটি শক্তিশালী ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ। তবুও ১৯৯৬ সালে দোস্তাম স্যালাঙ্গ গিরিপথের রাস্তা উড়াইয়া দিয়া তালেবানদের অগ্রযাত্রা রুখিবার জন্য শেষ প্রচেষ্টা চালান। উত্তর ও দক্ষিণকে বিভক্তকারী পাহাড়ের একমাত্র সুড়ঙ্গের নাম স্যালাঙ্গ টানেল। বর্তমানে তিনি এবং তাঁহার জটিল মিত্র এককালের সোভিয়েত বিরোধী বিদ্রোহী নেতা আহমদ শাহ মাসুদ রক্ষণভাগে। কিছুদিন আগে দোস্তাম বলেন "আমাদের আক্রমণ করিবার কোন পরিকল্পনা নাই, তবে আমরা আক্রান্ত হইলে আমাদের নিজেদের রক্ষা করিবার পরিকল্পনা আছে।"

তালেবান যোদ্ধারা প্রধানত পাকিস্তান ও সৌদি আরবের আর্থিক সাহায্যে মাদ্রাসার ছাত্রদের লইয়া গঠিত ইসলামী যোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অস্ত্র–শস্ত্র সজ্জিত করে এবং নৈতিক বলে বলিয়ান একটি সুদক্ষ বাহিনী গড়িয়া তোলে। ইতোমধ্যে উভয় দিকে দোস্তাম-মাসুদ বাহিনীকে উজ্জীবিত করিবার জন্য প্রত্যেক রাতে ইরানী সরবরাহ ট্রাকসমূহ সশব্দে মাজার-ই-শরীফে প্রবেশ করে। দোস্তামের লোকজন রুশ উর্দি পরিধান করে এবং রুশ অস্ত্র বহন করে। একটি পাশ্চাত্য গোয়েন্দা সূত্র অনুযায়ী, প্রতিবেশী উজবেকিস্তান দোস্তামকে মিগ-২১ জঙ্গীবিমান সরবরাহ করে। অপরদিকে প্রতিবেশী তাজিকিস্তান মাসুদকে কুলাইব-শহরে একটি সরবরাহ ঘাটি প্রদান করে (Newsweek, April 14, 1997)।

ঐদিকে উত্তরে উজবেকিস্তান প্রচণ্ড চাপের মধ্যে দিনাতিপাত করে কখন তালিবান বাহিনী বন্ধুত্বের পুল (Friendship Bridge) পার হইয়া উজবেকিস্তানে প্রবেশ করে। এই পুল আফগানিস্তান ও তদানীন্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেকিস্তানের মধ্যে প্রধান প্রবেশদ্বার হিসাবে কোজ করে। তাহাদিগকে তেমন দোষও দেওয়া যায় না, কারণ গত সপ্তাহে আফগান গৃহযুদ্ধের ঢেউ উজবেক সীমান্ত পর্যন্ত আসিয়া পৌছে। বন্ধুত্বের পুলের ৬০ কিঃ মিঃ দক্ষিণের স্থানটি বিগত দুই যুগের আফগান গৃহযুদ্ধের সময় হইতে একটি চমৎকার ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে বিদ্যমান। শান্তিপূর্ণ এই স্থানটি গত সপ্তাহে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তালেবান বাহিনী হঠাৎ মাজার-ই-শরীফ আক্রমণ করিয়া দখল করিয়া লয়। আবদুর রশীদ দোস্তাম তাহার ব্যক্তিগত জেট বিমানে করিয়া তুরস্কে পলায়ন করেন। তাহার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালিক পালওয়ান শহরটি তালেবানদের হতে ছাড়িয়া দেয়। মাজার-ই-শরীফ দখল করিয়া তালেবান সেখানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু হইবার ঘোষণা দেয় এবং অস্ত্রশস্ত্র জমা দিতে বলে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মালিক পালওয়ান বিদ্রোহ করেন এবং তালেবানদিগকে মাজার-ই-শরীপ ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। (Newsweek, June 9, 1997)।

তালেবানদের উৎপত্তি ঃ

তালেবানদের উৎপত্তির ইতিহাস অনুমান ও গুজবনির্ভর। রণকৌশল, শক্তিমত্তা, কৌলিন্য ও কার্যকরী কর্মপন্থায় অদ্বিতীয় তালেবান নামের এই আফগান বাহিনী। বিদেশী পরিকল্পনা,

অর্থ ও অস্ত্রের জোরে গঠিত এই বাহিনীর মূলে কাজ করিয়াছে একজন ধর্মীয় নেতা ও একজন বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত ব্যক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে একজন সন্ত্রাসীর কৌশলগত মিত্রতা। এই জোটের মধ্যে আরও রহিয়াছে মধ্য এশিয়ার স্থলবেষ্টিত তেল সম্পদ সমুদ্রে বহনকারী সম্ভাব্য পাইপ লাইনের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নির্মাতার মধ্যে সংঘর্ষ। তালেবান এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক কোন যোগসূত্র পাওয়া না গেলেও তালেবানদের পিছনে সক্রিয় রহিয়াছে ঐ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ঘনিষ্ঠ মিত্র-রিয়াদ ও ইসলামাবাদ। তবে ইহাদিগকে একটি শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন নিভৃতাচারী আফগান মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে একদল ধর্মীয় গোষ্ঠী।

তালেবানদের গোড়াপত্তন হয় ১৯৮০ সালের শুরুতে। পাকিস্তানের স্পেশাল অপারেশনের অফিসার সুলতান আমিরের হাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধিকাংশ ধর্মীয় যোদ্ধা আসিয়াছে সনাতন গ্রাম্য ধর্মীয় মাদ্রাসা হইতে। এই ধরনের যুবকদের সাধারণভাবে তালেবান বা ছাত্র বলা হয়। এইসব অভিজাত যোদ্ধাদের একটি অংশকে রুশ বিরোধী মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। অবশিষ্টগণকে প্রাচীন গোত্র ব্যবস্থার বাহিরে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত বিশেষ যোদ্ধা দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমেরিকার সিআইএ (C.I.A) সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহের জন্য কোটি কোটি ডলার প্রেরণ করিবার সময় ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মীয় দলের কোন বাছ-বিচার করে নাই। যুদ্ধ চলাকালে সৌদি আরব উদ্বাস্তু শিবিরে কোরআন শিক্ষার জন্য অর্থ প্রেরণ করে। ১৯৯২ সালে কাবুলের মস্কো সমর্থিত সরকারের পতনের সময় এইসব তালেবানদের সংখ্যা কয়েক হাজারে দাঁড়ায়। ছাত্ররা তাহাদের গ্রামে এবং মাদ্রাসায় প্রত্যাবর্তন করে কিন্তু তাহারা এই সংকল্প ও ঐক্য লইয়া যায় যে কখনো যুদ্ধের প্রয়োজন হইলে তাহারা পুনরায় অস্ত্র ধারণ করিবে।

এই যুদ্ধের ডাক আসে হঠাৎ করিয়া ১৯৯৪ সালে। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সৈন্যদল ঘরে ফিরিয়া গেলে ইসলামাবাদে মার্কিন সাহায্য স্রোতে ভাটা পড়ে নতুন অর্থের উৎসের সন্ধানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভূট্টো করাচী হইতে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত প্রাচীনকালের সিল্কপথ সরাসরি আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া খুলিবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বোধ হয় চিন্তা করেন নাই যে মধ্যবর্তীদের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি শক্তভাবে স্থানীয় ডাকাতদল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই বছর ৩০ ট্রাকের একটি বহর ঔষধ ও খাদ্য লইয়া পাকিস্তান হইতে দক্ষিণ আফগান শহর কান্দাহারের মধ্য দিয়া তুর্কমেনিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়। পাকিস্তানের গুপ্তচর শাখার একজন চৌকস অফিসার সুলতান আমির এই বহরের নেতৃত্ব দেন। এই আমির অতীতে ১৫ বৎসর ধরিয়া সোভিয়েত বিরোধী যুবক মোজাহিদ গেরিলা দলকে প্রশিক্ষণ দান করেন। এইগুলি আফগানিস্তানে মার্কিন সাহায্য সম্ভার আনিবার পূর্বের কথা। মুজাহিদ যুবকগণ তাহাকে ইমাম হিসাবে জানে এবং অনেকটা ধর্মীয় অনুভূতিতে শ্রদ্ধা করে। পরবর্তীকালে গঠিত তালেবান বাহিনীতে তাহার হাতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুজাহিদও রহিয়াছে। যাহা হউক, এই ট্রাক বহর একজন স্থানীয় সন্ত্রাসী নেতা নিয়াজ ওয়ায়ান্দ কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং স্বয়ং আমির ভীষণভাবে প্রহৃত হন। তাঁহার পুরাতন মুজাহিদ শিষ্য ছাত্রগণ এই খবর পাইয়া তাহাকে উদ্ধারের জন্য আগাইয়া আসে এবং নিয়াজকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। এইসব ডাকাতদের উপর বিরক্ত হইয়া তালেবানগণ ধর্মীয় শিক্ষক মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে কান্দাহার দখল করিয়া লয়।

[বিরানব্বই]

এই অপ্রত্যাশিত বিজয় আফগানদের মধ্যে বিদ্যুতের মত কাজ করে। প্রাচীন কোরআনী বা কাওমী মাদ্রাসার মুজাহিদগণ আফগানিস্তানকে সন্ত্রাসমুক্ত করিবার স্বপ্ন দেখে। এখন তাহারা দলে দলে কান্দাহারে একত্রিত হয়। আইন-শৃঙ্খলাহীন আফগানিস্তানে আরও অধিক প্রভাব বিস্তারে আগ্রহী পাকিস্তান এখন আন্দোলনকে আরও চাঙ্গা করিবার জন্য সাহায্যের হাত বাড়ায়। সাহায্যের মধ্যে ছিল বেশ কিছু সংখ্যক অভিজ্ঞ ট্যাংক চালক ও পাইলট এবং দুইজন নওমুসলিম সামরিক উপদেষ্টা। তাহাদের একজন হইলেন সুলতান আমির। ইহাদিগকে কূটনৈতিক আচরণে পশ্চিমাঞ্চলীয় নগরী হেরাতে পাঠানো হয়। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে তালেবানদের উত্থানকে অনেকটা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। পাকিস্তান তাহার সাহায্য সম্ভারকে বেশ গোপন রাখে এবং আস্তে আস্তে আমেরিকর সিআইএ (CIA) ও আগমন করে।

সফলতা তালেবানদিগকে প্রায় ধ্বংসই করিয়া দিয়াছিল। যোদ্ধারা অতঃপর ইসলামাবাদের পরামর্শে কান না দিয়া পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার সতর্কবানি অবহেলা করিয়া ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কাবুল আক্রমণ করিয়া বসে। তাহাদের কাবুল আক্রমণ ছিল অনেকটা পাগলা ঘোড়ার মত। ফলে তাহারা শুধু আরেক কাবুল অবরোধকারী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয়। অতঃপর কাবুল সরকার গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করে এবং কামানের গোলা হইতে পলাইবার পূর্বেই প্রায় ৪০০ তালিবান নিহত হয়।

তালেবানগণ কোন প্রকারে টিকিয়া থাকে। সেই সময় সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত মোল্লা ওমরের সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার জন্য রাস্তার বাহিরে চলিবার উপযোগী গাড়ি এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও নূতন সাহায্য লইয়া হাজির হয়। রিয়াদ হইয়া গেল তালেবান অর্থের প্রধান যোগানদার এবং বেতন প্রদানকারী হইলেন যুবরাজ তুর্কী বিন ফয়সাল। তালেবান বার্তাবাহকদের লইয়া সৌদি গোয়েন্দা প্রধান প্রতিনিয়ত রিয়াদে নিয়মিত বৈঠকে বসেন। ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে তালেবান বাহিনী কাবুল অভিযানে বাহির হয়। ওসামা বিন লাদেন নামক একজন চরমপন্থী সৌদি নাগরিক আর্থিক সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসেন। ওসামাকে ধরিবার জন্য মার্কিন বিচার বিভাগ ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। তিনি বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপকে সাহায্য করেন বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে। সৌদি আরবের খোবার নামক মার্কিন সামরিক ঘাটিতে আত্মঘাতি ট্রাক বোমা হামলায় তাহার হাত রহিয়াছে বলিয়াও যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে। আফগান ও পশ্চিমা সূত্র অনুযায়ী মোল্লা ওমরকে প্রদত্ত ওসামা বিন লাদেনের উপহারের পরিমাণ ৩০ লক্ষ ডলার। বর্তমানে ওসামা তাঁহার ১৬০ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারবর্গ লইয়া পারিবারিক ৩ কোটি ডলারের লভ্যাংশ সহ মোল্লা ওমরের বন্ধু হিসাবে কান্দাহারে অবস্থান করিতেছেন। তালেবানদের উজ্জ্বল ধর্মীয় চেতনা এবং কাবুলের আশেপাশের গোত্রপ্রতিদের আত্মসমর্থনের মাধ্যমে শীঘ্রই কাবুলের পতন হয়।

কাবুলের পতনের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসন তালেবানদের ব্যাপারে নির্বিকার ছিল। মহিলাদের ব্যাপারে কড়াকড়ি সত্ত্বেও মধ্যপদবীর কর্মকর্তাগণ আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে তালেবানদের ভূমিকার বেশ প্রশংসা করেন। তবে তাহারা আফিম ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত ট্যাক্সের সমালোচনা করেন। উল্লেখ্য, সর্বকালে আফগানিস্তানে আফিমের ব্যবসা একটি অতি লাভজনক ব্যবসা বলিয়া বিবেচিত।

মার্কিন প্রশাসন এখনো তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। তবে কাবুলের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি যোগাযোগ রহিয়াছে। যদিও মার্কিন ব্যবসায়ীগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতেছেন। একটি মার্কিন নির্মাণ সংস্থা তুর্কমেনিস্তান হইতে আফগানিস্তানের ভিতর দিয়া পাকিস্তান পর্যন্ত তেলের পাইপ লাইন নির্মাণের কাজে লিপ্ত রহিয়াছে এবং শীঘ্রই তাহারা আফগানদিগকে এই কাজে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করিবে বলিয়া জানাইয়াছে। অপর একটি আর্জেন্টাইন কোম্পানিও এই কাজে নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করিতেছে। উভয় কোম্পানি আফগানদের বিষয়ে তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য সৌদি কোম্পানিদের ভাড়া করিয়াছে। উভয়ে আফগানিস্তানে কর্মরত প্রাক্তন মার্কিন কূটনৈতিকদিগকে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়াছে। তবে সময় যতই অতিবাহিত হইতেছে তালেবানদের ব্যাপারে মার্কিন নীতি পাইপলাইন রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হইবার সম্ভাবনা বেশি (Newsweek, October. 13, 1997)।

তালিবানদের সহিত উত্তরে যুদ্ধরত ক্ষমতাচ্যুত আফগান প্রেসিডেন্ট রব্বানীর অনুগত রশীদ দোস্তা ও আহমদ শাহ মাসুদের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একাধিক বৈঠক তেহরান ও অন্যত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বশেষ বৈঠক পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তানে বিরদমান গোষ্ঠীগুলোর প্রতিনিধিগণ তাহাদের মধ্যকার গভীর বিভেদ দূর করিবার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিতদের লইয়া একটি কমিশন গঠন করিবার বিষয়ে একমত হন। ইসলামাবাদে তাহাদের বর্তমান শান্তি আলোচনার চতুর্থ দিনে গতকাল (২৯/৪/৯৮) প্রতিনিধিগণ এই বিষয়ে সম্মত হন। ইহার মধ্য দিয়া তাহারা দুই দশকের সংঘাত বন্ধের লক্ষ্যে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ লন। জাতিসংঘ এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) ইসলামাবাদে এই আলোচনার ব্যবস্থা করে। ওআইসির একজন মুখপাত্র জানান, প্রতিনিধি দলগুলি একটি ওলামা কমিশন গঠনের ব্যাপারে একমত হন। প্রত্যেক পক্ষ এই কমিশনের সদস্য হিসাবে তাহাদের মনোনীত আলেম বা ইসলামী ধর্মীয় পণ্ডিতদের নাম জমা দেন। কোন পক্ষই অপর পক্ষের কোন সদস্যের নাম তালিকা হইতে বাদ দিবার দাবি করিতে পারিবে না। বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে ওলামা কমিশন ইসলামী আইন বা শরীয়া অনুযায়ী দেশ পরিচালনার সিদ্ধান্ত লইবেন এবং সেইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবেন। শান্তি প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কর্মকর্তাগণ আশা করেন অতঃপর যুদ্ধবিরতি ও যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের বিষয়ে আলোচনা হইবে।

গতকালের আলোচনা বৈঠকে ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত টমাস সাইমনস যোগ দেন। উভয় পক্ষকে আলোচনার টেবিলে বসিতে সম্মত করিবার ব্যাপারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিল রিচার্ডসন মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তালেবান পক্ষের আলোচক এবং পাকিস্তানে তালেবান রাষ্ট্রদূত আবদুল হাকিম মুজাহিদ বলেন, আমরা এই ব্যাপারে যথেষ্ট ছাড় দিয়াছি (বিবিসি)।

কিন্তু সিএনএন এর ৪ঠা মে '৯৮'র খবরে প্রকাশ বিবাদমান দুই পক্ষের শান্তি আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তালেবান বাহিনীর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার ও বন্দী বিনিময়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের পর আলোচনা বৈঠক ভাঙ্গিয়া যায়। জাতিসংঘ প্রতিনিধি জেমস নব বলিয়াছেন, বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হইয়াছে। তালেবান আলোচক হাকিম মুজাহিদ বলেন, সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার এবং বন্দী বিনিময়ের জন্য তাহারা প্রস্তাবিত গভর্নিং কমিশন চান। কিন্তু গভনিং কমিশন গঠনের বিষয়টি বিরোধী জোট পরে আলোচনা

করিতে চায়। আলোচনা হইতে কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয় নাই। শুধুমাত্র উভয়পক্ষ সাময়িকভাবে বড় ধরনের হামলা চালানো হইতে বিরত থাকিবার ব্যাপারে একমত হয়। তালেবান মিলিশিয়া বাহিনী আফগানিস্তানের ৮৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরাঞ্চলীয় অবশিষ্ট ১৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে বিরোধী জোট। বিরোধী জোটের মুখপাত্র রসূল তালিব বলেন, তাহারা মধ্য আফগানিস্তান হইতে অবরোধ প্রত্যাহার চান। জাতিসংঘ বলিয়াছে এখানে অনাহারে শতাধিক লোক মারা গিয়াছে। হাজার হাজার আফগান খাদ্য সংকটে পড়িয়াছে (বিএনএস, সিএনএন)।

তবে উভয় পক্ষ বড় ধরনের হামলা চালানো হইতে বিরত থাকিবার অঙ্গীকার করিলে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কাবুলের ২৫ কিলোমিটার উত্তরে উভয় পক্ষ বেশ বড় ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তালেবান বাহিনী বিমান আক্রমণের সুযোগ লইয়া সম্মিলিত বাহিনীকে বেশ পর্যুদস্ত করিতে সক্ষম হয়। এই সংঘর্ষে তালিবান বাহিনী বেশ বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করিয়াছে বলিয়া দাবি করে। অতঃপর মধ্য ও পশ্চিম আফগানিস্তানে বড় ধরণের সফলতা অর্জনের পর তাহারা উত্তরে তালিবান বিরোধী জোটের সদর দফতর মাজার-ই-শরীফ অবরোধ করে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তালিবান বাহিনী উহা দখল করিয়াছে বলিয়া রয়টার, এএফপি ও বিবিসির খবরে প্রকাশ। শহরটির বিমানবন্দরসহ সব কয়টি কৌশলগণ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তাহাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। বিরোধী বাহিনী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পার্শ্ববর্তী সামানগান এলাকায় পলায়ন করে। গতকাল (৮/৮/৯৮) খুব ভোরের দিকে রকেট ও বিমান হামলা চালাইবার পর সম্পূর্ণ শহরটি তালিবান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। সর্বশেষ এই বৃহত্তম শহরটি দখলের মাধ্যমে প্রায় গোটা আফগানিস্তান তালেবানদের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসে। পাশ্চাত্য সূত্রে বলা হয় মুসলিম মিলিশিয়ারা গতকাল ভোরে প্রচণ্ড হামলা চালাইয়া বিরোধী বাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং তাহারা নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দখল করিয়া লয়। ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনার খবর অনুযায়ী তালেবানরা মাজার-ই-শরীফ দখল করিয়া লইয়াছে এবং আফগান বিরোধী জোট মাজার-ই-শরীফের পতনের কথা স্বীকার করিয়াছে (ইনকিলাব, আগস্ট ৯, ১৯৯৮)।

উত্তর আফগানিস্তানের মাজার-ই-শরীফ দখলের পর তালেবানরা মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেয়। দীর্ঘ দিনের যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং গোষ্ঠীগত বিবাদে আক্রান্ত আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা পর্বত প্রমাণ দুরূহ কাজ। তালেবানরা আফগানিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্রের আদলে গড়িয়া তোলার প্রয়াস পায়। ইহারই অংশ হিসাবে তাহারা মহিলাদের কঠোর পর্দা প্রথা প্রবর্তন করে এবং তাহাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। একাকী কোন মহিলার ঘর হইতে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেয়। তদুপরি তাহারা ইসলামী দণ্ডবিধিও (Islamic penal code) চালু করে।

এই সমস্ত বিধি ব্যবস্থা চালু করিবার ফলে, বিশেষত মহিলাদের ব্যাপারে বিধি নিষেধ আরোপের ফলে পাশ্চাত্য জগত তালেবানদের সমালোচনা করে।

তুরস্ক ঃ

প্রায় ১১ মাস পূর্বে (জুন, ১৯৯৩) মহিলাদের উল্লাসের মধ্যদিয়া তানসু সিলার আংকারার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সমাসীন হন। আত্মবিশ্বাসী এবং নূতন নূতন ভাবধারায় উজ্জীবিত

প্রধানমন্ত্রী তুরস্কে নব প্রাণের সঞ্চার করেন। নূতন প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের ধ্বজাধারী হিসাবে সিনার কর্তৃক তুরস্ককে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রধান চাবিকাঠিতে রূপান্তরিত করিবার আশায় সবাই বুক বাঁধে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তানসু সিলার তাহার প্রথম বক্তৃতায় দেশে বিরাট পরিবর্তন আনিবার আভাস প্রদান করেন। দেশবাসীও তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে।

কিন্তু পদত্যাগ পর্যন্ত তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা তুরস্কের ক্ষতি ছাড়া উপকার নহে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাহা ১৯৯৩ সালে ছিল ৭.৩% তাহার নিম্নগতি উল্লেখযোগ্য। বিশৃঙ্খল অর্থনীতির দরুন মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়াইয়াছে ১০৭%-এ। তুর্কী লিরা শতকরা ৬০ ভাগ মূল্য হারাইয়াছে। স্টক মার্কেটের সূচকে অধোগতি এবং বাজেট ঘাটতি রেকর্ড ভংগ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তানসু সিলারের দল ট্রু বাথ পার্টির (True Bath Party) অবস্থান ভাল নয়। একদিকে কুর্দীদের সহিত যুদ্ধ লাগিয়া আছে, অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনতন্ত্র অধিকারী দেশে ইসলামী দলের প্রার্থীগণ মার্চের মেয়র নির্বাচনে ইস্তাম্বুল ও আংকারা সহ ২৮টি নগরীতে জয়লাভ করিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর এক বৎসর ভুল নেতৃত্বের পর অনেক তুর্কী এমনকি, যাহারা তাঁহার হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া পছন্দ করেন তাঁহারাও প্রশ্ন তোলেন সত্যিই কি তিনি তাহার দায়িত্ব পালন করিতেছেন? অনেকেই অবাক হন ট্রু বাথ পার্টি এবং সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পপুলিষ্ট (Social Democratic Populist Party) দলের কোয়ালিশন সরকার আর কতদিন টিকিবে। আংকারার Turkish Daily News এর কলামিস্ট সিরমা এডকান বলেন, সিলারের নিজের দলের মধ্যেও তাঁহার বিরোধী রহিয়াছে। অন্যান্য দল ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বলেন, তিনি অর্থনীতি ও প্রশাসক নিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই অযোগ্য।

সিলার এমন একটি আর্থিক ব্যবস্থা লাভ করেন যাহা মুদ্রাস্ফীতিতে ভারাক্রান্ত এবং এমন একটি প্রশাসন পান যাহা আমলাতান্ত্রিক ভারে ন্যুব্জ, কিন্তু অর্থনৈতিক অবনতিকে তিনি আরও ভারাক্রান্ত করেন। রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়িগণ তাঁহাকে বর্ণনা করেন এক রোখা, একদেশদর্শী এবং অন্যের পরামর্শ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হিসাবে। আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি একটি কৃচ্ছতা সাধনের নীতি গ্রহণ করেন এবং সে সময় তিনি সুদের হার কৃত্রিমভাবে কম রাখেন। কিন্তু এখনও তিনি ব্যয়ের পরিমাণ কমাইতে সক্ষম হন নাই। এই বিষয়ে দুইজন কেন্দ্রীয় ব্যাংক গভর্নরের সাথে মতবিরোধ হইলে তাঁহারা পদত্যাগ করেন এবং এইভাবে অনেকেই পদত্যাগ করেন। সিলার নীতি নির্ধারণ করেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য, কিন্তু ৬৩০০ কোটি ডলার বিদেশী ঋণ পরিশোধে তাঁহার অবহেলার দরুন বিদেশী সাহায্যদাতাগণ হতাশ হন। ইহার প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়িলে অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

অতঃপর তুরস্কে ভোটারগণ তানসু সিলারের বিপক্ষে ইসলামী দল ওয়েলফেয়ার পার্টিকে বিপুল সংখ্যায় বিজয়ী করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দান করে। মহানগরী ইস্তাম্বুল ও আংকারার আবাসিক নাগরিকদের ইহা অবাক করে। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি হইতে একটি উজ্জ্বল বিষয় হইল কুর্দী ও ওয়ার্কার্স পার্টির দ্বারা পরিচালিত কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে তুর্কী সেনা বাহিনীর সফলতা। তুর্কী ভূখণ্ড রক্ষায় সরকারি বাহিনী পূর্ণ সফলতা অর্জনের দাবি জানায়। তবে এই যুদ্ধে ব্যয় হয় বৎসরে ৭৭ কোটি ডলার এবং কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাৎসরিক ৪০০ কোটি ডলারের পর্যটন খাতের আয়ের উপর আঘাত হানে। কুর্দীদের এই ঘন ঘন আক্রমণে কর্মকর্তাগণ শুধু এইটুকু আশা করেন যে ইহাতে পর্যটকগণ ভীত হইবেন না।

ক্রমাগত বিপর্যয়ের পর তানসু সিলার পুনরায় অর্থনৈতিক সংস্কারে মনোনিবেশ করেন।

কৃচ্ছতা সাধন, কৃষিতে ভর্তুকি কমানো এবং কলকারখানা ব্যক্তিমালিকানায় ছাড়িয়া দিবার ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারে তিনি হাত দেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাড়িতেই থাকে। প্রেসিডেন্ট সোলেমান ডেমিরিল তাঁহাকে কিছু ভাল উপদেশ দেন। "আমাদের সমস্যাদি রহিয়াছে, একটি গণতান্ত্রিক দেশে এইগুলি প্রায়ই গজাইয়া উঠে, কিছু সমস্যার মোকাবিলা করিতে হইবে এবং কিছু সমস্যা লইয়া বাঁচিতে শিখিতে হইবে"। দুই দুইবার সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হইলেও সোলেমান ডেমিরিল ৭ বার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। (Time, May 30, 1994)।

কিন্তু তানসু সিলার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বেশিদিন টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। পরবর্তী নির্বাচনে ওয়েলফেয়ার পার্টি জয়লাভ করিলে গোঁড়া ইসলামপন্থী নেকমতিন এরবাকান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু তুরস্কের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে সনাতন ইসলামপন্থীদের কোন স্থান নাই এবং এই ব্যাপারে সেনাবাহিনীর সদস্যরা খুবই কঠোর। তাহারা কিছুতেই ইসলামপন্থী একটি দলকে তুরস্কের ক্ষমতায় দেখিতে চায় না। অতঃপর তাহারা প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে পদত্যাগ করিবার জন্য এরবাকানের উপর চাপ প্রয়োগ করিতে থাকে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হইল পদত্যাগ না করিলে সামরিক অভ্যুত্থান অত্যাসন্ন। অতঃপর ১৯৯৬ সালের জুন মাসে এরবাকান পদত্যাগ করিয়া নিজেও বাঁচিলেন এবং দেশকেও সামরিক শাসন হইতে রক্ষা করিলেন।

পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মাসুদ ইলমাজের (Mesut Yelmaz) সুবিধা হইল তাহাকে কোন অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোকাবিলা করিতে হইবে না। তুর্কিরা বরং আশ্চর্য হইবে যদি তিনি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন। পূর্ববর্তী সরকারের ধ্বংসাবশেষ হইতে তাঁহার পক্ষে একটি সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা মানে আরও কাঁচা নেতৃত্বের পরিচয় দেওয়া যাহা ইতিপূর্বে তিনি দেখাইয়াছেন মাদারল্যাণ্ড পার্টির নেতা হিসাবে অথবা দুই সংক্ষিপ্ত সময়ের তাহার প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে (১৯৯১ সালে পাঁচ মাস এবং ১৯৯৬ সালে তিন মাস)। প্রধানমন্ত্রী হইয়া তিনি ঘোষণা দেন যে তাহার কাজ হইল নির্ধারিত সময়ের দুই বৎসর পূর্বে একটি সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা। কিন্তু তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

এরবাকানের পদত্যাগের পূর্বে সাত মাস ধরিয়া তুরস্ক ভীষণ এক গোলযোগের সময় অতিবাহিত করিয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত কট্টর ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের বক্তব্য হইল, তুর্কী সংবিধান অনুযায়ী এরবাকান এবং তাহার ওয়েলফেয়ার পার্টির (রেফাহ) ন্যায় ইসলামপন্থীদের বাধা দেওয়া তাহাদের পবিত্র দায়িত্ব। রেফাহের সদস্যদের শরীয়াহ (ইসলামী আইন) জারি করা, মহিলাদের বোরখা পরিধান করা এবং ইরান, ইরাক ও লিবিয়ার দিকে হাত বাড়াইবার ব্যাপারে তিনি চোখ ঠারেন এবং কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। তুরস্কের মত দেশ যেখানে মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দেয়াল নির্মাণ করা তাহাদের ঈমানের অংগ, সেখানে এইগুলি অসম্ভব। একজন ইউরোপীয় বিশ্লেষক বলেন, "জেনারেলদের নিকট মৌলবাদ তুর্কীর সমাজ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকিস্বরূপ। অতএব ইহা সর্বাগ্রে পালনীয়, এমনকি গণতন্ত্রেরও পূর্বে"।কিন্তু এরবাকানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া তাঁহাকে গায়েব করা যাইবে না। অপরদিকে অধিকাংশ পর্যবেক্ষক মনে করেন ইহাতে বরং ইসলামপন্থীদের সংগ্রামের চেতনা উজ্জীবিত করা হইল এবং রেফাহের স্বপক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি করা হইল।

এরবাকান নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করিতে পারিতেন না। জুন '৯৭-এর প্রথম দিকে

তিনি এবং তাঁহার প্রধান কোয়ালিশন সঙ্গী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তানসু সিলার অক্টোবর বা নভেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একমত হন। এরবাকান চিন্তিত ছিলেন যে, জেনারেলদের সহিত তাঁহার সরকারের ক্রমাগত বিবাদের ফলে তিনি মান সম্মান ও ক্ষমতা উভয়টি হারাইতেছেন। সিলার চিন্তিত ছিলেন যে, ইসলামপন্থীদের সহিত তাহার উঠাবসার দরুন তাঁহার ধর্মনিরপেক্ষ ট্রু বাথ পার্টি হইতে সদস্যগণ সরিয়া যাইতেছেন এই জন্য। বেশ কয়েকজন মন্ত্রি এবং সংসদ সদস্য ইতোমধ্যে পদত্যাগ করেন। উভয় দলীয় নেতা তাই বিশ্বাস করেন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলে সংসদে তাহাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হইবে। ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে রেফাহ একক ভোট পাইয়াছে জাতীয় পর্যায়ে ২১ শতাংশ এবং সংসদে ৫৫০ আসনের মধ্যে ১৫৮টি আসন। এইবারের নির্বাচনে এরবাকান ভবিষ্যদ্বাণী করেন, নির্বাচনে তাঁহার দল ৪০ শতাংশ বা খুব সম্ভব ৫০ শতাংশ আসন পাইবে।

ক্ষমতার বাহিরে থাকিয়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করায় এরবাকান মনে করেন তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হইবে। কারণ বিরোধী দল হিসাবে তাহারা ১৫ শতাংশ বেকারত্ব, ৮০ শতাংশ মুদ্রাসস্ফীতি এবং সেনাবাহিনী যাহা যাহা করিতেছে বিশেষত কুর্দী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে তাহাদের কার্যাবলীর সমালোচনা করিতে পারিবে। আশানুরূপ আসন লাভ করিলে তাহাদিগকে আর সিলারের দ্বারস্থ হইতে হইবে না। এরবাকানের সুবিধা হইল তুরস্কে তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় নেতা আর নাই। অন্য কোন ভাল প্রার্থী নাই বলিয়াই ইলমাজকে প্রধানমন্ত্রীত্ব দেওয়া হইয়াছে। তানসু সিলারের আক্ষেপ, প্রেসিডেন্ট সোলেমান ডেমিরিল টু স্ট্রাথ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও ইলমাজকে প্রধানমন্ত্রীত্বের আহ্বান জানাইবার পূর্বে তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন না। নির্বাচনে তিনি খারাপ করিলে তাহার স্বামীকে লইয়া তিনি আমেরিকায় বসবাস করিবেন বলিয়া জানান।

অপরদিকে এরবাকানের কিছু ব্যক্তিগত সমস্যাও রহিয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট রেফাহ দল নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইনগত ব্যবস্থা লইতেছে। কারণ এই দল মসজিদ ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী দেওয়াল লঙ্গন করিয়াছে। অনেক তুর্কী এবং বেশ কিছু ধর্মনিরপেক্ষবাদীও সতর্কবানি উচ্চারণ করিয়াছেন, ইসলামপন্থীদের ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক কণ্ঠ রোধ করিলে তাঁহারা জঙ্গী হইয়া যাইবে। অধিকাংশ তুর্কী ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায় না, আবার একটি পুলিশী রাষ্ট্রও চায় না। এখনো বলা যাইতেছে না মধ্যপন্থীরা কতদিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে। (Newsweek, June 30, 1997)।

তুরস্কের সর্বশেষ খবর হইল সাধারণ নির্বাচন এখনো অনুষ্ঠিত হয় নাই। বিরোধী দলীয় নেতা ডেনিজ বেকাল সম্ভাব্য সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিয়া সেই দেশে আগাম নির্বাচনের আহ্বান জানাইয়াছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী মাসুদ ইলমাজ বলেন, ইসলামপন্থীদের সাথে সংগ্রামে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পরিহার করিতে পারিব না। এই দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত একটি পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রীদের হেড স্কার্ফ বা নেকাব পরিধানের বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবতের রায় দিয়াছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসলামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষদের মধ্যে বিরাজমান তিক্ত সংগ্রাম আরও অবনতির দিকে লইয়া যাইবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতিদের একটি স্বাধীন সংগঠন 'উচ্চ শিক্ষা পরিষদ' এর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতোপূর্বে যেসব বিদ্যালয় বিরাজমান নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়াছে তাহাদের সেই মহড়া দেখাইবার অবকাশ থাকিবে না। উল্লেখ্য, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া মুসলমান ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে (এপি)।

তুরস্কের নির্বাচনে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী মাসুদ ইলমাজকে পরাজিত করিয়া বুলেন্ত এচেভিত প্রধানমন্ত্রী হন। চলতি ঘটনাবলীর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা হইল কুর্দী নেতা আবদুল্লাহ ওসালানের গ্রেফতার এবং তুরস্কের আদালতে হত্যা মামলায় তাহার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান। গ্রেফতারের পর হত্যার রাজনীতি তিনি প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দিলেও অনেক তুর্কী নাগরিকের হত্যার দায়ে তাহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরী করিবার জন্য তুরস্কের সব রাজনৈতিক দল একমত ছিল। কিন্তু ইদানীং তুরস্কের ডানপন্থী দল ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট পার্টি ওসালানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করিবার ব্যাপারে কিছুটা নমনীয় হইয়াছে। ইউরোপীয় আদালতের রায় না দেওয়া পর্যন্ত তাহারা অপেক্ষা করিতে রাজি। ওসালানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করিবার প্রশ্নে পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট সুলেইমান ডেমিরেলের অনুমোদন প্রয়োজন। এই বিদ্রোহী কুর্দী নেতার আইনজীবীরা ইউরোপীয় মানবাধিকার আদালতে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আবেদন জানাইয়াছে। ইউরোপীয় আদালত মামলায় রায় পর্যালোচনা না করা পর্যন্ত দণ্ড কার্যকর না করিতে তুরস্কের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত এচেভিত এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১২ই জানুয়ারি ২০০০ জোটের শরিক দলগুলির সাথে আলোচনায় বসিবেন। সম্প্রতি তুরস্ক ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইয়াছে। অতএব ইউরোপীয় আদালতের আহ্বান অত সহজে প্রত্যাখ্যান করা তুরস্কের পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নহে।

লেবানন ঃ

একযুগ পূর্বে লেবাননের বেকা উপত্যকায় অবস্থিত একটি প্রাচীন বাজার-শহরে বিশ্বের প্রধান একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উচ্চ শ্রেণীর অর্কেস্ট্রা ও নর্তকী দল, সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক নাট্য সম্প্রদায়, চোখ ধাঁধানো একক কুশলী যেমন জাজবাদক মাইলস ডেভিস এবং উপাখ্যানের ব্যালে নৃত্য পরিবেশক রুডলফ নূরীয়েভ সবাই গ্রীষ্মকালীন এই বালাবাক আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগদানের জন্য হৈ চৈ বাধাইয়া তোলে। বালাবাক দর্শক, কুশলী সবাইকে সম্মোহিত করিয়া রাখে এবং কেন এরূপ করিয়া রাখে তাহা বুঝা দূরে নহে। উৎসবের মূল মঞ্চ দ্বিতীয় শতাব্দীর বাকসুস (Bacchus) মন্দিরের করিয়েনথাল-স্টাইলের দুই খামের সামনে অবস্থিত উৎসবে নিত্য নূতন বিষয় সংযোজন করা হয় এবং বহু প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতঃপর ১৯৭৫ সালের গৃহযুদ্ধ লেবাননকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। পরবর্তী ১৫ বৎসর বাথুস মন্দিরের উর্ধগামী থামগুলি সেনাবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীর প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনি করে– ব্যান্ড শো বা জাজ সঙ্গিতের শব্দ নহে।

সেই বালাবাক আন্তর্জাতিক উৎসব পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে। লেবাননের ক্যারাক্যালা নৃত্য থিয়েটার (Caracalla Dance Theatre) মঞ্চ মাতাইয়া তোলে এবং সেই সঙ্গে নূতন আশার সঞ্চার করে যে, দেশটি হয়ত পুনরায় আরব বিশ্বে সাংস্কৃতিক পথ নির্দেশক হইয়া উঠিবে। বিধ্বস্ত দেশটি হইতে যুদ্ধের ক্ষত এখনও পুরাপুরি মুছিয়া যায় নাই- ইসরাইল এখনও দক্ষিণে একটি প্রসস্থ অঞ্চল দখল করিয়া রাখিয়াছে, অপরদিকে ইসলামী গেরিলারা বেকা উপত্যকায় প্রচুর যুদ্ধ সামগ্রীর একটি শিবির সংস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। লেবাননীদের জন্য এই উৎসব একটি উৎসাহব্যঞ্জক চিহ্ন যদ্বারা দেশটির ১৫ বৎসরের গৃহযুদ্ধের ক্ষত শুকাইয়া উঠিবার লক্ষণ-প্রকাশ পায়। এই সঙ্গে আরো কয়েকটি উৎসবও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় জমিয়া উঠিয়াছে, যেগুলিকে একত্রে বলা হয় 'আরব পর্যটন

উৎসব'। আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো উৎসবগুলি ১,৫০,০০০ পর্যন্ত দর্শক আকর্ষণ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। এইসব পর্যটকদের অধিকাংশ হইতেছে ধনী উপসাগরীয় আরব। উৎসব সংগঠক নিকোল এসোলি (Nicole Asseily) বলেন, "বালাবাক উৎসবের পুনরাগমন এই বার্তাই বহন করে যে, লেবানন শান্তিতে আছে।"

লেবাননকে উহার গৌরবময় দিনে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরির গৃহীত বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে বালাবাক একটি ক্ষুদ্র প্রয়াশ মাত্র। ১৯টি দেশের ২০০০ ক্রীড়াবিদদের অংশ গ্রহণে বৈরুতে সমাপ্ত অষ্টম প্যান-আরব ক্রীড়া আরব বিশ্বে লেবাননকে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার কিছুদিন পর ১৯৯২ সালে বৈরুতকে এই ক্রীড়ার স্বাগতম দেশ হিসাবে চিহ্নিত করা হইলে অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন বৈরুত এই ক্রীড়া শেষ করিতে পারিবে কিনা। কিন্তু পুনর্নির্মিত শামরুন স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করিয়া এই ক্রীড়া সুন্দরভাবে চলিতে থাকে। ৫০,০০০ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন স্টেডিয়াম একদা ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (Palestine Liberation Organization) ঘাটি হিসাবে কাজ করে– ১৯৮২ সালের আগ্রাসনের সময় ইসরাইলী জঙ্গী বিমান কর্তৃক বোমা হামলা করা পর্যন্ত। ২০০০ সাল নাগাদ বৈরুতের প্রসিদ্ধ সুক এবং পার্শ্ববর্তী ইস্পাত ও আয়নার স্তম্ভগুলি খুলিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সাথে কর্মকর্তাগণ আশা করেন, শীঘ্রই বৈরুত পুনরায় মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইবে। নগরীর অবশিষ্টাংশে নূতন নূতন রেষ্টুরেন্ট, হোটেল ও থিয়েটার গড়িয়া উঠিতেছে। এমনকি উপাখ্যানের ক্যাসিনো দ্য লিবান (Casino du Leban) পাঁচ কোটি ডলার ব্যয়ে সম্পূর্ন মেরামত করিবার পর নূতন করিয়া খোলা হইয়াছে।

বৈরুতের বাহ্যিক কাঠামোর পুননির্মাণ সত্ত্বেও লেবানন এখনও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আশংকাজনকভাবে পিছাইয়া রহিয়াছে। কাজের সন্ধান পাওয়া কঠিন। শিল্প ও কৃষিখাত এখনও যুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। বৈরুতের বাহিরে বিশেষ করিয়া বেকা উপত্যকায় পরিবারবর্গ কোন প্রকারে খাদ্যের টেবিলে কিছু দিতে পারে। প্রধানমন্ত্রী হারিরীর কোন কোন সমালোচক বলেন, উৎসাহ, খেলাধুলা এবং আকাশচুম্বি ভবনসমূহ লেবাননের কঠিন সমস্যার প্রকৃত সমাধান নহে। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যমঞ্চ পরিচালক ইলিয়াস খউরী বলেন, "তাহারা এক প্রকারের পর্যটন সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে চান। আমরা সত্যিকারের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা চাই, আর এমন কোন চেহারা নয় যে সবকিছু ঠিক আছে"।

বাস্তবিক পক্ষে, গ্রীষ্মকালীন উৎসবসমূহ লেবাননের ভবিষ্যতের ন্যায় এখনও আরব-ইসরাইলী সংঘর্ষের দ্বারা ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইসরাইলী জঙ্গীবিমানসমূহ বালাবাকের উপর দিয়া চক্কর দিয়া যায়। দুইটি অতি দ্রুতগামী জঙ্গী বিমানের সুতীব্র শব্দ বাখুয়া মন্দিরের থামের উপর আঘাত হানে (Newsweek, August 4, 1997)

* * * *

ইসরাইল তাহার সৈন্যদের নিয়ন্ত্রিত দক্ষিণ লেবাননের বাফারজোন হইতে সরিয়া আসিবার ব্যাপারে মন্ত্রিসভায় আনুষ্ঠানিক বিতর্ক শুরু করিয়াছে। ইসরাইল গত বিশ বৎসর ধরিয়া দক্ষিণ লেবানন দখল করিয়া আছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে লেবাননের ঐ অঞ্চল ইসরাইল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান মঙ্গলবার দক্ষিণ লেবাননস্থ অধিকৃত আরব অঞ্চল পরিদর্শনে আসিতেছেন। তিনি বর্তমানে

লেবাননের রাজধানীতে রহিয়াছেন।

ইসরাইলী মন্ত্রিসভায় সামান্যতম মতভেদ সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাহার সরকার পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হইবে। কফি আনান মধ্যপ্রাচ্য সফর কালে ইসরাইল-লেবানন সীমান্ত বিরোধ লইয়া মধ্যস্থতা করিতে পারেন। ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও তথাকথিত ওয়ার কেবিলেট শর্ত দিয়াছে যে সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইলে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা জোরদার করিতে হইবে। লেবানন এই প্রস্তাব মানিতে রাজী নহে। সিরিয়ার মত লেবানন বিবৃতি দিয়া বলিয়াছে তাহারা কোন সীমান্ত নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না। ইসরাইলকে ২০ বৎসর আগের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বিনা শর্তে মানিয়া লইতে হইবে। (জেরুজালেম হইতে- এপি ২১/৩/৯৮)।

এইদিকে ইসরাইলী সামরিক গোয়েন্দা প্রধান বলিয়াছেন সিরিয়ার সমর্থন ছাড়া ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করিবে না। সিরিয়াকে না জড়াইয়া দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করিবার প্রশ্নে মন্ত্রিসভায় উত্থাপিত দুইটি নূতন প্রস্তাব সামরিক গোয়েন্দা প্রধান এমনান শাহকে গত শুক্রবার নাকচ করিয়া দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আইজ্যাক মবডে কেইর দেওয়া প্রস্তাবটি ছিল দক্ষিণ লেবাননে লেবাননী সৈন্য মোতায়েন এবং শিয়াপন্থী হিজবুল্লাহ গেরিলাদের আক্রমণ প্রতিরোধের নিশ্চয়তা দেওয়া হইলে দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হইবে।

অন্যদিকে অবকাঠামো মন্ত্রী, এ্যারিয়েল শ্যারনের প্রস্তাব ছিল লেবানন বা সিরিয়ার সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়াই দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হোক। ইহার পর ইসরাইলের উপর হিজবুল্লাহ গেরিলাদের কোন হামলা চলিলে ইসরাইল লেবাননের বিদ্যুতের মত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অবকাঠামোর উপর প্রচণ্ড হামলা চালাইবে। দুইজন মন্ত্রীর এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতেই গোয়েন্দা প্রধান লেঃ জেনারেল এমনন শাহকে মন্ত্রিসভায় তাহার সিদ্ধান্ত জানান।

এইদিকে ইসরাইলকে সিরিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করিবার পর লেবাননী সৈন্য ঐ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিলে সিরিয়া কোন আপত্তি করিবে না। এই খবরটি সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই। তবে ইহার পূর্বে ইসরাইলের অভিযোগ ছিল, সিরিয়া দক্ষিণ লেবাননে শান্তিপূর্ণ সমাধানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং আলোচনার টেবিলে ইসরাইলকে ছাড় দিতে বাধ্য করিবার জন্য হিজবুল্লাহ গেরিলাদিগকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য সফরকারী জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান লেবাননে দুই দিনের সফর শেষে ইসরাইল পৌঁছিয়াছেন। সফরকালে তিনি দক্ষিণ লেবানন হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে তাহার নিজস্ব প্রস্তাব পেশ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। তবে মহাসচিব কফি আনান চাইবেন এককভাবে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার এবং ১৯৬৬ সালের চুক্তি অনুযায়ী ইসরাইল ও হিজবুল্লাহ উভয় পক্ষই বেসামরিক জনগণকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করিবে না বলিয়া নিশ্চয়তা দিক।

লেবাননী ও সিরীয় নেতারা অবশ্য ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে সন্দেহ পোষণ করেন।

এদিকে ইসরাইলের নূতন প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক লেবাননের সহিত শান্তি আলোচনা

শুরুর আভাস দেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শান্তি আলোচনা আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ৩রা জানুয়ারি ২০০০ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য সিরিয়া-ইসরাইল শান্তি আলোচনার সময় লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি আলোচনা অনুষ্ঠানের ঘোষণা আসতে পারে। অপরদিকে হেজবুল্লাহ গেরিলা ও ইসরাইলী সৈন্যদের মধ্যে সংঘাত চলিতেছে। মাঝখানে তিনদিনের যুদ্ধ বিরতির পর হিজবুল্লাহ গেরিলারা ইসরাইলী সৈন্য ও অনুগত মিলিশিয়াদের উপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করে। ইসরাইলও পাল্টা গোলা বর্ষণ করে। ইহাতে তাহাদের কোন খবর এখনও পাওয়া যায় নাই।

সম্প্রতি দক্ষিণ লেবাননে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইরানপন্থী হিজবুল্লাহ গেরিলাদের হামলায় গত সপ্তাহে সাতজন ইসরাইলী সৈন্য নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হইবার ঘটনায় শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হইয়াছে। তবে ইসরাইল দক্ষিণ লেবানন হইতে তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়াছে। হিজবুল্লাহ গেরিলা হামলার জবাবে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের কেন্দ্রস্থলেই ইসরাইলের মুহুর্মূহু বিমান হামলার ফলে সমগ্র এলাকায় উত্তেজনা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হিজবুল্লাহ আক্রমণের জন্য ইসরাইল বৈরুত সরকারকেও দায়ী করিয়াছে।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)

১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহরানে অনুষ্ঠিত 'মর্যাদা, সংলাপ ও অংশীদারিত্বের সম্মেলন' শীর্ষক ইসলামী সম্মেলন সংস্থার অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন মহা ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, বাদশাহগণ এবং শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তাদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া ৯ হইতে ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন সফলভাবে সমাপ্ত হয়। ১১ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনের শেষ দিকে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, বাদশাহগণ এবং শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে মোট ১৪২টি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তিনটি ইশতেহার ও বিবৃতি প্রকাশিত হয়। এইসব প্রস্তাব, ইশতেহার ও বিবৃতিতে তাহারা ইসলামী জাহানের সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

গত ৯ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী খামেনীর উদ্বোধনী ভাষণের মধ্য দিয়া তেহরানে অষ্টম ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন শুরু হয়। অর্ধ শতাধিক সদস্য দেশ তেহরান সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে। এইসব দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ মুসলিম জাহানের সমস্যা, সংকট ও দুর্যোগসমূহ মোকাবিলার পথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বিশ্বের সকল মুসলমানের মধ্যে সর্বাত্মক ঐক্য ও সংহতি পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বসনিয়া- হার্জেগোভিনার প্রেসিডেন্ট আলী ইজ্জত বেগোভীচ, সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর হাসান আল বাশীর, মালীর প্রেসিডেন্ট আলফা ওমর কোনারাহ এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব ইজ্জদ্দীন আল-ইরাকী বক্তৃতা করেন। তাহারা আশা প্রকাশ করেন যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সভাপতি থাকা কালে এই সংস্থা সাফল্যের সাথে মুসলিম জাহানের সমস্যাবলী সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ এবং বাদশাহগণ মানবজাতির প্রকৃত ভিত্তিমূল হিসাবে তাওহীদ ও দ্বীন ইসলামের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন। মানুষের

আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত জীবনের মধ্যে এবং মুক্তি ও পুণ্যের মধ্যে নিখুঁত ভারসাম্যরূপ ইসলামের ধৈর্য, দয়া-অনুগ্রহ, জ্ঞান ও ন্যায় নীতির শিক্ষাসমূহ অনুযায়ী ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মুলনীতিসমূহ, বিশেষ করিয়া ইসলামী উম্মাহর ঐক্য এবং ইসলামী মুল্যবোধসমূহ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাহারা ইসলামী উম্মাহর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ এবং উম্মাহর ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের পরিপূর্ণ সংরক্ষণকে সমাজের ভিত্তিমূল শক্তিশালী ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সুদৃঢ়করণের সর্বপ্রধান উপাদান হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও মাজহাবের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইতিবাচক আন্তঃক্রিয়া ও সংলাপের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সংক্রান্ত যে সব ধারণা অনাস্থা সৃষ্টির কারণ হইয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপ্রিয় আন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রকে সংকোচিত করিয়াছে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্বপরিবেশ এবং একটি ভারসাম্য ও ন্যায়নীতিপূর্ণ শান্তিকামী বিশ্বব্যবস্থা রূপায়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে ইসলামী উম্মাহর মধ্যে নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনা ও বিপুল উপায় উপকরণের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর নেতৃত্বাধীন ও মহামান্য প্রেসিডেন্ট সৈয়দ খাতামির প্রশাসনাধীন ইরানের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাজ্ঞাপনপূর্বক ঘোষণা করা হয় যে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা সৈয়দ মুহাম্মদ খাতামীর সভাপতিত্বের মেয়াদে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক গঠনমূলকভাবে পরিচালিত হইবে এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে সংস্থার অংশগ্রহণের ভূমিকা বৃদ্ধি পাইবে।

তেহরান ইশতেহার ঃ

তেহরানে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলন শেষে 'তেহরান ইশতেহার' প্রকাশ করা হয়। ইহাতে মুসলিম জাহানের ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে মুসলিম দেশসমূহের নীতি অবস্থান প্রতিফলিত হয়। তেহরান ইশতেহার ছয়টি অধ্যায়ে ও ২৬টি ধারায় বিন্যস্ত। ইহাতে ফিলিস্তিন, বাইতুল মুকাদ্দাস, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, আফগানিস্তান ও কাশ্মীর সমস্যাসহ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার নীতি প্রতিফলিত হয়। এই ইশতেহারে যে কোন প্রকারের সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা করা হয়। মুসলিম জাতিসমূহ ও অমুসলিম দেশসমূহের মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রতি সমর্থন জানান হয় এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মোকাবিলা করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

তেহরান ইশতেহারে একদেশদর্শিতা এবং কোন দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-কানুনকে সংশ্লিষ্ট দেশের সীমান্তের বাহিরে কার্যকর করাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা ও আন্তঃক্রিয়া সভ্যতাসমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক জানাজানি এবং অন্যান্য ধর্ম ও চিন্তাধারাসমূহের সাথে গঠনমূলক সংলাপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই ইশতেহারে সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই উন্নয়নের উপর সুস্পষ্ট ভাষায় গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তৎপরতায় নারীদের অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করিবার জন্য ওআইসি সচিবালয়ের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

তেহরান ইশতেহার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি লিবিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত বয়কট প্রত্যাহারের জন্য আহ্বান জানান হয়। ইহাতে বলা হয়, লিবিয়া যেইসব ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহার ভিত্তিতে এবং আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে

অবশ্যই লিবিয়ার বিরুদ্ধে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা উচিত। (Irani News letter, Jan. 1, 1998)।

তেহরান শীর্ষ সম্মেলন মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের পথে এক বিরাট পদক্ষেপ। উপসাগরীয় যুদ্ধ এবং অন্যান্য সংঘাতের দ্বারা মুসলিম জাহান উপলব্ধি করিতেছে যে পাশ্চাত্য জগতের মন ভুলানো কথাবার্তা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এই সুযোগে তাহারা মুসলিম জাহানের ধন-সম্পদ অতি সস্তায় লুটপাট করিতেছে। একদা বৈরী বিভিন্ন মুসলিম বাদশাহ, শেখ, আমির, প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের একত্রে সম্মেলনে একত্রিত হইয়া এবং আরব আজমের ব্যবধান ভুলিয়া এক টেবিলে বসার অর্থ হইল মুসলিম জাহানে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হওয়া। এই ঐক্য ধরিয়া রাখিতে পারিলে শীঘ্রই মুসলিম জাহান এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে।

আজ ১৪/৩/৯৮ কাতারের রাজধানীতে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন শুরু হইতেছে। বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশসমূহের পরাষ্ট্রেমিন্ত্রগণ এই সম্মেলনে যোগ দিবেন। ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই সম্মেলন একটি নিয়মিত বা রুটিন বিষয় হইলেও বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে কাতার সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। ইহার কারণ ইসলামী সম্মেলন সংস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল বিশ্বের মুসলিম দেশগুলির স্বার্থরক্ষা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি দেশে দেশে বসবাসরত মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার ঘোষিত নীতি ও উদ্দেশ্য লইয়া। ওআইসি উহার নীতি ও উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা সফল হইয়াছে সেই মূল্যায়ন যেমন করিবার সময় আসিয়াছে, তেমনি সময় আসিয়াছে এই মুহূর্তের সমস্যা ও সংকটের দিকে যথোচিতভাবে দৃষ্টি দিবার। এই কথা নিশ্চয় উল্লেখের অবকাশ রাখে না যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে শুধু মুসলিম দেশগুলিই ধ্বংসের ষড়যন্ত্র হইতেছে না, একই সঙ্গে চলিতেছে অমুসলিম বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের উপর সর্বাত্মক নির্যাতনও। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া ইরাক বিরোধী ধ্বংসাত্মক আয়োজনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন, দৃষ্টি ফিরানো দরকার সার্ভিয়ার কসোভোতে চলমান মুসলিম নিধন অভিযানের দিকেও।

বহুল আলোচিত ইরাক সংকট প্রসঙ্গে এই স্থলে এইটুকু বলা যথেষ্ট যে, ঐতিহ্যবাহী এই মুসলিম দেশটিকে ধ্বংস করিবার লক্ষ্যে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সর্বব্যাপী আয়োজন এখনো অব্যাহত রহিয়াছে। রাশিয়া, গণচীন ও ফ্রান্স সহ শক্তিধর কয়েকটি দেশের বিরোধিতা এবং শান্তিকামী বিশ্ববাসীর প্রবল প্রতিবাদের মুখে আক্রমণ না করিবার সাময়িক কৌশল অবলম্বন করিলেও পাশ্চাত্য জগতের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এখনও পর্যন্ত ইরাককে ধ্বংস করিবার পরিকল্পনা বাতিল বা পরিত্যাগ করে নাই। এই দুইটি দেশ এখনো জাতিসংঘের মধ্যে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে মানিয়া লয় নাই। এই দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিবকে এই মর্মে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে, ইরাকের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণ পরিচালনার আগে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া লইবে অর্থাৎ যে কোন সময় ইরাকের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে পাশ্চাত্য জগতের।

অন্যদিকে এক জঘন্য মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলিতেছে সার্বিয়ার কসোভোতে। ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশ কসোভোতে স্বাধীনতা দূরে থাক, এমন কি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদানেও অস্বীকৃতি জানাইয়াছে সার্বিয়ার শাসকগোষ্ঠী। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নস্যাতের

পাশাপাশি ধর্মীয় জনগোষ্ঠী হিসাবে মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া দিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে সেইখানে। কসোভোর মুসলিম নিধন তথা জঘন্য গণহত্যার প্রশ্নেও ক্ষতিকর অবস্থান লইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী জগৎ। যুগোস্লাভিয়ার ভাংগন এবং কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থানকালেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মুসলিম বিরোধী কৌশল ও অবস্থান লইয়াছিল। সেই কারণেই আগ্রাসন ও গণহত্যা প্ররোচিত ও দীর্ঘায়িত হইয়াছিল এবং বসনিয়া হার্জেগোভিনা পরিনত হইয়াছিল এক ধ্বংসস্তুপে। কসোভোর গণহত্যাকেও নানা কৌশলে উৎসাহ যোগাইতেছে পাশ্চাত্য বিশ্ব এবং অর্থনৈতিক অবরোধের আড়ালে প্রকৃতপক্ষে তাহারা মুসলিম নিধন অভিযানকে আগাইয়া লইয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দিতেছে। আর সেই সুযোগেই সার্বিয়ার শাসকরা নৃশংস গণহত্যা চালাইয়া যাইতেছে এবং প্রতিদিন কসোভোতে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করিতেছে মুসলিম নাগরিকগণ।

এই প্রেক্ষাপটে বর্তমান ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। মুসলিম বিশ্বের সুখ দুঃখের নিয়ামক হিসাবে তাই নির্যাতিত মুসলিম দেশসমূহ এই সম্মেলনের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। অতএব আশা করা যাইতেছে, এই সম্মেলন সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করিবে।

কাতারের রাজধানী দোহায় তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত ইশতেহারে মুসলিম দেশসমূহের প্রতি ইসরাইলের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানান হইয়াছে, কারণ ফিলিস্তিন প্রশ্নে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি আলোচনায় কোন অগ্রগতি নাই এবং এই প্রক্রিয়াকে ইসরাইল অবমূল্যায়ন করিয়াছে। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার ইশতেহারে শান্তির প্রশ্নে ইসরাইলী ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানান হয়। এই ইশতেহার ঘোষণার পর স্বগাতিক কাতারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হামাদ বিন জসিম বিন জাবের আল সানী বলিয়াছেন শান্তি প্রক্রিয়া থামিয়া থাকিবার কারণে দোহায় ইসরাইলী বাণিজ্য মিশনের কর্মসূচি বাতিল হইতে পারে।

১৯৯১ সালে মাদ্রিদ শান্তি চুক্তির পর ইসরাইলের সাথে মুসলিম দেশের কূটনৈতিক মিশন ও ব্যুরো খুলিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। সদ্য সমাপ্ত দোহা সম্মেলনে ঐ সিদ্ধান্ত পূনর্বিবেচনার আহ্বান জানান হয় এবং মিশন ও ব্যুরো প্রয়োজনে বন্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। ইসরাইলের সাথে কয়েকটি আরব দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে রহিয়াছে জর্দান, মিশর, কাতার ও ওমান, কিন্তু ওমান বলিয়াছে তাহারা আর কোন সম্পর্ক বজায় রাখিবে না। ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক ওআইসি সদস্যদের আহ্বানে সাড়া দিবে কি না জানা যায় নাই। তুরস্ক ও ইসরাইল প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ।

৫৫ সদস্যের ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে মাদ্রিদ শান্তি চুক্তির উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার প্রতি আন্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলিবার ব্যাপারে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতি চাপ প্রয়োগের আহ্বান জানানো হয়। ইশতেহারে ইরাক কর্তৃক জাতিসংঘ বিশেষ কমিশনকে অস্ত্র রোধের প্রশ্নে সহযোগিতায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। কসোভোর সার্বিয় বাহিনী কর্তৃক মুসলিম জনগণের মানবাধিকার হরণ ও ব্যাপক নিপীড়নের ঘটনার নিন্দা করা হয়। ইরান ও লিবিয়ায় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তি আরোপে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়া হয়।

ইসরাইল ঃ

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সহিত তাহার রাজনৈতিক বন্ধুদের সম্পর্ক শীতল হইয়া উঠিতেছে। সদ্য পদত্যাগকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, শিহরণ জাগানো বক্তৃতার অধিকারী ডেভিড লেভীর নিকট নেতানিয়াহুর মন্ত্রিসভা আর আপন নিবাস নহে। এই দুইজন অবশ্য কখনো একে অপরকে পছন্দ করেন নাই। কিন্তু এখন আর মাত্র একজন পক্ষ ত্যাগ করিলে নেতানিয়াহুর কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভাঙিয়া যাইবে। সেই ক্ষেত্রে কিছু লোক অনেক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া যাইবেন এবং অনেক মহাপরিকল্পনার স্বপ্ন দেখিতে থাকিবেন। জেরুজালেমের মেয়র এবং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে একই দলভুক্ত ইহুদ অলমার্ট নেতানিয়াহুর পতনের পর গোপনে ঐ পদ লাভের কথা বলেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী আইজ্যাক মর্দেশাই গত সপ্তাহে যিনি তাহার মনিবের সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সভা এড়াইয়া যান, সিদ্ধান্ত লইয়াছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী ইসরাইলী সরকার পশ্চিম তীরের ১০ শতাংশ এলাকা ফিলিস্তিনীদের ছাড়িয়া না দিলে তিনি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু তাহা করিলে নেতানিয়াহু ডানপন্থীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন হারাইবেন। ডানপন্থীরা ইতোমধ্যে চূড়ান্ত আঘাত হানিবার হুমকি দিয়াছে। তিনি ফাঁদে আটকা পড়িয়াছেন। ছোরা উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে। মার্চ মাস নাগাদ তিনি হয়ত পুনরায় নির্বাচন অভিযান শুরু করিবেন।

ইসরাইলী রাজনীতি এখন হ য ব র ল অবস্থায়। নেতানিয়াহুর সুদিনের বন্ধুরাই শুধু ক্ষমতায় যাইবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নহে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় শামিল হইয়াছেন বিরোধী শ্রমিক দলের নেতা ইহুদ বারাক যাহাকে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে ভোটাররা প্রত্যাখ্যান করিয়া নেতানিয়াহুকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন। জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করিবার জন্য শত্রুর সহিত মিলিবার কথা বাদ দিলেও বারাক পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন চান। ইসরাইলী রাজনীতিতে বন্ধুর চাইতে সংখ্যার নির্ভরযোগ্যতা অনেকবেশি এবং তিনি নির্বাচনে সর্বদা নেতানিয়াহুর চাইতে ১০ হইতে ১৫ শতাংশ ভোট বেশি পাইয়াছেন। ব্যাপারটি এমন নহে যে অধিকাংশ ভোটার ইসরাইলের হাওয়া খাইবার রাজনীতির আর খবর রাখে না। 'যে দলই ক্ষমতায় থাক না কেন পরিণতি একই হইবে।" মন্তব্য করেন গিডিওন বিরান নামক তেল আবিবের একজন এটর্নি। বস্তুতপক্ষে ৫৫ বছর বয়স্ক বারাক এবং ৪৮ বছর বয়স্ক নেতানিয়াহুর মধ্যে খুব একটা ফারাক নাই। উভয়েই অতি অল্প বয়সেই কৃতিত্বের অধিকারী হন। ১৯৭০ সালের দশকে বারাক নেতানিয়াহুর অধিনায়ক ছিলেন গুপ্তচর ইউনিটে। বারাক অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত ইসরাইলী সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন এবং আইজ্যাক রবিনের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হিসাবে নাগরিক জীবন আরম্ভ করেন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় বারাক শ্রমিক দলের এক বাণিজ্যিক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহুকে অপদস্থ করেন। কিন্তু দুইজনেই শান্তিতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী একটি বিষয়ে একমত, তাহা হইল আরব পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদি বসতি স্থাপনে ইসরাইলের অধিকার রহিয়াছে এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করিয়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফিলিস্তিনী দাবি পূরণের সময় এখনো আসে নাই। (Newsweek, Jan. 19, 1998)

১৯৯৯ সালে মে-জুন মাসে অনুষ্ঠিত ইসরাইলের নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু পরাজয় বরণ করিয়াছেন এবং ফিলিস্তিনীদের সহিত শান্তির প্রবক্তা লেবার পার্টির ইহুদ বারাক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহুদ বারাক নির্বাচনের পূর্বে ঘোষণা

দিয়াছিলেন তিনি ফিলিস্তিনীদের সহিত থমকিয়া দাঁড়ানো শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করিবেন এবং সমঝোতার মাধ্যমে অত্র এলাকায় কাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহুদ বারাককে নির্বাচিত করিবার মাধ্যমে ইসরাইলী জনগণ ফিলিস্তিনীদের সহিত শান্তি স্থাপনে তাহাদের আগ্রহের প্রতিফলন ঘটান।

নির্বাচিত হইবার পর ইহুদ বারাক শান্তির পথে অগ্রসর হন এবং ইতোমধ্যে তিনি প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের সহিত ত্রি-পক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হইয়া শান্তি আলোচনাকে ইহার সঠিক পথে পুনরাস্থাপন করেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ও সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারুক আল-সাব্বার সাথে ত্রি-পক্ষীয় এক বৈঠকে মিলিত হইয়া সিরিয়ার সহিত একটি স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আশা করা যাইতেছে শীঘ্রই তিনি লেবাননের সহিতও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগাইয়া আসিবেন।

শেষ খবর হইতেছে, ইসরাইলী সিরিয়া শান্তি আলোচনা স্থগিত এবং দক্ষিণ লেবাননে সিরিয়া সমর্থিত হেজবুল্লাহ্ গেরিলাদের সহিত ইসলাইলী সৈন্যদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলিতেছে।

ইরিত্রিয়া ঃ

১৯৯১ সালে ইরিত্রিয় গেরিলা বাহিনী কর্তৃক রাজধানী আসমারা দখলের মধ্য দিয়া ইরিত্রিয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেও প্রতিবেশী এবং পূর্বতন জবরদখলকারী ইথিওপিয়ার সহিত উহার সংঘর্ষ প্রায় লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি সংঘটিত যুদ্ধে ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারার বাহিরে অবস্থিত একটি সম্মিলিত সামরিক-বেসামরিক বিমান বন্দরে বোমা নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে দেশ দুটির মধ্যে সীমান্ত বিরোধের আরও অবনতি ঘটে। ইথিওপিয়া ইতোপূর্বে সেই দেশের সেকেলে নগরীর নিকট ইরিত্রিয়ার একটি জঙ্গী বিমান ভূপাতিত করিয়া ইহার পাইলটকে আটক করে। অপরদিকে ইরিত্রিয়ার বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় একটি ইথিওপিয় জঙ্গী বিমান ভূপাতিত হইলে ইহার বৈমানিক সৈনিককে আটক করা হয়। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া লড়াই বাধিয়া যাইবার পর জাতিসংঘ অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতির জন্য দেশ দুইটির প্রতি আহ্বান জানায়।

সুদান ঃ

উত্তর আফ্রিকা তথা সমগ্র আফ্রিকার সর্ববৃহৎ দেশ সুদান দীর্ঘদিন ধরিয়া গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। মধ্যখানে ১১ বছর শান্তির বিরতি ছাড়া ১৯৫৫ সাল হইতে সুদানের আরব নেতৃত্বাধীন ইসলামী সরকার এবং কৃষ্ণ আফ্রিকান প্রধানত খ্রিস্টান ও তেজস্বী বিদ্রোহীগণ যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে। ১৯৮৩ সাল হইতে এই পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ লোক নিহত হইয়াছে। বাৎসরিক ঋতু পরিবর্তনের ন্যায় যুদ্ধও অনেকটা নিয়মিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষাকালে সুদানের পিপলস লিবারেশন আর্মির (The Sudan Peoples Liberation Army) বা SPLA গেরিলা কৌশলসমূহ বেশ কার্যকরী হয়। কিন্তু সরকারি বাহিনী শুকনা মৌসুমে বিদ্রোহীদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায়।

এতদসত্ত্বেও এইবারের ঘটনা ভিন্নরূপ কারণ সুদানের যুদ্ধ এখন শুধু উত্তর এবং দক্ষিণের বা মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ নহে। বিদ্রোহীরা এখন প্রতিবেশী অনেক রাষ্ট্র হইতে সাহায্য লাভ করিতেছে। কারণ তাহারা কর্ণেল ওমর আল বশীরের ন্যাশনাল ইসলামিক ফ্রন্টকে (NIF) একটি ক্রমবর্ধমান হুমকি হিসাবে দেখিতেছে। এই

প্রথমবারের মত বিদ্রোহীগণ এবং উত্তরের আরব রাজনৈতিক বিরোধীদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হইয়াছে। বিগত পাঁচ মাসে বিদ্রোহীরা দক্ষিনের এক বিরাট শস্যপূর্ণ এলাকা দখল করিয়া লইয়াছে। অনেক বুদ্ধিজীবী ও কূটনীতিক এই অগ্রযাত্রাকে বশীরের শেষ অধ্যায় হিসাবে দেখিতেছেন। আফ্রিকা কনফিডেনসিয়াল নামক পত্রিকার মতে, বিরোধী পক্ষ ১৯৯৭ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৯৯৮ সালের প্রথম ভাগে সরকারের পতন ঘটাইতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে। সাবধানী পশ্চিমা কর্মকর্তাবৃন্দ মনে করেন ইহা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

সুদানের প্রতিবেশিগণ অপেক্ষা করিতে করিতে পরিশ্রান্ত। নয়টি দেশ সুদানের প্রতিবেশী। অনেকে অভিযোগ করে সুদান সমস্ত এলাকায় স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উগান্ডা, ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া ইতোমধ্যে বিদ্রোহ কবলিত হইয়াছে। এইসব বিদ্রোহীরা খার্তুম হইতে অস্ত্রশস্ত্র পাইতেছে এবং সুদানে তাহাদের ঘাটিসমূহ বিদ্যমান। SPLA ও তাহাদের আরব মিত্রবর্গ সম্প্রতি ইরিত্রিয়া ও ইথিওপিয়া হইতে তাহাদের নূতন উত্তরমুখী রণাঙ্গন খুলিয়াছে, ফলে খার্তুম তাহার দক্ষিণে নিয়োজিত রণসম্ভার অন্যত্র সরাইতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে বিদ্রোহীদের দক্ষিণ রণাঙ্গনে আক্রমণের ধারা সতেজ হইয়া উঠিতেছে। এই আক্রমণে উগান্ডা প্রবলভাবে সমর্থন যোগাইতেছে।

কাম্পালার সমর্থন বিদ্রোহীদের বিরাট আশারস্থল। উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইয়রী মোসেভেনী তিন বছর পূর্বে বর্তমান রুয়ান্ডার নেতৃবৃন্দকে তাহাদের ক্ষমতারোহণে সাহায্য করেন এবং তিনি কঙ্গোর প্রেসিডেন্ট মুবতু শেকোকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া লরেন্ট কাবিলার ক্ষমতা গ্রহণে সহায়তা করেন। বর্তমানে তিনি SPLA-এর নেতা জন গ্যারাঙ্গকে সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছেন। স্মর্তব্য, মোসাভেনী ও গ্যারাঙ্গ বাল্যবন্ধু এবং তাঞ্জানিয়ার দার-আস-সালাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠি। পশ্চিমা জগৎও সুদানের ইসলামী ফ্রন্ট সরকারের পতন চায়। ১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকায় সুদানের নামও অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ১৯৯৫ সালে মিশরীয় প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারককে হত্যা প্রচেষ্টা সন্দেভাজন তিন গুপ্তহত্যাকারীকে প্রশিক্ষণ ও এই কাজে প্ররোচিত করিবার দায়ে জাতিসংঘ ১৯৯৬ সালে সুদানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। বছরের পর বছর ধরিয়া খার্তুম তিউনিসিয়া, সৌদি আরব ও আলজেরিয়ার মত দেশে বিদ্রোহীদের মদদ দিয়া আসিতেছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। স্বদেশে সরকার বিরোধী পক্ষকে অপহরণ ও নির্যাতন করে বলিয়া মানবাধিকার গ্রুপের সদস্যগণ অভিযোগ করেন। তবে ওয়াশিংটন মনে করে পরস্পর গোত্রীয় কলহে লিপ্ত দক্ষিণের বিদ্রোহীদের ক্ষমতারোহণে সাহায্য করিয়া আরও কলহ বৃদ্ধি করিবার চাইতে খার্তুমের সহিত কথাবার্তা বলাই উত্তম। তবে পেন্টাগন ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল চায় ক্লিনটন প্রশাসন খার্তুমের ব্যাপারে আরও কঠোর পন্থা গ্রহণ করুক। কিন্তু অধিকাংশ নীতিনির্ধারকগণ আরও অপেক্ষা করিবার নীতিতে বিশ্বাসী।

দক্ষিণ সুদানীরাও অপেক্ষা করিবার নীতিতে বিশ্বাসী। কারণ তাহারা এই ধরনের বিজয় ছুঁই ছুঁই অবস্থা অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই। ১৯৯০ এর দশকে তাহারা SPLA এর নেতাদের ভূয়া প্রতিশ্রুতি দেখিয়াছে। সেই সময় তাহারা দক্ষিণ সুদান প্রায় দখল করিয়াই ফেলিয়াছিল। কিন্তু খার্তুম জিহাদ ঘোষণা করে এবং লক্ষাধিক লোক সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৯৪ সাল নাগাদ বিদ্রোহীরা তাহাদের অর্জিত প্রায় সমস্ত এলাকা পুনরায় হারাইয়া ফেলে। বর্তমানে সরকারি জঙ্গী বিমান বহর মাঝে মাঝে সগর্জনে

বিদ্রোহী এলাকা প্রকম্পিত করে এবং সবাইকে বোমাতংকে গর্তে লুকাইতে বাধ্য করে।

এমনকি বিদ্রোহীদের বিজয়ও স্থায়ী শান্তির কোন নিশ্চয়তা দিতে পারিবে না। ১৯৫৫ সালে দক্ষিণাঞ্চলীয় আরবদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিলে দেশটি অঘোষিত বিভক্তির ভাগ্যবরণ করে। কখনো কখনো বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হয়– একদিকে গ্যারাঙ্গের ডিংকা গোত্র যারা SPLA নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে দক্ষিণের নৃতাত্ত্বিক গ্রুপসমূহ। দক্ষিণের বিদ্রোহীগ্রুপ এবং খার্তুমের আরব বিরোধীদের সখ্যতা তাহাদের একই শত্রু ওমর আল বশীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভাঙিয়া যাইবে এবং পুনরায় নূতন সরকারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া যাইবে। সুদানে আরবদের সংখ্যা অনারবদের দ্বিগুণ।

অপরদিকে সুদানের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তফা ওসমান ইসমাইলের নিকট প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক রাজনৈতিক উত্তর আছে। সুদান সন্ত্রাসীদের লালন করে এই ধরনের এক প্রশ্নের উত্তরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিনি চান যুক্তরাষ্ট্র সুদানে লুক্কায়িত সন্ত্রাসীদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করুক। অমুসলিম দক্ষিণাঞ্চলীয় লোকেরা ইসলামী উত্তরাঞ্চলীয় লোকদের দ্বারা অত্যাচারিত এই ধরনের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "সরকার ধর্মীয় সহনশীলতায় বিশ্বাসী।" আমাদের লক্ষ্য একটি স্বাধীন সমাজ। সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা, তিনি বলেন।

পশ্চিমা সাংবাদিকদের মতে, এই নিশ্চয়তার সহিত বিপ্লবীদের কণ্ঠের মিল নাই, যাহারা ১৯৮৯ সালে একটি রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়াছে ইসলামী শরীয়া আইন চালু এবং ধর্মযুদ্ধ রপ্তানির ওয়াদা করিয়া– এখন কি হইতেছে? গৃহযুদ্ধের কষাঘাতে এই প্রথম বারের মত ক্ষমতার উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ হুমকির সম্মুখীন হইয়াছে। উত্তর সীমান্তে বিদ্রোহীদের নূতন রণাঙ্গন খুলিবার ফলে পূর্বের বাগ্মীতা আর কাজে লাগিতেছে না।

বন্দুকের মুখে সরকারের পতনের সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবে হামলা প্রতিহত করিতে করিতে সরকার নিঃস্ব হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি, কারণ ইহাতে সরকারি কোষাগার হইতে দৈনিক ১৫ লক্ষ ডলার খসিয়া পড়িতেছে। অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটের পরিপূরক হইয়া উঠিতেছে। শুক্রবার জুম্মার নামাযে শরীয়তপন্থী ইমামগণ সরকার যথেষ্ট ইসলামী নহে বলিয়া সমালোচনা করেন। সরকারের ইসলামী পরামর্শদাতা হাসান তোরাবী সুদানের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু যুব সংসদ সদস্যগণ অভিযোগ করেন যে, বিপ্লব উহার কক্ষচ্যুত হইয়া গিয়াছে।

নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য সরকারি নেতৃবৃন্দ একটি বিদ্রোহী গ্রুপের সহিত সমঝোতায় উপনীত হইয়াছেন। এপ্রিল '৯৭-এ সরকার বিদ্রোহী খণ্ড খণ্ড দলগুলির সহিত এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে এই মর্মে যে, দক্ষিণাঞ্চলের পৃথক হইয়া যাইবার অধিকার রহিয়াছে। প্রধান বিদ্রোহী নেতা জন গ্যারাঙ্গ সরকারের এক বৈঠকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (Newsweek, Aug. 18, 1997)

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট কর্ণেল ওমর আল বশীরের সরকার ইসলামী বিধি নিষেধ আরোপে কিছুটা শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছে। তবে এই শৈথিল্য কতটুকু পাশ্চাত্য ও বিদ্রোহী চাপের মুখে এবং কতটুকু অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও সামরিক অভ্যুত্থানের আশংকায় তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সমঝোতার প্রস্তাব

দিলে এক মার্কিন কূটনীতিক প্রত্যুত্তরে বলেন "লক্ষণ ভালই মনে হয়, কিন্তু সুদানকে আরও অনেক কিছু করিতে হইবে, যথা সন্ত্রাসীদের গোপন আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।" (Newsweek, Aug. 18, 1997)

সুদানের অবস্থা দিন দিন বিশৃঙ্খলার দিকে যাইতেছে। যে কোন দিন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধিয়া যাওয়া বা সামরিক অভ্যুত্থান হওয়া বিচিত্র কিছু নহে।

সুদানে দুর্ভিক্ষের আশংকা ঃ সুদানের সর্বশেষ খবর হইল বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে যে সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি ক্রমেই বাড়িতেছে। কারণ সেইখানকার জনগণ কোন রকম আন্তর্জাতিক সাহায্যবিহীন একটি বিপর্যয়কর বছর অতিক্রম করিতেছে। সংস্থার মুখপাত্র জানান বিদ্রোহী অধ্যুষিত দক্ষিণ সুদানের কমপক্ষে সাড়ে তিন লাখ লোকের জন্য জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সাহায্য পৌঁছানো দরকার। তিনি বলেন, ঐ এলাকায় অপুষ্টি বাড়িতেছে। খাদ্যের অভাবে লোকজন গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া খাইতেছে এবং পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছে। (এপি)

কিন্তু সুদানের পক্ষে আরেক ভাষ্য মতে সুদানের ইসলামপন্থী সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের শিকার। যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যেসব মুসলিম দেশসমূহকে কালো তালিকাভুক্ত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে সুদান অন্যতম। সুদানে ইসলামপন্থী সরকার ক্ষমতাসীন হইবার পর হইতে পাশ্চাত্য জগৎ সুদানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে মদদ দিয়া আসিতেছে। ১৯৫৬ সালে বৃটিশ নাগপাশ হইতে স্বাধীনতা লাভের পর হইতে বস্তুত এই আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। উল্লেখ্য, বৃটিশ শাসনামলে তাহারা সুদানকে খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ সুদান এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর সুদান এইভাবে বিভক্ত করে। ফলে ইসলামপন্থী সরকার গঠনের পর দক্ষিণ সুদানের অধিবাসীরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আরম্ভ করে এবং সরকার দাবি করে খোদ যুক্তরাষ্ট্র ইহাতে মদদ দিয়া আসিতেছে। সুদান সরকার আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামী আন্দোলন ছড়াইয়া দিবার ওয়াদা করিয়াছে। ইহাকেই পশ্চিমা জগৎ বলিতেছে 'সন্ত্রাস' ছড়াইয়া দিবার ওয়াদা করিয়াছে। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদানকে ৬ষ্ঠ সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করে। দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশটিতে মানবিক ও আর্থিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়। পশ্চিমা সূত্রমতে দেশটির ২০ লাখ লোকের জরুরী খাদ্য সাহায্য প্রয়োজন। দকিক্ষনাঞ্চলের ১৫ লাখ এবং রাজধানী খার্তুমের চারিদিকের সাড়ে তিন লাখ লোক দুর্ভিক্ষ কবলিত।

সম্প্রতি দক্ষিণ সুদানের কর্ণেল গ্যারাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত সুদান পিপলস লিবারেশন আর্মির সাথে ইথিওপিয়ায় অনুষ্ঠিত সরকারি দলের বৈঠক ভাঙিয়া যায়। কারণ গ্যারাঙ্গ দক্ষিণ সুদানের লোকদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য তথায় গণভোট দাবি করেন। এই বৈঠক ভাঙিয়া গেলেও আগামী ৬ মাসের মধ্যে দুই বিবদমান প্রতিনিধিরা নাইরোবীতে পুনরায় শান্তি আলোচনায় মিলিত হইবার ব্যাপারে একমত হইয়াছেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে এই বৈঠকও ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ দক্ষিণ সুদানের মতামত নিয়ন্ত্রণ করে বহি:শক্তি, ফলে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ সুদান ব্যতীত আলোচনার টেবিলে কোন সুফল পাইবার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

এদিকে সম্প্রতি কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার কারণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান ও সুদানে টমা হক (Toma Hawk) ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মতে, এই দুইটি দেশ হইতেই সন্ত্রাসীরা কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার মার্কিন স্থাপনার উপর হামলা চালাইয়াছে। বিশেষত এই ঘটনায় সুদানের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও তিক্ততায় পর্যবসিত হইল।

সুদানের প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির গত রোববার (১২/১২/৯৯) রাতে তিন মাসের জন্য রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা জারি করিয়াছেন। পার্লামেন্টের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের পর তিনি এই উদ্যোগ নেন। টেলিভিশন ভাষণে ওমর আল বশির বলেন, দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বাহিরের হস্তক্ষেপজনিত সমস্যা সমাধানে এই জরুরি অবস্থা জারি করা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট বশির বলেন, রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা সুদানের স্থিতিশীলতা জোরদার ও শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখিবে। শান্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও সুদানে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষে প্রায় ২০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে। ১৯৮৯ সালে আল বশির সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিবার পর গত কয়েক বছরে তাহার অন্যতম সহযোগী পার্লামেন্টের স্পিকার তুরাবির সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। গত মাসে পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের একটি বিলের উদ্যোগ লইবার পর এই বিরোধ আরও ঘনীভূত হয়। (১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৯, এপি)

আরব অর্থনীতি ঃ

বর্তমানে আরব দেশসমূহে বৈদেশিক ঋণের বোঝা ১৬ হাজার কোটি ডলার। আরব রাষ্ট্রগুলিতে এই ঋণের জন্য বছরে প্রয়োজনীয় সেবা খাতে এক হাজার তিনশত কোটি ডলার ব্যয় করিতে হয়। আরব অর্থ তহবিলের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা এই কথা জানান।

আবুধাবি ভিত্তিক আরব অর্থ তহবিল (এএমএফ) চেয়ারম্যান জামিম আল-মানারী বলেন, আরব ঋণের পরিমাণ ১৬ হাজার কোটি ডলার ছাড়াইয়া গিয়াছে এবং সেবা খাতের ব্যয় প্রায় ৬ হাজার তিনশত কোটি ডলারে দাঁড়াইয়াছে। এএমএফ আরব লীগের প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আল-মানারী সাংবাদিকদের বলেন, সবদেশই ঋণ গ্রহণ করে এবং তাহাতে কোন সমস্যা নাই। একটি দেশকে কতটা ঋণের বোঝা বহিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করাই হইতেছে আসল সমস্যা।

আল-মানারী আরব ঋণের দেশওয়ারী কোন হিসাব দেন নাই। তবে এএমএফ-এর এক রিপোর্টে দেখা যায় মিশর, মরক্কো, আলজেরিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া ও জর্ডান ২২ সদস্যদের আরব লীগের মোট ঋণের দুই-তৃতীয়াংশের বোঝা বহিতেছে। (বিএসএস, এএফপি)

হিযবুল্লাহ গেরিলা বাহিনী ঃ

জাতিসংঘের ৩৬ নম্বর ফাঁড়ি যে উপত্যকার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত উহাকে বলে হিযবুল্লাহ মহাসড়ক (Hizbullah Highway)। দক্ষিণ লেবাননে ইসরাইল ও ইসলামী গেরিলাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সময় জাতিসংঘের "শান্তিরক্ষী বাহিনী" সদস্যরা এইস্থানে লিতানি নদীর উপরস্থিত পাহাড়ের উপর ১৫৫ মিঃ মিঃ কামানের অবিরাম গোলা বর্ষণে অভ্যস্ত। কিন্তু ইসরাইলের মার্কিন নির্মিত কোবরা হেলিকপ্টারসমূহ আরও নিবিড় অনুসন্ধানের জন্য উড়িতে আরম্ভ করিলে দুধর্ষ ফিনিসীয় সৈন্যরা বুঝিতে পারে যে আরও বড় ধরনের ঝড় আসিতেছে। গত সপ্তাহে কপ্টারগুলি নিউইয়র্কের নববর্ষের পটকাবাজীর ন্যায় গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলে জাতিসংঘ সৈন্যরা কংক্রিটের দেয়ালের পিছনে আশ্রয় লয়। ফ্যানটম জেট বিমানসমূহ মাথার উপর দিয়া ছো মারিয়া নিকটবর্তী পর্বত চূড়ায় ভারি অস্ত্রশস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া যায়। মাথার হেলমেট ঠিক করিতে করিতে সৈন্যরা বলাবলি করে আজ রাতে

সেইখানে কিছু একটা ঘটিতেছে। এলাকাটি মোটের উপর সরস, খাড়া উপত্যকা। ইসরাইলের অধিকৃত এলাকায় অনুপ্রবেশ করিবার জন্য গেরিলারা এলাকাটি ব্যবহার করে।

কেউ কেউ এখানে অনুমান করে, কিছু একটা মানে বড় ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতি। এই দিনে ইসরাইলের ৯ মাইল ব্যাসের অধিকৃত এলাকায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হয়। একজন ইসরাইলী সৈন্য ও তিনজন গেরিলা মারা যায়। খোদ ইসরাইলে একটি রকেট পতিত হয় এবং সীমান্তের উভয় পার্শ্বে আরও অনেক বেসামরিক লোক নিহত হয়। দক্ষিণ লেবানন হইতেছে গেরিলা ও মিলিশিয়া (আধা সামরিক), ইসরাইলী সৈন্য, সিরীয় দৈত্য ও নিরুপায় জাতিসংঘ সৈন্যদের সংমিশ্রণ। বর্তমানে সেখানে কোন সরকার নহে বরং ঘটনা প্রবাহের নিয়ন্ত্রণই কার্যকর।

গত এপ্রিলে ৯৭ একটি ধ্বংসাত্মক ইসরাইলী বিমান ও গোলন্দাজ আক্রমণ সত্ত্বেও হিযবুল্লাহ গেরিলারা পূর্বের চেয়েও অধিকতর ভয়ংকর অবস্থায় আছে। এই অঞ্চল হয়ত ইসরাইলী বেসামরিক লোকদের আশ্রয় দেয়-বিগত ২২ বছরে মাত্র ৭ জন নিহত হয় কিন্তু গেরিলাদের সহিত যুদ্ধে এই পর্যন্ত ১৮১ জন ইসরাইলী সৈন্য এবং ৩৫২ জন তাহাদের লেবাননী মিত্র নিহত হয় (উভয় পক্ষের গোলাগুলির মধ্যে আটক ২ লক্ষ লেবাননী বেসামরিক লোকদের বিষয় বাদ দিয়াও)। অনেক ইসরাইলী এই হত্যা এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিতে চায়। কিন্তু ইসরাইলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের লেবাননী সমন্বয়কারী ইউরী লুবরানীর মতে একতরফাভাবে ঐ এলাকা হইতে বাহির হইয়া আসিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না এবং এই ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীও কোণঠাসা অবস্থা অনুভব করিবে। “আমরা আমাদের কামানের সঙ্গে লাগিয়া থাকিব এবং আমাদের জখমে পট্টি লাগাইব।” তিনি বলেন অনির্দিষ্ট কোন পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

লেবানন, ইসরাইল, সিরিয়া সবাই শান্তি চায়। লেবানন- সিরিয়া শান্তি চুক্তির জন্য প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন, শিমন পেরেজ উভয়ে চেষ্টা করেন কিন্তু সিরিয়া গোলান হাইট-এর বিনিময়ে শান্তি চুক্তি করিতে রাজি নহে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু শান্তির জন্য কোন ছাড় দিতে রাজী নহেন। যে কোন ফিলিস্তিনী, লেবাননী বা হিযবুল্লাহ আক্রমণের জন্য তিনি সিরিয়াকে দায়ী করেন। অনেক আরব মনে করে নববর্ষের দিনে বাস বোমায় দামেস্কে যে ১১ জন লোক নিহত হয় সেই সন্ত্রাসী কার্যটি ইসরাইল করিয়াছে। কোন সাক্ষী না থাকিলেও ইসরাইল এই দাবি অস্বীকারও করে না।

মধ্যপ্রাচ্যে অনেক সময় মানুষ গুজবকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করে। তবে সত্যিকার অর্থে গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন স্থানীয় হিযবুল্লাহ নেতা আবু আলী আহমদ বলেন ইসরাইলীরা যতই গোলাবর্ষণ করিবে ততই আমাদের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী হইবে এবং প্রত্যেকটি গুলি নূতন বোমা ও রকেট হামলার দ্বারা নেতানিয়াহুর পূর্বসূরী যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা আরও দূরে সরিয়া যাইবে। (Newsweek, Jan. 20, 1997)

হিযবুল্লাহ গেরিলারা প্রতিনিয়ত ইসরাইলী আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে। এদিকে পশ্চিম তীরের হেবরন শহর লইয়া ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে একটি সমঝোতা হইতেও ইউরোপ ও আমেরিকা আশান্বিত হয় যে অতঃপর ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যকার শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করা যাইবে। কিন্ত লেবাননের বেকা উপত্যকায় ঠাসাঠাসি করিয়া বসবাসরত কয়েক লক্ষ অধিবাসী বা নিকটবর্তী দক্ষিণ লেবাননের লোকদিগকে এইসব শান্তির কথা বলিয়া লাভ নাই। কারণ তাহারা জানে সিরিয়া ও ইসরাইল এখনো

সমঝোতার চাইতে সংঘর্ষের অধিক নিকটবর্তী। হিযবুল্লাহ্ গেরিলা সারাউত বলেন, "লোকেরা ইসরাইলের সহিত শান্তির কথা বলিলেও আমরা এখন যুদ্ধে আছি।"

প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন খ্রিস্টোফার তাহার মন্ত্রীত্বকালে ২৬ বার সিরিয়া সফর করেন এবং সিরিয়াকে একটি সমঝোতায় আনিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি সফলতার মুখ দেখেন নাই। ইসরাইলের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন একবার গোলান উচ্চ ভূমি ফেরত দিবার প্রস্তাবও করেন, কিন্তু সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ এক ইঞ্চিও নড়েন নাই। তারপর হইতে দূরত্ব বাড়িতে থাকে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পূর্বেকার কোন অলিখিত প্রস্তাব মানিতে রাজি নহেন। ইসরাইলী কূটনীতিক, যিনি আইজ্যাক রবিন ও শিমন পেরেজের সময় সিরিয়ার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, বলেন "উভয় পক্ষ কোন শান্তিচুক্তি ছাড়াই বসবাস করিতে পারে। এখানে খুব শীঘ্রই কোন সমঝোতার সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু কোন সমঝোতা না হইলে অতঃপর কি হইবে? বড় মাপের নিয়মিত কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নাই! কিন্তু আরও রক্তপাত হইতে পারে। একজন নেতৃস্থানীয় সিরিয়া বিষয়ক ইসরাইলী বিশেষজ্ঞ বলেন, "আমি কোন সুদিন দেখিতে পাইতেছি না। ইসরাইলীদের একটি শিক্ষা দিবার জন্য আসাদ হেযবুল্লাহদের ব্যবহার করিবে'। কয়েকদিন পূর্বে দক্ষিণ লেবাননে গেরিলাদের 'আঘাত করে পালিয়ে যাও' রণকৌশল এমন কার্যকর প্রমাণিত হইয়াছে যে অনেক পর্যবেক্ষক বলিতেছেন ইসরাইল ইহার নিরাপত্তা অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইতেছে। হেযবুল্লাহ গেরিলারা গর্ব করিয়া বলে দক্ষিণ লেবানন আর্মি (South Lebanian Army) তাহাদিগকে উত্তম খবরাখবর প্রেরণ করে। উল্লেখ্য, এই SLA ইসরাইলের আধা সামরিক বাহিনী হিসাবে কাজ করে যাহাতে ইসরাইলী সেনাবাহিনী ঐ অঞ্চল ত্যাগ করিলে ইহারা এলাকার দায়িত্ব লইতে পারে।

সামরিক বিশ্লেষকগণ বলেন, ইসরাইল কর্তৃক লেবাননকে সিরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য বেকা উপত্যকাই উপযুক্ত স্থান। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই কাজ যাহাতে সম্পাদন করা না যায় সেজন্য সিরিয়া তথায় নিয়োজিত বিশ হাজার সৈন্যদের শক্তিশালী করিবার জন্য সেখানে ট্যাংক ও গোলন্দাজ বাহিনী প্রেরণ করে। হিযবুল্লাহ গেরিলারা অতি সতর্কতার সহিত তাহাদের যোদ্ধা, অস্ত্রসম্ভার ও নিরাপদ বাসস্থানসমূহ বেকায় নিয়োজিত সিরীয় সৈন্যদল ও বেসামরিক লোকদের মধ্যে ছড়াইয়া ছিটাইয়া রাখে। একজন যোদ্ধা দক্ষিণে যুদ্ধের সময় এই উপত্যকাকে একটি আঁকড়াইয়া থাকা ট্যাংকের সহিত তুলনা করে। ১০ সদস্য বিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত এবং লোক বসতি এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান লইয়া গেরিলারা এই পর্যন্ত নিজেদেরকে ইসরাইলী বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

এতদসত্ত্বেও গেরিলারা একটি বড় ধরনের ইসরাইলী আক্রমণ প্রত্যাশা করে। তাহারা গত বছরের ইসরাইলী Graphcs of wrath (ক্রোধের আঙ্গুর) নামীয় শাস্তিমূলক আক্রমণের কথা সালংকারে বর্ণনা করে। ঐ সামরিক অভিযানে হিযবুল্লাহদের যুদ্ধ ক্ষমতা যৎসামান্যই ক্ষতি সাধন করে, অথচ ২০০ লেবাননী বেসামরিক লোক নিহত হয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসরাইলের নিন্দা ও ধিক্কার আনয়ন করে। এই রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের পর ইসরাইল ও হিযবুল্লাহ উভয়ে একটি নিয়মিত আক্রমণ নীতিতে স্বাক্ষর করে যদ্বারা কোন বেসামরিক এলাকায় আক্রমণ করা যাইবেনা বা তাহাদিগকে আবরণ হিসাবেও ব্যবহার করা যাইবেনা। এই পর্যন্ত উভয় পক্ষ এই সমঝোতা মানিয়া চলে, কিন্তু হিযবুল্লাহরা সব সময় উস্কানীমূলক

কাজ করে যাহাতে ইসরাইল ঐ চুক্তি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। একজন হিযবুল্লাহ যোদ্ধা বলেন, আমরা অপেক্ষায় থাকি কোন দিন ইসরাইল এই চুক্তি সরাসরি ভঙ্গ করে যাহাতে আমরা আমাদের সমস্ত হাতিয়ার লইয়া প্রতি আক্রমণ করিলে কেউ আমাদের দোষী করিতে না পারে।

এই ধরনের কথাবার্তা উপত্যকার খুব কম সংখ্যক অধিবাসীদের জন্যই সুখকর। জীবনযাত্রা যেখানে ইতোমধ্যেই কঠিন। লেবাননের প্রকৃত শাসক সিরিয়া উপত্যকার প্রধান শিল্প, হাসিস চাষাবাদ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং জনগত ইহাতে অভ্যস্ত হইতে চেষ্টা করিতেছে। বেকার জনগণ একমাত্র প্রার্থনা করিতে পারে, তাহাদের শক্তিশালী প্রতিবেশিদের সংঘর্ষ যাহাতে হিংস্ররূপ লাভ না করে। মুহাম্মদ রা'দ নামক লেবাননের একজন হিযবুল্লাহ সংসদ সদস্য বলেন, সিরিয়া ইসরাইলী সূত্রে সমঝোতার আলাপ-আলোচনার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব প্রতিরোধ চলিতে থাকিবে। আমরা ইসরাইলকে ক্লান্ত দেখিতে চাই। কিন্তু লেবাননের অধিবাসীদের নিকট সবচেয়ে কঠিন হুমকি সম্ভবতঃ এই যে, ক্লান্ত ইসরাইল কি না করিতে পারে। (Newsweek, Feb. 3, 1997)

মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলা ঃ

৭ই আগস্ট ১৯৯৮ আফ্রিকার কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলায় ২৫৮ জন নিহত ও হাজার হাজার লোক আহত হয়। এই দুইটি দেশই ওআইসি এর সদস্য। এই হামলার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি ধনকুবের এবং বর্তমানে আফগানিস্তানে বসবাসরত ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করেন। ইতোপূর্বে ওসামা ১৯৭৯ সাল হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধরত আফগানিস্তানকে শারীরিক ও আর্থিকভাবে ব্যাপক সাহায্য করেন। পরবর্তীতে তিনি আফগানিস্তানে তালেবানদের উত্থানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি সেনাবাহিনীতে হাজার হাজার মুসলিম যোদ্ধা নিয়োগের জন্য ২০ কোটি ডলারেরও বেশি ব্যয় করেন। (তালেবানদের উত্থান দ্রষ্টব্য)। যুক্তরাষ্ট্র বিন লাদেনকে সমগ্র বিশ্বে ইসলামী সশস্ত্র সংগ্রামে সহায়তা করিবার দায়ে দোষি সাব্যস্ত করে। ওসামা বিন লাদেনের উপস্থিতির আরেকটি সম্ভাব্য দেশ সুদান। তাই ৭ই আগস্ট মার্কিন দূতাবাসে বোমা হামলার প্রতিশোধ স্বরূপ আফগানিস্তান ও সুদানে ওসামার সম্ভাব্য অবস্থান স্থলে ২০শে আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র শক্তিশালী টোমা হক (Toma Hawk) ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। এই হামলায় আফগানিস্তানে দুইটি কথিত সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার একটি ওসামা বিন লাদেন পরিচালিত, তবে এই হামলার সময় তিনি তথায় ছিলেন না। অপরদিকে সুদানে কথিত রাসায়নিক অস্ত্র তৈয়ারীর কারখানায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাইলেও সুদান সরকার ইহাকে একটি ঔষধ তৈয়ারির কারখানা বলিয়া দাবি করে এবং আন্তর্জাতিক তদারকির আহ্বান জানায়।

আফগানিস্তানের তালেবানরা ওসামাকে তাহাদের অতিথি বলিয়া দাবি করে। তাহাদের মতে তিনি বিগত ১৪ বছর ধরিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং যতদিন ইচ্ছা কাবুলে অবস্থান করিবেন। (ইউএনবি;এপি)

ইরান ঃ

ইরানী নেতা হাশেমী রাফসানজানীর প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হইবার পর ১৯৯৭ সালে মোহাম্মদ খাতামী ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অপরদিকে ১৯৮৮ সালে ইরানের

ধর্মীয় নেতা বা ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর মৃত্যুর পর আধ্যাত্মিক নেতা বা ইমাম আলী খামেনী ইরানের ধর্মীয় নেতা হিসাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। বহির্বিশ্বের সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং দেশের ধর্মীয় নেতার মধ্যে সম্প্রতি সৃষ্ট মত পার্থক্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। উল্লেখ্য, নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, আর ধর্মীয় ইমাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেশের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্বাহী হিসাবে কাজ করেন। মরহুম ইমাম খোমেনী সৃষ্ট ঐতিহ্য অনুযায়ী ধর্মীয় নেতার উপদেশ বা মতামত দেশের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক হিসাবে প্রাধান্য পাইয়া থাকে। তবে সাধারণত উভয়ে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করেন বিধায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। শীয়াদের মতানুসারে যেহেতু মহানবীর (সাঃ) পারলৌকিক ও ইহলৌকিক সমস্ত ক্ষমতা হযরত আলীর (রাঃ) নিকট এবং পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে অন্যান্য ইমামদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে, অতএব, ইমামই আইন অনুযায়ী সরকারের মালিক। ইমাম বা তাহার প্রতিনিধিদের অধীনে নহে এরূপ সুন্নী খলিফাগণসহ সমস্ত সরকার ক্ষমতায় জোর দখলকারী। ফলে ইসলামের প্রথম তিন খলিফা– আবু বকর, ওমর ও ওসমান (রাঃ)কে শীয়াগণ ক্ষমতায় জোর দখলকারী বিবেচনা করে।[১]

ইরানের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মের ব্যাপক প্রভাব এখনও বিদ্যমান। তাহা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী মোহাম্মদ খাতামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার ফলে দেশে যে একটা খোলামেলা আবহ সৃষ্টি হইয়াছে সেই সুযোগ ইরানীরা লইতেছে। ইরানের প্রতিটি সরকারি অফিসের দেওয়ালে দেওয়ালে ইমাম আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর ছবি শোভা পাইতেছে। আলেমদের বিশেষত পবিত্র কোম নগরীর ফাইজিয়েহ সেমিনারী স্কুলের আলেমদের ক্ষমতা ও প্রভাব এখনো বিদ্যমান। তবুও বলিতে হয় পরিবর্তন আসিয়াছে। তাই দেখা যায়, ফাইজিয়েহ স্কুলের অনতিদূরে পত্রিকা স্টলে ইমাম খোমেনীর ছবির পাশাপাশি ফুটবল তারকাদের ছবিও শোভা পাইতেছে। ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের পর ঘরে বন্দী মহিলাদের এখন ব্যাপকহারে ঘরের বাহিরেও দেখা যাইতেছে। ইরানী নারীদের এখন তেহরানের আজাদী স্কোয়ারে রাইফেল স্যুটিং কিংবা ইসলামী ওম্যান্স স্পোর্টস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেও দেখা যায়।

বিপ্লবোত্তর ইরানে সম্প্রতি যে কড়াকড়ি কিছুটা শিথিল করা হইয়াছে তাহা বেশির ভাগ নারীদের ক্ষেত্রে। এখন বেশি সংখ্যায় মেয়েরা স্কুলে যাইতেছে, কারণ অভিভাবকরা এখন অনুভব করিতেছে যে মেয়েদের স্কুলে পাঠানো অনেকটা নিরাপদ। তবে এখনো নারীদের ঘরের বাহিরে যাইবার জন্য তাহাদের স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি লাগে। নারীরা কার চালাইবার অনুমতি পাইয়াছে, তবে বাসে এখনো পিছনের সীটে বসিতে হয় এবং নির্ধারিত দরজাই ব্যবহার করিতে হয়। ইসলামী বিপ্লবের পর হইতে রাস্তাঘাটে ছেলেদের দ্বারা মেয়েদের উত্যক্ত হইবার ঘটনা নাই বলিলেই চলে, তবে এখন আসিয়াছে গ্রেফতারের ভয়। রাস্তাঘাটে অশালীন পোশাক বা অতিমাত্রায় প্রসাধনী ব্যবহার করিলে পুলিশের হাতে গ্রেফতারের আশংকা রহিয়াছে কিংবা অফিসে প্রবেশে বাধা আসিবে।

জন্মলগ্ন হইতে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি ডেমোক্রেট কি রিপাবলিকান উভয় দলীয় সরকারের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ লাগিয়াই আছে। এই বিবাদের জের ধরিয়াই বিগত ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় (১৯৮০-১৯৮৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার

১। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য - পৃষ্ঠা ঃ ১৩৩

মিত্রবর্গ ইরাককে প্রভূত সামরিক সহায়তা প্রদান করিয়া ইরানকে কোণঠাসা করিয়া রাখে এবং পরাজয়ের গ্লানি লইয়া যুদ্ধ বিরতি মানিয়া লইতে বাধ্য করে। ইরানের নূতন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামী তাই নির্বাচিত হইয়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালান। তিনি আমেরিকান জনগণের প্রশংসা করিয়া সিএনএনকে (মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক) এক সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকারের ঠিক আগের দিন ইরানের আধ্যাত্মিক নেতা বা ইমাম আলী খামেনী শুক্রবার ২/১/৯৮ যুক্তরাষ্ট্রের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, এই দেশটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করিয়া তুলিবার অপচেষ্টায় লিপ্ত রহিয়াছে। সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সিএনএন-এর সহিত সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট খাতামী যে বক্তব্য রাখিয়াছেন ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনীর বক্তব্য ইহার একেবারেই বিপরীত। ইহা ছাড়াও প্রেসিডেন্ট খাতামীর বক্তব্য ইরানে ক্ষমতাসীন ধর্মীয় নেতাদের সাথে কট্টরপন্থী ও উদারপন্থী দলগুলির মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। ইমাম আয়াতুল্লাহ খামেনী এক সমনে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ইরানের জনগণ ও ইরানী নেতাদের মধ্যে একটি দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া ইরানকে যুক্তরাষ্ট্রের মত করিয়া তুলিতে চায়। তাহারা এই দেশে অস্থিতিশীলতা ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিতে তৎপর। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট খাতামী বলিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে তিনি আমেরিকার মহান জনগণের সাথে এক আলোচনার ব্যাপারে আশাবাদী। ইমাম খামেনী যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ঘোর বিরোধী। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট খামাতী যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। এদিকে ওয়াশিংটন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসকে সমর্থন যোগাইবার অভিযোগে তেহরানকে বারবার অভিযুক্ত করিয়া আসিতেছে এবং ইরান এই অভিযোগ অস্বীকার করিতেছে। ওয়াশিংটন কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বের সন্ত্রাসী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ইরানের নামও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। (এপি তেহরান হইতে)

অপরদিকে গোপন রাখিবার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি নির্দ্ধারকগণ বেপরোয়া। ইরানী প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ খাতামীর সহিত সাক্ষাৎকারের এক কপি বিবরণী অগ্রিম পাইবার জন্য তাহারা সিএনএনকে বহু অনুনয় বিনয় ও খোশামোদ তোষামোদ করিয়াছেন। "আমেরিকান জনগণের নিকট বার্তা" হিসাবে তাহার (খাতামী) অনেক দিনের প্রতিশ্রুতিতে মধ্যমপন্থী ইরানী প্রেসিডেন্ট কি বলিতে পারেন উহার একটি মার্কিন প্রত্যুত্তর প্রস্তুত করিবার একটি সুযোগের তাহারা প্রত্যাশী। কূটনৈতিক কঠিন ওয়াদায় আবদ্ধ বিল ক্লিনটন স্বয়ং যদি টিভি ক্যামেরায় সরাসরি প্রত্যুত্তর প্রদান করেন তাহা হইলে কেমন হয়? তাহা সম্ভব নহে, তবে একেবারে অসম্ভবও নহে, কারণ ইরানের অভ্যন্তরে ও বাহিরে বিগত মে মাসের পর হইতে খাতামী একজন চলতি অত্যাশ্চর্য। কট্টরপন্থী আয়াতুল্লাহদের প্রবল ভাবে সমর্থিত একজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংস্কারের মঞ্চ হইতে বিপুলভাবে তাহার জয়লাভের দিন হইতে এই ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে।

গত সপ্তাহে বেতার, টিভি সময়ের প্রায় দুই ঘন্টা পূর্বেও ক্লিনটনের উপদেষ্টাগণ দোদুল্যমান অবস্থায় ছিলেন। কিছুই পাওয়া গেল না এমনকি সিএনএনএর সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী কৃষ্টাইন এ্যামেন পাওয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র জেমস রবিনের বাগদত্তা হওয়া সত্ত্বেও। শেষ পর্যন্ত সিএনএনএর সাক্ষাৎকারের কপি আসিল, প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলব্রাইট উহাতে হুমড়ি খাইয়া পড়িলেন, কিন্তু দেখা গেল খাতামী আনুষ্ঠানিক আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছেন মাত্র। তাহারাও (পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) অবাক হইয়াছেন। ইরান কর্তৃক সন্ত্রাসবাদের নিন্দাকে অকপটই মনে হইতেছে।

১৯৭৯ সালে মার্কিন কূটনৈতিকবৃন্দকে তেহরানে জিম্মি হিসাবে আবদ্ধ করিবার ব্যাপারে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমেরিকান জনগণের মৌলিক আদর্শের প্রতি তিনি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আমেরিকার প্লাইমাউথ শীলাকে তিনি আস্থা ও মুক্তির প্রতীক হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু খাতামী কর্তৃক সরকারে-সরকারে সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসিবার পরিবর্তে অনানুষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রস্তাব উত্থাপনে আমেরিকার একজন উচ্চস্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা হতাশা ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশ্য ওয়াশিংটনের অতি উৎসাহ প্রদর্শনে ইরান ক্রুদ্ধ হইতে পারে। ক্লিনটন প্রশাসনের কেউ উহা চান না। খাতামীর জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ইরানী জনতা এখনও শুক্রবারের জুম্মার খুতবায় "আমেরিকা নিপাত যাক" শ্লোগান দিয়া থাকে।

হোয়াইট হাউজের পরামর্শদাতাগণ ক্লিনটনের রাজনৈতিক ভাবমূর্তির ক্ষতি করিতে চান না। ১৯৭৯ সালে ইরানের শাহের তেহরান ত্যাগের পর হইতে আমেরিকা ইরানকে বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করিয়া থাকে। ইরান কর্তৃক তেহরানস্থ মার্কিন দূতাবাস জবর দখল করিয়া ৫২ জন মার্কিন কূটনীতিককে জিম্মি করিয়া রাখিবার ঘটনা প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্রশাসনের উপর বিরাট দাগ কাটিয়া গিয়াছে। ৪৪৪ দিন আবদ্ধ রাখিবার পর জিমি কার্টারের উত্তরাধিকারী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পূর্ব মূহুর্তে জিম্মিদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯৮৬ সালের ইরান কন্ট্রা কেলেংকারীতে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান ও জর্জ বুশ বিরাট হোঁচট খান। সেই দুঃসহ স্মৃতি ক্লিনটন প্রশাসনকেও বেশ কিছুদিন তাড়া করে। তাঁহার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ারেন ক্রিষ্টোপার এ বিষয়ে অন্তর্জ্বালায় ভোগেন, কারণ কার্টার প্রশাসনের সময় তিনি জিম্মি উদ্বারের ব্যাপারে তেহরানের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছিলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী অল ব্রাইট এখনও তেহরানের ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন নাই, কারণ তাহাতে তিনি রিপাবলিকান সিনেটরদের উষ্মার মুখে পড়িবেন। ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক রিপাবলিকানগণ এক আইন পাস করেন, যদ্বারা আমেরিকানদিগকে ইরানে বড় ধরনের বিনিয়োগে বাধা প্রদান করা হয়। এই আইনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল তেল কোম্পানি কনোকো (Conoco) কে ইরানে প্রাপ্ত ২০০ কোটি ডলারের গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের একটি চুক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে। তৎপরিবর্তে তেহরান এই কাজটি ফরাসী, রুশ ও মালয়েশিয়ান যৌথ এক কোম্পানিকে প্রদান করে। এই সুযোগ হাতছাড়া হইবার ফলে, মার্কিন কোম্পানিসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে ক্যাসপিয়ান সাগরের আশে পাশে এই ধরনের আরও বড় বড় গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের কাজ হইতেও তাহারা পাছে বাদ পড়িয়া যায়, তাই তাহারা তাহাদের তদবিরকারীদের মাধ্যমে হোয়াইট হাউজের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে।

খাতামীর নির্বাচনে মার্কিন প্রশাসন আশান্বিত হয়। প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিনটন প্রশাসন অল ব্রাইটের দস্তখতে ইরানী প্রেসিডেন্টের নিকট এক পত্রে জানিতে চান তিনি আনুষ্ঠানিক আলাপ আলোচনায় রাজি আছেন কি-না। কাগজে কলমে তিনি কোন উত্তর দেন নাই। সে সময় খাতামী সরকারের উচ্চ মহলে তাহার নিজস্ব লোক

বসাইয়া তাঁহার প্রভাব প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ছিলেন।

হঠাৎ ভোজভাজির মত এক ঘটনা ঘটিয়া গেল। গত নভেম্বরে অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ফুটবল কাপের বাছাই পর্বে ইরান চূড়ান্তভাবে বিশ্বকাপে খেলিবার যোগ্যতা অর্জন করিলে মোহগ্রস্ত ইরানী জনতা রাস্তায় নামিয়া আসে- বালক, বালিকা, পুরুষ, মহিলা সবাই নাচিয়া, গাহিয়া অন্তত সাময়িকভাবে মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ফুটবল টীম তেহরানে ফিরিয়া আসিলে অন্তত ৫০০০ মহিলা ষ্টেডিয়ামে প্রবেশ করিয়া টীমকে স্বাগত জানাইবার আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রবেশের জন্য পীড়াপীড়ি করে।

জনগণের নবলব্ধ আস্থা খাতামীর সমস্যা সমাধান করিয়া দেয়। তিনি প্রকাশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তম গুণাবলীর প্রশংসা করিতে আরম্ভ করেন। পরিণামে ক্লিনটন প্রশাসনের মধ্যেও আস্থা ফিরিয়া আসে। ইতোমধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর যে কোন সেক্টরে কিছুটা সফলতার মুখ দেখিতে উন্মুখ হইয়া পড়ে। কারণ বিগত দিনে অল ব্রাইট একের পর এক ব্যর্থতায় প্রশাসনকে স্থবির করিয়া ফেলিয়ছে। মধ্যপ্রাচ্য এক সংকট হইতে আরেক সংকটের দিকে আগাইতেছে। বলকানে মার্কিন শান্তিস্থাপনকারীদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকিতে হইবে। ইরাকের বিরুদ্ধে সর্বশেষ পদক্ষেপে সাদ্দামকে আরও শক্তিশালী করিয়াছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রায় সর্বক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসন উহার ফ্রান্স ও রাশিয়ার ন্যায় বন্ধুদের ক্ষেত্রে খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে, এমনকি উহার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বন্ধুরাও কনোকো তৈল কোম্পানির স্থলাভিষিক্ত ফরাসি নেতৃত্বাধীন যৌথ কোম্পানিকে সমর্থন করিতেছে।

ইরানের সহিত শান্তি স্থাপন করিতে হইলে ধৈর্যধারণ করিতে হইবে। উভয় পক্ষে বৈরিতা অনেক গভীর ও পুরাতন। প্রত্যেকটি বিষয় খুব সতর্কতার সহিত উত্থাপন করিতে হইবে। পূর্বের অনেক প্রচেষ্টা শুধুমাত্র তাড়াহুড়া করিবার কারণে পণ্ড হইয়া গিয়াছে। মার্কিন কূটনীতিকগণ এখন পরবর্তী পদক্ষেপ কি হইবে তাহা লইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন। কিভাবে কোথায় প্রথম সাক্ষাৎ হইতে পারে উহা লইয়া চিন্তা ভাবনা চলিতেছে। সম্ভাব্য স্থান হইতে পারে সুইজারল্যান্ডের ড্যাভোস-এ বিশ্ব অর্থনৈতিক সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম-এর সম্মেলনে। কিন্তু বিগত জানুয়ারির শেষ পাদে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনে তেমন সুবিধা হয় নাই। এখন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া রহিয়াছে আগামী জুন '৯৮-এ ফ্রান্সে অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের আসরের দিকে ২১শে জুন লিয়নে প্রথম রাউন্ডে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে খেলা চলিবে। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট ছাত্র আলী রেজা বলেন সর্বোত্তম পন্থা হইতেছে প্রতিযোগিতার পূর্বে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ খেলায় ইরানকে আহ্বান করা। যদি তাহারা সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে তবে তাহা দেখিবার মত একটি খেলাই হইবে। (Newsweek, Jan. 19, 1998)।

আলজেরিয়া ঃ

১৯৯১ সালের নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট নামের এই ধর্মীয় দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলেও নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলের পূর্বেই দেশে সামরিক শাসন জারি হইয়া যায়। সামরিক শাসকবর্গ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে। কিছুদিন চুপচাপ থাকিবার পর আলজেরিয়ায় ব্যাপক সন্ত্রাস আরম্ভ হইয়া যায়। বিভিন্ন জায়গায় বেসামরিক লোকজন নিহত হইতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৯৯৭ সালের নির্বাচনে সামরিক শাসনের সমর্থক দল ক্ষমতায় আসে। উল্লেখ্য, স্যালভেশন ফ্রন্ট এই নির্বাচন বয়কট করে। নূতন সরকার এই হত্যাযজ্ঞ

বন্ধ করিতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষ বিগত ৩রা জানুয়ারি '৯৮ আলজেরিয়ায় পশ্চিমাঞ্চলের ৪টি গ্রামে এইদিন সন্ধ্যায় ছোরা ও কুড়ালধারী হামলাকারীরা সারারাত ধরিয়া হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া কমপক্ষে ৪১২ জনকে হত্যা করিয়াছে। গত ৬ বৎসর ধরিয়া গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত আলজেরিয়ায় এতবড় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা এই প্রথম। সরকারি সূত্রে এই হত্যাযজ্ঞে নিহতের সংখ্যা বলা হইয়াছে ৭৮ জন।

আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে এই পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। এই গৃহযুদ্ধ অবসানের কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। সর্বোপরি কাহারা এই হত্যাযজ্ঞ চালাইতেছে তাহা লইয়াও বিতর্ক রহিয়াছে। সরকারি সূত্রে এই হত্যাযজ্ঞের জন্য ইসলামী সন্ত্রাসী গ্রুপকে দায়ি করা হইতেছে। অপরদিকে ইসলামপন্থীরা বলিতেছে সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই হত্যাযজ্ঞ চালাইয়া ইসলামী গ্রুপের উপর দায়িত্ব চাপাইতেছে। ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেসরকারি মালিকানাধীন পত্রিকার রিপোর্টারদের হত্যাযজ্ঞাস্থল পরিদর্শনে পাঠাইলে তাহার যে সব বিবরণ প্রদান করেন তাহাতে সবাই বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। আলজেরিয়ার দৈনিক আল-ওয়াতান পত্রিকার বেশ কয়েকজন মহিলার উদ্ধৃতি দিয়া বলা হয়, বনি বেসউস নামক স্থানে হত্যাকান্ড চলিবার সময় এলাকার লোকদের সাহায্যের আবেদনে জরুরি সার্ভিসগুলি কোন সাড়া দেয় নাই। সশস্ত্র ইসলামী গ্রুপকে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ি করা হইলেও মাত্র কয়েক মিটার দূরে চারিটি সেনা ছাউনি থাকা সত্ত্বেও কয়েকশত সশস্ত্র ব্যক্তি আশি জন ব্যক্তিকে কিভাবে হত্যা করিয়া পার পাইয়া যায়। তাই বিশ্লেষকদের ধারণা, এইসব হত্যাকাণ্ডের পিছনে সরাসরি সরকারি বাহিনী জড়িত রহিয়াছে। আরসিডি নামে একটি বিরোধীদল দাবি করিয়াছে যে, শাসকচক্র ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য সুকৌশলে এইসব হত্যাকান্ড চালাইতেছে। অন্যদিকে আলজেরিয়ার নৃশংস গণহত্যা তদন্তে ইউরোপীয় প্রস্তাব সরকার নাকচ করিয়া দিলে হত্যাকাণ্ডের পিছনে যে সরকারের মদদ রহিয়াছে তাহা দিন দিন আরও স্পষ্ট হইতেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আলজেরিয়ায় বিগত ছয় বৎসর যাবৎ সংঘটিত গণহত্যা তদন্তে একটি জাতিসংঘ দল পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিল। দেশটিতে অব্যাহত হত্যাকাণ্ডে তাহাদের সাবেক ঔপনিবেশিক শাসক ফ্রান্স এইবার ক্রোধান্বিত হইয়া বলিয়াছেন, তাহারা আর চুপচাপ হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে না। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের মেরী বিনসনও বলিয়াছেন, আলজেরিয়ায় তাহারা জাতিসংঘের একটি মিশন পাঠাইবার সম্ভাবনা বিবেচনা করিবেন। যুক্তরাষ্ট্রও এইবার হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ব্যাপারে আহ্বান জানাইয়াছে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবিন কুক একটি প্রতিনিধি দল আলজেরিয়ায় পাঠাইবার উদ্যোগ লইয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এই ব্যাপারে আলজেরিয়ার সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করা হয় নাই। বরং তাহা আলজেরিয়ার অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলিয়া নিরুৎসাহিত করা হয়। এই সমস্ত কর্মকাণ্ড হইতে পরিস্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, গণহত্যার পিছনে সরকারের হাত রহিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহা একেবারে অমূলক নহে।

আলজেরিয়ায় একের পর এক যে হত্যাকাণ্ডগুলি ঘটিতেছে উহার জন্য পশ্চিমা কর্মকাণ্ড বহুলাংসে দায়ি বলিয়া পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। কেননা, ফ্রান্স, আমেরিকা সহ অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্রের সমর্থন রহিয়াছে, বর্তমান সামরিক সরকারের প্রতি। তাহাদের সমর্থন ও সহযোগিতায় সামরিক সরকার দেশটি শাসন করিয়া চলিয়াছে। কাজেই বর্তমানে আলজেরিয়ায় বিভিন্ন হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে মানবাধিকার লংঘনের পশ্চিমা সতর্কবাণী ফাঁকা

বুলি ছাড়া আর কিছুই নহে। পশ্চিমারাই চায় নাই, ১৯৯১-৯২ সালের নির্বাচনে জয়ী ইসলামপন্থী দল জিতিয়া ক্ষমতায় আসুক। তাহারা ধুয়া তুলিয়াছিল স্যালভেশন ফ্রন্ট ক্ষমতায় গেলে গণতন্ত্র নস্যাৎ হইবে। এইভাবে নির্বাচনের রায় মানিয়া না লইয়া দেশটিতে গণতন্ত্র রক্ষার নামে কার্যত গণতন্ত্রের বীজকেই অংকুরে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ব্যাপারে সোচ্চার হইলেও আলজেরিয়ায় তাহারাই গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়াছে। তাহারা চীন মায়ানমার সহ অনেক দেশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্নে। নির্বাচনের পর তাহারা প্রশ্ন তুলিয়াছিল ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় গেলে সেনাবাহিনীর জেনারেলদের ষড়যন্ত্র ও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিবে। বিজয়ী দল ক্ষমতার স্বাদ না পাইয়া সন্ত্রাসের পথ বাছিয়া লইয়াছে। পশ্চিমারা তথায় একটি সংঘাত এড়াইতে যাইয়া আরেকটি সংঘাতের জন্ম দিয়াছে।

আলজেরিয়ার সংঘাতে পশ্চিমা স্বার্থ ঃ

পশ্চিমা জগৎ আলজেরিয়ায় যতই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলুক না কেন আসল ব্যাপার হইল ইসলামী দল ক্ষমতায় গেলে পশ্চিমা একচেটিয়া স্বার্থ ক্ষুন্ন হইবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। বিশ্বের চৌদ্দতম বৃহত্তম তেলভান্ডার ও পঞ্চম বৃহত্তম গ্যাস ভান্ডার সমৃদদ্ধ আলজেরিয়ার সংগে পশ্চিমা স্বার্থ সরাসরি জড়িত। দেশটির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হইল পাশ্চাত্যের তেল কোম্পানিসমূহ। এজিপ, বিপিএল্‌ফ, একসন, মোবিল ও টোটাল- এই কোম্পানিগুলি আলজেরিয়ার অর্থনীতিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রন করিয়া থাকে। অথচ দেশে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ পশ্চিমা তেল কোম্পানিগুলোকে স্পর্শও করিতে পারে নাই, কারণ সরকার তাহাদের এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে, তাছাড়া এই তেলক্ষেত্রগুলি রাজধানী আলজিয়ার্স হইতে কয়েকশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। সরকার আক্রমণের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে উত্তরে কৃষিসমৃদদ্ধ অঞ্চলসমূহকে। এই অঞ্চলসমূহ স্যালভেশন ফ্রন্টের দুর্ভেদ্য ঘাটি। গত বৎসর (১৯৯৭) স্যালভেশন আর্মি সরকারের সহিত এক সমঝোতায় পৌঁছিলে তাহাদেরই একটি গ্রুপ সশস্ত্র ইসলামিক গ্রুপ এই সমঝোতাকে বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে। তাহার পর শুরু হয় দুই গ্রুপের লড়াই।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ি কাহারাঃ

আলজেরিয়ায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডগুলির জন্য কাহারা দায়ি তাহা নির্ধারণ করা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। রক্তাক্ত আলজেরিয়ায় আজ এমন এক ভয়াবহ অবস্থা যে, কেউ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। হতভাগ্যরা জানে না কে ঘাতক আর কে রক্ষক। এই ব্যাপারে সন্দেহ নাই যে, নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াও ক্ষমতালাভে ব্যর্থ হইয়া ইসলামী সালভেশন ফ্রন্টের সমর্থকগণ প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অপরদিকে সরকারি বাহিনী তাহাদের ক্ষমতার ভিত আরও মজবুত করিবার জন্য এবং মৌলবাদী হত্যার নামে নিজেরাও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছে। তাই কোন হত্যাকাণ্ডে যেহেতু কোন পক্ষ নিজেদের দায় দায়িত্ব স্বীকার করে না, তাই কাহারা কোন হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ি তাহা নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার।

আলজেরিয়ায় বর্তমানে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে আদর্শের কোন বালাই নাই। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। দেশটির বর্তমান পরিস্থিতির জন্য পশ্চিমারাই যেহেতু বহুলাংশে দায়ি তাই সমাধানের পথও তাহাদের হাতেই বহুলাংশে নির্ভরশীল। জাতিসংঘ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে, আলজেরিয়ায়ও

অনুরূপ পন্থায় এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত বলিয়া পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন। তবে এই পর্যন্ত আলজেরিয়ার ব্যাপারে বিশ্ব সংস্থার কোন মাথা ব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না।

আলজেরিয়ার সর্বশেষ ঘটনা হইল বিগত ৭ই এপ্রিল ১৯৯৮ আলজেরিয়ার সৈন্যরা দেশের পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম গেরিলাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ১২ দিনের অভিযানে এক শতেরও অধিক গেরিলাকে হত্যা করে। সরকারপন্থী পত্রিকা আল মুজাহিদ এই খবর পরিবেশন করে। পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়, বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সমর্থন লইয়া সৈন্যরা এই অভিযান চালায়। পত্রিকার রিপোর্টে সরকারি পক্ষের কোন ক্ষয়-ক্ষতি কিংবা কোন গেরিলাকে আটকের কথা জানান হয় নাই। ১৯৯২ সালে সহিংসতা শুরুর পর হইতে এই রকম অনেক অভিযান চালানো হইয়াছে, অনেককে হত্যা করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালের নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের বিজয়কে জোরপূর্বক ছিনাইয়া লইবার পর যে সহিংসতা শুরু হইয়াছে তাহাতে এই পর্যন্ত ৭৫ হাজার লোক নিহত হইয়াছে।

আলজেরিয়ায় ক্রমবর্ধমান হত্যাযজ্ঞের মধ্যে সম্প্রতি নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী স্যালভেশন আর্মির সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণে সম্মত হইয়াছে বলিয়া স্থানীয় পত্রিকা 'লিবার্টি' খবর পরিবেশন করিয়াছে। খবরে বলা হয়, রাজধানী আলজিয়ার্সের সাড়ে ৪শত কিলোমিটার দক্ষিণে লাগুয়াতের কাছে এক হামলায় ১১জন নিহত হয়। রাজধানীর ২৪০ কি. মি. পশ্চিমে ১৬ জন ইসলামপন্থী নিহত হয়। আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকার প্রস্তাবিত সাধারণ ক্ষমার আওতায় চলতি মাসের (ডিসেম্বর '৯৯) মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই অস্ত্র সমর্পণে সম্মত বলিয়া খবরে প্রকাশ। তবে এই খবরের সত্যতা নিরপেক্ষ সূত্রে যাচাই করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া পত্রিকা জানাইয়াছে। উল্লেখ, প্রেসিডেন্ট আবদেল আজিজ দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে ইসলামী মিলিশিয়াদের উদ্দেশে সাধারণ ক্ষমার প্রস্তাব দিয়া আগামী ১৩ জানুয়ারি ২০০০ সালের মধ্যে অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানান। (পূর্বকোণ, ডিসেম্বর ৫, ১৯৯৯) কিন্তু প্রেসিডেন্টের শান্তি পরিকল্পনার পরই আলজিয়ার্সের ৫০ কি. মি. পশ্চিমে চরমপন্থীদের গুলিতে ২৯ জন লোক প্রাণ হারায়।

সিরিয়া ঃ

ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তির ব্যাপারে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ ক্ষুব্ধ হন। কারণ তাহার আশা ছিল ফিলিস্তিনীরা পশ্চিম তীর ফিরিয়া পাইবার সাথে সাথে সিরিয়াও ইসরাইলের অধিকার হইতে গোলান মালভূমি ফিরিয়া পাক। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল উপলব্ধি করে সিরিয়াকে বাদ দিয়া শুধু ফিলিস্তিনীদের দিয়া শান্তি আসিবে না। তাই তাহারা সিরিয়ার সহিত একটি শান্তি চুক্তির জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু বাদ সাধে গোলান উপত্যকা। ইসরাইল চায় আগে শান্তি চুক্তি হউক তারপর পর্যায়ক্রমে গোলান উপত্যকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু সিরিয়া আগে উপত্যকা ফেরত পাইবার দাবিতে অনড়।

প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আসাদ সম্প্রতি তাহার ক্ষমতা পথের আরেকটি কাঁটা

অপসারণ করিয়াছেন। তাহা হইল প্রেসিডেন্ট তাহার ভাই রিফাতকে গৃহবন্দী করিয়াছেন। তাহাকে ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ হইতে বরখাস্ত করিবার কয়েকদিন পর এই ঘটনা ঘটিল। রিফাত বর্তমানে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে লাকাতিয়ার একটি বাড়িতে বন্দী জীবন যাপন করিতেছেন। এই বাড়ির চতুর্দিকে গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা পাহারা দিতেছে। সিরিয়ার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদ ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদ হইতে রিফাতকে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ বরখাস্ত করা হয়। এই পদে এখন আসাদের পুত্র বাশারের স্থলাভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রেসিডেন্ট আসাদের পুত্র সম্প্রতি সামরিক বাহিনীর লেঃ কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়াছেন এবং তাহাকে সিরিয়ার রিপাবলিকান গার্ডের কমান্ডার-ইন-চীফের দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ক্ষমতা গ্রহণের পর সিরিয়ার সাথে ১৯৯৬ সালে স্থগিত শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারুক আল-সাববার সাথে বৈঠকে মিলিত হন। ওয়াশিংটনে চলমান এই শান্তি আলোচনা বেশ হৃদ্যতার সাথে আরম্ভ হয়। প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক এবং অর্থমন্ত্রী আব্রাহাম সুহাত এর সাম্প্রতিক মন্তব্য হইতে বুঝা যায় ইসরাইল শান্তির বিনিময়ে গোলান উপত্যকা সিরিয়ার নিকট ফেরৎ দিতে কুণ্ঠিত নহে। সিরিয়ার সাথে শান্তি চুক্তির ফল বেদনাদায়ক হইতে পারে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করিয়াছেন। অপরদিকে অর্থমন্ত্রী সুহাত আভাস দিয়াছেন যে, শান্তির বিনিময়ে ১৭ হাজার উপত্যাকার মানুষ গৃহহীন হইয়া পড়িবে। কিন্তু গোলার উপত্যকায় বসতি স্থাপনকারী হাজার হাজার ইহুদী শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা বলিয়াছে কোন কিছু ধ্বংসের বিনিময়ে শান্তির প্রয়োজন নাই। (জেরুজালেম ঃ ১২ ডিসেম্বর '৯৯ এ পি)।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী ওয়াশিংটনে দুই দিন বৈঠক শেষে ইসরাইল ও সিরিয়া আগামী মাসে (৩ জানুয়ারি ২০০০) নূতন করিয়া আলোচনায় বসিতে সম্মত হইয়াছে। এই বৈঠকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থানীয় শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে (খবর এএফপি)। হোয়াইট হাউস ত্যাগের সময় ইহুদ বারাক দুই দিনের এই আলোচনাকে প্রথম ও জটিল পদক্ষেপ কিন্তু সঠিক পথ বলিয়া বর্ণনা করেন। (প্রথম আলো, ১৮-১২-৯৯)

জটিলতার মধ্যে রহিয়াছে সিরিয়ার দাবী ঃ গোলান উপত্যাকা হইতে ইসরাইলী সৈন্য সম্পূর্ণ প্রত্যাহার। ইসরাইলের দাবি ঃ সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য সিরিয়া কর্তৃক শান্তির গ্যারান্টি, যাহাতে সিরিয়া আপাতত নীরবতা পালন করিতেছে।

ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র ঃ

১৯৯০ সালের মে মাসে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেন একত্রিত হইবার পর আশা করা গিয়াছিল ঐতিহ্যবাহী এইদেশটি উন্নয়নের দিকে ধাবিত হইবে এবং গণতন্ত্র ইহার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করিবে। দক্ষিণ ইয়েমেনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হইয়া যাইবার পর ১৯৯০ সালে দুই ইয়েমেন একত্রিত হয়। কিন্তু উত্তরের নেতা প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ এবং দক্ষিণের নেতা ভাইস প্রেসিডেন্ট আলী সালেম আলবে'দ প্রতিনিয়ত ঝগড়ায় লিপ্ত থাকেন। তাহারা কখনো তাহাদের সৈন্যবাহিনী এবং অর্থনীতি একত্রিভূত করেন নাই এবং কোন বিশ্বাসও গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। ১৯৯৩ সালের সংসদ নির্বাচনের পর সংঘাত চরম আকার ধারণ করে যখন সালেহ তাঁহার মন্ত্রিসভার ৩১ সদস্যের মধ্যে ২১টি

সদস্যপদ দান করেন তাঁহার নিজস্ব দল ও উত্তরের মৌলবাদী গ্রুপকে। ইহার দুইমাস পর মৌলবাদী নেতা সমাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত আইন বাতিল করিবার দাবি জানাইলে আলবে'দ রাজধানী সানা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে ফিরিয়া যান এবং আর কখনো ফিরিয়া আসেন নাই।

ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জ্ঞাপনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয় পর্যটক, তেল বিষয়ক কর্মকর্তা ও কূটনীতিকদের অপহরণকে এবং এই পরিবেশে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আলবে'দ এর সানা ত্যাগের ফলে সরকারে চরম অচলাবস্থার দৃষ্টি হয়। ফলে এমনকি বার্ষিক বাজেট পাস করাও সম্ভব হয় নাই। শত শত লোক উত্তর অংশে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। শতকরা ১০০ ভাগ মুদ্রাস্ফীতি এবং ইয়েমেনী রিয়ালের অবমূল্যায়নের ফলে সরকার ১৯৯২ সালের খাদ্য মূল্যের দাঙ্গার আশংকা করে, ঐ দাঙ্গায় একশত জনেরও অধিক লোক নিহত হয়।

জর্দানের মধ্যস্থতায় একটি সমঝোতা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর উত্তর ও দক্ষিণের সেনাবাহিনীর মধ্যে শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। আলবে'দ দক্ষিণের এক প্রদেশের একটি নব আবিষ্কৃত তেল ক্ষেত্র হইতে তেল চুষিয়া লইবার দায়ে সালেহকে অভিযুক্ত করেন। আরব বিশ্বের সব চাইতে দরিদ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ ইয়েমেনে ১২ বৎসর পূর্বে তেল আবিষ্কার হইলে উত্তর ও দক্ষিণের সবাই আশা করে যে দেড় কোটি লোক অধ্যুষিত এই দেশে আর তাহাদের ধনী প্রতিবেশীদের অনুগ্রহের দিকে তাকাইয়া থাকিবে না। উপসাগরীয় যুদ্ধের আগ পর্যন্ত উপসাগরীয় দেশ শাসিত দেশসমূহ হইতে লক্ষ লক্ষ ইয়েমেনী কর্তৃক প্রেরিত অর্থের উপর এই দেশ নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু সালেহ্ ইরাককে সমর্থন দিবার ফলে বাদশাহ ফাহ্‌দ এতই বিরক্ত হন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশ লক্ষ ইয়েমেনী শ্রমিককে তাহাদের দেশে ফেরত পাঠান এবং এর ফলে দেশের নড়বড়ে অর্থনীতির বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়।

১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে উত্তরের একটি সাজোয়া ব্রিগেড দক্ষিণের একটি বাহিনীকে সানার উত্তর পশ্চিমের একটি শহরে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলে ইয়েমেন ব্যাপক যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। পূর্বের উত্তর-দক্ষিণ সীমান্তে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে কোন পক্ষাবিজয়ের পথে রহিয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। একটি আপোস মীমাংসায় ব্যর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রবার্ট পেলেট্রে মন্তব্য করেন, ইয়েমেনী সমস্যার কোন সামরিক সমাধান নাই।

উভয় পক্ষ সমগ্র আরব বিশ্বে তাহাদের দূত প্রেরণ করে, তবে কোন পক্ষই সমঝোতায় আগ্রহী নয়। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় পক্ষের কর্মকর্তাদের সহিত কায়রোতে পৃথক পৃথকভাবে বৈঠকে মিলিত হইবার পর মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক বলেন, তিনি এই সংঘর্ষের নিষ্পত্তির আশু কোন সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। ইয়েমেনের অধিকাংশ অধিবাসী নিজেদের এক জাতিভুক্ত বলিয়া মনে করিবার ফলে এই সংঘর্ষের সমস্ত দায় দায়িত্ব উত্তর দক্ষিণের দুই নেতার ঘাড়ে চাপিতেছে যাহারা একটি যুদ্ধ বাধাইয়া সমস্যার সমাধান চাহিতেছেন। ইয়েমেনী জনগণের উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে একটি সফল কোয়ালিশনের সমম্ভাবনা ক্ষীণ। উভয় দেশের পৃথক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ধারা বিদ্যমান। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উভয় দেশ তিন শতাব্দীকাল ওসমানীয় তুর্কী শাসনাধীন থাকাকালে ১৮৩৯ সালে বৃটিশ দক্ষিণের রাজধানী এডেন অধিকার করে। ১৯৬৭ সালে বৃটিশ হইতে স্বাধীনতা লাভের পর দক্ষিণ সর্বপ্রথম আরব মার্ক্সীয় রাষ্ট্র হইয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর ইয়েমেন তুর্কীদের অধীনতা অস্বীকার করে এবং তাহার পর

হইতে ইহা রক্ষণশীল গোত্রীয় শাসক দ্বারা শাসিত হয়। (Time, May 23, 1994)

১৯৯০ সালে উত্তর ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইয়েমেন একত্রিত হইয়া ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র হিসাবে উহার যাত্রা শুরুর পর হইতে প্রতিবেশী সৌদি আরবের সহিত সীমান্ত যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিবেচিত সৌদি আরব ও প্রতিবেশী দরিদ্র দেশ ইয়েমেনের মধ্যে একটি সীমান্ত এলাকা লইয়া দীর্ঘদিন যাবৎ এই বিরোধ চলিতে থাকে। তেল ও গ্যাস সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি লইয়া ইতোপূর্বে কয়েকদফা সংঘর্ষও হয়। অবশেষে ১৯৯৬ সালে উভয় দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ১৯৯৫ সালের পর বিরাজমান সমস্যা সমাধানের পথে কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই।

সম্প্রতি ইয়েমেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেন মোহাম্মদ আরব বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিষয় লইয়া আলোচনায় অগ্রগতি হইয়াছে। তবে তিনি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন অসম সমাধান তাহার দেশের জনগণ মানিয়া লইবে না। তিনি বলেন, এই পর্যন্ত আলোচনায় যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহাকে তিনি ব্যাপক অগ্রগতি বলিয়াই মনে করেন। এখন উভয় দেশের জন্য মঙ্গলজনক ও সন্তোষজনক হইবে এইরকম একটি চুক্তি হওয়া প্রয়োজন। এইদিকে সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুবরাজ নাঈফ বিন আবদুল আজিজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আলোচনায় সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে এবং শীঘ্রই বিরোধের নিষ্পত্তি সম্ভব হইবে। ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহও এই বিরোধের একটি সন্তোষজনক নিষ্পত্তি সম্ভব বলিয়া আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

রিয়াদ তেহরান সহযোগিতা চুক্তি ঃ

সাম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল রিয়াদ-তেহরান সহযোগিতা চুক্তি। আরব-পারস্যগণ সংঘাত ইতিহাসগত একটি ঘটনা। পৌরাণিক কাল হইতে এই দুইটি জাতি-আরব-ইরানীরা একে অপরের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। তবে মাঝে মধ্যে সমঝোতা যে হয় নাই তাহাও নহে। বিগত ইরান-ইরাক যুদ্ধে পূর্বেকার সমস্ত সমঝোতা পদদলিত করিয়া এই দুইটি দেশ চারি বৎসর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, এই যুদ্ধে প্রায় সমস্ত আরব দেশ ইরাককে মদদ যোগাইয়াছে।

১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পর রিয়াদ-তেহরান সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে। দুই দেশের তিক্ততা বৃদ্ধিতে পাশ্চাত্য জগত বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর এই দুই দেশ অতীত ভুল ভ্রান্তির নিরীখে নিজেদের অবস্থান পর্যালোচনা করে এবং পাশ্চাত্য জগতের মোকাবিলায় নিজেদের সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট হয়। ইহার বহিঃ প্রকাশ ঘটে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তেহরানে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে আরব শীর্ষ নেতাদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়া। সৌদি বাদশাহ ফাহদ এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। এইভবে দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বিগত ২৩শে মে ১৯৯৮ সৌদি আরব ও ইরান প্রযুক্তি ও সহযোগিতা চুক্তিতে উপনীত হয়। ইরানী সরকারি সংস্থা ইরনা এই খবর প্রদান করে। এই চুক্তির আওতায় ইরানের তাম্র শিল্প ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উভয় দেশ যৌথভাবে বিনিয়োগ করিবে। গত তিন বছরে সৌদি আরব ইরান হইতে ৪ কোটি ডলার মূল্যের তামার তার খরিদ করিয়াছে।

জর্দান ঃ

জর্দানের বাদশাহ হোসাইন ৪৫ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিতেছেন। একটানা এত দীর্ঘ সময় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা খুব কম রাজা বাদশাহর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। ১৯৫৪ সালে পিতা তালাল ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য যুবরাজ হোসাইনের পক্ষে পদত্যাগ করিলে তিনি ১৭ বৎসর বয়সে বাদশাহ হন।[১] দ্বিতীয় দফা ক্যান্সার আক্রান্ত হইয়া তিনি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন। গত সপ্তাহে তিনি ক্লিনিক হইতে উপগ্রহের মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বাদশাহ হোসেন মহানবীর (সাঃ) মূল গোত্র আরবের হাশেমী গোত্রের মানুষ। তাঁহার মধ্যে দেশপ্রেম যেই ভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে এমনটি আর কাহারও দেখা যায় নাই। শান্তির জন্য তাহার ন্যায় কঠোর পরিশ্রম সম্ভবত আর কেহ করেন নাই। এখন তাহার বয়স ৬২ বৎসর। এই সুদীর্ঘ সময়ে ঐ এলাকায় তীব্র যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, দুর্বল শান্তি চুক্তি হইয়াছে- এইসব কিছুই তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে। অসংখ্য হত্যা চেষ্টা তিনি কাটাইয়া উঠিয়াছেন, আবার বহু বিদ্রোহ তিনি দমন করিয়াছেন। জর্দানের শতকরা ৮০ ভাগ লোক বাদশাহ হোসাইন ছাড়া অন্য কোন শাসক দেখে নাই। বাদশাহর দ্বিতীয় দফা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়া দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক। জর্দানের অর্থনীতি এখন হোঁচট খাইতেছে। তাহার পরিবার এখন দ্বিধাবিভক্ত। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচন লইয়া প্রাসাদ ষড়যন্ত্র মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। বাদশাহ অবশ্য বলিয়াছেন সবকিছু দৃঢ়ভাবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার ক্যান্সারে আক্রান্ত হইবার সংবাদ কেবল অনিশ্চিত অবস্থাকে আরও অনিশ্চিত করিয়া তুলিবে। বাদশাহর উত্তরাধিকারী কি তাঁহার মত ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবেন? ইহাই এখন প্রধান প্রশ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্ষুদ্র এই দেশটি এমন এক অঞ্চলে অবস্থিত প্রকৃত পক্ষে যেটি বিশ্বের সব চাইতে গোলযোগপূর্ণ এলাকা।

প্রতিবেশী ইসরাইলের সঙ্গে বাদশাহ হোসাইনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রহিয়াছে, যাহার অধিকাংশই গোপন- ফলে ইসরাইলের সঙ্গে জর্দানের একটি শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে। একই সঙ্গে বাদশাহ হোসাইন ফিলিস্তিনী নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। তিনি ক্ষমতায় না থাকিলে এই সম্পর্ক রক্ষা করা যাইবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। ১৯৯৪ সালে প্রথমবার রোগমুক্তির পর হোসাইন ইসরাইলের সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৯৫ সালে আইজ্যাক রবিনের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় বাদশাহ হোসেইন যে বক্তৃতা করেন তাহাতে অনেকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, বাদশাহ শান্তির প্রতি পুরাপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইবার পর ঐ শান্তি প্রক্রিয়া ছিন্ন হইয়া যায়। ১৯৯৩ সালের আসলো চুক্তিতে যে আলোচনার কথা হয় উহার কোন অস্তিত্ব এখন আর নাই।

ইসরাইলী কর্তৃপক্ষ শান্তিচুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া আরব এলাকায় বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়। ইসরাইলী গোয়েন্দা এজেন্ট একজন ফিলিস্তিনী মৌলবাদী নেতাকে জর্দানের রাজধানী আম্মানে হত্যা করিবার চেষ্টা চালায়। গত বৎসর বাদশাহ হোসাইন নেতানিয়াহুকে পত্র মারফত সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, আপনার কর্মপদ্ধতি আমার বিশ্বাসে অথবা যা আমি অর্জন করিবার চেষ্টা করি তাহা ধ্বংস করিয়া দিতে উদ্ধত।

১। মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য - পৃষ্ঠা ঃ ৫১৩

এই জটিল ও কঠিন সম্পর্ক সঠিক পথে পরিচালিত করিবার দায়িত্ব সম্ভবত তাহার ছোট ভাই যুবরাজ হাসানের উপর বর্তায়। ৩৩ বৎসর যাবৎ হাসান যুবরাজ হিসাবে সিংহাসনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নেতানিয়াহুর ধারণা, জর্দান একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্র। জর্দানীগণ নিজেরা এ ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনী যাহারা মূলত ইসরাইল হইতে আসে, তাহারা এখন পশ্চিম তীর দখল করিয়া আছে। ইহাদের অনেকেই ইসরাইলের সহিত বাদশাহর শান্তিচুক্তি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ১৯৭০ সালে জর্দানের মধ্যে পিএলও'র একটি নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলে কিন্তু বাদশাহ সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন। এই বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া মাসব্যাপী যে যুদ্ধ চলিয়াছিল উহা ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর নামে পরিচিত। ৫১ বৎসর বয়স্ক যুবরাজ হাসান ফিলিস্তিনীদের মন জয় করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। একই সময়ে হাসানের প্রতি বেদুঈনদের আনুগত্য তেমন প্রবল নহে। কিন্তু ১৯২০ সালে ওসমানীয় তুর্কীর শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃটিশদের উস্কানীতে বিদ্রোহের পর হইতে হাশেমী বংশের এই গোত্রকে বেদুঈনরা সমর্থন দিয়া আসিতেছে। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে অভ্যস্ত বুদ্ধিজীবী প্রকৃতির পণ্ডিত ব্যক্তি হাসানের মধ্যে বাদশাহ হোসেনের সেই কারিশমা নাই।

বাদশাহ হোসেনের নিজের উত্তরাধিকার নির্বিঘ্নেই নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু তাহার পরবর্তী শাসক নির্বাচন লইয়া ষড়যন্ত্র ইতোমধ্যেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সংবিধান অনুযায়ী যুবরাজ হাসান সিংহাসনে বসিবার পর তাহার পুত্র ১৯ বৎসর বয়স্ক রশীদ ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজের মর্যাদা পাইবেন। কিন্তু বাদশাহ হোসেন কয়েক বৎসর যাবৎ অস্পষ্টভাবে বলিয়া আসিতেছেন যে সিংহাসনে আরোহণ প্রক্রিয়ায় গণতন্ত্রায়ন প্রয়োজন। অতঃপর তিনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের একটি গোপন প্যানেল তৈয়ার করিয়া তদ্বারা দুই ঘনিষ্ঠরামর্শদাতাকে বিষয়টি পর্যালোচনার জন্য বলেন, ইহার ফলে বাদশাহ তাহার চতুর্থ স্ত্রী মার্কিন বংশোদ্ভূত রাণী নূরের গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ সন্তান হামজাকে (১৮) পরবর্তীতে সিংহাসনে বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া গুজব ছড়াইয়া পড়ে। নূর এবং হাসানের স্ত্রী প্রিন্সেস সারভাতের মধ্যকার সম্পর্ক শীতল। পাশ্চাত্যের কূটনীতিকগণ বলিয়া থাকেন যে, দুইজন রাণীর স্থান সংকুলানের মত তেমন বড় রাষ্ট্র জর্দান নহে।

আম্মানস্থ একজন জার্মান কূটনীতিক বলেন, হামজাকে ভাল কিছুর জন্য গড়িয়া তোলা হইতেছে। গত বৎসর সম্রাজ্ঞী নূর প্রিন্সেস ডায়নার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে হামজাকে তাহার রক্ষী হিসাবে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহাতে হামজার ভাবমূর্তি অনেকটা বাড়িয়া যায়। সনাতনী জর্দানী সমাজে নূর কখনো তেমন জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই, তবে ইউরোপের রাজকীয় চিত্র সম্বলিত সাময়িকীগুলিতে নূরের ছবি নিয়মিত ছাপা হইয়া আসিতেছে। গত জুনে লন্ডনের বাহিরে জর্দান সম্রাজ্ঞী নূর আয়োজিত এক বার্ষিক অনুষ্ঠানে আসিয়াছিলেন প্রিন্স চার্লস, স্পেনের রাজা এবং অভিনেতা হ্যারিসন ফোর্ড ও বারবারা ওয়েল্টাস। গত মাসে নূর ল্যান্ডমাইন সারভাইবার্স নেট ওয়ার্কে ডায়ানার স্থান অধিকার করেন।

প্রিন্সেস সারভাত কম গ্ল্যামারাস হইলেও সমভাবে শক্ত মহিলা। তিনি জর্দানের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন। বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জর্দানের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্র্যাজুয়েটদের উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয় সারভাত তাহার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক।

সারভাত সাবেক পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কন্যা। অক্সফোর্ডে জর্দানী যুবরাজের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয়। জর্দানী জনগণ তাহার অনাড়ম্বর জীবন যাপন পদ্ধতি পছন্দ করেন।

এখন এই দুই মহিলার দুই পুত্র পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কাজেই রাজপ্রাসাদের পর্যবেক্ষকগণ বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেন কোন প্রিন্সের জন্মদিন কেমনভাবে উদযাপিত হয়। ১০ মাসের বড় রশীদ বর্তমানে জার্মানিতে অবস্থানরত বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কাজ করিতেছেন। কিছুকাল আগে জর্দান টাইমস-এর ভিতরের পাতায় পূর্ণ পৃষ্ঠায় তার একটি রঙিন ছবি ছাপা হয়। ইহার পর যখন হামজার পালা আসে তখন তাহার ভাইকে ছাড়াইয়া যায়। হামজার ছবি ছাপা হইল এই পত্রিকার প্রথম পাতায় এবং উহার সাথে বাদশাহর একটি চিঠি ছাপা হয় যাহাতে তিনি তাহার পুত্রকে স্মরণ করাইয়া দেন, তাহার বয়সে তিনি বাদশাহ হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পিতার মত হামজাও এই বসন্তে স্যান্ডহার্স্টে বৃটিশ সামরিক একাডেমীতে ভর্তি হইবেন। মায়ো হাসপাতালে বাদশাহ হোসেন বলেন, "আমি উদ্বিগ্ন নই।" তাহার এই সাহসিকতা তাহার চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ যাহা তাহাকে মধ্যপ্রাচ্যের অপরিহার্য মানুষে পরিণত করিয়াছে। (B.S.S. Featture)

* * * *

জর্দানের বাদশাহ হোসেনের ইন্তেকালঃ

জর্দানের বাদশাহ হোসেন বিন তালাল গতকাল (৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) আম্মানের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। বাদশাহর ইন্তেকালের পরপরই রাণী নূরের গর্ভজাত যুবরাজ আবদুল্লাহকে নূতন বাদশাহ ঘোষণা করা হয়। নূতন বাদশাহ তাহার প্রথম টেলিভিশন ভাষণে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকিয়া মরহুম বাদশাহর কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখিবার আহ্বান জানান।

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অংগনে এক মধ্যপন্থী শক্তি হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত জর্দানের বাদশাহ হোসেন। ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের সঙ্গে জর্দানের শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর বৃহত্তর আঞ্চলিক শান্তি স্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।তাহাকে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার অন্যতম স্থপতি হিসাবে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। মধ্যপ্রাচ্যের বহু জটিল এবং বিস্ফোরক রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় তাহার মধ্যস্থতার উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল ও আরব রাষট্রগুলি বরাবরই নির্ভর করিয়াছে। তাই তাহার মৃত্যুতে যে সব প্রশ্ন বৃহৎ হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা হইল তাহার অনুপস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির উপর কি প্রভাব ফেলিবে? মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ার ভবিষ্যতইবা কি হইবে? এই প্রসঙ্গে বিবিসির মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশ্লেষক রজার হার্ডি বলেন, "আমি মনে করি জর্দানসহ পুরো অঞ্চলই এক অস্থিতিশীল পর্যায়ে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহার কারণ ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, এই অঞ্চলের জনগণ রাজ সিংহাসনকে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাদশাহ হোসেন-এর উপস্থিতিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। অন্য কোন আরব নেতা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশ শাসন করেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারের বিষয়টি প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

বহুদিন ধরিয়া যুবরাজ ও সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসাবে বাদশাহর ভাই যুবরাজ হাসানকে জনগণ উত্তরাধিকারী হিসাবে মনে করিয়াছিল। তবে মধ্যখানে কিছুকাল যুবরাজ হামজাকেও সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু বাদশাহ সম্প্রতি

চিকিৎসা শেষে যুক্তরাষ্ট্র হইতে ফিরিয়া তড়িঘড়ি তাহার বড় ছেলে রানী নূরের ঔরষের আবদুল্লাহকে যুবরাজ ঘোষণা করেন। তাই হাসান দৃশ্যত এই রদবদল মানিয়া লন।

জর্দানের বর্তমান বাদশাহ আবদুল্লাহ সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল। তিনি রাজপরিবারের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এলিট ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন। আবদুল্লাহর রাজনৈতিক মতাদর্শ কি তাহা খুব একটা জানা যায় নাই। তবে সহযোগীগণ জানান তিনি পিতার মতই পাশ্চাত্য পন্থী। তবে তিনি রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। তাহার বয়স মাত্র ৩০-এর কোঠায়। পিতার ন্যায় দেশ পরিচালনা এবং সেই সঙ্গে তিনি তাহার মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ অবস্থান কতটুকু ধরিয়া রাখিতে পারিবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন। দেশ পরিচালনায় তিনি ব্যর্থ হইলে দেশের স্থিতিশীলতায় যে ভাঙন দেখা দিবে তাহা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের উপর প্রভাব ফেলিবে এবং মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হইবে। এই কারণেই মধ্যপ্রাচ্যে জর্দানের স্থিতিশীলতার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ, আয়তনে ছোট হইলেও জর্দান মধ্যপ্রাচ্যে কৌশলগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ।

বাদশাহ হোসেন আলেকজান্দ্রিয়া এবং ইংল্যান্ডের হ্যারো ও স্যান্ডহার্স্টে পড়াশুনা করেন। দীর্ঘ ৪৭ বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই তাহাকে অভ্যুত্থান, হত্যা প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ফিলিস্তিনী শরণার্থীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ফিলিস্তিনীরা তাহার পিতামহ বাদশাহ আবদুল্লাহকে জেরুজালেমের আকসা মসজিদে হত্যা করে (মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য-পৃষ্ঠা-৪৮৯), কারণ ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরাইলী যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের জন্য তাহারা বাদশাহ আবদুল্লাহকে দায়ি করে।

মধ্যপ্রাচ্যের জটিল ও উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও তাহার যোগ্য নেতৃত্বের কারণে এই অঞ্চল এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান লাভ করে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে জর্দান উহার কিছু অংশ হারায়। সেই সঙ্গে ইসরাইল হইতে অনেক ফিলিস্তিনী শরণার্থী জর্দানে আশ্রয় লয়। পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (পিএলও) নেতৃত্বে ফিলিস্তিনী কমান্ডোরা জর্দান হইতে ইসরাইলের অভ্যন্তরে গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিলে জর্দানের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া দাঁড়ায়। পরে ১৯৭০ সালে দেশের অস্তিত্ব লইয়া পিএলও এবং বাদশাহ হোসেন-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাদশাহ পিএলও কমান্ডোদের জর্দান ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তিনি ইরাকের পক্ষ নেন ও পশ্চিমাদের বিরোধিতা করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং সেই সাথে তিনি সৌদি আরব, পিএলও এবং অন্যান্য মধ্যপন্থী আরব দেশের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। ১৯৮৮ সালে তিনি পশ্চিম তীরের উপর জর্দানের দাবি প্রত্যাহার করিলে প্রবাসী ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পথ পরিষ্কার হয়।

বর্তমানে বাদশাহ হোসেনের উত্তরসূরী বাদশাহ আবদুল্লাহকে নিজের দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া আগাইয়া নেওয়া এবং ইরাককে বিক্ষুব্ধ না করিয়া ইসরাইলের সহিত জর্দানের সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। (ভোরের কাগজ-৭/২/৯৯, কিঞ্চিত পরিবর্তিত)

সৌদি আরব

সৌদি আরবে ব্যাংকিং খাতে চলতি বৎসরের প্রথম দশ মাসে মোট সম্পদের ৬ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে। সৌদি আরবের অর্থ সংস্থা (SAMA) বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত সোমবার এক

বিবৃতিতে এই তথ্য জানায়। এই খাতে ১৯৯৮ সালের শেষে সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪হাজার ২শত ৮০ কোটি ডলার। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে তাহা নামিয়া দাঁড়ায় ৪ হাজার ২০ কোটি ডলারে। সৌদি আরবে ১৯৯৮ সালের শেষ নাগাদ ১১টি ব্যাংক গড়িয়া উঠে। তবে গত জুলাই মাসে সংযুক্ত সৌদি ব্যাংক এবং সৌদি আমেরিকান ব্যাংক একীভূত হইবার পর এই সংখ্যা ১০ এ নামিয়া আসে। সৌদি আরবে বর্তমানে ৩ হাজার ১শত ৪৮টি কারখানা রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এক পঞ্চমাংশ কারখানা তেল ব্যবস্থায় নিয়োজিত। কারখানাগুলির মোট মূল্য ৬, ১৮০ কোটি ডলার।

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থা মহিলাদের ব্যাপারে অমানবিকতার অভিযোগ উথাপন করে। অপরদিকে ইরান ও অন্যান্য তালেবান বিরোধী গ্রুপের চাপের মুখে জাতিসংঘ তালেবানদের আসন প্রদানের পরিবর্তে পূর্বেকার বোরহানুদ্দিন রাব্বানী সরকারকেই স্বীকৃতি প্রদান করে, যদিও আফগানিস্তানের চারিভাগের তিন ভাগই তালেবানদের দখলে এবং বিরোধী রাব্বানী জোটের হাতে রহিয়াছে মাত্র এক- চতুর্থাংশ এলাকা। তালেবান সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যার সৃষ্টি করে ওসানা বিন লাদেনকে কেন্দ্র করিয়া আমেরিকানদের সম্পর্কে।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু রুশদের আফগানিস্তান ত্যাগের পর তাহার সঙ্গে আমেরিকানদের সম্পর্ক খারাপ হইয়া যায়। সমগ্র বিশ্বে মার্কিন স্বার্থে আঘাত হানিবার মূলে ওসামার হাত রহিয়াছে বলিয়া যুক্ত রাষ্ট্র অভিযোগ করে।

১৯৯৯ সালের শুরুতে কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ার মার্কিন দূতাবাসে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে প্রায় শতাধিক মার্কিন নাগরিক নিহত হয়। এই বোমা বিস্ফোরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে। সৌদি বংশোদ্ভূত ধনকুবের ওসামা ইতোপূর্বে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন ইসলাম এবং ইসলামী জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য তাহার জীবন উৎসর্গিকৃত। তাহার দৃষ্টিতে, পৃথিবীর সর্বত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের ধনসম্পত্তি, বিশেষত তেল সম্পদের উপর হাত বসাইয়াছে, তাই তাহাকে বাধা প্রদান করা তাহ্যর ঈমানী দায়িত্ব। কেনিয়া ও তাঞ্জানিয়ায় বোমা বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওসামাকে বিচারের জন্য সমর্পণ করিতে আফগানিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার ওসামাকে হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানাইলে বিষয়টি জাতিসংঘে উথাপন করা হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদও একইভাবে আফগানিস্তানের নিকট দাবি জানায়, অন্যথায় ১৪ই নভেম্বর '৯৯ সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে আফগানিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক অবরোধ আরোপের হুমকি দেয়। আফগান সরকার দৃঢ়ভাবে ওসামা বিন লাদেনকে হস্তান্তরে অস্বীকৃতি জানাইলে ১৪ই নভেম্বর হইতে জাতিসংঘ আরোপিত অবরোধ কার্যকর হয়। অর্থনৈতিক অবরোধের অংশ হিসাবে সর্বপ্রথম পাকিস্তানের সামরিক সরকার তালেবানদের সমস্ত সম্পদ আটকের নির্দেশ দেয়।

ওসামা-বিন- লাদেনঃ

সৌদি পরিবারের একজন সদস্য ওসামা-বিন-লাদেন ইদানীং বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত। অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামরত মুসলমানদের চোখে তিনি একজন

ত্রাণকর্তা, যিনি বীর মুসলিমদের নিজ পায়ে দাঁড়াইবার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। তিনি মনে করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য মুসলমানদের একে অন্যের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া ফায়দা হাসিলে লিপ্ত এবং তাই তাকে যখন যেভাবে পারা যায় আঘাত কর। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও উহার মিত্রদের দৃষ্টিতে বিন লাদেন একজন নিকৃষ্ট মানের সন্ত্রাসী যে নির্দ্বিধায় যে কোন জনপদ ধ্বংস করিতে পারে। তাহার হাতে বিশ্বমানবতা নিরাপদ নহে; অতএব বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো এখন সময়ের দাবি। যে বা যাহারা তাহাকে আশ্রয় দেয় সেও তাহার ন্যায় সন্ত্রাসী- অতএব অবরোধযোগ্য। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

শেখ ওসামা বিন লাদেনের পিতা মুহাম্মদ বিন আওদ বিন লাদেন সৌদি বাদশাহ ফয়সলের শাসনামলে একজ মন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একটি নির্মাণ কোম্পানির মালিক ছিলেন। হারাম শরীফ এবং মসজিদুল আকসা সম্প্রসারণ ও সংস্কার কাজ তাহার হাতে ন্যস্ত হয়। ওসামার পিতা বাদশাহ ফয়সলের জীবদ্দশায়ই ইহলোক ত্যাগ করেন। বাল্যকাল হইতেই বোমা মারিয়া পাহাড় উড়াইয়া বিশেষ প্রশিক্ষণ তিনি গ্রহণ করেন।

ওসামা বিন লাদেনরা ২৫ ভাই। তাহার পিতা এই ২৫ ভাইকেই জেহাদের জন্য প্রস্তুত করেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। ইহুদি কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাসের পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার ঘটনা হইতে বিশাল ধন সম্পতির মালীক ওসামা জেহাদের প্রেরণা লাভ করেন। ১৯৭৯ সালে রুশ লালবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করিলে তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদদের সাহায্য করে। এতদসত্ত্বেও কেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন- এই ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে ওসামা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভয় ছিল পাছে রাশিয়া আফগানিস্তানকে পরাস্ত করিয়া ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের পথ পায় এই ভয়ে তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদদের রাশিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়া সাহায্য করে। কিন্তু রাশিয়া আফগানিস্তান ত্যাগ করিলে যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়। আফগানিস্তানে ইসলামি শাসন কায়েম হোক তাহা যুক্তরাষ্ট্র চায় না। মুজাহিদ গ্রুপগুলিকে একত্রিত করিয়া কমিউনিস্ট নজিবুল্লাহর সহিত সরকার গঠন করিতে যুক্তরাষ্ট্র উৎসাহ যোগায়। কিন্তু ওসামা সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিষয়ক ও আল-খুবারে বোমা হামলার জন্য ওসামাকে দায়ী করে। তিনি এই হামলা সমর্থন করেন কিন্তু নিজের অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করেন। তাহার মতে এই হামলায় শুধু মার্কিনীরাই নিহত হইয়াছে, একজন সৌদি নাগরিকও নিহত হয় নাই। সোমালিয়ায় আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনার জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি এই অভিযোগ স্বীকার করিয়া বলেন জেনারেল আইদিদের হাতে মাত্র ৩০০ সৈন্য ছিল তন্মমধ্যে ২৫০ জন তাহার সরবরাহকৃত সৈন্য।

বস্তুত ওসামা বিন লাদেন নিজের কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া হাজার হাজার আরব অনারব যুবকদিগকে অত্যাধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেন এবং তাহাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এই সমস্ত যুবকদিগকে তিনি মুসলিম বিশ্বে অবস্থিত মার্কিন স্থাপনাসমূহে লেলাইয়া দেন যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র এই সব দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। পাকিস্তানের 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকার এক সাংবাদিক আহমদ মীরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ওসামা বলেন, আমেরিকা জাতিসংঘের আড়ালে সোমালিয়ায় তাহাদের আস্তানা গড়িয়া তুলিবার অপপ্রয়াস চালায়,

যাহাতে সুদান ও ইয়েমেনের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। প্রতিটি ইসলামী দেশ আমাদের নিজেদের ঘরতুল্য। আমাদের ঘরে আমেরিকা অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছিল। ফিলিস্তিন এবং ইরাকে আমেরিকা মুসলিম নিধন করিয়াছে।

অতএব ওসামা বিন লাদেন একজন বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব। সংগ্রামরত মুসলিম বিশ্ব তাহাকে মনে করে একজন ত্রাণকর্তা বলিয়া আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাকে মনে করে একজ নিকৃষ্ট ধরনের সন্ত্রাসী বরিয়া, যিনি রিয়াদ ও আল খুবারে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাইয়া কয়েক ডজন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করিয়াছেন এবং সোমালিয়ার ১২৫ জনেরও অধিক মার্কিন সৈন্যের মৃত্যুর কারণ। তিনি মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনি মুবারকের উপর প্রাণঘাতী আক্রমণের পিছনেও তাহার হাত রহিয়াছে বলিয়া আমেরিকা অভিযোগ করে, যিনি সুদানে তিনটি ঘাটি স্থাপন করিয়া সুদানী কমন্ডোদের দ্বারা হাজার হাজার যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়া মিসর, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, ইয়েমেন ও সৌদি আরবে পাঠাইতেছে। ইহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হামাসের সহিত মিশিয়া ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। যুক্তরাষ্ট্র আরও অভিযোগ করে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ সালে নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরণের সাথে জড়িত রমজী ইউসুফও ওসামা বিন লাদেনের একজন ছাত্র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৫ই জুন, ২০০০

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

[একশ একত্রিশ]

লেবানন
পশ্চিম তীর
দখলকৃত : ১৯৬৭
এ স্থলে চরমপন্থী ইহুদি
অভিবাসীরা গোলযোগের
সৃষ্টি করিতে পারে।
জনসংখ্যা
ইহুদী ১০০,০০০
ফিলিস্তিনী ১০,০০,০০০
ইসরাইলী
নিরাপত্তা এলাকা
সিরিয়া
গোলান উচ্চভূমি
দখলকৃত : ১৯৬৭
অধিকাংশ ইসরাইলী
এখনও সিরিয়ার
সঙ্গে কোন চুক্তির
বিরোধী
গাজা উপত্যকা
দখলকৃত : ১৯৬৭
অনেক দুরিদ্রও
চরপন্থী ফিলিস্তিনী
এখানে বাস করে
তেল আবিব
জেরিকো
জর্দান
জেরুজালেম
পূর্ব জেরুজালেম
দখলকৃত : ১৯৬৭
ইসরাইলী ও
ফিলিস্তিনী উভয়ে
জেরুজালেমকে
তাহাদের রাজধানী
বলিয়া দাবি করে।
সিনাই উপদ্বীপ
দখলকৃত : ১৯৬৭
ফেরৎ দান ১৯৮২
এই ব্যাপারে ইসরাইল ও
মিসর ক্যাম্পডেভিতে
চুক্তি করে।
ইসরাইল
সূত্র : নিউজউইক
সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯৯৩
জনসংখ্যা
ইহুদী ১,৩৩,০০০
ফিলিস্তিনী ১,৫২০০
মিসর

ভূমিকা

এই গ্রন্থ একটি উদারনৈতিক আর্ট কলেজে ২০ বৎসর মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস শিক্ষা দিবার ফলশ্রুতি। যেসব ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের এই এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই, এবং যেসব শিক্ষক নিজেরা এই ক্ষেত্রে পারদর্শী, কিংবা তেমন পারদর্শী নহেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত। এই গ্রন্থের উপাদানসমূহ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শ্রেণীকক্ষে আলোচিত ও তথা হইতে আহরিত। এই ক্ষেত্রে যেগুলি মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের অতীত ও বর্তমান সমস্যাবলী, গুণাবলী এবং অবদানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে ছাত্রদের সহায়ক শুধু সেগুলিই এখানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য এই গ্রন্থে চারি খণ্ডে বিধৃত। প্রথম খণ্ডে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তৃতি সম্পর্কে, দ্বিতীয় খণ্ডে ওসমানীয় ও সাফাভীয় সাম্রাজ্য, তৃতীয় খণ্ডে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও মধ্যপ্রাচ্য এবং চতুর্থ খন্ডে অনেক জাতিগত রাষ্ট্রে বিভক্ত আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহারা এক বৎসরের শিক্ষা কোর্সে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যায়ন করেন তাহারা প্রথম সেমিস্টারে সুফলদায়কভাবে প্রথম দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন এবং দ্বিতীয় সেমিস্টারে অবশিষ্ট দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন।

এই গ্রন্থে বর্ণিত সংস্কৃতি গঠনে অনেক জাতির অবদান রহিয়াছে; কিন্তু অন্ততঃপক্ষে তিনটি শ্রেণীর আলোচনা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস তেমন বুঝা যায় না। এই শ্রেণীগুলি হইল আরবিভাষী লোকজন, পারস্যবাসী ও তুর্কি। কোন আলোচনায় উপরোল্লিখিত যে কোনো একটিকে বাদ দিলে, তাহা অত্র এলাকার একটি বিকৃত ছবি প্রদান করিবে মাত্র। অত্র গ্রন্থে ছত্র বা শব্দ গণনা না করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাপারে আমি গোটা অঞ্চলের ইতিহাসে ইহার প্রকৃত স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যে-কোনো ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় রহিয়াছে। ইহার প্রাসঙ্গিক বিষয় দেশীয়। আশা করি পারস্যে আমার জন্ম ও লালনপালনের ফলে প্রধান বিষয়াদিতে আরব ও তুর্কি প্রসঙ্গ আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয় নাই। ইহা লিখিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে পাঠক অত্র এলাকার ভিতর হইতে বাহিরে দেখেন, বাহির হইতে ভিতরে নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পাঠ করিলে ইহা আমাদিগকে মানবপ্রকৃতির সেই অনুভূতি লাভে সহায়তা করে, যাহাকে আমরা 'জ্ঞান' বলি। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই এলাকার তৈল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বরং এই জন্য যে এতদ্‌ঞ্চলের জনগণের দোষগুণ, বুদ্ধিমত্তা ও বোকামী বিশ্বের জনগণের ভাগ্যকে প্রভাবিত করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি আরব, পারস্য, তুর্কি ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গবেষণামূলক রচনাদি ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতে পারিলে আমি খুশি হইতাম। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ব্যবহারে তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, উল্লেখ করিতে গেলে তাহা কয়েক পাতা হইবে। তাঁহাদের গবেষণাপ্রসূত কার্যাবলী ছাড়া

এই পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইত না এবং সেই কারণেই তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা গভীর ও অকপট।

বিগত পনের বৎসর ধরিয়া মিনেসোটার সেন্টপলের 'লুই ডব্লিউ এন্ড মন্ড হিল ফেমিলি ফাউন্ডেশন' (Louis W. and Mond Hill Family Foundation of St. Paul Minnesota) সেই শহরের চারিটি কলেজকে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অধ্যয়নে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের একজন সমন্বয়কারী হিসাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে এই অঞ্চলের দেশসমূহ ভ্রমণ করিবার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বৃত্তি লাভ করি। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি আমাদের কর্মসূচির প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। তাহাদের আগ্রহের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শনস্বরূপ ইহা তাঁহাদের করকমলে অর্পিত হইল।

ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক মিঃ কেনেথ হোল্‌ম্‌স্‌-এর প্রতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, যিনি অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে অতি মূল্যবান উপদেশাদি দান করিয়াছেন। ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস্‌ ওয়ালেস (James Waliace, Professor of History) বয়েড মি. শেপারের সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তিনি আমার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। ইতিহাসে জ্ঞান এবং সম্পাদক হিসাবে আমেরিকান হিস্টরিক্যাল রিভিউর দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহার অসংখ্য উপদেশাদিকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিক্কি কেডিডর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তিনি সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। তাঁহার ধারালো ও জোরালো সমালোচনা ও উপদেশাবলীর ফলে এই গ্রন্থের মান অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। আমার ছাত্র এ্যালেন জিবাস ও জেমস্‌ পলজিনকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা যথাক্রমে অর্ধেক ও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করেন। এহেন ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোনো ভুলভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে আমি সেগুলির এবং সমস্ত ব্যাখ্যা ও উপসংহারে ভুলত্রুটির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমার ধৈর্যশীল ও দীর্ঘকালীন কষ্টসহিষ্ণু সচিবদ্বয়, ক্যাথারিন ক্রস ও নেন্সী নেলসনকে যাঁহারা পুন পুন পাণ্ডুলিপি টাইপ করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা এতই অভিজ্ঞ যে, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের এই গবেষণায় তাঁহারা পরিপূর্ণ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। আমার স্ত্রী ও পরিবার, যাহারা কমপক্ষে তিন বৎসর এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় আমার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেন্টপল, মিনেসোটা — ইয়াহ্‌ইয়া আরমাজানী

মধ্যপ্রাচ্য ঃ অতীত ও বর্তমান
পঞ্চম সংস্করণে অনুবাদকের কথা

২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে রিপাবলিক্যান দলের জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বি ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আল-গোরকে পরাজিত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁহার মেয়াদকালের স্মরণীয় ও মর্মান্তিক ঘটনা হইল নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন স্ট্রীটে অবস্থিত বিশ্ব ট্রেড সেন্টারে (World Trade Centre) ও সশস্ত্র বাহিনী সদর দফতর পেন্টাগনে সন্ত্রাসী কর্তৃক বোমা হামলা। পরবর্তীকালে সন্ত্রাসী দমনের নামে আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ এবং উভয় দেশের শাসকদের উৎখাত করিয়া তথায় যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা। এই ঘটনায় মুসলিম বিশ্ব তথা বিশ্ব মানবতা চরম সংকটে নিপতিত হয়। ওসামা বিন লাদেনকে এই হামলার হোতা হিসাবে বিবেচনা করিয়া আফগানিস্তানে হামলা চালান হয়। কারণ সেই দেশের শাসক বা আমির মোল্লা মোহাম্মদ ওমর বিন লাদেনকে একজন অতিথি বিবেচনায় মার্কিনীদের হাতে সোপর্দ করিতে অস্বীকার করেন। পরবর্তীকালে বিন লাদেনের তথা তাঁহার সংগঠন আল-কায়েদার সঙ্গে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সম্পর্ক রহিয়াছে বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্র ইহার সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ইরাক আক্রমণ করে। ইরাক পদানত করিয়া প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে বন্দি করেন। অপর দিকে কিউবার গুয়ানতানামো বে'তে অবস্থিত মার্কিন বন্দিশালায় পাঁচ শতাধিক আল-কায়েদা যোদ্ধাদের নির্যাতন করা হয় বলিয়া মার্কিন পত্র-পত্রিকায় তথ্য প্রকাশ পায়। আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন আক্রমণে লক্ষ লক্ষ মুসলিম আরব ও অনারব সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মুসলিম জগতে অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়ে। মুসলিম সরকার প্রধানগণ মার্কিনীদের সন্ত্রাস দমনের নামে লক্ষ লক্ষ মুসলমান হত্যা, ইরাকে অবস্থিত প্রাচীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন ধ্বংস করা সত্যেও যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়াছেন। অপরদিকে বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান প্রেসিডেন্ট বুশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সাথে সাথে শান্তিকামী বিশ্বের বিবেকবান কোটি কোটি মানুষ প্রেসিডেন্ট বুশের এসব গণহত্যা এবং সভ্যতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানাইয়া ভয়াবহ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মানবতার নামে উচ্চকণ্ঠ যুক্তরাষ্ট্রের এহেন মানবতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড সর্বত্র ঘৃণিত হয়। তাছাড়া গুয়ানতানামো বে এর বন্দিশালায় মার্কিন সৈন্যদের অমানবিক আচরণ এবং ইরাকের আবুগারিব কারাগারে বন্দি নির্যাতন মধ্যযুগীয় বর্বতাকেও হার মানায়। মার্কিন মহিলা সৈন্যরা এ সমস্ত কারাগারে যে যৌন নির্যাতন চালাইয়াছে তাহাও তাহাদের স্বদেশবাসী এবং বিশ্ববিবেককে নাড়া দিয়াছে।

[একশ ছত্রিশ]

এই সময়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২০০৪ সালের ১২ই নভেম্বর ধীর-বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ইয়াসীর আরাফাতকে হত্যা করা এবং অতঃপর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের নেতৃত্বে ইসরাইলের সাথে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

উপরে উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং সেইসঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ইহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে এই সম্পর্কীয় সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলিয়া ধরিবার প্রয়াস চালান হইয়াছে।

বহুজাতিক বাহিনীর ইরাক দখলের প্রায় চারি বৎসর পর অতিসম্প্রতি প্রথম বারের মত ইরাকের একটি প্রধান প্রতিরোধকারী দল যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেশে ফিরিবার জন্য কিছু শর্ত উপস্থাপন করিয়াছে। প্রদত্ত শর্তগুলি মানিয়া লওয়া যেকোন প্রশাসনের পক্ষে অসম্ভব। তবে সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ যোদ্ধাদল ইরাকী ইসলামী রেসিসট্যান্সে মুভমেন্টের (Iraq Islamie Resistacne Movement) নেতা আবু সালিহ আল জিলানী জানান, তাহাদের সমবেত লড়াইয়ে তিন হাজারেরও উপর মার্কিন সেনা নিহত হইয়াছে। আর জীবনহানী না করিয়া যদি তাহারা দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের শর্তে সাড়া না দিয়া উপায় নাই। আল জিলানীর গ্রুপকে বলা হয় ২০তম বিপ্লবী ব্রিগেড (20th Revolutionary Brigade)। ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিনী অবরোধের অব্যবহিত পরেই এই গ্রুপটি প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করে। আল-জিলানীর উপস্থাপিত বিবৃতিটি খুব গুরুত্বের দাবী রাখে। অবশ্য ইহা শুধু সুন্নিদের মতামত, শীয়াদের নহে। বিবৃতিতে ইরাকের বর্তমান রাষ্ট্রীয় সংবিধান বাতিলের আহ্বান জানান হইয়াছে। সুন্নিরা এখনও ওয়াশিংটনের প্রধান শত্রু। আল জিলানী দ্য ইনডিপেন্ড্যান্ট (The Independent) পত্রিকায় প্রেরিত বার্তায় বলিয়াছেন, 'আলোচনা ও আপস রক্ষার উদ্দেশ্যই হইল ইরাকে রক্তপাত বন্ধ হোক। আমেরিকানরা কি ইরাক ত্যাগ করিয়া নিজ দেশে ফিরিবে এবং ইরাকী জনগণকে শান্তিতে বসবাস করিবার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করিবে? ইহা হইলে বাস্তবতা অনুসারে আমরা পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করি।' আল জিলানী জাতিসংঘ,. আরব লীগ এবং ইসলামিক কনফারেন্সকে অনুরোধ করিয়াছেন তাহাদের সমঝোতা প্রস্তাব অনুসারে দ্রুত আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করিতে। সুন্নি ইরাকী রেসিস্‌ট্যান্স মুভমেন্ট প্রদত্ত শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) সর্বাগ্রে মার্কিনীদের সদিচ্ছার নমুনা হিসাবে জেলে আটক পাঁচ হাজার বন্দিকে মুক্তি দিতে হইবে।

(খ) তাহাদের ভূমিকা ইরাকী জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন—এই মতকে স্বীকৃতি এবং বৈধতা দিতে হইবে। পাশাপাশি তাহাদের প্রতিরোধ করিবার বৈধতাকেও স্বীকৃতি দিতে হইবে।

(গ) সবশর্ত আন্তর্জাতিকভাবে মানিয়া লওয়া হইবে তেমন একটি সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন করিতে হইবে।

(ঘ) সমঝোতামূলক সব কর্মকাণ্ড খোলাখুলি ও জনসমক্ষে হইতে হইবে।

(ঙ) সব জিহাদী ব্রিগেডের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি সমঝোতা আলোচনায় অংশ লইবে।

(চ) ইরাকে কর্মরত রাষ্ট্রদূত এবং সবচেয়ে সিনিয়ার কমাণ্ডার আমেরিকার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

উল্লিখিত শর্তসমূহ সম্পর্কে মার্কিনীরা কি চিন্তা-ভাবনা করে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। এতদিন ধরিয়া যাহাদিগকে সন্ত্রাসী বলিয়া আখ্যয়িত করিয়া আসিয়াছে তাহাদের সঙ্গে আপোষ করিবার কথা এখনই যে বলিবেনা তাহা বলাই বাহুল্য। তাহারা যদি সত্যসত্যই উপলব্ধি করে যে প্রতিরোধকারীদের প্রতি জনগণের সমর্থন রহিয়াছে তবে এই নির্বাচিত সরকারকে সমর্থন করা নিরর্থক হইবে। জিলানী আরো দাবী করেন, ইরাকী কর্তৃপক্ষ এবং মার্কিন সৈন্যদের জারিকৃত সব ফরমান ও চুক্তি বাতিল করিতে হইবে।

আরেকটি বিষয় এইস্থলে খুবই অর্থবহ তাহা হইল প্রতিরোধকারী সংস্থা একটি নহে বরং অনেকগুলি। প্রস্তাবিত দাবীসমূহ একটি গ্রুপের দ্বারা উপস্থাপিত; তাই এই গ্রুপের মনোভাবের সাথে অন্যান্য গ্রুপগুলি একাত্মতা প্রকাশ করে কিনা তাহাও যাচাই করা প্রয়োজন। সুন্নিদের দেওয়া শর্তে সাবেক ইরাকী সেনাদের মানিয়া লইবার আহ্বান জানান হইয়াছে। অপরদিকে ব্রিটিশ মার্কিনীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা প্রতিরোধ যুদ্ধের যোদ্ধাদের কৌশলে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। আল-জিলানী প্রেসিডেন্ট বুশকে অভিযুক্ত করিয়াছেন এইভাবে— তিনি ইরাকে প্রতিরোধ যুদ্ধকে প্রতিহত করিবার নূতন কৌশল গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক প্রতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের ময়দানে আমরা নামিয়াছি আমাদের মাতৃভূমিকে বিদেশী দখলদারমুক্ত করিতে। ইরাককে স্বাধীন করিবার যে সংগ্রাম তাহা আমেরিকা কেন, কেহই প্রতিহত করিবার ক্ষমতা রাখে না। প্রতিরোধ যোদ্ধারা কখনও অন্যায় কাজ করে নাই, সুতরাং তাহাদের ক্ষমা করিবার প্রশ্নই উঠেনা। আমেরিকা ক্ষমা চাহিতে বলিয়া বরং অন্যায় করিয়াছে। আমরা জেহাদ হইতে সরিয়া যাইতেছিনা। জেহাদ ত্যাগ করিবার অর্থ হইল আমাদের মৃত্যু। আমরা একটি লক্ষ্য লইয়া লড়াই চালাইয়া যাইতেছি এবং তাহা হইল আমাদের পবিত্র ভূমি ইরাকের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা আমাদের অধিকার।' (ইরাকী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতা প্রসঙ্গে দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার মধ্যপ্রাচ্য সংবাদদাতা রবার্ট ফিস্ক; দৈনিক আমার দেশ, ২০/২/০৭)।

তবে ইরাকী ইসলামী রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্টের নেতা আবু সালেহ আল-জিলানী উত্থাপিত এই শান্তি প্রস্তাবের ব্যাপারে আর কোন আলোচনা শুনা যাইতেছে না। সম্প্রতি মার্কিন ডেমোক্রেট দলীয় কংগ্রেস সদস্যদের চাপে পড়িয়া প্রেসিডেন্ট বুশ কিছুটা নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাই ইরাক আয়োজিত প্রতিবেশীদের আসন্ন বৈঠকে ইরান ও সিরিয়ার সঙ্গে বৈঠকে বসিতে বুশ রাজী আছেন বলিয়া মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস জানাইয়াছেন। ইহা যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। যুক্তরাষ্ট্র এতদিন,

ইরাকের স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনায় ইরান ও সিরিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যাপারে কংগ্রেস সদস্য ও দুই দলীয় ইরাক পর্যালোচনা গ্রুপের অবস্থানকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছিল (১/৩/০৭)।

আফগানিস্তান :

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (চতুর্থ সংস্করণে অনুবাদকের কথা দ্রষ্টব্য) রুশ আধিপত্য অবসানের পর আফগানিস্তানে বিবদমান মুজাহিদ গ্রুপগুলির অন্তর্কোন্দল ও কলহের অবসান ঘটাইয়া তথায় মোল্লা মোহাম্মদ ওমরের নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে তালেবানগণ তাহাদের একক শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে। তাহারা তথায় একটি নিরংকুশ ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েমের প্রচেষ্টা চালায়। ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক আধুনিকতা তাহারা পরিহার করে। মহিলা চলাচলে ইসলামী বিধিবিধান প্রয়োগ করে এবং ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর করিবার মাধ্যমে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু জাতিসংঘ দেশটিকে স্বীকৃতি প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে। কঠিন এক খরায় পতিত হইয়া দেশে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে দেশ এক চরম দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি দাঁড়ায়।

অপরদিকে ধনাঢ্য ব্যবসায়ী এবং সমগ্র বিশ্বে মুসলিম জনগণের ত্রাণকর্তা, বিশেষ করিয়া ফিলিস্তিনী মুসলমানদের মুক্তিদাতা স্বরূপ নিজেকে উৎসর্গকারী হিসাবে পরিচয় দিয়া ওসামা বিন লাদেন মোল্লা ওমরের অতিথি হিসাবে কান্দাহারের পাহাড়ী এলাকায় বসবাস করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী তিনি তাঁহার মুজাহিদ বাহিনী দ্বারা (মার্কিনীদের ভাষায় সন্ত্রাসী দ্বারা) বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মার্কিনী অবস্থানে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে আঘাত হানেন। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ সম্পদ, তাহাদের দূতাবাস, সর্বোপরী তাহাদের লোকজন বিন লাদেনের আক্রমণের শিকার। তাই যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে বিন লাদেনের অবস্থান এবং তজ্জন্য ইহার শাসক মোল্লা ওমরকে কখনও ভালো চোখে দেখে নাই।

নিউইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলা ঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ সকাল ০৯.০৩ মি. আমেরিকান এয়ারলাইনস এর ২টি ছিনতাইকৃত বিমান যাত্রীশুদ্ধ নিউইয়র্কের ম্যানহাটন স্ট্রীটে অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের (World Trade Centre) যুগল উচ্চ ভবনে (Twin Tower) হামলা চালায়। অপর দুইটি যাত্রীবাহী বিমান ওয়াশিংটনের সামরিক সদর দফতরে (Pentagon) আত্মঘাতি বোমা হামলা চালায়। সম্ভবত নিশানা ভুল করিয়া বিমানদ্বয় হোয়াইট হাউজের পরিবর্তে পেন্টাগনে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালায় (Newsweek, Special Issue, Sept. 24. 2001)। প্রত্যক্ষদর্শিদের বিবরণে প্রকাশ, যুগল উঁচু ভবনদ্বয় বিমানে রক্ষিত ৬০,০০০ গ্যালন বিস্ফোরক জ্বালানী তেলের আঘাতে ভস্মীভূত হয়। জ্বালানী তেল ভবনে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিগোলায় পরিণত হয়। ভবনদ্বয় বিকট শব্দে গলিয়া গলিয়া মাটিতে পতিত হয়। শুধুমাত্র লোহার ফ্রেম খাড়া থাকে। অপর দিকে পেন্টাগনে ধ্বংসস্তুপ এবং ক্রমাগত আগুনের লেলিহান শিখায় দুইদিন উদ্ধার তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হয়। এইভাবে নিউইয়র্কের আকাশসীমায় সগৌরবে গর্বিত উজ্জ্বল বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রের যুগল ভবন হঠাৎ ভয়ংকরভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়।

নিউইয়র্ক নগরীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত শতশত রক্ষী ও গোয়েন্দা চোখ ফাঁকী দিয়া কিভাবে ছিনতাইকৃত বিমানদ্বয় বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রে আঘাত হানিতে সক্ষম হইল? অপর দিকে মার্কিন ফেডারেল রাজধানীর নিরাপত্তা বেষ্টনি ভেদ করিয়া, বিশেষ করিয়া সশস্ত্র বাহিনী সদর দফতর পেন্টাগনে কিভাবে দুইটি বিমান এমন প্রচণ্ড আঘাত হানিতে সক্ষম হইল? খুটিনাটি বিশ্লেষণে শতকরা ৩০ ভাগ লোক মনে করে, ফেডারেল গোয়েন্দা সংস্থা (FBI) এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা শাখা (CIA)-র গোয়েন্দা তৎপরতায় গাফিলতির জন্য ইহা সম্ভব হইয়াছে। আর ৫৭ ভাগ মনে করে বিমান-বন্দরের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থাই ইহার জন্য দায়ী। সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন হতভম্ব হইয়া যায় যে আক্রমণের ১৫ মিনিট পরেও বিমান বাহিনীর কোন জঙ্গি বিমান রাজধানীর আকাশে উড্ডয়ন করে নাই। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিকচেনী দৌড়াইয়া হোয়াইট হাউজের শক্ত, মজবুত, বিমানাক্রমণ ঠেকাইতে সক্ষম বাংকারে আশ্রয় লন। প্রেসিডেন্ট এমনভাবে আত্মগোপণ করেন যে, পেরুভিয়ার লিমায় অবস্থানরত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারেন নাই। প্রেসিডেন্ট বুশ তখন পরিবর্তিত আমেরিকার উপর দিয়া তাঁহার নিজস্ব বিমানে উড্ডয়নরত (Newsweek Oct 1.2001)। পুনরায় হামলার আশংকা তখনও মার্কিনীদের বিচলিত করে। ৮২ ভাগ লোক মনে করে বিভিন্ন নগরীতে ভবনসমূহে বা উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে শীঘ্রই আরও হামলার আশংকা রহিয়াছে।

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলাকে প্রেসিডেন্ট বুশ আমেরিকার বিরুদ্ধে একটি হীন সন্ত্রাসী কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। ফলে তাঁহার নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বে সন্ত্রাসী দমনের এক মিশনে নিজেকে নিয়োগ করে। সন্ত্রাসী তালিকায় এবং যে বা যাহারা বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে হামলা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে শীর্ষে স্থান পায় আফগানিস্তান। কারণ এই দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বরের দুশমন ওসামা বিন লাদেনকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

প্রকাশ্য দিবালোকে যুক্তরাষ্ট্রে হামলাকারী এই জঘন্য শত্রুর প্রতিশোধ লইতে প্রেসিডেন্ট বুশ বদ্ধপরিকর। সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকার এক জরিপে প্রকাশ, আমেরিকার শতকরা ৭১ ভাগ মানুষ সন্ত্রাসী ঘাটিতে শক্ত আঘাত হানিবার পক্ষে, সেই হামলায় অগুনতি অসামরিক লোকক্ষয় হইলেও। নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হাজার হাজার লোকের নিহত হইবার ঘটনায় বিশ্বব্যাপী বুশের সমর্থন ব্যাপকভাবে বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন দেশ হইতে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আসে। তন্মধ্যে এক নম্বরে আসে বৃটেন, অতঃপর অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী এবং নিউজিল্যান্ড। সম্ভাব্য সামরিক অভিযানে নিম্নলিখিত ছকে সমর্থন বা বিরোধের তালিকা পাওয়া যায় ঃ

১. যাহারা সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করিবে ঃ
বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, নিউজিল্যান্ড।

২. যাহারা তাহাদের ঘাঁটি ব্যবহার করিতে দিবে ঃ
মিশর, ভারত, ইসরাইল, ইতালী, জাপান, জর্ডান, কুয়েত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, দক্ষিণ কোরিয়া, তাজিকিস্তান, তুরস্ক, আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান।

৩. যাহারা গোয়েন্দা সহায়তা দিবে ঃ
   আলজেরিয়া, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লেবানন, রাশিয়া, সুদান, সিরিয়া।
৪. যাহারা সামরিক ব্যবস্থা সমর্থন করে না ঃ
   ইরাক, কিউবা, উত্তর কোরিয়া, লিবিয়া। (Newsweek Oct. 1. 2001)।

বুশের কৃতিত্ব বলিতে হইবে যে, তিনি এই হামলাকে কেন্দ্র করিয়া সন্ত্রাস দমনের নামে সমগ্র বিশ্বকে, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে তাঁহার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার পরিচালিত ধর্মযুদ্ধে (Crusade) অংশগ্রহণ করিতে সক্ষম হন। অথচ এই আক্রমণে বিন লাদেনের হাত আছে কিনা তাহা কেউ যাচাই করেন নাই। বিন লাদেন নিজে বলিয়াছেন তিনি এই হামলা পরিচালনা করেন নাই, তবে তিনি ইহা জানিতেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ সতর্ক করিয়া দেন, তালিবান নেতৃবৃন্দ যদি কিছু আপোষহীন শর্ত মানিয়া না লয়, যাহার মধ্যে সৌদি পলাতক ওসামা বিন লাদেন এবং তাঁহার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে হস্তান্তর রহিয়াছে, তবে যুক্তরাষ্ট্র তাহাদিগকেও সন্ত্রাসী তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিবে। প্রত্যুত্তরে তালেবানরা বলে, যুক্তরাষ্ট্র যদি আক্রমণ করে তবে তাহারা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কোপানলে পড়িবে এবং সমগ্র অঞ্চলে তাহারা ভয়াবহ অবস্থায় পতিত হইবে। মোল্লা ওমর টেলিফোনে নিউজউইক প্রতিনিধিকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের আক্রমণ করে তবে আমরা জেহাদের ডাক দিব।"

পেন্টাগনের প্রতিরক্ষা নীতি বোর্ডে (Pentagon's Defence Policy Board) আসন্ন হামলা লইয়া বিভিন্ন প্রকারের জল্পনা-কল্পনার পর স্থির হয় যে, আফগানিস্তানে বিমান হামলা এবং অতঃপর বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হইবে। অতঃপর উত্তর আফগানিস্তানের তালেবান বিরোধী জোট গঠন করিয়া তাহাদের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র সীমিত স্থলবাহিনী নিয়োগ করিবে। এই জোট তালেবানদের হটাইয়া কাবুল দখল করিবে এবং মার্কিন সমর্থক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে। ইতোমধ্যে মার্কিন সৈন্যরা ওসামা বিন লাদেন এবং মোল্লা ওমরকে তাহাদের অনুসারীসহ পাকড়াও করিবে এবং এইভাবে সন্ত্রাসমুক্ত আফগানিস্তানে তাহারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রেসিডেন্ট বুশ প্রভুর (God) নামে প্রচণ্ড শপথ করিলেন, সন্ত্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সভ্যজগতের এক চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনা করিবেন। এই অভিযান প্রথমে পরিচালনা করা হইবে ইসলামী চরমপন্থী ওসামা বিন লাদেন এবং আফগানিস্তানে পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত তাঁহার আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জঙ্গি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ এবং সৈন্য সামন্ত বিন লাদেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়, এবং মোল্লা ওমরের নেতৃত্বে তালেবান বাহিনীও এই মহা জেহাদের শপথে দণ্ডায়মান হয়। (Newsweek, Sept 24. 2001)।

প্রেসিডেন্ট বুশ সরাসরি সতর্ক করিয়া দেন, তালেবান নেতারা ওসামা বিন লাদেন ও তাঁহার কয়েকজন নেতাকে হস্তান্তরসহ কিছু আপোষহীন শর্ত মানিতে ব্যর্থ হইলে যুক্তরাষ্ট্র তালেবানদের সন্ত্রাসী হিসাবে গণ্য করিবে। তালেবানরা তাহাদের নিজস্ব সতর্কবাণীও উচ্চারণ করে; যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ করিলে তাহারা সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কোপানলে

পড়িবে এবং এই অঞ্চলটি ভীষণ দুর্যোগে নিপতিত হইবে। তালেবান মুখপাত্র মোল্লা মোহ্মাজিন নিউজউইককে টেলিফোনে জানান "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের আক্রমণ করিলে আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দিব।" (Newsweek Oct. 1. 2001)।

পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিন বাহিনী তাহাদের মিত্র ব্রিটিশ বাহিনী লইয়া আফগানিস্তানে এক সর্বাত্মক বিমান আক্রমণ পরিচালনা করে। বোমার আঘাতে বড় বড় পাথরের পাহাড় পুকুরে পরিণত হয়। টনটন বোমা মারিয়া মার্কিন বাহিনী তালেবানদের পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ভয়াবহ বি-৫২ বোমারু বিমান হইতে শুরু করিয়া এ যাবৎ কালের সমস্ত আধুনিক জঙ্গি বিমান তাহারা ব্যবহার করে। এক মাসের প্রচণ্ড বিমান হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র উত্তরের জেনারেল দোস্তামের নেতৃত্বে আফগান স্থলবাহিনী প্রস্তুত করে। বেশ কয়েকদিন ইতস্ততার পর এই বাহিনী তালেবানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সম্মুখ যুদ্ধে কয়েকবার বিপর্যয়ের পর মার্কিন বিমান বাহিনীর সহায়তায় তাহারা তালেবানদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভ করে। তালেবানরা ক্রমশঃ উত্তরের মাজার শরীফ, হিরাত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ শহর এলাকা ত্যাগ করিয়া কাবুলের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এই সমস্ত এলাকায় বিপুল সংখ্যক তালেবান আত্মসমর্পণ করে বা বন্দি হয়।

অতঃপর মার্কিন বাহিনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং উত্তরের তালেবান বিরোধী জোট কাবুল ও কান্দাহারের উপকণ্ঠে অবস্থান গ্রহণ করে। মার্কিন মিত্র বাহিনীর ব্রিটিশ সেনারা কান্দাহারে এক হঠাৎ-আক্রমণ করিলে তালেবান বাহিনী তাহা দৃঢ়তার সাথে প্রতিহত করে। মোল্লা ওমরের নেতৃত্বাধীন তালেবান এবং ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা যোদ্ধা দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ ক্রমশঃ মার্কিন বাহিনীর হাতে ধরা পড়িলে আফগান প্রশাসন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং মোল্লা ওমর অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে কান্দাহার ত্যাগ করেন। অতঃপর তালেবানদের শেষ ঘাটি কাবুল, কান্দাহার মার্কিন বাহিনীর হস্তগত হয়।

মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং তাঁহার অতিথি সৌদী প্রিন্স ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে আত্মগোপন করেন। বিভিন্ন সূত্রমতে তাঁহারা পৃথক হইয়া যান এবং ওসামা বিন লাদেন পূর্ব-আফগানিস্তানের তোরাবোরা পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী তন্নতন্ন করিয়া তল্লাসী চালায়। কুখ্যাত ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপ করিয়া হাজার হাজার আফগানদের প্রাণ সংহার করে। তোরাবোরা পাহাড়ে তাহারা এক প্রকারের বোমা নিক্ষেপ করে যাহা পাথরের পাহাড় ভেদ করিয়া পাহাড়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত গুহায় আঘাত হানে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিন লাদেন ঐ পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইলে তিনি নিশ্চয় নিহত হইয়াছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন গুহায় অনুসন্ধানে জানা যায় তিনি জীবিত আছেন, যদিও পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

কিছুদিন পর খবর পাওয়া যায় ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় আশ্রয় লইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট বুশের অনুরোধে পাকিস্তানের সামরিক শাসক পারভেজ মোশাররফ পশ্চিমের ওয়াজিরিস্তান এলাকায় অভিযান প্রেরণ করেন। বিন লাদেনের সহকারী আল-জাওয়াহিরীর এক ভিডিও টেপের

মাধ্যমে জানা যায় তাঁহারা ওয়াজিরিস্তানেই অবস্থান করিতেছেন। সম্পূর্ণ এলাকা অবরোধ করা সত্ত্বেও আলৌকিকভাবে তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করেন।

অতঃপর ২০০2 সালে আফগানিস্তান হইতে একদা বহিষ্কৃত মার্কিন মিত্র আবদুল হামিদ কারজাইকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়া মার্কিন মিত্র বাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। অপর দিকে পাঁচশতাধিক আফগান বন্দিকে কিউবার উপকূলবর্তী মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন গুয়ানতানামো বে'তে অবস্থিত বিশেষভাবে নির্মিত বন্দি শিবিরে আটক করে। পরে অনুসন্ধানে জানা যায় তালেবান বাহিনীর সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া বেশ কিছু সংখ্যক মার্কিন ও ব্রিটিশ নাগরিকও ঐ বন্দিদের তালিকায় রহিয়াছে। বন্দিশিবিরে মার্কিন বাহিনী বন্দিদের অমানবিক নির্যাতন করে। এক পর্যায়ে নিরূপায় বন্দিরা খাদ্য গ্রহণ হইতে বিরত থাকে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে জানাজানি হইয়া গেলে মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। তাঁহারা বন্দি শিবির পরিদর্শন করেন এবং এইভাবে বিনাবিচারে আটক রাখিবার নিন্দা করেন।

এদিকে ওসামা বিন লাদেনকে ধরিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়া তাঁহাকে ধরিতে ব্যর্থ হয়। তবে বিভিন্ন সূত্র মনে করে তিনি পাকিস্তানে কোথাও পলাইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বস্ত সূত্রমতে তিনি ও তাঁহার শীর্ষ নেতা আইমান আল জাওয়াহিরীকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মিরান শাহ্ নামক স্থানে দেখা গিয়াছে (Newsweek 15 July, 2002.)।

সন্ত্রাস বা তালেবান দমনে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একযোগে কাজ করিতেছে বিধায় পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে জনগণ, বিশেষত তালেবান সমর্থক আলেমগণ পারভেজ মোশাররফের বিরোধীতা করেন। এমনকি কয়েকবার তাঁহার জীবন নাশের চেষ্টাও চালান হয়। তবে সৌদী আরব ও অন্যান্য মার্কিন সমর্থক গোষ্ঠি বিন লাদেন পাকিস্তানে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া মন্তব্য করে। প্রতি উত্তরে পারভেজ মোশাররফ তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করেন বিন লাদেনের অবস্থান জানাইবার জন্য। খোদ মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাও তাঁহার অবস্থান নির্ণয় করিতে ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি সি আই এর একজন মুখপাত্র বলেন, বিন লাদেনের অবস্থান তাহাদের জানা আছে। কিন্তু তাঁহার সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন তথ্য বা প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে আটক করা সম্ভব হইতেছে না। তবে পাকিস্তান আফগান গেরিলা ও আল-কায়েদার বিরুদ্ধে অব্যাহত তৎপরতা চালাইয়া যাইতেছে। (পূর্বকোণ, ২৮শে জুন ২০০৫)।

যতই দিন যাইতেছে আফগানিস্তানে মার্কিন বিরোধী প্রতিরোধ শক্তিশালী হইতেছে। মার্কিন বাহিনী এবং তাবেদার কারজাই সরকারের বিরুদ্ধে হামলা জোরদার হইতেছে। তিন মাস পূর্বে গৃহিত জাতি গঠনের উচ্চাশা এখন হতাশায় নিমজ্জিত। অতর্কিত হামলা, বোমা নিক্ষেপ এবং সর্বশেষ মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হইবার ঘটনায় মার্কিন বাহিনী ও কারজাই সরকার উদ্বিগ্ন। বর্তমানে আফগানিস্তানে মার্কিন ক্ষয়ক্ষতি ইরাককেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। তালেবান মুখপাত্র মোল্লা লতিফ হাকিমা বলেন, বিদেশী সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ না করা পর্যন্ত হামলা অব্যাহত থাকিবে। তাহারা ক্রমশঃ বিদেশী সৈন্যদের ভিত

ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও জানান, তালেবান যোদ্ধারা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মোল্লা ওমর তাহাদের নেতৃত্বে রহিয়াছেন। গত তিনমাসে দুইটি মার্কিন কপ্টার ভূপাতিত হইয়াছে। ৪৭ জন আফগান পুলিশ, ১৩৪ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ৪৫ জন মার্কিন সৈন্য নিহত হইয়াছে। যোদ্ধাদের রণকৌশলে মার্কিন বাহিনী অবাক! তাহাদের দক্ষতা ইরাকীদের চাইতেও সুনিপুণ (নয়া দিগন্ত ৬ জুন, ২০০৫।)

এদিকে পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবান যোদ্ধাদের সাথে সংঘর্ষে ১১ জন পাক সৈন্য ও ৩০ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত হইয়াছে। এই হিসাবের বাহিরে ২০ জন পাক সৈন্য নিখোঁজের খবর পাওয়া গিয়াছে। অপরদিকে বৃটেন আফগানিস্তানে আরও কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য পাঠাইতেছে। ইতোমধ্যে সেইখানে ৯০০ সৈন্য মোতায়েন রহিয়াছে। (প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০০৫)।

গুয়ানতানামো বে বন্দিশিবির ঃ

কিউবার সাথে সংযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন গুয়ানতানামো বে'তে অবস্থিত বন্দিশিবির বিশেষ কায়দায় নির্মিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার সহায়ক মিত্রবাহিনীর হাতে ধৃত ইরাক ও আফগানিস্তানের স্বাধীনতাকামী গেরিলাদের এখানে বন্দি করিয়া রাখা হয়। ২০০১ সাল হইতে আজ পর্যন্ত পাঁচশতেরও অধিক লোক এইস্থানে বিনা বিচারে আটক রহিয়াছে। হাতে পায়ে লোহার ডান্ডা বেড়ি পরাইয়া তাহাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে আনা নেওয়া করা হয়। ভয়াবহ অত্যাচারের শিকার এইসব বন্দি প্রতিনিয়ত মৃত্যু কামনা করে। সম্প্রতি তাহাদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়ে। সভ্য জগতের মানুষ এইসব লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা জানিতে পারিয়া বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে। বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে। যুক্তরাষ্ট্রের সুশীল সমাজ প্রতিবাদে সোচ্চার হন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন গুয়ানতানামো বে'র মার্কিন বন্দিশিবির বন্ধ অথবা সংশোধন করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ের কোন ব্যক্তি মার্কিন বন্দি শিবিরটি লইয়া কড়া সমালোচনা করিলেন। এক সাক্ষাৎকারে ক্লিনটন বলেন, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কতটা যুক্তিযুক্ত; কিংবা মার্কিন সমাজের মৌলিক চরিত্রকে ইহা চ্যালেঞ্জ করে কিনা? যদি ইহার উত্তর হ্যাঁ হয় তাহা হইলে সন্ত্রাসীদের হাতেই বিজয় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুয়ানতানামো বে'র মার্কিন বন্দি শিবিরটির ভবিষ্যৎ লইয়া ওয়াশিংটনে যে বিতর্ক-আলোচনা হইয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট একথা বলেন। গত সপ্তাহে বিষয়টি লইয়া মার্কিন সিনেটেও ব্যাপক আলোচনা হয়। (প্রথম আলো, ২১ জুন ২০০৫)।

এদিকে এই বন্দি শিবিরে ৩ জন বন্দি আত্মহত্যা করে। ইহাকে লইয়া সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড়ের মুখে প্রেসিডেন্ট বুশ গত ২৩শে জুন ০৬ এক বিবৃতিতে বলেন, তিনি এ বন্দি শিবিরটি বন্ধ করিয়া বহু বন্দিকে তাহাদের নিজ নিজ দেশে ফেরৎ পাঠাইতে চান। (আমার দেশ ২৩ জুন ২০০৬)।

আফগানিস্তানে প্রতিরোধ যুদ্ধ দিনদিন ব্যাপকতা লাভ করিতেছে। হেলমান্দ প্রদেশের গভর্ণরের মুখপাত্র হাজি মোহাম্মদ ওয়ালী জানান, ওয়াশার জেলায় তালেবান যোদ্ধারা একটি সরকারী কার্যালয়ে হামলা চালাইলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সংঘর্ষে জেলা গভর্ণর মোল্লা সাকি ও একজন আফগান সৈন্যও প্রাণ হারায়। তালেবানদের পক্ষে ১১ জন নিহত হয়। মধ্যরাতে জাবুল প্রদেশে কাবুল, কান্দাহার মহাসড়কে এক সংঘর্ষে ৭ জন যোদ্ধা নিহত হয়। অপরপক্ষে অপহৃত আফগান পুলিশ প্রধান ও তাহার পাঁচ সহযোগীকে তালেবান যোদ্ধারা হত্যা করে। আফগানিস্তানের দক্ষিণে এবং পূর্বে সম্প্রতি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অসংখ্য সন্দেহভাজন যোদ্ধা ও সরকারী বাহিনী সদস্য নিহত হইয়াছে। (প্রথম আলো-২১ জুন ০৫)। বর্তমানে আফগানিস্তানে ১৮ হাজার মার্কিন সৈন্য রহিয়াছে।

আফগানিস্তানে তালেবানরা আবার সংঘবদ্ধ হইয়া মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আঘাত হানিতেছে। অন্যদিকে ইহাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণে নামিয়াছে মার্কিন বাহিনী ও ন্যাটো (NATO) বাহিনী। কোয়ালিশন বা মিত্র বাহিনী টনের পর টন বোমা মারিয়াছে। তালেবান সরকারকে উৎখাত করিতে যাইয়া তাহারা হাজার হাজার নিরীহ আফগানদের হত্যা করিয়াছে। কিন্তু তাহার পরও দেখা যাইতেছে বড় বড় শহরগুলি ছাড়া প্রায় সমগ্র গ্রামাঞ্চল তালেবানদের দখলেই রহিয়া গিয়াছে। বর্তমানে যেই হারে তালেবানরা সংঘটিত হইতেছে এবং খোদ-কাবুল—কান্দাহার মহাসড়কে সরকারী বাহিনীর উপর হামলা করিতেছে, তাহাতে প্রতিয়মান হয় হামিদ কারজাই সরকার খুব বেশিদিন আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না। মার্কিন বাহিনীকে আফগানিস্তান ছাড়িতে হইবে। তবে উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সেনা দলকে আফগানিস্তানে যে ভাগ্য বরণ করিতে হইয়াছিল তাহাই মার্কিন বাহিনীর ভাগ্যে রহিয়াছে কিনা তাহা দেখিবার বিষয়।

এনএনবি জানায়, গত বৃহস্পতিবার (১লা ফেব্রুয়ারী ০৭) তালেবান দখলকৃত শহরের উপর এখনও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিয়াছে তালেবান যোদ্ধারা। ন্যাটো বাহিনীর ব্যাপক অভিযান সত্ত্বেও গত বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের হেলমান্দ প্রদেশের মুসকালা জেলাশহর তাহারা দখল করিয়া লয়। ঐ শহরে উড়ান হয় তালিবানী সাদা পতাকা। অপর দিকে আফগান ও ন্যাটো সেনারা মুসকালা পূনরুদ্ধারে সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করিয়াছে। অতি শীঘ্র ভয়াবহ এক সংঘর্ষের আশংকায় অধিবাসীরা শহর ছাড়িয়া অন্যদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। হেলমান্দ প্রদেশের উপজাতীয় প্রধান বলেন, বৃহস্পতিবার তালেবানরা শহরের সরকারী ভবনে তাহাদের নিজস্ব পতাকা উড়াইয়াছে। (দৈনিক পূর্বকোণ ৬ই ফেব্রুয়ারি ০৭)। প্রত্যক্ষদর্শিদের প্রতিবেদন অনুযায়ী কাবুল শহর ও ইহার আশেপাশের কিছু এলাকা এবং কান্দাহারে ন্যাটো বাহিনীর নড়বড়ে অবস্থান ছাড়া অবশিষ্ট আফগানিস্তানে এবং উত্তরের প্রদেশগুলিতে ন্যাটো বা মার্কিন সৈন্যদের কোন অবস্থান নাই। গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, সংঘর্ষ চলিতেছে শুধু উপরোল্লিখিত এলাকাগুলিতে। অন্যত্র ন্যাটো বাহিনী শুধু বোমা হামলাই চালাইতেছে।

এদিকে মিউনিখ ও কান্দাহার হইতে এ.এফ.পি জানায়, ন্যাটোর শীর্ষ কমান্ডার বলেন, আফগানিস্তানের সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এবং পূণর্গঠন কাজ যথাযথভাবে করিবার জন্য যে

পরিমান বিদেশী সৈন্য প্রয়োজন তাহা সেখানে নাই। ন্যাটো কমাণ্ডার মার্কিন সেনা বাহিনীর জেনারেল বান্তজ-ক্রাডক বলেন, সেভিলেতে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বৈঠকে আফগানিস্তানে ন্যাটো জোটের আরও সেনা থাকিবার প্রয়োজনীয়তার বিয়ষটি বেশ গুরুত্ব পায়। তিনি বলেন, পর্যাপ্ত সেনা ছাড়াই কমাণ্ডাররা তাঁহাদের কাজ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অনবরত এক স্থান হইতে আরেক স্থানে গিয়া কাজ করিতে হইতেছে। উল্লেখ্য, ক্রাডক সম্প্রতি আফগানিস্তানে ন্যাটো নেতৃত্বাধীন আরও ৩৫০০০ সেনা পাঠাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

এদিকে আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের পুলিশ প্রধান জেনারেল আসমত উল্লাহ্ আলিজি জানান, শুক্রবার রাতে বিদ্রোহী অধ্যুষিত পাঞ্জাবী (পাকিস্তানের পাঞ্জাব নহে) জেলায় টহল দিবার সময় তালেবান যোদ্ধারা হামলা করে। এই সময় উভয়পক্ষের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায়। তালেবান মুখপাত্র ইউসূফ আহমদ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করিয়া বলেন হামলায় প্রায় ১০ পুলিশ হতাহত হয়। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার পর পুলিশ নিয়মিতভাবে তালেবানদের আক্রমণের শিকার হইতেছে। আফগানিস্তানের জন্য আরও ৩৫,০০০ ন্যাটো সৈন্য তলব এবং কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জাবী জেলায় তালেবানদের হামলায় পুলিশ হতাহতের ঘটনা প্রমাণ করে আফগানিস্তানে দখলদার বাহিনী তাহাদের অবস্থান বজায় রাখিতে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন, যে জন্য তাহারা আরও সৈন্য তলব করিয়াছে।

এদিকে আফগান-পাকিস্তান সীমান্তে তালেবান ও আল-কায়েদা যোদ্ধাদের লইয়া উভয় দেশ সমস্যায় নিপতিত। সীমান্তের ওয়াজিরিস্তান এলাকায় বসবাসকারী পাঠানদের মাঝখান দিয়া সীমান্ত রেখা গিয়াছে। ফলে এক পারের পাঠানরা কোন দেশ—আফগানিস্তান বা পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত হইলে উভয় পারের পাঠানরা বিবাদে জড়ইয়া পড়ে। পাঠানদের তীব্র জেহাদী মনোভাব এবং সেইসঙ্গে দুর্গম ও দুর্ভেদ্য পাথুরে পাহাড় দ্বারা গঠিত এলাকাটি অনেকটা দুরতিক্রম্য। ওয়াজিরিস্তানের সর্দারদের সহযোগিতা ছাড়া কোন লোককে সেই এলাকা হইতে বাহির করা একরূপ অসম্ভব। তাই আল-কায়েদার শীর্ষ কয়েকজন নেতা এখানে লুক্কায়িত রহিয়াছেন বলিয়া ন্যাটো বাহিনীর ধারণা। কিন্তু তাহারা এই ব্যাপারে নিরুপায়। অগত্যা পাকিস্তান সহযোগিতা করিতেছে না বলিয়া তাহারা পাকিস্তানের উপর দোষ চাপায়। কিন্তু পাকিস্তানও এ ব্যাপারে নিরুপায়। তাহার উপর মার্কিন হামলা অত্যাসন্ন দেখিয়া পাকিস্তান ওয়াজিরিস্তানের উপর বোমা হামলা করিয়া প্রায় ২০০ লোক হত্যা করিলেও নেতাদের ধরিতে ব্যর্থ হয়।

তালেবানদের সঙ্গে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর সংঘর্ষ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। তালেবানরা প্রায়ই কাবুল-কান্দাহার মহা সড়কে ন্যাটো বাহিনী বা আফগান পুলিশের উপর হামলা করিয়াই যাইতেছে। পশ্চিমা তথ্য বিবরণী অনুযায়ী এইসব হামলায় বহু জঙ্গি নিহত হইলেও হামলার সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহাতে প্রতীয়মান হয় জঙ্গি নিহতের এই সংখ্যা কিছুটা বাড়াবাড়িই বটে। তাহা ছাড়াও এইসব মৃতের সংখ্যা কোন নিরপেক্ষ সংস্থা নিশ্চিতও করে নাই।

ইরাক ঃ

ইরাক কর্তৃক ১৯৯১ সালে কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিরতির শর্ত হিসাবে নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইরাক আন্তর্জাতিক তদারকিতে তাহার সমস্ত পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জৈব অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করে এবং ব্যালিষ্টিক ক্ষেপনাস্ত্রসমূহ খুলিয়া ফেলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বরাবর বলিতে থাকে যে ইরাকের নিকট প্রচুর গণবিধ্বংসী অস্ত্র (Weapons of mass destruction) মজুদ রহিয়াছে। এদিকে (২০০০ সালে) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী আলগোরকে পরাজিত করিয়া জর্জ ডব্লিউ বুশ (জুনিয়র) প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁহার নির্বাচিত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বৈরী শাসকদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেন। ইহারই এক পর্যায়ে ২০০১ সালের ৯ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীর বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রে (World Trade Centre) বিমান হামলায় যুগলভবন ভষ্মীভূত হয় (আফগানিস্তান দ্রষ্টব্য)। প্রেসিডেন্ট বুশ এই কাজের জন্য আফগানিস্তানে অবস্থানরত আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করেন। তিনি এই নেতার হস্তান্তর দাবী করেন। কিন্তু আফগানিস্তান শাসনকারী তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর অস্বীকার করিলে প্রেসিডেন্ট বুশ বিশ্বের সম্মিলিত বাহিনী দ্বারা আফগানিস্তান দখল করেন, যদিও তিনি ওসামা বিন লাদেন ও মোল্লা ওমরকে ধরিতে ব্যর্থ হন।

বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে বোমা হামলার পর হইতে প্রেসিডেন্ট বুশের প্রতিশোধের সম্ভাব্য তালিকায় এক নম্বরে ছিল আফগানিস্তান এবং দুই নম্বরেই ছিল ইরাক। আফগানিস্তান দখল করিবার পর বুশ ইরাক আক্রমণের দিকে নজর দেন। কিন্তু কোন কূটনৈতিক ব্যবস্থা বা অস্ত্র পরিদর্শন ছাড়া সরাসরি ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে রিপাবলিকান দলের অনেক নেতাই জর্জ বুশকে নিষেধ করেন (Newsweek, Sept. 3. 2002)।

কিন্তু বুশ তাঁহার নিজস্ব ঢালাও মতবাদ ঘোষণা করেন। এবং তাহা হইল যেই সমস্ত দেশ গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মালিক তাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব সতর্কতামূলক যুদ্ধ (Pre-emptive War) পরিচালনা করা, অর্থাৎ আক্রান্ত হইবার আশংকায় পূর্বেই আক্রমণ করা। ইহাকে তিনি ১৯৪৭ সালের ট্রুম্যান মতবাদের (Truman Doctrines) সহিত তুলনা করেন। তবে জর্জ বুশের এই নীতি প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মতবাদের ন্যায়ই বিতর্কিত (Newsweek, Sept 9,2002)। কিন্তু ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দল সতর্ক করে, নূতন কোন কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং অস্ত্র পরিদর্শন ছাড়া ইরাক আক্রমণ বোকামী হইবে। অতঃপর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড এবং প্রধান সেনাপতি এ্যন্ডি কার্ড (Andy Card) এর পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন।

ইরাক আক্রমণের প্রাক্কালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ইরাক ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনামূলক অস্ত্রসম্ভার নিম্নরূপ ঃ

বাহিনী	ইরাক	যুক্তরাষ্ট্র
সেনাবাহিনী	৪,২৪,০০০	৪,৮৫,৫৩৬
রিজার্ভ	৬৫০,০০০	৮৬৫,২০০
মেরিন কোর		১৭৩,৩৮৫
নৌবাহিনী	২,০০০	৩৮৪,৫৭৬
বিমান বাহিনী	৩০,০০০	৩৬৯,৭২১
বিমান বিধ্বংসী কামান	১৭,০০০	
আধা সামরিক	৪৪,০০০	
উপকূল রক্ষী (Coast Guard)		৩৭,১৬৬

উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের চাইতে ইরাকের বর্তমান সামরিক শক্তি এক তৃতীয়াংশ এবং অনেক সৈন্য ছিল অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত।

ইরাকী অস্ত্রশাস্ত্র ঃ

প্রধান যুদ্ধট্যাংক	২২০০
অন্যান্য আর্মার্ড যানবাহন	৩৭০০
প্রধান গোলন্দাজ অস্ত্র	২৪০০
জঙ্গি বিমান	৩০০

উল্লেখ্য ইরাকের অধিকাংশ অস্ত্রশস্ত্র প্রথম উপসাগরীয় (১৯৯১) যুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আবার অনেক যুদ্ধাস্ত্র প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের অভাবে বিকল হইয়া পড়ে। যাহাও অবশিষ্ট ছিল তাহাও যুদ্ধ বিরতির শর্ত হিসাবে জাতিসংঘের তদারকিতে ধ্বংস করা হয়। অতএব, বাহ্যত অনেক অনেক শক্তিশালী মনে হইলেও অস্ত্র পরিদর্শক দল তাহার প্রধান বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করিয়া দেয় (Newsweek, Sept, 13-2002)। তাই বারবার পরিদর্শন সত্ত্বেও জাতিসংঘ পরিদর্শক দল ইরাকে ব্যাপক গণবিধ্বংশী কোন অস্ত্রের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইলে ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া, চীন আরও অনুসন্ধান ছাড়া ইরাক আক্রমণের বিরোধীতা করে। নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হইয়া প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের সম্মতিতে ইরাক আক্রমণের সিদ্ধান্ত লন।

২২শে মার্চ ২০০৩ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সম্মিলিত কোয়ালিশন বাহিনী অপারেশন ইরাকী ফ্রিডম (Operation Iraqi Freedom) নামের অভিযানে ইরাক আক্রমণ করে। পারস্য উপসাগরে অবস্থিত মার্কিন বিমানবাহী রণতরী হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে জঙ্গী বিমান ইরাকের উপর টন টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী বসরা এলাকায় এবং মার্কিন বাহিনী মুলভূমিতে ইরাকী সাদ্দাম বিমান ঘাটির দিকে অগ্রসর হয়।

আক্রমণের দুই সপ্তাহ পর দুইটি শক্তিশালী মার্কিন এব্রাম এম-১ ট্যাংক ইরাকী গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। ইউফ্রেটিশ নদীর পশ্চিম তীরে বিধ্বস্ত দুইটি ট্যাংক খুব বেশী নহে, কারণ কোয়ালিশন বাহিনীর নিকট অনুরূপ প্রায় ৬৫০টি ট্যাংক রহিয়াছে এবং

আরও ট্যাংক পথে রহিয়াছে। কিন্তু মার্কিনীদের যাহা ভাবিয়া তোলে তাহা হইল যে পদ্ধতিতে ঐগুলি ধ্বংস হইয়াছে তাহাতে ইরাকী গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধ কৌশলের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। উল্লেখ্য মার্কিন বাহিনী হালকা বাধার মুখে বাগদাদের অতি সন্নিকটে পৌছিলে ইরাকীরা গেরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করে। আরও দুশ্চিন্তার কারণ হইল, রাশিয়ার নির্মিত ট্যাংক বিধ্বংসী এই কামান ইরাকীরা কোথায় পাইল? ইরাকীরা অতি গোপনে এইসব হাল্কা, শক্তিশালী এবং সহজে ক্ষেপণযোগ্য এক হাজার ট্যাংক বিধ্বংসী কামান ক্রয় করে। পেন্টাগনের সূত্রমতে, ইউক্রেনের অস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে এইসব সংগ্রহ করা হয় (জানুয়ারীতে তাহারা এইসব ৫০০ করনেট ট্যাংক বিধ্বংসী কামান সরবরাহ করে)। পেন্টাগনের ধারণা সিরিয়াও এইসব সরবরাহ করিতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ড সিরিয়ার এসব যুদ্ধ সামগ্রী ইরাককে সরবরাহের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চরণ করেন। (Newsweek, April, 7, 2003)।

ইরাক আক্রমণের দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে "ইরাকী মুক্তি কার্যক্রম" (Operation Iraqi Freedom) মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের গতি কোন দিকে মোড় ফিরাইতেছে? নিত্য নূতন জঙ্গি বিমান প্রয়োগের দ্বারা যুদ্ধের পরিধি বৃদ্ধি করা হইতেছে। অতি সতর্ক বুশ প্রশাসনের কর্মকর্তাগণের আশংকা, অগ্নিশর্মা আরব সড়কসমূহ কি মার্কিনপন্থী সরকারগুলির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধরা যাক, জর্ডানের আম্মানে বাগদাদ পতনের পূর্বেই সরকার পরিবর্তনের দিকে যাইতেছে? ইরাকে বাথ পার্টির পতনের পর যুদ্ধ আরও রক্তাক্ত হইবে বলিয়া সিনিয়র মার্কিন কর্মকর্তাগণ মন্তব্য করেন।

যতই দিন যাইতে থাকে ইঙ্গ-মার্কিন বিমান আক্রমণ এবং ইরাকী গেরিলাদের নিত্য নূতন যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টির ফলে ইরাকে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইরাকে মার্কিন স্থল বাহিনীর কমান্ডার লেঃ জেনারেল উইলিয়াম ওয়ালেস্ (Lt. General William Wallace) বলেন, "যে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিতেছি সে আমাদের মহড়া যুদ্ধের চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।" তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শত্রুর ভয়ংকর বাধা এবং বিশাল সরবরাহ লাইনের দরুন যুদ্ধের স্থায়ীত্ব পূর্ব অনুমানের চাইতে অনেক দীর্ঘ হইবে। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তাঁহার মন্ত্রী রামসফেল্ড, ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী ধারণা করিয়াছিলেন, মার্কিন সৈন্যরা (তৎসহ ৪৫,০০০ বৃটিশ সৈন্য) অতি দ্রুত শক্তিশালী গোলার সাহায্যে সবকিছু দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া অগ্রসর হইবে এবং সাদ্দাম ও তাঁহার পুত্রদের অচিরেই আটক করিবে। অতি শীঘ্র তাহারা বাগদাদ দখল করিয়া প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করিবে। সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ শীয়া সম্প্রদায় যাহারা সাদ্দামকে ঘৃণা করে, মার্কিন সৈন্যদের ফুলের মাল্য প্রদান করিবে বা সাদ্দাম ও বাথ পাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে যখন ইরাকী গেরিলাদের পিছন হইতে হঠাৎ আক্রমণে মার্কিন সৈন্যদের দলে দলে মৃত্যুবরণের খবর আসিতে থাকে তখন মার্কিন কর্মকর্তাদের হুঁশ হয়। তাহারা এখন দোষস্খালনের পথ খুঁজিতে থাকে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ এখন সাবধান বাণী উচ্চারণ করে, ইরাকী গেরিলারা পিছন দিক হইতে গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করিয়া মার্কিন বাহিনীর সরবরাহ লাইন তছনছ করিয়া

দিতে পারে। এদিকে 'ফেদাইয়ানে সাদ্দাম' নামক অপর একটি গেরিলা বাহিনী মার্কিন সৈন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফেদাইয়ানরা একে-৪৭ রাইফেলের ন্যায় হালকা অস্ত্র ব্যবহার করিলেও তাহাদের কার্যাবলী ছিল নৃশংস। সাদ্দামের জ্যেষ্ঠপুত্র উদ-এর পরিচালনায় গঠিত ফেদাইয়ান বাহিনী এ. কে.-৪৭, রাইফেল, মর্টার এবং আর.পি.জি অস্ত্র সজ্জিত। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০ হইতে ৪০ হাজার। উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুসাইয়ের হাতে ছিল স্পেশাল সিকিউরিটি অফিস নিয়ন্ত্রিত স্পেশাল রিপাবলিকান গার্ড। তাহারা মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে।

প্রবল বাধার মুখে মার্কিন কোয়ালিশন বাহিনী সাদ্দাম বিমান বন্দরের দিকে অগ্রসর হয়। ২রা মার্চ ০৩, স্থল বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। বোমার আঘাতে বাগদাদ জ্বলিতে থাকে। ২৩শে মার্চ ০৩ মার্কিন বাহিনী নাসিরিয়া নামক স্থানে বাধাগ্রস্ত হয়। ইরাকীরা একটি মার্কিন অগ্রসরমান গাড়ী বহরে অতর্কিত হামলা চালায় এবং তাহাতে প্রায় ১৫ জন সৈন্য হত বা নিখোঁজ হয়। পরদিন মরুঝড়ে অভিযান বাধাগ্রস্ত হয়। একটি এ্যাপাচী হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয় এবং দুইজন মার্কিন সৈন্য ইরাকী গেরিলাদের হাতে ধৃত হয়। ২৬শে মার্চ ১০০০ মার্কিন প্যারাসুট সৈন্য উত্তরের কুর্দি এলাকায় অবতরণ করে এবং তথায় অবস্থানরত কয়েকশত স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে মিলিত হয়। ৭ই এপ্রিল বোমার আঘাতে কারবালার প্রতিরক্ষা ভেদ করিয়া মার্কিন বাহিনী বাগদাদ এবং সাদ্দাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দখন করিতে অগ্রসর হয়। ১৯ এপ্রিল, ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক বসরা দখলের দুই দিন পর বাগদাদের পতন হয়। ঐ মার্কিন সৈন্যরা বাগদাদের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত সাদ্দামের পিতলমূর্তি ধ্বংস করে এবং উহার মুখে মার্কিন পতাকা উড়ায়। ১১ই এপ্রিল উত্তরে কিরকুক দখলের একদিন পর মার্কিন সৈন্য ও কুর্দি যোদ্ধারা মসূল দখল করে। কুর্দিরা উত্তরের তেলক্ষেত্রগুলি দখলে আনিতে মার্কিনীদের সাহায্য করে। (Newsweek April, 21, 2003)।

বাগদাদ শহরে প্রবেশ করিয়া মার্কিন সৈন্যরা নিরাপত্তাহীনভাবে শহরটি ছাড়িয়া দেয়। ফলে শহরে ব্যাপক লুটপাট আরম্ভ হয়। দোকান পাট হইতে মূল্যবান সামগ্রী ছাড়াও মিউজিয়াম হইতে অতি মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুট হয়। দখলদার সৈন্যরা শুধু তাকাইয়াই থাকে। কাহারও কাহারও মতে মার্কিন সৈন্যরা লুণ্ঠনকারীদের লেলাইয়া দেয়। ফলে হাজার হাজার বছরের মেসোপটেমিয়ান প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন লুট হইয়া যায়। এইসব মূল্যবান নিদর্শন উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা যেমন দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সভ্যতার নিদর্শনসমূহ লুট করিয়া লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তেমনি এখন বাগদাদ হইতে চুরি হওয়া বা লুট হওয়া প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মিউজিয়ামের শোভা বর্দ্ধন করিবে। অতঃপর সমগ্র বিশ্বের ধিক্কারের মুখে মার্কিন বাহিনী লুটপাট বন্ধের নিমিত্তে শহরে কারফিউ জারি করে। (Newsweek, Do)

এদিকে সাদ্দাম হোসেন গোপনে বাগদাদ ত্যাগ করেন। ইরাকী সৈন্যরা অস্ত্র ত্যাগ করে এবং সামরিক উর্দি ত্যাগ করিয়া বেসামরিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন জায়গায় তাহাদের ফেলিয়া যাওয়া সামরিক বস্ত্র, অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সাদ্দামের ভাগ্য লইয়া

মার্কিন বাহিনী বিপাকে পড়ে। যুদ্ধের পূর্বে অনেক তর্জনগর্জন শুনা গেলেও বাস্তবে কিছুই দেখা গেল না। সাদ্দাম ইচ্ছা করিলে অগ্রসরমান মার্কিন বাহিনীকে ঠেকাইতে অসংখ্য পুল ধ্বংস করিতে পারিতেন। তিনি নদীতে নির্মিত বাঁধসমূহ ধ্বংস করিয়া বন্যার সৃষ্টি করিতে পারিতেন। তিনি বাগদাদ দখলের দিবসে সৃষ্ট যানজটের সুযোগে আটকাইয়া পড়া মার্কিন গাড়ী বহরে আক্রমণ করিতে পারিতেন। তিনি দক্ষিণ ইরাকের তৈলক্ষেত্রগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িতে পারিতেন; কিন্তু তিনি কিছুই করেন নাই। কিন্তু কেন? দুই সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধে নিয়োজিত মেরিন জেনারেল এবং জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের যুগ্ম চীফ অব স্টাফ পিটার পেস (Peter Pace) একটি ব্যাখ্যা প্রদান করেন (Newsweek April, 21. 03) : "হয়ত তিনি মৃত অথবা তিনি (সাদ্দাম) জীবিত এবং বিশ্বের নিকৃষ্টতম সেনাপতি।" হঠাৎ একদিন তিনি (সাদ্দাম) বাগদাদের রাস্তায় জনগণ কর্তৃক বেষ্টিত ও হাস্যোজ্জ্বলভাবে দেখা দিলেন টিভির পর্দায়। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা ঐ এলাকায় ব্যাপক তল্লাসি চালায়; উহাদের মধ্যে একজন সাদ্দামের অবস্থান নির্দিষ্ট করেন; মুহূর্তে বোমার আঘাতে ঐ ভবন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করা হয়। অতঃপর দখলদার বাহিনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে সাদ্দাম ঐ ধ্বংসস্তুপে নিহত হইয়াছেন। কিন্তু যতই দিন গড়াইতে থাকে ততই ইরাকী গেরিলাদের প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিভিন্ন স্থানে শত শত মার্কিন সৈন্যদের মৃত্যুর খবরে প্রমাণিত হয় তাহারা এক কঠিন বিবরে অবস্থানরত।

এদিকে মার্কিন ৩য় পদাতিক ডিভিশন কর্তৃক সাদ্দাম বিমান বন্দর ও বাগদাদ নগরীর পতনের পর কোয়ালিশন বাহিনী সমগ্র ইরাকে ছড়াইয়া পড়ে। একে একে ফালুজা, তিকরিত, কিরকুক, কারবালা, নাজাফ, মসুল মার্কিন বাহিনীর করতলগত হয়। তবে এই সমস্ত এলাকা সহজে হস্তগত হয় তাহা ভাবিবার কোন কারণ নাই, কারণ মার্কিন বাহিনী এখানে প্রবল বাধার সম্মুখিন হয় এবং অনেক মার্কিন সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে এসব এলাকা হস্তগত হয়। অতঃপর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তাহার সহযোগীদের ধরিবার জন্য কোয়ালিশন বাহিনী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। কারণ ইরাকী যোদ্ধারা দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিরোধের সৃষ্টি করে তাহাতে শতশত মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। হাজার হাজার সৈন্য আহত ও পঙ্গুত্ব বরণ করে। তাই প্রতিরোধ যুদ্ধের স্নায়ুকেন্দ্র সাদ্দাম ও তাহার সহকর্মিদের ধরিবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠে। একে একে তারিক আজিজ, তাহা রামাদান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ধরা পড়িতে থাকেন। কিন্তু সাদ্দাম হোসেনকে ধরা যেন নাগালের বাহিরে।

২২শে জুলাই ২০০৩ সাদ্দাম হোসেনের পুত্রদ্বয় উদ হোসেন এবং কুসাই হোসেন মসুলে মার্কিন সৈন্যদের সহিত গোলাগুলিতে নিহত হন। সেই সঙ্গে কুসাইয়ের শিশু পুত্র মোস্তফাও নিজের এ. কে. ৪৭ রাইফেলের গুলিবর্ষণ করিতে করিতে মৃত্যুবরণ করে। মার্কিন সৈন্য কর্তৃক সনাক্তকৃত সাদ্দাম পুত্রদ্বয়কে তাহারা তালিকাভুক্ত করে "উচ্চমূল্যের লক্ষ্য" (High Value Target No 2 and No 3) হিসাবে। তাহারা আশা করে ইহার দ্বারা ইরাকীরা বুঝিতে পারিবে যে পুরাতন শাসনামল শেষ এবং সাদ্দাম হোসেনের

ফিরিয়া আসিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহার দ্বারা দৈনিক একজন মার্কিন সৈন্য নিহত হইবার ঘটনা কি শেষ হইবে? একজন কুর্দি গোয়েন্দা বলেন, উদ এবং কুশাইয়ের হাতেই ছিল প্রকৃত ক্ষমতা। আরেক তথ্য মতে এখনও ৩৫,০০০ যোদ্ধা সম্বলিত একটি বাহিনী সাদ্দামের পক্ষে প্রাণপণ লড়াই করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সাদ্দাম পুত্রদ্বয় নিহত হইয়াছেন এই খবর ইরাকীদের বিশ্বাস করাইতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করিয়া মার্কিন সৈন্যরা তাহাদের লাশকে মোম দিয়া পূনর্গঠিত করতঃ টেলিভিশনে বার বার দেখাইতে থাকে।

কিন্তু উদ ও কুশাইকে অত সহজে ধরা সম্ভব হয় নাই। উত্তর মসুলের যে বাড়ীতে তাঁহারা লুক্কায়িত ছিলেন তথায় প্রবেশে দখলদার বাহিনী দুইবার বাধাগ্রস্ত হয়। ভিতর হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে মার্কিন সৈন্যরা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ১০১ উড়ন্ত ডিভিশন (101 Airborne Division) পুরা মোতায়েন করিয়া ভবনটি ঘিরিয়া রাখা হয়। উপর হইতে হেলিকপ্টার গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৩য় বার ১০টি TOW ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বারা ভবন ধ্বংস করিয়া তাহারা ৩টি লাশ মার্কিন গোলার আঘাতে ঝাঁঝরা অবস্থায় দেখিতে পায়। ঐ গুলিই উদ, কুশাই, মোস্তফা এবং একজন দেহরক্ষির লাশ। পরে জানা গেল তাহারা এই বাড়ীতে ২৪ দিন ধরিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। বাড়ীর মালিক, নাওয়াফ আল-জায়েদান মার্কিন ঘোষিত প্রতি পুত্রের জন্য ১৫ মিলিয়ন ডলার পুরষ্কারের লোভে তাহাদের সন্ধান দেয়।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর উত্তরে কুর্দিগণ এবং দক্ষিনের শিয়া সম্প্রদায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়। শীয়ারা নিজেদেরকে অতঃপর ইরাকের ন্যায়ানুগ উত্তরাধিকারী বিবেচনা করে। ইরাকী মুসলমানদের ৬০ ভাগ শীয়া বিধায় তাহারা আইনানুগতার প্রশ্ন উত্থাপন করে। অতঃপর তাহারা মার্কিন বাহিনীর ইরাক ত্যাগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যে সমস্ত দল বা গ্রুপ ইরাকের ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজেদের বিবেচনা করে তাহাদের তালিকা নিম্নরূপ :

গ্রুপ	নেতা	উদ্দেশ্য
১. সাংবিধানিক রাজতন্ত্র আন্দোলন (Constitutional Monarchy Movement)	শরীফ আলী বিন হোসাইন, হাশেমীয় রাজাদের উত্তরাধিকারী যাহারা ১৯৫৮ পর্যন্ত শাসনকাজ চালায়।	গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
২. ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টি	আজিজ মোহাম্মদ : ১ম সেক্রেটারী পদাধিকারী	কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা।

গ্রুপ	নেতা	উদ্দেশ্য
৩. ইরাকী ন্যাশনাল কংগ্রেস	আহমদ সালাবী : ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত ইরাকে অবস্থানকারী, পেন্টাগন সমর্থিত।	ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
৪. ইরাকী ন্যাশনাল একর্ড (Iraqi National Accord)	আইয়াফ আলাভী, সাবেক দলত্যাগী বাথ পার্টি নেতা	ঐ
৫. কুর্দিস্তান গণতন্ত্রী দল (Kurdistan Democratic Party)	মাসউদ বার্জানী, উত্তর-পশ্চিম কুর্দি অঞ্চল প্রধান।	কুর্দিদের স্বায়ত্বশাসনসহ একটি ফেডারেশন ধরনের ব্যবস্থা।
৬. প্যাট্রিওটিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্তান (Patriotic Union of Kurdistan)	জালাল তালাবানী ঃ কুর্দি অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব এলাকায় অবস্থিত।	ঐ
৭. নাজাফ হাওজা (Najaf Howza)	মোকতাদা আল-সদর, ইরাকে একজন প্রভাবশালী শীয়া নেতা হিসাবে আবির্ভূত।	একটি ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা।
৮. ইরাকে ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ কাউন্সিল (Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq)	মোহাম্মদ বাকির আল-হাকিম, ১৯৮০ সালে ইরানে পলায়ন। একটি শিয়া গ্রুপ	ঐ

Newsweek, May, 5-2003.

ইরাকে সাদ্দাম সরকারের পতনের ফল ভোগ করিবার জন্য যে সব ব্যক্তিত্ব আগাইয়া আসেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম উদয় হন আহমদ সালাবী। তাঁহার দল ইরাকী ন্যাশনাল কংগ্রেস। অতীতে মাত্র ১৩ বৎসরকাল ইরাকে অবস্থানের পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। ইরাকী হান্টিং ক্লাবে (Iraqi Hunting Club) তিনি তাঁহার অফিস স্থাপন করেন। বর্তমানে বিপর্যস্থ এই ক্লাবটি একদা একটি আউটডোর চলচ্চিত্র থিয়েটার এবং টেনিস খেলার স্থান হিসাবে সাদ্দাম পুত্র উদয়ের সখের ক্লাব ছিল। নিউজউইক সাপ্তাহিকীর রিপোর্টারে সাথে একান্ত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি বাগদাদের চতুঃপার্শ্বের সব গোত্রের সাথে কথা বলিয়াছেন। সব পেশার লোকদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাধ্যমে তিনি সাদ্দাম আমল এবং বাথ শাসনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি ইরাকে গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া আরম্ভ করিতে চান এবং সেইসাথে একটি বেসামরিক সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে চান। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কেউ তাহাকে পছন্দ করে, কেউ কেউ পছন্দ করে না। মার্কিনীরা কখনও এইদেশ নিজেরা শাসন করিবে না। তিনি তাহাদের সমর্থনে আগাইয়া যাইতে চান, কিন্তু আমেরিকার একজন প্রার্থী হিসাবে নহে।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের ভাষ্য মতে সালাবী একজন চোর, এবং অধিকাংশ ইরাকীও তাহা বিশ্বাস করে—এরূপ একটি প্রশ্ন তিনি সাদ্দামের বানানো গল্প হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি যত শীঘ্র সম্ভব মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আশা করেন। (Newsweek, May 5, 2003)

ক্ষমতা প্রত্যাশী আরেক ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ মোহসিন জুবাইদী। ইনি সাদ্দাম আমলে ইরাক হইতে বহিষ্কৃত এক ব্যক্তি। বাগদাদ দখলের পর রাতারাতি তিনি এখানে হাজির হন এবং নিজেকে একজন ক্ষমতার দালাল হিসাবে প্রতিভাত করেন। বাগদাদের ইশতার শেরাটন হোটেলে তিনি নিজেকে বাগদাদ কার্যনির্বাহী পরিষদের (The Executive Council of Baghdad) প্রধান বলিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা নিজেদের স্বেচ্ছাসেবক বলিয়া উল্লেখ করেন। জুবাইদী, যাঁহাকে কেউ কেউ বাগদাদের মেয়র বলিয়াও উল্লেখ করেন, দাবী করেন বিগত ১৭ এপ্রিল ২০০৩ ২২ সদস্য বিশিষ্ট এক নির্বাহী পরিষদ তাঁহাকে নির্বাচিত করিয়াছেন এবং তিনি মার্কিন সৈন্যদের সাথে একযোগে ইরাক পূণর্গঠনের কাজে ব্যস্ত রহিয়াছেন। নিউজউইককে তিনি বলেন "আমার অর্থ আছে, আমার নিকট হাসপাতালসমূহের চাহিদা মাফিক চিকিৎসা সামগ্রী রহিয়াছে, সর্বোপরী ইরাকী জনগণ আমার সঙ্গে রহিয়াছে। (অর্থ তিনি দান হইতে পাইয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। (Newsweek, May, 5, 03.)

তিন যুগের কঠোর সাদ্দাম শাসনের পর ছোট বড় অনেক ইরাকী এখন ক্ষমতা দখলে ব্যস্ত। কালো মিহি সূতার পোষাকে গোত্রীয় শেখগণ নিজেদের উপগোত্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের ওকালতি করিবার জন্য লোক লাগাইয়াছেন। অপব্যয়ী পরিবারগুলি সাদ্দামের অভিজাত এলাকার বাড়ীঘর দখলের জন্য তোষামোদকারী নিয়োগ করিয়াছেন। প্রত্যাবর্তনকারী বহিষ্কৃত ইরাকীগণ—আলেম-ওলামা হইতে রাজনীতিবিদগণ নামাজের ইমামতি এবং জনগোষ্ঠির উপর নেতৃত্বদানের জন্য তাহাদের দাবী উত্থাপন করিতেছেন। তবুও এইসব হবু রাজা-বাদশাহদের কেউই ৫১ বৎসর বয়সী সাবেক গুপ্তচর জুবাইদীর ন্যায় উদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই। বিগত ২৩ বৎসর সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য ইরাকী ন্যাশনাল কংগ্রেসের একজন গোপন নেতার ভূমিকা পালন করিলেও প্রকৃতপক্ষে হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তি ছাড়া কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অধিকাংশই তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন একজন নেকড়ে হিসাবে (Al-Deeb)।

জুবাইদী মার্কিন সেনা ও পুলিশের যৌথ পাহারার ব্যবস্থা শুধু নহে বরং তিনি এই সপ্তাহে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিতব্য তৈল রপ্তানীকারকদের সংগঠন ওপেক (OPEC) এ তাঁহার প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থাও প্রায় চূড়ান্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু ইরাকী ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রধান সালাবী এবং ইরাকে ওয়াশিংটনের অন্তর্বর্তীকালীন বেসামরিক প্রশাসক লেঃ জেনারেল (অবঃ) জে. গার্নার (Retired Lt. General Jay Garner) এর সতর্কবাণীর দ্বারা তিনি নিবৃত্ত হন।

মোকতাদা আল-সদর ঃ প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর সবচাইতে উল্লসিত হয় দক্ষিণ ইরাকের শীয়া মুসলমান। শতকরা ৬০ ভাগ শীয়া অধ্যুষিত ইরাকে সংখ্যালঘু সুন্নিনেতা সাদ্দাম হোসেন দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন চালাইয়া শীয়াদের মাথা তুলিতে দেন

নাই। অবশ্য সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বশবর্তী বাথ পার্টি শাসিত ইরাকে ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ছিল অনেকটা শিথিল এবং এই কারণেই শীয়া ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল নাজাফ ইরাকে অবস্থিত হইলেও অনেকে মনে করেন ইরানই শীয়াদের কেন্দ্রস্থল এবং কোম নগরী একটি কেন্দ্রবিন্দু যেখানে ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও অন্যান্যরা বাস করেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর খোমেনীগণ মনে করেন শীয়া ধর্মের কেন্দ্রস্থল কোম হইতে নাজাফে চলিয়া গেল। তাই সাদ্দামের পতনের পর দক্ষিণের শীয়ারা উল্লসিত হয়। এই উল্লাস এবং শীয়াদের সংঘটিত করিবার জন্য যিনি বাহির হইয়া আসেন তিনি মোকতাদা আল-সদর।

মোকতাদা আল-সদরের সদর দফতর নাজাফে হযরত আলীর (রা:) মাজারের পার্শ্বে এক বাজারে স্যাঁত স্যাঁতে এক দোকানে অবস্থিত। তাঁহার পিতা শীয়াদের এক নেতা ১৯৯৯ সালে সাদ্দাম হোসেনের আদেশে নিহত হন। কালো পাগড়ী পরিহিত এই শীয়া নেতাকে একনজর দেখিবার জন্য শতশত লোক বাহিরে জড়ো হয় এবং এক এক করিয়া তিনি তাহাদের সাক্ষাৎ দেন। তাঁহার নিহত পিতা মোহাম্মদ সাদেক আল-সদরকে তিনি আল্লাহর নবী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পর আল-সদর মার্কিন স্বার্থের প্রবল বিরোধী হিসাবে আবির্ভূত হন। ইরান ভিত্তিক শক্তিশালী এক শীয়া ধর্মীয় নেতার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কারণে ইরাকী শীয়ারা তাঁহার কট্টরপন্থি হইবার ভয়ে ভীত হয়। কিন্তু আল-সদর ঐ নেতার সহিত তাঁহার সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন। সাদ্দামের পতনের জন্য তিনি মার্কিনীদের নিকট কৃতজ্ঞ কিনা—এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আমরা আল্লাহর নিকটই ঋণী। কেউ কেউ বলেন, তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আল্লাহর প্রতিভূ হিসাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। বিগত কয়েকদিনের হিংসা-বিদ্বেষের মধ্যে নাজাফে এই যুবক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আবির্ভূত হন। (Newsweek, May, 19-2003)। তাঁহার আগমনের পিছনে কারণ হইল ধর্মীয় নেতাদের আস্তিনে লুক্কায়িত অগনিত ডলার এবং শীয়া ইসলামের এক পবিত্র স্থানে আবদুল মজিদ খোয়াই নামক এক ধর্মীয় নেতার হত্যাকাণ্ড। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম কর্তৃক লণ্ডনে নির্বাসিত এই নেতা মার্কিন প্রহরায় ইরাকের নাজাফে আগমন করেন। তাঁহাকে সামনে রাখিয়া মার্কিনীদের পরিকল্পনা হইল সাদ্দামোত্তর ইরাকে মধ্যপন্থী নেতাদের উত্থান ঘটানো যাহা 'কট্টরপন্থী' ইরানের বিরুদ্ধে একটি বাধা হিসাবে বিরাজ করে। দৃশ্যতঃ আবদুল মজিদকে হত্যার কারণ হিসাবে তাঁহার মার্কিন সম্পর্ককে দায়ী করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল-সদরের দোরগোড়ায় এই হত্যাকাণ্ডকে সমাগত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব হিসাবেও কেউ কেউ উল্লেখ করেন। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আল-খোয়াই মনে করেন সাদ্দাম শাসন শেষ হইয়া যাইবে। তাই তিনি নাজাফকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষমতা বলয় সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অচিরেই প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম কঠোরভাবে সেই শীয়া অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিয়া দিলে আল-খোয়াই লন্ডনে পলায়ন করেন।

নাজাফের একটি সূত্র অনুযায়ী আল-সদর তাঁহার অনুসারীদের বলেন যে, তিনি আল-খোয়েইর আগমনে উদ্বিগ্ন। তিনি তাঁহার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেন এবং এই

মার্কিন দালালের বিরুদ্ধে শীয়াদের বাধা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করেন। ইরানের কোম নগরীতে অবস্থানরত এক কট্টর শীয়া নেতা, খাদেম আল-হোসাইনী আল-হায়েরী পত্র মারফৎ আল-সদরকে উৎসাহিত করেন এবং তাঁহাকে ইরাকে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি সমস্ত সাদ্দামপন্থীদের ইরাক হইতে বহিষ্কারের আহ্বান জানান। আল-খোয়েই আল-সদরের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার দুই দিন পরেই আল-খোয়েই এবং অপর এক শীয়া নেতা হায়দর রাইফী সদরের সমর্থকদের হাতে নিহত হন। অতঃপর আল-সদর কূফা মসজিদে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইরাকে ইসলামী আইনের কিছু অংশ কার্যকরী করিবার নির্দেশ দেন।

দক্ষিণ ইরাকের শীয়া জনগোষ্ঠি আল-সদরের আহ্বানে সাড়া দেয়। তাঁহারা মার্কিন বাহিনীর ইরাক ছাড়ার ঘোষণা দেন। অতঃপর ইহাদের সহিত মার্কিন বাহিনীর ঘোরতর সংঘর্ষ বাধে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল-সদর বাহিনী জয়যুক্ত হয়। কিন্তু অচিরেই আল-হায়েরীর আহ্বানে আল-সদর মার্কিনীদের সহিত এক সমঝোতায় উপনীত হইয়া যুদ্ধ থামাইয়া দেন।

সাদ্দাম হোসেন গ্রেফতার :

অপরদিকে সমগ্র ইরাকে গেরিলা যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়ে। সাদ্দামের রিপাবলিকান গার্ডরা বেসামরিক বেশে মরিয়া হইয়া মার্কিন স্বার্থের বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাইয়া মার্কিন ও বৃটিশ সেনাবাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। শুধুমাত্র রাইফেলের সাহায্যে গ্রেনেড নিক্ষেপ করিয়া তাহারা শত শত মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য হত্যা করে। যে সমস্ত দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ইরাকে সৈন্য প্রেরণ করে তাহাদের বেসামরিক লোকদের অপহরণ করিয়া তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহারে অথবা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিতে বাধ্য করে। ডজন ডজন সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়। অসংখ্য ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, লরি, জিপ রাস্তার পাশে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখা যায়। এদিকে জ্বালানী তেলবাহী পাইপে আগুন ধরাইয়া তাহারা ইরাকের তেল রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেয়। মার্কিন সৈন্যরাও প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া গেরিলা-পথচারী নির্বিশেষে ইরাকীদের হত্যা করে। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম পুত্র উদ ও কুশাই একমাত্র পৌত্রসহ উত্তর মৌসূলে লড়াই করিয়া শাহাদাত বরণ করেন। মার্কিনীরা সাদ্দাম এবং তাহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের তালিকা বানাইয়া সর্বত্র প্রচার করে, এবং ধরাইয়া দিতে পারিলে পুরস্কার প্রদানের অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়। ইহারই এক পর্যায়ে ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ সাদ্দামের জন্মভূমি তিকরিতে তাঁহারই এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম মার্কিন বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। তাঁহার গ্রেফতারে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এবং মুক্তিকামী সমগ্র বিশ্বে শোকের ছায়া নামিয়া আসে।

কিন্তু যুদ্ধ থামিয়া যায় নাই। অতঃপর মার্কিন বাহিনী সাধারণ ইরাকীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়া মার্কিন সৈন্যের পোষাক পরিধান করাইয়া মাঠে নামায়। অতএব গেরিলারা সৈন্য রিক্রুটিং সেন্টারে হামলা চালাইয়া বহু ইরাকীদের হত্যা করে। ইরাকে অবস্থিত জাতিসংঘ সদর দফতরে হামলা চালাইয়া গেরিলারা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে এবং একজন উঁচুমানের কূটনীতিককে হত্যা করে। ফলে নিরাপত্তার অভাবে জাতিসংঘ দফতর জর্ডানে স্থানান্তরিত করা হয়।

[একশ ছাপ্পান্ন]

ইরাকে গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র, রাসায়নিক অস্ত্রের মজুদ আছে এবং সর্বোপরী নিউইয়র্কের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে (World Trade Centre) হামলাকারী ওসামা-বিন লাদেনের আল-কায়েদা জঙ্গিগোষ্ঠির সহিত প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের গোপন সম্পর্ক আছে– এই ধূয়া তুলিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ-ডব্লিউ বুশ অত্যাধুনিক সমরশক্তি লইয়া ইরাকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। গণ-বিধ্বংসী অস্ত্র ইরাকে নাই–এই ধরনের একটি জাতিসংঘ রিপোর্টকে উপেক্ষা করিয়া তিনি ইরাক দখলের পর স্বীয় গোয়েন্দাদল লেলাইয়া দিয়া কোন অস্ত্রই ইরাকে খুঁজিয়া পাইলেন না। অপর দিকে আল-কায়েদার সঙ্গেও সাদ্দামের কোন সম্পর্কের সূত্রও খুঁজিয়া পাইলেন না। বড় বড় শহরগুলি সম্মিলীত বাহিনীর হস্তগত হইলেও যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি জর্জ বুশের অনুকূলে চলিতেছে না। ইরাকে কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত এবং প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক সৈন্য আহত ও পঙ্গু হইবার ঘটনায় মার্কিন জনগণ প্রতিবাদে মুখর হইয়া উঠে।

এই আত্মঘাতি যুদ্ধের দায় দায়িত্ব বর্ত্তাইতেছে এখন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রামসফেল্ডের উপর। ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন জেনারেল ইরাক যুদ্ধে খামখেয়ালী, ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও চরম অব্যবস্থাপনার জন্য সরাসরি রামসফেল্ডকে দায়ী করিয়া তাঁহার পদত্যাগ দাবী করেন। প্রেসিডেন্ট বুশ তাঁহার প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের দাবীতে অটল। যুদ্ধারম্ভের যুগের বৈদেশিক মন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত স্বনামধন্য সেনাবাহিনী প্রধান কলিং পাওয়েল, ডিক চেনী এবং রামসফেল্ডকে বুঝাইতে সক্ষম হন নাই যে তাঁহারা সঠিক পথে নাই। এই দুই ব্যক্তি আমেরিকার প্রশাসনকে এমনভাবে বিন্যস্ত করিতেছেন যাহা দ্বারা সমগ্র বিশ্বে মার্কিনীরা একটি একগুঁয়ে জাতি হিসাবে পরিচিতি লাভ করিবে (Newsweek, Sept, 2, 2002)। পাওয়েল প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের ন্যায় বিশ্বায়নের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তিনি বলেন, "আমরা সহস্রাধিক গ্রন্থির সাহায্যে মুক্ত বিশ্বের অগণিত নগরী, ইহার প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহ, ইহার সুপ্রাচীন সভ্যতাসমূহ এবং ইহার মুক্তির নবতর দাবীর সহিত আবদ্ধ।" (Newsweek, Do) সাদ্দামের নির্গমনের ব্যাপারে তিনিও চেনী এবং রামসফেল্ডের সহিত একমত। কিন্তু সাদ্দামের বহিষ্কারের পন্থা লইয়া তাহাদের মধ্যে পার্থক্য অতি গভীর। কট্টরপন্থীরা মনে করেন মার্কিন শক্তি প্রয়োগই যথেষ্ট। কিন্তু কলিং পাওয়েল এইসব আদর্শ পরিচালিত বেসামরিক যুদ্ধবাজদের ব্যাপারে শংকিত। দুইবার ভিয়েতনাম সফরের পর তিনি বলেন; "আমার প্রজন্মের অনেক পেশাজীবী ক্যাপ্টেন, মেজর, লেঃ কর্ণেল যাহারা ঐ যুদ্ধে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রতিজ্ঞা করেন, (নীতি নির্দ্ধারণে) আমাদের পালা আসিলে আমরা মার্কিন জনগণ বুঝে না বা সমর্থন করে না এই ধরনের স্বল্প প্রস্তুতিমূলক অনাগ্রহী যুদ্ধে রাজী হইব না।" (Newsweek, Sept, 23, 2002)। তাই ইরাক যুদ্ধে বৈদেশিক মন্ত্রী কলিং পাওয়েল মোটেই রাজী ছিলেন না। ২০০৪ সালে পূনঃনির্বাচিত হইবার পর বুশ প্রশাসন কলিং পাওয়েলকে বাদ দিয়া আরেক কট্টরপন্থী মহিলা কণ্ডোলিৎসা রাইসকে বৈদেশিক মন্ত্রী নিয়োগ করে।

অবসরপ্রাপ্ত ৬ মার্কিন জেনারেলের সহিত হাত মিলাইয়াছেন আরেক সেনা কর্মকর্তা, ন্যাটোর সাবেক কমাণ্ডার জেনারেল ওয়েলেসলি ক্লার্ক। তিনি বলেন, ডিক চেনী এবং রামসফেল্ড অযথা যুক্তরাষ্ট্রকে ইরাক যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ইরাক অভিযানকে মর্মান্তিক ভুল ও কৌশলগত বিপর্যয় আখ্যা দিয়া বলেন, ইহার সহিত সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই। ভুল নীতির কারণে রামসফেল্ড জেনারেলদের আস্থা হারাইয়াছেন, তাই তাঁহার পদত্যাগ করা উচিৎ। (আমার দেশ, ১৯ এপ্রিল ২০০৬)।

মার্কিন জনগণ এবং পেন্টাগনের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এইসব ব্যক্তিগণের বক্তব্য হইতে বুঝা যায়, তেল ব্যবসায়ী ডিক চেনী এবং অস্ত্র ব্যবসায়ী রামসফেল্ডের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এক চরম বিপর্যয়ে আনিয়া ফেলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নির্বাচনী খেলার মাধ্যমে গঠিত ইরাকের পুতুল সরকার চরম বিপর্যয় হইতে বুশ প্রশাসনকে রক্ষা করিতে পারিবে না। প্রেসিডেন্ট বুশ এবং রামসফেল্ড গং রা 'ভুল হইয়াছে' 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া যতই চেঁচামেচী করেন না কেন বাঁচার কোন পথ নাই।

এইদিকে ইরাকে কোয়ালিশন বাহিনী কর্তৃক ঠাণ্ডা মাথায় চলিতেছে অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিক হত্যাকাণ্ড। এই জন্য একদল নোবেল বিজয়ী ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বের নানা অংশের বিশিষ্ট জন জাতিসংঘের নিকট চিঠি লিখিয়াছেন। চিঠিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন নোবেল বিজয়ী হ্যারল্ড পিন্টার, জে. এম. কোয়েতজি, হোসে মারামাগো এবং দারিও ফো। অন্যদের মধ্যে রহিয়াছেন নোয়াম চমস্কি, হাওয়ার্ড জিন, কর্ণেল ওয়েস্ট এবং টনি বেন। ইহারা এই অভিযোগের পূর্ণ তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাইয়াছেন। ইউরোপীয় সংসদে গ্রীণ পার্টির প্রতিনিধি ক্যারলিন লুকাসও এই তদন্তের দাবী সমর্থন করিয়াছেন।

গত মাসে (মার্চ ২০০৬) গার্ডিয়ান সংবাদপত্রে ইরাকী লেখিকা হাইফা জাঙ্গামা এই হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সঠিক সংখ্যা হয়তো কোন দিনই পাওয়া যাইবে না। তবে ইহা হাজারেরও অনেক বেশী। শুধু বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়েই ৮০ জন শিক্ষক এই পর্যন্ত খুন হইয়াছেন। যাহারা আক্রান্ত হইয়াও বাঁচিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে তো তালিকার বাহিরেই রাখা হইয়াছে। হাইফা দেখিয়াছেন, কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হইয়াছে তাহা নহে। সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকই এই নিহতের তালিকায় রহিয়াছেন। ইহার মধ্যে চিকিৎসক, আইনজীবী, বিজ্ঞান গবেষক, আরবি পণ্ডিত এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকরাও রহিয়াছেন।

২৮শে জানুয়ারী বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল রাজ্জাক আল-নাসেরের বাড়ির সামনে দুইটি মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়ায়। বন্দুকধারী কয়েকজন নামিয়া আসিয়াই তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ঘটনা হইল, কয়েকদিন আগে আল-জাজিরা ও আল-আরাবিয়া টেলিভিশনে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের কঠোর বিরোধিতা করিয়া মতামত জানাইয়াছিলেন এই অধ্যাপক। আরেক প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী ডঃ আবদুল লতিফ আল-মায়া আল-জাজিরা টেলিভিশনে ইরাকের পুতুল শাসকদের সমালোচনায় মুখরিত হন। ইহার পরপরই তিনি বন্দুকধারীর গুলিতে ঝাঁঝরা হইয়া খুন হন। (প্রথম আলো : এপ্রিল, ১৭, ২০০৬)।

উল্লেখ্য, ঘরে এবং বাহিরে প্রবল সমালোচনার মুখে প্রেসিডেন্ট বুশ সৈন্য প্রত্যাহারের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু কাহার হাতে প্রশাসন ন্যস্ত করা যায়? এইজন্য ইরাকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার (?) অংশ হিসাবে বাথ পার্টির দলত্যাগী নেতা এবং "ইরাকী ন্যাশনাল একর্ডের" আইয়াদ আলাভীকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং কুর্দি নেতা জালাল তালাবানীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ইরাকে সাধারণ নির্বাচন করিয়া নূতন সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে। কিন্তু নির্বাচন সম্পন্ন হইবার চারিমাস পরেও একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ মার্কিনীদের তত্ত্বাবধানে প্রণীত সংবিধানে শীয়াদের গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে বেশী। অপরদিকে কুর্দিদের প্রদত্ত সুবিধাদির দ্বারা তাহাদের স্বাধীনতার পথ সুগম করা হইবে। ফলে সুন্নিরা ইহাতে ক্ষুব্ধ হয়। তাই সুন্নিরা মন্ত্রিসভা গঠনের প্রক্রিয়া হইতে নিজেদের সরাইয়া রাখে। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শীয়া নেতা নূরী আল মালিকীকে মনোনয়ন দানের মধ্য দিয়া টানা চারিমাসের অচলাবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটিবে বলিয়া আশা করা হয়। নূতন প্রধানমন্ত্রীর কাজ হইবে ৩০ দিনের মধ্যে সরকার গঠন করা। আর ইহা হইবে সাদ্দাম হোসেনের পর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সরকার। ইরাকের পুণঃনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানী আশা করেন ইহার মাধ্যমে ইরাকের জাতিগত দাঙ্গার অবসান হইবে। মালিকী মিলিশিয়াদের ইরাকী নিরাপত্তা বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করিবার মধ্য দিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রণের দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন।

কিন্তু নিজ দেশে জনপ্রিয়তা ২৯ ভাগে নামিয়া আসা প্রেসিডেন্ট বুশ নূতন সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করেন জাতিগত মিলিশিয়া বিশেষতঃ সুন্নি গেরিলাদের। এইদিকে ইরাকে মোতায়েন কোয়ালিশান বাহিনীর কমান্ডার ব্রিটিশ জেনারেল রবার্ট ফ্রে বলেন, দেশটিতে মিলিশিয়া সমস্যার সমাধান কেবল রাজনৈতিকভাবেই সম্ভব।

লেঃ জেনারেল (অবঃ) জে. গার্নারের পর ইরাকে মার্কিন প্রশাসক বা দূত হিসাবে প্রেরণ করা হয় পল ব্রেমারকে (Paul Breamer)। তিনি ইরাকে বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করিবার চেষ্টা চালান। ২০শে ডিসেম্বর ২০০৩ তিকরিতে এক খামার বাড়ীর ভূগর্ভস্থ মাটির বাংকার হইতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম গ্রেফতার হইবার পর ব্রেমার সাদ্দাম আমলের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি কুর্দি নেতা তালাবানীকে অন্তর্বতীকালীন প্রেসিডেন্ট এবং আলাভীকে প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন দান করেন (উপরে দ্রষ্টব্য)। একটি বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা তিনি চালু করেন এবং অতঃপর একটি সামরিক বিমানযোগে ইরাক ত্যাগ করেন। কিন্তু ইরাকী গেরিলাদের সঙ্গে কোয়ালিশন বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধও চলিতে থাকে এবং একদিকে সুন্নি-শীয়া এবং অপরদিকে কুর্দিদের মধ্যে এক প্রবল গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় ইরাক।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করা এবং মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র চালুর যে লক্ষ্য লইয়া মার্কিনীরা ইরাক আক্রমণ করিয়াছিল তাহার তিন বৎসর পর দেখা যাইতেছে যে, ইরাক সর্বাত্মক গৃহযুদ্ধের মুখে চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মার্কিনীরা ১৬ই মার্চ ২০০৬

ইরাকে এক প্রচণ্ড বিমান হামলা চালায়। সাদ্দামের পতনের পর দেশটিকে শান্ত করিবার প্রয়াস হিসাবে এই হামলা মার্কিন নেতৃত্বাধিন জোট এবং ইরাকী পুতুল সরকারের আরেকটি ব্যর্থতার প্রতীক। গতমাসে সামারায় শীয়াদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাজার ইমাম্ আল হাদি মসজিদে বোমা হামলার পর সাম্প্রদায়িক সংঘাতে ইরাকে শত শত মানুষ মারা যায়।

২০০৫ সালের এপ্রিলে ইরাকে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ওয়াশিংটন অতি উচ্ছ্বসিত থাকিলেও ঐ সময়ে ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল হোসেন কামিল দেশটিতে নিম্ন মাত্রার গৃহযুদ্ধ শুরু হইয়াছে বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, সুন্নি আরবরা শীয়া লোকজনকে প্রতিদিন হত্যা করিতেছে, একই সময় প্রতিবাদ হিসাবে শীয়ারাও সুন্নিদের হত্যা করিতেছে।

এদিকে নূরী জাওয়াদ আল মালিকী ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানীর মনোনয়ন লাভ করিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে, অর্থাৎ ২২শে মে ০৬ এর মধ্যে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা প্রকাশ করেন।

ইরাকের সর্বশেষ পরিস্থিতি ঃ (মে ২০০৬) ঃইরাকে মারাত্মক গণবিধ্বংসী ও কেমিকেল অস্ত্র রহিয়াছে এবং ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র (WTC) ধ্বংসকারী আল-কায়েদা সংগঠনের সম্পর্ক রহিয়াছে এই অজুহাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং তাঁহার প্ররোচনায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশ লইয়া গঠিত সম্মিলীত সামরিক জোট ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে। কিন্তু বিশাল বাহিনী লইয়া ইরাক আক্রমণ ও করায়ত্ব করা এবং উহার প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করিবার পরও মার্কিন বাহিনী কোন গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও আল কায়েদার সঙ্গে সম্পর্ক আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে লক্ষাধিক নিরীহ ইরাকী এবং কয়েক হাজার মার্কিন সৈন্য নিহত হয়। সমগ্র বিশ্বে এই যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট বুশ ও টনি ব্লেয়ারকে ধিক্কার প্রদান এবং স্বয়ং বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ প্রতিবাদী মানুষের হুংকারে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং টনি ব্লেয়ার শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে এবং জনসমক্ষে স্বীকার করেন যে ইরাক যুদ্ধে তাহারা অনেক ভুল করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার ২৫শে মে ২০০৬ হোয়াইট হাউসে ৫০ মিনিটের এক সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা তাঁহাদের এই ভুলের কথা স্বীকার করেন। এই সম্মেলনে ইরাক হইতে সৈন্য প্রত্যাহারের কোন সময়সূচী তাঁহারা ঘোষণা করেন নাই, তবে প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আশা প্রকাশ করেন যে, ২০০৭ সাল নাগাদ ইরাকী সৈন্যরা সে দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। আরেক খবরে প্রকাশ, জর্জ বুশ বলিয়াছেন আগামী জুলাই-০৬ এ মার্কিন সৈন্য আংশিক হ্রাস করা হইবে।

বিচারের কাঠগড়ায় ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ঃ ২০০৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিকরিতের এক খামার বাড়ী হইতে মার্কিন সেনা কর্তৃক গ্রেফতারের পর সাদ্দাম হোসেনকে বাগদাদ বিমান বন্দরের নিকটবর্তী একটি গোপন স্থানে বন্দি করিয়া রাখা হয়। তাঁহার বিচার লইয়া বিশ্বব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সাদ্দামের সমর্থকগণ আশংকা করেন মার্কিন সমর্থক বর্তমান ইরাকী প্রশাসক দ্বারা তাঁহার বিচার হইলে তাহা

নিরপেক্ষ হইবে না, বরং যেন তেন প্রকারে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইবে এবং তাহা দ্রুত কার্যকর করা হইবে; কারণ বর্তমান সরকার এমন সব ব্যক্তিবর্গ লইয়া গঠিত যাহারা কোন না কোনভাবে সাদ্দাম কর্তৃক নিগৃহিত হইয়াছিলেন। অতএব এ বিচার নিরপেক্ষ হইবে না। তাই তাঁহারা এ বিচার ইরাকের বাহিরে কোন স্থানে বা আন্তর্জাতিক আদালতে কিংবা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হইলেও তিনি ন্যায় বিচার পাইবেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাকীদের দ্বারা বিচারকার্য সম্পাদন করাইতে জেদ ধরেন। অতঃপর ইরাকে তাঁহার এবং তাঁহার সাত সহযোগী তারেক আজিজ, তাহা রামাদান প্রমুখের বিচার আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ সাদ্দামের এক উকিলকে হত্যা করা হয়। অন্যজনকে হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু তাহার পরও বিচারক বিব্রত বোধ করেন এবং অতঃপর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর প্রধান বিচারক হিসাবে বিচারক রউফ আবদেল রহমানকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ও তাঁহার সাত সহযোগীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, ১৯৮০ সালে ইরাকের দোজাইল গ্রামে তাঁহারা ১৪৮ জন শীয়া প্রতিবাদ কারীকে হত্যা করেন এবং তাহাদের ফলের বাগান ও বাড়ীঘর ধ্বংস করেন। সরকারপক্ষ বিভিন্ন সাক্ষী উপস্থাপন করিলেও সাদ্দাম হোসেনকে প্রকৃত আদেশ দানকারী হিসাবে প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হয়।

১৫ই মে, ২০০৬ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, ১৯৮০ সালে ইরাকের দোজাইল গ্রামে তাহারা খুন, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ৩৯৯ জনকে অবৈধভাবে গ্রেফতার করেন। এই মর্মে তাঁহাদের বিরুদ্ধে চার্জশীট গঠন করা হয়। এই অভিযোগের ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তিনি দোষী নাকি নির্দোষ এই ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে কোরআন হাতে সাদ্দাম হোসেন দাঁড়াইয়া বলেন, তিনি হ্যাঁ বা না উচ্চারণ করিয়া উত্তর দিবেন না। বরং তিনি বিচারককে আবারও স্মরণ করাইয়া দেন, তিনিই এখনও ইরাকের বৈধ প্রেসিডেন্ট।

বিগত ২০শে জুন ২০০৬ অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে সাদ্দাম হোসেনের অপর এক আইনজীবী খামিস আল ওবেইদী নিহত হন। আরও ২০ জনের সাথে তাঁহাকে তাঁহার বাসভবন হইতে বন্দুকধারীরা তুলিয়া লয় এবং বাগদাদের রাস্তায় গুলি করিয়া হত্যা করে। আইনজীবী খামিস আল ওবেইদীকে হত্যার প্রতিবাদে সাদ্দাম হোসেন ও তাঁহার ৫ জন সঙ্গি অনশন পালন করেন বলিয়া তাঁহার প্রধান আইনজীবী খলিল আল-দুলেইমি অভিযোগ করেন। আইনজীবী খামিসসহ সাদ্দামের মোট তিনজন আইনজীবীকে হত্যা করা হইল। ঘটনা দৃষ্টে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, সাদ্দাম পক্ষের কোন আইনজীবী বা সাক্ষী জোরালো ভূমিকা রাখিলে তাঁহাকে হত্যা বা হুমকির মাধ্যমে নিরস্ত করিয়া প্রকারান্তরে এরূপ একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা যাহাতে কেউ সাদ্দামের পক্ষে দাঁড়াইতে না পারে, এবং এই জন্যই সাদ্দামের দাবী সত্ত্বেও এবং এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের (Amnesty International) অনুরোধ সত্ত্বেও বিচারকার্য ইরাকেই পরিচালনা করা হইতেছে। খলিল আল দুলেইমি আরও বলেন, সাদ্দাম এবং অন্যান্য বিবাদীরা তাঁহাদের পক্ষের আইনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক পরিষদের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

ইরাকী গেরিলাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীক জারকাবী নিহত ঃ একের পর এক বোমা হামলা ও হত্যাযজ্ঞ ঘটাইয়া, বিদেশী সৈন্যদের শিরচ্ছেদ করিয়া এবং ভিডিও টেপের বার্তায় অব্যাহত হুমকি প্রদানের মাধ্যমে ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের শুরু হইতেই মার্কিন ও ইরাকী বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখেন গেরিলা নেতা আবু মুসাব আল-জারকাবী। সাদ্দাম শাসনের অবসানের পর ৩৯ বৎসর বয়স্ক জারকাবিই ইরাকে গেরিলাদের প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রতীকে পরিণত হন। বিগত ৭ই জুন ২০০৬ বাগদাদের অদূরবর্তী একভবনে সাত সহযোগীসহ এক বৈঠকে মার্কিন বিমান হামলায় সবাই নিহত হন। অনেক পরীক্ষার পর তাঁহার পরিচিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হইবার পর যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার নিহত হইবার ঘটনা প্রকাশ করে।

জারকাবির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। মার্কিন সৈন্য নিকোলাস বার্গকে অপহরণ ও শিরচ্ছেদ, মাদ্রিদে বোমা হামলা, ইরাকে শীয়া মতানুসারীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, বন্দরনগরী বসরায় আত্মঘাতী হামলা হইতে শুরু করিয়া গত বৎসর নভেম্বর মাসে জন্মভূমি জর্দানের এক হোটেলে বোমা হামলাসহ অজস্র ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী তিনি। আম্মানের হোটেলে ঐ হামলায় ৬০ ব্যক্তি নিহত হইবার ঘটনায় জারকাবীর অনুপস্থিতিতেই জর্দানের আদালত তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তবে জারকাবী আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেন ২০০৩ সালে। ইরাকে মার্কিন হামলার ঠিক আগে। নিরাপত্তা পরিষদে ইরাক যুদ্ধের যথার্থতা প্রমাণ করিতে যাইয়া তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল বলিয়াছিলেন, ইরাক আল-জারকাবীর সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ককে আশ্রয় দিয়াছে। জারকাবীকে তিনি ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী এবং ইরাক ও আল-কায়েদার মধ্যকার যোগসূত্রের অংশীদার বলিয়া উল্লেখ করেন।

কে এই জারকাবী? জর্দানের রাজধানী আম্মানের ১৭ মাইল উত্তরের ধূলায় ধূসরিত খনির শহর জারকায় ফিলিস্তিনী বাবা আর জর্দানী মার ঘরে ১৯৬৬ সালে জারকাবীর জন্ম। এক নোংরা স্যাঁতসেঁতে দোতলা বাড়ীতে ছোটবেলা কাটে তাঁহার। হাইস্কুলে উঠিয়া তাঁহার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া যায়। এলাকার লোকজন তাঁহাকে ধার্মিক বলিয়াই জানিতেন। হাজার হাজার মুসলিম তরুণের মত জারকাবীও আফগানিস্তানে সোভিয়েত বিতাড়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং একজন ভাল যোদ্ধার সুনাম অর্জন করেন। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরিয়া তিনি সম্ভবতঃ মিসরীয় ইসলামিক জিহাদ দলে যোগ দেন। এই দলটি পরে ১৯৯৮ সালে আল-কায়েদা নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হয়। পাশাপাশি হিজবুল তাহরির দলেরও সদস্য হন তিনি। ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই দলের মূল লক্ষ্য। এই সময় জর্দানে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড ভোগ করেন তিনি। ২০০৬ সালের ৭ই জুন বাগদাদের অদূরে সহযোদ্ধা পরিবেষ্টিত অবস্থায় মার্কিন বিমান হামলায় তিনি মারা যান। (দৈনিক যুগান্তর, ৯ জুন ২০০৬)।

আবু মুসাব আল-জারকাবীর মৃত্যুর পর আল-কায়েদা সদর দফতর (ভ্রাম্যমান) হইতে হামজা আল-মোহাজেরকে ইরাকের আল-কায়েদার আমির নিযুক্ত করা হইলে আল-কায়েদার সব ইউনিট তাহা মানিয়া লয়। এদিকে আল-কায়েদা প্রধান ওসামা বিন

লাদেন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, জারকাবীর মৃত্যুতে ইরাকে মার্কিন স্বার্থের উপর হামলার মাত্রা কিছু অংশেও কমিবে না, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইবে। ইসলামী এক ওয়েবসাইটে গতকাল ৩০ শে জুন ২০০৬ প্রচারিত নূতন এক ভিডিও টেপে এই হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট ডব্লিউ বুশ ঘোষণা করেন, জারকাবীর উত্তরসূরী হামজা আল মোহাজির যুক্তরাষ্ট্রের হিট তালিকায় রহিয়াছে। কিন্তু বিবিসির ভাষ্য অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী আল-কায়েদা জঙ্গিদের চাইতেও দেশের অভ্যন্তরে বাড়িয়া উঠা জঙ্গিদের তরফ হইতে বড় ধরনের হুমকির সম্মুখীন। মার্কিন এ্যাটর্নি জেনারেল আলবার্তো গঞ্জালেস সম্প্রতি এই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার এবং এফ. বি. আইয়ের দফতরসমূহ বোমা মারিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ইতোমধ্যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ভয়াবহ এই পরিকল্পনায় জড়িত সাতজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫জন মার্কিন নাগরিক এবং ২ জন হাইতির। অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের সূচনা করাই ছিল ইহাদের মুল লক্ষ্য। (দৈনিক আমার দেশ, ২৫ জুন ২০০৬)।

দুর্নীতির বিস্তার ঃ সাদ্দাম-পরবর্তী ইরাকে দুর্নীতির নজিরবিহীন বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। দুর্নীতি দমন বিষয়ক কমিটি প্রধান হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছেন, সাদ্দাম হোসেনের পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্নীতিবাজ লোকেরা ধরা ছোঁয়ার বাহিরে। ইরাকী কমিশন অন পাবলিক ইনটেগ্রিটির প্রধান বিচারপতি বরদি হামজা বলেন, দুর্নীতির বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। ২০০৩ সালে সাদ্দাম হোসেনের পর দুর্নীতি লাগামহীনভাবে বাড়িয়াছে। তিনি এই অবস্থার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতাকে দায়ী করেন। তাছাড়াও অপরাধীর কড়া শাস্তি হয় না বলিয়াও দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়াছে বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোন অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় না। আবার তদন্তে কেউ দোষী সাব্যস্ত হইলেও আগেভাগে ইঙ্গিত দিয়া তাহাকে বিদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইরাকের আবু ঘারিব জেলখানা ঃ আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা (F.B.I) যদি ২০তম হবু ছিনতাইকারী জাকারিয়া মুসাভিকে বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংশের পরিকল্পনা সময়মত উদ্ধার করিবার জন্য অত্যাচার করিত তবে কি হইত? ইহার জন্য কে অপবাদ দিত? ঘটনা এমন নহে যে তাহারা সভ্যজগতের কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া কাজ করিতেছে, কিংবা তাহারা ইরাকের কোন সন্ত্রাসীও নহে। আবু ঘারিব জেলখানায় সামরিক গোয়েন্দারা প্রশ্নোত্তরে বন্দিদের নিকট হইতে যাহা পাইতেছে তাহা, পশ্চিমা সাংবাদিকদের মতে "সামান্যই"। এইজন্য জেলখানায় অত্যাচারের অভিযোগে ৬ সামরিক পুলিশের (MP) জেরা করিবার ফাঁকে ফাঁকে তাহাদের প্রতি সদয় হইবার জন্য বলা হয়। অভিযোগে প্রকাশ সামরিক পুলিশ কর্পোরাল চার্লস্ গ্র্যানার জুনিয়র (Cpl Charls Graner Jr) এক তরুণীকে তাহার সার্ট গলা পর্যন্ত তুলিতে আদেশ দেয়। সে একজন কথিত যৌনকর্মি। মিলিটারী পুলিশ হোসেন মোহসেন মাতার নামীয় একজনকে উদোম গায়ে আরেকজনের উপর চড়িতে বলে। সে কথিত চোর। হাকী ইসমাইল আবদুল হামিদকে কুকুর দ্বারা ভয়

দেখানো হয়। সামরিক পুলিশ আবু ঘারিব জেলখানায় শুধু বন্দিদের অত্যাচার করে নাই বরং অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ বন্দিদেরও অত্যাচার করে।

এই জেলখানার যে ১৩ জনকে অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া চার্জ গঠন করা হয় তন্মধ্যে ৮ জনকে তদন্তকারীরা বেকসূর খালাস দেয়। সন্ত্রাসী সন্দেহভাজন মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহর ব্যাপারে দেখা যায় তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ ভাসা ভাসা এবং অনির্ভরযোগ্য। পরিশেষে এই উপসংহারে আসিতে হয় যে এই বন্দিদের উপর নির্যাতন চালান হয় শুধুমাত্র কৌতুক করিয়া। কর্পোরাল গ্র্যানার সম্পর্কে একজন তদন্তকারী মন্তব্য করেন, "শুয়রের বাচ্চা" (S.O.B. Son of a bitch)। এই মন্তব্যটিকে তিনি দুইবার রেখাংকিত করেন। এই দলটি আমেরিকার যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়। আমেরিকার দখলদারিত্বে ইরাকীদের সমর্থনের বিষয়ে যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা গণনাহীন। নূর বলিয়া (প্রকৃত নাম গোপন করা হইল) এক তরুণীকে গ্র্যানার তাহার স্তন ও লজ্জাস্থান উন্মোচন করিতে আদেশ দেয়, যাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না। নূর পরে বাগদাদে বিজ্ঞপ্তি দেয় যে মার্কিন সৈন্যরা তাহাকে ধর্ষণ করিয়া গর্ভবতি করে। সে আরও লেখে "বাধা দিয়া তাহারা বলে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সবাইকে হত্যা করুন" (... begging resistance to "Please kill all of us") (Newsweek, July, 19 2004)। বন্দি সাত্তার জব্বার এর মাথায় হুড দেওয়া এবং বিদ্যুতায়িত তার দিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিবার ছবিটিকে ইরাকীরা বিদ্রুপ করিয়া নাম দিয়াছে "স্টাচু অব লিবার্টি"।

গুয়ানতানামো বে বন্দিদের জন্য সরকার নিযুক্ত উকিল বলেন, "ইহা এমন একটি জেলখানা যাহা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণের বাহিরে।" তিনি আপিলে বলেন, ইহা হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে করা হইতেছে অথবা আমরা জানি না ইহাতে কাহারা আছে। মার্কিন সেনাবাহিনী কারাগারে ৩২জন বন্দির মৃত্যু সম্পর্কে খোজখবর লয়। ইহাদের অধিকাংশই আবু ঘারিবে মারা গিয়াছে।

মৃত্যুবরণকারী একজনের নাম মুনাদিল আল-জুমাইলী, ৪০ বছরের স্বাস্থ্যবান যুবক ফেব্রুয়ারী ১০ তারিখ ২০০৪ মারা যান। মাথায় রক্তক্ষরণে তিনি মারা যান। তাঁহার পরিবার জানেও না কখন মারা গেল। তাঁহার ১২ বছরের কন্যা পত্রিকায় ছবি দেখে, বরফের উপর লাশ রাখা, এম. পি. হারমান ও গ্র্যানার তাঁহার উপর বিজয়সূচক চিহ্ন দেখাইতেছে। বন্দিদের উকিল বলেন, "আপনারা হয়ত বলিবেন নির্দেশিত হইয়া আমরা একাজ করিয়াছি, কিন্তু ছবিই প্রকাশ করিতেছে আপনারা আমোদ আহ্লাদ করিবার জন্য এগুলি করিয়াছেন।" (Newsweek, Do)।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড :

অবশেষে ইরাকের প্রহসনের বিচারে সাদ্দাম হোসেন ও তাঁহার দুই সহযোগির ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয়। বিশ্ববাসী এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করিবার দাবী জানায়। ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৬ শনিবার সকালে বাগদাদের গ্রীন জোনে ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসীর আদেশ তড়িঘড়ি কার্যকরী করা হয়।

এইদিন সৌদী আরব ও ইরাকসহ সমগ্র আরব বিশ্বে ছিল কোরবানীর ঈদ (ঈদ-উল-আজহা)। ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলাইবার প্রক্রিয়া টেলিভিশনে দেখান হয়। সাদ্দাম হোসেন অবিচলভাবে কলেমা শাহাদাত পাঠ করিতে করিতে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেন। নিয়মানুযায়ী মুখে মুখোশ পরান হয়। কিন্তু সাদ্দাম মুখোশ পরিতে অস্বীকার করেন এই বলিয়া যে "মুখ লুকাইয়া আমি মৃত্যুবরণ করিব না।" কালেমা শাহাদাতের "মুহাম্মদ" পর্যন্ত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অপসৃত হন। অতঃপর ঐ দিনই তাঁহার জন্মভূমি তিকরিতে তাঁহার শহীদ পুত্রদ্বয় উদ ও কুশাই এবং দৌহিত্র মোস্তফার পাশে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

জঘন্যভাবে কার্যকর এই ফাঁসীর দৃশ্য দেখিয়া বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়। আরব বিশ্বে ক্ষোভের আরেকটি কারণ হইল ঐদিনটি ছিল পবিত্র কোরবানীর দিন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের পরোক্ষ ইঙ্গিতে এই দণ্ডাদেশ প্রদান এবং কার্যকর করা হয় বলিয়া বিভিন্ন পত্র পত্রিকার খবরে ছাপা হয়। ফাঁসী কার্যকরকারীদের মধ্যে শীয়া মতাবলম্বী লোকজনের উপস্থিতি এবং সাদ্দামকে বিদ্রুপ করা এবং শীয়া নেতা মোক'তাদা আল-সদরের পক্ষে ধ্বনী দেওয়ার মাধ্যমে একদিকে শীয়াদের বিজয়ের ভাব প্রকাশ করা হয়, অপরদিকে ইরাকে শীয়া-সুন্নিদের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব আরও উসকাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র বলিয়া আরববাসী মনে করে।

তড়িঘড়ি ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী করিবার আরেক বৈশিষ্ঠ হইল প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানীর সম্মতি ছাড়াই আদেশ কার্যকর করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালীকীর একক সম্মতিতেই আদেশ কার্যকর করা হয়। বিশ্লেষকরা মনে করেন, শীয়া অনুসারী মালীকী সন্দেহ প্রকাশ করেন, সুন্নী অনুসারী কুর্দি নেতা প্রেসিডেন্ট তালাবানী মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকরে সম্মত নাও হইতে পারেন। তাহাছাড়া বিশ্বব্যাপী ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী না করিবার জন্য যে আবেদন নিবেদন এবং বাদ প্রতিবাদ শুরু হয়, সেই প্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি এই আদেশ কার্যকরী হয়। প্রেসিডেন্ট তালাবানী একবার উচ্চারণও করিয়াছিলেন যে তিনি মৃত্যুদণ্ডাদেশে সম্মতি প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন।

প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের মৃত্যুর পর আরব বিশ্বে একমাত্র লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী ছাড়া অন্যকোন রাষ্ট্র প্রধান কোন সমবেদনা বা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নাই। লিবিয়া তিনদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করে এবং পতাকা অর্ধনমিত রাখে। মিশরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মুবারক শুধু সমালোচনা করেন সাদ্দামের ফাঁসী কার্যকর করিবার প্রক্রিয়ার বিষয়টি। তিনি বলেন, যে অমানবিক পন্থায় সাদ্দামের ফাঁসীর আদেশ কার্যকরী করা হয় তাহাতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন শহীদের মর্যাদা লাভ করেন। পন্থা লইয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডব্লিও বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও সমালোচনা করেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুই একটি মুসলিম দেশ ছাড়া অবশিষ্ট মুসলিম বিশ্বও কোন শোক বা সমালোচনা জ্ঞাপন করেনি। ইহার অবিসংবাদিত কারণ হইল প্রবল পরাশক্তিকে কেউ অসন্তুষ্ট করিতে চাহে নাই। আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থা, সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাদ্দামের বিচার ও ফাঁসীর

প্রতিবাদ জানায়। মানবিক সংস্থা বিচারের নামে এই প্রহসনেরও সমালোচনা করে। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মাহাথির মোহাম্মদ তীব্র ভাষায় শুরু হইতে এই বিচার প্রহসনের প্রতিবাদ জানান। ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭ কুয়ালালামপুরে এক যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে তিনি বুশ-ব্লেয়ারকে সাদ্দামের চাইতেও বড় খুনী হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে শিশু হত্যাকারী ও যুদ্ধাপরাধী বলিয়া নিন্দা করেন। (দৈনিক আমার দেশ ৬/২/০৭)।

তড়িঘড়ি শহীদ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসীতে ঝুলাইবার ফলে ইরাকে ব্রিটিশ-মার্কিন হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হইবে বলিয়া বুশ-ব্লেয়ার ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিতে বিপরিত হইয়াছে। সমগ্র ইরাক জুড়িয়া হত্যাযজ্ঞ পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বাড়িয়া যায়। ফালুদা, তিকরিত, কিরকুকসহ বিভিন্ন স্থানে বিশেষ বিশেষ অভিযান চালাইয়াও হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। শীয়া-সুন্নি সংঘাত ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পায়। শীয়ারা সুন্নিদের মসজিদে ও আবাসিক এলাকায় এবং সুন্নিরা শীয়াদের মসজিদে ও মার্কিন এলাকায় আত্মঘাতি বোমা হামলা চালায়। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে বাগদাদের এক মার্কেটে ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে ১৩০ জন নিহত এবং তিন শতাধিক লোক আহত হইবার পর গত দুইদিনে দেশটির বিভিন্ন অংশে দফায় দফায় বোমা হামলা এবং গোলাগুলির ঘটনায় নিহত হয় এক ব্রিটিশ সেনাসহ কমপক্ষে আরও ৫৭ জন। এদিকে বাগদাদের নিরাপত্তা রক্ষা ও রক্তক্ষয়ী গোষ্ঠিগত সংঘাত বন্ধের প্রচেষ্টায় ইরাকী ও মার্কিন যৌথ বাহিনী এক বড় ধরনের অভিযান শুরুর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইরাকী নিরাপত্তা সূত্রগুলি জানায়, বাগদাদের বাব আল শেখ জেলা, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় আল সাইদিয়াহ জেলা, আল মুস্তানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও উত্তরাঞ্চলীয় তেল সমৃদ্ধ নগর কিরকুকে মর্টার হামলা, গাড়ী বোমা ও রাস্তার পাশে পাতিয়া রাখা বোমার বিস্ফোরণ এবং গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। এইসব ঘটনায় নিহত হয় তের ইরাকী। বাগদাদের বাহিরে বিচ্ছিন্ন ঘটনায় প্রাণ হারায় আরও সাত ইরাকী। আর বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায় ৩৩টি লাশ। আগের দিন বাগদাদের একটি বাসস্ট্যাণ্ডে গেরিলা হামলায় মারা যায় কমপক্ষে ৩৭ জন। গতকাল আল-সাইদিয়াহর এক পেট্রোল পাম্পের পাশে এক শক্তিশালী ট্রাকবোমা বিস্ফোরণে মারা যায় কমপক্ষে ৮ ইরাকী ও আহত হয় ৩৯ জন। বাগদাদে সহিংসতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় যৌথ বাহিনী এই সর্বাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা লয়। বিগত ২০০৬ সালে নূরী আল-মালিকী প্রধানমন্ত্রী হইবার পর ইহা হইবে তৃতীয় সর্বাত্মক অভিযান। (আমার দেশ ৬/২/০৭)।

ইরাকে অবস্থার কোন পরিবর্তন না হওয়ায় এবং হত্যাযজ্ঞ বাড়িয়া যাওয়ায় জর্জ বুশ ইরাকে ২১৫০০ মার্কিন সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা করেন এবং বাগদাদে সর্বাত্মক হামলার আয়োজন করেন।

বাগদাদে যৌথবাহিনীর সর্বাত্মক হামলার প্রস্তুতি সম্পন্ন হইয়াছে। সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক বাহিনী লইয়া তাহারা রাস্তায় নামিয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেও মার্কিন মেরিন সৈন্য বহনকারী একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হইয়া বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে একটি মাঠে পড়িয়া

আগুন ধরিয়া যায়। আরোহী ৭ মেরিন সৈন্য সবাই নিহত হয়। ইরাকী বিমান বাহিনী কর্মকর্তারা বলেন, বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্রের সাহায্যে ইহাকে ভূপাতিত করা হয়। তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে ইহা ষষ্ঠ মার্কিন বিমান ধ্বংসের ঘটনা। এই ঘটনা ইরাকে বিমান চলাচলে ক্রমবর্ধমান সমস্যারই ইঙ্গিত বহন করে। অপরদিকে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম আট দিনে ৩৩ জন মার্কিন সেনা প্রাণ হারায়।

এদিকে মার্কিন প্রতিনিধি সভার ডেমোক্র্যাট দলের নেতারা বুশ সরকারের স্বরূপ উন্মোচন করিয়া আনীত একটি প্রস্তাবের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রস্তাবে ইরাকে আরও সৈন্য পাঠাবার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বুশের সিদ্ধান্ত নাকচ এবং সেনাবাহিনীর প্রতি সমর্থন ঘোষণা করা হইবে। ৭ই নভেম্বর ০৬, ডেমোক্র্যাটরা মার্কিন কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর প্রতিনিধি সভায় ইরাক যুদ্ধের উপর ইহাই প্রথম ভোটাভুটি। মার্কিনীরা বুশের যুদ্ধনীতির ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। চার বছরব্যাপী এই যুদ্ধে তিন হাজারেরও বেশী মার্কিন সৈন্য এবং হাজার হাজার ইরাকী নিহত হয়।

মার্কিন বাহিনীর প্রতীক্ষিত বাগদাদ-হামলা আরম্ভ হইয়াছে। ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার দক্ষিণ বাগদাদে মার্কিন বিমান হামলায় ৮ সন্দেহভাজন গেরিলা নিহত হয় বলিয়া দাবী করা হয়। বিমান হামলায় একটি ভবন ধ্বংস হইলে তাহাদের প্রাণহানী ঘটে। বাগদাদের দক্ষিণ উপকণ্ঠে সুন্নি অধ্যুষিত জাবুর এলাকায় বৃহস্পতিবার এই হামলা চালান হয়। ইরাকে আল-কায়েদা ও বিদেশী যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে আমেরিকান সৈন্যরা ব্যাপক গেরিলা হামলা মোকাবিলা করে বলিয়া মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক বিবৃতিতে জানান হয়। লক্ষণীয়, মার্কিন সৈন্য নিধন যতই বাড়িতেছে ইরাকী বেসামরিক লোকজন হত্যার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। মার্কিন সৈন্য নিধন বা মার্কিন-ইরাকী সৈন্য কর্তৃক ইরাকী গেরিলা নিহতের ঘটনাও বোধগম্য; কিন্তু ইরাকী বেসামরিক লোকজন হত্যার তাৎপর্য কি তাহা রহস্যজনক। বিশ্লেষকদের মতে যতই মার্কিন সৈন্য নিহত হইতেছে ততই ইরাকে বেসামরিক নিরীহ লোকদের উপর বোমা হামলার ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই দুইয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক অবশ্যই আছে, এবং সেই সম্পর্কটি হইল মার্কিন বাহিনীর দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ যুদ্ধ হইতেছে তাহাকে বিভক্ত করিয়া শীয়া-সুন্নিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক হানাহানি লাগাইয়া রাখিয়া উভয়কে দুর্বল করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টা ইরাকে মার্কিন দখলদার বাহিনী নিজেদের গোয়েন্দা বাহিনী ও সেই সঙ্গে ইসরাইলী গোয়েন্দা বাহিনী মোসাদের মাধ্যমে করিতেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ বেসামরিক বোমা হামলাগুলিকে যতই ইরাকীদের কাজ বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করুক এই কাজের কলকাঠি তাহারাই নাড়িতেছে পিছন হইতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন মহল এখন শীয়া-সুন্নির এই পারস্পরিক হানাহানিকে গৃহযুদ্ধ হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া এমন প্রচারণা চালাইয়া যাইতেছে যাহাতে ইহা মনে হইবার উপায় নাই যে, এই বিভেদ ও হানাহানির মূল কলকাঠি মার্কিন সরকার ও ইরাকে তাহাদের দখলদার বাহিনীর দ্বারাই নাড়া হইতেছে। ইরাকের পরিস্থিতির দিকে তাকাইলে এই বিষয়টি সহজেই স্পষ্ট হইবে। (দৈনিক আমার দেশ ১০ ফেব্রুয়ারী ০৭)।

এদিকে ইরাকের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুর ৪০ দিন পূর্ণ হয় গত বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারী ০৭)। সাদ্দামের চেহলামের এই দিনটিতে তাঁহার জন্মস্থান তিকরিতের মসজিদে ছিল বেদনাহত মানুষের সমাগম। প্রিয় নেতার রূহের মাগফেরাত কামনায় তাহারা সেখানে জড়ো হয়। সুন্নি নেতা জুমা আল আতাওয়াই মসজিদে আগতদের উদ্দেশে বলেন, সাদ্দাম হোসেনকে আমরা কখনও ভুলিবনা। সমগ্র আরব ও ইসলামী বিশ্বের এই মহান নেতা চিরকাল ইসলাম বিরোধী শক্তি ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া গিয়াছেন। মসজিদের বাহিরে সাদ্দামের মৃত্যুতে শোকবার্ত্তা লেখা ব্যানার ঝুলান হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে এখন কতখানি আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়াছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা হইতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারী অব ষ্টেট (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) কন্ডোলীসা রাইস সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এই সফর শেষ হয় বিগত ১৬ জানুয়ারি কুয়েতে। সেখানে কুয়েতের আমির এর 'বায়ান' প্রাসাদে ঐদিন উপসাগর সহযোগিতা কাউন্সিল (Gulf Cooperation Council, GCC) এর ছয় সদস্য সৌদী আরব, কুয়েত, বাহরায়েন, কাতার, ওমান এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সেই সঙ্গে মিশর ও জর্ডান মধ্যপ্রাচ্যের এই আটটি দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন।

এই বিবৃতিতে উপরোক্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট বুশ কর্তৃক ইরাকে ২১,৫০০ সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া বলেন, ইহার দ্বারা ইরাকে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা সম্ভব হইবে। তাহাছাড়া, ইরাকের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা এবং সেখানে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ইহা সহায়ক হইবে—এই মর্মে রাইস এর প্রস্তাবকেও তাঁহারা সমর্থন করেন। প্রকৃতপক্ষে এইভাবে বুশের পরিকল্পনাকে সমর্থন প্রদানের অর্থ হইল, ইরাকে রক্তারক্তি ও হানাহানি বৃদ্ধি করিয়া সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়াইয়া তোলা এবং এইভাবে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ইরাকী জনগণকে নির্মমভাবে দমন করা। এই বিষয়টি এখন স্পষ্ট যে, ১৬ জানুয়ারী কুয়েতে যাহারা রাইসের সঙ্গে বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন তাঁহারা যে ইরানের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্টের যুদ্ধনীতি ও যুদ্ধ প্রস্তাবকে সমর্থন করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ ইরাকে প্রস্তাবিত সৈন্য পাঠাইবার জোর বিরোধিতা করিতেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬৫% জনগণ, মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট উভয় হাউস। তাঁহারা ইতোমধ্যেই ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থাৎ মার্কিন শাসক শ্রেণীর একটি শক্তিশালী অংশ, বিশেষতঃ ডেমোক্রেটিক পার্টির লোকজন এবং সেইসঙ্গে বুশের দল রিপাবলিক্যান পার্টির বেশ কিছু সদস্য এই সৈন্য পাঠাইবার বিরোধীতা করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারা অবিলম্বে ইরাক হইতে সৈন্য প্রত্যাহারেরও জোর দাবী জানাইতেছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই চক্রান্তমূলক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইরাকে মার্কিন বিরোধী প্রতিরোধযুদ্ধ ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া তাহাদের ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি করিতে থাকিবার কারণেই এখন মার্কিন সরকার ইরাকে অতিরিক্ত ২১৫০০ সৈন্য পাঠাইবার উদ্যোগ লইয়াছে।

ইহার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, ইরাকে তাহারা যে তাবেদার সরকার মালিকী আল-নূরীর নেতৃত্বে খাড়া করিয়াছে সেই সরকার এবং তাহাদের ইরাকী বাহিনীও মার্কিন বিরোধী যুদ্ধের মোকাবিলা করিতে দিন দিন অক্ষম হইয়া পড়িতেছে।

ফিলিস্তিন ঃ

১৯৯৮ সালের ২৩শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ওয়াশিংটনে ফিলিস্তিন-ইসরাইল এক অন্তবর্তীকালিন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় (চতুর্থ সংস্করণে অনুবাদকের কথা, পৃ: ছিয়াশি দ্রষ্টব্য)। পরবর্তী ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক এই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করিবার অঙ্গিকার করেন। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী শান্তি আলোচনার কার্যক্রম থমকিয়া দাঁড়ায়। কারণ জেরুজালেমের মর্যাদা, সীমান্ত নির্ধারণ ও উদ্বাস্তু প্রত্যাবর্তনের মত বিতর্কিত বিষয়গুলির মীমাংশা তখনও হয় নাই। অতঃপর ২০০০ সালে ইসরাইল-হেজবুল্লাহ্ সংঘর্ষের পর শান্তি আলোচনা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। জেরুজালেমকে ফিলিস্তিনীরা তাহাদের রাজধানী করিতে চায়। কিন্তু ইসরাইলও ইহাকে তাহাদের রাজধানী বলিয়া দাবী করে। সীমান্তের ব্যাপারে ফিলিস্তিনীদের দাবী ১৯৪৮ পূর্ববর্তী সীমান্তে ইসরাইল ফিরিয়া যাক, কিন্তু ইসরাইলীরা দাবী করে ফিলিস্তিনীরা গাজা এবং পশ্চিম তীরের জেরিকো এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় থাকুক। উদ্বাস্তুর ব্যাপারে ফিলিস্তিনীদের দাবী ১৯৪৮ পরবর্তী সময়ে যে সমস্ত ফিলিস্তিনী তাহাদের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া উদ্বাস্তু হইয়াছে তাহাদিগকে ফেরৎ আনিতে হইবে। কিন্তু ইসরাইল চায় শুধু ১৯৬৭ পরবর্তী সময়ে যাহারা উদ্বাস্তু হইয়াছে তাহাদিগকে ফেরৎ আনা হোক। (Newsweek April 2,2001)।

ইহার মধ্যে এ্যারিয়েল শ্যারন, কট্টরপন্থী লিকুদ পার্টি নেতা, আকস্মিকভাবে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে প্রবেশ করেন। ইহাকে ফিলিস্তিনীরা চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন হিসাবে বিবেচনা করে। অতঃপর ফিলিস্তিনী-ইসরাইলী দাঙ্গা বাধিয়া যায় এবং শান্তি আলোচনাও বন্ধ হইয়া যায়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী ইসরাইলের জাতীয় নির্বাচনে লিকুদ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিলে কট্টরপন্থী এ্যারিয়েল শ্যারন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হন। অপরদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিল ক্লিনটনের পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জর্জ ডব্লিও বুশ (জুনিয়র)। রিপাবলিকান দলের এই কট্টরপন্থী নেতার ক্ষমতাসিন হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী নূতন মোড় লয়। ইহুদ বারাক এবং বিল ক্লিনটন ছিলেন ফিলিস্তিনীদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল, আর এ্যারিয়েল শ্যারন ও জর্জ বুশ সম্পূর্ণ বিপরীত। পরবর্তী ব্যক্তিদ্বয় ফিলিস্তিনীদের অত ছাড় দিতে রাজী নহেন।

এদিকে গাজা উপত্যকায় হামাস যোদ্ধাদল ১৯৪৮ সালে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলে বিশেষভাবে ইসরাইলে এবং পশ্চিম তীর ও গাজা অঞ্চলের ইহুদী বসতিগুলিতে আত্মঘাতি বোমা হামলা এবং অবিরাম মর্টার হামলা চালাইতে থাকে। মূল ইসরাইলে আত্মঘাতি বোমা হামলায় বহু ইহুদি প্রাণ হারায়। দুই দিন ধরিয়া আরাফাতের দূতগণ গাজা সিটি ও পশ্চিম তীরের মধ্যে যাওয়া আশা করিতে থাকে। ইসরাইলীরা আরাফাতকে তাঁহার পশ্চিম তীরের দীনহীন অফিস গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের

মুখে আরাফাত বোমা বন্ধ করিবার জন্য হামাস নেতাদের আহ্বান জানান। তিনি হামাস নেতা শেখ আহমদ ইয়াসিনের শ্বরণাপন্ন হন এবং সমঝোতা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক চলাকালে আরাফাতের পুলিশ গাজা সিটিতে হামাস নেতাদের গ্রেফতার ও তাহাদের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যাহোক, শেখ ইয়াছিনের আহ্বানে হামাস যোদ্ধারা ইসরাইলে হামলা বন্ধ করে। তবে এই ঘটনা একজন সমঝোতাকারী হিসাবে আরাফাতের সুনাম বৃদ্ধি করে। ইসরাইলী বন্ধুরা আরাফাতকে হুমকি দিতে থাকে, হামলা বন্ধ করিতে না পারিলে পশ্চিমা শক্তিবর্গ তাঁহার কর্তৃত্ব মানিবে না। কিন্তু ধরপাকড়ের জন্য হামাস নেতৃত্ব তাঁহার অফিস ভাঙ্গচুর করে। প্রতিবাদে হাজার হাজার ফাতাহ্ সমর্থকগণ তাঁহার পক্ষে রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই যুদ্ধ বিরতির ফাঁকে ফিলিস্তিনীরা দাবী করে ইসরাইল পুনরায় আলোচনা টেবিলে বসুক, ফিলিস্তিনী হত্যা বন্ধ করুক এবং ফিলিস্তিনী চাকুরীজীবীদের জন্য ইসরাইলের গেট খুলিয়া দিক। (Newsweek Do)।

প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাত সুদীর্ঘ আরব ইসরাইলী সংঘাতে দীর্ঘস্থায়ী এক ব্যক্তিত্ব। যেকোন মৌলিক আলোচনায় তিনি মধ্যভাগে আসিয়া পড়েন। তাঁহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য বিল ক্লিনটন প্রশাসনের সমালোচনা করা হয়। আবার দুরত্ব সৃষ্টি করিবার জন্য বুশ প্রশাসনের সমালোচনা করা হয়। প্রেসিডেন্ট ও বুদ্ধিজীবীগণ পরিকল্পনা মানিয়া লইবার জন্য এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য তাঁহাকে সর্বদা অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন, যেন এই একজন ব্যক্তির বক্তব্যের দ্বারা ৫০ বছরের বিবাদ সিম্বাদ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু এতদিনে বুঝা গেল এই এক ব্যক্তির দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপন সম্ভব নহে। (Newsweek April-9, 2001)। এই সেইদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলীদের মধ্যে ক্রমাগত মধ্যস্থতাকারী ডেনিস রস (Dennis Ross) শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ইয়াছির আরাফাতের দ্বারা এই সমস্যার ইতি টানা সম্ভব নহে। তিনি বলেন, "তাঁহার নিকট কাঙ্খিত এমন কিছু রহিয়াছে যাহা তিনি করিতে অপারগ। ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি জেরুজালেম বিভক্তি মানিয়া লইতে অপারগ। ক্যাম্প ডেভিড এ যাহা আরাফাত করিতে পারেন নাই এবং এখনও করিতে পারেন না তাহা হইল পি. এল. ও-র প্রতিষ্ঠাকালীন দাবী—১৯৪৮ সালে ইসরাইল কর্তৃক উৎখাতকৃত ফিলিস্তিনীদের তাহাদের স্বস্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া হউক।" (ঐ)। ১৯৪০ সালের শুরুতে আরম্ভ হইয়া ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনী বিষয় একটি, এবং তাহা হইল আরব বিশ্বে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা প্রায় ১০ লক্ষ ফিলিস্তিনীদের তাহাদের উদ্বাস্তু জীবন হইতে ফিরিয়া আসা। পি. এল. ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই ফিলিস্তিনী ইস্যুটি তুলিয়া ধরিবার জন্য এবং আরাফাত হইলেন উদ্বাস্তুদের নেতা। ইহা অনেকটা তুলনীয় হয়—সবটা নিব, না হয় কিছুই নিব না। কিন্তু ইহুদী নীতি হইল যতটুকু পাই তাহাই লইব এবং আরও চাইব। ১৯৮০ সালে ফিলিস্তিনীদের প্রায় কিছুই না পাইবার উপক্রম হয়। ইসরাইলের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিবৃদ্ধি এবং ইহার দ্বারা অন্যান্য আরবদেশের সহিত তাহার সংঘর্ষের ফলে পি. এল. ওর জন্য প্রায় সব দ্বারই রুদ্ধ হইয়ে যায়। অতঃপর ১৯৮৭ সালে পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকার 'ইন্তিফাদা' আন্দোলনের ফলে সবকিছু পরিবর্তন হইয়া যায়। ইসরাইলী

অধিকৃত এলাকায় তাহারা স্বাধীনতা দাবী করিতে থাকে এবং ইহার দ্বারা তাহারা বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অতঃপর আরাফাত এবং তাঁহার পি. এল. ও ফিলিস্তিনীদিগকে অধিকৃত অঞ্চলে দ্বিতীয় সারির নাগরিক হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট তুলিয়া ধরেন এবং এই প্রথম বারের মত তিনি অসলোতে (নরওয়ের রাজধানী) ইসরাইলের সহিত আলোচনায় বসেন। তবে তিনি তাঁহার পুরাতন অসম্ভব দাবী (উদ্বাস্তুদের প্রতাবর্ত্তন) হইতে সরিয়া আসিয়া একটি সম্ভাব্য দাবীতে (ইহুদীদিগকে অধিকৃত অঞ্চল হইতে বাহির করা) আসিতে পারিতেন। এই দাবীর পরিবর্তনের দ্বারা তিনি তাঁহার লোকদিগকে একটি রাষ্ট্র দিতে পারিতেন। জাতীয় স্বাধীনতা দিতে পারিতেন এবং একটি স্বাভাবিক অবস্থার শুরু করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি পারেন নাই। একজন আরব ব্যাখাকার, ফুয়াদ আজমী ব্যাখ্যা করেন, "আরাফাত তাঁহার লোকদিগকে বলিতে পারেন নাই যে আমি তোমাদিগকে শান্তি আনিয়া দিতে পারি তবে ফিলিস্তিনের স্বপ্ন ত্যাগ করিতে হইবে। জাফফা এবং হাইফাও ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি বেদনাদায়ক সমঝোতার চাইতে সাহসী প্রতিরোধের ভাষাই ব্যবহার করিলেন।" (Newsweek, April, 9, 2001)।

তবে প্রতিরোধের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরাফাতের চাইতে বরং হামাস আরও অধিক শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। শত শত আত্মঘাতী হামলাকারী এবং নৃশংস যোদ্ধা তাহাদের তালিকায় থাকিবার ফলে পশ্চিমা জগৎ বরং হামাসকেই অধিক শক্তিশালী মনে করে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে ক্ষমতার অংশীদার হওয়ায় আরাফাতের ফাতাহ্ যোদ্ধাদের চাইতে হামাসকে ইহুদীরা অধিক সমিহ করে। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিবর্গের চাপে পড়িয়া আরাফাতকে হামাসের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা লইতে হয় যাহাকে ফিলিস্তিনীরা বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া সমালোচনা করে। এইভাবে একদিকে হামাস অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের চাপে পড়িয়া ইয়াছির আরাফাতের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হইয়া পড়ে। গত সপ্তাহে (৮ই ডিসেম্বর ০১) হামাস আত্মঘাতি হামলাকারীরা জেরুজালেম ও হাইফায় ১২ ঘণ্টায় ২৭ জন ইহুদীকে হত্যা করে। মার্কিন ও ইসরাইলের কঠোর চাপে পড়িয়া ফিলিস্তিনী নিরাপত্তা রক্ষিরা পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় অভিযান চালাইয়া ২০ জন হামাস যোদ্ধাকে গ্রেফতার করে। কিন্তু ইহুদী ও মার্কিনীরা ইহাকে নিছক একটি লোক দেখানো ঘটনা বলিয়া নাকচ করিয়া দেয় (Newsweek, Dec, 17, 2001)। ফলশ্রুতিতে ইসরাইল ওয়াশিংটনের অনুমোদন লইয়া গাজা শহরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করিয়া হত্যাযজ্ঞ চালায়।

তবে এ্যরিয়েল শ্যারন এবং জর্জ বুশ উভয়ে মনে করেন আরাফাতের সহিত শান্তি আলোচনা করিয়া লাভ নাই। অতএব, তাঁহারা মাহমুদ আব্বাস (আবু মাজন)কে ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্য চাপ দেন। ইয়াসির আরাফাতের বহুদিনের সঙ্গী যোদ্ধা মাহমুদ আব্বাস ইদানিং মার্কিন লাবির সহিত অতি ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত। মার্কিন লবির চাপের মুখে ইয়াছির আরাফাত মাহমুদ আব্বাসকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দান করেন। ইয়াছির আরাফাতকে রাজী করাইবার ব্যাপারে আরও গভীর ভূমিকা পালন করেন

মিশরীয় গোয়েন্দা প্রধান ওমর সোলেমান। ইসরাইলের সহিত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শুধু আব্বাস নহে, বরং আরেক গোয়েন্দা কর্মকর্তা মোহাম্মদ দাহলাতিন, নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকর্তাকেও তিনি নিয়োগ দেন। আব্বাস পুরাপুরি পশ্চিমা জীবনযাপন করেন। তিনি স্যুট পরিধান করেন এবং ঠোঁটের উপর সামান্য চুল ছাড়া তিনি সম্পূর্ণ ক্লিন-শেভ্‌ড এক ভদ্রলোক। ২০০৩ সালের মে মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবার পর নূতন মন্ত্রিসভার নামের তালিকা লইয়া আরাফাতের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে অনেক শক্ত মন্দ কথাও হয়। আরাফাতের সমালোচনাকারীদের তালিকা হইতে বাদ দিবার আদেশ করেন তিনি। তবে আরাফাতের প্রবল চাপের মুখে আব্বাস ধৈর্য ধারণ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ পত্র দিয়া বলেন, তিনি পদ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। আব্বাসের মন্ত্রিসভার সদস্য নাবিল শাথ বলেন, "ইহা ছিল একটি শক্ত প্রস্তাবনা।"

যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মনে করে বিগত ৩৪ বৎসরের মধ্যে আব্বাসই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আরাফাতের ক্ষমতার বাধা অতিক্রম করিতে পারেন। বিগত ২ বৎসর ধরিয়া ফিলিস্তিন-ইসরাইলের যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ চলিতেছে তাহাকে তিনি সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার নম্র ভদ্র আচরণের সামনে আরাফাত নতি স্বীকার করেন। তবুও অনেক ফিলিস্তিনী সন্দেহ পোষণ করেন, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট এবং পি.এল.ও. চেয়ারম্যান হিসাবে আরাফাতকে কতটুকু সামাল দেওয়া যাইবে। (Newsweek, May, 5, 2003)। আব্বাসের সামনে বিরাট দায়িত্ব; একদিকে তাঁহার লোকদের কষ্ট লাঘব করা, সশস্ত্র এবং জনপ্রিয় ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ লওয়া, অপরদিকে শ্যেন দৃষ্টি সম্পন্ন ইহুদী সরকারের সহিত শান্তি বৈঠক করা। ইহার মধ্যে আবার আরাফাত নিশ্চিত হইতে চান যে তিনিই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন রহিয়াছে। তাহাতেও সমস্যা আছে। বিরুদ্ধ পক্ষ মনে করিবে তিনি মার্কিনীদের হাতের পুতুল। (Newsweek, May 5, 2003)।

১৯৫০ এর দশকে উভয়ে মিলিয়া ফাতাহ্ গ্রুপ (পি. এল. ও-র সশস্ত্র গ্রুপ) গঠন করিলেও আব্বাস ও আরাফাতের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল রহিয়াছে। আব্বাস সর্বদা পিছনে থাকিয়া ফিলিস্তিনী প্রতিষ্ঠানসমূহ গঠন করেন এবং পরবর্তীকালে পি. এল. ও-র আন্তর্জাতিক বিভাগের প্রধান হন। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে আরাফাত তাঁহার খাপে পিস্তল পুরিয়া লইতে চান, অপরদিকে আব্বাস নীরবে ইসরাইলী বামপন্থীদের খোঁজ করেন কথা বলিবার জন্য। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় আরাফাত যখন সাদ্দাম হোসেনের পক্ষাবলম্বন করেন তখন আব্বাস দৌড়ান সউদী আরবের দিকে ভাঙ্গা সম্পর্কের জোড়া দিবার জন্য।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এ্যরিয়েল শ্যারনের কথা, তিনি অগ্নি গোলক মাথায় লইয়া আলোচনা টেবিলে বসিতে নারাজ। অপর দিকে ফিলিস্তিনীদেরও একই কথা— ইসরাইল একদিকে ফিলিস্তিনীদের হত্যা করিবে অপর দিকে শান্তির কথা বলিবে তাহা হয় না। প্রধানমন্ত্রী মাহমূদ আব্বাস মার্কিন-ইসরাইলী মহল ও ফিলিস্তিনীদের মধ্যে যাওয়া আসা করিলেও স্থায়ী শান্তির পথ তাঁহার নিকট বহুদূর। ইহার মধ্যে বিগত সপ্তাহে (২৬ শে মার্চ

২০০৪) ইসরাইলী ক্ষেপনাস্ত্রের আঘাতে হামাস এর অধ্যাত্মিক নেতা শেখ আহমদ ইয়াছিনকে ইসরাইলীরা হত্যা করে। তাঁহার প্রতি শোক জ্ঞাপনের জন্য লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনী রাস্তায় নামিয়া আসে এবং প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করে। তাৎক্ষণিকভাবে আত্মঘাতি বোমা হামলার দ্বারা তাহারা ১০ জন ইহুদী হত্যা করে। তবে প্রধানমন্ত্রী শ্যারন আরও বৃহৎ আকারের পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন এবং তাহা হইল গাজা ভূখণ্ড হইতে একতরফাভাবে ইহুদী সৈন্য ও বসতিকারীদের সরাইয়া লওয়া।

গাজা হইতে সৈন্য ও বসতিকারী সরাইয়া আনা প্রধানমন্ত্রী শ্যারনের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত এবং একটি বিপ্লবাত্মক যুদ্ধ কৌশল। মাত্র এক বৎসর পূর্বে শ্যারনের লিকুদ পার্টি নির্বাচনী চাল হিসাবে লেবার পার্টি কর্তৃক গাজা হইতে সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিল। কেন এই নীতি পরিবর্তন? কারণ একটিই, যাহা শ্যারন উপলব্ধি করেন, এবং তাহা হইল অত্র এলাকার ৭৫০০ বসতি স্থাপনকারীদের রক্ষার জন্য সরকারকে ২০০০ হাজার সৈন্য এবং দশ লক্ষাধিক ডলারেরও অধিক বাৎসরিক ব্যয় করিতে হয়। তাহাছাড়া এই বিপুল অর্থ-সম্পদ পশ্চিম তীরের লোকদের জন্য খরচ করা আরও অধিকতর লাভের কাজ। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনকারীদের একজন জিওফ্রি আরসন (Geoffrey Arson) বলেন, "ইহা তিনি (দখলের) সমস্যা নিরসনের জন্য করিতেছেন না বরং তিনি তাঁহার অবস্থান সুসংহত করিবার জন্যই করিতেছেন। (Newsweek, April 5, 2004)। শ্যারন মিশরীয় গোয়েন্দা প্রধান ওমর সোলেমানের সঙ্গে চুক্তি করেন, যাহাতে তাহারা ফিলিস্তিনী নিরাপত্তা রক্ষীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করেন এবং এই রক্ষীবাহিনী গোলযোগপূর্ণ মিশরীয়-গাজা সীমান্ত এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে। শ্যারন আরও পরিকল্পনা করেন, ইহুদীদের ফেলিয়া আসা ঘরবাড়ী তিনি ফিলিস্তিনীদের ব্যবহার করিতে দিবেন না। এইগুলি হয়ত এইভাবেই খালি থাকিবে অথবা বোমা মারিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে। তবে নিউজউইক ভাষ্যকার যশুয়া হ্যামারের (Goshua Hammer) মতে, ইসরাইল যেভাবেই গাজা হইতে প্রত্যাবর্তন করুক না কেন ইহা হইবে ফিলিস্তিনী গোলাবর্ষণের মুখেই একটি পশ্চাদপসারণ, এবং শেখ ইয়াছিনের জন্য একটি মরণোত্তর বিজয়। (Newsweek, Do)।

এদিকে পশ্চিম তীরের রামাল্লায় তাঁহার সদর দফতরে ইয়াছির আরাফাত অনেকটা বন্দি জীবন যাপন করেন। এইদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ প্রণীত মধ্যপ্রাচ্য শান্তির 'রোডম্যাপ' প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাত তাঁহার রামাল্লা সদর দফতরে অনেকটা গৃহবন্দি। রামাল্লায় অবস্থিত তাঁহার সদর দফতর, যাহা 'মোকাতায়ন' নামেও পরিচিত, ধ্বংশোন্মুখ অবস্থায় দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার ক্ষমতাও অনুরূপ ধ্বংসোন্মুখ। ইসরাইলী ট্যাংক ও বুলডোজার দ্বারা তিনবার ধ্বংসকৃত ইহার আঙ্গিনা বিগত শতাব্দীর ব্রিটিশ অফিসারদের দ্বারা এবং পরবর্তীতে ইসরাইলী সেনাধ্যক্ষদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ভাঙ্গা ভবনসমূহ এবং মোচড়ানো দুমড়ানো গাড়ীসহ ভবনটিকে দেখিতে এক ভাগাড়ের মতই দেখায়। তাঁহার ১৭জন আধুনিক প্রহরীদল পাশ্ববর্তী একটি ভবনে অবস্থান করে যাহার বহির্দেয়াল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাঁহার বাবুর্চি দল এবং রক্ষণাবেক্ষণকারী ২০

জনের একটি দল একই কক্ষে অবস্থান করে, কারণ তাহাদের আগেকার ভবনটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে।

ইয়াছির আরাফাত অসুস্থ ঃ বৃহস্পতিবারের (২৮ ডিসেম্বর ২০০৪) অধিকাংশ সময় পর্যন্ত ইয়াছির আরাফাত ভাবিতেও পারেন নাই যে তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য তাঁহার পশ্চিম তীরের সদর দফতর ছাড়িয়া দেশের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইবে। আগের দিন জ্ঞান হারাইলেও তিনি কিছুই মুখে দিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার সেবকদিগকে জানাইয়াছিলেন, তিনি 'মোকাতা' ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে চান না। বছর খানেক পূর্বে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভোগিবার মত অত খারাপ অবস্থাও তাঁহার বর্তমানে হয় নাই। তবুও তিনি রামাল্লায় তাঁহার ভগ্নপ্রায় সদর দফতর ত্যাগ করিতে চান না। কারণ ইহুদীরা তাঁহার প্রত্যাবর্তনের গ্যারান্টি দেয় নাই। অপরাহ্নে অবস্থা খারাপের দিকে যায় যখন জর্দানী, তিউনিসিয়ান ও ফিলিস্তিনী ডাক্তারদের সহিত মিশরীয় ডাক্তারদের একটি দলও যোগ দেয়। রক্ত পরীক্ষার পর কোন কোন ডাক্তার এই ফিলিস্তিনী মুক্তি আন্দোলনের নেতার ব্লাড ক্যান্সার বা লিকুমিয়া রোগ বলিয়া মত দেন। তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য প্রেরণের মত পোষণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে এ্যারিয়েল শ্যারনও তাঁহার স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার নিশ্চয়তা দেন। বিশ্বে দীর্ঘতম স্বাধীনতা আন্দোলনকারী ইয়াছির আরাফাতকে শেষ পর্যন্ত প্যারিসের নিকটবর্ত্তী একটি সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। তাঁহার শুভাকাংখী ডাক্তারগণ তাঁহাকে অতঃপর দীর্ঘদিন বিশ্রামে থাকিবার পরামর্শ দেন। ইহাতে বুঝা যায় দীর্ঘ ৩৬ বৎসর মুক্তি আন্দোলনকারী আরাফাত তাঁহার স্বপ্ন একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দেখিয়া যাইতে পারিবেন না। তবে তাঁহার উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কেউ কেউ মন্তব্য করেন, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর না হইয়া বরং কট্টর ইসলামপন্থী হামাস হয়ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিতে পারে (Newsweek, January 3, 2005)।

ইসরাইল উহার নিজস্ব নীতি লইয়া অগ্রসর হয়। প্রধানমন্ত্রী শ্যারন আরাফাতের সহিত আলোচনায় বসিতে দীর্ঘদিন অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে হয়ত অন্যদের সহিত আলোচনায় বসিবার প্রস্তাব আসিতে পারে। তাই তিনি সেই দিকে না যাইয়া বরং গাজা হইতে একতরফা প্রত্যাহারে তাঁহার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ তাঁহার দল লিকুদ পার্টি বিরোধিতা করিলেও তিনি জাতীয় সংসদে পরিকল্পনাটি পাশ করাইয়া লন।

এইদিকে ফরাসী ডাক্তারগণ আরাফাতের লিকুমিয়া রোগ হয় নাই বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বরং তাঁহারা ইহাকে কলন ক্যান্সার (Colon Cancer) বলিয়া সনাক্ত করেন। তিনি বাঁচিয়া গেলে, ইসরাইল মনে করে, অন্তত একটি সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা হইল, আরাফাত জেরুজালেমের মসজিদুল আকসায় তাঁহার দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসরাইল তাহাতে সম্মতি প্রদান করে নাই। (Newsweek, Do)।

ইয়াছির আরাফাতের অনেক সুযোগ্য উত্তরসূরী থাকিলেও তিনি কাহাকেও মনোনীত করিয়া যান নাই। পি. এল. ও-র অতি প্রবীন নেতা মাহমুদ আব্বাস এবং আহমদ কোরেই সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী হইতে পারেন। কিন্তু ইহাদের কেউই ফিলিস্তিনীদের নিকট জনপ্রিয়

নহেন এবং পশ্চিম তীর ও গাজার অসংখ্য নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাহাদের কোন অনুগামী নাই। অনেকে আশংকা করেন নিরাপত্তা রক্ষীদের মধ্যেও সংঘর্ষ বাধিয়া যাইতে পারে। তবে ইহাও ঠিক তিনি এক গভীর ক্ষমতার শূন্যতা রাখিয়া গেলেন।

ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে আবার হামাস সমস্যা। এই কট্টরপন্থী দলটি ইসরাইলকে হটাইয়া ফিলিস্তিনে ইসলামী সরকার গঠন করিতে চায়। বিগত চারি-পাঁচ বৎসরের ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘর্ষে এবং বিশেষতঃ আরাফাতের প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে দলটি গাজায় ও পশ্চিম তীরে বেশ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই গ্রুপটির মন্ত্রিপরিষদে বা সংসদে কোন সদস্য নাই। কেউ কেউ আশংকা করেন আরাফাতের অবর্ত্তমানে দলটি গাজায় জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করিয়া লইতে পারে।

ইয়াছির আরাফাতের ইন্তেকাল ঃ ১৮ই নভেম্বর, ২০০৪ বৃহস্পতিবার সোবহে সাদেকের সময় ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট, ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার চেয়ারম্যান ইয়াছির আরাফাত ইন্তেকাল করেন। ইন্না হিল্লাহে... রাজেউন। অনুসারীদের নিকট তাঁহার পরিচয় ছিল আবু আম্মার। ২৬ বৎসরের মুক্তি সংগ্রামী কাফিয়া আবৃত্ত যোদ্ধা রাজা ৭৫ বৎসর বয়সে প্যারিসের এক সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ফিলিস্তিনীদের তিনি যাযাবর জীবন হইতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দ্বারপ্রান্তে আনয়ন করেন। ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব আত্মপ্রত্যয়ী আরাফাত নিজেকে একজন গেরিলা নেতা হইতে নোবেল পুরষ্কার বিজয়ীতে রূপান্তরিত করেন। তাহা সত্ত্বেও জীবনের শেষ বৎসরগুলি তিনি অতিবাহিত করেন দীনহীনভাবে, বিশ্বনেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এবং রামাল্লায় অবস্থিত তাঁহার সদর দফতরে বন্দি হিসাবে। চারি বৎসরের সংঘাত ফিলিস্তিনী শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তাহাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করিয়া দেয় এবং তাহাদের ৩০০০-এর অধিক লোককে হত্যা করে। (Newsweek, Nov 22, 2004)। তাঁহার অনেক ঘনিষ্ঠজন তাঁহার বিবেচনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

তাহা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ সাধারণ ফিলিস্তিনী তাঁহাকে সম্মান করে তাহাদের স্বদেশ ভূমির প্রত্যাশার মূর্তপ্রতীক হিসাবে। আবু আম্মারের উত্থানের পূর্বে স্বদেশহারা এইসব লোকজন ব্যবহৃত হইত আরব-ইসরাইলী সংঘাতের চালের গুটি হিসাবে। অতঃপর আরাফাত মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া থাকা এইসব পোড় খাওয়া উদ্বাস্তুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দাবী উত্থাপন করেন। বেঁটে, টাক মাথা, শক্ত চোয়াল এবং প্রায় চিবুকহীন ও ক্ষমতাহীন দুইটি হাত লইয়া ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (P.L.O) চেয়ারম্যান আরাফাত একজন চিত্তাকর্ষণকারী ব্যক্তিত্ব। কিন্তু তিনি তাঁহার শারীরিক দুর্বলতাকে আরও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করেন। তাঁহার সাদাসিদা জীবন যাপন একজন তাপসের ন্যায় তাঁহার মর্যাদাকে উন্নত করে, যিনি আত্মগর্বের ব্যাপারে উদাসিন এবং শুধু জাতিগঠনের ন্যায় একক এক চিন্তায় মগ্ন। (Newsweek, Nov 22, 2004)।

চেয়ারম্যান আরাফাত বিদেশী ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন লক্ষ লক্ষ ডলার, যাহা শুধু তাঁহার প্রধান হিসাব কর্মকর্তাই জানেন; খরচ পাঠান প্যারিসে তাঁহার স্ত্রী সুহা ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যার জন্য। খরচ পাঠান আল-আক্সা মার্টিয়ার্স ব্রিগেডের জন্য, অনাথ ও

বিধবাদের জন্য। তাঁহার গোপন তহবিল দিয়াই চলে পি. এল. ও. গেরিলা বাহিনী আল-ফাতাহ্। অথচ তিনি নিজের আবাসের জন্য নেন নাই কোন বিলাসবহুল অট্টালিকা বা কোন ছুটিছাটা। আজীবন একজন ভ্রাম্যমান মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ছিল কয়েকটি ফটো, একটি পিস্তল। তাঁহার একমাত্র আসক্তির মধ্যে, তাঁহার ব্যক্তিগত সহচরের মতে, ছিল তাঁহার টেবিলের ডেস্কে রাখা এক কৌটা মধু। তাঁহার বাঁচিবার কৌশল ছিল অনেকটা অস্বাভাবিক। বছরের পর বছর তিনি বেশ কিছু আততায়ীর আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া যান; তাঁহার নিজের হিসাবে বিগত ১০ বছরে প্রায় ৫০ বার। ইসরাইলের গুপ্ত সংস্থা মোসাদ (Mossad) বিভিন্ন মহাদেশে তাঁহাকে হত্যার জন্য খুঁজিয়া বেড়ায়। ১৯৮২ সালে এক ইসরাইলী সামরিক গুপ্ত ঘাতক তাঁহার মস্তকে গুলি করিলে তাহা তাঁহার চুল স্পর্শ করিয়া যায়। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ওয়াদা করিয়াছিলেন আরাফাতকে হত্যা করিবেন না বলিয়া (বিশ বৎসর পর শ্যারন আক্ষেপ করেন, হত্যার সুযোগ পাইয়াও তিনি আরাফাতকে হত্যা করেন নাই বলিয়া।) লিবিয়ার মরুভূমিতে চেয়ারম্যান এক বিমান দুর্ঘটনা হইতে বাঁচিয়া যান, যাহাতে তাঁহার পাইলট মারা যান এবং তাঁহার স্বয়ং রক্তক্ষরণ হইতে থাকে মরুভূমির বালিতে ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত। তিনি তাহার ভাগ্য লইয়া ঠাট্টা করেন, অবচেতন মনে তিনি সমাগত বিপদ টের পান। তাঁহার রাজনৈতিক সচেতনতাও কম প্রখর ছিল না। তিনি তাঁহার প্রচ্ছন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রবলভাবে প্রতিহত করেন এবং যাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করে তাহাদের নিকট হইতেই তিনি শক্তি সঞ্চয় করেন। প্রধানমন্ত্রী শ্যারন তাঁহাকে "অপাংক্তেয়" ঘোষণা করেন, তাঁহার সদর দফতর বুলডোজার দিয়া গুঁড়াইয়া দেন, তাঁহার হেলিকপ্টারগুলি ধ্বংস করেন, তাঁহাকে ট্যাংক দ্বারা অবরোধ করিয়া রাখেন এবং তাঁহাকে হত্যা বা নির্বাসিত করিবার ঘোষণা দেন। এই সমস্ত হুমকি ফিলিস্তিনীদের তাহাদের নেতার প্রতি সমর্থনকে আরও উজ্জীবিত করে। (Newsweek, Do)।

ইয়াছির আরাফাত নিজেই তাঁহার আবিষ্কার। তিনি জেরুজালেমের সম্ভ্রান্ত হোসাইনী উপগোত্রে তাঁহার জন্ম বলিয়া দাবী করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই উপগোত্রের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় মাত্র। ১৯২৯ সালে কায়রোতে জন্মের পর তাঁহার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ আবদেল রহমান আবদেল রউফ আরাফাত আল কুদুয়া (al-Qudua) আল হুসাইনী। ৪ বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তাঁহার পিতা একজন কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। আরাফাতের কথায় কায়রো-উচ্চারণ তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত ফিলিস্তিনী হইতে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। ১৯৪৬ সালে, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ২ বৎসর পূর্বে তিনি ব্রিটিশ ও ইহুদীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য অস্ত্র আনা নেয়া করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি এবং তাঁহার ২০ জন সঙ্গি গোপনে ফাতাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। জর্দান নদীর পূর্ব তীরকে তাঁহারা ইসরাইলে গেরিলা আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করেন। আরব বিশ্বে আরাফাতের উদিয়মান খ্যাতি (ভিন্নমতে কুখ্যাতি) ১৯৬৯ সালে তাঁহাকে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার (PLO) চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করে।

তাঁহার উত্থানের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদী বিরোধী সহিংসতা প্রবল আকার ধারণ করে। অবশ্য ইহাতে কোন কোন আরব দেশ বিরক্তও হয়, যেমন ঃ ১৯৭০ সালে পি.এল.ও. একটি বিমান ছিনতাই করিলে জর্দানের বাদশাহ হোসাইন সংস্থাটিকে বহিষ্কার করেন। তাহারা অতঃপর লেবাননে তাহাদের কার্যপরিচালনা করে। ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিক গেমসে তাহারা ১১ ইসরাইলী ক্রীড়াবিদ হত্যা করে। এই সমস্ত নিষ্ঠুর কর্মকাণ্ডে কেউ কেউ বিরক্ত হইলেও ফিলিস্তিন সমস্যাটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি লাভে সক্ষম হয়। এই ঘটনার প্রায় ২ বৎসর পর ১৯৭৪ সালে সামরিক পিস্তল খাপে লইয়া ইয়াছির আরাফাত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হন। তিনি বলেন, "আমি একটি অলিভ বৃক্ষের শাখা ও একটি মুক্তিযোদ্ধার পিস্তল লইয়া আসিয়াছি। আমার হাত হইতে অলিভ বৃক্ষের শাখা পড়িতে দিবেন না," বলিয়া তিনি পিস্তলের বাঁট দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করেন। (Newsweek, Do)। ১৯৮২ সালে ইসরাইল লেবাননে পি.এল.ও ঘাটি আক্রমণ করিলে তিনি পি.এল.ও. যোদ্ধাদের লইয়া তিউনিসিয়ায় গমন করেন।

বাতাসের গতি পরিবর্তন হইলে ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলী নেতৃবৃন্দ গোপন বৈঠকে বসেন এবং ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালের অসলো শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ৫ বৎসরে 'ইন্তেফাদা' আন্দোলনের দ্বারা ইসরাইল উহার ব্যয় সাপেক্ষ অধিকৃত এলাকা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পি.এল.ও ও তাহাদের অসংখ্য সদস্যের বহিষ্কারের দ্বারা তাহাদের ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকৃতির বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। ফলশ্রুতিতে ইসরাইল পি.এল.ও.কে ফিলিস্তিনী জনগণের আইনানুগ প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রতিদানে আরাফাত বলেন, "পি.এল.ও. ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের অধিকার স্বীকার করে" এবং "ইসরাইল রাষ্ট্রের ধ্বংসের জন্য সন্ত্রাস, হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড এবং উহার উচ্ছেদের আগ্রহকে বিদায় জানায়।" এইসব প্রতিশ্রুতির জন্য ইয়াছির আরাফাত ১৯৯৪ সালে ইসরাইলের শিমন প্যারেজ ও আইজ্যাক রবিনের সাথে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। অতঃপর বিজয়ী বেশে তিনি গাজা প্রতাবর্তন করেন এবং ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষ (Palestine Authority) গঠন করেন। ১৯৯৬ সালে ফিলিস্তিনীরা তাঁহাকে শতকরা ৮৭ ভাগের বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে।

শীঘ্রই স্বপ্নভঙ্গ হয়। ২০০০ সালের জুলাই মাসে ওয়াশিংটনের নিকটবর্তী ক্যাম্প ডেভিডে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় আরাফাত ও প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক একত্রে মিলিত হন। প্রস্তাবিত শান্তিচুক্তিতে আরাফাতকে পশ্চিম তীরের ৯০ শতাংশ এলাকা, আরব অধ্যুষিত পূর্ব জেরুজালেমের কর্তৃত্ব এবং আল আকসা মসজিদ এলাকার মাউন্ট টেম্পলের সমান প্রশাসন ছাড়িয়া দিতে ইহুদ বারাক রাজী হন, বিনিময়ে কিছু এলাকায় ইহুদী বসতি স্থাপন চালু রাখিবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি ইয়াছির আরাফাতের দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন আরব দেশে ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা আরব উদ্বাস্তুদের ফিরাইয়া আনিতে রাজী হন নাই। (পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ : একশ আটানব্বই) ফলে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায়। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে পূনরায় ইন্তেফাদা আরম্ভ হয়। ভীত সন্ত্রস্ত ইসরাইলী সৈন্যরা শতাধিক পাথর নিক্ষেপকারী বালকদের ভুপাতিত করে এবং আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীরা

শতাধিক ইহুদীদের রাস্তাঘাট, হোটেল রেস্তোঁরায় হত্যা করে। অতঃপর ২০০১ সালে ক্ষমতারোহনকারী এ্যারিয়েল শ্যারন প্রেসিডেন্ট ইয়াছির আরাফাতকে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত রামাল্লায় তাঁহার সদর দফতরে বন্দি করিয়া রাখেন।

জীবনের শেষ দিনগুলি আরাফাত তাঁহার সদর দফতরে কাটান। তথায় দুইটি ভবন সংযুক্তকারী একটি পুল রহিয়াছে। পুলে জানালা রহিয়াছে। জানালার পাশে বসিলে পূরো পশ্চিম তীর এবং দূরে গাজা অঞ্চল অস্পষ্ট দেখা যায়। হিন্দুস্থানের আগ্রা দুর্গ হইতে দূরে সম্রাট শাহ্জাহানের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের তাজমহল দেখা যায়। প্রতিদিন সম্রাট এই দুর্গ হইতে তাজমহলের প্রতি তাকাইয়া থাকিতেন এবং বিগত দিনের সুখময় স্মৃতি রোমন্থন করিতেন। চেয়ারম্যান ইয়াছির আরাফাতও এই পুলের জানালায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন এবং ঘটনাবহুল জীবনের সফলতা ব্যর্থতা এবং সাধের অনাগত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের দিকে তাকাইয়া সময় কাটাইতেন।

চারি বৎসরের অস্থিরতা, সংঘাত সংঘর্ষের পর প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন একতরফাভাবে গাজা অঞ্চল হইতে সৈন্য প্রত্যাহার করেন এবং বসতিস্থাপনকারীদের ঐ অঞ্চল হইতে ফিরাইয়া আনেন, অবশ্য পশ্চিম তীরের যে অংশ পূর্ববর্ত্তী প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক পি.এল.ও.কে দিতে চাহিয়াছিলেন শান্তির বিনিময়ে সে এলাকায় এখন শ্যারনের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত হইয়াছে।

যাহাহোক, ইয়াছির আরাফাত তাঁহার লোকদিগকে গুলি ও রক্তপাতের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। পুরাপুরি সফলতা তিনি পান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নূতন দ্বার উন্মোচন করিবে কিনা তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

জেরুজালেমের হারাম শরীফে তাঁহাকে কবর দিবার আগ্রহ পূরণ হয় নাই। কারণ এ্যারিয়েল শ্যারনের বিরোধীতা। যা হোক প্রথমে কায়রোতে একটি জানাজা, অতঃপর রামাল্লায় তাঁহার সদর দফতরের প্রাঙ্গণে আরেকটি জানাজা শেষে সেইখানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ইয়াছির আরাফাত ক্ষমতা বলয় দুইভাগে ভাগ করিয়া তিনি উভয়ের শীর্ষনেতা ছিলেন। উহার একটি ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (Palestine Authority) এবং অপরটি পি.এল.ও। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্টের পদ ন্যস্ত হয় আইনানুগভাবে পার্লামেন্টের স্পীকার রাউহী ফাত্তাহ্ এর উপর। আইনতঃ ৬০ দিনের মধ্যে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার কথা। পরের পদ মন্ত্রিসভার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। ২০০৩ সালে মাহমুদ আব্বাস প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তেফা দিলে ইয়াছির আরাফাত আহমদ কোরেইকে (আবু আলা) প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত আহমদ কোরেই ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কাজ চালাইয়া নিবেন। ইহার পরের সংস্থা আইন পরিষদ (Legislative Council)। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত ৮৮ সদস্য বিশিষ্ট আরেকটি কাউন্সিল পি.এল.ও-র বাহিরের সংস্থাদের প্রতিনিধিত্ত্ব করে যথা হামাস, জিহাদ গ্রুপ ইত্যাদি।

ক্ষমতার অপর অংশ পি.এল.ও। ১৯৬৯ সালে ইয়াছির আরাফাত ইহার চেয়ারম্যান হন এবং আমৃত্যু এ পদে বহাল থাকেন। বর্তমানে ইহা অনেকগুলি সংস্থার সম্মিলিত

ইউনিয়ন। ইহাকে এমনভাবে সাজানো হইয়াছে যে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইলে ইহা যাহাতে ইসরাইল রাষ্ট্রের সাথে সহঅবস্থান করিতে পারে। আরাফাতের মৃত্যুর পর মাহমুদ আব্বাস সর্বসম্মতিক্রমে পি.এল.ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। তিনি ইসরাইলে জনপ্রিয় কিন্তু আরব সড়কগুলিতে নহে। **কার্যকরী কমিটি** (Executive Committee) ঃ মাহমুদ আব্বাস এখন ১৮ সদস্য বিশিষ্ট **কার্যকরী কমিটির** প্রধান। ইহার সদস্যগণ ন্যাশনাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত। ইহার কাজ হইল পি.এল.ও-র অধিনস্থ প্রায় এক ডজন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ঃ সেলিম জানূন পি.এল.ও-র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থার প্রধান। ইহার ৬৬৯ জন সদস্য অধিকাংশ ফিলিস্তিনী ভগ্নাংশগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

ফাতাহ্ ঃ আরাফাতের এই গ্রুপটি ১৯৬৯ সাল হইতে পি.এল.ও-কে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে। কট্টরপন্থী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারুক কাদ্দুমী এই ফাতাহ্ গ্রুপটিকে তিউনিসিয়া হইতে নিয়ন্ত্রণ করেন।

হামাস : ইহা একটি ইসলামী কট্টরপন্থী দল যাহা ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। ফিলিস্তিনীদের ৩০ ভাগ ইহার সমর্থক।

* * * * *

বিগত ৯ই জানুয়ারী ২০০৫ এর প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে মাহমুদ আব্বাস (ওরফে আবু মাজন) ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পি.এল.ও চেয়ারম্যান মাহমুদ আব্বাস ফাতাহ্ সমর্থক। আব্বাসের সামনে সমস্যার পাহাড়। একদিকে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা, ইসরাইলের সঙ্গে সহঅবস্থান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দর কষাকষি করা। অপরদিকে ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয় কট্টর ইসলামপন্থী হামাসদের নিয়ন্ত্রণ করা।

ফাতাহ্ গ্রুপের সাথে হামাস গ্রুপের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করিয়া প্রেসিডেন্ট বুশ-প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনে শান্তির রোডম্যাপ বাস্তবায়ন এক পর্বতসম সমস্যা। এদিকে ইয়াছির আরাফাত নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি প্রবেশ করিয়া মানুষের আস্থা বিনষ্ট করিয়াছে।

আরেক সমস্যা ইহুদী রাষ্ট্রটি। তাহারা অকাতরে বোমা মারিয়া ফিলিস্তিনীদের হত্যা করিতেছে। বিগত চারি বৎসরে ইন্তেফাদা আন্দোলনের সময় ১০০০ ইহুদী নিধনের বিনিময়ে ৩০০০ ফিলিস্তিনীকে তাহারা হত্যা করিয়াছে। এইসব কারণে হামাস ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত যুদ্ধ বিরতি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কেউ কেউ বলেন, হামাসকে ফিলিস্তিন প্রশাসনের ভাগ দিলে তাহারা সমঝোতায় আসিতে প্যারে। ফিলিস্তিন আইন পরিষদের একজন সদস্য, নাবিল আমর বলেন, ইহা নির্ভর করে ইসরাইলের আচরনের উপর। "যদি (প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন) ফিলিস্তিনীদের উপর আক্রমণ বন্ধ করেন তবে আবু মাজেন হামাসদিগকে একটি অস্ত্রবিরতিতে সম্মত করাইতে পারেন।" (Newsweek, Jan. 2005)।

বিগত সপ্তাহে (৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০০৬) অনুষ্ঠিত ফিলিস্তিন আইন পরিষদের নির্বাচনে কট্টর ইসলামীপন্থী হামাস দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। হামাস নেতা

ইসমাইল হানিয়া প্রধানমন্ত্রী নিয়োজিত হন। ১৩২ আসন বিশিষ্ট কাউন্সিলে হামাস লাভ করে ৭৪টি আসন। অপরদিকে তাহাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ্ লাভ করে ৪৫টি আসন। হামাসের এই বিজয় এবং ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রিত ফাতাহ এর পরাজয়ের কারণ খুঁজিতে যাইয়া বিশ্লেষকরা বলেন, বর্তমানে ফিলিস্তিনে বড় সমস্যা হইল আইন শৃংখলা ফিরাইয়া আনা। শান্তি স্থাপনে অক্ষম কোন পক্ষের সহিত শান্তির কথা বলিয়া লাভ নাই। আইন শৃংখলার অবনতির কারণ ইদানিং কালে হামাসের জয়লাভের পর ফাতাহ্ গেরিলাদের সহিত যে সংঘর্ষ বাধে অহর্নিশি তাহাই ফিলিস্তিনের জনজীবন বিষাইয়া তুলিয়াছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে হামাসের একজন যুগ্ম-প্রতিষ্ঠাতা, মুহাম্মদ জহুর নিউজউইকের সাংবাদিককে বলেন, জনগণ যে বিরক্তিকর পরিবেশে বসবাস করিতেছে তাহা হইতে মুক্তি পাইবে। বিষাক্ত পরিবেশ হইল, দুর্বল ও অকার্যকর কর্তৃপক্ষের মধ্যেই দুর্নীতি, যদ্দরুন তাহারা অন্যান্য অপরাধ দুরে থাকুক সামান্য নেশা প্রবণতা রোধ করিতেও অক্ষম (Newsweek, Feb 6, 2006)। যুক্তরাষ্ট্রের মতে মানুষ দুর্নীতি, নেশাগ্রস্ততা ও অপরাধ প্রবণতা হইতে মুক্তি চায়; কিন্তু সমস্যা হইল হামাসের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হইল ইসরাইলের ধ্বংসসাধন, এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দলটিকে একটি সন্ত্রাসী দল হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে।

প্রেসিডেন্ট আব্বাসের সামনে বড় সমস্যা হইল, ফিলিস্তিনের অভ্যন্তরিন কোন্দল মিটাইয়া বিদেশী অর্থ সাহায্য আনিতে না পারিলে রোডম্যাপের দ্বারা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা লাভ করা বিঘ্নিত হইবে এবং অভ্যন্তরিণ কোন্দল-সংঘাত বাড়িয়া যাইবে। রোডম্যাপের মধ্যে রহিয়াছে ফিলিস্তিন কর্তৃক ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে পূর্ণ-অস্ত্রবিরতি কার্যকর করা। রোড ম্যাপে আরও রহিয়াছে গাজা ভূখণ্ড হইতে ইসরাইলী সৈন্য ও বসতিস্থাপনকারীদের পশ্চিম তীরে প্রত্যাবর্তন; গাজা, পশ্চিম তীর লইয়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং পূর্ব জেরুজালেম ফিলিস্তিনীদের ফেরৎ দেওয়া। কিন্তু হামাস কিছুতেই এই প্রস্তাবে রাজী নহে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ডে নজিরবিহীন উপদলীয় সংঘাত বাধিয়া যায়। প্রেসিডেন্ট ইহার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা বাহিনীকে চরম সতর্কতাবস্থায় থাকিবার নির্দেশ দেন। এইদিকে ১৫ জুন গাজায় ইসরাইলী বিমান হামলায় ৯জন নিহত ও ১০জন আহত হইয়াছে। ফাতাহ্ ও হামাস দলের মধ্যেকার উত্তেজনা লাঘবে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া এক সভায় মিলিত হন।

ইসরাইল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। অতঃপর এই বিষয়টির উপর ফিলিস্তিনে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন প্রেসিডেন্ট আব্বাস। হানিয়ার বক্তব্য হইল গণভোটের দ্বারা ফিলিস্তিনীদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হইবে যাহা কিছুতেই কাম্য নহে। শীর্ষস্থানীয় হামাস নেতা মুসির আল-মাসরি প্রস্তাবিত গণভোটকে হামাস সরকারের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান বলিয়া উল্লেখ করেন। আগামী ২৬শে জুলাই গণভোট অনুষ্ঠিত হইবে। গণভোটের বিষয় হইল ঃ ফিলিস্তিনে জাতীয় ঐকমত্যের একটি সরকার এবং ১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিনের দখল করা ভূমিসহ ইসরাইলের পাশাপাশি একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন।

গণভোটকে কেন্দ্র করিয়া ফাতাহ্ ও হামাসের মধ্যে রামাল্লায় সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ফাতাহ্ দলের আল-আকসা মার্টার্স ব্রিগেডের বন্দুকধারীরা পার্লামেন্ট ভবনের জানালায় গুলি ছোড়ে এবং দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া আসবাবপত্র ভাংচুর করে ও ফাইলপত্রে আগুন ধরাইয়া দেয়। এই সমস্ত ঘটনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে আতংক ছড়াইয়া দেয়। গত কয়েকদিনের সহিংসতায় প্রায় ২০ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়।

কট্টরপন্থী হামাস ফিলিস্তিনের ক্ষমতায় আসিবার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীর ইউনিয়ন ফিলিস্তিনকে দেওয়া সমস্ত আর্থিক অনুদান বন্ধ করিয়া দেয়। কারণ এই দলটি ইসরাইলের অস্তিত্ব স্বীকার করে না এবং অস্ত্রের জোরে ইহুদীদের উৎখাতে বিশ্বাসী। অনুদান বন্ধের ফলে ফিলিস্তিনের জনজীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠে। গণভোটের মাধ্যমে জনগণ ইসরাইলের সহিত সহ অবস্থানের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করিলে হামাসের ইসরাইল বিরোধী নীতি দুর্বল হইয়া যাইবে। আব্বাসের এই পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সমর্থন জানাইয়াছে। এইদিকে জনগণের ভোগান্তি লক্ষ্য করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন হামাসকে বাদ দিয়া সরাসরি ফিলিস্তিনীদের আর্থিক সাহায্য করিবার প্রস্তাব লইয়াছে।

এ্যারিয়েল ক্যারণ অসুস্থ :

এইদিকে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট এবং ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস গত ২২ শে জুন ২০০৬ জর্দানে বৈঠক করেন। উল্লেখ্য, গাজা এলাকা হইতে ইসরাইলী সৈন্য ও বসতিস্থাপনকারীদের সরাইয়া আনিবার পরপরই প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার মস্তিষ্কে তড়িৎ অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা বাঁচিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁহার পূনঃস্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবার ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাই তাঁহার স্থলে লিকুদ পার্টির এহুদ ওলমার্টকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। এইদিকে জর্দানের বাদশাহ্ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর আমন্ত্রণে ইসরাইল-ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি লইয়া বৈঠক করিতে সেইখানে আসেন দুই নেতা। জর্দানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ পেট্রায় নোবেল বিজয়ীদের বিশ্ব ফোরামের অনুষ্ঠানের সময় একইসঙ্গে এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। ২০০৫ সালে জুন মাসের বৈঠকের এক বছর পর এই প্রথম বৈঠক করিলেন দুই নেতা। অনুষ্ঠানস্থলের সেই হোটেলে ২৫ জন নোবেল বিজয়ী এবং আরও ৩০জন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বও অবস্থান করেন।

ফিলিস্তিন প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র নাবিল আবু রুদেইনা বলেন, ইহা কোন আনুষ্ঠানিক বৈঠক নহে। উভয় নেতা কোন একান্ত আলাপচারিতাও করেন নাই। তবে এই বৈঠক ভবিষ্যৎ ইসরাইল-ফিলিস্তিন বৈঠকের দ্বার উন্মোচন করিবে, এবং আশা করা যায় রোডম্যাপের ব্যাপারে দুইপক্ষ পূনঃবৈঠকে মিলিত হইবেন। ফিলিস্তিনের হামাস সরকার এখনও ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় নাই। বৈঠকে উপস্থিত ইসরাইলী উপ-প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ বলেন, যোগাযোগ আরও সামনে অগ্রসর হইলে এইগুলি ইতিবাচক ও ফলদায়ক হইবে।

এ দিকে মাহমুদ আব্বাস নোবেল লরেট এলি উইসেলকে বলেন, এমন ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে যে হামাস সরকার ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান করিবে। ইসরাইল চায়, হামাস ইসরাইল-ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্রের ভিত্তিতে রোডম্যাপ প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দিক। হামাস হয়ত ইহাতে এখনও রাজী নহে। তবে আগামীতে বিষয়টি মানিয়া লইবে বলিয়া আশা করা যায়। (যায়যায় দিন, ২৩ জুন ০৬)।

হামাস কর্তৃক ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান লইয়া প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সহিত দর কষাকষি চলিতেছে এমন এক সময় ফিলিস্তিনীদের একটি জঙ্গি গ্রুপ পশ্চিম তীর-গাজা মধ্যবর্তী একটি ইসরাইলী নিরাপত্তা চৌকিতে হামলা করিয়া ২ জন ইসরাইলী সৈন্যকে হত্যা করে ও অপর একজনকে অপহরণ করে। হামাস মুখপাত্র সামী জুহ্‌রী হামলা প্রসঙ্গে বলেন, ইসরাইল কর্তৃক নিরীহ নারী শিশু ও ২ জন জঙ্গি নেতাকে হত্যার প্রতিবাদে এই হামলা চালান হয়। ইসরাইল অবিলম্বে এই অপহৃত সৈন্যের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন দাবী করে, অন্যথায় গাজায় সশস্ত্র হামলার হুমকি দেয়। কিন্তু কোন কূটনৈতিক ব্যবস্থার দিকে না যাইয়া তাহারা প্রতিশোধের দিকে যায়। অতঃপর ইসরাইল ট্যাংক, সাঁজোয়া যান ও বিমান সহকারে একযোগে হামলা চালায়। প্রধানমন্ত্রী হানিয়াকে হত্যার ঘোষণা দেয় এবং হানিয়ার অফিস ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বোমার আঘাতে গুঁড়াইয়া দেয়। মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মোবারক মধ্যস্থতার ভূমিকা লইলেও ইসরাইল প্রচণ্ড হামলা চালায়। প্রধানমন্ত্রী বিশ্বদরবারে এই অমানবিক হামলার বিরুদ্ধে মানবিক সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিবার আহ্বান জানান। ইসরাইল বিমান হামলা ও রকেট চালাইয়া একজন ইসলামী জিহাদ গ্রুপের সদস্যকে হত্যা করে এবং হামাস মন্ত্রিসভার এক ডজন মন্ত্রীসহ শতাধিক লোককে গ্রেফতার করে। ইসরাইল আরও হুমকি দেয় তাহাদের আটক সৈন্যকে অক্ষত অবস্থায় ফেরৎ না দিলে বন্দিদের সবাইকে হত্যা করা হইবে।

সন্ত্রাস বিরোধী আন্তর্জাতিক অভিযানের নেতা আমেরিকা ইসরাইলের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও গ্রেফতার অভিযানকে সমর্থন জানায়। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আনিবার জন্য এই পর্যন্ত অনেক শান্তিচুক্তি ও রোডম্যাপ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ ইসরাইলের সন্ত্রাস ও সামরিক হামলার কারণে বারবারই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এইসব শান্তিচুক্তি ও রোডম্যাপ। এই জন্যই মনে করা হয় যুক্তরাষ্ট্র এই সমস্যা সমাধানে আন্তরিক নহে। ইসরাইল-ফিলিস্তিন সমস্যা জিয়াইয়া রাখিয়া আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যে তাহার দখলদারীত্ব বজায় রাখিতে চায়। এই দখলদারীর পিছনে রহিয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের মূল্যবান তেলসম্পদ। মূলতঃ এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও উদ্দেশ্যের কারণেই আমেরিকা ফিলিস্তিনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হামাস সরকারকে মানিয়া লইতেছে না। আর আমেরিকার সমর্থন রহিয়াছে বলিয়াই ইসরাইলের পক্ষে এতটা ন্যাক্কারজনকভাবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালান সম্ভব হইতেছে।(যায়যায় দিন, জুলাই ১, ২০০৬)।

ফিলিস্তিনকে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিবার মাধ্যমেই কেবল মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পূর্ণাঙ্গ ফিলিস্তিন রাষ্ট্র যতদিন না হইতেছে ততদিন কোন শান্তি প্রচেষ্টা সফল হইবে না। বন্ধ হইবে না ফিলিস্তিনের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন।

মক্কা চুক্তি ২০০৬ :

ফিলিস্তিনে ২০০৬ সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের পর হামাস গ্রুপ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করিলে হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়া প্রধানমন্ত্রী হন। (পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃ: একশত সাতানব্বই) কিন্তু হামাসের এই ক্ষমতাগ্রহণ পি.এল. ও.র সশস্ত্র ফাতাহ্ গ্রুপ মানিয়া লইতে পারে নাই, ফলে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষে ১৩০ জন ফিলিস্তিনী উভয় পক্ষে নিহত হয়। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস বার বার চেষ্টা করিয়াও উভয় গ্রুপকে কোন সমঝোতায় পৌঁছাইতে ব্যর্থ হন। অবস্থার অবনতি লক্ষ্য করিয়া সৌদী আরবের বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজীজ সমঝোতার লক্ষ্যে মক্কাশরীফে উভয় পক্ষকে এক বৈঠকে আমন্ত্রণ জানান। দীর্ঘ আলোচনার পর কয়েক মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধের লক্ষ্যে গতকাল ৯ই ফেব্রুয়ারী ০৭ প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিস্তিনী গ্রুপগুলি ক্ষমতা ভাগাভাগির এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। তাহারা একমত হয় যে ইসলামী জঙ্গি গোষ্ঠি হামাস একটি নূতন কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিবে। এই সরকার ইসরাইলের সঙ্গে গৃহীত বিগত শান্তিচুক্তি মানিয়া চলিবে। তবে ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্র নূতন সরকারের প্রতি সহিংসতা পরিত্যাগ, ইসরাইলকে স্বীকৃতি ও শান্তিচুক্তি সমুন্নত রাখিতে সম্মত হইবার দাবী জানায়।

মার্কিন ও ইসরাইলী স্বীকৃতি চুক্তির সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। হামাসকে যে যথেষ্ট পরিমাণ নমনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদিগকে এই বিষয়টি বুঝাইতে না পারিলে পাশ্চাত্য ফিলিস্তিনী সরকারের উপর হইতে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলিয়া লইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহাতে শান্তিপ্রক্রিয়ার অগ্রগতিও দুরূহ হইয়া পড়িবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র টম ক্যামি বলেন, চূড়ান্ত চুক্তিটি কেমন হইয়াছে তা তাহারা খুতিয়া দেখিবেন। ইহা আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণ করিয়াছে কিনা তাহাও মূল্যায়ন করিতে হইবে। চুক্তি ঘোষণার পর ইসরাইলী মুখপাত্র শিরি এইসিন বলেন, ইসরাইল আশা করিতেছে, নূতন ফিলিস্তিনী সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তিন নীতিমালার সবগুলি মানিয়া লইবে। তিন নীতিমালা হইল সহিংসতা ত্যাগ, ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান ও অন্যান্য চুক্তির প্রতি সরকারের অঙ্গিকার।

জাতিসংঘের নবনিযুক্ত মহাসচিব বান কি-মুন ফিলিস্তিনী ঐক্য সরকারের ঘোষণাকে স্বাগত জানান। তিনি আশা করেন, এই চুক্তি সহিংসতা বন্ধ ও ফিলিস্তিনী জনগণের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করিবে। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় বাদশাহ আবদুল্লাহ্ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার ডান পাশে ছিলেন মাহমুদ আব্বাস এবং বাম পাশে ছিলেন হামাসের উর্দ্ধতন নেতা খালেক মিশাল। আব্বাসের সহকারী নাবিল আমর চুক্তি ঘোষণা করিয়া লিখিত আব্বাসের একটি পত্র পাঠ করেন। ইহাতে হামাসের প্রতি পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে মক্কা আলোচনার ফর্মুলা অনুযায়ী দুই গোষ্ঠির মধ্যে পদ ভাগাভাগি করিয়া একটি নূতন কোয়ালিশন সরকার গঠনের আহ্বান জানান হয়। আব্বাস ও মিশাল দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করেন, এই চুক্তি তাহাদের গোষ্ঠিগুলির মধ্যে শান্তি আনিয়া দিবে। সৌদী বাদশাহ্র

সাহায্যের জন্য তাঁহারা তাঁহার ঢালাও প্রশংসা করেন, এমন কি সমঝোতা গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতার জন্য তাঁহাকে মহানবীর (সাঃ) সঙ্গে তুলনা করেন।

দুই পক্ষের কয়েকটি সূত্রমতে, অর্থ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে দুই নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে সাবেক সংস্কৃতিমন্ত্রী জিয়াদ আবু আমরকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে এবং সালদি ফায়াদকে অর্থমন্ত্রীর পদে নিয়োগ দেওয়া হইতেছে। ফায়াদ আগেও এই পদে ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদেও আরেক নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে একমত হইলেও ফাহাদকে নিয়োগ দেওয়া হইবে সে ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই হামাস ও আল-ফাতাহ্ নেতারা। সৌদী আরবে নিযুক্ত ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রদূত জামাল আল-সোবাকী জানান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদে হামাসের পক্ষ হইতে একজনের নাম প্রস্তাব করা পর্যন্ত ফাতাহ্ অপেক্ষা করিবে। উভয় পক্ষই এই ব্যাপারে একমত যে ঐ পদে একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হইবে। তবে এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস, প্রধানমন্ত্রী ইসমাইল হানিয়া ও হামাস নেতা খালেদ মিশাল–এই তিনজনের নিকট হইতে অনুমোদিত হইতে হইবে।

ইরান ঃ

আফগানিস্তান ও ইরাক কুক্ষিগত করিবার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এইবার ইরানের দিকে নজর দেন। ইঙ্গ-মার্কিন জোট একটি অজুহাত দাঁড় করায় ইরানের বিরুদ্ধে। ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈয়ার করিবার চেষ্টা করিতেছে— ইহা অমার্জনীয় অপরাধ! কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র যদি বিপজ্জনক হয় তবে তাহা সকলের জন্যই হওয়া উচিৎ। এইখানে প্রশ্ন থাকিয়া যায় দায়িত্বশীলতার। নিরপেক্ষ বিচারে বিশ্বের প্রধান দায়িত্বজ্ঞানহীন রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাহারা দুইবার ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে। অন্ততঃ ২৮ বার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের হুমকি দেয়। ১৯৭৩ সালে ইরান পরমাণু অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। তখন ভারত ও পাকিস্তান চুক্তি স্বাক্ষরে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীকালে উভয় দেশই প্রকাশ্যে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এখন মনে হয় চুক্তিতে স্বাক্ষর না করিয়া এশিয়ার এ দুইটি দেশ সঠিক কাজই করিয়াছিল। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের, পররাজ্যগ্রাসী বৃটেনের, উপনিবেশবাদের প্রবক্তা ফ্রান্সের, জায়নবাদী ইসরাইলের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র আছে সেখানে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণকারী প্রতিটি রাষ্ট্রের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা উচিৎ। আজ যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অভিযোগ তুলিয়াছে ইরাকের বিরুদ্ধে, তাহারাই এক সময় ইরানকে পারমাণবিক শক্তির অধিকারী করিতে চাহিয়াছিল। তখনকার ইরানের শাসক ছিলেন রেজা শাহ্ পাহলভী।

প্রেসিডেন্ট খাতামীর মেয়াদ শেষ হইলে ২০০৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কট্টরপন্থী মাহমুদ আহমাদনিজাদে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ইরানের পারমাণবিক প্রযুক্তি লাভের ঘোর সমর্থক।

১৯৫৭ সালে মার্কিন-ইরান পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তী দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে সরবরাহ করে পারমাণবিক চুল্লি, প্রযুক্তি, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের

উপাদান এমনকি টেকনিশিয়ানও। সেই সময়কালে ইরানের নেতৃত্বে আমূল পরিবর্তন ঘটে। দেশ রাজতন্ত্র হইতে ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনে পরিবর্তন ঘটে সামান্য। সেই সময়ের যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব রামসফেল্ড বর্তমানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তখনকার যুক্তরাষ্ট্রের চীফ অব স্টাফ ডিকচেনী এখন উপরাষ্ট্রপতি। যাহারা একসময় ইরানকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত করিতে প্রবল আগ্রহ দেখাইয়াছিল তাহারাই আজ ইরানকে চোখ রাঙ্গাইতেছে। চোখ রাঙ্গানীর কারণ দুইটি ঃ প্রথমত, ইরানে খনিজসম্পদ রহিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ইরানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যুক্তরাষ্ট্রের সেবাদাস হইতে রাজী নহে। ইরানে রহিয়াছে ১২৫.৮ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের ভাণ্ডার। ৯৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস। ইরানের খনিজ সম্পদ লুণ্ঠন করাই ইস্যু উত্থাপনের একমাত্র কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন।

একটি মৌলিক ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে অনেকেই ইরানের সমালোচনা করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রবল শত্রুও উহার স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির জন্য কৃতিত্ব না দিয়া পারেন না। মার্কিনীদের ইরানের একচেটিয়া তেল লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে এদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইরান পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তৃতকরণ বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও পরমাণু গবেষণা চালাইবার হকদার। এন. পি. টি (NPT) বা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তৃতকরণ বিরোধী চুক্তির ৪নং ধারা অনুযায়ী ইরান পরমাণু গবেষণা করিতে আইনতঃ অধিকারী। ১৯৬৩ সালে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল পিটিবিটি (PTBT)। এই চুক্তি মোতাবেক পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো যায় ভূগর্ভে, সমুদ্রবক্ষে নহে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী হওয়া সত্ত্বেও চুক্তি পরবর্তীকালে ফ্রান্স ২৭ বার, গণচীন ২০ বার উন্মুক্ত বিস্ফোরণ ঘটায়। কিন্তু তাহাতে কেউ আপত্তিও করেনি। এন.পি.টির পর স্বাক্ষরিত হয় সিটিবিটি (Comprehensive Test Ban Treaty)। ইহার ৬নং ধারানুযায়ী অন্য দেশ হইতে ইরান পরমাণু প্রযুক্তি আমদানী করিতে বা অন্য কোন দেশে তা রপ্তানি করিতে পারে। ইতোমধ্যে ভারত, ব্রাজিল, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশ শুধু পরমাণু গবেষণা নহে বরং পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণও ঘটাইয়াছে। কিন্তু আচরণে দেখা যাইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বৈরী হইলেই কেবল পরমাণু গবেষণা বা এরূপ কোন কিছু করিতে পারিবে না। ইহা একটি ঘোরতর অন্যায় বলিয়া অনেক দেশ যথা ভেনেজুয়েলা প্রতিবাদ জানাইয়াছে।

ইরানের পরমাণু চুল্লি বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ বলিয়া যে প্রস্তাব ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি এজেন্সির সভায় উত্থাপিত হয় উহাকে সমর্থন করে ভারত। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। ভারত কখনও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মিতালী করে আবার কখনও চীনের সাথে, কখনও জাপানের সাথে। তাহার পুরাতন বন্ধু সাবেক সোভিয়েত এবং বর্তমান রাশিয়ার সাথে বন্ধুত্ব বজায় তো আছেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্ররা যতই লাফালাফি করুক না কেন ইরান আক্রমণ অত সহজ নহে। একদিকে আফগানিস্তান ও ইরাকে হাজার হাজার মার্কিন সৈন্য হতাহত হইয়াছে। অপরদিকে মধ্য এশিয়ার সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (SCO) শক্তিশালী হইবার মধ্যে এশিয়ায় মার্কিন শক্তি চাপের মুখে। বিগত ডিসেম্বরে (০৫) উজবেকিস্তান

হইতে মার্কিন ঘাটি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয় যুক্তরাষ্ট্র। কিরঘিজস্তান তাহার দেশে মার্কিন ঘাটির ভাড়ার অর্থ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এস.সি.ও. ভূক্ত দেশগুলি হইতেছে রাশিয়া, চীন, কাজাকিস্তান, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরঘিজস্তান। অধিকন্তু পাকিস্তান, ভারত ও ইরান এই প্রতিষ্ঠানের পর্যবেক্ষক। ইরানে মার্কিন স্থলবাহিনী আসিলে তাহা এস.সি.ও ভূক্ত রাষ্ট্রসমূহ (একমাত্র ভারত ব্যতীত) কর্তৃক ঘেরাও হইবার সম্ভাবনা। অপরদিকে ইরাক যুদ্ধের খরচ জোগাইতে মার্কিন অর্থনীতি দেউলিয়া হইবার পথে। ইতোমধ্যে ইরাকী মুজাহিদ বাহিনী প্রমাণ করিয়াছে মার্কিন বাহিনী একটি শক্তিশালী বাহিনী তবে অপ্রতিরোধ্য নহে।

ইতোমধ্যে সমগ্র বিশ্বে ইরানের ব্যাপারে মার্কিন নীতির কড়া সমালোচনা শুরু হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র চায় আফগানিস্তানের স্টাইলে জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরানে হামলা চালাইতে, কিন্তু সেখানে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে রাশিয়া ও চীন। এ দুইটি দেশ ইরানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধী। ইতোমধ্যেই এই দুইটি দেশ নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো প্রয়োগের হুমকি দিয়াছে। প্রেসিডেন্ট বুশ তাই কিছুটা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি বলেন ইরানের সঙ্গে আলোচনার দ্বার এখনও বন্ধ হয় নাই। তবে ইরানের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের জন্য সর্বত্র তিনি বলিয়া বেড়াইতেছেন ইরান একটি বিপজ্জনক দেশ। অপরদিকে অনেক দেশ বলিতেছে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করিবার উদ্দেশ্যেই এই সমস্ত টালবাহানা করিতেছে। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট বলেন, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী লইয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশসমূহ অধিক বাড়াবাড়ি করিতেছে। তাঁহার এই বক্তব্যের প্রতি বহির্বিশ্বের সমর্থন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। তবে বৃটেন বলে, ইরানের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে তাহা তলাইয়া দেখা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র বলে, ইরান বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি হুমকি স্বরূপ। তাই তাহাকে পারমাণবিক বোমার মালিক হইতে দেওয়া হইবে না। এদিকে ইরান বলিয়াছে শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক কর্মসূচির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইলে ইরান তেল অস্ত্র ব্যবহার করিবে। বিশ্বে তেল সরবরাহের বড় নিয়ন্ত্রক ইরান। সে তেল নিষেধাজ্ঞা জারী করিলে বিশ্বের সমস্ত দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সর্বশেষ খবরে প্রকাশ ইরান পারমাণবিক কর্মসূচী সফলভাবে চালাইয়া বিশ্বে পারমাণবিক প্রযুক্তির অধিকারী একটি দেশে পরিণত হইয়াছে। (পূর্বকোণ অবলম্বনে, ২৯ মার্চ ০৬)।

এইদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচী বিষয়ে বাধা প্রদান করিবার জন্য বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করে। এ উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স এক বৈঠকে মিলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কর্তৃক প্রণীত একটি খসড়া প্রস্তাব বৈঠকে উত্থাপন করিলে রাশিয়া ও চীন তাহা প্রত্যাখ্যান করে। তাহারা জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ের আওতায় খসড়া প্রস্তাব তৈয়ারীর বিরোধিতা করে। চীনও সপ্তম অধ্যায়ের আলোকে খসড়া প্রস্তাব তৈয়ারীতে সম্মত নহে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি দেখা দিলে সনদের সপ্তম অধ্যায় কোন দেশের বিরুদ্ধে

অর্থনৈতিক অবরোধ বা সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন দিতে পারে। এইদিকে ইরান হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছে, খসড়া প্রস্তাবের অর্থ হইতেছে যুদ্ধের হুমকি। নিরাপত্তা পরিষদ কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে তাহা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার (IAEA) প্রতি ইরানের সহযোগিতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলিবে। ইরান বরাবরই বলিয়া আসিতেছে অস্ত্র তৈয়ারী নহে বরং বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই ইরান পরমাণু কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। (প্রথম আলো ১৮ মে ২০০৬)।

এইদিকে বিশ্বের ক্ষমতাধর দেশগুলি তেহরানকে ইউরেনিয়াম কর্মসূচী বন্ধের বিনিময়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার একটি প্যাকেজ প্রস্তাব দেয়। গত ৬ জুন ২০০৬ ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান হ্যাভিয়ার সোলানা এই প্রস্তাবটি ইরানে পৌঁছাইয়া দেন (AFP)। ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমদিনেজাদ গত বুধবার প্রথমবারের মত জানান, দুইমাসের মধ্যে তেহরান আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের ব্যাপারে তাহাদের প্রতিক্রিয়া জানাইবে। ইরানী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২২শে আগস্ট দুই মাস পূর্ণ হইবে। এক বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট আহমদিনেজাদ জানান, দুই মাসের মধ্যে তেহরান আন্তর্জাতিক প্রস্তাবের ব্যাপারে তাহাদের প্রতিক্রিয়া জানাইবে। তাহার এই বক্তব্যের পরই জার্মানীসহ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র বৃটেন, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা টেলিফোনে আলোচনা করিয়া সময়সীমার ব্যাপারে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেন। ভিয়েনায় ইইউ-আমেরিকার সম্মেলনের পর বুশ তাঁহার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি মনে করে দুই মাস নহে বরং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যাপারে উত্তর আসা উচিৎ। ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনুচেহের মুত্তাকি বলেন, আমেরিকার এই ব্যাপারে অত তাড়াহুড়া করা উচিৎ নহে। কারণ প্রস্তাবে কিছু অস্পষ্টতা রহিয়াছে। তাহাছাড়া হ্যাভিয়ের সোলানা প্রস্তাবটি প্রদান করিবার সময় কোন সময়সীমা বাধিয়া দেন নাই। ইরানী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র হামিদ রেজা আসেফি বুশের নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুঁশিয়ারী অগ্রাহ্য করিয়া বলেন, বুশের ভাষা গ্রহণযোগ্য নহে। ইউরোপের সহিত ইরানের সহযোগিতামূলক মনোভাবের সঙ্গেও তাহা সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। (যায়যায় দিন, ২৩ জুন ০৬)।

পরমাণু কর্মসূচী লইয়া ইরানের উপর ইঙ্গ-মার্কিন চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাথে সাথে বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণসহ বিশ্বব্যাপী ইরানের উপর হামলার ভয়াবহ পরিণতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনী ও প্রতিবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি সংগঠনের একটি জোট কর্তৃক তাহাদের এক রিপোর্টে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে উদ্দেশ্য করিয়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয় ঃ ইরানের বিরুদ্ধে যে কোন সামরিক পদক্ষেপ অতি বিপজ্জনক ও অকল্পনীয় ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডাকিয়া আনিতে পারে।

উল্লেখ্য ইরান তাহার পরমাণু কর্মসূচী স্থগিত রাখিতে অস্বীকৃতি জানাইবার পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের (২০০৬) শেষ দিকে তেহরানের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মানিয়া চলিতে দেশটিকে বাধ্য করিবার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তদনুযায়ী আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আই,এ,ই,এ) জানাইয়াছে তাহারা ইরানে তাহাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রচেষ্টার প্রায় অর্ধেকই স্থগিত রাখিয়াছে। এদিকে শীর্ষস্থানীয় একজন

মার্কিন কূটনীতিক বলেন পারমাণবিক কর্মসূচীর কারণে তেহরান তাহার আন্তর্জাতিক সমর্থন হারাইয়া ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আই, এ,ই,এ (I.A.E.A)-এর রিপোর্ট অনুসারে তাহাদের ২২টি প্রজেক্ট এখন স্থগিত আছে। কিন্তু ইরান এই ধাপ্পাবাজী অস্বীকার করিয়া বলিয়াছে ইরান ও আই.এ.ই.এ.-র (International Atomic Energy Agency) মধ্যকার সহযোগী প্রজেক্টগুলি ঠেকাইবার মার্কিন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেইগুলির প্রায় ৯০ শতাংশেরও বেশি প্রজেক্ট এখনও চলিতেছে।

অপরদিকে মার্কিন গোয়েন্দাদের ধারণা, ইরাকে তাহাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে গেরিলারা যেইসব মরণঘাতি অস্ত্র ও বোমা ব্যবহার করিতেছে তাহা ইরান হইতে আসিতেছে। নিউইয়র্ক টাইম্‌সে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের সমর্থনে পত্রিকাটি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়া জানায়, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি নিজেদের মধ্যে ব্যাপক ভিত্তিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই ধারণায় উপনীত হইয়াছে। তবে তাহারা এই ব্যাপারে এখনই কোন চূড়ান্ত মন্তব্য করিতে রাজী নহে। মার্কিন গোয়েন্দারা মনে করেন, ইরান-ইরাকী শীয়া গেরিলাদের মারণাস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। কর্মকর্তারা বলেন, এই অস্ত্র সহজেই রাস্তার পাশ হইতে ছোঁড়া যায়। প্রচলিত হাত বোমার চেয়ে এইগুলির ধ্বংসাত্মক কার্যকারিতা অনেক বেশি। বাগদাদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় এইগুলি বড় ধরনের হুমকি।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচীর উপর মার্কিন হামলা এবং ইরান ইরাকী গেরিলাদের অস্ত্র সরবরাহ করিতেছে বিধায় সম্ভাব্য মার্কিন হামলা–এই দুইয়ের উপর বর্তমানে মার্কিন সিদ্ধান্ত ঘুরপাক খাইতেছে। বিশ্লেষকদের মতে এখন যুক্তরাষ্ট্রের ইরান আক্রমণের প্রধান কারণ হিসাবে ইরাকী গেরিলাদের ইরান সাহায্য দিতেছে–এই মর্মে যুক্তি খাড়া করা, কারণ এতদিন মার্কিন সরকার ইরানের পারমাণবিক বোমা তৈরীর গোপন কর্মসূচীর কথা বলিয়া সেই দেশটি আক্রমণ করিতে চাহিলেও সেখানে আণবিক বোমা তৈরীর কোন কর্মসূচীর প্রমাণ যে নাই তাহা জাতিসংঘের পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ এল বারাদীও খুব স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। আমেরিকানরা নিজেরাও কোন প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারে নাই। শক্তিধর কোন দেশ অপর ছোট দেশের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য কারণের অভাব হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাক আক্রমণ ও দখলদারিত্বের জন্য তাই যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা করে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও শুধু পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রস্তুতির অভিযোগ তুলিয়া ইরান আক্রমণের যুক্তির দুর্বলতা আন্তর্জাতিক মহলে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি করায় তাহারা এখন ইরাকে মার্কিন দখলদারীর বিরুদ্ধে আন্তর্ঘাতমুলক কার্যকলাপের কথা বলিয়া ইরান আক্রমণের নূতন অজুহাত খাড়া করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত আছে। অপর দিকে ইরান একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে যে তাহাদের আণবিক বোমা তৈরির কোন পরিকল্পনাই নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ইরানের বিরুদ্ধে এক বড় সামরিক আক্রমণ চালাইবার জন্য সমস্ত প্রস্তুতি প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিস্তারিত বিবরণ আসিয়াছে, তবে বিগত ২৭শে জানুয়ারি ০৭, ফ্রান্সের বিখ্যাত Le Figaro

পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগরে দুইটি যুদ্ধবিমানবাহী বহর হইতে ৩০ হইতে ৪০ দিন পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টা বিমান আক্রমণ পরিচালনার শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে। ইহার জন্য তাহারা নির্ভর করিতেছে বাহ্রাইনের উপর, কাতারের বিশাল আল-উদায়েদ বিমান ঘাঁটির উপর; ইহা ছাড়াও সরবরাহের জন্য ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দিয়াগো গার্সিয়া ঘাঁটির উপর। আমেরিকার উপগ্রহগুলি ইতোমধ্যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পর্কিত ১৫০০ টার্গেট চিহ্নিত করিয়াছে যেইগুলি ছড়াইয়া আছে ১৮টি প্রধান এলাকায়। ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই যে, এইগুলির প্রভূত ক্ষতিসাধন করা হইতে পারে। ইহার সহিত যুক্ত হইতে পারে বিভিন্ন শিল্প এবং তৈল লক্ষবস্তু। (কলামিষ্ট বদরুদ্দীন ওমরের প্রবন্ধ অনুসরণে : দৈনিক আমার দেশ, ১০.০২.০৭)।

এই প্রতিবেদন হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন ইরানের অর্থনীতি ও সামরিক শক্তি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংশ করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তাহার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের এই স্বৈরাচারী কর্মসূচী এখন তাহাদের যে প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বে ও সরাসরি নির্দেশে পরিচালিত হইতেছে মানবতা বিরোধী স্বেচ্ছাচারী চরিত্র হিসাবে তিনি হইলেন কুখ্যাত হিটলারের চেয়েও অনেক বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সমগ্র বিশ্বের জনগণের অনেক বড় শত্রু। (দৈনিক আমার দেশ, ১০ ফেব্রুয়ারি ০৭)।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, ইরান তাহার পরমাণু কর্মসূচী বন্ধ করিতে পারে বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছে দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীর এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ফ্রান্সের "দৈনিক লিবারেশান" আলী খামেনীর ঐ সহযোগী আলী আকবর বেলায়েতিকে উদ্ধৃত করিয়া বুধবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এই কথা জানায়। পত্রিকাটি জানায়, বেলায়েতি জানান ইরান আগেই তাহাদের কর্মসূচী বন্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের এই তৎপরতাও পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সৃষ্ট বিরোধ নিরসনে সহায়ক হয় নাই। "কিন্তু আমরা যদি এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে কাজ করিয়া যাই তবে এই সংক্রান্ত কোন প্রস্তাবই অগ্রহনযোগ্য হইবে না। আমরা শুধু একটি ব্যাপারেই অনমনীয় অবস্থান লইয়াছি। তাহা হইল আমাদের পরমাণু জ্বালানী পাইবার বৈধ অধিকারের প্রতি সম্মান দেখাইতে হইবে। আর পরমাণু অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তিতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হইয়াছে," আয়াতুল্লাহ বলেন।

পরমাণু সংক্রান্ত বিরোধের প্রেক্ষিতে ইরানী নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বক্তব্য দিয়াছেন। ইতোপূর্বে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ পরমাণু কর্মসূচী বন্ধের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, "আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত আছি। তবে পরমাণু বন্ধের পরিকল্পনা আমাদের নাই।" আয়াতুল্লাহ্ আলী খামেনীয়র বক্তব্য অবশ্য সর্বশেষ। দেশটির যেকোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবার ক্ষমতা একমাত্র আলী খামেনীর হাতেই রহিয়াছে। (বিডি নিউজের সূত্র ধরিয়া দৈনিক পূর্বকোন, ১৫ ফেব্রুয়ারি '০৭)।

এইদিকে লেবাননের হিজবুল্লাহ্র উপ-প্রধান মঙ্গলবার (২৭ ফেব্রু-০৭) এক হুঁশিয়ারীতে বলেন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল ইরানে কোন প্রকার সামরিক অভিযান চালাইলে

গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে। হিজবুল্লাহ্ নেতা শেখ নাঈম কাশেম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালাইলে ইরানপন্থী হিজবুল্লাহ তাহাতে জড়িত হইবে না, তবে ইরানের হামলার অংশ হিসাবে ইসরাইল লেবাননে হামলা চালাইলে হিজবুল্লাহ্ অবশ্যই তাহার জবাব দিবে। (বৈরুত হইতে UNB/AP)।

জর্দান ঃ

২ বৎসর পূর্বে (১৯৯৯) পিতা বাদশাহ্ হোসেনের উত্তরাধিকারী হইলে জর্দানের নূতন বাদশাহ্ দ্বিতীয় হোসেনকে একজন অত্যাধুনিক বাদশাহ্ হিসাবে অভিনন্দিত করা হয়। অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং একজন ইন্টারনেট প্রিয় ব্যক্তি, উৎসাহী যুবক বাদশাহ্ বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং কথিত দুর্নীতিপরায়ন হাসপাতালসমূহ ছদ্মবেশে পরিদর্শন করেন। কিন্তু শত শত বিক্ষোভকারী আম্মানে নাকবা দিবস পালনের জন্য একত্রিত হইলে বাদশাহী তখন ভিন্ন চেহারা প্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনীদিগকে ফিলিস্তিন হইতে ইসরাইল জোরপূর্বক বাহির করিয়া দিলে তখন হইতে ফিলিস্তিনীরা ঐ দিবসটিকে বাৎসরিক নাকবা দিবস হিসাবে পালন করে। জর্দানী নিরাপত্তা বাহিনী তাহাদিগকে কুকুর লইয়া ধাওয়া করে এবং লাঠিচার্জ করে। এই দৃশ্যের ছবি তুলিতে গেলে সাংবাদিকদিগকেও গ্রেফতার করা হয়। হোসাম মাহমূদ (২৭) নামক এক ফিলিস্তিনী রেস্টুরেন্ট মালিক বলেন, "সরকার আমাদিগকে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করিতে দিবে না কেন? বাদশাহ্ কাহাকে ভয় করেন?"

এরূপ আরও অনেক যুবক আরব বাদশাহ্দের জন্য এখন ভাল দিন যাইতেছে না। আল-আকসায় ইন্তিফাদা আন্দোলন চলিতে থাকিলে বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্ (৩৯) প্রাণপণ চেষ্টা করেন এই আগুন যাহাতে হাশেমীয় রাজত্বে ছড়াইয়া না পড়ে। গত শীতকালে ফিলিস্তিনে বিক্ষোভ ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহার প্রতিপক্ষ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের (৩৫) ন্যায় আবদুল্লাহও বেকায়দায় পড়েন। বর্তমানে আরব নেতৃত্বের আধুনিক পুরুষের প্রতীক হিসাবে ক্ষমতায় আগত উভয় নেতাই তাঁহাদের রাজত্বকে পুরাতন বিরোধ দ্বারা পরিচালিত দেখিতে পান।

তাঁহারা এক ভয়াবহ ঝুঁকির সম্মুখীন হন। আবদুল্লাহকে তাঁহার অভ্যন্তরিন সংস্কারের আকাংখাকে প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধের চাপের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। জর্দানের মোট জনসংখ্যার কথিত শতকরা ৬০ ভাগ ফিলিস্তিনী হতাশ ও রাগান্বিত হয়। সিরিয়ার বাশার আল আসাদ তাঁহার নিজস্ব ইন্তেফাদা সমস্যায় ভোগেন। তিনি ইসরাইলের প্রতি নিজেকে খুব কড়া হিসাবে প্রতিভাত করিতে চান। কিন্তু দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহ্কে প্রদত্ত সমর্থনের ফলে ইসরাইল তাঁহার বিরুদ্ধে যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার উস্কানী দেয় তাহা আর যাহাই হোক সিরিয়ার নড়বড়ে অর্থনীতির জন্য বা ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্রের জন্য মোটেই সুখকর হয় নাই। উভয়ের উচিৎ তাহাদের ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করা এবং ইসরাইলের সহিত ব্যাপক সাংঘর্ষিক যে কোন পন্থা হইতে নিজেদের বিরত রাখা। সেই সঙ্গে ক্ষমতায় আসিবার সময় তাহাদের প্রদত্ত সংস্কারের গতিও সঠিক রাখা।

বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্র সমস্যা অধিক জটিল। তাঁহার পিতা বাদশাহ্ হোসেন ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখিবার জন্য ১৯৯৪ সালে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু চুক্তির দ্বারা প্রাপ্য সুবিধাদি, যথা পশ্চিম তীরের সহিত বর্দ্ধিত ব্যবসা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ হইতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা কিছুই বাস্তবায়িত হয় নাই। এখন তাঁহার পুত্রের সহযোগীরা মনে করেন তাহাদের সহিত প্রতারণা করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ্র প্রধান চিন্তার বিষয় হইল এই শান্তিচুক্তি বাতিলের দ্বারা সহিংসতা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং আরও চিন্তার বিষয় হইল ইসরাইলী সামরিক বাহিনীর ধাওয়া খাইয়া ফাতাহ্ গেরিলারা ও পশ্চিম তীরের অন্যান্য জঙ্গিরা জর্দানে আশ্রয় লইতে চাহিবে। আম্মানের একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাদওয়ান আবদুল্লাহ বলেন, "১৯৬০ এর দশকের ন্যায় জর্দান আর ফিলিস্তিনী স্বাধীনতাকামীদের আশ্রয় দিতে চায় না।" সেই যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে এক সামরিক বিদ্রোহ প্রচেষ্টা এবং বাদশাহ্ হোসেন কর্তৃক ১৯৭০ সালে পি. এল. ও কে জর্দান হইতে বহিষ্কারের মাধ্যমে।

বাদশাহ্ একটি সুন্দর উদাহরণ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনী নারী গুলিবিদ্ধ হইলে আবদুল্লাহ তাহাকে জর্দানী একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি সর্বদা ফিলিস্তিনী বিষয়ে একাত্মতা ঘোষনা করেন এবং ইন্তিফাদায় আহতদের জন্য রক্তদান করেন। কূটনীতিকরা বলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ্ গোয়েন্দা প্রধানের উপদেশও গ্রহণ করেন এবং কট্টরপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুড সদস্যরা প্রতিবাদ সমাবেশ করিলে উহাকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। বাদশাহ্ হোসেন প্রায়ই প্রতিবাদ সমাবেশগুলির উপর আঘাত হানিতেন। "কিন্তু বাদশাহ্ হোসেন গোত্রীয় নেতাদের সহিত বৈঠক করিতেন, তাহাদের সহিত কফি পান করিতেন, তাহাদের ভাষায় কথা বলিতেন", বলেন আম্মানের এক পশ্চিমা কূটনীতিক। সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে তিনি সংঘাতের সময় ব্যবহার করিতেন। আবদুল্লাহ্ অপরদিকে অশুদ্ধ আরবী বলেন এবং তাঁহার পিতার সেই জনগণের স্পর্শ এখনও লাভ করিতে পারেন নাই। এখন বাদশাহ্ আবদুল্লাহর সামনে বড় ঝুঁকি হইল তাঁহার লোকদের হতাশাকে নিয়ন্ত্রনহীন প্রচণ্ড ক্ষোভে পরিণত হওয়া হইতে রক্ষা করা। (Newsweek, May, 28, 2001)।

সিরিয়া ঃ

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট, একজন বাথ পার্টি নেতা হাফিজ আল আসাদ ২০০০ সালে মারা গেলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বাশার আল-আসাদ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। বাশার আল-আসাদ স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের মানুষ নহেন। লেবানন হইতে তাঁহার বাহিনীর হঠাৎ প্রত্যাহার সমাপ্ত করিবার এক সপ্তাহ পর অন্তর্মুখি সিরীয় নেতা প্রায় দুই ডজন ক্ষুদ্র দলীয় রাজনীতিবিদদের তাঁহার পিতা হাফিজ আল-আসাদ কর্তৃক দামেস্কের পাহাড়ের চূড়ায় নির্মিত এক ব্যক্তিগত দুর্গে একত্রিত হইবার আদেশ দান করেন। এই সভার উদ্দেশ্য লেবানন হইতে সৈন্য প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা প্রকাশের জন্য নহে বা যাহারা ইহার সমালোচনা করে তাহাদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য নহে। তৎপরিবর্তে ৩৯ বৎসর বয়স্ক

আসাদ পরবর্তী সপ্তাহে অনুষ্ঠিতব্য শাসক দল বাথ পার্টির কংগ্রেসের উপর দৃষ্টিপাত করেন। অতিথিদের চা ও লেমোনেড পানের পাশাপাশি তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদারতা সম্পর্কে তাঁহাদের চিন্তা-ভাবনা অবিনিবেশ সহকারে শ্রবন করেন এবং সংস্কারের উপর তাঁহার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। শুধু একবার তিনি সেকেলে আজীবন প্রেসিডেন্ট থাকিবার কথা উল্লেখ করেন এবং সেইসঙ্গে তিনি তাঁহার শাসন কাড়িয়া লইবার ব্যাপারে গোপন ইসলামপন্থীদের কড়া সতর্কবাণী উচ্চারণও করেন।

অতিথিদের কাউকেও বাশারের পিতার প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করিতে হয় নাই। ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার ব্যাপারে এই বৃদ্ধ কোন সম্ভাব্য সন্দেহ রাখিয়া যান নাই। ১৯৮২ সালে তিনি উত্তরের হ্যামা শহরে একটি বিদ্রোহ নির্দয়ভাবে দমন করেন। তিন সপ্তাহ ধরিয়া শহরটির উপর কামানের গোলাবর্ষণ করা হয় এবং হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিককে হত্যা করা হয়। পুত্রের ন্যায় তাঁহার একনায়কত্ব একদল বজ্রমুষ্টি নিরাপত্তা রক্ষিদের দ্বিধাহীন সমর্থন ব্যতীত টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু পশ্চিমা তথ্যসূত্রে বাশারকে চিত্রিত করে এক দুর্বোধ্য ব্যক্তিত্ত্ব হিসাবে; তাঁহার প্রতিনিধিগণ সদাসর্বদা ওয়াশিংটনের সাথে সিরিয়ার সুসম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তারপরও মার্কিন কর্মকর্তাগণ সর্বদা ইরাকী স্বাধীনতাকামীদের অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে আনয়নের ব্যাপারে সিরিয়াকে দোষারোপ করেন।

বাশার-আল-আসাদ কি সবদিক রক্ষা করিতেছেন? তিনি কি ইরাক যুদ্ধে উস্কানী দিতেছেন? সিরীয়দের, বিদেশী জিহাদীদের এবং ইরাকী বাথপন্থীদের সীমান্ত অতিক্রম করিতে দিতেছেন? অথবা তিনি কি ক্রমশঃ নিজের দেশে সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং জঙ্গি ইসলামপন্থীদের সিরিয়ার ক্ষমতা দখলের আশংকায় বিদ্রোহীদের দমন করিতেছেন? তবে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে তাঁহার কার্যক্রমের দ্বারা তিনি একাকী হইয়া পড়িয়াছেন এমন এক অঞ্চলে যেখানে বন্ধুদের নিকটে রাখা এবং শত্রুদের দূরে সরাইয়া রাখা একটি টিকিয়া থাকিবার ব্যাপার। (Newsweek, Jun, 13-2006)।

বাশার কখনও প্রভূত্বকারী ছিলেন না। শৈশবে তিনি এক জটিল বালক ছিলেন— তাঁহার বড়ভাই শক্ত সবল ক্রীড়াবিদ বাসিলের সম্পূর্ণ বিপরীত। আসাদের জীবনীকার প্যাট্রিক শীল (Patrick Sealle) বর্ণনা করেন কিভাবে বাশারের প্রপিতামহ সোলাইমান সিরিয়ার পশ্চিমের পাহাড়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কুস্তিগীরদিগকে পরাভূত করিয়া সুনাম অর্জন করেন। কিন্তু বাশার কোন যোদ্ধা ছিলেন না। জীবনের পেশা বাছিয়া লইবার সময় আসিলে তিনি চক্ষুবিশারদের পেশা বাছিয়া লন। তিনি একজন চক্ষুবিশেষজ্ঞ হিসাবে হয়ত একটি নিরুপদ্রব জীবনই চালাইয়া যাইতে পারিতেন যদি না ১৯৯৪ সালে তাঁহার বড়ভাই বাসিল একটি মোটরকার দুর্ঘটনায় মারা যাইতেন। অতঃপর বাশার তাঁহার চক্ষুচিকিৎসার পেশা ত্যাগ করিয়া ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইবার জন্য বাসিলের স্থান গ্রহণ করেন। ২০০০ সালে সিরিয়ার আসাদ মৃত্যুবরণ করিলে সিরিয়া দ্রুত উহার সংবিধান সংশোধন করে যাহাতে ৩৪ বৎসর বয়স্ক বাশার ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। অতঃপর মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর একনায়কদের ন্যায় তিনি শাসনভার পরিচালনা করেন। ৯/১১/২০০১

নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার বিধ্বস্ত হইবার পর আসাদ সরকার মার্কিন পরিচালিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করে। আল-কায়েদার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা প্রতিবেদন আদান-প্রদান করে এবং আমেরিকান গোয়েন্দা দলকে সিরিয়ার ভিতরে কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করে। কিন্তু অংশিদারিত্ব শীঘ্রই আলাদা হইয়া যায়। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সিরীয় রাষ্ট্রদূত ইমাদ মুস্তফা বলেন, "ইহা এমন নহে যে আমরা ইহা বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।" "সিরিয়া এখনও সহযোগিতার হাত বাড়াইতে প্রস্তুত, কিন্তু এক হাতে তালি বাজে না।" রাষ্ট্রীয় মুখপাত্র রিচার্ড বাউচার (Richard Boucher) জোর দিয়া দামেস্ককে দায়ী করেন। "কোন কোন সময় তাহারা আল-কায়েদার ব্যাপারে সহযোগিতা করিয়াছে", তিনি বলেন। "এমন এমন কিছু ব্যাপারও রহিয়াছে যাহাতে তাহারা সীমান্ত প্রশ্নে যাহা করণীয় তাহা করিয়াছে। কিন্তু... আমি বলিব না যে তাহারা বিশেষ কোন নিয়মিত চালু সহযোগিতা বন্ধ করিয়াছে। কারণ আমাদের মধ্যে নিয়মিত চালু সহযোগিতাই ছিল না।" ইহা ওয়াশিংটনেরই দোষ; মোস্তফা বলেনঃ "(আসাদ) বিশ্বাস করেন, আমেরিকার সহিত কাজ করিবার অন্য কোন বিকল্প নাই। সহযোগিতা গ্রহণে তাহাদের অস্বীকৃতিতে তিনি হতাশ হন।" (Newsweek, June, 13, 2006)।

মধ্যপ্রাচ্যে সন্দেহ দানা বাধিয়া উঠিতেছে যে, সরকার পরিবর্তন ছোঁয়াছে হইতে পারে। যদি তাহাই হয় তবে সিরিয়া বিশেষতঃ এই প্রবণতার শিকার হইতে পারে। আজকাল সিরীয়রা প্রকাশ্যে তাহাদের দেশের শ্বাসরুদ্ধকর রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলে, এবং বলে বেসরকারীভাবে বেকার সংখ্যা ২০ শতাংশ। অপরদিকে তাহাদের প্রতিবেশী লেবাননের লোকদের সিরিয়ার বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় লম্পঝম্প করিবার অবস্থাও তাহারা দেখে। অনেক সিরীয়বাসী বাশারকে উৎখাতকারী কোন জনপ্রিয় গণঅভ্যুত্থান এর কথাও ভাবে।

সেইক্ষেত্রে কে ক্ষমতায় আরোহন করিবে? সিরিয়ার অভ্যন্তরে কোন সুসংঘটিত বিরোধী দল নাই। নিষিদ্ধ ঘোষিত মুসলিম ব্রাদারহুড সদশ্যরা অনেক পূর্বেই দেশ ত্যাগ করিয়াছে। এই ব্রাদারহুড সদস্যরাই ফিলিস্তিনে হামাস গ্রুপ গঠন করে। এই ব্রাদারহুডের সদস্য হওয়া একটি চরম শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই গ্রুপের একজন দেশান্তরিত নেতা বর্তমানে লন্ডনে বসবাসরত আলী সদরুদ্দিন আল-বায়ানৌনী বলেন, "বিরোধী পক্ষ দুর্বল। বিগত চারি যুগ ধরিয়া সিরিয়ার সাধারণ রাজনৈতিক জীবন ধারাবাহিকভাবে বিনষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে... (কিন্তু) মূল কথা হইল সমগ্র সিরীয়বাসীই বিরোধী পক্ষে রহিয়াছে। এই সরকারের কোন জনপ্রিয়তা নাই।"

হাফিজ আল-আসাদের মৃত্যুর পর পক্ষত্যাগী একটি গ্রুপ, অধিকাংশই মানবাধিকার কর্মী, মাসে একবার আতাশী ফোরাম নামের এক কক্ষে মিলিত হয়। এই সেইদিন পর্যন্ত বাশার তাহাদিগকে একত্রিত হইবার অনুমতি দান করেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে এক রাত্রে নিরাপত্তা রক্ষিরা একে-৪৭ রাইফেল সহকারে কাতামা গ্রামের একটি ছোট সাদা বাড়ী অবরোধ করে। আলী আবদুল্লাহ নামের একজন আতাশী ফোরামের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষককে একটি কালো রংয়ের মার্সিডিজ গাড়ীতে উঠায়। অন্ধকারে অবস্থানরত রক্ষিরা শান্তভাবে আবদুল্লাহর পুত্রদের বলে যে তাহাদের পিতা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

[একশ তিরানব্বই]

গত সপ্তাহে (৬ই জুন -২০০৬) আলী আবদুল্লাহ্ তখনও ফিরিয়া আসেন নাই এবং ফোরামের অন্যান্য সদস্যরা পলাইয়া যায়। দামেস্কে একটি গণঅভ্যুত্থানের গুজব মানুষের মুখে মুখে ফিরিতেছে। কিন্তু বিষয়টি অতি সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অবধারিত যে বাশারের পিতা যে কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রায় তিন যুগ শাসন করিয়া গিয়াছেন তিনিও তাহাই করিবেন। (Newsweek, Jun 13, 06)।

লেবানন ঃ

সম্প্রতি লেবাননের বেকা উপত্যকায় সিরীয় সৈন্য অবস্থানের বিরুদ্ধে বৈরুতসহ সমগ্র লেবাননে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ চলিতে থাকে। অপরদিকে ইরাকে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা হামলায় সিরিয়া সাহায্য করিতেছে বলিয়া যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ উত্থাপন করিতেছে। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে গত এপ্রিল ২০০৫-এ সিরীয় সৈন্যবাহিনী দীর্ঘ ২০ বৎসর অবস্থানের পর লেবানন ত্যাগ করে। কিন্তু তারপরও লেবাননের রাজধানী বৈরুতের বিভিন্ন স্থানে আজও সিরিয়ার নেটওয়ার্ক বলবৎ রহিয়াছে। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী গত মে মাস পর্যন্ত লেবাননে ৯টি বোমা হামলা সংঘটিত হইয়াছে যাহার জন্য তাহারা সিরিয়াকে দায়ী করে। তাছাড়া সিরিয়া বিরোধী রাজনীতিবিদ যাহাদের পার্লামেন্টে শক্ত গাঁথুনী রহিয়াছে তাহারাই দেশে এবং দেশের বাহিরে সিরিয়া বিরোধী জনমত তৈরীতে ব্যস্ত। লেবাননে সিরিজ বোমা হামলার এক পর্যায়ে লেবাননের জনপ্রিয় এবং সিরীয় সৈন্য অবস্থান বিরোধী প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরী তাঁহার ২২ জন সঙ্গিসহ নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়াকে দায়ী করে।

প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরী হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে তদন্তে সিরিয়াকে পূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান জানাইয়া গতকাল মঙ্গলবার (২রা নভেম্বর ০৫) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গৃহিত হয়। এই প্রস্তাবে, তদন্তে সিরিয়া শর্তহীনভাবে সাহায্য না করিলে তাহার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ লইবার ব্যাপারেও হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়। পরিষদে উপস্থিত সিরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হারিরী হত্যাকাণ্ড তদন্তে তাহাদের সহযোগিতা না করিবার অভিযোগ নাকচ করিয়া দেন এবং অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত জাতিসংঘের এই বিল নাকচ করেন।

আন্তর্জাতিকভাবে সর্বসম্মতিতে সিরিয়ার বিরুদ্ধে একটি কড়া বার্তা পাঠাইবার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের ১৫টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে যোগ দিবার আমন্ত্রণ জানান। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কণ্ডোলিৎজা রাইস এবং রাশিয়া, চীন, বৃটেন ও ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণসহ ১২টিরও বেশী দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ বৈঠকে যোগ দেন।

হারিরী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জাতিসংঘের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর হইতে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেন এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য চাপ দিয়া আসিতেছিল। জাতিসংঘের তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, ১৪ ফেব্রুয়ারি ০৫ এর বোমা হামলায় হারিরীসহ ২২ জনের নিহত হইবার ঘটনার সঙ্গে সিরীয় এবং লেবাননী নিরাপত্তা কর্মকর্তারা জড়িত। জাতিসংঘ সনদের ৭ম অধ্যায়ের আওতায় এই প্রস্তাবটি পাস হয়। এই প্রস্তাবের আওতায়

জাতিসংঘ তদন্তকারীরা সিরিয়ার যেকোন সন্দেহভাজনকে আটক করিতে পারিবেন। ইহা ছাড়াও কমিশন যাহাকে সন্দেহভাজন মনে করে এমন যে কোন ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে এবং ভ্রমনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারিবে। এই আইন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার-আল-আসাদ, তাঁহার ভাই মাহের আসাদ এবং তাঁহার শ্যালক সামরিক গোয়েন্দা প্রধান আসিফ শওকতের জন্য একটি বড় ধরনের সমস্যা তৈয়ার করিবে।

এই তদন্তের ব্যাপারে সাহায্য না করিলে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বানও জানানো হইয়াছে। তবে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফারুক আল শাবা কোন প্রতিক্রিয়া ছাড়াই তাঁহার দেশকে অভিযুক্ত করিবার জন্য জাতিসংঘের প্রধান তদন্তকারী দেতলেভ মেহলিসের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, সিরীয় কর্মকর্তাগণ তদন্তে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়াছেন এমন কোন তথ্য প্রমাণ নাই। (BBC, AP)

ইরাক যুদ্ধের ব্যাপারে সিরিয়া গেরিলাদের সাহায্য করিতেছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট বুশ অভিযোগ করিতেছিলেন এবং সেই জন্য তিনি সিরিয়া আক্রমণ বা অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকিও দিয়া আসিতেছিলেন। এখন হারিরী হত্যাকাণ্ড তাঁহার জন্য এক অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। অতএব প্রেসিডেন্ট বুশ এই সুযোগে সিরিয়াকে কাবু করিতে সচেষ্ট হইবেন। গতকাল (১০/১১/০৫) প্রেসিডেন্ট বাশার-আল-আসাদ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন সিরিয়া হারিরী হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করিবে এবং এইদেশটি যে হারিরী হত্যাকাণ্ডে জড়িত নহে তাহা প্রমাণ করিবে।

এদিকে হারিরী হত্যাকাণ্ড তদন্তের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত তদন্ত দলটি লেবাননের প্রেসিডেন্ট এমিল লাহুদের সাথে বৈরুতে বৈঠক করে। সিরিয়াপন্থী লেবাননী প্রেসিডেন্ট লাহুদের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীসহ চারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকিবার অভিযোগ আনা হইয়াছে। উল্লেখ্য, লেবাননের সংবিধান অনুযায়ী সেই দেশের প্রেসিডেন্ট একজন খৃষ্টান এবং প্রধানমন্ত্রী একজন মুসলমান।

১০ই ডিসেম্বর ০৫, সাবেক প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরীর হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জাতিসংঘ নিযুক্ত তদন্ত কমিটির সর্বশেষ রিপোর্টের ভিত্তিতে এই হত্যাকাণ্ডে সিরিয়ার যোগসাজসের ব্যাপারে নূতন প্রশ্নের জন্ম দিবে। পূর্ববর্তী তদন্তকারী কর্মকর্তা দেতলেভ মেহালিজ জাতিসংঘ মহাসচিবের সাথে দেখা করেন। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য প্রদান হইতে বিরত থাকেন। পূর্বের ন্যায় সর্বশেষ রিপোর্টেও সিরিয়াকে আরও সহযোগিতা করিতে বলা হয়। নিরাপত্তা পরিষদ সিরিয়াকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছে এই বলিয়া যে, যদি তদন্তের ব্যাপারে পুরাপুরি সহযোগিতা না করে তবে সিরিয়া আবারও অবরোধসহ বিভিন্ন শাস্তির সম্মুখিন হইতে পারে। (UNB/AP)।

* * * *

ইসরাইল-লেবানন যুদ্ধ ২০০৬ :

লেবাননের হিজবুল্লাহ্ মিলিশিয়াদের হাতে দুই ইসরাইলী সৈন্য আটকের ঘটনায় ২২/৭/২০০৬ ইসরাইলী সেনাবাহিনী লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে স্থল ও বিমান হামলা চালায়। হামলায় লেবাননের দুই নাগরিক নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। হিজবুল্লাহ্ মিলিশিয়ারা জানায় তাহারা দুইজন ইসরাইলী সেনাকে আটক করে, যাহা ইসরাইলকে লেবাননে স্থল অভিযান পরিচালনায় প্ররোচিত করে। তাহারা আরও বলে ইসলামী রেসিস্ট্যান্স (Islami Resistance) বন্দি ও আটককৃতদের মুক্তির উদ্দেশ্যে দুইজন ইসরাইলী সেনাকে ফিলিস্তিনী অধিকৃত সীমান্ত হইতে আটক করে। ইসরাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির পেরেৎজ ইহার সত্যতা নিশ্চিত করিয়া তাহাদের ভাগ্যের জন্য সরাসরি লেবাননকে দায়ী করেন, কারণ লেবাননী মন্ত্রীসভায় একজন হিজবুল্লাহ্ সদস্যও অন্তর্ভুক্ত।

ইসরাইল লেবাননের বিরুদ্ধে নৌ অবরোধ করে। ইসরাইলী প্রতিরক্ষা সূত্র জানায় এই অবরোধের উদ্দেশ্য হইল সন্ত্রাসী ও অস্ত্র স্থানান্তরে বাধার সৃষ্টি করা। এই অবরোধ আরোপের পূর্বে লেবাননের ৩টি বিমানবন্দরে হামলা চালাইয়া ঐগুলি অকেজো করিয়া দেওয়া হয়। ফলে লেবাননের ফ্লাইটগুলিকে সাইপ্রাসের দিকে ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। এইদিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের এই হামলার নিন্দা এবং সৈন্য প্রত্যাহারের এক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহার বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করে।

এইদিকে সমগ্র লেবানন জুড়িয়া চলে ইসরাইলী ধ্বংসযজ্ঞ ও বর্বরতা। ১২ দিন ধরিয়া অব্যাহত হামলায় প্রাণ হারায় ৩৬০ জন নিরীহ মানুষ। ঘরবাড়ী ছাড়িয়া নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যায় লাখ লাখ মানুষ। বিদেশীরাও গণহারে দেশত্যাগ করে। ইসরাইলী বর্বর বাহিনীর নির্বিচার বোমা ও ক্ষেপনাস্ত্র হামলায় ধ্বংশ হইয়া যায় বৈরুত বিমান বন্দরের রানওয়ে, মহাসড়ক, সেতু, টিভি ষ্টেশন, টিভি ও মোবাইল ফোনের টাওয়ার, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ শ' শ' স্থাপনা। ইসরাইল নিজেই বলিয়াছে তাহারা শনিবার পর্যন্ত লেবাননে ১৮০০ লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। ইসরাইলের অভ্যন্তরে লাগাতার ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া পাল্টা জবাব দেয় হিজবুল্লাহ্।

এদিকে দক্ষিণ লেবাননে আগ্রাসী ইসরাইলী বাহিনীর সঙ্গে হিজবুল্লাহ্ যোদ্ধাদের চলিতেছে তুমুল লড়াই। হিজবুল্লাহ গেরিলারা ইসরাইলে আটক তাহাদের বন্দিদের মুক্তিপণ হিসাবে ১২ই জুন ২০০৬ দুইজন ইসরাইলী সৈন্যকে আটকের পর হইতে ইসরাইলের বর্বর হামলায় গতকাল পর্যন্ত লেবানিজ সেনাসহ অন্ততঃ ৩৬০ জন লেবাননী নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে সহস্রাধিক। গতকাল ২৩ জুলাই, সিরিয়া হুঁশিয়ারী দিয়া বলিয়াছে ইসরাইল লেবাননে প্রবেশ করিলে তাহারা হস্তক্ষেপ করিবে।

ইসরাইলী হামলার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়িয়া নিন্দা প্রতিবাদ সত্ত্বেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার ইসরাইলী হামলার সাফাই গাহিয়া চলিয়াছেন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট আবারও বলিয়াছেন হিজবুল্লাহ্ কর্তৃক আটককৃত দুই

সৈন্যকে মুক্তি এবং ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ না করিলে তাহাদের এই আক্রমণ চলিতে থাকিবে। ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ানের মতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন লইয়াই ইসরাইল লেবাননে হামলা চালাইয়াছে।

এদিকে বিশ্বের শিল্পোন্নত ৮টি দেশের জোট জি-৮-এর শীর্ষ সম্মেলন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে শুরু হইয়াছে। লেবাননে ইসরাইলী আগ্রাসনকে কেন্দ্র করিয়া গ্রুপের অন্তর্গত নেতাদের মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ইসরাইলের লেবানন ও গাজা আক্রমণকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী এবং জাপানের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। জর্জ বুশ বলেন ইসরাইল সন্ত্রাসী হামলা হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছে। হিজবুল্লাহ্ হইল এই সংকটের মূল। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক বলেন, লেবাননের সার্বভৌমত্ব, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তাকে যাহারা ক্ষুণ্ন করিয়াছে তাহাদের অবশ্যই নিবৃত্ত হইতে হইবে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লদিমির পুতিন অন্যায়ভাবে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ইসরাইলকে অভিযুক্ত করেন।

অপরদিকে জাতিসংঘ কর্তৃক যুদ্ধ বিরতির জন্য এক আহ্বান ইসরাইল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার দক্ষিণ লেবাননে আন্তর্জাতিক বাহিনী মোতায়েনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত লেবাননে অবিরাম এবং গাজায় ক্ষণে ক্ষণে ইসরাইলী বিমান হামলা চলিতেছে। ইসরাইল দক্ষিণ লেবাননে ২টি গ্রাম দখল করিলে হিজবুল্লাহ্র তীব্র রকেট হামলায় একটি গ্রাম ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। অন্য গ্রামটির জন্য হিজবুল্লাহ-ইসরাইল তুমুল লড়াই চলিতেছে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ গ্রুপ, বিশেষতঃ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্ট্যাডিজ ও প্রতিরক্ষা গ্রুপ 'জেনস্'-এর ধারণা অনুযায়ী ইসরাইল, লেবানন এবং হিজবুল্লাহ যোদ্ধাদের সামরিক শক্তির একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ ঃ

ইসরাইল, লেবানন ও হিজবুল্লাহ্র তুলনামূলক সামরিক শক্তি ঃ

সেনা/বিমান/নৌ

পক্ষ	সেনা	বিমান সেনা	নৌবাহিনী সেনা	রিজার্ভ	স্বেচ্ছাসেবক	মোট
ইসরাইল	১২৫,০০০	৩৫,০০০	৮০০০	৪৮০০০	নাই	২১৬০০০
লেবানন	৭২১০০	১১০০	১০০০	নাই	নাই	৭৪,২০০
হিজবুল্লাহ্	৬০০-১০০০	নাই	নাই	১০,০০০	৫,০০০	প্রায় ২০,০০০

সামরিক সরঞ্জাম

পক্ষ	ট্যাংক	জঙ্গি বিমান	যুদ্ধ জাহাজ	হেলিকপ্টার	সাবমেরিন	পরমাণু অস্ত্র	রকেট	মিজাইল
ইসরাইল	৩৬৩০	৪৭০	১৫	নাই	৩	২০০		
লেবানন	৩১০	নাই	নাই	২৪৯	নাই	নাই	নাই	নাই
হিজবুল্লাহ্	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	নাই	১৫০০০	১৬২ ক্যাটাগরির ৩০

হিজবুল্লাহ্ গেরিলা বাহিনী ঃ

১৯৯২ সালে হিজবুল্লাহ্ গ্রুপটি এক কঠিন বিতর্কে নিপতিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল লেবাননের যুদ্ধ পরবর্তী সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা না করা। দলের মহাসচিব হাসান নসরুল্লাহ্ নির্বাচনে অংশগ্রহণ সমর্থন করেন এবং পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিয়া কিছু সংসদীয় আসন প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁহার দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করেন। ইহার পর হইতে হিজবুল্লাহ্ লেবাননে একটি গণতান্ত্রিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং দেশে নিজেদের একটি বলিষ্ঠ শীয়া প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহা সত্ত্বেও তাহার জঙ্গি মনোভাব, বিশেষতঃ ইসরাইল ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে মোটেও কমে নাই। হিজবুল্লাহ্ নিজেদেরকে জাতীয় প্রতিরোধ বাহিনী হিসাবে সম্বোধন করে ও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বহাল রাখে এবং নিজেদেরকে দেশের একটি অত্যন্ত কার্যকরী সামরিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। অস্ত্র জমা দিবার জাতিসংঘ আহ্বান তাহারা অমান্য করে, যদিও দেশে এমন একটি মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে যে একটি স্বায়ত্বশাসিত সশস্ত্র গ্রুপ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা জাতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করিয়া বরং বিদেশী সিরিয়া ও ইরানী স্বার্থই অধিক তদারকি করিতেছে। (Newsweek, Jan, 22, 2006)।

অপরদিকে সিরীয় বাহিনী লেবানন হইতে প্রত্যাহারের পর হিজবুল্লাহ্‌র অজেয় শক্তি আর বাকি নাই। বর্ত্তমানে গ্রুপটি সিরিয়ার সহিত আঁতাতের খেসারত পদে পদে দিতেছে। বর্তমানে লেবাননীরা ভাবিতেছে যে সিরীয়রা হিজবুল্লাহ্‌র মাধ্যমে পুনরায় এই দেশের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। কয়েকদিন পূর্বে এক সাংবাদিকের জানাজায় হেজবুল্লাহ্ সংসদ সদস্যদের প্রতি জনতার টিটকারীসূচক ধ্বনি দ্বারা বুঝা যায় বিগত এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের মর্যাদা কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সিরীয় বাহিনীর প্রত্যাহারের পর এইভাবে হিজবুল্লাহ্ দলটি এক দ্বিধাগ্রস্ততায় পতিত হয়। সামরিকভাবে ইহা শক্তিশালী এখনও, কিন্তু যেইদেশে জাতীয় পর্যায়ের সিদ্ধান্তসমূহ লওয়া হয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিকে সেখানে এই সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্থহীন। দলটি একান্তভাবেই সিরীয় সমর্থক হইয়া উঠে এমন এক সময়ে যখন বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রধানমন্ত্রী রফিক হারিরী হত্যাকাণ্ডের পর অধিকাংশ লেবাননী এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরিয়াকে দায়ী করে। শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহ্ প্রথমবারের মত লেবাননের কোয়ালিশন সরকারে যোগদান করিলেও ইহা দামেস্কের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ। অতএব, প্রশ্ন উঠিয়াছে হিজবুল্লাহ্‌র আনুগত্য দামেস্ক তেহরানের প্রতি নাকি বৈরুতের প্রতি যাহার কোয়ালিশন সরকারে ইহা যোগদান করিয়াছে। (Newsweek, Jan, 23, 2006)।

হিজবুল্লাহ্‌র পরিচিতি সংকট আরও গভীর। ২০০০ সালে ইসরাইলকে লেবানন হইতে বিতাড়িত করিবার পর এই দলটি আশা করিয়াছিল যে সে এতদঞ্চলে ইসরাইল বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করিবে। কিন্তু বোধগম্য কারণে সে দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে ফিলিস্তিনী, বিশেষতঃ হামাস ও ফাতাহ্‌দের স্কন্ধে। সেখানে হিজবুল্লাহ্ উচ্চকণ্ঠে দাবী করে তাহাদের জনপ্রিয়তা জেহাদী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাইতেছে তাহাদের সমর্থনের ভিত্তি পৃষ্ঠপোষকদের বিশাল নেটওয়ার্কের উপর। একদা তাহাদের

নেতা নসরুল্লাহ বলেন, লেবাননের প্রয়োজন বড়মাপের ব্যক্তিত্বের এবং বড় মাপের নেতৃত্বের, পাতি নেতাদের নহে। নসরুল্লাহ্ যাহা স্বীকার করিবেন না তাহা হইল, এই সংগঠনটি ক্ষুদ্র আঞ্চলিক জেহাদে অধিক সংবেদনশীল, একটি স্থায়ী সামগ্রিক বিপ্লবের প্রতিশ্রুতির প্রতি নহে।

ধর্মীয় ব্যাপারে প্রশ্ন হইল হেজবুল্লাহ্ কি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য কাজ করিতেছে? নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বপক্ষে নসরুল্লাহ্র সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে, দলটি অ-ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মানিয়া লইয়াছে। ইদানিংকালে নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতিতে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতার চেয়ে মানব রচিত পরিকল্পনার উপরই অধিক আস্থাশীল বোঝা যায়।

শেষ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে এইসব বিপরিতমুখিতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক। কিছু একটা করিতে হইবে। গণতন্ত্র ইতোমধ্যে হিজবুল্লাহ্র উপর এই পথ বাছিয়া লইবার নির্দেশনা দিতেছে কিন্তু নির্বাচন সর্বদা এই নিশ্চয়তা দেয় না যে বাছুনি সর্বদা সঠিক হইবে।

লেবাননের সাবেক প্রধামন্ত্রী রফিক হারিরীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সিরিয়া-বিরোধী জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রবলভাবে সৃষ্টি হইয়াছিল যে, সিরিয়া এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত, কারণ লেবাননী সরকার যদিও সিরিয়ার লেবাননে অবস্থানের পক্ষে ছিল কিন্তু হারিরী ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন। অপরদিকে হেজবুল্লাহ্ গেরিলা সংগঠনও সিরিয়ার লেবাননে অবস্থানের পক্ষে ছিল। এই বিবাদকে কেন্দ্র করিয়া ইসরাইলী লবি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফায়দা হাসেল করে এবং সিরিয়াকে লেবানন ত্যাগে বাধ্য করে। ২০০৬ সালের আগস্ট মাসে হিজবুল্লাহ্ গেরিলারা ইসরাইলের দুই সৈন্যকে আটকের পর ইসরাইল লেবাননে হামলা চালায়।

সিরীয় বাহিনীর লেবাননের বেকা উপত্যকা ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলের সঙ্গে হেজবুল্লাহ্ গেরিলাদের সংঘর্ষের সুচনা করে। ইসরাইলী বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে ইতোপূর্বে তাহাদের ছাড়িয়া আসা এলাকার দিকে অগ্রসর হয়। প্রাথমিক কিছু গোলাগুলি বিনিময়ের পর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যায় এবং ইসরাইলী বাহিনী লেবাননের অভ্যন্তরে কয়েকটি এলাকায় ঢুকিয়া পড়ে। হেজবুল্লাহ্ গেরিলা বাহিনী তড়িংগতিতে তাহাদের রুখিয়া দাঁড়ায়, খোদ ইসরাইলের অভ্যন্তরে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে। গেরিলাদের প্রচণ্ড প্রতিরক্ষায় ইসরাইলী বাহিনী পিছু হটিতে বাধ্য হয়। তিনটি গ্রাম ইসরাইলী বাহিনী দখল করিয়া লইলে হেজবুল্লাহ্ গেরিলারা প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে ইসরাইলীরা ঐ গ্রাম ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হয়। অতঃপর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি পালিত হয়।

হেজবুল্লাহ গেরিলা কর্তৃক ইসরাইলকে পিছু হটিতে বাধ্য করিবার ঘটনায় প্রমাণিত হইল ইসরাইলী নিয়মিত বাহিনী অজেয় নহে। সেইসঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হইল লেবাননী নিয়মিত বাহিনীর চেয়েও হেজবুল্লাহ্ অধিক কার্যকর ও নিষ্ঠাবান। সমগ্র লেবানন তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হেজবুল্লাহ্র প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইরানের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাহারা জিহাদী মনোভাব লইয়া মরণপণ-যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। অতঃপর তাহারা বিজয় দিবস পালন করে। বিজয় র‍্যালীতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত

লেবাননী অংশ গ্রহণ করে। অপরদিকে ইসরাইলী জনগণ তাহাদের প্রশাসনের উপর বিরক্ত হয়। তাহাদের ভাষায় এই অপরিকল্পিত যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইসরাইলী ভাবমূর্তি নষ্ট হইবার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ লইয়াও তাহারা চিন্তিত হয়।

সউদী আরব ঃ

মার্কিন-সউদী আরব বন্ধুত্ব যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্ব-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য তীব্র আলোচনার বিষয়। বর্তমানে ইহা কতটুকু ধ্বংসের মুখোমুখী? জবাবে সউদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী চরম হাতাশা ব্যক্ত করেন। প্রিন্স সউদ আল ফয়সল আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত—শহুরে, বিনম্র এবং প্রায় প্রতিটি ভুলভ্রান্তির জন্য সংযত–ওয়াশিংটনে ক্রিয়াশীল অসন্তোষ শান্ত করিয়া ঝড়ের বেগে রিয়াদ ফিরিয়া আসেন। ৯/১১ই সেপ্টেম্বরের ছিনতাইকারীদের সহিত তাঁহার সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ থাকিতে পারে বলিয়া সম্মিলিতভাবে তাঁহাকে দোষারোপ করা হয়। তিনি প্রেসিডেন্ট বুশের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন ২৮ পৃষ্ঠার গোপন তালিকাভূক্ত, পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতবাহী প্রতিবেদন সাধারন্যে প্রকাশ করা হোক, কিন্তু জর্জ বুশ তাহাতে কান দেন নাই। নিউজউইক সংবাদদাতা টেলিফোনে যুবরাজকে বলেন, তাঁহার আশি বৎসর এবং সত্তর বৎসর বয়স্ক চাচাগণ—বাদশাহ্, যুবরাজ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি এতই জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহারা তাঁহাদের তৈল সমৃদ্ধ রাজত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিতেছেন?

প্রিন্স আস্তাগফিরুল্লাহ্ বলেন। "যদি কোন সরকার উত্থিত সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় তবে উহার টিকিয়া থাকিবার কোন অধিকার নাই।" কিন্তু বুশ প্রশাসনের অনেকের, যাহারা কেপিটল পাহাড়ে (মার্কিন প্রশাসনিক সদর দফতর) এবং গোয়েন্দা সংস্থায় রহিয়াছেন, এই ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া সউদী-মার্কিন অংশীদারিত্বই "একমাত্র ভরসা যাহার উপর ভর করিয়া বিশ্ব অর্থনীতি লম্প-ঝম্প করে," মন্তব্য করেন একজন সাবেক সি.আই.এ এজেন্ট রবার্ট বায়ের (Robert Baer)। কিন্তু বর্তমানে কৌশলগত সম্পর্ক যে তিক্ততায় নামিয়াছে তাহা ইতোপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। সউদী রাজকীয় পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একজন আরব এই তিক্ততাকে বর্ণনা করেন "সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত—একেবারে শেষ প্রান্তে" বলিয়া। তেল শোধাগারের বাতাসে বিস্ফোরম্মুখ জ্বালানীর যে অবস্থা, সউদী-মার্কিন বন্ধুত্বও মনে হয় অনুরূপ যে কোন সময় অগ্নিশিখায় ভষ্মিভূত হইয়া যাইবে। (Newsweek, Aug, 11, 2003)।

তবে হ্যাঁ, মরুরাজত্বে অনেক সময় দৃষ্টিভ্রমও হয়। পর্দার অন্তরালে বুশ পরিবার এবং সউদী পরিবার এখনও বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা এবং এই বাস্তবতার নিরীখে সউদী কর্মকর্তাগণ, যাঁহারা সাধারণতঃ মুখোমুখী সংঘর্ষের পিছনে থাকেন, গত সপ্তাহে অগ্রনী ভূমিকা পালন করিবার সিদ্ধান্ত লন। তাঁহারা জানেন যে বুশ প্রশাসনের জন্য বর্তমানে তাহাদের অংশীদারিত্বের বেশী প্রয়োজন এবং বুশ প[illegible]বারও তাহা জানে।

পেন্টাগনের চতুর্দিকে নবাগতরা আশা করিয়াছিলেন কলহপ্রিয় সউদী আরবের পরিবর্তে দখলকৃত ইরাকী তৈল তাহাদের চাহিদা পূরণ করিতে সক্ষম হইবে এবং বিশ্ব

তৈলের বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকিবার নিশ্চয়তা দিবে। কিন্তু ইরাকী প্রতিরোধকারীদের দমন করিবার বিপুল ব্যয় এবং পুনর্নির্মানের দীর্ঘসূত্রিতা সেই আশায় ছাই নিক্ষেপ করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময় দৈনিক ৩০ লক্ষ ব্যারেল তৈল উত্তোলন করিতে পারিলে বাগদাদকে ভাগ্যবানই বলিতে হইবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আরও বিপর্যয় নামিলে এই সংখ্যা ২০ লক্ষের উর্দ্ধে উঠিবেনা। রিয়াদ ও ওয়াশিংটনের উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের সাথে সম্প্রতি আলোচনাকারী একজন ইউরোপীয় গোয়েন্দা বিশ্লেষণকারী বলেন, "যতদিন ইরাকী তৈল পাওয়া যাইবে না ততদিন বরং দৈনিক ১ কোটি ব্যারেল তৈল উত্তোলনকারী অর্থাৎ সউদী আরবের সাথে সম্পর্কের তালগোল পাকানো ঠিক হইবে না।" (Newsweek,, Do)।

রিয়াদ ও আমেরিকান রাজনীতিবদরাও তথ্য মাধ্যমের ব্যাপারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছেন। যুবরাজ সউদ প্রেসিডেন্ট বুশকে ৯/১১-এর ঘটনাবলীর জন্য প্রণীত প্রতিবেদনের গোপন শ্রেণীভূক্ত পৃষ্ঠাগুলি প্রকাশ করিতে বলেন। কারণ, যেমনটি একজন সউদী কর্মকর্তা বলেন, "তিনি চালাক ব্যক্তি এবং ইহাও তিনি জানেন যে ঐ প্রতিবেদনের এমন কিছু নাই যাহা এতদিনে জানাজানি হইয়া যায় নাই।" যুবরাজ সউদ বলেন, "যদি ইহা (প্রতিবেদন) অর্থহীন হয় তবে ইহা অর্থহীন, আমরা ইহা ছাড়াও চলিতে পারি। আর ইহাতে যদি গ্রহণযোগ্য কিছু থাকে এবং অপরাধীদের সনাক্ত করা থাকে তবে আমরা দ্রুত তাহাদের ধরিতে পারি।" এই পর্যন্ত যাহা জানাজানি হইয়াছে তাহা হইল, ওমর আল বায়ূমী (Omar al-Bayoumi) নামক একজন ব্যবসায়ী সউদী গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করিতে পারেন। আল-বায়ূমী আবার স্যান ডিয়াগোতে দুই ছিনতাইকারীকে সঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন। তারপরেই আল বায়ূমী সউদী আরবে ফিরিয়া আসেন। তারপরও যুবরাজ সউদ নিউজউইক সাময়িকীকে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সহিত সাক্ষাতের পরেই মাত্র জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কণ্ডোলিৎসা রাইস তাঁহাকে বলেন, ওয়াশিংটন আল-বায়ূমীকে কিছু প্রশ্ন করিতে চায়। সউদের মতে তিনি এ ব্যাপারে ইতোপূর্বে সরকারী কোন অনুরোধ পান নাই, এবং তিনি রাইসকে বলেন, "তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবার জন্য আমার নিকট এ বিষয়টি আপনার তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই।"

সাবেক সি.আই.এ ব্যক্তিত্ব বায়ের (Baer) বলেন, বুশ প্রশাসন উদ্বিগ্ন যে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি সউদী নাগরিকদের বিরুদ্ধে শাস্তিযোগ্য, কিন্তু সউদী সরকার তাহাদিগকে হস্তান্তর করিবে কিনা সন্দেহ। প্রিন্স সউদ বলেন, প্রেসিডেন্ট বুশ এমনকি একান্তেও ২৮ পৃষ্ঠার এই প্রতিবেদনে আমাকে ভাগীদার করিবেন না। প্রেসিডেন্ট যুক্তিপ্রদর্শন করেন, যেমনটি তিনি প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, এই প্রতিবেদন প্রকাশ করিলে গোয়েন্দা সূত্র ও কৌশল ফাঁস হইয়া যাইবে। প্রিন্স সউদ বলেন, "তিনি (প্রেসিডেন্ট) বলেন, ইহাতে কিছু লোকের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়িবে। আমাকে ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কথা এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যাঁহার অবদান প্রশ্নাতিত। আপনারা জানেন, ইহা তাঁহার নিকট ঐশী বাণীর ন্যায়।"

সৌভাগ্যবশতঃ শেষ পর্যন্ত রিয়াদও সেই বার্তা কিছুটা লাভ করিয়াছে। ১২ই মে, ২০০৩ আত্মঘাতি বোমা হামলাকারীরা স্বয়ং সউদী আরবে আঘাত হানিলে এবং ৩৪ ব্যক্তি মারা গেলে নিরাপত্তা বাহিনী তৎপর হইয়া উঠে, এবং কখনও কখনও অস্ত্র সহকারে সন্দেহভাজন আল-কায়েদা সমর্থকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থা ওয়াশিংটনের রাগ নিরসনে অনেকদূর যায়– এবং সউদীদের ব্যাপারে তাহাদের সন্দেহ কিছুটা হইলেও বিদূরিত করে। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া রাজত্বের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফকে (Nayef) ওয়াশিংটন তাহাদের অনুসন্ধানের পথে প্রধান বাধা হিসাবে বিবেচনা করিত। এমনকি কোন কোন সউদী কর্মকর্তা তাঁহাকে অপ্রয়োজনীয় বাধা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। যুবরাজ (Crown Prince) আবদুল্লাহ্‌র এক বন্ধু নিউজউইককে বলেন, "তিনি এই বোকা অনিচ্ছাকে (অনুসন্ধানে সহযোগিতায়) সহজভাবে লন এই মনে করিয়া যে তাঁহার উপর কোন দোষ চাপান হইবে না। নিউজইউকের সাংবাদিকের মতানুসারে নায়েফ অতি সহজভাবে অন্যকে দোষারোপ করেন; এক পর্যায়ে তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, ৯/১১ আক্রমণ একটি ইহুদী ষড়যন্ত্রও হইতে পারে। (Newsweek,, Aug, 11, 2003)।

কিন্তু ঐসব দিন এখন শেষ বলিয়া মনে হয়। সি.আই.এ এবং এফ.বি.আই কর্মকর্তারা এখন প্রিন্স নায়েফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পরিবর্তনের একটি উদাহরণ ঃ নায়েফ সম্প্রতি তাঁহার পুত্র প্রিন্স মুহাম্মদকে এক নাজুক কার্যোপলক্ষে তেহরান প্রেরণ করেন। এই কাজটি ছিল এক মার্কিন-সউদী যৌথ পদক্ষেপ এবং উদ্দেশ্য ছিল আল-কায়েদা নেতৃবৃন্দ তৎসহ ওসামা বিন লাদেনপুত্র সা'দকে হস্তান্তর করিবার বিষয়ে আয়াতুল্লাহ্‌কে ঐকমত্যে আনয়ন করা। তাহাদের ধারণা সা'দ তেহরানের হেফাজতে আছেন।

সেইসঙ্গে সউদী আরবে অভ্যন্তরিন সংস্কারও জোরদার করা হয়। পরীক্ষামূলকভাবে পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালান হয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ঃ যে শিক্ষা ধর্মান্ধতা আনয়ন করে; দান খয়রাতের ক্ষেত্রে যাহা এতদিন ব্যয় হইত কথিত সন্ত্রাসী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায়। এইগুলি এখন কঠোর নিয়ন্ত্রণে আনা হয়; সরকার নিয়ন্ত্রিত মসজিদের প্রায় ২০০০ ইমামকে বরখাস্ত করা হয়। তবে সউদীদের মতে চাকুরী ফিরিয়া পাইবার জন্য পূনঃপ্রশিক্ষণ দানের নিমিত্তে। যুবরাজের একজন উপদেষ্টা বলেন, "ঐতিহাসিকভাবে যে দেশ ছিল ধীর বরফ গতির, তাহা গত বৎসরে যে গতিতে চলিয়াছে তাহাকে বলা যায় বিদ্যুৎ গতির।"

হয়ত তাহাই। পশ্চিমা সাংবাদিকদের মতে ইহার অর্থ এই নহে যে সউদী আরব আর কখনও সন্ত্রাসীদের আস্কারা দিবে না। জনগণের এক বিরাট অংশের নিকট রাজকীয় পরিবার আস্থাভাজন নহে। রাজবংশ স্বেচ্ছাচারী হইলেও কোন একক শক্ত গাঁথুনির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। অনেক বিবদমান পক্ষ ক্ষমতাকাংখী, যাহাদের সবাই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নহে। ইহা এমন একটি দেশ যেখানে বাদশাহ্‌, বাদশাহ্‌ ফাহদ দুর্বল পক্ষাঘাতগ্রস্ত– যেমনটি গোয়েন্দাসংস্থার প্রধানও। তাহাদের মধ্যে ফাহদের আপন ভাই নায়েফ প্রায় সময় সৎভাই যুবরাজ আব্দুল্লাহ্‌র সহিত বিবদমান। যুবরাজ আবদুল্লাহ্‌ ফাহ্‌দের

পক্ষে দেশ পরিচালনা করেন। মৌলিক প্রশ্ন, কে দায়িত্বে আছেন , এখন পরিষ্কার। ইহা নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে কেউ বলিতে পারে না, কতদিন সউদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরযোগ্য বন্ধু থাকিবে বা মোটেই বন্ধু থাকিবে কিনা!

সর্বশেষ খবর : বাদশাহ্ ফাহ্দ ২০০৫ সালের ১৬ নভেম্বর ইন্তেকাল করেন এবং যুবরাজ আবদুল্লাহ্ বিন আবদুল আজিজ সর্বসম্মতিক্রমে সউদী আরবের বাদশাহ্ হিসাবে বরিত হন।

মিশর ঃ

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ১৯৭৮ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ইসরাইলের সহিত স্বাক্ষরিত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং বিনিময়ে ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় ইসরাইলের হাতে দখলকৃত মিশরের মালিকানাধিন সিনাই অঞ্চল ফেরৎ পান। [পূর্বে দ্রষ্টব্য : পৃ: পনের] ইসরাইলকে কেন স্বীকৃতি প্রদান করিলেন– এই অজুহাতে মিশরের কট্টরপন্থী মুসলিম ব্রাদারহুড (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ) কর্মীদের হাতে ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রেসিডেন্ট নাসেরের আরেক ভাবশিষ্য, উদিয়মান রাজনীতিবিদ হোসনী মুবারক মিশরের প্রেসিডেন্ট মনোনিত হন। সেই হইতে এক নাগাড়ে তিনি মিশরের প্রশাসনিক কাজ চালাইয়া যান।

২৪ বছরের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পর ৭৭ বৎসর বয়সী মিশরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক বিগত সেপ্টেম্বর (২০০৫) মাসে দেশের প্রথম বহুদলীয় প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁহার স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটান। মিশরীয় এই লৌহমানব আমেরিকার বুশ প্রশাসনের চাপে পড়িয়া এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া মার্কিন পত্র-পত্রিকা মনে করে (Newsweek,, May, 8, 2006)। কারণ, বুশ প্রশাসন মনে করে মধ্যপ্রাচ্যের স্বেচ্ছাচারী সরকারগুলিকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করিতে পারিলেই কেবল ইসলামী কট্টরপন্থীদের ঠেকানো সম্ভব। কে এই নির্বাচনে জয়লাভ করিবেন এরূপ কোন কথা কশ্মিনকালেও উত্থিত হয় নাই। মুবারক এককভাবে ৮৪ শতাংশ ভোট লাভ করেন এবং তাঁহার শাসকদলীয় ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি সংসদে ৪৪৪ আসনের মধ্যে ৩২৪টি আসন লাভ করে। কিন্তু নির্বাচন অভিযানে কায়রো ও অন্যান্য নগরীতে কঠিন মুবারক-বিরোধী আন্দোলনে বাক-স্বাধীনতা এবং একটি স্থায়ী বহুদলীয় ব্যবস্থা টিকিয়া থাকিবার নূতন আশা জাগরিত হয়। কিন্তু বর্তমানে মিশরে গণতন্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রমূলক দমননীতি বিরাজ করিতেছে বলিয়া একজন পাশ্চাত্য কূটনীতিক মনে করেন, যাহাকে তিনি 'কষাঘাত' রূপে আখ্যায়িত করেন। বিরোধীদলীয় নেতাদের গ্রেফতার করা হয়, প্রতিবাদকারীদের মুখ বন্ধ করা হয়। হোসনী মুবারক ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের হত্যার পর আরোপিত জরুরী আইনসমূহ প্রত্যাহার করিবার কোন আলামতই প্রদর্শন করেন না।

[দুইশত তিন]

যুক্তরাষ্ট্র মিশরকে বাৎসরিক ১৮ লক্ষ ডলার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য বাবৎ প্রদান করিলেও সমালোচনা স্তব্দ করিয়া দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারী ২০০৬ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কণ্ডোলিসা রাইস মিশর সফরে আসিয়া শুধু বলেন, "একদলীয় সরকার শাসিত দেশগুলিকে গণতান্ত্রিক পরিবেশে ফিরাইয়া আনার প্রক্রিয়া সময়ের ব্যাপার।" ফিলিস্তিনের নির্বাচনে কট্টরপন্থী হামাস এর ক্ষমতায় আগমন এবং মিশরের নির্বাচনে মুসলিম ব্রাদারহুড এর শক্ত ভূমিকায় অনেক মিশরীয় এখন এই জনশ্রুতির সহিত একমত পোষণ করিতেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র উহার মধ্যপ্রাচ্য সংস্কার সম্পর্কীয় দায়িত্বটি পূনর্বিবেচনা করিতেছে। জর্জ ইসহাক, 'কিফায়া' (যথেষ্ট) নামক এক সংঘটনের সমন্বয়কারী যিনি হোসনী মুবারকের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ সমাবেশ সংঘটিত করিয়াছেন, বলেন, "সমগ্র বিষয়টি একটি কুহেলিকা বা ধূম্রজাল মাত্র" (Newsweek,, May 8, 2006)। কোন কোন মিশরীয় মনে করেন, গত সপ্তাহে সমুদ্রসৈকতে যাহাব (Dahab) নামক এক বিশ্রামাগারে এক বোমা হামলায় ২৪ জন নিহত হইবার ঘটনার জের ধরিয়া মুবারক এই দমননীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অভিযোগ করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উহার সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করিতেছে ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতন্ত্রপন্থীদের বিরুদ্ধে, সিনাই মরুভূমিতে ঘাঁটি গাড়িয়া বসা ইসলামী কট্টরপন্থীদের বিরুদ্ধে নহে।

পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমগুলি প্রচার করে, হোসনী মুবারকের সমস্ত আক্রোস বিগত নির্বাচনে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আইমান নূর এর উপর। একজন প্রাক্তন সংসদ সদস্য নূর ২০০৫ সালে গাদ (আগামীকাল) পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার অনর্গল সম্মোহিনী বক্তৃতায় সরকারের মধ্যে অবস্থিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনার দ্বারা এক বিরাট সমর্থকগোষ্ঠি তিনি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন। কায়রোর বিরোধীপক্ষ সমর্থক দৈনিক মিশর আল-ইয়ম (অদ্যকার মিশর) পত্রিকার সম্পাদক হিশাম কাশেম বলেন, "তিনি যুবক, তিনি মনোমুগ্ধকর এবং প্রচারাভিযানে তিনি মেধাবী। মুবারক তাঁহার ভয়ে ভীত।"

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একজন প্রার্থী হিসাবে নূর অনেক নীচে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং মাত্র ৭ শতাংশ ভোট লাভ করেন। পার্টির নিবন্ধন দলিলে জাল দস্তখত করিবার অপরাধে তিন মাস পর তাঁহাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হয় এবং তাঁহাকে ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পশ্চিমা কূটনীতিকরা বলেন, প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারকের ভয়ে বিচারকরা এই রায় দিয়াছেন।

সংসদে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী মুসলিম ব্রাদারহুডের ব্যাপারে মুবরাক কিছুটা ধৈর্যশীল। নির্বাচনে তাহারা ৮৮টি আসন লাভ করে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন সরকারদলীয় সন্ত্রাসী এবং পুলিশরা যদি ভোটকেন্দ্র বন্ধ করিয়া না দিত এবং ভোটারদের বেদম পিটুনি না দিত তবে এই সংখ্যা ১২০ পর্যন্ত উঠিত। ব্রাদারহুড প্রতিনিধিরা সংসদে মুবারক সরকারের সমালোচনা করে এবং অভিযোগ করে যে সরকারের অবহেলার কারণে দেশে বার্ড ফ্লু রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে, এবং লোহিত সাগরে ডুবিয়া যাওয়া ফেরীর মালিককে সরকার বেকসূর খালাস দিয়াছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে সরকার আঘাত হানে এবং কয়েক

ডজন আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করে (Newsweek,, May, 8, 2006)।

প্রেসিডেন্ট হিসাবে হোসনী মুবারকের ইহাই বোধ হয় শেষ মেয়াদ। পরবর্তী নির্বাচন ২০১০ বা ২০১১ এর পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে না। বিশ্লেষকরা মনে করেন, মুবারক তাঁহার রাজনৈতিক সংস্কারসমূহ বাস্তবায়ন পিছাইয়া দিবেন যাহাতে তাঁহার প্রতিবন্ধী উত্তরাধিকারী সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র জামাল মুবারক এর ক্ষমতারোহন সহজ হয়। বিগত বৎসরগুলিতে জামাল মুবারকের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বেশ উর্দ্ধমুখী।

মিশরের নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের ৮০ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করিয়াছে সে দেশের পুলিশ। ১৫ ফেব্রুয়ারী ০৭ বৃহস্পতিবার রাজধানীর কায়রো এবং নীল উপত্যকায় অভিযান চালাইয়া ইহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের অধিকাংশ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। বিরোধী প্রচারণার সাথে যুক্ত থাকিবার কারণে তাহাদিগকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের নিকট সরকার বিরোধী বিপুল পরিমাণ বই এবং লিফলেট পাওয়া যায়। অভিযানের পর ব্রাদারহুডের ডেপুটি মোহাম্মদ হাবিব সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, মিশরে রাজনীতিতে আমাদের প্রান্তিক করিয়া ফেলিবার সরকারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই গ্রেফতার অভিযান। ইহা ছাড়াও সূরা কাউন্সিলের নির্বাচনে আমরা যাহাতে অংশ লইতে না পারি সেই ব্যবস্থার অংশ হইল এই গ্রেফতার। (এন.এন.বি)।

বন্দর ও পরমাণু কর্মসূচী মুসলমানদের জন্য নহে ঃ

আজকের পশ্চিমা বিশ্বে খোলাখুলিভাবে ইসলাম ও আরবদের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং অপমান প্রকাশ করাই যেন সমাজের একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাপার। "দুবাই বন্দর চুক্তি" মুখ থুবড়াইয়া পড়াটা ইহার সর্বশেষ জ্বলন্ত উদাহরণ। আমেরিকার রাজনৈতিক ডামাডোলের কারণে দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে পেশাদার বন্দর পরিচালনাকারী ডিপি ওয়ার্ল্ডকে (D.P. World) কোন চুক্তি করা হইতে জোর পূর্বক বিরত রাখা হয়। এই রাজনৈতিক বিতর্কের মূল বিষয় এই যে, ডি. পি. ওয়ার্ল্ড আরবদের মালিকানাধিন একটি প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ও গণমাধ্যমের জোর প্রচারণা ছিল ঃ "আমাদের বন্দর হইতে আরবদের দূরে রাখ।" কাহারও এই কথা স্মরণ করিবার গরজই পড়ে নাই যে, সৌদী আরব এবং উপসাগরীয় দেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানীসমূহে ১২,১০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করিয়াছে। ইসলাম বিদ্বেষী দুই দলীয় একটি জোট যাহার মধ্যে রহিয়াছে রক্ষণশীল ইভাঞ্জালিকাল খৃষ্টান (Evangalical Christian), প্রচার সর্বস্ব ডেমোক্র্যাট এবং শক্তিশালী ইসরাইলী লবি–যাহারা প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে বন্দর সংক্রান্ত এই পরিকল্পনা প্রত্যাহারে বাধ্য করিয়াছে। ইহার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মিত্র সংযুক্ত আরব আমিরাতের গালে প্রচণ্ড থাপ্পড় মারা হয়। কিন্তু বিনা বাক্যে তাহারা নিজেদের গুটাইয়া লয়।

ভারত সফরের সময় পরমাণু নীতির ব্যাপারে দ্বৈতনীতিমূলক চুক্তি স্বাক্ষর শেষে জর্জ বুশ দেশে ফিরিয়া আসিবার পরপরই নোংরা ব্যাপারটি ঘটিয়া যায়। বছরের পর বছর

পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের কথা প্রচারের পর বুশ ভারতকে পরমাণু জ্বালানী এবং গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু প্রযুক্তি দিতে রাজি হন। তিনি এই সময় ভারতের পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনের ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেও পুরানা মিত্র পাকিস্তানের সাথে এই ধরনের কোন চুক্তি করিতে অস্বীকার করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভারতের জন্য পরমাণু অস্ত্র তৈরী সঠিক হইলেও মুসলিম দেশ পাকিস্তান ও ইরানের ক্ষেত্রে তাহা অগ্রহণযোগ্য। ভারত আন্ত-মহাদেশীয় এবং সমুদ্র হইতে নিক্ষেপণযোগ্য পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বানাইবার চেষ্টায় মার্কিন সহায়তা পাইলেও পাকিস্তানকে এই ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। এমনকি তাহার পরমাণু স্থাপনার উপর হামলার হুমকিও দিতেছে যুক্তরাষ্ট্র।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিকচেনী মার্কিন ইহুদী লবির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে পরমাণু কর্মসূচীর জন্য ইরানের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধের হুমকি প্রদান করেন, যদিও ইরানের এই ধরনের অস্ত্রের কোন অস্তিত্ব আছে কিনা তাহা লইয়া সবাই সন্ধিহান। কিন্তু ভারতের নিকট নিক্ষেপণযোগ্য একশতের মত পরমাণু বোমা এবং ইসরাইলের নিকট এই ধরনের দুই শত বোমা আছে। অবাধ্য মুসলিম বিশ্বের কারণে 'দুর্বৃত্তচক্রের' পরমাণু শক্তিধর সদস্য উত্তর কোরিয়াকে বাধ্য করিবার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে ওয়াশিংটন। ধারণা মতে, পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র, যেমন ঃ ইরাক বা ইরানকে আক্রমণ করা বাস্তবে এই অস্ত্রধারী রাষ্ট্র (উঃ কোরিয়া) আক্রমণ করিবার চাইতে অবশ্যই অনেক বেশী নিরাপদ।

ভারত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর অম্লান বদনে বুশ আবার পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধের প্রয়োজনীয়তার দাবী করিতে থাকেন। ইহার কয়েকদিন পর বিবিসি এক চমকপ্রদ সংবাদ প্রকাশ করিয়া জানায়–১৯৬০ এর দশকে গোপনে বৃটেনের সরবরাহ করা পরমাণু উপাদানের সাহায্যে ইসরাইল এই জাতীয় বোমা তৈয়ার করে। পরে তাহারা তৈয়ার করে হাইড্রোজেন বোমা। অদ্ভূত ব্যাপার হইল পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরক বাড়াইয়া বিরল উপাদান ট্রিটিয়াম ব্যবহারের ব্রিটিশ প্রযুক্তি ইসরাইল পরে ভারতের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়।

অস্ত্র বিস্তার রোধে বৃটেনের উন্নাসিক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যখন ইরাকের তথাকথিত ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের ব্যাপারে উপদেশ বাণী দেন তখন অনেকেই তাহাতে মজা পান। তাঁহার নৈতিকতা যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক দখলের সময় গণমাধ্যমে প্রচারিত রসিকতাগুলির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। "আমরা অবশ্যই জানি, ইরাকের কাছে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র আছে। ইহা প্রমাণ করিবার মত কাগজপত্রও আছে আমাদের কাছে।" [কানাডার বিশিষ্ট সাংবাদিক এরিক. এস. মারগোলিস কর্তৃক লিখিত এবং দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত : মার্চ ২০০৬]।

তুরস্ক ঃ

গণবিধ্বংসী অস্ত্র এবং আল-কায়েদার সাথে ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সম্পর্কের বিরুদ্ধে আগ্রাসন পরিচালনার পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের ভূমি ব্যবহারের অনুমতি চাহিলে তুরস্ক এক জটিল অবস্থায় নিপতিত হয়। গত উপসাগরীয় যুদ্ধে

যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধে সাড়া দিয়া তুরস্ক ইরাক আক্রমণে অংশগ্রহণ করিলে সাদ্দাম হোসেন তাহার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ঘোষণা করেন। ফলে তুরস্ক ৪০০০ কোটি ডলার হারায় ব্যবসা হাতছাড়া হইবার কারণে। শুধু তাহাই নহে, তুরস্কে অবস্থানরত কুর্দি উদ্বাস্তু কর্তৃক উসকাইয়া দেওয়া এক গেরিলা যুদ্ধে কুর্দি ওয়ার্কার্স পার্টি বা পি.কে.কে. তুরস্কের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সাদ্দাম ঐ উপসাগরীয় যুদ্ধে পরাজিত হন– কিন্তু তুরস্ক মনে করে তাহারাও পরাজিত হইয়াছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাবাহাট্টিন কাকমাকগ্লু (Sabahattin Cakmakoglu) বলেন, "ঐ ধরনের অভিজ্ঞতা আমরা আর চাই না।"

তবে তাহাতে তুরস্কের গত্যন্তর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুক্তরাষ্ট্র সাদ্দামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতরণ করিলে তুরস্কের ঘাটি তাহারা ব্যবহার করিবেই। ন্যাটোর একজন সদস্য হিসাবে এবং বিশ্বব্যাংকের (IMF) একজন খাতক হিসাবে তুরস্কের 'হ্যাঁ' বলিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রহিয়াছে। আবার 'না' বলিবার পক্ষেও যথেষ্ট যুক্তি তাহার রহিয়াছে। ইরাকের বিরুদ্ধে তুর্কি বিমান ঘাঁটি ব্যবহারের বিরুদ্ধে দাঁড়ান বা পক্ষে দাঁড়ান তুরস্কের পক্ষে সত্যিই কঠিন কাজ।

সাদ্দামের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার দাঁড়াইবার মধ্যে যথেষ্ট ঝুঁকি রহিয়াছে। সবচাইতে বড় ঝুঁকি হইল ইহার দ্বারা একটি স্বাধীন কুর্দিস্তানের জন্ম হইতে পারে। অতঃপর সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় থাকুন বা না থাকুন কুর্দি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন জোরদার হইবে। ১৯৯৯ সালে তুরস্ক শক্তিশালী হয় যখন তাহারা কুর্দি মুক্তিকামী নেতা আবদুল্লাহ ওসালানকে গ্রেফতার করে। অতঃপর কুর্দি এলাকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার ন্যায় জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে তুরস্ক উত্তর ইরাক নিয়ন্ত্রণকারী কুর্দি নেতাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টায় আশাতীত ফলোদয় হয়। কুর্দি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (KDP) সর্বোচ্চ নেতা মাসুদ বার্জানী পি. কে. কে এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নিন্দা করেন এবং দাবী করেন, "গণতান্ত্রিক ইরাকের আওতায় কুর্দিস্তানের জনগণের জন্য একটি ফেডারেল সরকার গঠনের বাহিরে তাহাদের আর কোন দাবী নাই।" (Newsweek,, Jan, 7, 2002)।

এখন প্রশ্ন আসে, যুক্তরাষ্ট্র যদি উত্তর ইরাকের কুর্দি গ্রুপগুলিকে, যাহাদের সহিত দক্ষিনের শীয়া বিদ্রোহীদের সম্পর্ক রহিয়াছে, সাদ্দামকে উৎখাতের জন্য ব্যবহার করে, যেমনটি তাহারা উত্তর আফগানিস্তানের জোটগুলিকে তালেবানদের হটাইবার কাজে ব্যবহার করিয়াছিল, তবে ইহা গণহত্যার রূপ ধারণ করিবে এবং সমগ্র এলাকাটিকে এক চরম ধ্বংসের দিকে টানিয়া আনা হইবে"—মন্তব্য করেন তুর্কি বৈদেশিক উপমন্ত্রী ওজডেম স্যানবার্ক (Ozdem Sanburk)। তবে সে সময় যদিও যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণের ব্যাপারে মনস্থির করে নাই, কিন্তু তাহারা তুরস্কে অবস্থিত ন্যাটোর র‍্যাডার ব্যবস্থা ব্যবহার করিতে থাকে, যাহাতে উত্তর ইরাকের উপর নজরদারী করা যায়।

তুর্কি প্রধানমন্ত্রী বুলেন্ত এসিভিট (Bulent Ecevit) এর সহিত সাদ্দামের ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা খুব কম বিশ্বনেতৃবৃন্দের সহিতই রহিয়াছে। শীঘ্রই তাঁহার ওয়াশিংটন সফরের পরিকল্পনা রহিয়াছে। ধারণা করা হয় বুশ প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গ তাঁহার

ইরাক যুদ্ধে জড়াইবার ব্যাপারে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হইবেন। এসিভিট এর সামরিক বাহিনীর রাজনীতি-সচেতন মহলের সহিত সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহারা তুর্কি ভূখন্ডের বাহিরে সামরিক ঝুঁকি লইবার বিরোধী। আবার এসিভিটই প্রথম সারির প্রধানমন্ত্রীদের একজন যিনি উপসাগরীয় যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম সাদ্দামের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি এই বিষয়ে সন্দেহাতিত হন যে সাদ্দামকে কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক উপায়ে জয় করা যায়, জোর খাটাইয়া নহে। এই পন্থাই তিনি অবলম্বন করেন। ইরাকের সহিত তাঁহার ব্যবসা বিনিয়োগ একশত কোটি ডলারে উন্নিত হয় যাহার অধিকাংশই কুর্দিদের মাধ্যমে আধাআইনানুগ তৈল ব্যবসার দ্বারা।

এইখানেই তুরস্কের দ্বিধাগ্রস্ততা। দক্ষতা ও রাজনীতির নিরীখে তুরস্ক ইরাকের বিরুদ্ধে যে কোন সামরিক ব্যবস্থার বিরোধী। অপরদিকে সে আমেরিকান ও ন্যাটোর শুভেচ্ছার উপর এত গভীরভাবে নির্ভরশীল যে কিছুতেই এই ব্যাপারে নেতিবাচক ভূমিকা রাখিতে সে পারে না। ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাল মিলাইয়া সেও আমেরিকার এই যুদ্ধংদেহী মনোভাবের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতে পারে, অথবা সময় ক্ষেপণ করিতে পারে। কিন্তু ওয়াশিংটন অত ধৈর্য ধরিতে পারে না। মার্কিন কূটনীতিকগণ তুরস্ক না বলিলেও ইহাকে 'হ্যাঁ' ধরিয়া তাহাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে, বা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে তুরস্কের জন্য ইহা হইবে দ্বিতীয় উপসাগরীয় যুদ্ধ। (Newsweek,, Do)।

ইতোমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের ব্যাপারে তুর্কি সশস্ত্র বাহিনী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সাধারণতঃ যখন সামরিক বাহিনী কথা বলে তখন আংকারার রাজনীতিকগণ চুপ করিয়া শুনেন। ইহা চীফ অব জেনারেল স্টাফ এর এমন শব্দ ব্যবহার করা নহে যাহা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। বরং বেসামরিক সরকারের যাহারা তাহাদের (সেনাকর্মকর্তা) কথামত চালিবেনা তাহাদিগকে বরখাস্ত করাই তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্বে তুর্কি জেনারেলগণ একজন গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলায়। তাহার পর তিনজন প্রধানমন্ত্রীকে তাহারা বহিষ্কার করে– শেষ বহিষ্কার ১৯৯৮ সালে। এখন সামরিক কর্মকর্তাগণ পুনরায় কথা বলেন, যতদূর স্মরণ করা যায় প্রথমবারের মত আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। তুরস্কের বিচিত্রময় ইতিহাসের প্রতি যাহারা নজর রাখেন তাহাদের মনে এই কথাটি অবশ্যই উদিত হইবে যে দেশটি কোন দিকে যাইতেছে, এবং দেশটি কি উহার পুরাতন পশ্চিমা জোট হইতে সরিয়া যাইতেছে? (Newsweek, June, 16, 2003)।

কেউ অবশ্য আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের কথা চিন্তা করেন না। কিন্তু গত সপ্তাহে বেশ কিছু সেমিনার আলোচনা সভায় উচ্চপদে সমাসিন জেনারেলগণ আক্রমণাত্মক ভাষায় জাতীয়তাবাদের পক্ষে কথা বলেন। ইউরোপে যোগদানের প্রতি এখনও তাহাদের অঙ্গিকারের কথা দাবী করিয়াও চীফ অব জেনারেল স্টাফ হিলমী ওজকাক (Hilmi Ozkok) ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য তুরুস্কের সদস্যপদের আবেদনের ব্যাপারে ইইউর (EU) দ্বৈত ভূমিকার সমালোচনা করেন। আরেক সিনিয়ার অফিসার

তুরস্কের ১২ মিলিয়ন জাতিগত কুর্দিদের আরও অধিক অধিকার প্রদানের ইউরোপীয় আহ্বানকে "জাতীয় ঐক্যের জন্য একটি হুমকি" হিসাবে আখ্যায়িত করেন। এমতাবস্থায় বেসামরিক সরকার এক দোদল্যমান অবস্থায় নিপতিত হয়— ইহা লইয়া সংসদে বিতর্কে লিপ্ত হইবে, নাকি ব্রাসেলস কর্তৃক ঘোষিত কিছু জরুরী সংস্কারে মনোনিবেশ করিবে। এই কারণে ইউরোপীয়রা আংকারার সহিত ইইউতে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিতে বিলম্ব করে।

এইদিকে আমেরিকার সমালোচনা করা হয় এই বলিয়া যে সে ইরাকের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে আংকারার প্রতি আহ্বান জানায়, কিন্তু উত্তর ইরাকে তুরস্কের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমেরিকা চিন্তা করে না। অপরদিকে তুরস্কের জাতীয় সংসদ তাহার ইরাক যুদ্ধে অংশগ্রহণ বাতিল করিয়া দিলে যুক্তরাষ্ট্র বেকায়দায় পড়ে। তারপরও আমেরিকা তুরস্কের জন্য ১০০ কোটি ডলার মঞ্জুর করে এবং বৈদেশিকমন্ত্রী কলিন পাওয়েল তুরস্ককে "উত্তম বন্ধু" হিসাবে আখ্যায়িত করিয়া একযোগে কাজ করিবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের ব্যাপারে বাধা হইল ব্রাসেলস ঘোষিত সংস্কার বাস্তবায়ন করা, যথা মানবিক অধিকার নিশ্চিত করা। মানবিক অধিকার হইল বাক স্বাধীনতার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা, পুলিশী ক্ষমতা হ্রাস করা এবং বিচার বিভাগের সংস্কার করা–সেই সঙ্গে কুর্দিদের আরও কথা বলিবার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং তাহাদের ভাষার উৎকর্ষ সাধনের অধিকার প্রদান করা। তুর্কি সংসদ এইসব বিষয় পাশ করিবার পক্ষে। কিন্তু বাদ সাধে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council)। ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানের তুর্কি আশা-আকাংখা তছনছ হইয়া যাইবে যদি সেনাবাহিনী সর্বশেষ প্রতিক্রিয়া সংস্কার প্রস্তাবনা নাকচ করিয়া দেয়। নাকচ না করিলেও উহার প্রতিক্রিয়া হইবে নাটকীয়। দীর্ঘমেয়াদে, ইউরোপের প্রতি তুরস্কের বক্রগতির অর্থ হইল রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর ভূমিকার পরসমাপ্তি। সামরিক বাহিনী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন দেশের প্রতি ইউরোপীয়দের দুর্বলতা নাই। সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষমতা হ্রাসকারী যেকোন পদক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার ইঙ্গিত দেয় জেনারেলরা। অন্যথায় তাঁহারা এইসব বিশেষতঃ মানবিক ব্যাপারকে হাল্কাভাবে লইবার জন্য ক্ষমতাসিন এ. কে পার্টিকে (AK Party) বলিতে পারেন, কারণ পূর্ববর্তী সরকারগুলির ন্যায় এইদলও পাছে ক্ষমতা হারায়। (Newsweek, Jun, 16, 2003)।

অপরদিকে প্রতিবেশী সিরিয়া ও ইরানে মার্কিন বিমান বাহিনীর সগর্জন আনা-গোনার প্রতিবাদ করে আংকারা। কারণ অন্যথায় উত্তর ইরাকে মার্কিন নীতিতে আংকারা ভয় পায় পাছে কুর্দিরা স্বাধীন হইয়া যায়।

বর্তমান পরিস্থিতি ঃ

ইরাক আক্রমণে আংকারা তাহার ভূখণ্ড ব্যবহার হইতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী কুর্দিদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই এখন তুরস্কের প্রধান মাথা ব্যাথার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রায় ২ লক্ষ তুর্কি সৈন্য ট্যাংক ও

হেলিকপ্টার সহকারে ইরাকের পার্বত্য সীমান্তে জড়ো করা হয়। কুর্দি অর্থনীতির চালিকাশক্তি হইল আমদানিকৃত মালামাল ও খাদ্যদ্রব্য যেগুলি তুরস্কের মধ্য দিয়া কুর্দিস্তানে আনা হয়। বিগত কয়েকদিনে মালামাল আনানেয়াকারী ট্রাকের সংখ্যা দৈনিক ১,০০০ হইতে মাত্র দুই/একশত ট্রাকে নামিয়া আসে। তুর্কি সামরিক মুখপাত্র জানায় এই সৈন্য মোতায়েনের উদ্দেশ্য হইল কুর্দি পি.কে.কে বিদ্রোহী গ্রুপের সদস্যরা যাহাতে ইরাকের ক্যাণ্ডিল পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত তাহাদের ঘাঁটি হইতে নির্গত হইয়া তুরস্কে প্রবেশ করিতে না পারে। কিন্তু বাগদাদে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের (মার্কিন নিয়ন্ত্রিত) রাগান্বিত কর্মকর্তাগণের মতে, গত সপ্তাহে পি.কে.কে-র সদস্যদের খোঁজে তুর্কি গেরিলাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৫ কিলোমিটার ইরাকী ভূখণ্ডে ঢুকিয়া পড়ে। এই অনুপ্রবেশ ভয়াবহ সংঘর্ষের সূচনা করিতে পারে।

দেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের তুলনায় ইরাকী কুর্দিস্থান অনেক শান্ত। বাগদাদের তুলনায় এখানে সাম্প্রদায়িক সংঘাত নাই বলিলেই চলে। কিন্তু উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইতেছে। মোকতাদা আল সদরের শীয়া মিলিশিয়ারা তৈল সমৃদ্ধ কিরকুকের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিরকুককে তাহারা কুর্দিস্থানের অংশ বলিয়া বিবেচনা করে। প্রতিবেশী ইরানে গতমাসে (এপ্রিল, ২০০৬) প্রায় ১০,০০০ সৈন্য পি.কে.কে সমর্থক বিদ্রোহীদের উপর হামলা চালায়। এইসব বিদ্রোহীরা এ অঞ্চলে ইরানের বশ্যতা স্বীকার করে না। ক্যাণ্ডিলে অবস্থানরত ৫,০০০ এই ধরনের গেরিলাদের ব্যাপারে তুরস্ক হতাশ। বিগত ২ মাসে পি. কে. কে. এবং ইহার রাজনৈতিক সাথীরা তুরস্কের অভ্যন্তরে যে অভিযান শুরু করিয়াছে তাহা বিগত কয়েক যুগেও দেখা যায় নাই। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একনাগাড়ের হঠাতাক্রমণে ৮জন সরকারী সৈন্য নিহত হয়। পি.কে.কে দ্বারা ইস্তাম্বুলে প্রোথিত ২টি বোমার আঘাতে ১৪ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়।

আংকারা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারে ক্রমশঃ অধৈর্য হইয়া উঠিতেছে; কারণ তাহারা পি. কে. কে সমস্যার সমাধান করিবে বলিয়া তুরস্ককে কথা দিয়াছিল। গত সপ্তাহে চীফ অব স্টাফ জেনারেল হিলমী ওজকক্ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী তুরস্ক নিজেকে রক্ষা করিবার অধিকার রাখে। ইহার দ্বারা তিনি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পি. কে. কে. ঘাঁটিতে প্রচণ্ড আক্রমণের আভাস প্রদান করেন। (২০০৩ সালে প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের পতনের পূর্বেও তুর্কি সেনাবাহিনী প্রায় নিয়মিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া পি. কে. কে বিদ্রোহীদের ধাওয়া করিত এবং কখনও কখনও স্থানীয় কুর্দিদের সহায়তাও লওয়া হইত, যাহাদের সহিত পি. কে. কে-এর বিরোধ ছিল)। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ্ গুল গত সপ্তাহে আংকারায় মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কণ্ডোলীৎসা রাইসকে অনুরোধ করেন যাহাতে এই উত্তেজনা নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। জবাবে রাইস বলেন, ইরাকের নড়বড়ে নিরাপত্তার কারণে সীমান্ত অতিক্রমকারী আক্রমণে একটি অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারে। (Newsweek, May, 6, 2006)।

ওয়াশিংটন দুই মিত্রের মধ্যখানে আবদ্ধ—এক ন্যাটো সদস্য তুরস্ক, মুসলিম বিশ্বে তাহার সবচাইতে নিকটতম বন্ধু, দুই ইরাকী কুর্দিগণ যাহারা ইরাকে তাহার সর্বঘনিষ্ঠ

মিত্র। অধিকার বলে পি.কে.কে-কে দমন করিবার দায়িত্ব ইরাকী সরকারের, বলেন একজন সিনিয়র ইরাকী কর্মকর্তা যিনি তাঁহার পরিচয় জানাইতে নারাজ। তিনি বলেন, "আমরা আমাদের ভূমি হইতে তুরস্কের উপর কোন পি.কে.কে. আক্রমণ হইতে দিব না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাও সুস্পষ্ট।" একজন মার্কিন কর্মকর্তা, তিনিও তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করিতে নারাজ বলেন, ওয়াশিংটন সদা সর্বদা চেষ্টা করিতেছে যাহাতে স্থানীয় কুর্দিরা নিজেরাই তুর্কি আক্রমণের পূর্বেই পি.কে.কে-এর উপর হামলা চালায়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত জালমে খলিলজাদ (Zalmay Khalilgad) এরও অনেক যুক্তি আছে। একটি হইল, কুর্দিরা একান্তভাবে কামনা করে তাহাদের এলাকায় একটি স্থায়ী মার্কিন সামরিক ঘাটি বসানো হউক, যাহাতে বাগদাদে কখনও কুর্দিবিরোধী কোন সরকার আসিলে উহাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে। আরেকটি হইল, তৈল সমৃদ্ধ কিরকুকে শীয়াদের কোন মতলব থাকিলে উহাকে যাহাতে মার্কিনীদের সাহায্যে প্রতিহত করা যায়। ভবিষ্যতে তৈলের রাজস্ব যাহাতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে না পারে তাহার জন্যও ওয়াশিংটনের সাহায্য প্রয়োজন।

এখন বড় প্রশ্ন হইল ইরাকী কুর্দিরা কেন পি.কে.কে বিদ্রোহীদের উপর হামলা করিতেছে না, যাহাদের সহিত ইতোপূর্বে প্রায়ই তাহাদের সংঘর্ষ হইত। একটি কারণ এই যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের আমলে ইরাকী কুর্দিদের নড়বড়ে স্বায়ত্বশাসন প্রায় নির্ভর করিত আংকারার শুভেচ্ছার উপর। এই শুভেচ্ছা পি.কে.কে-কে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সহায়ক ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইরাকী কুর্দিরা অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী। এই প্রথমবারের মত, নামে না হইলেও কার্যত তাহাদের একটি রাজনৈতিক জাতিসত্ত্বা গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাই তুরস্কে বসবাসকারী তাহাদের ১৪ মিলিয়ন স্বদেশীদের জাতিগত আশা আকাংখার সমর্থন দিতে তাহারা আগ্রহী। সোজা কথায় তুরস্ক যদি আন্তঃসীমান্ত হামলা বন্ধ না করে তবে ইহা তুরস্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিদ্রোহীদের প্রতি সমর্থনেরই ইঙ্গিত। কুর্দিস্তান আঞ্চলিক সরকারের নেতা মাসুদ বার্জানী গত সপ্তাহে সতর্ক করিয়া দেন, তুরস্ক যদি আমাদের লোকদের লাভবান হওয়া বা প্রাগ্রসর হওয়ার পথে "বাধা দিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে তুরস্কের নিজস্ব স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা" বিঘ্নিত হইবে। এই ধরনের কথাবার্তার দ্বারা পি.কে.কে-কে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য তুরস্ককে আরও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে এবং এইজন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ ইরাকী ভূখণ্ডে ঠেলিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।

এদিকে তুরস্কে কারাবন্দি কুর্দি (পূর্বে দ্রষ্টব্য চতুর্থ সংস্করণ, তুরস্ক, পৃ. চুরানব্বই) বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা আবদুল্লাহ ওসালানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া যে দাবী উঠিয়াছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছে তুর্কি বিচার মন্ত্রণালয়। ওসালানের আইনজীবীরা বলিয়াছেন পরীক্ষা করিয়া তাঁহার দেহে উচ্চমাত্রার বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা তাঁহার দেহে প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়। কিন্তু তুরস্কের কর্মকর্তারা বলিতেছেন, ওসালানের আইনজীবীরা তাহাদের মক্কেলের দিকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ টানিবার জন্য এই ধরনের দাবী তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ওসালান গুরুতর অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

প্রসঙ্গত : আবদুল্লাহ্ ওসালান ১৯৯৯ সাল হইতে ইস্তাম্বুলের নিকট একটি কারাগারে আটক রহিয়াছেন। তুরস্কে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী অভিযানের জন্য ওসালানকে অভিযুক্ত করা হয়। ঐ অভিযানে ৩০ হাজার মানুষ নিহত হয়। (BBC)।

শীয়া-সুন্নি প্রশ্নে সৌদী আরব ও ইরান :

ইরাকে জাতিগত সংঘাত ও সহিংসতারোধ করিতে একযোগে কাজ করিবার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করিয়াছেন সৌদী বাদশাহ্ আবদুল্লাহ্ ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদ। ইরাকের শীয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব যেন গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া না পড়ে সেইজন্য কার্যকর পদক্ষেপ লইবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন উভয় নেতা। দুইদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ৩রা মার্চ ০৭ সৌদী আরব পৌঁছেন মাহমুদ আহমদিনেজাদ। ঐদিনই উভয় নেতা বৈঠকে বসেন। বৈঠক শেষে সৌদী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাউদ আল-ফয়সল সাংবাদিকদের বলেন, "মধ্যপ্রাচ্যে দাঙ্গা ও সংঘাতের বিস্তাররোধে প্রয়োজনীয় যেকোন পদক্ষেপ লইতে সম্মত হইয়াছে ইরান ও সৌদী আরব। "ইরাকের শীয়া-সুন্নি দাঙ্গা যাহাতে গোটা অঞ্চলকে গ্রাস করিতে না পারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ লইতে উভয় নেতা একমত হইয়াছেন। তাহাছাড়া লেবানন সংকট নিরসনে সৌদী আরবকে সহায়তা প্রদানের আশ্বাসও দিয়াছেন ইরানী প্রেসিডেন্ট।

সর্বশেষ প্রতিবেদন ঃ আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক যুক্তরাজ্যের জন্য ভয়ংকর হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে :

আল-কায়েদা নেটওয়ার্ক যুক্তরাজ্যের জন্য মারাত্মক ও ভয়ংকর হুমকি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবিষ্যতে এই হুমকি সামাল দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। সম্প্রতি প্রকাশিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের এক রিপোর্টে এইকথা বলা হয়। রিপোর্টে বলা হয় ইরাক যুদ্ধ চরমপন্থি গোষ্ঠিগুলিকে আরও শক্তিশালী করিয়াছে। ইরাক হইতে নানা ধরনের খবর আসিতেছে। ইরাক এখন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে।

কমিটির চেয়ারম্যান মাইক গেপস্ বলেন, আল-কায়েদা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের শনাক্ত করা খুবই কঠিন। ছোট খাট সাফল্য দেখা দিলেও ইহা আগের চাইতে আরও অধিক শক্তি লইয়া আমাদের সামনে সমুপস্থিত। রিপোর্টে আরও বলা হয় সন্ত্রাস বিষয়ক প্রচারণা মোকাবিলায় আরব ও ইসলামী বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হইয়াছে খুবই সামান্য। গুয়ানতানামো বন্দি শিবিরের অস্তিত্ব মার্কিন নৈতিক ক্ষমতা ভুলুণ্ঠিত করিয়াছে। ইহাছাড়াও আফগান পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে কমিটি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। সম্প্রতি ব্রিটিশ সৈন্যদের আফগানিস্তানে কেন মোতায়েন করা হইয়াছে সরকারের কাছে এমপিরা তাহার ব্যাখ্যা চাহিয়াছে। কমিটি রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ইরাক হইতে ব্রিটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করিবার সুপারিশ করে। রিপোর্টে বলা হয় যে, ইরাকে নিরাপত্তা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। দেশটির মারাত্মক দাঙ্গা ও জাতিগত সহিংসতা খুবই উদ্বেগজনক। তাছাড়া রিপোর্টে কোয়ালিশন বাহিনীর হাতে

বন্দির সংখ্যাসহ অন্যান্য ইস্যুর জবাব দিবার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়। ইরান ইস্যু লইয়াও রিপোর্টে আলোচনা করা হয়। কমিটি ইরাকে ইরানের তৎপরতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে। ইরান হইতে ইরাকে কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা এবং অস্ত্র ও প্রযুক্তি সরবরাহ লইয়াও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ব্রিটিশ এমপিদের অভিমত, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইরানের অবস্থান বিতর্কিত এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় তাহারা চরম অসহযোগিতা করিয়াছে। ইরানের সাথে আলোচনায় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি যে সহযোগিতা দেখাইয়াছে কমিটি তাহার প্রশংসা করে। ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা লওয়া হইলে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যত্র উহার পরিণাম ভয়াবহ হইবে। এই ব্যবস্থা লইয়া দীর্ঘমেয়াদে পরমাণু অস্ত্র তৈরির উদ্যোগ হইতে ইরানকে প্রতিহত করা যাইবে না। অন্যসব বিকল্প ফুরাইয়া না যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক মিত্রদের মধ্যে ব্যাপক সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত সরকারের উচিত হইবে না ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া অথবা এই ব্যবস্থার সমর্থন দেওয়া। মার্কিন প্রশাসনের কাছে এ সব বিষয় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা সরকারের দায়িত্ব বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করা হয়। (দৈনিক পূবকোণ, জুলাই ৫, ০৬)

মধ্যপ্রাচ্যে রুশনীতি :

পরাশক্তি হিসাবে অধুনালুপ্ত সোভিয়েত রাশিয়ার (১৯১৭-১৯৮৯) অবস্থান বিশ্বশান্তি তথা মধ্যপ্রাচ্যের শেখ তন্ত্রবিরোধী দেশগুলির জন্য ছিল ক্ষমতার ভারসাম্য। সেই ১৯৫৬ সালে সুয়েজ সংকটের সময় আমেরিকার পরোক্ষ সমর্থন লইয়া ইসরাইল, বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে মিশরের উপর হামলা করে। মিশর তখন রাশিয়ার সমর্থন ও অর্থায়নে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ করিতেছিল। পশ্চিমা শক্তি আর্থিক সাহায্যে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা প্রত্যাহার করে। বাধ্য হইয়া মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসের সুয়েজ খাল জাতীয় করণের ঘোষণা দিয়া তাহা দখল করিয়া লন। আপোষের পথে না গিয়া আমেরিকার লাঠিয়াল ইসরাইল তৎসহ মধ্যস্থতার নামে বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে মিশর আক্রমণ করে। জলপথে ব্রটেন ও ফ্রান্স এবং স্থলপথে ইসরাইল সিনাই দখল করিয়া সুয়েজ খালের পূর্ব পাড়ে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সময় রাশিয়া মিশরের সমর্থনে আগাইয়া আসে। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন–অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি না হইলে অকুস্থলে রুশ বাহিনী হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যস্থতার জন্য আগাইয়া আসে এবং যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে। এইভাবে রাশিয়া আগাইয়া না আসিলে বর্তমান ইরাকের ন্যায় মিশরের ইতিহাসও ভিন্নভাবে লিখিতে হইত। এইভাবে সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব পরিমণ্ডলে একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং এইভাবে স্নায়ুযুদ্ধেরও অবসান হয়। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া যায়। মধ্য এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের যে সমস্ত দেশ লইয়া বিশাল সোভিয়েত ইউনিয়ন গড়িয়া উঠিয়াছিল সেইগুলি অতঃপর ছোট ছোট স্বাধীন দেশে রূপান্তরিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাশিয়ার নিকট পারমানবিক

বোমা তৎসঙ্গে দূর পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্রও তাহার নিকট মওজুদ রহিয়াছে ঠিকই, কিন্তু ন্যাটো সামরিক জোটের সঙ্গে পাল্লা দিয়া যে ওয়ারশ প্যাক্ট (Warsaw Pact) গড়িয়া তোলা হইয়াছিল তাহা পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিদায়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হইয়া যায়। নিরাপত্তার নিরিখে রাশিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল ১৯৮৯-এর পরপরই। কি করিয়া যে এতবড় একটা শক্তি নিমেষে ভূলুণ্ঠিত হইল এবং প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইল তাহা বিস্ময়ের ব্যাপার। পূর্ব ইউরোপের যেইসব দেশ আগে ওয়ারশ প্যাক্টের সদস্য ছিল তাহাদের একে একে ন্যাটোর সদস্য করিয়া আমেরিকা রাশিয়ার নিরাপত্তা দুর্বল ও অনিশ্চিত করিয়া দেয়।

১৯৮৫ সালে প্রেসিডেন্ট গর্বাচক এবং তাঁহার গ্লাসনস্ত ও পেরেসত্রোইকা বা সংস্কার ও উম্মুক্ততা নীতির দরুণ সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমশঃ পুঁজিবাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং প্রেসিডেন্ট ইয়েলেৎসিনে আসিয়া রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক ধ্যান ধারণা বিলুপ্ত করিয়া পুরাপুরি পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়। সেইসঙ্গে দেশটি শক্তিহীন হইয়া পশ্চিমা গোষ্ঠির কৃপার পাত্রে পরিণত হয়। দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় এবং চরম অরাজকতার দিকে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক সংস্কারের সুবাদে আমেরিকা এবং তাহার অনুগত সংস্থা বিশ্বব্যাংক, আই.এম.এফ (IMF) সহানুভূতি দেখাইয়া পরামর্শ দেয় কিভাবে অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটাইতে সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য তাহাকে ঋণও দেওয়া হয়। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশটিকে পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা। ইয়েল্যেৎসিন নিজে ভালোভাবে জীবনযাপন করেন কিন্তু দেশের কথা চিন্তা করেন নাই। তিনি আমেরিকার বশংবদ হিসাবে সুখে জীবন কাটান।

কিন্তু ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হইয়া আসিলে তিনি আমেরিকার বশংবদ হইতে অস্বীকার করেন। ইরাকে আগ্রাসী যুদ্ধে তিনি জার্মানী-ফ্রান্সের সহিত মিলিত হইয়া মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধীতা করেন। ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রনিরোধ চুক্তি ভঙ্গের জন্য আমেরিকার যুদ্ধের পায়তারা দেখিয়া রাশিয়া স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেয় যে ঐ দেশটিকে ইরাকের মত আক্রমণ করা যাইবে না। ইরানের পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মেশিনারী ও অন্যান্য মালামাল দিবার জন্য রাশিযা একটি চুক্তিও সম্পাদন করে। যদিও পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ না করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের বিরুদ্ধে সীমিত নিষেধাজ্ঞা আরোপে ভোট দিয়াছে রাশিয়া কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা যে সামরিক আক্রমণের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবেনা সেই কথাও সে স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছে।

ইরাকে সামরিক বিপর্যয়ের অবমাননা ও ব্যর্থতা ঢাকিবার জন্য বুশ প্রশাসন যখন সেখানে আরও ২১,৫০০ সৈন্য পাঠাইবার উদ্যোগ নেয় তখন প্রেসিডেন্ট পুতিন আর ধৈর্য ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। অতীতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ওয়ারশ জোট ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য পুতিনের যে রাগ হইয়াছিল উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি মাঠে নামেন। গত সপ্তাহে (১৫ ফেব্রুয়ারি ০৭) মিউনিখে অনুষ্ঠিত আমেরিকা ও ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এক বৈঠকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন,

আমেরিকা তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতেছে এবং বিশ্বে একমাত্র পরাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য অন্য দেশের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়া দিতেছে। তিনি ইরাকের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলেন, আমেরিকার আগ্রাসী নীতির কারণে বিশ্বশান্তি আজ বড় এক হুমকির মুখোমুখী। আমেরিকাকে তাহার সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের পরামর্শ দেন প্রেসিডেন্ট পুতিন। তাঁহার কড়া সমালোচনা শুনিয়া উপস্থিত পশ্চিমা নেতৃবৃন্দ বেশ অবাক হন।

শুধু হুমকি বা সতর্কবাণী উচ্চারণ নহে; পুতিন এই প্রথম বারের মত মধ্যপ্রাচ্যে সফরে আসেন এবং সৌদি আরব, কাতার ও জর্ডান সফর করেন। এই দেশগুলির উপর আমেরিকার প্রভাব সবচাইতে বেশী। সেখানে তিনি লাল গালিচা সম্বর্ধনা লাভ করেন। সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ তাঁহাকে শান্তি ও ন্যায়নীতির মানুষ বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ও সাহসেরও প্রশংসা করেন। আম্মানেও তিনি অনুরূপ সম্বর্ধনা লাভ করেন। মধ্যপ্রাচ্যে রাশিয়ার একমাত্র মিত্ররাষ্ট্র ছিল ইরাক ও সিরিয়া। ইরাক এখন আমেরিকার কব্জায়। এই অবস্থায় আমেরিকার বিশ্বস্ত মিত্রদেশ সৌদী আরব, কাতার ও জর্ডানে প্রশংসাসূচক কথা শুনিয়া এবং উষ্ণ সম্বর্ধনা পাইয়া পুতিন বেশ উৎফুল্ল হন। তিনি স্পষ্ট জানাইয়া দেন, রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য মধ্যপ্রাচ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সেইখানে আমেরিকাকে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে দেওয়া হইবে না। (আমার দেশ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ০৭, হাসনাত আবদুল হাই এর প্রবন্ধ অনুসরনে)। প্রেসিডেন্ট পুতিনের ভাষায় পুরাতন সোভিয়েত মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুতিনের এই সমালোচনা আমেরিকাকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্ক নূতন চিন্তাভাবনার দিক নির্দেশনা দিবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুহাম্মদ ইনাম উল-হক
৩০শে মার্চ, ২০০৭

ষষ্ঠ সংস্করণে অনুবাদকের ভূমিকা

২০০৭ সালে অত্র গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের সময় অনুবাদকের ভূমিকায় যেসমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করা হইয়াছিল তারপর আলোচ্য এলাকা তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটনাবলীতে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। খোদ মার্কিন মুল্লুকে বর্ণবাদী রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশের পরিবর্তে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হইয়া ক্ষমতাসীন হন নিগ্রো বংশোদ্ভূত একজন মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী খৃস্টান বারাক হোসেন ওবামা। যুদ্ধবিধ্বস্ত আমেরিকায় পরিবর্তন আনয়নের অঙ্গিকার করিয়া তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। তিনি আরও ওয়াদা করেন, কিউবার উপকূলে অবস্থিত গুয়ানতানামো-বে জেলখানা তিনি গুটাইয়া ফেলিবেন। এই জেলখানায় ইরাক-আফগানিস্তান হইতে আনা তালেবান, আল-কায়েদা ও অন্যান্য মার্কিন বিরোধী বন্দিদের অমানবিক নির্যাতন করা হয়।

এদিকে মার্কিন বাহিনী ও উহার মিত্রদের দ্বারা পরিচালিত সম্মিলিত আক্রমণের ফলে প্রায় সমগ্র ইরাক ও আফগানিস্তান তখন মিত্র বাহিনীর করতলগত। মার্কিন ধাওয়া খাওয়া তালেবান ও আল-কায়েদা যোদ্ধারা পাকিস্তানে প্রবেশ করিবার ফলে এদেশও ঐ ধ্বংশযজ্ঞে সামিল হইয়া যায়। ইরাক আফগানিস্তানের যুদ্ধ যেন শেষ হইয়াও হয় না। আফগানিস্তানের ন্যায় ইতোমধ্যে ইরাকও উহার অখণ্ডতা হারাইয়াছে। সাদ্দামের অর্থ ও প্রচণ্ড শক্তিধর ইরাক আর নাই। মার্কিনীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং উহার তাবেদার শাসকচক্র শীয়া নূরী আল-মালিকী এবং কুর্দি-সুন্নী প্রেসিডেন্ট জালাল তালাবানীর কার্যকারিতায় ইরাক এখন তিনভাগে বিভক্ত; দক্ষিণাঞ্চল শীয়া অধ্যুষিত মোক্তাদা আল-সদরের নিয়ন্ত্রিত মাহদী আর্মির নিয়ন্ত্রণে, উত্তর-পূর্বে পি.কে.কের নিয়ন্ত্রণে কুর্দি এলাকা এবং মধ্যভাগে সুন্নি অধ্যুষিত বাগদাদে অবস্থানকারী প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া মার্কিন বা মিত্র বাহিনী। প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, মিত্র বাহিনী এবং মার্কিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইরাকী বাহিনী বাগদাদে অবস্থান করিলেও ইরাকে শান্তি বিরাজ করিতেছে তা কিন্তু বলা যাইতেছে না। কারণ ইরাকী গুপ্তঘাতক বা সুন্নি-স্বাধীনতাকামীদের আত্মঘাতি গোলার আঘাতে আজ এ অঞ্চলে, কাল ঐ অঞ্চলে আবার পরশু আরেক অঞ্চলে ডজন ডজন ইরাকী ও মার্কিনী হতাহত হইতেছে। আবার ইরাকী গেরিলাদের মারিবার অজুহাতে মার্কিন দ্রোন বিমান (পাইলটবিহীন বোমারু বিমান) দ্বারাও শত শত নিরীহ ইরাকী মারা যাইতেছে। অদৃষ্টের পরিহাস, এইসব হত্যাকাণ্ড চলিতেছে মধ্য ইরাকের মার্কিন নিয়ন্ত্রিত

সুন্নি এলাকায়। একদিকে মার্কিন ও মিত্র বাহিনী বিমান হামলার দ্বারা শত শত ইরাকীকে হত্যা কারিতেছে আবার ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করিতেছে। বাগদাদের গ্রীনজোন এলাকা, যাহাকে মিত্র বাহিনী নিরাপদ এলাকা আখ্যায়িত করিয়াছে, সেখানেও মূহুর্মূহু বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইতেছে ইরাকী গেরিলা বাহিনী। তাই মার্কিন ও অকুস্থলে নিয়োজিত ন্যাটো বাহিনী কমান্ডদের প্রত্যয়, ইরাকে স্থায়ী কর্তৃত্ব আরোপ সম্ভব নহে।

আফগানিস্তান ঃ

অপরদিকে আফগানিস্তানেও ঠিক একই অবস্থা। রাজধানী কাবুল এবং তৎসংলগ্ন কিছু এলাকা ছাড়া সমগ্র আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী বা মার্কিন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আফগান বাহিনীর কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। দক্ষিণ আফগানিস্তানে হেলমান্দ প্রদেশ তৎসহ কান্দাহারে তালেবান বাহিনী শক্ত ঘাটি গাড়িয়া বসিয়াছে। বিভিন্ন সময় তালেবানরা খোদ্দ কান্দাহার-কাবুল মহাসড়ক অবরোধ করিয়া ফেলে। অতঃপর মার্কিন বাহিনী আসিয়া তাহা অপসারণ করে। বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সম্মিলিত অভিযান চালাইয়া মার্কিন বাহিনী হেলমান্দ প্রদেশ দখল করিয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। কিন্তু ইদানিং খবর আসিতেছে, ঐসব এলাকায় এখন তালেবান বাহিনী টহল দিতেছে। অতএব নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতেছে না এ মুহূর্তে কোন কোন এলাকা তালেবানদের আর কোন এলাকা মার্কিন নিয়ন্ত্রণে।

নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ঘোষণা করিয়াছিলেন, ইরাক হইতে মার্কিন বাহিনী তিনি প্রত্যাহার করিবেন। কিন্তু ক্ষমতায় আসিয়া তিনি লক্ষ্য করেন, বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ এখানে এমনভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে, সৈন্য এখন কিভাবে প্রত্যাহার করা যায় তাহাই সমস্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত মার্কিন সেনাধ্যক্ষদের ধারণা, ইরাকের বাইরে এখন আফগানিস্তানের সমস্যাই অধিক ভয়াবহ। বর্তমানে আফগানিস্তানে মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর সংখ্যা যুদ্ধকালিন ইরাকের সৈন্যদেরও ছাড়াইয়া গিয়াছে। মার্কিন কমান্ডাররা আরও ধারণা প্রকাশ করেন, তালেবান বা আল-কায়েদার বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিজয় কখনও সম্ভব নহে।

তাই এক পর্যায়ে তালেবানদের সাথে আলাপ আলোচনার বিষয়টি উঠিয়া আসে। তালেবানদের সাথে আলোচনাকে ঘিরিয়া আফগানিস্তানে বিভিন্ন পক্ষের কৌশলগত স্বার্থদ্বন্দ্বে এখন নূতনমাত্রা পাইতেছে। এমনকি পাক-ভারত অস্থির সম্পর্কের প্রভাবও পড়িতেছে আফগানিস্তানের যুদ্ধে। ন্যাটোভূক্ত পশ্চিমের দেশগুলি আফগানিস্তানের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হইতে এখন বাহির হইয়া আসিবার পথ খুঁজিতেছে। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমের খবর দেখিয়া মনে হয়, তালেবানদের সাথে আলোচনার বিষয়টি মোটামুটি পাকাপাকি হইয়াছে। তাহারা এমন ধারণা দিতে চান যে, তালেবানরা কোন সমস্যা নহে, মূল সমস্যা আল-কায়েদা। এসব খবর বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য এইসব প্রপাগাণ্ডা চালান হইতেছে। দুবাইয়ে

জাতিসংঘের এক কর্মকর্তার সঙ্গে তালেবান নেতার বৈঠক হইয়াছে মর্মে প্রচারিত এক খবর তালেবানরা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু আফগানিস্তানে তালেবানদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভূমিকা অনেক গুরুত্ববহ। এক সময় পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষকতায় তালেবানদের উত্থান হইয়াছিল, যদিও তাহা এখন অনেকটা স্তিমিত। কারণ, মার্কিন চাপে পড়িয়া বিগত দিনে পাকিস্তানকে তালেবানদের সাথে যুদ্ধে জড়াইতে হইয়াছিল। অবশ্য পাকিস্তানের পক্ষ হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে যে, নূতন বছরে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে তালেবানদের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান চালান হইবে না। তাহা সত্বেও তালেবানদের একটি অংশের সাথে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার গভীর সখ্যতা রহিয়াছে। এইখানেই ভারতের ভয়। ভারতের আশংকা, তালেবানদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আবার আফগানিস্তানে পাকিস্তানের ভূমিকা বাড়িবে। কারণ, কাশ্মীরের চাইতেও আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার এখন অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

এই কারণে শুরু হইতে আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইকে পুরামাত্রায় সমর্থন দিয়া আসিতেছে ভারত। তাহারা সর্বদা তালেবানদের সাথে বৈঠকের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছে। কারজাই সরকার এখন কাবুল ছাড়া আফগানিস্তানের কোন প্রদেশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। বরং সম্প্রতি কাবুলে তালেবান হামলা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমনকি তালেবান হামলায় মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারাও নিহত হইয়াছেন, যাহা ন্যাটোভূক্ত দেশগুলোর জন্য একটি বড় ধরনের আঘাত। প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানে কাজ করিবার মত যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশ্বাসযোগ্য অংশীদার নাই। কারজাই যে আফগানিস্তানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ তাহা বিচ্ছিন্নভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। আবার কারজাই ছাড়া এখন মার্কিনীদের নিকট হইতে দায়িত্ব লইবার মত এমন কোন শাসকশ্রেণীও নাই যাহারা সামগ্রিক কোন জাতীয় পরিচয় দান করিতে পরে। তালেবানরা দিন দিন শক্তিশালী হইতেছে। বর্তমান আফগান নেতৃত্ব চায় না যে, কোয়ালিশন বাহিনী চলিয়া যাক। আফগানিস্তানে সৈন্য বাড়াইবার কথা প্রকাশ করিতে যাইয়া প্রেসিডেন্ট ওবামা ১৮ মাসের মধ্যে মার্কিন সৈন্য দেশে ফিরাইয়া লইবার কথা বলেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় রাখিয়া বলা যায়, নিকট ভবিষ্যতে সৈন্য প্রত্যাহারের তেমন সম্ভাবনা নাই। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় হামলা চালাইয়া ও তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার পশ্চিমা সহযোগিরা এখন আফগানিস্তানে আটকাইয়া গিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন কমান্ডার ম্যাকক্রিস্টাল ঘোষণা করেন, 'একজন সৈনিক হিসাবে আমার অনুভূতি হইল, যুদ্ধ অনেক হইয়াছে, এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সমাধান। যুদ্ধের পরিণতিতে রাজনৈতিক সমাধানই যাহাতে বাহির হইয়া আসে সেই লক্ষ্যে তালেবানদের সাথে আলোচনা শুরু করিতে হইবে।' (নয়া দিগন্ত/৩.২.১০)

অতি সম্প্রতি আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর কান্দাহারে ন্যাটো বাহিনীর বিমানঘাঁটিতে গত শনিবার (২২.৫.১০) রাতে হামলা চালাইয়াছে তালেবান যোদ্ধারা।

ইহাতে বেশ কয়েকজন ন্যাটো সৈন্য আহত হইয়াছে। হামলার কারণে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ শেষ মুহূর্তে ঐ ঘাঁটি পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। আফগানিস্তানে গত বার দিনে ইহা তালেবান যোদ্ধাদের দ্বিতীয় হামলার ঘটনা। ইতোপূর্বে গত বুধবার তাহারা বাগদাদে মার্কিন ঘাঁটিতে হামলা চালায়। ন্যাটোর মুখপাত্র লেঃ কর্নেল টড ভিসিয়ান জানান, শনিবার স্থানীয় সময় রাত আটটার দিকে রকেট ও মর্টার হামলা চালান হয়। ন্যাটোর এক বিবৃতিতে হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করিয়া বলা হয় ইহাতে বেশ কয়েকজন সামরিক ও বেসামরিক লোক আহত হয়। তাহাদের চিকিৎসা দেওয়া হইয়াছে। তবে সংখ্যা নিশ্চিত করা যায় নাই।

আফগান কর্মকর্তারা জানান, কান্দাহারের ঐ ঘাঁটিতে পাঁচটি রকেট আঘাত হানে। ইহাদের একটি রকেট হেলিকপ্টার ঘাঁটিতে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শী একজন সাংবাদিক জানান, হামলার সময় মাইকে সতর্ক বার্তা ঘোষণা করিয়া সবাইকে বাঙ্কারে আশ্রয় লইতে বলা হয়। হামলায় ন্যাটো সৈন্যরা এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, প্রতিরক্ষা ব্যাবস্থা না লইয়া তাহারা সবাই বাঙ্কারে আশ্রয় লয়।

তালেবানরা এই হামলার দায় স্বীকার করিয়াছে। তালেবানের মুখপাত্র ইউসূফ আহমাদি বলেন, ঘাঁটির দুই দিক হইতে হামলা চালান হয় এবং ইহাতে ১৫টি রকেট ব্যবহার করা হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ঘাঁটির বাহিরে ন্যাটো সৈন্যদের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। অন্যথায় তালেবানদের পক্ষে অবাধে ঘাঁটির দুই দিক হইতে হামলা চালান সম্ভব হইত না।

এদিকে ২০১১ সালের পর আফগানিস্তান হইতে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রায় পাকাপোক্ত হইয়াছে। তাই ২০১১ সালের জুলাইয়ের পর সৈন্য প্রত্যাহার করা হইলে আফগানিস্তানে ব্যাপক বেসামরিক সহায়তা নিশ্চিত করিবার উপায় নির্ধারণের জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন ও তাঁহার ন্যাটো মিত্ররা এক বৈঠকে মিলিত হন। হিলারী ও ন্যাটো প্রধান এনডারস ফগ রাসমুসেন (Enderse Fog Rasmusen) জাতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব লইবার জন্য আফগান সেনাবাহিনী ও পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ৪৫০ জন প্রশিক্ষক খুঁজিয়া দিতে ২৮ সদস্যের মিত্র জোটের নিকট আহ্বান জানাইবেন। বৃহস্পতিবার (১৮.৪.১০) ইস্তোনিয়ায় ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রিদের বৈঠকে রাসমুসেন জানান, "আমরা অব্যাহতভাবে আফগানদের সামর্থ্যবান করিয়া তুলিবার প্রয়াস চালাইয়া যাইতে চাই এবং পরিস্থিতি অনুকূলে আসিলে তাহাদের নিরাপত্তার বৃহত্তর দায়িত্ব তাহাদের কাছে পর্যায়ক্রমে অর্পণ করা হইবে।" উল্লেখ্য, ন্যাটো প্রায় ৪০টি দেশের ৯০ হাজার সৈন্যের যৌথ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেছে। (AFP-র বরাতে আমার দেশ, ২৪.৪.১০)

পাকিস্তানের সীমানার বাহিরে তৎপর পাকিস্তানী তালেবানদের দমন করিতে দেশটির অনীহার কথা বলিয়াছেন একজন রুশ কূটনীতিক। ভারতে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার এম কাদকিন বলেন, প্রায় ৪০টি সন্ত্রাসী (মুজাহিদ) সংগঠন পাক আফগান

সীমান্ত এলাকায় তাহাদের কর্মকাণ্ড চালাইয়া যাইতেছে। ইসলামাবাদ ইহাদের দমনের উদ্যোগ লয় নাই। দ্বিতীয় মেয়াদে ভারতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত কাদকিন ভারতের গণমাধ্যমের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, রাশিয়ার স্যাটেলাইট ইমেজ ও গোয়েন্দাদের মাধ্যমে এই তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্টদের মতে কাদকিনের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোপূর্বে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ জানাইয়াছিল, তালেবানদের লস্করে তৈয়বা গ্রুপ এ অঞ্চলে আরও শক্তিশালী হইয়াছে এবং এই সংগঠন আফগানিস্তানে ভারতীয় স্বার্থে আঘাত হানিবার চেষ্টা করিতেছে। তবে বর্তমানে তালেবানরা এই নাম বাদ দিয়েছে। তালেবানদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থের বিষয়টি উঠিয়া আসে। সর্বাগ্রে আসে ভারত পাকিস্তানের স্বার্থের বিষয়টি। আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের প্রবল অনীহা। অবশ্য পশ্চিমা দেশগুলি যখন আলোচনার বিকল্প কিছু দেখিতেছে না সেক্ষেত্রে ভারতের অনীহা মূল্যহীন। আফগানিস্তানে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী। আর ভারতের জন্য আফগানিস্তান হইতেছে পাকিস্তানের সাথে প্রক্সি ওয়ারের ক্ষেত্র। পাকিস্তান প্রায় শুরু হইতে বলিয়া আসিতেছে পাকিস্তানে যেসব হামলা চালান হইতেছে তালেবানদের নামে, সেইগুলি চালান হইতেছে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দ্বারা। আবার আলোচনার জন্য তালেবানদের ওপর ভারত কিছু শর্ত চাপাইতেছে– যেন এ সংকটে ভারত একটি পক্ষ তা বিশ্ববাসী জানিতে পারে, যদিও এই সংকটে ভারত কোন পক্ষই নহে। কিন্তু পাকিস্তানের লক্ষ্য হইতেছে তালেবান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়কে খুশি রাখা। এই ব্যাপারে সে সাফল্য অর্জন করিতে পারিলে তাহাতে সে যেমন লাভবান হইবে তেমনি চীনও লাভবান হইবে।

জনসমক্ষে আবার ওসামা বিন লাদেন ঃ

দীর্ঘ বিরতির পর ওসামা বিন লাদেন আবার সংবাদ শিরোণাম হইয়াছেন। অতিসাম্প্রতিক এক অডিও বার্তায় লাদেন আমেরিকার ডেট্রয়েটের আকাশে একটি মার্কিন বিমান উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টার দায় স্বীকার করিয়াছেন। গত ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ নাইজেরিয়ার নাগরিক ওমর ফারুক আবদুল মোত্তালাব বিমানটি ধ্বংশের চেষ্টা চালান। আল-জাজিরা টেলিভিশনে প্রচারিত ঐ অডিও বার্তায় লাদেন যুক্তরাষ্ট্রকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন, গাজায় নিরীহ মানুষের ওপর ইসরাইলী বর্বরতায় যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন যতদিন থাকিবে, মার্কিনীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের হামলা ততদিন অব্যাহত থাকিবে। বরাবরের মতই যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াছে, তাহারা এখনও ঐ অডিও বার্তার যথার্থতা যাচাই করিতে পারে নাই। এই অডিওর কণ্ঠের সাথে লাদেনের মূল কণ্ঠ মিলাইয়া দেখা হইবে। তবে হোয়াইট হাউস লাদেনের সমালোচনা করিয়া তাহাকে বিচারের মুখোমুখি করিবার অঙ্গিকার ব্যক্ত করিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, লাদেন কেন এই অডিও বার্তা প্রকাশে একমাস সময় নিলেন? ইহার মাধ্যমে কি লাদেন বুঝাইতে চাহিতেছেন, তিনি এখনও জীবিত ও সক্রিয় আছেন

এবং অনেক কিছুই তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আছে? (প্রথম আলো ১২.২.১০ ক্রোড়পত্র)।

ওসামা বিন লাদেন কোথায় আছেন? কেন তিনি বা তাঁহার কাল্পনিক অবয়ব সর্বদা মার্কিনীদের তাড়া করিতেছে? এইগুলি এখন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ ও ইলেকট্রনিক গোয়েন্দার কার্যকারীতা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। তাই ইহা বিশ্বাস করা কষ্টকর, এমন অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র লাদেনের বর্তমান অবস্থা (জীবিত না মৃত) এবং ঠিকানা জানে না!

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন অভিযানে কাবুল হইতে তালেবান বিতাড়িত হইবার পর বিশ্ববাসী জানিত, লাদেন পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী তোরাবোরা পার্বত্য এলাকায় লুকাইয়া রহিয়াছেন। বি-৫২ বোমারু বিমান দিয়া প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমা তোরাবোরায় ছোঁড়া হইয়াছে। এরপরও কি লাদেন বাঁচিয়া আছেন? সেই ভয়াবহ হামলায় মৃত্যু ও ধ্বংসের সাক্ষি হইয়া তোরাবোরা পর্বতশ্রেণী এখনও দাঁড়াইয়া আছে। অতঃপর লাদেনকে লইয়া মার্কিন দুশ্চিন্তা অনেকটা প্রশমিত হয়। মার্কিনীদের বিরুদ্ধে জেহাদ সম্বলিত দুই একটি অডিও বা ভিডিও বার্তা ছাড়া সংবাদ প্রতিবেদনে লাদেন খুবই কম স্থান পান। অতঃপর মার্কিন প্রেডিডেন্ট নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের প্রাণহানীর পর সরকার যখন দেশের অভ্যন্তরে চাপের মুখে পড়িত তখনই লাদেনের টেপ প্রকাশ করা হইত। বিশেষতঃ আল-জাজিরা টেলিভিশনে লাদেনের টেপ বেশি প্রচার করা হইত।

ওসামা বিন লাদেনের পূর্বেকার কয়েকটি ভিডিও টেপের যথার্থতার ব্যাপারে বেশ কিছু গৎবাঁধা বিতর্ক ছিল। যথাঃ বয়স বাড়া সত্ত্বেও লাদেনকে কেন তরুণ মনে হয়? তাঁহার মুখমণ্ডলের বলিরেখাগুলি আগের চাইতে ভিন্ন দেখা যায়, তাঁহার চোখের নীচের কালো দাগ আকস্মিক বিলীন হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এইসব টেপ ভবিষ্যৎ কোন্ প্রতারণার কৌশলের জন্য মার্কিনীরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়াছে?

পশ্চিমা গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞদের ধারণা, লাদেন পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তবর্তি কোন পাহাড়ে লুকাইয়া আছেন। পাকিস্তান বারংবার পশ্চিমাদের দাবি নাকচ করিয়া বলিয়া আসিতেছে, লাদেন পাকিস্তানে নাই। তাহারা এমন ইঙ্গিতও দিতেছে যে লাদেন হয়তো বাঁচিয়াই নাই। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের (৯/১১) পর হইতে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থাসহ সমস্ত তথ্য বিনিময়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী মার্কিন গোয়েন্দারা এখনও লাদেনের অবস্থান নির্ণয় করিতে পারে নাই তাহা ভাবাও বিস্ময়ের বিষয়। আফগান সীমান্তবর্তী পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরীস্তানে চালকবিহীন ড্রোন বিমান/হেলিকপ্টারের সাহায্যে বহু হামলা চালাইয়াও যুক্তরাষ্ট্র লাদেন বা তাঁহার প্রধান সহযোগি আয়মান আল-জাওয়াহিরিকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করিতে বা অবস্থান চিহ্নিত করিতে পারে নাই। তাহা হইলে লাদেন রহস্যটা কি? তিনি কি বাঁচিয়া আছেন এবং সুস্থ আছেন? তিনি কি পাক-আফগান সীমান্তের কোথাও লুকাইয়া আছেন? নাকি তিনি

সোমালিয়া বা ইয়েমেনের মত দূরবর্তি স্থানে চলিয়া গিয়াছেন? আসলেই লাদেন কি এত কৌশলী যে, এত বছর তিনি সফলভাবে মার্কিন নজর এড়াইতে পারেন? নাকি তিনি মার্কিনাদের 'সুবিধা'র মানুষ, যাহাকে তাহারা পরিস্থিতির প্রয়োজনে কাজে লাগাইতে পারে? এইসব প্রশ্নের জবাব নাই। তবে ইহা সত্য, মার্কিন প্রশাসন বা তাহাদের গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক নিজেদের স্বার্থেই লাদেনকে বাস্তব বা কল্পনিক বাঁচাইয়া রাখিবে এবং তাঁহার পিছু পিছু ছুটিবে। (দৈনিক প্রথম আলো, ১২.২.১০)

ইরাক ঃ

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জানা যায়, ২০০১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ (জুনিয়র) কর্তৃক মার্কিন বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংশের অজুহাতে প্রথমে আফগানিস্তান পরে ইরাক দখলের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বুশকে প্রবল সমর্থন যোগান। অতএব যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের প্রায় অধিকাংশ দেশ বুশের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আগাম যুদ্ধের (Preemptive War) আহ্বানে সাড়া দিয়া আফগানিস্তান ইরাক দখল করে। যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও অন্যান্য সহযোগি দেশের ব্যাপক অর্থনৈতিক লোকসানসহ বিপুল সংখ্যক লোক ক্ষয় হয়। এ যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। অনেক বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হইয়া যায়। ইউরোপ-আমেরিকায় হাজার হাজার লোক বেকার হইয়া পড়ে এবং রাষ্ট্র দেউলিয়া হইয়া যায়। তাই বিশ্বব্যাপী প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে এই বিশাল যুদ্ধ আয়োজনের কোন প্রয়োজন ছিল কি? অংশগ্রহণকারী দেশের সরকার প্রধানগণ ভীষণ-জবাবদিহীতার সম্মুখিন। তাঁহারা এখন অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইতে ব্যস্ত। ব্রিটেনের সাবেক আন্তর্জাতিক উন্নয়নমন্ত্রী ক্লেয়ার শর্ট (Clair Short) ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কে সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের মন্ত্রিসভাকে 'বিভ্রান্ত' করা হইয়াছিল বলিয়া দোষ স্খালনের চেষ্টা করেন। ইরাক যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি তদন্ত কমিশনের সামনে তিনি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেন। ক্লেয়ার শর্ট বলেন, ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ লইয়া সরকারের শীর্ষ আইন উপদেষ্টা মন্ত্রিসভাকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইরাকে হামলার আগে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন এ্যাটর্নি জেনারেল লর্ড গোল্ডস্মিথ।

২০০৩ সালে ইরাক অভিযান শুরুর দুই মাস পর মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন ক্লেয়ার শর্ট। তদন্ত কমিশনের সামনে তিনি বলেন, মন্ত্রিসভা 'সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী সংস্থা' ছিল না। পার্লামেন্টকে তিনি 'রাবার স্ট্যাম্প' হিসাবেও অভিহিত করেন। ইরাক যুদ্ধের সবুজ সংকেত দিবার পূর্বে ২০০৩ সালের জানুয়ারি মাসে এটর্নি জেনারেল গোল্ডস্মিথ প্রধানমন্ত্রী ব্লেয়ারকে বলিয়াছিলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের নূতন করিয়া কোন প্রস্তাব ছাড়া ইরাক অভিযান বেআইনী হইতে পারে। কিন্তু মার্কিন সরকারের একজন জ্যেষ্ঠ আইনজীবি এবং জাতিসংঘে ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত স্যার জেরেসি গ্রিনস্টকের সঙ্গে কথা বলিবার পর তিনি তাঁহার মত পরিবর্তন করেন। (বিবিসি)

সম্প্রতি বাগদাদের এক গোপন কারাগারে ইলেকট্রিক শক, যৌন হয়রানিসহ রুটিন নির্যাতন চালান হয় বন্দিদের ওপর মর্মে বিবিসি ও এএফপি এক প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (Human Rights Watch) তাহাদের রিপোর্টে এই তথ্য জানাইয়াছে। এক ব্রিটিশসহ ৪০ জনের উপর জরিপ চালাইয়া এই গ্রুপটি জানায়, এইসব নির্যাতন ইরাকী সেনাবাহিনী চালায়। তবে ইরাকী কর্তৃপক্ষ এই গোপন বন্দিশালার কথা অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা বলে, অতীতে এই ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ রহিয়াছে।

উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে জাতিসংঘের নির্যাতন বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। বাগদাদের বিমান ঘাঁটিতে গোপন বন্দিশালায় ৪ শরও বেশি বন্দি রহিয়াছে। ৬৮ বছর বয়সী এক বন্দি জানান, তাঁহাকে বেদম পিটানো হয় এবং জননেন্দ্রিয়ের ভিতর বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানায়, তিনি এবং অন্য বন্দিদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সহায়তা এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার অভিযোগ আনা হয়। তবে কাহারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে চার্জ দাখিল করা হয় নাই। বিবিসি প্রতিনিধি গোপন বন্দিশিবির হইতে ছাড়া পাওয়া এমন বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বলিয়া এইসব তথ্য পান। 'সৈন্যরা আমাদের মাথায় নোংরা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া নির্যাতন শুরু করে। আমাদের সমস্ত শরীর পানিতে চুবানোর পর বৈদ্যুতিক শক দিয়া নির্যাতন চলে।' ইরাক সরকার এইসব অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। তবে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলিয়াছে, এইসব সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ঐ গোপন আটককেন্দ্র এখন বন্ধ রহিয়াছে।

মোকতাদা আল-সদর ও মেহদী বাহিনী ঃ

দক্ষিণ ইরাকে শিয়া মতাবলম্বী মোকতাদা আর সদরের মেহদী বাহিনী আরেক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা যদি সফলতা লাভ করিতে পারে তবে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের গড়া একক ইরাকের মানচিত্র খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যাইবে। অবরুদ্ধ বাগদাদে মোকতাদা আল সদরের মাহদী বাহিনী যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহারা ইতোমধ্যে দেশের একদা শান্তিপূর্ণ এলাকায় ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। একদা এ.কে ৪৭ রাইফেল (AK-47) সজ্জিত ১২টি প্রাইভেট কার শিয়া-সুন্নি মিশ্র অধিবাসী অধ্যুষিত বাগদাদের এলাম অঞ্চলে তাহারা প্রকাশ্য দিবালোকে ঢুকিয়া পড়ে। তাহারা মোকতাদা আল-সদরের প্রশংসাসূচক ক্যাসেট বাজাইয়া অধিবাসীদের ঘরের বাহিরে আসিবার জন্য চীৎকার দেয়। শক্তি প্রদর্শনের নিমিত্তে তাহারা শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলী ছোঁড়ে এবং সুন্নিদের মৃত্যু সম্বলিত শ্লোগান দেয়। তিনদিন পর ইব্রাহিম নামক এক সুন্নি ক্রীড়াবিদ খেলা শেষে ঘরে ফিরিবার সময় এই মেহদি বাহিনী তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। তাহার অপরাধ, কয়েকদিন পূর্বে সে খেলার মাঠে মেহদী বাহিনী ও মোকতাদা আল সদরের উদ্দেশে কুমন্তব্য করে। (Newsweek, May, 7, 2007)

বাগদাদের রাস্তায় চলন্ত গাড়ী হইতে গুলি বর্ষণ নূতন কিছু নহে। কিন্তু ইব্রাহিমের ন্যায় এ ধরনের হত্যা ভবিষ্যতে আরও ভয়াবহ অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে। কিছুদিনের

মধ্যে বাগদাদে হাজার হাজার মার্কিন ও ইরাকী বাহিনী মোতায়েন হইলে আল-সদর তাহার বাহিনীকে কিছুটা চুপচাপ থাকিবার নির্দেশ দেন। ইহাকে মার্কিন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ডেভিড পেট্রিউস (Gen. David Petreus) তাঁহার নীতির সফলতা আখ্যা দেন। কিন্তু এখন সদরের মাহদী বাহিনীর ব্যক্তিবিশেষ, কখনও কখনও পুরা বাহিনী নিজ হইতে ফাটিয়া পড়ে, কারণ তাহারা আর চাপাচাপি সহ্য করিতে রাজি নহে।

এইসব যথেচ্ছ দাঙ্গাবাজরা ইতোমধ্যে ইরাকের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে। প্রাথমিক কিছুদিন চুপচাপের পর বাগদাদে পূনরায় প্রভাতে বেওয়ারিশ লাশের সংখ্যা বাড়িয়া যায় এবং এ সংখ্যা ক্রম বর্ধমান। রাজধানীর বাহিরে দক্ষিণ দিকে ধাবমান যোদ্ধাদের সহিত স্থানীয় মাহদী শাখাগুলির সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাহাদের উপস্থিতিতে আঞ্চলিক বিবদমান শিয়া গ্রুপগুলির ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। পশ্চিমা সম্মিলিত বাহিনী উদ্বিগ্ন হয় যে, ইরান বিপ্লবী গার্ড (Iran Revolutionary Guard) মেহ্‌দী বাহিনীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমেরিকান সৈন্যদের উপর চাপ সৃষ্টিকারী দল গঠন করিবে। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে মেহ্‌দী স্প্লিন্টার দল (Splinter Group) কারবালায় পাঁচজন মার্কিন সৈন্য হত্যা করে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ সাধারণ্যে অনুপস্থিত সদর স্বয়ং এই বিভক্তির ইঙ্গিত দেন। বিগত দিনে নাজাফে অনুষ্ঠিত এক শোভাযাত্রার পূর্বে তিনি এক বিবৃতি প্রচার করেন, যাহাতে তিনি তাঁহার অনুসারীদের অনুগত থাকিতে বলেন। নিম্নস্তরের মেহ্‌দী নেতারা আরও খোলাসাভাবে বলেন যে, কিছু সংখ্যক দল আছে যাহারা সৈয়দ মোকতাদার আদেশ অমান্য করে। পশ্চিম বাগদাদের মেহ্‌দী সেনাধ্যক্ষ আবু হাতিব বলেন, 'আমরা সরকারকে ইঙ্গিত দিয়াছি এইসব অবাধ্যদের যেন গ্রেফতার করা হয়। যাহারা অবাধ্য হইবে তাহাদিগকে অবশ্যই মেহ্‌দী বাহিনী হইতে বাদ দেওয়া হইবে।' কিন্তু এই বাহিনী আরও অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে। একদিকে তাহারা শিয়া গ্রুপদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করিতেছে অপর দিকে প্রতিদিন তাহারা সুন্নি লোকদের হত্যা করিতেছে।

বর্তমানে ইরানে অবস্থানরত, যেমনটি মার্কিন সৈন্যরা মনে করে, মোকতাদা আল-সদর অবশ্য তাঁহার বাহিনীকে শক্তিশালী করিতে চান। মন্ত্রিসভা হইতে তাঁহার ছয়জন সদস্যকে প্রত্যাহার করিবার অর্থ হইল, অকার্যকর প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকী হইতে তাঁহার নিজের দূরত্ব সৃষ্টি করা। ইরাকীরা মালিকীর প্রতি খুবই বিরক্ত। পার্লামেন্টে সদর গ্রুপের একজন প্রসিদ্ধ সদস্য বাহা আল-আরাজী বলেন, "মালিকী সরকার খুবই দুর্বল"। এই সরকারের সফলতার সম্ভাবনা ক্রমশঃ তিরোহিত হইতেছে। মেহ্‌দী যোদ্ধারা বলে, ছাহাবীয়াহ বা সোনালী ইউনিটগুলিকে দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে মেহ্‌দী বাহিনী হইতে দলছুটদের খুঁজিয়া বাহির করিতে। এই ধরনেরই একটি ইউনিট বাগদাদে নিজেদের বন্দুকধারীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাহা সত্ত্বেও ইতোমধ্যে সদর কর্তৃক গড়িয়া তোলা বাহিনীকে যেই কোন কাহারো পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হইবে। (Newsweek)

ইরাকের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া—জাতীয় নির্বাচন ঃ

সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কর্তৃক ইরাকে লাগানো অগ্নিশিখা এখনও নিভে নাই, কোনদিন নিভিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাগদাদ বা ইরাকে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বহীন, সংরক্ষিত, বিশেষ সংরক্ষিত, গ্রীন জোন বা সাধারণ এলাকা—এমন কোন স্থান সম্পর্কে কেউ বলিতে পারে না—যে স্থানে বোমা হামলা বা আত্মঘাতি বোমা হামলা হয় নাই বা হইতে পারে না। বাগদাদ, বসরা আর কারবালার প্রান্তরে শুধু আগুন আর ধ্বংশ। মার্কিন টোমাহক ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র, এ্যাপাচে হেলিকপ্টার গানশীপ আর স্মার্ট বোমার আঘাতে প্রতিনিয়ত ধ্বংশ হইতেছে বিস্তির্ণ জনপদ। সাদ্দাম হোসেনসহ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে ১২ লক্ষেরও বেশি মানব সন্তান। ভিটা-মাটি হারাইয়া রিফিউজি হইয়াছে ৪০ লক্ষেরও অধিক লোক। প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটামিয়া বা আধুনিক ইরাক এখন এক ধ্বংশস্তুপের নাম।

তবুও ইরাকের মানুষ গণতন্ত্র ফিরিয়া পাইবার আশায় ভোটের লাইনে দাঁড়ায়। অদূরে মরুভূমির সীমান্তে তখন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভ আর সবুজ আলোর তীব্র ঝলকানীর কমলা রংয়ের বাগদাদ শহরটির কাঁপিয়া উঠার দৃশ্য। তবুও ভোট হয়। পাঁচ বছর আগের ভোটে (২০০৫) ইরাকীরা নিজেদের গণতান্ত্রিক প্রমাণ করিবার জন্য আত্মঘাতি বোমা হামলা অগ্রাহ্য করিয়া ভোট দিয়াছিল। শিয়ারা ভোট দিয়াছিল তাহাদের ধর্মীয় নেতাদের নির্দেশে, আর সুন্নিরা ভোট বয়কট করে নীরব প্রতিবাদ হিসাবে। সেই নির্বাচনের পরই আসে এক রক্তক্ষয়ী সময়। যুক্তরাষ্ট্রের ফরমায়েসী সেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন কূর্দী সূন্নি জালাল তালাবানী, আর প্রধানমন্ত্রী হন শিয়া নূরী আল-মালিকী। এ যেন হিসাব কষিয়া ইরাককে তিনভাগে ভাগ করা।

২০১০ সালের ৭ই মার্চ আবারও ইরাকে ভোটের কোলাহলকে ছাপাইয়া গেল মর্টারের গোলার শব্দ। ভোটের সময়সীমা পার হইবার পূর্বেই মারা পড়ে অন্ততঃ ২৪জন ইরাকী। আরেকবার ইরাককে 'গণতান্ত্রিক দেশ' প্রমাণ করিবার জন্য সেখানকার লোক ভোট দিল। নির্বাচনে এইবার সুন্নিরাও অংশগ্রহণ করে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বেও বাথ পার্টির সহিত সম্পর্ক থাকিবার অজুহাতে পাঁচশতেরও বেশি প্রার্থীর উপর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তাহাদের বেশির ভাগই সুন্নি। ইহাতে আরও স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইল ইরাক, ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্কের ভাষায়– "ধর্মীয় জাত-পাতের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করিল।" অনেক দরকষাকষি, অনেক ভুল বুঝাবুঝি আর অনেক বাগবিতণ্ডার পর ইরাকের পার্লামেন্ট নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পাশ করিয়াছিল। কথা ছিল, ২০১০ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ভেটো দিয়াছিলেন ইরাকের ভাইস প্রেসিডেন্ট তারিক আল-হাশেমী—তিনি সুন্নি। ইরাকের বর্তমান যুদ্ধের সময় অনেককে গৃহত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে সুন্নিদের সংখ্যাই বেশি। হাশেমী গৃহত্যাগিদের জন্য পার্লমেন্টে শতকরা ১৫ ভাগ আসন

দাবি করিয়াছিলেন। এইসব কারণে নির্বাচন পিছাইয়াছে ৭ই মার্চে। নির্বাচন লইয়া প্রথম হইতেই উদ্বিগ্ন ছিল আমেরিকা। কারণ, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে দুনিয়া জুড়ে তাহারা প্রচার করিতে পারিবে, ইরাকে গণতন্ত্র ফিরাইয়া দিয়াছে তাহারাই। ইরাককে স্বৈরতন্ত্রমুক্ত করিয়া (?) গণতন্ত্র উপহার দিবার জন্যই তাহারা ইরাকে হাজার হাজার সৈন্য পাঠাইয়াছে। রবার্ট ফিস্ক লেখেন, ইরাকের নূতন আইনের আওতায় নির্বাচন ব্যবস্থা এমনভাবে উলট-পালট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যেন কোন দল এককভাবে ক্ষমতায় আসিতে না পারে। ইরাকের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ সুন্নি আর ৬০ ভাগ শিয়া। সুন্নিদের মধ্যে রহিয়াছে আরব ও কূর্দি। ইহা ছাড়া রহিয়াছে তুর্কি, আর্মেনিয়ান ও এ্যাসিরিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষ। ৮৬টি দলের ছয় হাজার প্রার্থীর মধ্যে যাহারাই সংসদে আসুক না কেন, তাহাদের ক্ষমতাসীন হইতে হইলে কোন না কোন জোট গঠন করিতেই হইবে। আর ইহার অর্থ হইল, যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবে তাহাতে ক্ষমতার বিন্যাস হইবে ইরাকের শিয়া, সুন্নি ও কুর্দিদের সংখ্যানুপাতে। পশ্চিমা জগৎ সর্বদা মধ্যপ্রাচ্যে এমন ব্যবস্থাই চাহিয়াছে। তাহারা জানে এমন 'গণতন্ত্রে' যে সরকার আসিবে তাহাতে প্রতিটি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা অনুপাতে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা হইবে। ফলে প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব লইয়াই বেশি চিন্তিত থাকিবে। (দৈনিক পূর্বকোণ, রবার্ট ফিস্কের প্রবন্ধ অনুসরণে)।

২০১০ সালের ৭ই মার্চের নির্বাচনে শিয়া প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকীকে পরাস্ত করিয়া সুন্নি আইয়াদ আলাবীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মালিকী ইহাতে আপত্তি জানান এবং ব্যালট পেপার পূনঃগণনার অনুরোধ করেন। কিন্তু ইরাকের নির্বাচন কর্মীগণ বাগদাদ ও আশেপাশের এলাকার ফলাফল বহাল রাখে। আংশিক ব্যালট পূনঃগণনার পর তাহাতে কোন পরিবর্তন ধরা পড়ে নাই। নির্বাচনের ফলাফলে মালিকীর কোয়ালিশন দ্বিতীয় অবস্থানে রহিয়াছে। বিবিসির বাগদাদ সংবাদদাতা গ্যাব্রিয়েল গেট হাউস বলেন, নির্বাচন কমিশনের এই ঘোষণা ইরাকে রাজনৈতিক অচলবস্থা দূর করিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌছিল। পূর্ববর্তী ফলাফল বহাল থাকায় মালিকীর প্রধান চ্যালেঞ্জার আইয়াদ আলাবীর দলের সার্বিকভাবে দুই আসনের সংখ্যাগরিষ্টতাই রহিল। আর এই ঘোষণা মালিকীর জন্য একটা বড় ধরনের আঘাত হিসাবে দেখা দিয়াছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী মালিকী নির্বাচনের পরপরই অভিযোগ করিয়াছিরেন ভোট জালিয়াতী ও অনিয়মের। কিন্তু তাঁহার অনুরোধেই আবার ব্যালট গণনার পর নির্বাচন কমিশন কোন ধরনের হিসাবে গরমিল পায় নাই।

নির্বাচন কমিশনের পূনঃগণনার এই চূড়ান্ত ফলাফল অনুমোদনের জন্য এখন ফেডারেল আদালতে পাঠান হইবে। নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তা কাশিম আল আব্বুদি সাংবাদিকদের বলেন, আসনের সংখ্যা আগে যাহা ছিল হুবহু তাহাই রহিয়াছে। কোন পরিবর্তন হয় নাই। মার্চে প্রথম যে ফলাফল ঘোষণা করা হয় তাহা একই রহিয়া গিয়াছে।

তিনি আশা করেন, রাজনৈতিক মহল এইবার সন্তুষ্ট হইবেন। কারণ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সততা ছিল। জাল-জালিয়াতি ও অনিয়মের সব অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। অনেকেরই আশঙ্কা, অচলাবস্থা টিকিয়া থাকিলে বিদ্রোহীরাই ইহার সুযোগ লইবে। তাহাতে পরিস্থিতি আরও অচল হইয়া পড়িতে পারে। গত সপ্তাহে গোটা ইরাকে একের পর এক আত্মঘাতী বোমাসহ বিভিন্ন হামলায় ১০০ শতেরও বেশি লোক প্রাণ হারায়। (BBC. 18.5.10)

ফিলিস্তিন ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের নূতন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রধানতঃ ফিলিস্তিন-কেন্দ্রিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এই এলাকায় শান্তি ফিরাইয়া আনা। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরব বিশ্বসহ মুসলিম জাহানের আস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। তুরস্ক সফর কালে ওবামা মুসলমানদের সামনে তাঁহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি তুলিয়া ধরেন। মিশরের আল-আজহার ও কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কায়রোতে অনুষ্ঠিত এক বক্তৃতায় যে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য উল্লেখ করিবার মত এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন বারাক ওবামা। জর্জ মিশেলকে মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষ দূত নিয়োগ করেন তিনি। কিন্তু ওবামার এক বছরের শাসনামলে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি তিনি এখনও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ফিলিস্তিনে তিনি যে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের প্রতি নিজের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে কোন রকম তোয়াক্কা করিবার প্রয়োজন মনে করিতেছেন না ইসরাইলের বর্তমান কট্টরপন্থী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামীন নেতানিয়াহু। বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের প্রতি তোয়াক্কা না করিয়া তিনি পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদীবসতি স্থাপন করিয়াই যাইতেছেন। তিনি জেরুজালেমকে ইসরাইলের অবিভাজ্য রাজধানী করিবার পরিকল্পনা লইয়াছেন। গত ২৫শে জানুয়ারি '১০ এক অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন, এমন কোন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র তিনি হইতে দিবেন না যাহা চতুর্দিকে ইসরাইল দ্বারা পরিবেষ্টিত নহে। ইহারও পূর্বে তিনি ঘোষণা দিয়াছিলেন, সামরিক বাহিনী সম্বলিত কোন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র তিনি হইতে দিবেন না।

নেতানিয়াহুর পূর্বসুরি এহুদ ওলমার্ট প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের একটি কাঠামোর বিষয়ে সব পক্ষ একমত হইয়াছিল। সেই ঐকমত্য অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে জর্ডানের নিকট হইতে ইসরাইলের দখল করিয়া লওয়া পশ্চিম তীর এবং একই সময় মিশরের নিকট হইতে দখল করা গাজা উপত্যকায় স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হইবে। পবিত্র নগর জেরুজালেম হইবে উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী। এই সমঝোতাকে সামনে রাখিয়াই আগাইয়া যাইতেছিল মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ ও ইসরাইলের শান্তি আলোচনা। অতঃপর ফিলিস্তিনে সাধারণ নির্বাচনে হামাসের জয়লাভের পর এই সমঝোতা আলোচনা হইতে খানিকটা পিছটান দেয় ইসরাইল।

তাহারা গোটা ফিলিস্তিনের ওপর মাহমুদ আব্বাসের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং ফিলিস্তিন নিরাপত্তা বাহিনীকে ইসরাইলের পরিকল্পনা অনুসারে মার্কিন তদারকিতে সাজাইবার কাজে হাত দেয়। এইজন্য সব ধরনের অসহযোগিতা ও অবরোধ আরোপ করিয়া তাহারা হামাস সরকারকে বিদায় করে ক্ষমতা হইতে। হামাস সরকারকে বরখাস্ত করিবার যে আদেশ মাহমুদ আব্বাস প্রদান করেন উহাকে চ্যালেঞ্জ কারিয়া তাহারা গাজায় নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অতঃপর ইসরাইল গাজাকে সর্বাত্মকভাবে অবরোধ করিয়া রাখে। কিন্তু অবরোধ সত্ত্বেও হামাসকে দুর্বল করিতে ব্যর্থ ইসরাইল গাজায় অভিযান চালাইয়া হামাসের পতন ঘটাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টায়ও ব্যর্থ হইয়া ইহুদীরা অতঃপর পরবর্তী নির্বাচনে কট্টরপন্থী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে।

নেতানিয়াহু কট্টর চরমপন্থীদের সাথে লইয়া কৌশলে শান্তি প্রক্রিয়া হইতে নিজেকে গুটাইয়া লন, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদী বসতি স্থাপন পূনরায় আরম্ভ করেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাস এলাকা হইতে মুসলমানদের বিতাড়িত করিবার ষড়যন্ত্র করেন। অবস্থা দেখিয়া মাহমূদ আব্বাসও নিজেকে শান্তি আলোচনা হইতে সরাইয়া লন এবং ঘোষণা করেন, বসতি স্থাপন বন্ধ না করিলে তিনি আর শান্তি আলোচনায় বসিবেন না; এমন কি তিনি প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করিবার ঘোষণাও দেন। এ ধরনের এক পরিস্থিতিতে নূতন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নেতানিয়াহুর মনোভাব পূর্ববৎশীতলই থাকিয়া যায়। ওবামা তাঁহার বিশেষ দূত হিসাবে জর্জ মিশেলকে আবার নিয়োগ দেন শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় সচল করিতে। কিন্তু মাহমুদ আব্বাস বসিতে নারাজ। কারণ, তিনি জানেন কোন পূর্বশর্ত ছাড়া বৈঠকে বসিলে তাঁহাকে আরও ছাড় দিতে হইবে এবং আরও ভূমি হারাইতে হইবে আরবদের।

হামাসকে নির্মূল বা ক্ষমতাহীন করিবার গোপন শর্ত মানিয়া লইয়া কোন এক সময় মাহমূদ আব্বাস ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন। সেই শর্ত অনুযায়ী তিনি পুলিশ প্রশাসনকে পূনর্গঠন করেন। কোন কোন সময় ইসরাইলের নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে গোপনে ফিলিস্তিনী পুলিশ দ্বারা ফিলিস্তিনী বিরুদ্ধবাদীদের দমন করিয়াছেন এবং হামাস বন্দি দিয়া জেলখানা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে ইসরাইলের নিকট হইতে এতটুকু সহানুভূতিও আব্বাসের ভাগ্যে জুটে নাই। মাহমুদ আব্বাসের আল-ফাতাহ্‌র একজন সিনিয়র নেতা দুঃখ করিয়া বলেন, মাসের পর মাস পার হইতেছে, আমরা কিছুই অর্জন করিতে পারিতেছি না। কোন নির্বাচন হইল না, হামাসের সাথে সমঝোতায় পৌঁছিতে পারিলাম না। শান্তি প্রক্রিয়ার আলোচনাও আর অগ্রসর হইল না, দিন যতই গড়াইতেছে মাহমূদ আব্বাসের সমর্থন ততই প্রান্তিক পর্যায়ে নামিয়া আসিতেছে। যতটুকু কঠোরতা তিনি প্রদর্শন করিতেছেন তাহা মূলতঃ তাঁহার প্রতি ফিলিস্তিনী সমর্থন ধরিয়া রাখিবার জন্য। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রে-ইসরাইলের আনুকূল্যও তিনি নিশ্চিত করিতে পারিতেছেন না। আমেরিকানরা এখন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের নূতন

নেতা খুজিতেছেন যিনি একটি কট্টর ইসলাম বিদ্বেষী প্রশাসন গড়িয়া তুলিতে পারেন। এই লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে ইসরাইল একটি গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে তাহারা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিকে সামরিক দিক হইতে দুর্বল করা এবং নৈতিকভাবে হীনবল করিবার কাজ শুরু করিয়াছে। ইরান ও পাকিস্তানের পারমাণবিক স্থাপনার উপর হামলার ছক গ্রহণ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যে অক্ষ তৈরী হইয়াছে তাহাতে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছাড়াও নূতন করিয়া যোগ হইয়াছে ভারতও।

* * * * * *

মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিদূত জর্জ মিশেল শান্তি আলোচনা পুনরায় শুরু করিবার ব্যাপারে সম্প্রতি ইসরাইল ও ফিলিস্তিনী নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। অতি সাম্প্রতিককালে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের মধ্যে সম্পর্কের টানা-পোড়েনের মধ্যে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মিশেল প্রথমে ইসরাইলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মধ্যবামপন্থী লেবার পার্টির নেতা এহুদ বারাকের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্র বিভাগের মুখপাত্র পি জে ক্রাউলি বৃহস্পতিবার জানাইয়াছেন, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের সঙ্গে কথা বলিবার পরই মিশেলকে এই অঞ্চলে নূতন মিশনে পাঠান হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের টান টান উত্তেজনামূলক সম্পর্কের বিষয়ে মিশেল সোমবার (১৮.৪.১০) উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন, সব বিষয়ে পরিবর্তন আনিবার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। পরে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের সঙ্গে মিশেলের বৈঠক করিবার কথা। ইহার পূর্বে পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদী বসতি নির্মাণ লইয়া বর্তমানে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসনে নেতানিয়াহু অস্থায়ী সীমানার ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করিয়াছেন। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ নেতানিয়াহু পূর্ব জেরুজালেমে ইহুদী বসতি নির্মাণ বন্ধে সম্মত হইয়াছেন। (দৈনিক আমার দেশ, ২৬.৪.১০)

এদিকে ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ জানাইয়াছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় নূতন করিয়া শান্তি আলোচনা শুরুর উদ্যোগে তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে সাড়া দিবেন। বার্লিনে জার্মানির চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মার্কেলের সাথে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের এই কথা বলেন। মার্কেল বলিয়াছেন, নূতন এই শান্তি প্রক্রিয়াকে জার্মানি স্বাগত জানাইবে। মাহমূদ আব্বাস বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত মিশেলের নিকট হইতে এই বিষয়ক একটি প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ তাহা বিবেচনা করিতেছে। তবে একই সাথে ২০০৩ সালের ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি চুক্তির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া আব্বাস বলেন, ইসরাইল যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসতি স্থাপন বন্ধ করে এবং মৌলিক সমঝোতায় ফিরিয়া আসে তাহা হইলে তাহাদের

সাথে সহযোগিতা করিতে ফিলিস্তিন প্রস্তুত আছে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মুসলিম উদ্যোক্তা সংগঠকদের এক সমাবেশে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সঙ্ঘর্ষ নিরসনে ইসরাইল ও ফিলিস্তিন দুই রাষ্ট্র সমাধান নীতি হইতে যুক্তরাষ্ট্র সরিয়া দাঁড়াইবে না। উত্তর আমেরিকায় ইসরাইলী লবি এই ধরনের ঘোষণায় বিরক্ত হইতে পারে—এই ধরনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া বারাক ওবামা বলেন, "আমি যতদিন প্রেসিডেন্ট আছি দুই রাষ্ট্রনীতি হইতে সরিয়া যাইব না।" (আমার দেশ, ২৯.৮.১০)

এদিকে হোয়াইট হাউস মুখপাত্র রবার্ট গিব্স জানান, ইসরাইলের নিরাপত্তার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গিকারেও কোন ব্যত্যয় হইবে না, অর্থাৎ দ্বিরাষ্ট্রনীতির প্রতিও ওবামা প্রশাসনের সমর্থন থাকিবে। কারণ, তাঁহার মতে, ইহাতেই ইসরাইলী ও ফিলিস্তিনীদের অধিকার নিশ্চিত হইবে।

ফিলিস্তিনে শান্তি প্রক্রিয়া ব্যাহত হইবার কয়েকটি কারণ ঃ

আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা পরিচালনাকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিও বুশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা পর্যন্ত সবাই ফিলিস্তিনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইলেও তাঁহারা ব্যর্থ হইতেছেন। তবুও চেষ্টা করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা জানেন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি হইল ফিলিস্তিনে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তথায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। প্রচেষ্টা কেন ব্যর্থ হইতেছে এই সম্পর্কে ইসরাইলী পত্রিকা হারেজ (Haaretz) এর কূটনৈতিক সম্পাদক এলুফ বেন (Aluf Benn) কিছু কারণ লইয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি গভীরভাবে বিশ্বাস করিতে পারে না যে, একটি দ্বিরাষ্ট্র পরিকল্পনা দ্বারা ইসরাইলী-ফিলিস্তিনী সমস্যার সমাধান সম্ভব, বিশেষ করিয়া গাজা যখন ইসরাইলী হামলায় জ্বালিতেছিল। তাহা সত্ত্বেও বিগত দিনে প্রেসিডেন্ট বুশ এবং সাবেক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট যখন হোয়াইট হাউসে মিলিত হন তখন দ্বিজাতি রাষ্ট্রের বিষয়ে খুব আলোচনা করেন। প্রত্যেকের ন্যায় তাহারাও মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়ে পাঁচটি প্রতারণায় আবদ্ধ ঃ

১. উপর দিক নিচু কারা ঃ অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইল একটি চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি বা কূটনীতিক মহলে চূড়ান্ত "সমমর্যাদা" প্রদান। এই ধরনের একটি উদ্যোগের দ্বারা পশ্চিম তীর ও গাজায় একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে এবং সেই সঙ্গে ইসরাইলের জন্যও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করিবে। বিরোধপূর্ণ এলাকা যেহেতু ছোট আকারের, মাত্র কয়েক কিলোমিটার, হতাশ সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনী ব্লেয়ার এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কন্ডোলিজা রাইচ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, শেষ খেলা জানা হইয়া গিয়াছে, এখন একমাত্র সমস্যা হইল অকুস্থলে

গমন করা। ২000 সালের ডিসেম্বরে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কর্তৃক প্রদানকৃত সমাধান, যাহাতে চূড়ান্ত মর্যাদার নীল নকশা অন্তর্ভুক্ত ছিল, সবাইর নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু কোন কাজে আসে নাই। তিনি মনে করেন, জেরুজালেমের ভবিষ্যৎ এবং ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু সমস্যাদ্বয় সাধারণ সূত্রের বিষয়, বাস্তব কার্যকরী বিষয় নহে। কিন্তু তিনি ভুল করিয়াছেন। ইহা জাতীয় পরিচয়ের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যাহাতে কোন পক্ষই ছাড় দিতে রাজি নহে বরং ইহার জন্য মরিতে বা মারিতেও প্রস্তুত। ফিলিস্তিনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাসের কথা হইল হয়ত "চূড়ান্ত মর্যাদা বা কিছুই না"। অপরদিকে ইহুদী প্রধানমন্ত্রী চান শুধু একটি অভ্যন্তরিণ নিস্পত্তি যাহাতে চূড়ান্ত সীমানা, জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু সমস্যা– কিছুই থাকিবে না।

২. **নিচের দিক উপরে করা ঃ** পূর্বপুরুষদের ব্যর্থতা দেখিয়া প্রেসিডেন্ট বুশ সম্পূর্ণ উল্টা দিকে হাত দেন, অর্থাৎ সরে জমিনের বাস্তবতার পরিবর্তন। ক্রমবর্ধমান উন্নতির দ্বারা শান্তির সূচাগ্রে গমন সম্ভব হইতে পারে বিবেচনা করিয়া এই নীতিতে ফিলিস্তিনীদের বলা হইল সন্ত্রাস মোকাবিলা করিতে আর ইহুদীদের বলা হইল ভ্রমণের বাধা নিষেধ অপসারণ করিতে। ব্যর্থতার সাথে একের পর এক পরিকল্পনা দেওয়া হইল, কিন্তু কোন পক্ষ মার্কিনীদের খুশি করিবার জন্য যৎসামান্য উন্নতির বেশি যাইতে অস্বীকার করে। ২00৫ সালে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এ্যারিয়েল শ্যারন গাজা হইতে ইহুদী বসতি সরাইয়া লইলে অনেকে ইহাকে অবাস্তব বিবেচনা করিলেও তাহা কার্যকর করা হয়, কিন্তু তাহাতে কোন সমাধান আসে নাই।

৩. **সংখ্যাগুরু তত্ত্ব ঃ** শান্তি প্রতিষ্ঠাতাগণ সংখ্যাগুরু জনমতের উদাহরণ টানিয়া বলেন, অধিকাংশ ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলী শান্তির জন্য আপোষ করিতে রাজি। কিন্তু দুঃখজনক উত্তর হইল, সংখ্যাগুরু মতামত ধোপে টিকে না। বাস্তবতা নির্ধারিত হয় কিছু সংখ্যক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লোক দ্বারা—আত্মঘাতি বোমা হামলাকারী, কসম রকেট, পাহাড়ের উপরিস্থিত বসতি স্থাপনকারী দ্বারা— উদাসিন জনস্রোত দ্বারা নহে।

৪. **মধ্যস্থতাকারী তত্ত্ব ঃ** পণ্ডিতগণ মনে করেন, দীর্ঘ দিনের সংঘর্ষ, হত্যা ও লুটতরাজের ফলে ফিলিস্তিনী ও ইসরাইলীরা একে অপরের প্রতি আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, ফলে বিষয়টির মীমাংশার জন্য একজন মার্কিন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন, বিশেষতঃ প্রেসিডেন্টের একজন দূত যিনি উভয় পক্ষকে একত্রিত করিয়া একটি সমাধান চাপাইয়া দিতে পারেন। ইসরাইল মোটামুটি মার্কিন সমর্থনের উপর নির্ভরশীল; অতএব ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া তাহারা পশ্চিম তীরের দখল ছাড়িয়া দিবে। একটি শক্তিশালী মার্কিন মধ্যস্ততাকারীর অভাবের জন্য সাধারণতঃ আমেরিকার একটি শক্তিশালী ইসরাইল সমর্থক গোষ্ঠিকে দায়ী করা হয়। ভুল, ইহা কোন কুমতলব বা উদাসিনতা বা সমর্থক গোষ্ঠির ভয় নহে বরং প্রকৃত আগ্রহই ইহার জন্য দায়ী।

ক্লিনটন এবং বুশ প্রশাসন ইসরাইল কর্তৃক চীনের নিকট অস্ত্র বিক্রয়ের বিরোধিতা

করে এবং এ প্রক্রিয়ায় তাহারা জেরুজালেমের হাত বেশ মোচড়াইয়া দেয়, ফলে তাহারা অস্ত্র বিক্রয় হইতে ফিরিয়া আসে। এ পর্যায়ে কেপিটল হিলে অবস্থানরত ইসরাইলী সমর্থকগণ চুপচাপ বসিয়া থাকেন। ইসরাইলের বসতি স্থাপন এবং তল্লাসী কেন্দ্রগুলি ফিলিস্তিনীদের পীড়া দেয়। আমেরিকানদের নহে। ওয়াশিংটনের কার্যাবলি কাটছাঁট করা হয় ইহার নিজস্ব স্বার্থে– কোন নৈতিক বা আইনী আদর্শের জন্য নহে। একই বিষয় প্রযোজ্য একই রূপ সোচ্চার কিন্তু আরও অলস ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে এবং "মধ্যপন্থী আরব সরকারগুলির" ক্ষেত্রে। অতি সাম্প্রতিক ফিলিস্তিনী-ইসরাইলী সমঝোতার ধারক-বাহক সউদীগণ দূর হইতে তাহাদের শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপনের বাহিরে কখনও যাইবে না, সেই সাথে ফিলিস্তিনীদের আর্থিক সাহায্য এবং যে কূটনৈতিক তৎপরতায় ইসরাইলের বাধাপ্রদান দূরীভূত হইবে সেই ধরনের কোন ব্যবস্থা লইবার ব্যাপারে তাহারা সদা কুণ্ঠিত। বহিরাগত অন্য কোন দেশ এই কঠিন মধ্যস্থতার কাজে আগাইয়া আসিতে ইচ্ছুক নহে।

হতাশ ঘরমুখিতা তত্ত্ব ঃ উপরোল্লিখিত তত্ত্বসমূহের দ্বারা জর্জরিত হইয়া প্রধান নায়করা এখন প্রবঞ্চনার শিকার। ছয়দিনের যুদ্ধের বার্ষিকীতে এক ধরনের কাল্পনিক পুষ্পসজ্জিত পৃথিবীর চিন্তা তাহাদের মাথায় আসে। ফিলিস্তিনীরা তাহাদের ১৯৪৮ পূর্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের অধিকারের বা বালফার ঘোষণার পুর্ববর্তী অবস্থার স্বপ্ন দেখে যেখানে শত্রুভাবাপন্ন কোন ইহুদী উদ্বাস্তু থাকিবে না। ইসরাইলী বামপন্থীরা ১৯৬৭ পূর্ববর্তী ছোট কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ইহুদী রাষ্ট্রের চিন্তা করে যাহা ধ্বংশযজ্ঞে বিকলাঙ্গ পশ্চিমা বিবেক কর্তৃক প্রশংসিত হইবে। ইসরাইলী ডানপন্থীরা স্বপ্ন দেখে তাহাদের অসলো পূর্ব (অসলো চুক্তি) স্বর্গের যেখানে তাহারা নিরুপদ্রপে বসতি নির্মাণ চালাইয়া যাইতে পারে। বাস্তবে কেউ এখন আর পিছনে ফিরিয়া যাইতে পারে না। যদি কিছু হয় তাহা হইল এইসব দিবাস্বপ্ন শুধু সমস্যা সমাধানকে আরও জটিল করিয়া তোলে। (Newsweek, ১৮ জুন, ২০০৭)

সৌভাগ্যবশতঃ বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা দ্বিরাষ্ট্রনীতি হইতে সরিয়া আসিবেন না বলিয়া বার বার ঘোষণা দিতেছেন। এই ব্যাপারে তিনি দৃঢ় সংকল্প হইলে এবং তাঁহার প্রকৃত আগ্রহ থাকিলে অচিরেই একটি সমাধান বাহির হইয়া আসিবে।

মধ্যপ্রাচ্যকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত হিসাবে গড়িয়া তুলিবার একটি প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রসহ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি সমর্থন করিয়াছে। এই প্রস্তাবের কারণে ইসরাইলের কাছে থাকা সব ধরনের পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের ওপর চাপ তৈরি হইবে। এক যৌথ বিবৃতিতে বুধবার (১২.৫.১০) এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাইয়াছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন। ধারণা করা হইতেছে, ইরানের পরমাণু কর্মসূচী বন্ধ করিতে দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিষয়ে আরব রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন পাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তাহার অন্যতম মিত্র ইসরাইলের বিষয়ে ছাড় দিতেছে। তবে ওয়াশিংটন জানাইয়াছে এই প্রস্তাবটি এখনই

কার্যকর করা হইবে না। মধ্যপ্রাচ্যকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল করিবার প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানাইলেও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন সোমবার বলিয়াছেন, এইরকম অঞ্চল গঠন করিবার সময় এখনও আসে নাই। (Reuters)

এইদিকে বিবিসি ও রয়টার জানাইয়াছে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে পরোক্ষ শান্তি আলোচনা রবিবার (১৬.৫.১০) শুরু হইয়াছে। দুই পক্ষের সঙ্গে ওয়াশিংটনের বিশেষ মধ্যপ্রাচ্য দূতের কয়েক মাসের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার পর এই আলোচনা শুরু হইল। রামাল্লাহর পশ্চিম তীরে উর্ধ্বতন ফিলিস্তিনী আলোচক সায়ের ইরাকাত সাংবাদিকদের বলেন, পরোক্ষ আলোচনা শুরু হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস ও মার্কিন দূত জর্জ মিশেলের সঙ্গে বৈঠকের পর ইরাকাত এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, ৯ই মে প্রেসিডেন্ট আব্বাস ও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু পর্যায়ে আলোচনা শুরু হইয়াছে। তবে দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি কোন বৈঠক হইবে না বলিয়া জোর দিয়া জানান তিনি। ইরাকাত বলেন, ইসরাইলী সরকার এবং আমাদের মধ্যে কোন আলোচনা হইবে না। আলোচনা হইবে জর্জ মিশেল ও মার্কিনীদের সঙ্গে। তাহারাই দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করিবে। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পি.এল.ও) ইসরাইলের সাথে পরোক্ষ আলোচনায় সমর্থন দিলে দুইপক্ষের জন্য সামনে আগাইবার পথ প্রশস্ত হয়। উল্লেখ্য ২০০৮ সালের শেষ দিকে গাজায় ইসরাইলী সামরিক বাহিনীর যুদ্ধাভিযানের পর ফিলিস্তিনীরা প্রত্যক্ষ শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়। তবে গাজায় অবস্থানরত ফিলিস্তিনী হামাস গ্রুপ এ আলোচনার উদ্যোগ নাকচ করিবার জন্য পি.এল.ওর প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে।

বিগত রবিবার ১৬.৫.২০১০ শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে দ্বিতীয় দফা পরোক্ষ আলোচনা কোন ধরনের অগ্রগতি ছাড়াই শেষ করিয়াছেন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক মার্কিন দূত জর্জ মিশেল। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় হইতে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ফিলিস্তিনীদের প্রতি তাহাদের ইতিবাচক মনোভাব রহিয়াছে। তবে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আর কিছু বলা হয় নাই। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর সঙ্গে গত বৃহস্পতিবার হইতে গতকাল রবিবার (২ মে '১০) পর্যন্ত কয়েকদফায় সাড়ে তিন ঘন্টা বৈঠক করেন মার্কিন দূত জর্জ মিশেল। গত সপ্তাহে তিনি ফিলিস্তিনী নেতা মাহমূদ আব্বাসের সঙ্গেও বৈঠক করেন।

পরোক্ষ এই আলোচনা চারি মাস চলিবে। ইহাতে ফিলিস্তিন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরাজমান সীমান্ত, জেরুজালেম ও শরনার্থী সমস্যা লইয়া আলোচনা হইবে। আপাততঃ কোন অগ্রগতি না হইলেও পরোক্ষ এই আলোচনা উভয় পক্ষকে প্রত্যক্ষ আলোচনার দিকে লইয়া যাইবে বলিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করিতেছেন। (বিবিসি'র বরাতে প্রথম আলো, ২৫.৫.১০)

হিজবুল্লাহ গেরিলা বাহিনী ঃ (পূর্বে দ্রষ্টব্য, পৃ একশত সাতানব্বই)

লেবাননের বেসরকারী হিজবুল্লাহ গেরিলা বাহিনী একটি শক্তিশালী ও জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হইয়াছে। ২০০৬ সালে আগ্রাসী ইসরাইলী বাহিনীকে তাহারা যেভাবে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাতেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। সেই ইসরাইল-লেবানন যুদ্ধে ইসরাইলী বাহিনী লেবাননের তিনটি গ্রাম দখল করিয়া লইয়াছিল। অসহায় লেবাননী বাহিনী পিছু হঠা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে নাই। সেই চরম মুহূর্তে হিজবুল্লাহ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ইসরাইল ঐ তিনটি গ্রাম ছাড়িয়া লেবানন ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তাহাতেই এই বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। সংসদে তাহারা নির্বাচিত হয় এবং লেবাননের কোয়ালিশন সরকারেও তাহারা শরিকদার হয়।

বর্তমানে হিজবুল্লাহ বাহিনী আরও শক্তিশালী হইয়াছে। ফিলিস্তিনের হামাস ও ফাতাহ্ গেরিলাদের অবস্থানের কারণে তাহাদের ফিলিস্তিন সংগ্রামের একক যোদ্ধার দাবী নস্যাৎ হইলেও বর্তমানে তাহাদের শক্তি বিবেচনার যোগ্য। সম্প্রতি মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস্ বলেন, হিজবুল্লাহর কাছে যে পরিমাণ রকেট ও ক্ষেপনাস্ত্র রহিয়াছে অনেক দেশের সরকারের কাছেও সেই পরিমাণ অস্ত্র নাই। ইরান ও সিরিয়া লেবাননের শিয়া মতাবলম্বী এই ইসলামিক দলটিকে ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেট সরবরাহ করিয়া শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। অনেক দেশের সরকারের কাছেও তাহাদের সমপরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নাই। কিন্তু হিজবুল্লাহ বলিতেছে তাহাদের ক্ষেপনাস্ত্রের সংখ্যা এত বেশি নহে যে, তাহা ইসরাইল বা যুক্তরাষ্ট্রের সমান হইবে। তবে তাহারা ইহার পরিমাণ বাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে গেটস্ বলেন, ইহা সমগ্র অঞ্চলের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে ইসরাইলী প্রেসিডেন্ট শিমেন পেরেজ বলেন, সিরিয়া হিজবুল্লাহর কাছে কালোবাজারে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র বিক্রয় করিতেছে।

হিজবুল্লাহর অস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইল যাহাই বলুক না কেন ২০০৬ সালের ইসরাইল-লেবাননের যুদ্ধের চাইতে বর্তমানে হিজবুল্লাহর সামরিক শক্তি অনেক বেশি তাহা মানিতেই হইবে, কারণ তাহারা জানে ভবিষ্যতের কোন সংঘাতে ইসরাইলের মোকাবিলা করিতে হইবে হিজবুল্লাহ্‌কেই।

ইরান ঃ

কট্টরপন্থী মাহমুদ আহমাদিনিজাদ ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবার পর হইতে দেশের পরমাণু শক্তিধর হইবার প্রচেষ্টা জোরদার হয়; তবে ইরান শুরু হইতে বলিয়া আসিতেছে শান্তিপূর্ণ কাজের জন্য তাহারা এই কাজে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাহার মিত্রদের বিশ্বাস ইরান আণবিক বোমা তৈরীর লক্ষ্যেই এই কাজ চালাইয়া যাইতেছে। ইরানকে এই কাজ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইরানের উপর সীমিত আকারের অবরোধ আরোপ করে, কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের তেলের বড় নিয়ন্ত্রক হওয়ায়

জাতিসংঘের সীমিত আকারের অবরোধে কোন কাজ হয় নাই; তাহাছাড়াও ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে রাশিয়া ও চীনের সমর্থন থাকায় যুক্তরাষ্ট্র খুব একটা সুবিধা করিতে পারিতেছে না।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, মে মাসে ইরানের উপর নূতন অবরোধ আরোপ করা হইবে বলিয়া তিনি ধারণা করিতেছেন। ইরানের পরমাণু পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সম্ভাব্য পদক্ষেপ ঠেকাইতে তেহরান জোর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে মন্তব্য করিয়া বৃহস্পতিবার (১৮.৪.১০) বাইডেন এই কথা জানান। ইরান অবশ্য জোর দিয়াই বলিতেছে, তাহাদের পরমাণু কর্মসূচী শান্তিপূর্ণ উদ্দেশেই পরিচালিত হইতেছে। বাইডেন বলেন, ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এমন কি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট সবাই সম্মত যে, জাতিসংঘের অবরোধের পথেই আমাদের পদক্ষেপ লওয়া উচিত। (রয়টারের বরাতে আমার দেশ, ২৪.৪.১০)

আজ (৩.৫.১০) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ চুক্তির (NPT) পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনিজাদ এই বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য নিউইয়র্ক গিয়াছেন। তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিতেছেন। নিউইয়র্ক যাইবার প্রাক্কালে তিনি বলেন, তাঁহাদের হাতে প্রমাণ রহিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরাইলের সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠনের যোগাযোগ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে বিশ্ব সন্ত্রাসের মূলে। এইসবের তথ্য প্রমাণ তাঁহাদের হাতে রহিয়াছে। এই দুইটি দেশ চরমপন্থী গ্রুপগুলিকে সহায়তা ও মদদ দিতেছে বছরের পর বছর ধরিয়া। ইরান পরমাণু কর্মসূচী স্থগিত না করায় যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশের উপর নূতন করিয়া অবরোধ আরোপের চেষ্টা কালে আহমদানিজাদ এই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে সেই দেশ যে সামরিক সংঘাতে পরমাণু বোমার ব্যবহার করিয়াছে। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মোজতাবা সামারেহ হাশেমী জানান, আহমাদিনিজাদ জাতিসংঘ সম্মেলনে তাঁহার পরমাণু কর্মসূচী চালাইয়া লইবার অনুমতি চাইতে পারেন। কারণ ইরান সব সময় বলিয়া আসিতেছে তাহার পরমাণু কর্মসূচী কেবল জ্বালানীর প্রয়োজনে চালান হইতেছে।

এদিকে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ লইয়া যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা কাটিয়া উঠিবার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ব্রাজিল ও তুরস্কের অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়াছে ইরান। সোমবার (১৭.৫.১০) তুরস্ক ও ব্রাজিলের সঙ্গে চুক্তিতে সই করিয়াছে ইরান। অর্থাৎ ইরান এই চুক্তির আওতায় তেহরানের একটি গবেষণা চুল্লির জন্য পরমাণু জ্বালানীর বিনিময়ে তুরস্কের নিকট এক হাজার দুইশত গ্রাম সমৃদ্ধ ইউরোনিয়াম পাঠাইবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনিজাদ তেহরানে সোমবার প্রাতঃরাশের পর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ইরানের পরমাণু কর্মসূচী লইয়া পশ্চিমা সম্প্রদায়ের উদ্বেগ কমাইয়া আনিতে সহায়ক হইবে এই

চুক্তি। এই চুক্তি তেহরানের বিরুদ্ধে নূতন করিয়া জাতিসংঘের সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ প্রতিহত করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, ইরান নিজ দেশের বাহিরে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে রাজি হয় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী রেসেপ তাইয়েপ এরদোগাণের সঙ্গে আলোচনার পর। ইহার পূর্বে বিদেশে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ চালাইবার জন্য ইরানকে প্রস্তাব দিয়াছিল জাতিসংঘ। তেহরান জাতিসংঘের সেই প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেয়। ইরানকে এই ব্যাপারে রাজি করাইতেই মূলতঃ ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তেহরান সফর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলির সন্দেহ, তেহরানের পরমাণু কর্মসূচির আড়ালে ইরান বোমা তৈয়ারীর পরিকল্পনা করিয়াছে। ইরান অবশ্য বরাবরই পশ্চিমা বিশ্বের এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। পাল্টা বলিয়াছে শান্তির উদ্দেশ্যেই তাহাদের এই কর্মসূচি পালিত হইতেছে। তাৎক্ষণিকভাবে চুক্তির বিস্তারিত জানা যায়নি। তেহরানে তিন দেশের নেতা আলোচনার মাধ্যমে চেষ্টা করিয়াছেন কীভাবে ইরানের ওপর হইতে নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা সরান যায়। ইরান জানায়, বিদেশ হইতে উচ্চমানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে তাহারা তাহাদের ১২শ কেজি অসমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম বিনিময়ে রাজি হইয়াছে। বিদেশ হইতে আনা সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম চিকিৎসা গবেষণা চুল্লিতে ব্যবহার করা হইবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে ইরান বলিয়াছিল এই ধরনের যেই কোন সমীক্ষা তাহাদের মাটিতে হইতে হইবে। তেহরানে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ দাভুতোগলু বলেন, তেহরান জ্বালানি বিনিময়ে রাজি হওয়ায় ইরানের উপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আর কোন যৌক্তিকতা নাই। চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিনি তেহরানে সাংবাদিকদের বলেন, বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ইরান প্রমাণ করিয়াছে তাহারা গঠনমূলক পথ উন্মুক্ত করিতে চায়। তাই নূতন করিয়া নিষেধাজ্ঞা ও চাপ প্রয়োগের কোন ভিত্তি নাই। প্রেসিডেন্ট আহমদিনিজাদও ছয় বিশ্বশক্তির প্রতি ইরানের পরমাণু কর্মসূচী লইয়া নূতন আলোচনা শুরুর আহ্বান জানাইয়াছেন। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও জার্মানীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের উপর ভিত্তি করিয়া ইরানের সঙ্গে ৫+১ দেশের আলোচনার ইহাই সময়। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসে জাতিসংঘ ইরানকে প্রস্তাব করিয়াছিল তাহার স্বল্প মাত্রায় সমৃদ্ধ ১২শ কেজি ইউরেনিয়াম রাশিয়া ও ফ্রান্সে পাঠাইতে। তবে ইরান তাহার নিজ দেশের বাহিরে ইউরেনিয়াম পাঠাইতে অস্বীকার করে। এই কারণে পশ্চিমারা ফের নূতন করিয়া ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করে। ব্রাজিল ও তুরস্কের বিরোধিতার মুখে মূল নিষেধাজ্ঞা বিলম্বিত হয়। অবশ্য রাশিয়া ও চীন এই নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আপত্তি জানাইয়া আসিতেছিল। তাহারই ধারাবাহিকতায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ইরানে আসেন। ১৮ ঘণ্টার আলোচনার পর চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়া অচলাবস্থার অবসান ঘটিল বলা যায়। (BBC. Al-Jazira, AFP)

কিন্তু না, পরমাণু জ্বালানী বিনিময় চুক্তি করিলেও ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবরোধ আরোপের প্রক্রিয়া হইতে পিছু হটিবে না যুক্তরাষ্ট্র। ইরান, ব্রাজিল ও তুরস্ক একটি পরমাণু জ্বালানী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের পর ওয়াশিংটন এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্তি করে। যুক্তরাষ্ট্র বলিয়াছে, ইরান তাহার পরমাণু জ্বালানী তুরস্কের কাছে হস্তান্তর করিলেও অবরোধ আরোপের ঝুঁকি হইতে মুক্ত হইতেছে না। তেহরানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের পদক্ষেপ বন্ধ হইবে না। এমনকি এই পদক্ষেপে কোন ধীরতাও আসিবে না। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রবার্ট গিবস বলিয়াছেন, পরমাণু কর্মসূচি হইতে বিরত রাখিতে ইরানের বিরুদ্ধে অবরোধ আরোপসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসিবে না। তবে তিনি বলেন, ইরান নূতন চুক্তি মানিয়া চলিলে কিছুটা অগ্রগতি হইবে। ইহার পূর্বে ত্রিপক্ষীয় এই চুক্তির ব্যাপারে তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া লিখিত বক্তব্য দিয়াছিলেন। গিব্‌স বলেন, ইরান এই চুক্তি মানিয়া চলিলেও তাহাদের পরমাণু কর্মসূচির বিশ্বাসযোগ্যতা লইয়া যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। কেননা, তেহরান ঘোষণা করিয়াছে, ইউরেনিয়াম ২০ শতাংশ পর্যন্ত সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচী তাহারা অব্যাহত রাখিবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ফিলিপ ক্রাউলি বলেন, অনেকেই আছেন যাহারা ইরানের পরমাণু জ্বালানী বিনিময় চুক্তিকে সফলতা হিসেবে অভিহিত করিবেন। কিন্তু এই চুক্তির মাধ্যমে নূতন কিছু ঘটিয়াছে কিনা তাহা লইয়া আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। তবে তিনি বলেন, মার্কিন কর্মকর্তারা এখনও চুক্তিটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিতেছেন। তাহারা ইহা লইয়া শিঘ্রই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। এমনকি তুরস্ক ও ব্রাজিলের সঙ্গেও তাঁহারা আলোচনা করিবার চিন্তাভাবনা করিতেছেন। (এ.এফ.পি'র বরাতে প্রথম আলো, ১৯ মে, ২০১০)

এইদিকে ইরানের পরমাণু চুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহল শীতল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছে। যুক্তরাজ্য পূর্বের ন্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুর মিলাইয়া বলিয়াছে জাতিসংঘ প্রস্তাব অনুযায়ী ইরানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রক্রিয়া লইয়া আগাইয়া যাইতে হইবে। জাতিসংঘ ও রাশিয়া এই চুক্তিকে উৎসাহজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। চীন বলিয়াছে ইরানের পরমাণু জ্বালানী বিনিময় চুক্তি তাহারা সমর্থন করে। একই সঙ্গে চীন আশা প্রকাশ করে ইরানের পরমাণু কর্মসূচীকে কেন্দ্র করিয়া যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিরসনের পথে লইয়া যাইবে এই উদ্যোগ।

সিরিয়া ঃ

২০০০ সালে হাফিজ আল-আসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বাশার আল-আসাদ প্রেসিডেন্ট নিয়োজিত হন। পাশ্ববর্তী দেশ লেবাননের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী রফিক আল-হারিরীর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া সিরিয়ার সঙ্গে লেবাননের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। লেবাননের খৃস্টান প্রেসিডেন্ট লাহুদ সিরিয়াকে সমর্থন করেন। লেবাননের জনগণের চাপে পড়িয়া বেকা উপত্যকায় শিবির স্থাপনকারী সিরীয় বাহিনী লেবানন ত্যাগ করিতে বাধ্য

হয়। সিরীয় বাহিনী লেবানন ত্যাগের পরপরই ইসরাইল- লেবানন যুদ্ধ বাধিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত হিজবুল্লাহ গেরিলা বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ইসরাইল পিছু হটিতে বাধ্য হয়। (পঞ্চম সংস্করণে অনুবাদকের ভূমিকা দ্রষ্টব্য. পৃষ্ঠা একশত পঁচানব্বই)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সুযোগে সিরিয়াকে কাবু করিতে সচেষ্ট হয়। জাতিসংঘের তদন্ত রিপোর্টে হারিরী হত্যাকাণ্ডে সিরিয়া জড়িত মর্মে খবর প্রকাশিত হইলে যুক্তরাষ্ট্র আরও সুযোগ লাভ করে এবং জোরপূর্বক সিরিয়াকে অবরোধ করিবার চেষ্টা চালায়, কিন্তু সেইখানে বাধার সৃষ্টি করে রাশিয়া। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্বে দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা দুইশত বার, তের) মধ্যপ্রাচ্যে রুশ নীতিতে পরিবর্তন আসিয়াছে। তাহারা সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার ন্যায় মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষায় আগাইয়া আসিয়াছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যপ্রাচ্য সফরই ইহার প্রমাণ। ইদানিং আমেরিকা পুনরায় সিরিয়ায় হস্তক্ষেপের চেষ্টা চালাইতেছে, ফলে রাশিয়াও আগাইয়া আসে এবং সিরিয়ার নিকট যুদ্ধ বিমান, ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র ও বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিক্রয় করিবার জন্য কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। রাশিয়ার ফেডারেল সার্ভিস ফর মিলিটারী টেকনিক্যাল কো-অপারেশনের প্রধান মিখাইল দামিত্রিয়েভ বলেন,-রাশিয়া সিরিয়াকে মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান, ট্রাকে স্থাপিত ভূমি হইতে আকাশে উৎক্ষেপণযোগ্য স্বল্প পাল্লার পান্টসির ক্ষেপণাস্ত্র, কামানসহ বিমান বিধ্বংসী সরঞ্জামাদী সরবরাহ করিবে। দামিত্রিয়েভ বলেন, রাশিয়া দামেস্ককে ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্রও সরবরাহ করিবে।

সিরিয়ার আঞ্চলিক শত্রু ইসরাইল এই চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ক্রোধ প্রকাশ করে। একই সাথে সে দামেস্কের আর্থিক সামর্থের ব্যাপারেও প্রশ্ন তোলে। জেরুজালেমে কর্মরত ইসরাইলের এক সরকারী কর্মকর্তা, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বলেন, সিরিয়া বর্তমানে এই ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মূল্য পরিশোধ করিতে অক্ষম। তিনি নিশ্চিত যে, নিজের দেশের জনগণের জন্য খাবার কিনিবার মত যথেষ্ট অর্থও এই দেশটির নাই। কাজেই এই ধরনের সন্দেহজনক চুক্তির আসল কারণ কি, তাহা লইয়া যে কেউ অবাক হইয়া ভাবিবে। ইসরাইলের নিকটতম বন্ধু হিসাবে পরিচিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গি গ্রুপগুলিকে সহযোগিতা ও দুর্নীতির অভিযোগে সিরিয়ার উপর কয়েকদফা অবরোধ আরোপ করিয়াছিল। চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি সিরিয়া ভ্রমণ করেন, যাহা ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর মস্কোর কোন শাসকের প্রথম দামেস্ক সফর। মেদভেদেভ সিরিয়ায় পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে রাশিয়ার সম্ভাব্য সহায়তার বিষয়ে আলোচনায় নেতৃত্ব দেন। (রয়টার্স এর বরাতে দৈনিক আমার দেশ, ১৬.৫.২০১০)

সুদান ঃ

উত্তর আফ্রিকা বা আফ্রিকার সর্ববৃহৎ দেশ সুদানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের সহিত খৃষ্টান ও রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের দীর্ঘদিন ধরিয়া গৃহযুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে- (পূর্বে দ্রষ্টব্য

পৃষ্ঠা একশত ছয়)। সম্প্রতি সুদান কর্তৃপক্ষ বিরোধী দলীয় নেতা হাসান আল তুরাবিকে তাঁহার বাড়ি হইতে গ্রেফতার করে। বিগত ২৪ বছরের মধ্যে দেশের প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক মাস পর তাঁহাকে গ্রেফতার করা হইল। উল্লেখ্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই নির্বাচনে সুদানের এযাবৎকালের প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীর বিপুলভাবে পূনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পশ্চিমাগোষ্ঠির বিরাগভাজন ওমর আল-বশীরের বিরুদ্ধে তাঁহার মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ বিচারালয় হইতে গ্রেফতারের সনদ পাঠায়, কিন্তু সুদানের জনগণ এই সনদের বিরোধিতা করে এবং আল-বশীরকে বিপুলভাবে পুনরায় নির্বাচিত করে।

হাসান আল-তুরাবির সেক্রেটারী আওয়াদ বাবাকির এ.এফ.পি'কে বলেন, শনিবার মধ্যরাতের দিকে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের একটি দল তিনটি গাড়িতে করিয়া আসিয়া আল-তুরাবিকে তাহার বাড়ি হইতে তুলিয়া লইয়া যায়। তুরাবি গত মাসের নির্বাচনে জ্বালিয়াতির নিন্দা জানাইয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার পপুলার কংগ্রেস পার্টি ভবিষ্যতে সরকারে যোগ দিবে না। তুরাবি এক সময় প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীরের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পারন করিলেও তিনি বর্তমানে প্রেসিডেন্ট বশীরের কঠোর সমালোচকদের অন্যতম। ১৯৮৬ সালের পর সুদানের প্রথম বহুদলীয় এই নির্বাচনে বশীরকে বিজয়ী ঘোষনা করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বশীরকে আত্মসমর্পণ করিবার আহ্বান জানাইবার মাত্র দুইদিন পর ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে তুরাবিকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল। (এ.এফ.পি'র বরাতে আমার দেশ, ১৭.৫.১০)

চট্টগ্রাম
৩০ মে, ২০১১

ডঃ মুহাম্মদ ইনাম উল-হক

সাগর
আংকারা
তুরস্ক
সোভিয়েত
রাশিয়া
তেহরান
সিরিয়া
বাগদদ
ভূমধ্য সাগর
বৈরুত
দামেস্ক
জেরুজালেম
ইরাক
ইরান
আম্মান
কায়রো
কুয়েত
পারস্য উপসাগর
মিশর
সৌদী
রিয়াদ
কাতার
আরব
ওমান
মধ্যপ্রাচ্য
ইয়েমেন
এডেন
০ ৩০০
মাইল
আরব সাগর

সূচিপত্র

তৃতীয় খণ্ড

সাম্রাজ্যবাদ ও জাগরণ

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক মধ্যপাচ্য

মধ্যপ্রাচ্য পরিচিতি

আলোচ্য এলাকার নাম অনেকটা ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যাবলীর ন্যায় বিতর্কমূলক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রায় সমগ্র এলাকা ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। ইউরোপে তখন ইহা 'নিকট-প্রাচ্য' নামে পরিচিত ছিল। ইরান, আফগানিস্তান এবং কোনো কোনো সময় ভারতবর্ষকেও মধ্যপ্রাচ্য বলা হইত। এশিয়ার অবশিষ্টাংশকে 'দূরপ্রাচ্য' বা প্রাচ্য বলা হইত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওসমানীয় সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বলকান এলাকা অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে 'নিকটপ্রাচ্য' শব্দটি অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। তবে বিভিন্ন ফাউন্ডেশন, কলেজ এবং সমিতির মাধ্যমে 'নিকটপ্রাচ্য' নামটি প্রচলিত থাকে। কিছুসংখ্যক লেখক অবশ্য 'মধ্যপ্রাচ্যে'র চেয়ে 'নিকটপ্রাচ্য' নামটিকে অধিক পছন্দ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব-ইরান হইতে মিসরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে সামরিক এবং ল্যান্ডলীজ পলিসির ব্যাপারে এককরূপে গণ্য করা হইত। ফলে সৈনিকেরা পুঁথিগত ধারণা বর্জন করিয়া ইহার নামকরণ করেন 'মধ্যপ্রাচ্য'। যুদ্ধশেষে এই নাম স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া পড়ে যে অবশেষে ইহাই স্থায়ী নামে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত-পালিত কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা সঠিক ভৌগোলিক সীমারেখার জন্য 'নিকট', 'মধ্য' এবং 'দূর' শব্দগুলির প্রতি বিরূপ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া এই এলাকাকে 'পশ্চিম এশিয়া' বা 'দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া' নামে অভিহিত করেন। ইহা ছাড়া আরও দুইটি নামের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি হোগার্থের (Hogarth) ভাষায় 'অতি নিকট প্রাচ্য' (Nearer East) এবং অন্যটি কাহনের (Kahn) ভাষায় 'অপেক্ষাকৃত নিকট প্রাচ্য' (Hither East)।

দুর্ভাগ্যবশত যাঁহারা 'মধ্যপ্রাচ্য' নামটি ব্যবহার করেন তাঁহাদের অনেকেই ইহার সম্পূর্ণ এলাকার ব্যাপারে একমত নহেন। এইরূপ একটি চরমপন্থী ধারণা পোষণ করে 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিষ্ঠান' (Middle East Institute)। এই প্রতিষ্ঠানের মতে মরক্কো হইতে ইন্দোনেশিয়া এবং সুদান হইতে উজবেকিস্তান পর্যন্ত সমগ্র 'মুসলিম জাহান'ই হইতেছে 'মধ্যপ্রাচ্য'। আবার 'দেয়ারগোজ দি মিড্‌ল ইস্ট' -এর ন্যায় আধুনিক গ্রন্থগুলি মধ্যপ্রাচ্য বলিতে শুধু 'ফার্টাইল ক্রিসেন্ট'[১] বুঝায়। রয়েল ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (বৃটিশ) মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়া 'মধ্যপ্রাচ্য বলিতে ইরাক, তুরস্ক, আরব ও ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর, সুদান ও সাইপ্রাসকে বুঝায়। আলোচ্য গ্রন্থে মধ্যপ্রাচ্য বলিতে সুদান ও সাইপ্রাস ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকাগুলিকে বুঝান হইয়াছে।

৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ হইতে মোটামুটি ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসর, আরব, ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও ইরানের ইতিহাস একই প্রকৃতির। ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরান ব্যতীত তুরস্ক এবং উপরোল্লিখিত এলাকাগুলির ইতিহাসও একই ধরনের। ফলে এই গ্রন্থে

---

১. *'ফারটাইল ক্রিসেন্ট' বা 'উর্বর হেলাল' বলিতে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইলকে বুঝায়।*

মিসর, তুরস্ক, ইরান, আরব ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের ন্যায় একটি সীমিত এলাকাকে মধ্যপ্রাচ্য নামে অভিহিত করা ততটা অযৌক্তিক হয় নাই। কারণ ১৩০০ বৎসরের অধিককাল এই এলাকা ছিল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মধারার মূলকেন্দ্র- যাহা পর্যায়ক্রমে ইহার বহির্ভূত এলাকাকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অতএব এই এলাকার বিভিন্ন আন্দোলন বুঝিতে পারিলে ইহার বহিরাঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

সমগ্র ভূ-ভাগটি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ এবং পারস্য উপসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর এবং একইভাবে কাস্টিয়ান সাগরের জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত মোটামুটি একটি ক্ষেত্রফল বিশেষ। দক্ষিণ মিসর ও আরব ব্যতীত এই এলাকাটি গ্রীষ্মমন্ডলের বাহিরে অবস্থিত।

ভূমি

ভৌগোলিক দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্য তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।

১। **দক্ষিণ এলাকা :** এই এলাকায় পড়ে সমগ্র মিসর এবং উত্তর দিকে ফারটাইল ক্রিসেন্টের নিম্ন বাক লইয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপ। আরব মালভূমি লইয়া ইহা আফ্রিকান সাহারা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলের গড় উচ্চাতা ২,০০০ হইতে ৩,০০০ ফুট। এই মালভূমির উচ্চস্থল লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হিজাজে বিদ্যমান। এই উচ্চস্থল ৯,০০০ ফুট উচ্চ এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চতর হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে ইহার উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট। এই পর্বতশ্রেণী মধ্য-আরবে মেঘের আর্দ্রতা বহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম মরুভূমি 'রুব-আল খালি' (শূন্য এলাকা) সৃষ্টি করিয়াছে।

২। **উত্তর এলাকা :** এই এলাকা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরভাগে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিক গোলযোগ এইখানে তিনটি বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। এইগুলি তুরস্কের তারুস পর্বত, পশ্চিম ইরানের জাগরস পর্বত এবং উত্তর ইরানের আলবুর্জ পর্বত। এইসব উচু-নিচু পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পূর্ব তুরস্কের আরারাত পর্বত (১৭,০০০ ফুট) হযরত নূহের (আঃ) নৌকা অবতরণ স্থল হিসাবে পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট সুপরিচিত। দামাবন্দ (১৯,২০০ ফুট) নামে আরেকটি সুউচ্চ পর্বত উত্তর-ইরানে অবস্থিত। সারা বৎসর ইহা বরফাবৃত থাকে। হিমালয় পর্বতের পশ্চিমে ইহা সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণী। পারস্যের পৌরাণিক উপাখ্যানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রায় সমগ্র তুরস্ক আনাতোলিয়া মালভূমিতে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা গড়ে ৩,০০০ হইতে ৫,০০০ ফুট এবং সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ৬,০০০ হইতে ৮,০০০ ফুট। বৃষ্টিপাত হয় গড়ে ১০ হইতে ১৭ ইঞ্চি এবং তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে ৩০ ডিগ্রি ফারেনহাইট হইতে জুলাই মাসে ৮৬ ডিগ্রিতে উঠা-নামা করে।

আধুনিক ইরানের অর্ধেকেরও বেশি অংশ ইরানি মালভূমিতে অবস্থিত এবং ইহা দেশের রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২০০ হইতে ৮,০০০ ফুট। ইরানি মালভূমি পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত, যাহার মধ্য হইতে পানি নিষ্কাশনের কোনো পথ নাই, কিন্তু আনাতোলিয়া মালভূমি সেইরূপ নহে। ফলে ইরানি মালভূমির মধ্যভাগ প্রায় বৃষ্টিপাতহীন বলিয়া ইহার মধ্যে দুইটি মরুভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার একটি হইল উত্তরে লবণাক্ত দাশত-ই-কবীর এবং অন্যটি দক্ষিণে শক্ত বালির সাধারণ মরুভূমির ন্যায় দাশত-ই-লুত। মালভূমির বহিঃপ্রান্তের গড় বৃষ্টিপাত ৯.২

ইঞ্চি। তাপমাত্রা জানুয়ারি মাসে ৩৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হইতে জুলাই মাসে ৮৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে উঠা-নামা করে।

৩। **মধ্য এলাকা :** এই এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ ফিলিস্তিন হইতে উত্তর দিকে বাঁকিয়া তারুস এর দক্ষিণ পর্বত গাত্র পর্যন্ত এবং পুনরায় নিচের দিকে তাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা হইয়া পারস্য উপসাগর ও ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে দুইটি ছোট পর্বতশ্রেণী ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এইগুলি হইল লেবানন ও এ্যান্টি লেবানন (Anti-Lebanon)। ইহাদের উচ্চতা দক্ষিণে ৫,০০০ ফুট এবং উত্তরে মেরোনাইট সেন্টারে (Maronite Centre) ১৬,০০০ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতশ্রেণী এবং মিসর ও আরবের ভগ্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমের এই অঞ্চল সামুদ্রিক জীবনের স্তূপকেন্দ্র বিধায় পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে বিশাল তৈল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈচিত্র্য হইল- শুষ্কতা। জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা শুষ্ক। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইল পানি। কারণ পানি যেখানে নাই সেখানে জীবনও নাই। বস্তুত মরুভূমির ফার্সি প্রতিশব্দ বি-আবান, 'পানিহীন'। মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা পাঁচ হইতে ছয়ভাগ অঞ্চলে চাষাবাদ হয় এবং ইহার মধ্যে এক পঞ্চমাংশে পানির প্রয়োজন হয়। প্রাচীন আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং রোমানগণ পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করিত। প্রাচীন পারস্যবাসিগণ কানাত বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিয়া পাহাড় হইতে মাইলের পর মাইল সমতল ভূমিতে পানি সরবরাহ করিত। এখনও আরব ও সাহারা উভয়স্থানে বেদুইন স্ত্রীলোকগণ পানীয় জল সংরক্ষণের প্রয়োজনে উটের মূত্র দ্বারা চুল পরিষ্কার করিয়া থাকে। কায়রো শহরের বাহিরে স্ফিংস (Sphinx*) এর পাদদেশে দাঁড়াইয়া নীলনদের দিকে তাকাইলে সহজেই চোখে পড়ে যেখানে পানি আছে সেখানেই গাছ-গাছড়া জন্মিয়াছে এবং পানির নাগালের এক ইঞ্চি বাহিরে কিছুই জন্মায় নাই।

ভৌগোলিকগণ মধ্যপ্রাচ্যকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেন :

১. মরুভূমি, যেখানে কিছুই জন্মায় না, যথা নীলনদের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল, আরবের রুব-আল-খালি এবং ইরানের কবীর ও লুত।

২. ফারটাইল ক্রিসেন্টের দক্ষিণে শুষ্ক অনুর্বর ভূমি। এইখানে বসন্তের সময় উটের জন্য কিছু ঝোপ ও কাঁটা পাওয়া যায়। পানির জন্য বেদুইনগণ এক অস্থায়ী পানির গর্ত হইতে আরেকটিতে ছুটাছুটি করে।

৩. দক্ষিণ তুরস্ক, পশ্চিম ইরাক ও পূর্ব ইরানের অপেক্ষাকৃত কম শুষ্ক ভূমি। এই অঞ্চলের ভূমি চাষাবাদযোগ্য না হইলেও মোটামুটি মেষ ছাগল চরাইবার উপযোগী।

৪. স্থায়ী বসতি এবং কোথাও কোথাও বৃহৎ শহর পরিবেষ্টিত মরুদ্যান- যেখানে প্রতিনিয়ত পানি পাওয়া যায়।

৫. তুরস্ক ও ইরানের পাহাড়ি অঞ্চল আর সেখানকার চাষাবাদপূর্ণ সবুজ উপত্যকা,

---

* *গ্রীক উপাখ্যানের সিংহী মূর্তি। ইডিপাস ইহার ধাঁধার উত্তর দিতে সক্ষম হওয়ায় ইহা আত্মহত্যা করে। - অনুবাদক।*

সমতল পর্বতপার্শ্ব এবং পর্বতগাত্রের অসংখ্য গ্রামসমূহ।

৬. কৃষ্ণসাগর, ক্যাস্পিয়ানসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় এলাকা। এই জলপথগুলির প্রাচুর্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রত্যেকটির জন্য সমুদ্র পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

এই এলাকার মধ্যে শুধু দুইটি নদী প্রবাহিত। একটি নীল নদ যাহার উৎস হইল ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি হইতে উত্থিত নীলবর্ণের নীল এবং মধ্য আফ্রিকার উচ্চভূমি হইতে প্রবাহিত সাদা নীল।* উহারা খার্তুমে মিলিত হয় এবং ৪১৪৫ মাইল অতিক্রম করিয়া উত্তরে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়। মিসর দেশের উৎপত্তির দ্বারা নীল নদী লিবিয়া মরুভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার চাষাবাদ উপযোগী এলাকা নদীর উভয় তীরে দশ মাইল ব্যাপী মরুদ্যান বিশেষ। অতএব মিসর সত্যই "নীলনদের দান"। নীলনদ দুইভাবে জীবনদাতা। ইহা শুধু পানিই বহন করে না বরং ইহার বার্ষিক বন্যা মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। দশ কোটি টন সরস পলিমাটি এই কাজে সহায়ক।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি নদীপথ শাত-ইল আরব। কোনো কোনো স্থলে ইহা ইরাক ও ইরানের সীমান্ত হিসাবে কাজ করিতেছে।** ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদী পারস্য উপসাগরে পতিত হইবার ৬০ মাইল পূর্বে মিলিত হইয়াছে। শাত-ইল-আরব আবার কারুন নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্বে চক্রাকারে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই শাত-ইল-আবর। কারুন নদী ইরানে অবস্থিত। ইহা জাগরস পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছে এবং আহওয়াজ পর্যন্ত নৌ-পরিবহণযোগ্য। এই বিশুষ্ক এলাকায় উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হইল উত্তর তুরস্কের কিজেল ইরমাক (লাল নদী) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের যথাক্রমে সফেদ রুদ (শ্বেতনদী) ও কার্খ। ভৌগোলিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইল জর্দান নদী, লিতানী নদী ও অর্নেট নদী। এইগুলি সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইলের কিয়দংশে পানি সরবরাহ করে।

উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান উপকূল এবং উত্তর-পূর্ব তুরস্কের কিয়দংশ ব্যতীত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত শুধু অকিঞ্চিতকরই নহে বরং যাহা হয় তাহাও বসন্ত ও শীত মৌসুমে সীমাবদ্ধ থাকে। গ্রীষ্মকালে খরা একটি নিয়মিত ব্যাপার। সাধারণত আরব, ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর এবং ইরানের কিয়দংশে উত্তপ্ত গ্রীষ্ম ও উষ্ণ শীতের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তুরস্কের পার্বত্য এলাকায়, ইরানে ও লেবাননে ঠান্ডা শীতকাল ও ঠান্ডা গ্রীষ্মকালই সচরাচর বিরাজ করে।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই এলাকা বিশাল অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, অযত্ন ও মেষ-ছাগলের দরুন গুটিকতক স্থান ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানে বনহীন এলাকায় পরিণত হইয়াছে। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরে এবং লেবাননের পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণ ওক ও জুনিপার বৃক্ষ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট এলাকায় একমাত্র বৃক্ষ পপ্‌লার।

---

* *নীলবর্ণের নীল বা ব্লু নাইল বাহর আল আজরফ। সাদা নীল বা হোয়াইট নাইল বা বাহ্‌র আল আবয়াজ —অনুবাদক।*

** *ইরাক এই সীমান্ত মানিতে নারাজ। এই সীমান্তকে কেন্দ্র করিয়া ৮ বৎসরব্যাপী (১৯৮০-৮৮) ইরাক-ইরান যুদ্ধ হইয়াছে —অনুবাদক।*

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশেই গম, বার্লি, রাই, শিম, মসুর, পিঁয়াজ, ডালিম, নাশপাতি ও কিসমিস উৎপন্ন হয়। জাম্বুরা ফল জন্মে লেবানন, ইসরাইল ও ইরানে। আপেল জন্মে লেবাননে। ডুমুর ফল ও সুপারি জন্মে তুরস্কে; জলপাই জন্মে ইসরাইল, জর্দান ও ইরানে। আঙ্গুর এই এলাকার প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। পারস্যের পীচফল ও তরমুজ বিশ্ববিখ্যাত এবং অনুরূপভাবে খ্যাত ইরাকের খেজুর। শেষোক্ত ফলটি পারস্য উপসাগরীয় এলাকার বেশির ভাগ লোকের প্রধান খাদ্য। ইহার বিচি পশুর আহার্য এবং এই বৃক্ষের আঁশ দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা হয়। ইহার কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শিল্প-ফসলের মধ্যে প্রধান হইল মিসরের তুলা, ফারটাইল ক্রিসেন্টের সন, ইয়েমেনের কফি এবং ইরান ও তুরস্কের চা।

এই এলাকায় কুকুর, মেষ, ছাগল, শূকর ও গর্দভের ন্যায় অনেকগুলি গৃহপালিত পশু ছিল। চারণভূমির অভাবে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বর্তমানে খুবই নগণ্য হইয়াছে এবং দুগ্ধ সরবরাহও অপ্রতুল হইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়া ও উট প্রাচ্যের দেশ হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা। পারস্যের বিড়াল ও আরবি ঘোড়ার সুখ্যাতি সত্ত্বেও এই এলাকার প্রধানতম প্রাণী হইল উট। ভারবাহী জন্তু হিসেবে উটের স্থান আধুনিক কোনো যান-বাহন এখন পর্যন্ত পূরণ করিতে পারে নাই। বেদুইন জীবনে উট খুবই প্রয়োজনীয় জীব। উট বেদুইনদের জন্য দুধ ও মাংস যোগায়। ইহার লোম দ্বারা তাঁবু ও জামা প্রস্তুত হয়, গোবরে জ্বালানি হয় এবং মূত্র দ্বারা মাথার চুল পরিষ্কার করা হয়। 'মরুভূমির জাহাজ' হওয়া সত্ত্বেও ইহা পানি উত্তোলনের চাকা ঘুরায় এবং লাঙ্গল টানে।

এই এলাকায় প্রচুর সামুদ্রিক খাদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলাম ও ইহুদি খাদ্য-আইনের ফলে অধিবাসীদের মধ্যে ইহার প্রচলন খুবই সীমিত। পারস্য উপসাগরের সার্ডিন, ক্যাস্পিয়ান সাগরের কেভিয়ার এবং কৃষ্ণ সাগরের সুর্মা মাছ (Tuna) বিশ্ববিখ্যাত।

মধ্যপ্রাচ্যে চাষাবাদ খুবই সীমিত। তৈল ব্যতীত অন্য কোনো খনিজসম্পদই এই এলাকায় তেমন পাওয়া যায় না। তেল সম্পদ এই এলাকাকে শুধু বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত করে নাই, ইহাকে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পরিণত করিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তৈলের চাহিদা দাঁড়াইবে বৎসরে ১৬৫ কোটি টন। এই চাহিদার অর্ধেক আসিবে মধ্যপ্রাচ্য হইতে। তদুপরি সেখানকার তৈলসম্পদ এত ব্যাপক যে অনেকদিন পর্যন্ত ইহা ফুরাইবে না। এই অফুরন্ত তৈলসম্পদের অধিকাংশ রহিয়াছে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব ও কুয়েতে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের তৈলসম্পদ অতি নগণ্য।

রণকৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই এলাকার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গলস্থল। ভূমধ্যসাগর বা 'মধ্যসাগর' এর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই এলাকা পৃথিবীর বৃহৎ মহাসাগরগুলির সংযোগস্থল যাহা 'প্রাচ্যের সেতু' বলিয়া অভিহিত। অতি প্রাচীনকাল অবধি ইহা পাশ্চাত্য হইতে চীন ও ভারতবর্ষের স্থলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি প্রণালী বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করায় এই এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথে পরিণত হয়। ১৬ মাইল দীর্ঘ বসফরাস এবং পঁচিশ মাইল দীর্ঘ দার্দানালিশ বা হেলেস্পন্ট মারমারা সাগরের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া কৃষ্ণসাগরের সহিত

ভূমধ্যসাগরের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই সমস্ত প্রণালী অসংখ্য দিগ্বিজয়ীর কার্যকলাপের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। যেরযেস (Xerxes*) কর্তৃক ক্রোধে বেত্রাঘাত করিবার অনেক পূর্বকাল হইতে আজ পর্যন্ত ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কের স্থান হইয়া রহিয়াছে।

আরেকটি প্রসিদ্ধ জলপথ হইল লোহিত সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বাব-আল-মানদেব প্রণালী। সুয়েজ খালের মাধ্যমে ইহা ভূমধ্যসাগরের সহিত আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে।

তৃতীয় জলপথ হইল হরমুজ প্রণালী। ইহা পারস্য উপসাগরের মাধ্যমে তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী বিধৌত এলাকার সহিত ভারত মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে।

আধুনিককালে রেলপথের সূচনা মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণস্বরূপ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যসমস্যার (Eastern Question) প্রধান কারণ। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের এক বা একাধিক আধুনিক বিমান বন্দরে অবতরণ না করিয়া কেউ বেশি দূর যাইতে পারে না।

অর্থনৈতিক ও রণকৌশলের গুরুত্ব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য কতকগুলি প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি এবং বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের যথা, ইহুদিধর্ম, খ্রিষ্টানধর্ম এবং ইসলামের সূতিকাগৃহ হিসাবে বিরাজমান। ফলে ঐতিহাসিক, ধর্মতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর জন্য এই এলাকায় প্রচুর গবেষণার উপকরণ রহিয়াছে।

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে প্রাচীন গৃহস্থাপত্য শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। ইহার চারিটি বাহু ও একটি কেন্দ্রস্থল রহিয়াছে। একটি বাহু উত্তর পশ্চিমে তুরস্ক, দ্বিতীয়টি পূর্বে ইরান, তৃতীয়টি দক্ষিণে সৌদি আরব এবং চতুর্থটি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসর। কেন্দ্রীয় স্থান হইল ফারটাইল ক্রিসেন্ট। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বর্তমান লেবানন, সিরিয়া, ইসরাইল, জর্দান ও ইরাক। প্রত্যেকটি বাহু হইতে কেন্দ্রস্থলের দিকে একটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। তুরস্ক ও ইরানের সন্মুখদ্বার ছাড়াও প্রত্যেকটির পশ্চাৎদ্বার আছে। তুরস্কের পশ্চাৎদ্বার ইউরোপের দিকে এবং ইরানের পশ্চাৎদ্বার এশিয়ার দিকে। ইতিহাসে পাওয়া যায় যখনই এই দুই দেশের কোনো একটির কেন্দ্রস্থলের পথ বন্ধ হইয়াছে তখনই সেই দেশ বিচলিত বোধ করিয়াছে, যদিও সেইজন্য বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। সমগ্র ইতিহাসে এশিয়া মাইনরের জাতিসমূহ, প্রথমে বাইজেন্টাইনগণ এবং পরে তুর্কিগণ ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। অনুরূপভাবে সেই সময়ে পারস্যবাসিগণও চীন, ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে।

অপরদিকে অন্য দুইটি বাহু সৌদি আরব ও মিসরের অন্য কোনো অঞ্চলের দিকে পশ্চাৎদ্বার নাই অথবা তাহারা সেইগুলি ব্যবহার করে নাই। যুগ যুগ ধরিয়া আরব ও মিসরের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জনবলের পদসঞ্চার হইয়াছে ফারটাইল ক্রিসেন্টের দিকে। ফলে যখনই এই দুই দেশের কোনোটির কেন্দ্রস্থলের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে তখনই উহা নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায় যতগুলি শক্তি ফারটাইল ক্রিসেন্টে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই মিসর ও আরব উপদ্বীপ জয় করিতে সক্ষম হইলেও তুরস্ক

---

* *যেরযেস্ (৫১৯-৬৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) প্রথম দারিয়েসের পুত্র এবং পারস্যের সম্রাট। তিনি গ্রীস আক্রমণ করেন এবং ৪৮০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে সালামিস নামক স্থানে পরাজিত হন। — অনুবাদক।*

বা ইরান জয় করিতে পারে নাই। ফলে আরব জাতীয়তাবাদ ছাড়াও ফারটাইল ক্রিসেন্টে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর প্রতি সৌদি আরব ও মিসরের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে তুরস্ক ও ইরানের ভূমিকা এই ব্যাপারে খুবই নগণ্য।

অধিবাসী

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় অধিকাংশ অধিবাসী যথা, মিসরীয়, লেবাননী, তুর্কী ও পারস্যবাসীগণ গ্রীক, ইতালিয়ান, স্পেনীয় ও আইরিশদের ন্যায় সাধারণ ককেশীয় জাতি। এই এলাকায় বিশেষ করিয়া সুদানে নিগ্রো ধরনের লোকও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব ইরানের তুর্কমানগণের ন্যায় কতকগুলি মঙ্গোলীয় জাতিও এই অঞ্চলে বাস করে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দীর্ঘকাল যাবৎ একটি সংযোগস্থল হিসাবে থাকার ফলে বিভিন্ন জাতিতে এত মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, দৈহিক গঠনের দিক হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে অন্য যে কোনো বিষয়ের চাইতে বেশি পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে ভাষা।

ক. ইন্দো-ইউরোপীয়ান : এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল পারস্যবাসিগণ। তাহাদের সহিত আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও পাকিস্তানের কিছু অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে; ফার্সি ভাষার সহিত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের ভাষাগত মিল রহিয়াছে। তেমনি মধ্যপ্রাচ্যের আরমেনিয়ান ও কুর্দিদের সহিত পারস্যবাসীদের ভাষাগত সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের সহিত পারস্যবাসীদের পার্থক্য রহিয়াছে। আরমেনীয়গণ মধ্যপ্রাচ্য ও পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তবে তাহাদের প্রধান অংশ রহিয়াছে ইউরোপের আরমেনিয়ায়। অপরদিকে কুর্দিগণ তত বিশ্বজনীন নহে; তাহাদের অধিকাংশ বাস করে তুরস্ক, ইরান ও ইরাকের একটি বিশেষ এলাকায়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট রহিয়াছে।

খ. তুর্কি জাতি : মধ্যপ্রাচ্যের এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল তুর্কিগণ। প্রাচ্যে তাহাদের ভাষাগত মিল রহিয়াছে তুর্কমান ও উজবেকদের সহিত এবং পাশ্চাত্যে মিল রহিয়াছে হাঙ্গেরীয় ও ফিনিশদের সহিত। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইব মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কিগণ তুলনামূলকভাবে নবাগত।

গ. সেমিটীয় : সেমিটীয় ভাষাভাষী লোকজন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিহিত এলাকায় বাস করে। তাহারা ইন্দো-ইউরোপীয়দের ন্যায় বিক্ষিপ্ত বা তুর্কিদের ন্যায় বসবাস করে না। মধ্যপ্রাচ্যের এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল আরবিভাষী লোকজন। ইহারা কোনো বিশেষ 'জাতি' নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে অঞ্চলগত, জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী লোকদের সঙ্গে সুদান, উত্তর আফ্রিকা এবং সুদূর পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার লোকদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে।

হিব্রুভাষী ইহুদীদের সহিত আরবদের ভাষাগত সম্পর্ক বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যে তাহারা পৃথক রাষ্ট্রের অধিকারী। আরেকটি সংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইল আসিরীয়গণ বা কালদিয়ানীগণ। তাহারা সিরিয়াক ভাষায় কথা বলে। আসিরীয়গণ খ্রিষ্টান এবং প্রায়ই ইরান ও ইরাকে বাস করে। ইহাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ সিরিয়া ও লেবাননে বাস করে এবং বৃহদাংশ মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে।

ধর্মীয় শ্রেণীবিন্যাস

ভাষাগত শ্রেণীর বিভিন্নতা ধর্মীয় পার্থক্য দ্বারা বিশৃঙ্খল। এই ধর্মীয় পার্থক্যগত বিশৃঙ্খলা বেশ জটিল। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ লোক মুসলমান। তাহারা আবার সুন্নি ও শীয়া মতবাদে বিভক্ত। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নি। তাহারা নিজেদেরকে সুন্নাহ বা রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) নির্দেশিত পথের অনুসারী বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু তাহাদের এই দাবির যথার্থতার ব্যাপারে ওহাবিগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ওহাবিবাদ* সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। শিয়াদের প্রধান বিভাগগুলি হইল-

ক. জাফরি বা বার ইমামবাদী (Twelvers)। ইহা ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ইহার অনুসারিগণ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও ইতস্তত বাস করে।

খ. ইসমাইলীয়গণ বা সাত (Seveners) ইমামবাদিগণ সমগ্র ইসলামি বিশ্বে বিক্ষিপ্ত;

গ. যায়েদীয়গণ, যাহাদের ধর্ম ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম;

ঘ. আলাবীয়গণ, যাহারা উত্তর সিরিয়ায় বাস করে।

সুফিগণ ইসলামি সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা কোনো পৃথক মতবাদ সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু উলামাগণ বা ইসলামের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তাহাদের অতীন্দ্রিয় মরমীবাদের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইসলামের ক্রমবিকাশ আলোচনার সময় এই সমস্ত শ্রেণী সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হইবে।

এই অঞ্চলের অমুসলিম ধর্মগুলি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান না থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো ভূমিকাই সম্পূর্ণ হইবে না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সমস্ত ধর্মের কোনো আলোচনা অসমীচীন বিধায় এইখানে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইল।

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হইল খ্রিষ্টানগণ। মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিষ্টানগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ঃ

ক. প্রাচ্যদেশীয় সনাতন গির্জা (Eastern Orthodox Church) ঃ ইহা প্রাচ্যের চারিটি প্রাচীন নগরী হইতে উদ্ভুত-কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল), আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিওক ও জেরুজালেম। এইগুলি ১০৫৪ খ্রিষ্টাব্দে পাশ্চাত্য গির্জা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে এই গির্জা গ্রীক সনাতন (Greek Orthodox), রুশ সনাতন (Russian Orthodox) ইত্যাদি প্রথায় বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্বাধীন গির্জার অধিকারী (Autocephalous) এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব ধর্মযাজক আছে। তবে কনস্টান্টিনোপল এর ধর্মযাজকের অনুসারীগণ আরব ও গ্রীক। এন্টিওক ও জেরুজালেমের ধর্মযাজকের অধিকাংশ খ্রিষ্টান-আরব। এন্টিওক ধর্মযাজকের কেন্দ্রস্থল দামেস্ক।

খ. প্রাচ্যদেশীয় গীর্জাসমূহ (Oriental Churches) ঃ এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শাখা রহিয়াছে:

১. মিসরের কিপ্তি গির্জা (The Coptic Church of Egypt) ঃ এই গির্জা, যাহার ধর্মযাজক কায়রোতে বাস করেন, কলসেডন্ পরিষদের (Council of Chalcedon) সিদ্ধান্ত প্রত্যাখান করিয়া মনোফিজাইট (Monophysite) হইয়া যান। মনোফিজাইটগণ যীশুখ্রিষ্টের একাত্মতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহা ইথিওপিয়ার গির্জার মতো। তবে পার্থক্য এই

---

* *ওহাবিবাদ কোনো ধর্মের নাম নহে। বিস্তারিত বিবরণ নীচে দ্র. পৃ. ২৬০।*

যে মিসরে স্তোত্রমালা হইল কিপ্তি ও আরবি ভাষায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে কিপ্তিদের ভাষা আরবি। স্তোত্রমালার কিছু অংশে কিপ্তি ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

২. **সিরীয় গির্জা ঃ** যাহাকে 'জেকোবাইট'ও বলা হয়। এই গির্জাও মনোফিজাইট এবং সিরিয়ার হোমসে বসবাসকারী এন্টিওক ধর্মযাজক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্তোত্রমালা সিরিয়াক ভাষায় পরিচালনা করা হয়।

৩. **আর্মেনীয় গির্জা ঃ** প্রায়শই 'গ্রেগরীয়ান' নামে উল্লেখিত এই গির্জা প্রাচ্যদেশীয় সনাতনের মতানুসারী। আর্মেনিয়ার ইসমিজিন ক্যাথলিক (Catholicos of Etchmizdzin) ইহার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মযাজক। ইহা একটি জাতীয় গির্জা, কারণ ককেশ্যাশে আর্মেনীয়দের জাতিগত অস্তিত্ব ছিল। সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাহারা প্রথমে বাইজান্টাইন-পারস্য যুদ্ধ ও পরে ওসমানীয়-পারস্য যুদ্ধের মাঝখানে পতিত হয়। ফলে বিগত শতাব্দীগুলিতে তাহারা ওসমানীয় ও পারস্যবাসী উভয়ের এবং পরে রুশদের অধীনস্থ্ হইয়া পড়ে। রাশিয়ার বলসেভিক বিপ্লবের ফলে ইরভানকে রাজধানী করিয়া আরমেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহা ছাড়াও আরমেনীয় সম্প্রদায়গুলি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত।*

৪. **নেস্তোরীয়গণ** (The Nestorians) ঃ গির্জা হিসাবে নেস্তোরীয়গণ যীশুখ্রিষ্টের দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী। ইসলামের আগমনের পূর্বে সমগ্র এশিয়ায় তাহারাই ছিল খ্রিষ্টান ধর্মের প্রধান প্রচারক। ইরানের ধর্মযাজকের পক্ষ হইতে তাহারা সুদূর চীন পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে। 'জাতি' হিসাবে তাহাদিগকে আসিরীয় বলা হয় এবং তাহারা কথা বলে সিরীয় ভাষায়- যাহা সেমিটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ধর্মযাজক, মারশিম্মুম (Mar Shimmum), পার্থিব ও ধর্মীয় শাসনকর্তা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কৃষিজীবী সিরীয়গণ ইরানের আধিপত্যে বসবাস করিত। অপরদিকে জীলো (Jeeloo) নামে পরিচিত পাহাড়ী অধিবাসীগণ তুর্কিদের অধীনে বাস করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় উভয় শ্রেণীই আন্তর্জাতিক কোন্দলের শিকারে পতিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ আসিরীয় বসতি হইল ইরান ও ইরাকে।

গ. **রোমান ক্যাথলিক ঃ** তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ল্যাটিন রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং তাহারা মধ্যপ্রাচ্যে বসতকারী ইউরোপীয় রোমান ক্যাথলিক। বিভিন্ন সনাতন ও প্রাচ্যদেশীয় গির্জায় ব্যক্তিগত ধর্মান্তরিত লোকদের লইয়া ইহা গঠিত। আরেকটি শ্রেণী এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শ্রেণী হইল ইউনিয়েট গির্জা (Uniate Church)। এই নাম দেওয়া হয় সনাতনদিগকে - যাহারা পোপের আধিপত্য স্বীকার করেন কিন্তু অপরদিকে উপাসনায় প্রাচ্যদেশীয় রীতিনীতি পালন করিতে পারেন। তাহাদের ধর্মযাজক বিবাহ করিতে পারেন। মোটামুটিভাবে ইউনিয়েটগণ তাহাদের মৌলিক জাতীয় নীতিতে বিশ্বাসী এবং তাহাদের নিজস্ব ধর্মযাজকও আছে। এইগুলি হইল গ্রিক ক্যাথলিক, সিরীয় ক্যাথলিক ও আরমেনীয় ক্যাথলিক, কলডীয় ক্যাথলিক (নেস্তোলিয়ান), কিপ্তি ক্যাথলিক ও মেরোনাইট ক্যাথলিক। শেষোক্তটি সর্ববৃহৎ উপবিভাগ, এবং রীতি অনুসারে লেবানন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন এই বিভাগ হইতে।

ঘ. **এ্যাঙ্গলিকান ও প্রটেস্টান্ট** (Anglican and Protestant) এ্যাঙ্গলিকানগণের কাজ হইল মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সম্প্রদায়গুলি এবং প্রাচ্যদেশীয় ধর্মান্তরিতদের নেতৃত্ব প্রদান। এই দলে কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমান ও ইহুদিও রহিয়াছে। প্রটেস্টান্ট গির্জাগুলির উদ্ভব হইয়াছে

---

* *সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে আর্মেনিয়া একটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়।-অনুবাদক।*

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আমেরিকার গির্জাগুলির মিশনারী কার্যাবলী হইতে। ইহার সদস্যবৃন্দ হইল প্রাচ্যদেশীয় গির্জা এবং ইসলাম, ইহুদি ও জরথুস্ত্র ধর্ম হইতে দীক্ষিত লোকজন।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি অমুসলিম ধর্ম হইল ইহুদি ধর্ম- যাহা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের মূল ইহুদি অধিবাসীদের সকলেই শেফারডিম (Sephardim) সম্প্রদায়ভুক্ত। অপরদিকে ইসরাইলে বসবাসকারী আশকেনাজিম (Ashkenazim) সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই ইউরোপ হইতে সদ্যাগত। সৌদি আরব, জর্দান ও ইয়েমেন ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশেই ছোট ছোট ইহুদি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজন আছে বলিয়া দাবি করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের তৃতীয় অমুসলিম ধর্ম হইল আরব বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যবাসীদের জরথুস্ত্র ধর্ম (অগ্নি উপাসক)। ইহা ইহুদিধর্ম, বিশেষভাবে খ্রিষ্টানধর্ম ও ইসলামকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইহার দুইটি শাখা, মিথরাইজম (Mithraism) এবং মনিচ্যানিজম (Manicheanism) খ্রিষ্টানদের মতো রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিকদের ধর্মীয় আনুগত্য দাবি করে। আরব বিজয়ের পর যাহারা নিহত হয় নাই বা ধর্মান্তরিত হয় নাই তাহাদের একটি বিরাট অংশ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া ভারত ও পাকিস্তানে পার্সি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। জরথুস্ত্রদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনও ইরানে বসবাস করে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অমুসলিম ধর্মসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কথা উল্লেখ করিতেই হইবেঃ

দুর্জি বা দ্রুজ (The Druzes) ঃ লেবানন, সিরিয়া ও ইসরাইলে বসবাসকারী এই ধর্মানুসারিগণ শীয়া সম্প্রদায়ের ইসমাইল উপ-বিভাগের একটি অংশ। তাহারা ফাতেমীয় বংশের খলিফা হাকিমকে (৯৯৬ - ১০২১ খ্রীঃ) সৃষ্টিকর্তার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। এই নামটি বোধ হয় তাহাদের প্রথম মিশনারি দারাজি (Darazi ১০১৯ খ্রীঃ) হইতে উদ্ভুত। তাহারা কোনো ধর্ম গ্রহণ করে নাই কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের সার গ্রহণ করিয়া কালক্রমে একটি আলাদা জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ইয়াজিদিগণ (The Yazidis) ঃ নিজেদের ধর্মে তাহারা শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাহাদের প্রতিবেশীগণ তাহাদিগকে 'শয়তান পূজারী' বলিয়া অভিহিত করে। ইয়াজিদিবাদ শিয়া ইসলামের একটি প্রশাখা। তবে ইহাতে মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান, ম্যানিকিয়বাদ ও শামানবাদ এর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই ধর্মে প্রায় ২৫,০০০ হাজার বিশ্বাসী রহিয়াছে। তাহারা উত্তর সিরিয়া ও ইরাকে বাস করে।

সাবিয়ান (The Sabian) ঃ ইহাদিগকে প্রাক-ইসলামি যুগের আরবের সাবিয়ান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই সাবিয়ানগণকে (বা ম্যানডিন্স, Mandians) সাধারণত কিন্তু ভ্রমবশত বোধ হয় সেন্টজন দি ব্যাপটিস্ট মতাবলম্বী খ্রীষ্টান (The Christians of St. John Baptist) বলা হয়, ইহাদের ধর্ম যদিও খ্রিষ্টান (Judio-Christian) ছাঁচে গড়া। কোরআন শরীফে ইহাদের কথা তিনবার উল্লেখ আছে। বোধ হয় এ জন্যই মুসলমানগণ ইহাদিগকে 'আসমানী কিতাবের অধিকারীর মর্যাদা প্রদান করে। ধর্মীয় রীতি অনুসারে তাহাদের গোছল করিবার নীতিতে মুগ্ধ হইয়া আরবগণ ইহাদিগকে মুঘতাসিলা (যাহারা গোছল করে) বলিয়া অভিহিত করে। এই কারণে ব্যাপ্টিস্ট জনের অনুসারীদের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক

ধারণা করা হয়। বর্তমানে তাহারা প্রায়ই ইরাকে বাস করে এবং রৌপ্যশিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত।

বাহাইগণ (The Bahais) ঃ ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম শিয়া ইসলামের শায়খি সম্প্রদায়ের একটি প্রশাখা। ইহাকে 'বাবি' বলা হইত। ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বাহাইগণ বাবিগণ হইতে আলাদা হইয়া নিজস্ব একটি ধর্ম গঠন করে। বহু ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া এক শতাব্দীরও অধিককাল টিকিয়া থাকিবার পর এই ধর্ম সার্বজনীনতা লাভ করে। বাহাইদের অধিকাংশ লোক ইরানে বাস করে, যদিও তাহা স্বীকৃত নহে। তাহাদের কেন্দ্রস্থল ইসরাইলের হাইফা। বিশ্বের অনেক জায়গায় তাহাদের 'অধিবেশন' রহিয়াছে।

প্রভেদ ও ঐক্য

বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনভোগী এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর রহিয়াছে এগারটি আধুনিক রাষ্ট্র ও প্রায় সাতটি শেখ-শাসিত রাষ্ট্র। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা ও উন্নতির অধিকারী। সৌদি আরব ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রই একক ধর্মীয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নহে, অতএব কঠোর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের প্রশ্নে প্রায়ই ইহাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের সকল রাষ্ট্রেই জনসাধারণের পরিচয় তাহাদের ধর্মের মাধ্যমে হয় বলিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া মনে করে। এই বিপত্তি অতিক্রমের জন্য লেবানন একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। এই পন্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যানুসারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে সমানুপাতিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। একজন মেরোনাইট ক্যাথলিককে সর্বদা প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়, একজন সুন্নি মুসলমানকে করা হয় প্রধানমন্ত্রী, একজন শিয়া মুসলমানকে করা হয় পার্লামেন্টের স্পীকার, একজন সনাতন খ্রিষ্টানকে মন্ত্রিসভায় লওয়া হয়, একজন দুর্জিকে আরেকটি মন্ত্রিসভায় লওয়া হয় ইত্যাদি। ইহা একটি অনিশ্চিত ব্যাপার হইলেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ইহা ইরাকের অবস্থার তুলনায় অনেক উন্নততর। ইরাকে শিয়া সংখ্যালঘু জনসাধারণ সুন্নি সংখ্যালঘু জনসাধারণ কর্তৃক সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু ভাষাগতভাবে পারস্যবাসীদের সহিত সংযুক্ত। আরমেনিয়ান ও আসিরীয়গণ অবশিষ্ট ইরাকিদের ভাষাও ব্যবহার করে না, ধর্মও পালন করে না।

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রভেদ রহিয়াছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শ্রেণীভাগ খুবই জোরালো। লোকজন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্নে বিভিন্ন বিরোধে পতিত হয়, কখনও ভাষাগতভাবে যথা আরবি, আরমেনীয়, হিব্রু, কুর্দি, ফার্সি, সিরীয় ও তুর্কি এবং কখনও ধর্মগতভাবে যথা বাহাই, দুর্জি, ইহুদি, সনাতনী, প্রটেস্টান্ট, রোমান ক্যাথলিক, সাবিয়ান, সুন্নি, ইয়াজিদী বা জরথুস্ত্র এবং কখনও কখনও বিরোধে পতিত হয় জাতিত্বের ভিত্তিতে, যখন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রশ্ন উঠে। শেষোক্ত প্রকৃতির আনুগত্য ইসরাইলি, পারস্যবাসী ও তুর্কিদের মধ্যে যত প্রবল, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তত প্রবল নহে। এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া নৃতত্ত্ববিদ কার্লটন কুন (Carleton Coon) মন্তব্য করিয়াছেন, মধ্যপ্রাচ্য বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শ্রেণী সম্বলিত জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষ বিশেষ।

এতদসত্ত্বেও এই জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষের মধ্যেই রহিয়াছে কতকগুলি সুতা যাহা সকল জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে যে- কেউ এখানে একই প্রকৃতির চিত্র দেখিতে পায়

ও একটি ঐক্য লক্ষ্য করে। এই চিত্রগুলির একটি হইল জনসাধারণের সমাজ জীবন। ইহাতে সহজেই বলা যায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তিন ধরনের সামাজিক জীবন বিদ্যমান ঃ বেদুইন, গ্রাম ও শহর।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত জনসাধারণের শতকরা বোধ হয় পাঁচ ভাগেরও কম বেদুইন। লেবাননে প্রায় নাই। অপরদিকে সৌদি আরবে তাহাদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ভাগ। বেদুইনদের প্রধান সমস্যা হইল ঘাস এবং পানি সংগ্রহ করা। কিন্তু তাহা নির্ভর করে স্থানীয় এলাকার সুযোগ-সুবিধার উপর। তাহাদের প্রধান পেশা হইল মেষ, ছাগল ও উট চরানো। ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও আরব উপদ্বীপের যেইসব বেদুইন সমতল ভূমিতে পানির সন্ধান করে তাহাদিগকে বলা হয় 'চক্রবালীয়' (Horizontal)। পক্ষান্তরে পাহাড়ী, ইরান ও তুরস্কের যেইসব বেদুইন গ্রীষ্মকালে ঘাসের সন্ধানে পাহাড়ের উপর বাস করে তাহাদিগকে 'শীর্ষবিন্দু স্থানীয়' (Vertical) বলা হয়। কিন্তু উভয়ের সামাজিক জীবন একই প্রকৃতির এবং তাহারা একজন বংশগত নেতা কর্তৃক শাসিত হয়। এই নেতা আরবদের মধ্যে 'শেখ' এবং পারস্যবাসী ও তুর্কিদের মধ্যে 'খান' নামে পরিচিত। বেদুইনগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী। তাহারা যেইসব দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে না সেইগুলির জন্য শহরবাসীদের নিকট মেষ, দুধ, পনির, মাখন ও উল বিক্রয় করে। তাহারা সকলেই তাঁবুর মধ্যে বাস করে এবং মুহূর্তের আদেশে নিজেদের স্বল্প মালামাল লইয়া যাত্রা করিতে পারে। তাহাদের আনুগত্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে গোত্রের প্রতিই বেশি। আধুনিক আয়কর, পার্লামেন্ট, সামরিক কাজ বা জাতীয় সীমান্ত তাহারা বুঝে না বা বুঝিলেও গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। পূর্বে গোত্রগুলিকে রাজ্যের মেরুদণ্ড মনে করা হইত। স্ব স্ব এলাকায় তাহারা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত এবং বিনিময়ে রাজা বা খলিফাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য প্রদান করিত। তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ শাসকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত। বর্তমান জাতীয় বাজেটে, জাতীয় সেনাবাহিনী ও জাতীয় শিক্ষার যুগে অবশ্য তাহারা এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাহাদের বেদুইন জীবন যাত্রা একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। ক্ষেত-খামার ইহাদের প্রধান অর্থনৈতিক আধার। সেই সঙ্গে আছে শিল্পবিদ্যা। সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম মূলত একত্রে নির্মিত কতকগুলি ঘর বিশেষ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই এই সমস্ত ঘর রৌদ্রে পোড়ান ইট দ্বারা নির্মিত। উত্তর সিরিয়া ও আরবের কিছু অংশ ব্যতীত সমগ্র এলাকায় গ্রাম্য বাড়িগুলি প্রায়ই একতলা বা দ্বিতল। উত্তর সিরিয়া ও আরবের কিছু অংশের বাড়িগুলি এলোমেলো ঘনক্ষেত্র বিশেষ, পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলি পাহাড়ের পার্শ্বদেশ সন্নিবিষ্ট। এইসব গ্রামের অধিকাংশই প্রধান সড়ক হইতে দূরে বলিয়া এইগুলি প্রায় চোখে পড়ে না। অধিকাংশ কৃষকদের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রায় গত কয়েক হাজার বৎসরেও কোনো পরিবর্তন হয় নাই। তবে কেহ কেহ মোটামুটি উন্নততর পদ্ধতি ব্যবহার করে আবার অনেকেই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির ব্যাপারে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, রোগ এবং জমিদারী প্রথার ফলে এতদঞ্চলের চাষীদের মধ্যে আর্থিক প্রাচুর্য মোটেই থাকে না। গুটিকয়েক ছাড়া অধিকাংশ চাষী দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

গ্রামবাসীদের পোশাক খুবই সাধারণ। তাহা মিসরীয়দের 'রাত্রিকালীন পোষাক' হইতে পারস্যবাসীদের লম্বা কোর্তা ও পায়জামায় সীমাবদ্ধ। রুটির সঙ্গে কিছু তরকারি তাহাদের

নিত্যদিনের আহার্য। গ্রাম্য মহিলাগণ তাহাদের শহুরে বোনদের ন্যায় নিভৃতে বাস করে না, আবার গোত্রীয় মহিলাদের ন্যায় স্বাধীনতাও ভোগ করে না। গোত্রীয় লোকজন গর্বিত ও অস্থির কিন্তু গ্রামের লোকজন নম্র ও তৃপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সকল আধুনিক রাষ্ট্র চাষীদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার উদ্বোধন করিয়াছে। এই পরিকল্পনায় জমি বন্টন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা বিস্তার ও সমবায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আছে। ইরানে একটি অত্যাধুনিক কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া হাজার হাজার যুবককে 'শিক্ষা বাহিনী' বা 'স্বাস্থ্য বাহিনী' বা এই ধরণের কোনো বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়। তাহারা বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের পরিবর্তে দুই বৎসর সমগ্র দেশের গ্রামগুলিতে কাজ করে।

সুশৃঙ্খল ও আধুনিক জীবনযাত্রা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বদাই বিরাজমান ছিল। এই দিক দিয়া দামেস্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন নগর হিসাবে গর্ববোধ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বাগদাদ, বৈরুত, কায়রো, ইস্পাহান, ইস্তাম্বুল, জেরুজালেম ও মক্কা যে কোনো মাপকাঠিতে প্রাচীন নগর। মধ্যপ্রাচ্যের শহর ও নগরগুলিকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা দুরূহ ব্যাপার, তবে শুধু এইটুকু বলা যায় যে এইগুলি পরস্পর বিরোধী। এইখানে আধুনিক ইমারতের পার্শ্বেই রহিয়াছে হাজার বৎসরের পুরাতন রৌদ্রে ঝলসানো ইটের তৈয়ারি মসজিদ বা বাড়ি। দেশের সবচাইতে ধনী ব্যক্তি যেমন শহরে বাস করে তেমনি সব চাইতে দরিদ্র ব্যক্তিও শহরে বাস করে। রাস্তায় উচ্চশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া চলিতেছে নিরক্ষর লোকজন। বহু মহিলা প্যারিসের অত্যাধুনিক পোশাক পরিধান করে এবং নৃত্য করে অতি সাম্প্রতিককালের। অপরদিকে তাহাদের পার্শ্বেই তাহাদের ভগ্নীগণ প্রাচীন যুগের নিভৃত জীবন যাপন করে।

মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ নগর সরকাররূপে বিদ্যমান এবং আজ পর্যন্তও তাহারা শহরের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মধ্যপ্রাচ্যের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণী শহরে বাস করে। এই শহরেই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং সরকার গঠন ও ভাঙিবার জন্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আবার কৃষকদিগকেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানার কাজে লাগাইবার জন্য ব্যাপকভাবে শহরে আকর্ষণ করা হয়। ফলে শহরের বস্তিগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের শহরবাসীরা অতীতের প্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রা এবং ভবিষ্যতের অপূর্ণ আশার মধ্যে দোদুল্যমান। এখন তাহারা প্রশান্ত গ্রামবাসী, যাহারা অন্য কোনো জায়গায় যাইতে অনিচ্ছুক। সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত ইউরোপীয়ানের মত অনুভব করে যে তাহারা ইতিমধ্যে আসিয়াছে। এই ধারণার ভিতর তাহারা দ্বন্দ্বমান। সমগ্র দেশের বোঝা যেন তাহাদের স্কন্ধে। অথচ তাহারা এত চতুর ও সুযোগ সন্ধানী যে দেশীয় লোকদের বিশৃঙ্খলার সুযোগ তাহারা পুরাপুরি গ্রহণ করে।

গ্রামে এবং শহরের জীবনে পরিবারগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এইসব পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। শহুরে জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও এই রীতি ভঙ্গ করে নাই। পরিবারকে বাদ দিয়া মধ্যপ্রাচ্যবাসীর জীবনে কোনো মূল্য নাই। আত্মীয়তার বন্ধন আর্থিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপার। কোনো লোক গ্রাম বা বেদুইন গোত্র ত্যাগ করিলেও সে পরিবারের পরিচয় বহন করিয়া চলে।

মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামোর সবচাইতে ছোট অঙ্গ হইল পরিবার। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা একটি বর্ধিত পরিবার গোষ্ঠী, যাহার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের প্রধান এবং সমস্ত

ব্যাপারে সে পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রায়ই পারিবারিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষত শহরে ক্ষুদ্র পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে ব্যাপক। পরিবারকে সম্প্রসারণ করা হইবে নাকি ক্ষুদ্র অবস্থায় রাখা হইবে তাহা নির্ভর করে অর্থনৈতিক উৎপাদন, শক্তি, জমি বন্টন শর্তের প্রকৃতি এবং নাগরিকীকরণের উপর। পরিবার তাহার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নিরাপত্তা বিধান করে সত্য কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরিবারের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে পরিবারের মধ্যে ও বৃহদাকার শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের জটিলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বেদুইনদের মধ্যে নারী-পুরুষ সাধারণত আলাদা এবং স্ত্রীলোকগণ সরাসরি পুরুষের অধীন। মহিলাদের মর্যাদার নামে উহাদের মুখাবয়ব ঢাকা পর্দা মুসলিম রক্ষণশীলতার প্রধান নিদর্শন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক স্থানে পর্দা উঠিয়া গেলেও মহিলাদের পরিবর্তনশীল মর্যাদার ব্যাপারে অনেক বাধা-বিপত্তি রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য এখনও একটি পুরুষ-প্রধান অঞ্চল।

মধ্যপ্রাচ্যে শ্রেণী সচেতনতার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। শহরে ও গ্রামে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়। এইগুলি হইল উচ্চ শিক্ষিত (এলিট) শ্রেণী, ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র শ্রেণী। বেদুইনদের মধ্যে বংশানুক্রমিক অভিজাত শ্রেণী ছাড়া এই স্তরবিন্যাস তুলনামূলকভাবে কম। বক্তৃতার অভ্যাস, চলাফেরা ও প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য দিক সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করে। কোনো সমাজে কিছুক্ষণ কাটাইলেই সেই সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সহজেই আঁচ করা যায়। সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের কয়েকটি মাপকাঠি হইল পরিবারের প্রতি আনুগত্য, পরিবারের আকার, বয়স, জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্মশিক্ষা ও শিল্পকলার জ্ঞান।

অনেক শতাব্দী হইতে উচ্চ শিক্ষিত শাসক শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান। সামাজিকভাবে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না এবং আদর্শগতভাবে তাহাদের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। জমিদার ও কৃষক সকলের শয্যা, খাদ্য, পরিধেয় একই ধরনের ছিল। তাহারা উভয়ে ছিল আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী মুসলমান, ইসলামি নিয়মপ্রণালীতে বিশ্বাসী এবং ভালো-মন্দ সম্পর্কে একই ধারণা পোষণকারী। তবুও তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। জমিদার শ্রেণীর খাদ্য ছিল অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং পোশাক ও বিছানাপত্র ছিল উন্নতমানের। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচ এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। ইহা শুধু আর্থিক বৈষম্যই বৃদ্ধি করে নাই বরং ইহা অন্যান্য বৈষম্যও সৃষ্টি করিয়াছে। এখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার ধনী প্রভুর সম্মুখে তেমন নিঃসঙ্কোচ বোধ করে না যেইরূপ তাহার পিতা কোনো এক সময় বোধ করিত। একজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিজাত শাসক নিজের সম্পদের কল্যাণে দেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। সে তাহার পিতার ন্যায় একই ধরনের ঘরে বাস করে না, মেঝেতে সে ঘুমায় না, বসেও না বা একই ধরনের আহার গ্রহণ করে না। সে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের আরাম-আয়াস উপভোগ করে। অথচ গ্রামবাসীর জীবনে অতি অল্প পরিবর্তনই আসিয়াছে। নব্য অভিজাতবর্গ প্রায়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না এবং পূর্বের নীতিও মানিয়া চলে না। এমন কি তাহারা কথা-বার্তার সময় পাশ্চাত্য শব্দ এত ব্যবহার করে যে অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের পক্ষে ঐ ভাষা বোঝাও দুরূহ হইয়া পড়ে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামো বিরাট পরিবর্তনের মুখে- ভূমি সংস্কার অনেক হইয়াছে, আরও হইবে। এমন কি যেখানে ভূমি সংস্কার অল্প হইয়াছে, সেখানেও শক্তিমান জমিদারেরা ক্ষমতা ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে। যথেষ্ট শিক্ষা থাকিলে যে কোন লোক নিজ সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে। কিছু পরিমাণ ধন-সম্পদ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু পর্যবেক্ষকগণের ধারণা প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের জন্য সামরিক পেশার সহিত খানিকটা শিক্ষা যোগ হইলেই ভালো হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর জনসাধারণ দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা যোগাইবে। তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অংশ আদায় করিতে সক্ষম হইবে।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের অনুভূতিও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। জাতীয়তাবাদ একটি কৌশল মাত্র। ইহা যদিও মিসরীয়দিগকে সিরীয়দের বিরুদ্ধে এবং ইরাকীদিগকে পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করে, তাহা সত্ত্বেও ইহার উপাদানগুলি সকলের নিকটই সমান।

১. এইসব উপাদানগুলির একটি হইল অতীতের গৌরব লইয়া গর্ব করা। মধ্যপ্রাচ্যবাসী, চাই সে আরবই হোক, পারস্যবাসী হোক বা তুর্কি, সে চায় সকলেই তাহার অতীত সম্পর্কে অবগত হইয়া তাহাকে প্রশংসা করুক। অতীত তাহার গর্বের অনুপ্রেরণা জোগায়। কোনো জাতির মহত্ত্ব বলিতে যদি বলপূর্বক অন্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন বুঝায়, তাহা হইলে মধ্যপ্রাচ্য এই মহত্ত্বের দাবি করিতে পারে। কোনো এক সময় মধ্যপ্রাচ্যের জাতি, যথা, মিসরীয়, ব্যাবিলনীয়, পারস্যবাসী, আসিরীয়, আরবীয় তুর্কিরাও আজিকার আণবিক শক্তির অধিকারীদের ন্যায় শক্তিশালী ছিল। নৃশংস শক্তির দ্বারা তাহারা বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বর্তমান পাশ্চাত্যের বিশাল সাম্রাজ্যগুলির চাইতেও অধিক এলাকার উপর এবং অধিক জনসংখ্যার উপর তাহাদের ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছিল। পরবর্তী পাতাগুলিতে দেখা যাইবে বড় বড় সেনাপতিদের যথা খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস, মাহমুদ গজনী, ওসমানীয়দের কয়েকজন সুলতান- চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ্গ, নাদির শাহ এবং আরও অনেকের মধ্যে যে কোনো একজনের অসম সাহসিকতা, সামরিক ও রাজকীয় কার্যকৌশল, ইউরোপের সমকক্ষ অতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিদেরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। রোমান সাম্রাজ্য কর্তৃক জারিকৃত 'প্যাক্স রোমানা (Pax Romana) এশিয়ার চেঙ্গিস খানের বংশধরগণ কর্তৃক স্থাপিত 'শান্তির' নিকট ছিল খুবই নগণ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলো পশ্চিম রাশিয়া বা ভূমধ্যসাগর হইতে সমগ্র এশিয়ার উত্তর ও মধ্যভাগ দিয়া কুবলাই খানের রাজধানী পিকিং পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সড়কে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করে, শুধু নৃশংস শক্তি দ্বারা মহত্ত্ব বিচার করা যায় না বরং বুদ্ধিমত্তার গুণাগুণের দ্বারা বিচার করা যায়- যাহা সভ্যতার উন্নতিতে স্থায়ী অবদান রাখে। এই ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা গর্ব করিতে পারে। একজন পাশ্চাত্যবাসীর জীবনে বাধাধরা দিনগুলি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অবদানে সুষমামণ্ডিত। তাহার বৎসর সূচিত হয় একজন ফিলিস্তিনবাসীর জন্মের দ্বারা। তাহার মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা নির্ধারিত হয়, মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা আরম্ভকৃত এবং পারস্যবাসীদের দ্বারা পূর্ণাঙ্গকৃত গণনা করিবার কৌশল ও পঞ্জিকা দ্বারা। তুর্কিগণ কর্তৃক ইউরোপে প্রচলিত 'গোছলখানায়' সে গোছল করে এবং 'টার্কিশ' তোয়ালে দ্বারা নিজেকে বিশুষ্ক করে।

প্রাতঃরাশে সে কফি 'কাওয়া' (আরবি) পান করিতে পারে। সে যে চাকার উপর গাড়ি চালাইয়া অফিসে যায় তাহা মধ্যপ্রাচ্যে কেউ আবিষ্কার করিয়াছে। দিনে সে যেইসব বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়িক শব্দ ব্যবহার করিতে পারে যথা এলজেব্রা 'আল-জাবর (আরবি), এলকহল 'আল কহল' (আরবি) অথবা ট্যারিফ ' তারিফা' (আরবি) তা আরবি থেকে উদ্ভুত, তাহার ধর্মগ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'বিব্লস' (Biblos) হইতে যাহা লেবাননের একটি শহরের নাম, যেখানে সর্বপ্রথম বই লিখার চিন্তা উদিত হয়। তাহার পোস্ট অফিস পারস্যবাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সম্পর্কে হেরডটাস উল্লেখ করিয়াছেন; সে কাগজ দ্বারা লেখে যাহা মুসলমানগণ পাশ্চাত্যে আনয়ন করিয়াছেন; সে 'আরবি গণিত শাস্ত্র' ব্যবহার করে যাহা ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং আরবগণ ইউরোপে রফতানি করিয়াছে।

বাড়িতে সে আরাম কেদারায়, 'দিভান' (ফার্সি) বা সোফায় 'সফুফা' (আরবি) বিশ্রাম করিতে পারে এবং ম্যাগাজিন বা 'মাখজান' (আরবি) পড়িতে পারে। সে পাজামা 'পা-জামা' (ফার্সি) পরিধান করে এবং তোষকে 'মাটরাহ' (আরবি) শুইয়া থাকে। বস্তুত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকবর্গ মধ্যযুগের মুসলমানদের নিকট রেনেসাঁর ঋণের কথা অধিক স্বীকার করেন, কারণ মুসলমানরা গ্রীক ও রোমান শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং ইউরোপের নিকট প্রেরণ করিয়াছে।

রেনেসাঁর অনেক পূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জাতের মুসলমানগণ ল্যাটিন, গ্রীক, সিরিয়াক, ফার্সি, সংস্কৃত, চীনা এবং অন্য যে কোনো ভাষায় যে কোনো বিষয়ের গ্রন্থ যেখানেই পাইয়াছে সংগ্রহ করিয়াছে এবং বাগদাদে আনিয়াছে। খলিফা মামুন খ্রিষ্টান হুনাইন ইবনে ইসহাকের (৮০৯-৮৭৩) নেতৃত্বে একটি 'অনুবাদ সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংস্থা প্রায়ই গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবিতে অনুবাদ করেন। ইউরোপে ল্যাটিনকে যেরূপ পবিত্র ভাষা জ্ঞান করা হইত, মধ্যপ্রাচ্যে আরবিকেও অনুরূপ পবিত্র ভাষা জ্ঞান করা হইত।

পরবর্তী মুসলমানগণ এইগুলি পাঠ করে ও আয়ত্ত করে এবং এভিরোসের (ইবনে রোশ্‌দ) ন্যায় দার্শনিক সৃষ্টি করে, যাঁহার নিকট সেন্ট থমাস একুইনাস (St, Thomas Aquinas) ঋণী ছিলেন; ওমর খৈয়ামের ন্যায় গণিতশাস্ত্রবিদ সৃষ্টি করেন, যিনি জালালী পঞ্জিকা উদ্ভাবন করেন। ইহা এখনও ইরানে ব্যবহৃত হয়। এই পঞ্জিকা সমকালীন পাশ্চাত্যের ব্যবহৃত গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার চাইতেও নির্ভুল। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানগণ বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তৈয়ার করিয়াছে। তন্মধ্যে রহিয়াছেন রাযী ও অবিসিনা। ইহাদের প্রণীত গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে একমাত্র উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরিগণিত ছিল। তাঁহাদের 'আবক্ষ ছবি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্র বিভাগের হলগুলিতে শোভাবর্ধন করে।' পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বর্ণনা করা হইবে। সভ্যতার উপর তাঁহাদের অবদান প্রশ্নাতীত।

আবার এরূপ অনেকে আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন সত্যিকারের মহত্ত্ব রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতার উপর, যাহা মানবীয় ও গঠনমূলক। এই ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের যথেষ্ট অবদান আছে। বিশ্বের তিনটি বিখ্যাত একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্য। ইহুদি ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসার (আঃ) জন্মভূমি মিসর, খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইন এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের (সঃ) জন্মভূমি আরব। এইসব ধর্মের প্রত্যেকটি আবার ইরানে প্রতিষ্ঠিত স্বল্প পরিচিত জরথুস্ত্র ধর্মের নিকট ঋণী। মধ্যপ্রাচ্যের এইসব ধর্মের নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা অতি প্রিয় নীতিমালা ও জীবনের দিকদর্শন

এবং আল্লাহ, মানুষ, ইহকাল ও পরকালের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে ঋণী।

২. বাস্তবিকপক্ষে অতীতের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক অবদানের স্মৃতি একজন মধ্যপ্রাচ্যবাসীর অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত যে, সে বর্তমান বা ভবিষ্যতের চিন্তা ছাড়িয়া অতীতে বাস করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। অপরদিকে বর্তমানের কথা তাহার চিন্তায় আসিলেও সে অশ্রদ্ধা ও আত্মদৈন্যের শিকারে পতিত হয়। এই হীনমন্যতা তাহার বর্তমান জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় উপাদান। সে শুধু পাশ্চাত্যের শিল্পকলার উপর নির্ভরশীল নহে, সে প্রকাশ্যে (একজন তুর্কির ক্ষেত্রে) বা গোপনে (একজন আরব বা পারস্যবাসীর ক্ষেত্রে) একজন ইউরোপবাসীর মতো হইবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। সে পাশ্চাত্য ধরনের কাপড়-চোপড় পরিধান করে, পাশ্চাত্য ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত উপভোগ করে, পাশ্চাত্য আইনের অধীনে বাস করে, পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পছন্দ করে।

মধ্যপ্রাচ্যবাসিগণ যখনই একত্র হয় তাহারা পাশ্চাত্যবাসীদের সমকক্ষ হইবার সুদীর্ঘ পথের কথা এবং তাহাদের সমাজের ধীরগতির কথা আলোচনা করে। কোনো পাশ্চাত্যবাসীর মুখোমুখি হইলেই তাহাদের গর্বে হস্তক্ষেপ হয়; তাহারা আত্মরক্ষাকারী এবং কোনো কোনো সময় যুদ্ধংদেহী হইয়া উঠে। একদিকে তাহারা অনুভব করে বাঁচিবার জন্য তাহাদিগকে পাশ্চাত্য হইতে মূল্যবোধের ধার করিতে হয় এবং অপরদিকে এই কাজের জন্য তাহারা অনুতাপ করে। তবুও ইসলামি মধ্যপ্রাচ্যে ধার করিবার ব্যাপারে আত্মগ্লানি অনুভব করিবার কোনো নজীর নেই। আরবের মরুভূমিতে ইসলামের আবির্ভাবের সময় ইহা একটি নূতন তেজস্বী ধর্ম ছিল। ইহার কোনো ঐতিহ্য ছিল না এবং একটি আদিম সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্য হইতে ইহা উদিত হয়। মোটামুটিভাবে ইহা অতৃপ্ত আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধনে এবং পরিধি বিস্তৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ উপভোগ করে। ইসলাম হেলেনীয় চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়াছে, পারস্য ছাঁচের শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে এবং যে কোন সংস্কৃতি হইতে প্রচুর পরিমাণে ধার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই প্রশ্ন জাগে বর্তমানে ধার করিতে এই দ্বিধা কেন?

ইহার একটি কারণ হইল, অনেকগুলি এলাকায় ইসলাম খ্রিষ্টান ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হইয়া একটি ধর্মীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বর্তমানে খ্রিষ্টান নামের সভ্যতা হইতে শিক্ষা গ্রহণের দ্বিধাবোধ। বোধ হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল- যেইসব দেশ ও সংস্কৃতি হইতে ইসলাম ধার করিয়াছে সেইগুলি হয়ত ধ্বংসের মুখোমুখি ছিল বা সবেমাত্র পরাস্ত হইয়াছিল। ফলে বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির মতোই তাহার ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছিল। অবস্থা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্যের সঙ্গে বর্তমান মুসলমানগণ নিজের অবস্থা সম্পর্কে আস্থাশীল নহে। এখন যে কোনো ধার, শক্তির চাইতে দুর্বলতারই পরিচায়ক। অধিকন্তু, ইসলামের নেতৃবৃন্দ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের স্বধর্মিগণ যে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করিতেছে তাহা স্বীয় ঐতিহ্যকে সুশোভিত করিবার জন্য নহে বরং পাশ্চাত্যের উন্নততর চিন্তাধারাকে উহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য।

৩। আধুনিক জাতীয়তাবাদের তৃতীয় উপাদান হইল ধর্মনিরপেক্ষতা। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান, যদিও ইহা কোনো কোনো দেশে তুলনামূলকভাবে উন্নততর। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্রিষ্টান ধর্মের ন্যায় ইসলামও এখন একই বিবাদে লিপ্ত। খ্রিষ্টান ধর্মের ন্যায় ইসলামকেও কোনো না কোনোভাবে

আধুনিক বিজ্ঞান, ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানকে প্রতিঘাত করিতে হইতেছে। অন্ততঃ পক্ষে দুই প্রকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 'সিভিলাইজেশন অন ট্রায়াল' (Civilization on Trial) গ্রন্থে আরনল্ড টয়েনবি বলেন, "যখনই কোনো সভ্যসমাজ এই ধরনের ভয়াবহ অবস্থা বা অন্য কোনো প্রকারের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন উহার মোকাবেলার জন্য দুইটি পথ খোলা থাকে।" একটি হইল উগ্র গোঁড়ামিবাদ (Zealotism) যাহা "অপরিজ্ঞাত হইতে সুপরিচিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।" এবং উন্নতমানের কৌশল ও নূতন অস্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ 'ইহার পুরাতন যুদ্ধ প্রকৃতির অনুশীলন দ্বারা প্রতিঘাত করে।' অপরপথকে তিনি বীরত্ববাদ (Herodeanism) নামে অভিহিত করিয়াছেন, যাহার 'আদর্শ জ্ঞাত বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা হইল ইহার গোপনীয়তাকে আয়ত্ত করা' এবং উন্নতমানের কৌশল ও নূতন অস্ত্রের বিরুদ্ধে 'পুরাতন যুদ্ধকৌশল পরিত্যাগ করত শত্রুর নিজস্ব যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্র আয়ত্ত করিয়া শত্রুকে প্রতিঘাত করা।'

মধ্যপ্রাচ্যে অধিকাংশ 'গোঁড়ামিবাদীদেরকে' পরিচালনা করেন ধর্মীয় নেতাগণ-যাহারা পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা ভাবধারার আক্রমণে শঙ্কিত। তাঁহারা খাঁটি ইসলামে ফিরিয়া যাইতে চান 'যখন ইহা ছিল পবিত্র এবং বিদেশী ভাবধারা হইতে কলুষমুক্ত।' নির্দিষ্টভাবে তাঁহারা প্রথম চারি খলিফার যুগ বুঝাইতে চান, যখন পবিত্র কোরআনই ছিল একমাত্র পথ-নির্দেশ গ্রন্থ এবং সুন্নাহ্ ছিল একমাত্র আইন। এই দলের কোনো কোনো 'প্রগতিশীল' ব্যক্তি ধারের গুরুত্ব কমাইবার জন্য দাবি করিয়া থাকেন যে ইলেকট্রিক এবং টেলিফোন হইতে জেট বিমান ও মহাশূন্যে রকেট নিক্ষেপণের এইসব বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করে।

অপরদিকে 'বীরত্ববাদীদের' প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপ। উহাদের নেতৃত্ব দেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল যুবশ্রেণী যাহারা মুক্তির পথ নির্দেশ করেন সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণের মধ্যে। এই সমস্ত আধুনিকপন্থীগণ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল রাজনীতিবিদ গণতন্ত্রের পশ্চিম ইউরোপীয় নীতিতে বিশ্বাসী। তাহারা জ্ঞানের (Enlightenment) আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ঐসব শক্তিতে বিশ্বাসী যাহা একদিন আমেরিকা ও ফরাসি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। আধুনিক পন্থীদের দ্বিতীয় দল এমন গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী যাহা সোভিয়েত ইউনিয়নে* ও আধুনিক চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা 'কলুষমুক্ত' ও সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহারা কার্ল মার্ক্স -এর যুক্তির দ্বারা এবং কমিউনিস্ট শক্তির উল্কাবৎ উত্থানের দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিকপন্থিদের তৃতীয় দল পশ্চিমকে কমিউনিস্ট বিশ্বের উপর প্রাধান্য অর্পণ করিয়া নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলিয়া থাকেন এবং গণতন্ত্রের সহিত সামাজিক সংস্কারের সংযোগ করিতে চেষ্টা করেন, আবার একই সঙ্গে কমিউনিস্ট বিশ্বের একদলীয় গণতন্ত্রে আকৃষ্ট হন। কমিউনিস্টদের ধর্মবিরোধিগণ ছাড়া অধিকাংশ আধুনিকপন্থিগণ ধর্মনিরপেক্ষ, যাহারা একদিকে যেমন ধর্মের বিরোধিতা করেন না অপরদিকে তেমনি বর্তমান সমস্যার সমাধানে ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের কোনো ভূমিকা দেখিতে পান না।

আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইবার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর খ্রিষ্টান ধর্মের ন্যায় ইসলামও একই অন্তর্বিরোধে লিপ্ত। ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ ও ধার্মিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য

---

* *বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন খণ্ডবিখণ্ড হইয়া বাজার অর্থনীতি চালু করিবার ফলে এই আদর্শ এখন দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিমজ্জিত। - অনুবাদক।*

করে না এবং সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ইহার আইন-কানুন ধর্মগতভাবে বিংশ শতাব্দীতেও অবশ্য পালনীয়। তাই সমন্বয় সাধনের সমস্যা আরও জটিল। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে ছাত্রদেরকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতি ও ধর্ম চর্চার একত্রীকরণে ইসলাম সর্বদা আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। যদিও অনুরূপ যোগসূত্র কায়েম করিবার ব্যাপারে খ্রীষ্টধর্ম সাধারণত বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

৪। জাতীয়তাবাদের চতুর্থ উপাদান হইল সন্দেহপ্রবণতা। একজন আধুনিক জাতীয়তাবাদী, সে আরব হউক, পারস্যবাসী হউক বা তুর্কি হউক ইউরোপের প্রতি সন্দেহপরায়ণ না হওয়াটা যেন তাহার জন্য লজ্জার ব্যাপার। এমন ক্ষেত্রে তাহার বন্ধুমহল তাহাকে বড় জোর 'সহজে প্রতারিত ব্যক্তি' হিসাবে চিহ্নিত করে, নতুবা কম করিয়া হইলেও তাহাকে 'কমিউনিস্ট' অথবা 'সাম্রাজ্যবাদী' বলিয়া আখ্যায়িত করে। মধ্যপ্রাচ্যকে একটি 'শিবিরাগ্নির' সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোনো এক সময় ছিল, যখন ইহার শিখা অতি উচ্চে উঠিয়া চতুষ্পার্শ্বের এলাকাগুলিকে আলোকিত করিয়াছে। ইহার আলো ও উত্তাপ অনেক লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই সমাজে অনেক কিছু শিক্ষা হইয়াছে এবং অনেক কিছুর অংশ দেওয়া-নেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের পরবর্তী পাতাগুলিতে দেখা গিয়াছে যে লোকজন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সময়ের ছাই তাহাদের বিশাল আগুনকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা এখন আবার জাগরিত হইয়াছে এবং ছাইগুলিকে সরাইয়া ফেলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের সাহায্যে একটি নূতন আগুন জ্বালাইতে চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় তাহারা দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথম সমস্যা হইল-যতবার বিশেষত গত দেড় শতাব্দীতে, তাহারা উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে, বাহিরের হস্তক্ষেপের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তি হইল বৃটিশ, রুশ, ফরাসি, জার্মান ও আমেরিকা। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদীগণ এই বিশ্বাসে পৌঁছিয়াছে যে পাশ্চাত্য দেশগুলো কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে কেহই তাহাদের জাগরণ পছন্দ করে না। উটের অনুপস্থিতি বা আধুনিক বাজার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের পর্যটকদের সাধারণ মন্তব্যকে সাদামাটা মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ না করিয়া বলা হইতেছে যে, ইহা আদতে উন্নতি ব্যাহত করার শুরুক্ষণ প্রচেষ্টাই বটে। বিদেশীদের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা সম্পর্কিত ধারণা যাহা কখনও বাস্তবভিত্তিক, আবার কখনও কাল্পনিক-মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হইয়াছে।

৫। নূতন আগুন প্রজ্বলিত করিবার প্রচেষ্টায় বাধাদানকারী দ্বিতীয় সমস্যা অভিরুচি। ইহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, যাহা জাতীয়তাবাদের পঞ্চম উপাদান। একটি প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যবাসীর পক্ষে কোন্‌টা রাখা দরকার এবং কোনটা ছাটাই করা দরকার তাহাই বড় সমস্যা। জাতি হিসাবে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারা পরিবর্তন আশা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সমস্যা হইল কোন্‌টা গ্রহণ করিবে এবং কোন্‌টা প্রত্যাখ্যান করিবে। এই সিদ্ধান্তগুলি সহজ নহে বলিয়া মাতা, কন্যা, পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ সঙ্গীতের বিষয় ধরা যাক। অনেকেই পাশ্চাত্য সঙ্গীত ঘৃণা করে। যাহারা পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে ভালোবাসে এবং যাহারা জাজ (Jazz) সঙ্গীত ভালবাসে-এই দুই দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধের মধ্যে আবার যে দল উভয়ের সংমিশ্রণ কামনা করে তাহাদের কথা ভুলিলে চলিবে না। এই বিশৃঙ্খলা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিনব, যাহা গদ্যে, পোশাকে, শিক্ষায়, রাজনীতিতে এমন কি ধর্মে পর্যন্ত প্রতিফলিত।

ইসলাম

ইসলামই হচ্ছে সেই সার্বজনীন ও জীবন্ত আদর্শ যা মধ্যপ্রাচ্য নামের জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষটিকে একত্রিত করে। ইসলামে অনেক শ্রেণী ও মতাদর্শ রহিয়াছে। এইগুলি ৭২ ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। তবুও এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এখনও সুদৃঢ় ঐক্য রহিয়াছে। অনেক লেখক বলিয়া থাকেন যে, 'ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নহে ইহা একটি জীবনাদর্শও বটে।' অবশ্য এক দিক হইতে প্রত্যেক ধর্মই একটি জীবনাদর্শ। এই বক্তব্য দ্বারা তাঁহারা বুঝাইয়া থাকেন যে, ইসলাম জীবনের সকল কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব ইহা শুধু আধ্যাত্মিক পথনির্দেশই করে না। বরং কতকগুলি নিয়ম প্রণালী, আইন-কানুন ও সাধারণ পরিবেশও সৃষ্টি করে, যাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। ব্যক্তি- বিশেষের এখতিয়ার অতি অল্পই কার্যকর। ইসলাম তাহাকে বলিয়া দেয় কতবার, কখন এবং কিভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে ও কোন দিকে মুখ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে; বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইহার আইন-কানুন রহিয়াছে। যুদ্ধবিদ্যা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইহার বিধি নিষেধ সুস্পষ্ট। এইগুলি সমস্ত ইসলামি দেশগুলোতে প্রায় সমান। প্রায় ১৩০০ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত মুসলমানগণ অন্যদের সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, পুস্তক রচনা করিয়াছে। বিদ্রোহ সংঘটিত করিয়াছে এবং বিভিন্ন সৌধ নির্মাণ করিয়াছে। সমস্তগুলো ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে-হয়ত ইহার জন্য বা বিরুদ্ধে বা ইহার উদ্যোগে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বুঝা যায় না। অতএব এই গ্রন্থ ইসলাম হইতে শুরু হইবে।

আরম্ভ করিবার পূর্বে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আলোচ্য সভ্যতা প্রধানত আরব বিজয়ের দ্বারা আরম্ভ হয়, অতএব কখনও কখনও ইহাকে 'আরব সভ্যতা' নামে অভিহিত করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যেইগুলো 'আরব' নামে পরিচিত তাহারা নিজেদেরকে সেই সংস্কৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বসভ্যতায় 'আরব' অবদানের ব্যাপারে গর্ববোধ করে। ইহা যেমন গোলমেলে প্রকৃতির তেমনি ইহা অসত্য। প্রথমে আরব বেদুইনগণ যখন সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মিসর ও ইরান জয় করেন তখন তাহারা অনারব দেশগুলো জয় করেন। এই প্রক্রিয়ায় এই সমস্ত মরুসন্তানগণ তাহাদের সঙ্গে শুধু ইসলামই আনয়ন করেন নাই, বরং আরবি ভাষাও আনিয়াছিলেন, যাহাকে তাহারা 'ফেরেশতাদের ভাষা' বলিয়া বিশ্বাস করেন। অধিকন্তু এই ভাষা বিজিত জাতিগুলোর উপর এমনভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিসের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ফলে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জাতীয় উৎপত্তি বিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিদ্যার্থিগণ আরবিতে বিদ্যাচর্চা করেন। এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশই ছিল অনারব। প্রকৃতপক্ষে, অনেকেই আরবদের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। ইহাদের ভিতর উত্তর আফ্রিকার পণ্ডিত ইবনে খালদুনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে কোনো কোনো জাতি, যাহারা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক বিজিত হয়, যথা সিরীয়, মিসরীয় ও উত্তর আফ্রিকানরা আরবিকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। তবে অন্যরা যথা পারস্যবাসী, তুর্কি ও ভারতীয়গণ, আরবিকে মুখের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে নাই। তাহারা পরে নিজেদের রচনায় আরবি ভাষা পরিত্যাগ করে, যেরূপ ইউরোপীয়গণ ল্যাটিন ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছে।

বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে আরব জাতয়িতাবাদের উদ্ভব পর্যন্ত 'আরব' বলিতে শুধু মূল আরব উপদ্বীপের লোকদিগকে বুঝাইত এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিছু সংখ্যক নেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত 'আরবি যে বলে সে-ই আরব' এই মত মিসরিয়গণ প্রথমে গ্রহণ করে নাই। এই প্যান-আরবীয় নীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্যন্ত অনেক অনুসারীকেই প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

সমস্ত আরবিভাষী লোকদিগকে একটি আরব জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করিবার ইচ্ছাটি বোধগম্য এবং সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতও বটে। যদিও আরবি ভাষী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেকে ইহার বিরোধীও রহিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে যাহারা আরবিতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের সবাইকে 'আরব' বলিবার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কিছুসংখ্যক পণ্ডিত বর্তমানে আকাঙ্ক্ষিত 'আরব' শব্দটিকে যাহারা মধ্যযুগে আরবি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের নির্দিষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে মরুভূমির প্রাথমিক বিজয়ীদেরকে 'আরবীয়' (Arabian) রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়াছে। ইহা শুধু একতরফাই নহে, বরং ইহার ফলস্বরূপ এমন উদ্ভট দাবিও উত্থিত হইতেছে যে, পারস্য উপসাগরকে 'আরব উপসাগর' নামে অভিহিত করা উচিত।

ইসলামের বিজয়ের পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে এত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যে, এই সমস্ত সমস্যা অন্যান্য লোকদিগকেও প্রভাবিত করিতেছে। বর্তমানে সোভিয়েত উজবেকিস্তানের লোকজন একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আবিসিনাকে উজবেক বলিয়া দাবি করে। কারণ তিনি বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন যাহা বর্তমানে উজবেকিস্তানের সীমানায় পড়িয়াছে। পারস্যবাসীরা তাহাকে একান্ত নিজস্ব বলিয়া দাবি করে, কারণ তাহার মাতৃভাষা ছিল ফার্সি এবং তিনি ইরানে বাস করেন ও পরলোকগমন করেন। আরব লীগের তথ্য দফতর আবিসিনার অবদানকে বিশ্বের নিকট 'আরবদের অবদান' বলিয়া অভিহিত করে এবং তাহার একমাত্র কারণ হইল তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী আরবিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবিসিনা কাহাদের ছিলেন?

বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার জন্য আমরা আলোচ্য যুগকে আরব, পারস্যবাসী বা উজবেক বলিয়া বিবেচনা করিব না বরং ইহাকে তাহার নিজস্ব চরিত্র বলিয়া অভিহিত করিব। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বোধ হয় 'ইসলামিক' নামটিই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইসলামই এই সমগ্র এলাকার একমাত্র সাধারণ পরিচিতি। ইসলামই আরবিকে একটি পবিত্র ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে, যাহার ফলে সমস্ত মূল্যবান রচনাগুলি আরবিতে লেখা হইয়াছে। যদিও এই সভ্যতার কোনো কোনো অবদানকারী নিজেরা মুসলমান ছিলেন না; তথাপি কোনো প্রশ্নই থাকিতে পারে না যে তাঁহারা ইসলামের উদ্যোগেই তাঁহাদের কাজ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি প্রথম ইসলামি সরকার গঠন করেন। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইহা দিগ্বিজয়ের ধ্বজা ধরিয়া আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া পড়ে। এমন কি প্রাথমিক পর্যায়েও এই অভিযান উত্তর-পূর্বে ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত অতিক্রম না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকজন হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁহার আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি অজ্ঞ ছিল এবং তাহাদের নিজস্ব সমস্যাদি লইয়া ব্যস্ত ছিল।

ইউরোপ সবেমাত্র মহাশক্তিশালী রোমের পতন এবং রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের ধ্বংসের আঘাত কাটিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। বিভিন্ন গোত্র যথা ফ্রাংক (Frank), মেরোভিঙ্গিয়ান (Merovengeans), ভিসিগথ (Visigoths), অস্ট্রগথ (Ostrogoths) ও অন্যান্যরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু কেহই নিজেদের অভিলাষ অন্যদের উপর চাপাইতে সমর্থ হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণের বিরাট অংশ তখনও বর্বর থাকা সত্ত্বেও গির্জাই ছিল তাহাদের একমাত্র প্রধান প্রতিষ্ঠান যাহাকে জনসাধারণ মান্য করিত। ইহা ছিল মহান পোপ গ্রেগরীর যুগ, যিনি ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর বয়স ছিল ২০ বৎসর এবং ইহার ১৪ বৎসর পর মহামান্য পোপ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন চারিজন প্রসিদ্ধ ল্যাটিন ধর্ম যাজকদের (Latin Fathers) শেষ পুরুষ এবং মধ্যযুগীয় পোপদের প্রথম পুরুষ। তিনি মধ্যযুগের সূচনা করেন বলা যায়। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে পোপ নিযুক্ত করা হইলেও ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি খুব কর্মঠ হইয়া উঠেন। গির্জার সম্পদ তিনি দান-দাক্ষিণ্যে খরচ করেন, গরিবদিগকে খাওয়ান এবং যুদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্ত করেন; তিনি একটি বিরাট ধর্ম অভিযান পরিচালনা করেন, এবং ইউরোপের সুদূর অঞ্চলগুলিতে ধর্মাশ্রম নির্মাণে সহায়তা করেন। ইংল্যাণ্ডবাসীকে খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার মূলে তিনি ছিলেন পুরোধা। এই সন্ন্যাসীই সর্বপ্রথম পোপ, যিনি নিজেকে 'প্রভুর নফরদের নফর' বলিয়া উল্লেখ করেন। তবুও তিনি দাবি করেন, পোপ হিসাবে রোমের বিশপকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল গির্জার অধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করা উচিত। তিনি মনে করেন, একজন সম্রাটের অবর্তমানে গির্জারই উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করা উচিত। কথিত আছে যে, তিনি পার্থিব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রতি মুহূর্তের জন্য শোক প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি রাজার ক্ষমতা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করিতেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখা যাইবে এই ব্যাপারে তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গে একমত ছিলেন।

ভারতবর্ষে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় কৃতিত্বের অধিকারী গুপ্ত বংশের সোনালী যুগ শেষ হইয়াছে। এক শতাব্দীকাল হুনদের দাসত্ব ও ক্ষমতা লাভের অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পর গুপ্তবংশের হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে উত্তর ভারতে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর ১৫ বৎসর পর ৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। ঐ ৪২ বৎসর তিনি দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং

তাঁহার রাজধানী কনৌজ, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শিবের পূজার অনুসারী হইয়াও হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মহান রাজা অশোকের (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৪-২৩৬) সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন। প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ পর্যটক হুয়ান চুয়াং (Hsuan Chuang) বর্ণনা করেন, হর্ষবর্দ্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর পর একটি ভোজের পর্ব ঘোষণা করিতেন এবং ইহাতে প্রত্যেক ধর্মের দরিদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। খাজাঞ্চীখানার সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি আমন্ত্রিতদের মধ্যে বিতরণ করিতেন এবং এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার সমস্ত অলংকার ও রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ দান করিয়া দিতেন। এইসব কিছু এক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উপমহাদেশে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং রাজাগণও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। এই অবস্থা হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসারীদের আগমন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

চীনে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবদ্দশায় একটি পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। চীনে প্রসিদ্ধ তয়াং বংশ (Tang Dynasty) যাযাবর আক্রমণকারীদের শাসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চীনের সোনালী যুগের সূচনা করে। চীনের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুং (Tai Tsung ৬২৭-৬৪৯ খ্রিঃ) হযরত মুহম্মদের (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিযরতের পাঁচ বৎসর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেক বৎসরব্যাপী নিষ্ঠুর যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাই সুং বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান, খাল খনন, যুদ্ধ বন্দীদের পুনর্বাসন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে যে, কোনো একজন তাঁহাকে অপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর হইতে উপদেশ দিলে তাই সুং তাঁহার গুরু কনফুসিয়াসের (Confucius) সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীতে উত্তর দেন- "আমি যদি খরচ হ্রাস করি, বোঝা হাল্কা করি, শুধু চরিত্রবান কর্মাধ্যক্ষদের নিযুক্ত করি যাহাতে জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট কাপড়- চোপড় থাকে, তবে ইহা রাহাজানী দূর করিবার জন্য কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করিবার চেয়েও অধিক কার্যকরী হইবে।" এই সময়েই প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হুয়াং চুয়াং ভারতবর্ষ সফর করেন এবং প্রায় ৭৫টি বৌদ্ধ পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন, এই সময়েই চীনে 'ব্লক মুদ্রণী' আবিষ্কৃত হয়। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় সম্ভবত চীনই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সুশাসিত রাষ্ট্র।

আরও পূর্ব দিকে জাপানে তখন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলোড়ন চলিতেছিল। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সমসাময়িককালে জাপানে ছিলেন দেশের প্রথম সম্রাজ্ঞী সুইকু (৫৯২-৬২১ খ্রিঃ) যিনি যুবরাজ শোতোকু তাইশীর (Shotoku Taishi) প্রতিনিধিত্বের সময় বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুবরাজ একটি 'শাসনতন্ত্র' জারি করেন। এই শাসনতন্ত্র ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কনফুসীয়দের নীতিশাস্ত্র, চীনা রাজনৈতিক আদর্শ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণ। এই সমস্ত আন্দোলন চীনের তিয়াং বংশের দৃষ্টান্তে সুদৃঢ় হইয়া ৬৪৬ সালের তাইকওয়া সংস্কারে পরিচালিত হয় যদ্বারা সম্রাটকে অতি উচ্চ ক্ষমতা ও ঐশ্বরিক আসনে উন্নীত করা হয়। তাঁহাকে সমগ্র জাপানের মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাঁহার আদেশ মান্য করিবার জন্য প্রত্যেকে বাঁচিয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়। একদিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসারিগণ যখন আরবের মরুভূমি হইতে বাহির হয় গোত্রীয় সামন্তবাদের জীবন শেষ করিয়া– অপরদিকে জাপান তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

আরব উপদ্বীপের উত্তরের ভূখণ্ড তখন দুইটি বৃহৎ ও গর্বিত শক্তির পদানত ছিল।

পশ্চিমে ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য যাহার আধিপত্যে ছিল সমগ্র বলকান এলাকা ও এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ। ইহা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং ইহার রাজধানী ছিল বাইজান্টিয়ম বা কনস্টান্টিনোপলে। এই সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম ছিল প্রাচ্য সনাতন খ্রিষ্টান ধর্ম (Eastern Orthodox Christianity) এবং ইহার ভাষা ছিল গ্রীক। পূর্বে ছিল প্রাচীন আখমানিয়ান সাম্রাজ্যের (Achomanean Empire) উত্তরাধিকারী সাসানীয়গণ কর্তৃক শাসিত পারস্যবাসিগণ। ক্যাম্পিয়ান সাগরের উভয় তীর, ফারটাইল ক্রিসেন্টের পূর্ব অংশ, টাইগ্রীস ও সিন্ধু নদীসমূহের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা সাসানীয়দের আধিপত্যে ছিল। তাহাদের শীতকালীন রাজধানী ছিল টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত চ্যেসিফনে (Chesiphon) এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল একবাতানায় বা আধুনিক হামাদানে। তাহাদের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র এবং তাহাদের ভাষাকে বলা হইত পাহলভী বা মধ্যযুগীয় ফার্সি। পারস্য ও বাইজেন্টাইন উভয়েই ছিল স্বেচ্ছাচারী। ধর্মকে তাহারা রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত। তবে ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে পারস্যবাসিগণের মধ্যে অধিক একাত্মতা ছিল বলিয়া নিজেদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে তাহারা গর্বিত ছিল। এই দুইটি সাম্রাজ্য সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং কোনো পক্ষই অপর পক্ষকে পদানত রাখিবার মতো শক্তিশালী ছিল না।

হযরত মুহম্মদের (সঃ)জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে এই দুইটি সাম্রাজ্য সমসাময়িক দুই জন প্রসিদ্ধ সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। বাইজেন্টাইনে সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান (৫২৭-৫৬৫ খ্রিঃ) এবং পারস্যের শাহানশাহ ছিলেন খসরু আনুসিরাওঁয়া (৫৩১-৫৭১ খ্রিঃ) যাঁহাকে গ্রীকগণ বলিত 'খসরু' এবং আরবগণ 'ক্যসরা'। উভয় শাসকই ছিলেন কর্মঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষি এবং একচ্ছত্র ক্ষমতায় বিশ্বাসী। উভয়েই ছিলেন সংস্কারক এবং আইন প্রণেতা। তাঁহারা একে অপরকে ভাই সম্বোধন করিতেন। তাঁহারা একটি অনন্ত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন। এই ব্যাপারে জাস্টিনিয়ান ১১,০০০ পাউন্ড স্বর্ণ প্রদান করেন। কারণ তিনি ইতালি আক্রমণ করিবার জন্য নির্ভয় হইতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই চুক্তি এক যুগও স্থায়ী হয় নাই। ৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে আনুশিরাওঁয়ার সেনাবাহিনীকে এন্টিওকের বহির্দ্বারে মোতায়েন করা হয়। জাস্টিনিয়ান -এর অবস্থা তখন নাজুক। তিনি ৫৪৫ সালে ২০০০ পাউন্ড প্রদান করিয়া একটি পাঁচ বৎসর মেয়াদি চুক্তি সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত ৫৬২ খ্রিষ্টাব্দে ৫০ বৎসর মেয়াদি একটি শান্তি চুক্তির জন্য জাস্টিনিয়ান বাৎসরিক ৩০,০০০ খন্ড স্বর্ণ প্রদানে রাজি হন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অনতিবিলম্বে পুনরায় সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ একটি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়।

তবে এই ধারণা হওয়া উচিৎ নহে যে, পারস্যবাসি ও বাইজেন্টাইনগণ তাহাদের সমস্ত সময় যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যয় করিত। শান্তির সময় তাহাদের মধ্যে কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শের এবং বাণিজ্যিক দ্রব্য সামগ্রীর বিনিময় হইত। মসল্লা, মূল্যবান পাথর, হাতির দাঁত ও রেশমের ব্যবসায়িগণ বেশ তৎপর ছিল। শিল্পকলার উন্নতি, পাণ্ডুলিপির জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ গির্জা নির্মাণে বাইজেন্টাইনগণ যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত এবং গভীর ধর্মীয় আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত। পারস্যবাসিগণ নিজেদের এলাকায় ছিল জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে তাহারা ব্যবসা করিত। তাহারা অতি সুন্দর সৌধ নির্মাণ করে, একটি সুষ্ঠু শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং গুণ্ডী শাপুর (Gundi Shapur) -এ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, যাহা সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির কেন্দ্রে

পরিণত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও উভয় দেশের ব্যবসা, শিল্পকলা ও ভাবধারার বিনিময় অব্যাহত থাকে।

কিন্তু যুদ্ধও অব্যাহত থাকে। সাম্রাজ্যগুলি অন্য দুইজন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম দেয় ঃ ইরানে খসরু পারভেজ (৫৮৩-৬২৮ খ্রিঃ) এবং বাইজেন্টিয়ামে হেরাক্লিয়াস (৬১০-৬৪১ খ্রিঃ)। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, খসরু পারভেজ যিনি ৫৮৯ সালে বাইজেন্টাইন সম্রাট মৌরীস কর্তৃক পুনর্বহাল হইয়াছিলেন, শতবর্ষীয় ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য যে ফোকাস মৌরীসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাহাকে হত্যা করেন। ১৯ বৎসর ধরিয়া পারস্যবাসিগণের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং তাহারা দারা এন্টিওক, আলেপ্পো ও দামেস্ক অধিকার করে। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে খসরু পারভেজ জেরুজালেম ধ্বংস করেন এবং আসল ক্রুস (True Cross) ইরানে লইয়া যান। ইহা খ্রিষ্টানদের একটি আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ এবং তাহাদের বিশ্বাস যীশুখ্রিষ্টকে ইহার উপর ক্রুসবিদ্ধ করা হইয়াছিল। ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে খসরু আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে পারস্য সেনাবাহিনী পুনরায় দ্বিতীয় দারিয়াসের পর এই প্রথমবার মিসর দখল করে। ইতিমধ্যে আরেকটি পারস্যবাহিনী সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করিয়া ৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে কালসেডন (Chalcedan) দখল করে এবং বসফরাস অতিক্রম করিয়া কন্‌স্টান্টিনোপলে পৌঁছে।

৬১০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লার রসুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট হন। ঠিক সেই বৎসর হেরাক্লিয়াস বাইজেন্টিয়ামের সম্রাট হন। বার বৎসর পর্যন্ত তিনি পারস্যবাসিদের হাতে পরাজিত হইতে থাকেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মদীনায় রসুল ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ক্ষমতা হাতে নেন। হেরাক্লিয়াস সেই বৎসরই পারস্যবাসিদিগকে প্রতিঘাত করেন। তিনি গর্বিত, ক্লান্ত পারস্যবাহিনীর উপর একের পর এক যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি চ্যেসিফোনের সিংহদ্বারে উপনীত হন। খসরু পারভেজ তদীয় পুত্রের হাতে নিহত হন এবং হেরাক্লিয়াস আসল ক্রুশসহ তাঁহার হারানো সব কিছু উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহা একটি অর্থহীন বিজয়, কারণ ইরান ও বাইজেন্টিয়াম উভয়েই প্রচুর রক্তক্ষরণে তখন নিঃশেষিত। ধ্বংস তাহাদের দ্বারপ্রান্তে। তাহাদিগকে মরণাঘাত দিল আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের অধিবাসিগণ, যাহারা এককালে ছিল উভয় শক্তির বশ্য ও পদানত।

ইরান ও বাইজেন্টিয়ামের যুদ্ধ-বিগ্রহ আরব পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। উত্তরের সুসভ্য সাম্রাজ্যদ্বয় ইহাকে অসভ্য এলাকা হিসাবে গণ্য করিত। এই এলাকায় মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ অধিবাসী ছিল যাযাবর বেদুইন। তাহারা সর্বদা অবাধ্যতার পরিচয় দিত। মরুভূমি হইতে পরিচালিত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য উভয় সাম্রাজ্য দুইটি শক্তিশালী গোত্রকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। পারস্যবাসিগণ গাস্‌সানী গোত্রকে বাইজেন্টাইনদের তত্ত্বাবধানে থাকিতে অনুমতি প্রদান করে এবং বাইজেন্টাইনগণ প্রতিদানে হীরার লাখমি গোত্রের সঙ্গে পারস্যবাসিদের একই সম্পর্ক স্বীকার করে। তবে দক্ষিণ আরব ইহার অপেক্ষাকৃত কোমল জলবায়ু, স্থায়ী সংস্কৃতি ও স্বল্প ব্যবধানের জন্য অধিকাংশ সময় ইরানের পদানত ছিল। পারস্যের খোদিত প্রস্তরে হামীর, এডেন, ইয়েমেন এবং দক্ষিণ আরবের

অন্যান্য স্থানগুলিকে করদাতা অঞ্চল হিসাবে দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের সহিত বাইজেন্টাইনদের সম্পর্ক ছিল ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগরের মাধ্যমে।

আরব উপদ্বীপের মধ্য ও উত্তর অংশে হেজাজ ও নজ্দ ছিল বেশির ভাগই অনুর্বর মরুভূমি। মরুদ্যানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই বিশাল মরুভূমির বেদুইন অধিবাসিগণ পানি দেখিলে উট হইতে অবতরণ করিত এবং সেই পানি নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিত। পরবর্তীকালের বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইব্‌নে খালদুনের (১৩৩২-১৪০৬ খ্রিঃ) মতানুসারে যাযাবররা ছিল নিরক্ষর, তাহারা কোনো নৈপুণ্যের ধার ধারিত না এবং তাহারা ছিল সভ্যতা ধ্বংসকারী। আরবগণ রান্নার পাত্র স্থাপন করিবার জন্য পাথর ব্যবহার করে। অতএব পাথর সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা দালান- কোঠা ভাঙ্গিয়া ঐগুলি বাহির করিয়া লয়। জ্বালানির জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহারা ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলে। লুঠতরাজ ছিল আরব অর্থনীতির একটি স্তম্ভ এবং আরবদের জীবনপদ্ধতি। সমগ্র জীবন ধরিয়া তাহারা খাদ্য, উট ও স্ত্রীলোকদের পিছনে ব্যয় করিত।

এই এলাকায় অল্পসংখ্যক বসতি ছিল। উহাদের একটি ছিল হেজাজের মক্কা, লোহিত সাগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই শহরের প্রাণমূল ছিল জমজম নামক একটি কূপ। ইহার অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি ছিল দক্ষিণ আরব হইতে উত্তরের ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি পর্যন্ত পরিচালিত মসল্লা সরবরাহের পথে অবস্থিতি। ইহার বিখ্যাত হইবার মূলে ছিল প্রাচীন পবিত্রস্থান কাবা, যাহা উপদ্বীপের অধিবাসীদের ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল।

আনুমানিক খ্রিষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্বে এতদ্ঞ্চলের আরবগণ আকাশ হইতে একটি উল্কাখণ্ড পড়িতে দেখে এবং এই কারণেই ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করে।* তাহারা এই কৃষ্ণ পাথর 'হাজর-উল আসওয়াদ' (Hajar-ul-Aswad) কুড়াইয়া লয় এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ঘনক্ষেত্রফল (Cubic) বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করে। তাহাকেই কাবা বলা হয়। প্রতিবেশী গোত্রগুলি এই কাবাকে পূজা করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর আসিতে আরম্ভ করে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কাবার চতুর্দিকে একটি উপাসনালয় গড়িয়া উঠে ও উপদ্বীপের পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে ইহার উপাসনা সার্বজনীনতা লাভ করে। চন্দ্রপঞ্জিকার জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে এখানে একটি বাৎসরিক তীর্থ অনুষ্ঠিত হইত। একটি অলিখিত আইন অনুসারে এই সময় এবং আরও দুই মাস পর্যন্ত সর্বপ্রকার আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন গোত্র বিনা উৎপীড়নে এখানে আসা-যাওয়া করিতে সক্ষম ছিল। তীর্থযাত্রী তাহার কাপড় পরিবর্তন করিয়া 'এহরাম' অর্থাৎ সেলাইবিহীন দুই খণ্ড সাদা কাপড় পরিধান করিয়া একটি চতুষ্কোণ আঙ্গিনায় প্রবেশ করিত, যাহার মধ্যখানে কাবা অবস্থিত। কৃষ্ণপাথরে চুম্বন করিয়া সে ইহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিত, তিনবার দৌড়াইয়া এবং চারবার হাঁটিয়া। প্রত্যেকবার কৃষ্ণপাথরকে চুম্বন করিতে হইত। তারপর সে একটি প্রার্থনা আবৃতি করিত এমন এক জায়গায় যাহা পরে ইসলামি আমলে 'ইব্রাহীমের ঘর' হিসাবে পরিচিত হয়। ইহার অর্থ হইল ইব্রাহীমই সর্বপ্রথম এই কা'বা নির্মাণ করেন। অতঃপর সে শহরের বাহিরে দুইটি

---

* *আল-কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই পাথরটি কুড়াইয়া লন এবং কা'বাগৃহ তৈয়ার করিয়া হজের নিয়ম প্রচলিত করেন।-অনুবাদক।*

পাহাড়ের নিকটে যাইত, একটিকে বলা হয় সাফা এবং অপরটিকে বলা হয় মারওয়া। সাতবার সাফা পাহাড়ে উঠিয়া এবং পুনরায় নামিয়া মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়া সেই প্রার্থনা আবৃতি করিতে করিতে সে প্রত্যেকটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করিত। অতঃপর সে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া কা'বার চতুর্দিকে হাঁটিয়া প্রদক্ষিণ করিত এবং কৃষ্ণ-পাথরকে চুম্বন করিত।

তারপর ছয়দিন তীর্থযাত্রী বিশ্রাম করিত। বোধহয় তখন ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে, খেলাধুলা প্রতিযোগিতা এবং কবিতা শ্রবণে অতিবাহিত করিত। অষ্টম দিবসে সে নিকটবর্তী মীনা গ্রামে যাইয়া রাত্রি কাটাইত। তারপরের প্রত্যুষে সে আরাফাত পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইত এবং সেখান হইতে রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য মুজদালিফায় গমন করিত।

দশম দিবস তীর্থযাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কারণ, ইহা কোরবানীর দিন। তাহার পরে আসে ঈদ-আল-কবীর বা মহান ভোজ। এইদিন তীর্থযাত্রী মীনায় গমন করিয়া তিনটি বিশাল খুঁটি বিশিষ্ট উপাসনালয়ে যাইত। এই মন্দিরই বোধ হয় দুষ্ট শয়তানকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কোরবানীর স্থান। এই শয়তানকে বলা হয় শয়তান-আল-কবীর বা সর্ববৃহৎ শয়তান। অতঃপর সে তাহার অর্থের সমানুপাতিক একটি প্রাণী লইয়া সে জায়গায় কোরবানী দিত। ইহার পর সে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাপড় পরিধান করিয়া মক্কায় গমন করিত এবং পুনরায় বিনিময় ব্যবসা সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত।

লুণ্ঠন, আক্রমণ ও পানির সন্ধান ব্যতীত মোটামুটি ইহাই ছিল আরবদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। কা'বার ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রায় পরিবর্তনহীনভাবেই মুসলমানেরা অদ্যাবধি পালন করিয়া থাকে।

মক্কা একটি রাজধানীর ন্যায় গড়িয়া উঠে। তীর্থযাত্রিগণ তাহাদের গোত্রীয় দেবতাগুলি আনিয়া কা'বার আঙ্গিনায় স্থাপন করে। তীর্থের অনুশাসনাদির পর আরবগণ পণ্য বিনিময় করিয়া খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিত এবং কবিতায় তাহাদের শৌর্যবীর্য-গাঁথা আবৃত্তি করিত। উষ্ট্র-দৌড় এবং ঘোড়- দৌড় এই প্রতিযোগিতার অন্যতম ছিল। কবি ছিলেন একাধারে চারণ, একজন জ্ঞানী লোক, ঐতিহাসিক, গীতিবাগীস ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি। কৌতুক ও অভিশাপের মাধ্যমে তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলিকে তিরস্কার করিতেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে তাহাদের বীরত্ব, সম্মান ও সাহসিকতার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। প্রাক ইসলামি আরবের সেই কবিতাবলীর অতি অল্প নমুনাই বর্তমানে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতাগুলি কা'বার প্রবেশদ্বারে লটকাইয়া দেওয়া হইত এবং সেগুলিকে 'মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত' বলা হইত। বর্তমানে প্রাপ্ত কবিতাগুলির বিষয়বস্তু হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি, অন্তত তিনটি বিষয় ছিল আরবদের অত্যন্ত প্রিয়- কড়া মদ, বেগবান ঘোড়া এবং মরুভূমিতে কালো তাঁবুর মধ্যে সুন্দরীর ক্ষণিক সঙ্গ।

তখন হইতে মক্কা, মধ্য ও উভয় আরবের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল কোরাইশ গোত্রের হাতে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় কোরাইশ বংশ ক্ষমতার শীর্ষ অতিক্রম করিয়া ইহার প্রতিপত্তি ও আধিপত্য হারাইতে আরম্ভ করে বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপ- গোত্রগুলির মধ্যে তখন অনৈক্য বিরাজমান এবং এইগুলি উহাদের প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আহ্বান করে। এতদ্‌সত্ত্বেও

কোরাইশ বংশ তখনও ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। হজ্জের মৌসুম শেষ হইবার পর গোত্রগুলি উপদ্বীপের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত এবং তাহাদের চিরাচরিত নীতি—পানিসম্পদ ও স্ত্রীলোকের লুণ্ঠন কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অপরদিকে কোরাইশ নেতাগণ পরবর্তী মৌসুমে ব্যবসা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তরে সিরিয়া, মিসর ও ইরানে সুরক্ষিত কাফেলা প্রেরণ করিত; ফলে কোরাইশদের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ বহির্বিশ্ব সম্পর্কে তেমন অজ্ঞ ছিল না। বাইজেন্টিয়াম ও ইরানের মধ্যে প্রায়শ সংঘটিত যুদ্ধে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত- এই সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নাই। এতদ্বারা তাহারা একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলাইয়া দেওয়ার নিয়মাবলী শিখিতে পারিত। আরবে ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের বসতি থাকিবার ফলে পৌত্তলিক আরবগণ তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করিত। তাহাদের ঈশ্বরদের মধ্যে আরবগণ আল্লাহ নামটি জানিত (ওল্ড টেস্টামেন্টের এ্যললোহ বা এ্যালোহীম-এর ন্যায়)। মক্কার হানিফ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া বোধ হইত।

ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মধ্য প্রাচ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (সঃ)

উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত পরিবেশে এবং খুব সম্ভবত ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোরাইশ বংশের একটি ছোট ও আপাতদৃষ্টিতে অল্প প্রতিপত্তিশালী হাশেমী উপ-গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ তাঁহার জন্মের পূর্বে মারা যান এবং জন্মের ছয় বৎসর পর তাঁহার মাতা আমেনা মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ আবদুল মোত্তালিব তাঁহাকে লালন-পালন করেন এবং আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁহাকে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অন্যান্য রসুলদের জীবনীর ন্যায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনও সম্ভবত তাঁহার ভক্ত অনুসারীদের দ্বারা কাল্পনিক আকার ধারণ করে। কারণ ভক্তগণ তাঁহার তিরোধানের এক শতাব্দী বা অনুরূপ সময়ের পর তাঁহার জীবনচরিত রচনা করেন। হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনের প্রথম ২৪ বৎসরের বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও খুবই সংক্ষিপ্ত। সুক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অনেক কাহিনীকে একত্রিত করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে কোরাইশদেরও অংশ ছিল। কাফেলার একজন বালক-সদস্য হিসাবে সম্ভবত তিনি ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর এবং বোধ হয় ইরানও সফর করেন। এই সময় তিনি রাত্রিতে কাফেলার ইহুদী-খ্রিষ্টান সদস্যদের সহিত তাঁহার নিজের লোকদের ধর্মীয় বিতর্ক শুনিতেন। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ্ হইতে উদ্ধৃতি সহকারে বিতর্ক করিতেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাঁহার লোকদের সেইরূপ ব্যবহারযোগ্য কোনো ধর্মগ্রন্থ নাই। ইহা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। তাই জীবনের প্রথম ভাগে তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তাঁহার লোকদের একটি ধর্মগ্রন্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। কোরআনে আমরা একাধিকবার পাঠ করি, 'এখন আরবিতে তোমাদের একটি গ্রন্থ্ আছে' যাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময় হযরত মুহম্মদ (সঃ) যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, ইহা মোটামুটি পরিষ্কার যে তিনি ব্যবসার আদান-প্রদানের খাতিরেই তাহা করিয়াছেন। কারণ, তিনি ব্যবসার সমস্ত বিষয়ের সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠেন। ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর বয়স যখন ২৪ বৎসর, খাদীজা নাম্নী এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসার ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ একজন লোক খোঁজ করিতেছিলেন। খাদীজা তাঁহার স্বামীকে হারাইয়া ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ-কারবার নিজেই তদারক করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি যে নিজে কাজ কারবার তদারক করিতে পারিতেন একথা প্রমাণ করে যে, প্রাক-ইসলামি আরবে মহিলাদের মর্যাদা তত নিম্নমানের ছিল না। হয়ত অর্থনৈতিক কারণে কোনো কোনো গোত্র নবজাত শিশুকন্যা হত্যা করিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তখন মহিলারা শুধু যে সম্পত্তির মালিক হইত তাহা নহে, বরং ইচ্ছা করিলে তাহারা আত্মনির্ভরশীলও হইতে পারিত। পরিবারের একজন বন্ধু খাদীজার এই কাজের জন্য হযরত মুহম্মদের (সঃ) নাম সুপারিশ করে। তিনি ছিলেন সৎ, অভিজ্ঞ এবং কোরাইশ বংশেরও। খাদীজা তাঁহাকে সচিব নিযুক্ত

করেন এবং এক বৎসর পর তাঁহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদীজার বয়স ৪০ বৎসর এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। খাদীজা যেহেতু ধনী, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারিণী এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) চাকুরিদাত্রী, অতএব তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন– এই জাতীয় জনশ্রুতিই সম্ভবত সত্য।

স্বভাবতঃই হযরত মুহম্মদ (সঃ) রাতারাতি একজন কাফেলার যুব-সদস্য হইতে একটি উন্নতশীল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তায় উন্নীত হন এবং কোরাইশ গোত্রের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন। পঁচিশ বৎসর তিনি খাদীজার সহিত পরম সুখে জীবনযাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পুত্রগণ শৈশবেই মারা যান। ঘরে পরিতৃপ্ত জীবন এবং বাহিরে একটি উন্নতশীল ব্যবসা। অন্যান্য ধনী লোকদের ন্যায় তিনিও মক্কার পার্শ্ববর্তী হেরার একটি পাহাড়ি গুহা বা ঘর লইয়া উহাকে সজ্জিত করেন। শহরের গরম ও চেচামেচি হইতে বাঁচিয়া সেইখানে ধ্যান করিতেন।*

৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসের শেষের দিকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) গুহায় বিশ্রাম লওয়ার সময় একটি আওয়াজ শুনিতে পান। এই আওয়াজকে তিনি পরে 'ঘণ্টাধ্বনি' বলিয়া বর্ণনা করেন। বর্তমান ইসলামি বিশ্বের ন্যায় প্রাক-ইসলামি আরবে রমজান ছিল একটি রোজার মাস এবং ধর্মের প্রতি একজন অনুরাগী ব্যক্তি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তখন নিশ্চয়ই রোজা রাখিয়া ছিলেন। এই আওয়াজ তাঁহাকে বলিল, 'ইকরা বিইছমে রাব্বিকা'– "প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মানুষকে একটি জমাট রক্তবিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তিনি ভীত হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে, মুহম্মদ (সঃ) মনে করিলেন, যে কবিকে তিনি ঘৃণা করেন সেই কবিদের ন্যায় তাঁহাকে 'ভূতে পাইয়াছে'। তাঁহার ধারণা এত গভীর হয় যে, তিনি রীতিমতো আত্মহত্যা করিতে সিদ্ধান্ত নেন।** তিনি নিশ্চয়ই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন। কোন প্রভুর নামে কথা বলিবেন? মক্কার চতুষ্পার্শ্বে তখন মোটের উপর তিন শতের অধিক প্রভু বিরাজমান।*** তাঁহার স্ত্রীর নিকট তিনি এই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন। খাদীজা তাঁহার এক চাচাত ভাই ওয়ারাকার নিকট যান ও মুহম্মদের (সঃ) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি একজন খ্রিষ্টান ছিলেন। কথিত আছে ওয়ারাকা চীৎকার করিয়া বলেন- "দেখ তিনি এই জাতির জন্য একজন প্রেরিত পুরুষ হইবেন। তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধ রাখিতে বল।" হযরত মুহম্মদ (সঃ) ঐশী আদেশ প্রাপ্ত হন। পরে এই স্মরণীয় ঘটনাকে 'শক্তির রাত্রি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বিরতির পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) যখন পুনরায় 'উত্থিত ও সাবধান' হইবার জন্য আদেশ প্রদানকারীর সেই আওয়াজ শুনিলেন তাঁহার মধ্যে আর সংশয় রহিল না যে, আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হইবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তাঁহাকে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে খাদীজা ছিলেন সর্বপ্রথম। তাহার পর হইতে তাঁহার নিকট আরও ঘন ঘন ঐশীবাণী আসিতে লাগিল এবং সেই

* *লেখকের এই মতের সঙ্গে আমরা একমত নহি। মক্কার ধনী লোকেরা ধ্যান করিবার জন্য কুত্রাপী গুহায় যাইতেন না এবং উহাকে সজ্জিতও করিতেন না।-অনুবাদক।*

** *এখানেও লেখকের সঙ্গে আমরা একমত নহি কারণ, এই সময়ের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের জানা আছে। -অনুবাদক।*

*** *উপরে দ্রষ্টব্য ঃ পৃঃ -২৯।*

আওযাজকে তিনি ফেরেশতা জিব্রাইলের আওয়াজ বলিয়া শনাক্ত করিলেন, যিনি তাঁহাকে আল্লাহর বাণী পড়িয়া শুনান।

প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহর একত্ব প্রচার করেন, যাহা মক্কা নগরের চিরাচরিত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল।

"বল ঃ তিনিই আল্লাহ, এক।
আল্লাহ, যাঁহার নিকট সকলেই সর্বদা জাচঞা করে।
তিনি কাহারও নিকট হইতে জন্ম নেন নাই বা তিনি কাহাকেও জন্ম
দেনও না।
এবং তাঁহার সমকক্ষ কেউ নয়।"
-(আল-কোরআন ঃ ১১২)

আল্লাহ সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ভাবধারা এবং নবীদের নিকট আল্লাহর ঐশীবাণী প্রেরণের নীতি ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ঐতিহ্য হইতে তাঁহার নিকট আসিয়াছে। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ঐতিহ্য অনুসারেই মুহম্মদ (সঃ) নিজেকে একজন নবী মনে করেন। অতএব আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, হারুন, ইস্রাইলদের সন্তানগণ, মরিয়ম ও যিশু সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য খুবই স্বাভাবিক। পুরাতন নবীদের ন্যায় তিনিও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেন। আল্লাহর একত্ব এবং ইহকাল পরকালে তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার বাণী প্রচার করেন। আল্লাহ শুধু ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে নয়, বরং আরবদের ব্যাপারেও আগ্রহী। তিনিই কা'বা গৃহকে ইয়েমেনের আবিসিনীয় শাসক আবরাহার হস্তী আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে সংঘটিত হয় বলিয়া এই ঘটনাটি তাঁহার শ্রোতাদের নিকট পরিষ্কার স্মরণ রহিয়াছে।

"তুমি কি দেখ নাই, তোমাদের প্রভু কিভাবে হস্তীওয়ালাদের শায়েস্তা করিয়াছেন? তিনি কি তাহাদের কৌশলগুলিকে নিষ্ফল করিয়া দেন নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখি প্রেরণ করেন নাই, যেগুলি তাহাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে (গো-মহিষ দ্বারা) ধ্বংসকৃত সবুজ ফসলের ন্যায় রাখিয়া গিয়াছে।"

-(আল-কোরআন ঃ ১০৫)

তিনি হজ্জের মাসের সুযোগ গ্রহণ করেন। তখন হাজার হাজার লোক মক্কায় আগমণ করে। তিনি ক্ষমতাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কথা প্রচার করেন যে, 'আল্লাহ হযরত মুহম্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন তাহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য, শেষ বিচারের দিন এবং পরকালে তাহাদের শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে সাবধান করিবার জন্য। এই সমস্ত সাবধান বাণীতে তিনি পরম বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। সময় সম্পর্কে তিনি তাহাদিগকে সাবধান করেন ঃ

সূর্যকে যখন বিপর্যস্ত করা হয়,
এবং তারকারাজি যখন পতিত হয়,
এবং যখন পর্বতসমূহকে নাড়াইয়া দেওয়া হয়,
এবং যখন বড় ও ছোট সমস্ত উটগুলিকে ত্যাগ করা হয়,
এবং যখন সমুদ্রসমূহ উত্থিত হয়,
এবং যখন আত্মাগুলিকে পুনঃসংযোজন করা হয় ...।
-(আল-কোরআন ঃ ৮১)

তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দান করেন যে, ... "যখন শিঙ্গা একবার ধ্বনিত হইবে এবং ভূমণ্ডলকে সমস্ত পর্বতসহ উপরে তুলিয়া এক প্রচন্ড শব্দে ধ্বংস করা হইবে। তখন সেইদিন সমস্ত ঘটনাবলী পুনঃপ্রকাশ পাইবে ...। সেইদিন তোমাদিগকে অনাবৃত করা হইবে; তোমাদের কোনো গোপন তথ্য লুক্কায়িত থাকিবে না ...।"

–(আল-কোরআন ঃ ৬৯)

খুব বেশিসংখ্যক লোক তাঁহাকে অনুসরণ করে নাই। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার চাচাত ভাই আলী এবং তাঁহার চাকর জায়েদ ছিলেন প্রথমদের মধ্যে। বহুসংখ্যক ক্রীতদাস তাঁহার সাবধান বাণীতে কান দেন, কিন্তু তাহাদের কোনো প্রতিপত্তি ছিল না। সম্পন্ন লোকদের মধ্যে যিনি তাঁহার বাণী গ্রহণ করেন তিনি হইলেন আবুবকর। কোরাইশদের মধ্যে তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বাকি সকলেই হয়তো তাঁহাকে অবজ্ঞা করে বা বড়জোর তাঁহাকে ঠাট্টা করে এবং তাঁহাকে পাগল ও ভূতে পাইয়াছে বলিয়া বিদ্রূপ করে। তার প্রত্যুত্তরে বলা হয় ঃ আল্লাহ প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

"অস্তমিত তারকার শপথ,
তোমাদের সাথী ভুল করেন নাই বা প্রবঞ্চিত হন নাই;
বা তিনি তাঁহার স্বীয় ইচ্ছার কথাও বলেন না ...।'

-(আল- কোরআন ঃ ৫৩)

'এবং আপনি নিজের প্রতি আপনার প্রভুর অনুগ্রহের জন্য একজন উন্মাদ নন।" এবং পুনরায় 'সোবেহসাদেক ও গভীর রাত্রির শপথ, আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই বা আপনাকে ঘৃণাও করেন না ...।"

–(আল-কোরআন ঃ ৫৩)

কোরাইশরা নিজেদের মধ্যে একজন রসুল পাওয়াটাকে গর্বের চোখে দেখে নাই। হয়ত হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গী ব্যবসায়িগণ তাঁহার এই ধর্ম প্রচারে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখিতে পায়। নূতন ধর্মের প্রসার কা'বার চতুর্দিকে এবং কা'বার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত দেব দেবীসমূহকে ধ্বংস করিবে। ফলে হজ্জযাত্রা (প্রাক-ইসলামি রীতি অনুসারে) বন্ধ হইয়া যাইবে এবং হজ্জ ছাড়া মক্কার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কোরাইশগণ তাহাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য হারাইবে। সত্য কথা বলিতে কি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তেল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আরবের সর্ববৃহৎ আয়ের উৎস ছিল হজ্জ। অতএব রসূলের দাবির সাথে বাণিজ্যিক মুনাফার সেই পুরাতন সংঘাত পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহম্মদ (সঃ) কোরাইশদের উন্নতি ব্যাহত হওয়ার ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার কিছুই করণীয় ছিল না। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও সাদাসিদাভাবে তাঁহার ধর্ম প্রচারের কাজ চালাইয়া যান। অত্যাচার এড়াইবার জন্য মুহম্মদের (সঃ) অনেক অনুসারী ইথিওপিয়ায় (আবিসিনিয়া) হিজরত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাতেও কোনো ফলোদয় হয় নাই। আপোসের মাধ্যমে কৃতকার্যতা লাভের ব্যাপারে মুহম্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই উদগ্রীব হন। এক সময় হয়ত তিনি স্বীকার করিতে উদ্যত হন দেবমন্দিরে তিনটি দেবী-মূর্তি– লাত, মানাত ও উজ্জা খাঁটি হইতে পারে যদিও এইগুলি আল্লাহর অধঃস্তন। তবে পরে তিনি এরূপ প্ররোচণার বিরোধিতা করিয়া এক আল্লাহর কথা ঘোষণা করেন।

এই সংগ্রামে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবন বিপর্যস্ত হয় নাই। তিনি ছিলেন হাশিম উপগোত্রের সদস্য এবং উহার নেতা আবু তালিব তাঁহার চাচা। এই বৃদ্ধলোক যদিও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম মানিয়া লন নাই তথাপি তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তদস্থলে হযরত মুহম্মদকে (সঃ) গ্রহণকারী ক্রীতদাসগণ অত্যাচারের সমস্ত বোঝা বহন করেন। প্রাক-ইসলামি আরবের আইন অনুসারে ক্রীতদাসের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। বোধ হয় এই সমস্ত ক্রীতদাস ছাড়িয়া দিবার প্ররোচণায় মুহম্মদের (সঃ) নিকট নিম্নবর্ণিত ঐশীবাণী প্রেরণ করা হয়।

> "(হেরসুল) বলুনঃ ওহে অবিশ্বাসিগণ! তোমরা যাহার আরাধনা কর আমি তাহার আরাধনা করি না; বা আমি যাহার আরাধনা করি তোমরা তাহার কর না; এবং তোমরা যাহার আরাধনা কর আমি তাহার আরাধনা করিব না, বা আমি যাহার আরাধনা করি তোমরা তাহার আরাধনা করিবে না। তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"

-(আল -কোরআনঃ ১০৯)

হজরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনে সবচেয়ে বিপদপূর্ণ সময় ছিল ৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে। সেই বৎসর তাঁহার পালক পিতা, চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু তালেব মারা যান। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন আবু লাহাব। ইনি মুহম্মদের (সঃ) ধর্মের একজন গোড়া শত্রু, যাহাকে মুহম্মদ(সঃ) ঐশীবাণীর মাধ্যমে অভিশাপ প্রদান করেন ঃ

> "আবু লাহাবের ক্ষমতা ধ্বংস হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে। তাহার ধন-সম্পদ ও উপার্জন তাহাকে পরিত্রাণ দিবে না। তাহাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহার কাঠবহনকারী স্ত্রীর গলায় খেজুর দড়ির মালা থাকিবে।"

–(আল-কোরআনঃ ১১১)

অবস্থার চরম অবনতি ঘটে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজাও সেই বৎসর মারা যান। তাঁহার পক্ষে খাদীজাকে হারানো ছিল জাহাজের নোঙ্গর হারাইবার ন্যায়। উহার পর হইতে জীবনের স্রোত তাঁহাকে এদিক হইতে ওদিকে দোলাইতে থাকে। খাদীজার জীবদ্দশায় ২৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর দশ বৎসর তিনি অনেকগুলি বিবাহ করেন। কিছুসংখ্যক মহিলাকে তিনি আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিবাহ্ করেন, কারণ তাহাদের স্বামিগণ তাঁহার ধর্মের জন্য জীবন দান করেন বলিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাহাদিগকে বিবাহ্ করিতে বাধ্য হন। অন্যগুলিকে তিনি বিবাহ্ করেন রাজনৈতিক কারণে-অন্য গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। যে কোন লোক কোরআন হাদিস হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন যে খাদীজার মৃত্যুর পর তিনি গৃহজীবনে অনুরূপ শান্তি আর ফিরিয়া পান নাই।

এই প্রথমবারের মতো হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবার বিষয়টি চিন্তা করেন। প্রতিবেশী শহর তায়েফে তিনি ইহার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি তায়েফের লোকদের রাগ যে এত অধিক তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। সেখানে প্রস্তরাঘাতে প্রায় মৃত্যুর মুখে তাঁহাকে গোপন আশ্রয় নিতে হয়।

কিছু সংখ্যক উদার কোরাইশ নেতার মধ্যস্থতা ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পাইয়া হযরত মুহম্মদ (সঃ) সেখান হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) সৌভাগ্যবশত মক্কার ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইয়াসরিব শহরে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, যেগুলি পরে তাঁহার উপকারে আসে। ইয়াসরিবে তিনটি গোত্রের আদি বসতি ছিল। এই গোত্রগুলি হইল বনি নজির, বনি কুরাইজা ও বনি কাইনুকা। দুইটি পৌত্তলিক গোত্র আওস ও খাজরাজ এই শহর আক্রমন করে। ইহারা দক্ষিণ আরব হইতে আসিয়াছে বলিয়া দাবি করে। তাহারা কিছুসংখ্যক ইহুদী হইতে জমি ছিনাইয়া লয়। কতকগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং অবশিষ্ট ইহুদীদের সহিত সন্ধি করে। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব লইয়া আওস ও খাজরাজের মধ্যে মতবিরোদ হওয়ার ফলে তাহারা একে অন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই অন্তর্বিরোধের ফলে জননিরাপত্তা গভীরভাবে বিঘ্নিত হয় বলিয়া কেউ কেউ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চলাফেরা করা নিরাপদ কনে করিত না। দুই গোত্রের সমমর্যাদার কিছুসংখক নেতৃবৃন্দ এই বিরোধের অবসানের জন্য চেষ্টা চালান কিন্তু মধ্যস্থতা করিবার মতো যোগ্যতা কাহারো ছিল না। ফলে একজন বহিরাগত মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মনোনীত করাটা নিছক আকস্মিক নহে। প্রথমত ইয়াসরিববাসিগণ হযরত মুহম্মদের (সঃ) ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। তাহাদের শহরবাসী ইহুদিগণ মুসা ও তাহাদের নবীদের সম্পর্কে পূর্বেও বলিয়াছিল এবং একজন মাসিয়াহর আগমন সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিল। ফলে হযরত মুহম্মদের (সঃ) কথাগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিলেন। স্মরণ করা যাইতে পারে, ইয়াসরিব শহরটি ইয়েমেন ও দামেস্কের বাণিজ্য পথে অবস্থিত। অর্থনৈতিক দিক হইতে ছিল মক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইয়াসরিববাসিগণ হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও অন্যান্য কোরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের কথা জানিত। মুহম্মদকে (সঃ) তাহারা শুধু একজন নবী হিসাবে পায় নাই বরং তাঁহার মধ্যে একজন সুদক্ষ লোকের সন্ধান পাইয়াছিল-যিনি কোরাইশ গোত্রের আভ্যন্তরীণ পরিষদের সঙ্গে সুপরিচিত, যিনি তাহাদিগকে মক্কা নগরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করিতে সক্ষম।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে ছয়জন খাজরাজ বংশের লোক হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গে নূতন ধর্মে দীক্ষিত আরও অনেক লোক লইয়া আসে। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াসরিবের আওস ও খাজরাজ গোত্রের বেশ কিছুসংখ্যক লোক হযরত মুহম্মদকে (সঃ) তাহাদের নগরে আসিবার আমন্ত্রণ জানায়। এ অবস্থায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিজস্ব অভিরুচি না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ জন্মনগরী পরিত্যাগে তিনি নিশ্চয় অনিচ্ছুক ছিলেন। তবুও তাঁহার অনুসারীদের বেশ কিছুসংখ্যক লোককে তিনি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া সেই শহরে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের মধ্যে ওমর, ওসমানের ন্যায় ধনী কোরাইশও ছিলেন। তিনি নিজে তাহার শ্বশুর আবুবকর, তাহার চাচাত ভাই ও জামাতা আলী এবং দুইজন স্ত্রী সমভিব্যহারে সকলের অগোচরে মক্কা ত্যাগ করেন এবং ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ শে সেপ্টেম্বর নাগাদ ইয়াসরিব পৌঁছেন।* ইহাকেই হিজরত বা দেশত্যাগ বলে। প্রায় ১৭ বৎসর পর ইসলামের খলিফা থাকাকালে ওমর ইহাকে মুসলিম পঞ্জিকার প্রথম বৎসর হিসাবে নামকরণ করেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক ইয়াসরিববাসীদের সঙ্গে আল-আকাবার সন্ধি নামে একটি জোট স্থাপন

---

* *হিজরতের সময় একমাত্র হজরত আবুবকরই (রাঃ) মহান নবীর সঙ্গে ছিলেন। -অনুবাদক*

করা হইলেও মক্কাবাসীদের পক্ষে তাহাদের সম্পদ, মেয়েলোক ও সন্তান-সন্ততি লইয়া অপরিচিত ও শত্রু গোত্রগুলির মধ্যে বসবাস করাতে বেশ সাহসিকতার পরিচয় নিহিত। ইহার পর হইতে এই সমস্ত লোকদিগকে 'মুহাজিরুন' বা দেশত্যাগী বলা হয়। অপরদিকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যাহারা মুহম্মদকে (সঃ) অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন তাহারা আনসার বা সাহায্যকারী নামে পরিচিতি হন। পরে এই নগরীকে আর ইয়াসরিব বলা হয় না, বরং মাদীনাত-আল-নবী বা নবীর নগরী বা শুধু মদীনা নামে ইহা সুপরিচিত হয়।

নূতন নগরীতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তিনটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথমটি হইল মদীনায় তিনি শুধু আল্লাহর রসুলই নন, একটি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তাও বটে। তাঁহাকে একাধারে একটি সম্প্রদায়ের ভালো-মন্দের দেখাশুনা, বিচারের কাজ, আইন রচনা এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে সংগঠিত করিতে হয়। মদীনায় তাঁহার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁহার নবীর দায়িত্বকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়াও ধারণা করা হয়। সম্ভবত তাঁহার এবং তাঁহার অনুসারীদের মতানুসারে এই দুইটি দায়িত্বকে একত্রীভূত করা হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট (তৌরাত) অনুসারে মুসা (আঃ) যে বিষয়েই কথা বলিতেন তাহা মুসার (আঃ) নহে বরং ইয়াহওয়ের অর্থাৎ আল্লাহরই। অনুরূপ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে হযরত মুহম্মদের (সঃ) আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মামলার রায় ঘোষণাবলীকে শুধু মানুষ মুহম্মদের (সঃ) ঘোষণাবলী নহে বরং আল্লাহর পবিত্র আদেশ বলিয়া গণ্য করা হয়। নবী ও শাসক হিসাবে তাঁহার মধ্যে সরকার ও ধর্ম সম্মিলিত রূপ লাভ করে এবং পার্থিব ও পরলৌকিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। ইসলাম একটি ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং আজ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে মতবাদ অনুসারে ইহা তাহাই।

ফলে মুহম্মদের (সঃ) মদীনায় প্রাপ্ত ঐশীবাণীতে পূর্বের ন্যায় সরলতা বা কাব্যিক সৌন্দর্য নাই। এইগুলি অনেকটা পুনারাবৃত্তি ও বাগবহুল।* মক্কার বাণীগুলি যেখানে সাবধানকারী ও মিনতিপূর্ণ, সেইখানে মদীনারগুলি আদেশ ও ভীতিপ্রদর্শনমূলক। কোরানিক আইনের তালিকার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পার্থিব আইন-কানুন রহিয়াছে। সেইগুলি হইল ওজু, ব্যাভিচার, ভিক্ষা, মধ্যস্থতা, যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, চুক্তি, তালাক, মদ্যপান, বিবাদ, ক্ষমা, সাধারণ আচরণ, ভাল, মূর্তিপূজা, ন্যায় বিচার, বিবাহ, এতিম মাতাপিতা, যুদ্ধ, মেয়েলোক, প্রার্থনা প্রভৃতি। এইগুলি ইসলামি সম্প্রদায়ের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর আদেশাবলী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন জাতির

---

* *লেখকের এই উক্তির সহিত আমরা একমত নহি। বস্তুত মদীনায় অবতীর্ণ সুরাগুলি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত সুরায় ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ "বিজয়ের যুগে অবতীর্ণ মদীনার সূরাহসমূহ দীর্ঘ, বাগবহুল এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ। এইগুলিতে ধর্মীয় বিধিসমূহ এবং নামাজ, রোজা, হজ্জ ও পবিত্র মাসসমূহের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইগুলিতে আরও রহিয়াছে মদ, শুকর, জুয়াখেলা নিষিদ্ধকারী আইনসমূহ, জাকাত ও জিহাদের ব্যাপারে রাজস্ব ও সামরিক আইন-কানুন, খুন, প্রতিশোধ গ্রহণ, চুরি, সুদ খাওয়া, বিবাহ ও তালাক, অবৈধ যৌনক্রিয়া এবং ক্রীতদাস মুক্ত করা সংক্রান্ত বেসামরিক ও ক্রিমিনাল আইনসমূহ P. K.Hitti : History of the Arabs. Macmillan & Co. Ltd. London. 1953 পৃঃ 124 – অনুবাদক।*

ধর্মানুসারিগণ বিভিন্ন সময়ে এই আইনগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু তাহারা কিছুই করিতে পারেন নাই।

একটি ঐশ্বরিক শাসনে ধর্ম ও রাষ্ট্র অবিভাজ্য। আধুনিক মুসলমান উভয় সংকটে পড়িয়াছে। একদিকে মুসলমান হিসাবে সে নিজের জাতিত্বকে তাহার ধর্মের সহিত চিহ্নিত করিতে চায়, অপরদিকে একজন আধুনিক হিসাবে সে এমন একটি সমাজ চায়, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক। এ ব্যাপারে যথাযথ পন্থা নির্বাচন কঠিন ও বিপ্লবাত্মক। তুরস্ক এখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ এই রীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পরিতেছে না। আধুনিক অর্থে তুর্কী বলিতে তুরস্কের অধিবাসী যে কোনো ধর্মাবলম্বীকে বুঝায়- এমনকি সে নাস্তিক হইলেও, কিন্তু জনসাধারণ একজন 'তুর্কী' বলিতে মুসলমানকেই বুঝায়। তুরস্কের সমস্ত অমুসলিম নাগরিকগণ নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত, তুর্কি হিসাবে নহে। এই রাষ্ট্রে 'মুসলমান' বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী একজন আধুনিক যুবক ধর্মের প্রতি অনুগত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। তাহার ধারণা ইসলামি মতবাদে ধর্ম ও জাতীয়তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে খাঁটি ধর্মীয় আনুগত্য ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সে ইসলামের প্রতি অনুগত থাকিতে পারে।

মদীনায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল 'ইহুদী সমস্যা'। পুর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মদীনা শহরে অনেক ইহুদী বসবাস করিত। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেকে একজন ইহুদী খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের নবী বলিয়া বিবেচনা করেন।* ঐতিহাসিকগণ একমত যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আশা করিয়াছিলেন ইহুদী খ্রিষ্টানগণ তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন দান করিবে। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের তুলনায় ইহুদী ধর্মের প্রতি অধিক নৈকট্য অনুভব করিতেন বলিয়া মক্কায় ইতিমধ্যেই তিনি অনেকগুলি ইহুদী আচার-অনুষ্ঠান পালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেইগুলি হইল রোজা রাখা, জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়া ইত্যাদি। মদীনায় আগমনের পর তিনি আশা করেন ইহুদিগণ তাঁহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং পৌত্তলিকতার নির্মূল সাধনে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। এই ব্যাপারে তাঁহার ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মদীনার ইহুদিগণ তাঁহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিতে শুধু অস্বীকারই করে নাই বরং তাঁহাকে ছলনাকারী হিসাবে ঠাট্টা করিয়াছে এবং তৌরাত সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার জন্য তাঁহাকে বোকা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে তৌরাত বিকৃত করিবার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এবং একজন আরবকে 'মসিহ' হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তবুও মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার আশায় অটল থাকেন।

"ওহে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহর প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হও
এবং তাঁহার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগকে
তাঁহার দ্বিগুণ দয়া প্রদান করিবেন.........।"

-(আল-কোরআনঃ ৫৭)

"তিনি ইহুদীদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, ধর্মগ্রন্থপ্রাপ্ত লোকদের (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ) জানা উচিত, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা প্রদান করেন।"

-(আল- কোরআন ঃ ৫৭)

---

* *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৫।*

এই সমস্ত এবং এই ধরনের অন্যান্য যুক্তিগুলি যখন দৃঢ়ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইহুদীদিগকে আল্লাহর বাণী বিকৃত করিবার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি হত্যা ও নির্বাসনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুহম্মদ (সঃ) এবং মক্কাবাসীদের* মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে মদীনা ও উহার আশপাশের ইহুদিগণ নিরপেক্ষ ছিল নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহা এতদিন পরে নিরূপণ করা কঠিন। তবে নিশ্চিত বলা যায়, মুহম্মদ (সঃ) তাহাদিগকে শক্র জোটের (অর্থাৎ মদীনা আক্রমণকারী মক্কাবাসী ও বেদুইন গোত্রসমূহ) পক্ষাবলম্বনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। অন্যূন ৬২৫ খিস্ট্রাব্দে মুহম্মদ (সঃ) বনি নাজির নামে একটি ইহুদি গোত্রকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করেন। দুই বৎসর পর বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বনি কোরাইজা গোত্রের আনুমানিক ৬০০ লোককে কতলের শাস্তি প্রদান করা হয়, এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্বাসিত করা হয়। ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে মদীনার উত্তরে খয়বর নামে একটি মরুদ্যানের ইহুদীদিগকে নির্বাসিত করা হয়। এইসব ইহুদীর সম্পত্তি মদীনায় মুহম্মদের (সঃ) সহিত মিলিত হইবার জন্য আগত মুহাজিরিনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইহুদীদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার জন্যই বোধহয় মুহম্মদ (সঃ) একটি স্বাধীন কর্মসূচি গ্রহণ করেন এবং একটি আরব ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত নেন। ইহুদী খ্রিষ্টান ঐতিহ্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু তিনি দাবি করেন, ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ আল্লাহর আদেশাবলী অমান্য করিয়াছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করিয়াছে। যিনি ইহুদী রীতি অনুসারে উত্তরে জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন তিনি দক্ষিণে মক্কার দিকে মুখ ঘুরাইয়া ফেলেন। তখন হইতে সমস্ত মুসলমান মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় করে। তখন তাহারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। দেব দেবীর মূর্তি স্থাপনের দরুন যেহেতু কাবাগৃহকে অপবিত্র করা হইয়াছে, সুতরাং মুহম্মদের (সঃ) কর্তব্য হইল মূর্তিগুলি ধ্বংস করিয়া আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা। শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের পবিত্র দিন। মুহম্মদ (সঃ) শুক্রবারকে পবিত্র দিন হিসাবে বাছিয়া লন। শিঙ্গা ফুকিয়া ইহুদিগণ লোকদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিত এবং খ্রিষ্টানগণ ঘণ্টার দ্বারা ডাকিত। মুহম্মদ (সঃ) আজান বা মানুষের কণ্ঠ ব্যবহারের প্রচলন করেন। একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করিবার নিমিত্ত তিনি নামাজ, রোজা, আহার্যের আইন-কানুন ও অন্যান্য রীতিনীতিতে অনেক পরিবর্তন সূচনা করেন।

তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যাহা হযরত মুহম্মদ (সঃ) সমাধান করেন তাহা হইল মক্কাবাসীদের সঙ্গে তাঁহার ব্যবহার। এই চিন্তা বোধহয় তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল মক্কায়, এবং মদীনায় আগমনের প্রথম দিকে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যিশু এবং অন্যান্য নবিগণ যেইভাবে আল্লাহর বাণীর প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি সেইভাবে ছাড়িয়া দিবেন না। বরং মুসার (আঃ) ন্যায় তিনি পৃথিবীর উপর স্বয়ং আল্লাহর প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহা একমাত্র কূটনীতি, যুদ্ধ ও বিজয়ের মাধ্যমে করা সম্ভব। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান পর্যন্ত এই দশ বৎসর মদীনায় থাকাকালীন

---

* *নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪২।*

মুহম্মদ (সঃ) প্রায় প্রত্যেক বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এই যুদ্ধের প্রায় প্রত্যেকটিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। আরবদের উপর ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই মূলত এই সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। যেহেতু মক্কা নগরী ছিল সবচাইতে শক্তিশালী বিপক্ষ সেই হেতু হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই নগরীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই হযরত মুহম্মদ (সঃ) কে মক্কা হইতে আগত তাঁহার অনুসারীদের এবং মদীনায় তাঁহার সমর্থনকারীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার কাফেলাগুলির উপর আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের দ্বিতীয় সালে যুদ্ধমুক্ত রমজান মাসে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী একটি সম্পূর্ণ কাফেলার খবর পাইয়া তিনি উহা আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া আবু সুফিয়ান সাহায্যের জন্য মক্কায় খবর দেন। অন্যূন ৯০০ মক্কাবাসী ও ৩০০ মুসলমান মদীনার ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের বদর নামক স্থানে যুদ্ধে মিলিত হয়।

যুদ্ধটি ছিল সংক্ষিপ্ত, ছোট এবং উন্মত্ত। হযরত মুহম্মদ (সঃ) জয়লাভ করেন। কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ইহাকে গুরুত্বহীন যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিক ইহাকে যুদ্ধসমূহের যুদ্ধ, 'গজওয়াত' হিসাবে অভিহিত করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের একটি। হযরত মুহম্মদ (সঃ) যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হইতেন তবে ইসলাম খুব সম্ভবত অংকুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। তবে এই বিজয় হযরত মুহম্মদের (সঃ) নেতৃত্বকে দৃঢ় করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন। কোরআন বলিয়াছে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে ইতিমধ্যেই বদরের যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছেন।' এই বিজয়কে অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং এই খবর মরুভূমির চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তী যুদ্ধসমূহে মুসলমানগণ পূর্ণ আস্থা পোষণ করেন যে, তাহারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যারা মারা যান তাঁহারা শহীদ হইবেন এবং বেহেস্তে যাইবেন, আর যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইবেন। এই প্রথম যুদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায় যাহাতে আল্লাহর সৈনিকগণ বার বার শাহাদৎ বরণের নিমিত্ত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধে যোগদান করেন।

কিন্তু মক্কাবাসিগণ এই যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পর বৎসর ৩০০০ সৈন্যের নেতৃত্ব লইয়া আবু সুফিয়ান যুদ্ধে অগ্রসর হন। মরুভূমির অধিকাংশ যুদ্ধে স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য সঙ্গে যাইত। কথিত আছে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে একজনকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া যাইতেন।* উভয় পক্ষ ওহুদে মিলিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত মুহম্মদ (সঃ) অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আহত হন। ক্ষতির কারণ ছিল মদীনার একটি গোত্রের অবাধ্যতা। যাহাই হউক, কোনো অজ্ঞাত কারণে মক্কাবাসিগণ তাহাদের বিজয়ের ফল লাভ করিতে পারে নাই। হযরত মুহম্মদও (সঃ) অনতিবিলম্বে তাঁহার ক্ষতি কাটাইয়া উঠেন।

---

* *নীতি অনুসারে রসূলুল্লাহ (সঃ) আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে নিতেন না। নবীর মহিলাগণ যুদ্ধে থাকিতেন না। নবীর মহিলাগণ যুদ্ধে থাকিতেন উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য নহে, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য।- অনুবাদক।*

মক্কার বিরুদ্ধে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরবদিগকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু মক্কাবাসিগণ হযরত মুহম্মদের (সঃ) সেনাবাহিনীকে তাহাদের কাফেলা আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিতে পারে না। পূনরায় ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবু সুফিয়ান মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হন। নগরের ভিতরে থাকিয়া হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটিমাত্র প্রবেশদ্বার রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাও খুবই দুষ্কর হইত যদি তিনি পারস্যবাসি সলমানের পরামর্শ অনুসারে পরিখা খনন না করিতেন। সলমান সম্ভবত একজন পারস্যবাসি অফিসারের আরব আর্দালী ছিলেন। তাঁহার অনুসারীদের বিরক্তির মুখে হযরত মুহম্মদ (সঃ) পরিখা খনন করেন। এই ধরনের যুদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মক্কাবাসীগণও এরূপ কাপুরুষতা পন্থায় বিরক্ত হন। কাপুরুষতা হউক বা না হউক, ইহাতে কাজ হইয়াছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত হযরত মুহম্মদের (সঃ) উদ্দেশ্যে অপমানজনক কবিতা আবৃত্তি করিয়া মক্কাবাসিগণ অবরোধ তুলিয়া বাড়ির দিকে ফিরিয়া যায়। এই যুদ্ধকে খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়।

ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ না করিলেও এইসমস্ত যুদ্ধে মক্কাবাসিগণ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপর দিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) হারাইবার মত তেমন কিছু ছিল না এবং অনুভব করেন অবস্থা তাঁহার অনুকূলে। অধিকন্তু জেরুজালেম হইতে মক্কার দিকে কেবলা বা নামাজের দিক পরিবর্তন এবং কাবার প্রতি তাঁহার সম্মান প্রদর্শন প্রমাণ করে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কাকে পবিত্র মনে করিতেন। এই কারণে মক্কার হজ্জযাত্রাকে তিনি তাঁহার নূতন ধর্মের অংশ হিসাবে পরিগণিত করেন। এইভাবে হজ্জের স্থান হিসাবে মক্কা ইহার অর্থনৈতিক প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখে এবং এই পূর্ণ নিশ্চয়তায় মক্কাবাসিগণ যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইয়া যাওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তিপূর্ণ কারণ খুঁজিয়া পায় না। হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার দিক হইতে সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কূটনীতিকে তরবারীর উর্ধ্বে স্থান দেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদন করেন। মুসলমান ও মক্কাবাসিগণ এই সন্ধির মাধ্যমে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং মুসলমানদের মক্কায় হজ্জ পালনের কোনো বাধাই থাকে না।

এই সন্ধির মাধ্যমে দুই নগরীর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়। কোরাইশদের অনেক প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খালেদ-ইবন-আল-ওয়ালিদ ও আমর-ইবন-আল-আ'স, যাঁহারা পরে ইসলামের দুইজন খ্যাতনামা সেনাপতিতে পরিণত হন। দশ বৎসরের জন্য স্বাক্ষরিত এই হোদাইবিয়ার সন্ধির দুই বৎসর পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) সসৈন্যে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হইবার কারণ খুঁজিয়া পান। সম্ভবত মক্কাবাসী তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবে না এই মর্মে তিনি নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছিলেন। নূতন ধর্ম কা'বার প্রতি ইহার সম্মান অক্ষুণ্ন রাখিয়া কোরাইশদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে। এই অবস্থায় স্বয়ং আবু সুফিয়ান আসিয়া তাঁহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। অন্যরাও তাঁহাকে অনুসরণ করেন হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিজয়ীর বেশে তাঁহার জন্ম নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি কাবার চারিদিকে সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং ইহাকে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তাঁহার গোত্রের পরাজিত লোকদিগের প্রতি তিনি মহানুভবতার পরিচয় দেন এবং মদীনাবাসীদিগকে স্বস্তি দিবার জন্য মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া ইহাকে রাজনৈতিক রাজধানী হিসাবে চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে ইসলামের ধর্মীয় রাজধানী হিসাবে মক্কার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) কাজ তখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আরবকে একত্রিত করা। তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শীঘ্রই ওমান, হাদ্রামাউত এবং এমনকি-ইয়ামেনসহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর অনুষ্ঠানটি ছিল খুব সরল। মৌখিক স্বীকৃতি এবং জাকাত বা দরিদ্র–কর প্রদানের অঙ্গীকার একটি গোটা গোত্রের নূতন ধর্মে প্রবেশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা বিশ্বাসের বসে আসিত–নাকি প্রয়োজনের খাতিরে আসিত তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হিজরতের দশম বৎসরে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার শেষ হজ্জ সমাপনের জন্য মক্কা যান। তিনি তখন সর্বজনস্বীকৃত আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং আরবের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন যাহা ইহার শ্রোতাদের স্মরণে চির-অম্লান থাকিয়া যায়। ইহা 'বিদায় ভাষণ' নামে পরিচিত।

এই ভাষণে তিনি তাঁহার অনুসারীদের বলেন, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই। এইভাবে তিনি তাঁহার আনুগত্যকে গোত্রীয় আনুগত্যের উপর স্থান দেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদিগকে আরও উপদেশ প্রদান করেন, ধর্মীয় বন্ধন রক্তের বন্ধনের চেয়ে অধিক পালনীয়। অনুমতি ছাড়া তাঁহার অনুসারীদের একে অপরের জিনিসে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিয়া তিনি বস্তুতঃপক্ষে লুণ্ঠনাক্রমণ বন্ধ করিয়া দেন। ইহার তিন মাস পর (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রিঃ) তিনি তাঁহার প্রিয় স্ত্রী আয়েশার হাতের উপর মস্তক রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি যে স্থানে পরলোকগমন করেন, সেই স্ত্রীর ঘরের মেঝেয় তাঁহাকে করব দেওয়া হয়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রাখিয়া যান– যাহা একটি সশস্ত্র শিবিরও বটে। ইহার নামাজের স্থান একাধারে বিচারালয় এবং সামরিক কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টার। তিনি এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন যাহাতে বংশগত উত্তরাধিকারীর দাবি অস্বীকৃত। প্রত্যেকটি মুসলমান সামরিক তালিকাভুক্ত এবং নামাজের ইমাম যুদ্ধের অধিনায়ক। হাদিসে উল্লেখ আছে তিনি তাঁহার সমসাময়িক নরপতিদের নিকট পত্র লিখেন এবং তাঁহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। যাহা তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এখন আরবদের একজন নবী ও একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ' এবং মানুষের ন্যায়ই তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা ছিল। তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী যদ্বারা অনেক বৎসর পরও তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহার আচরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় এবং তাঁহার প্রত্যেকটি কথা অধ্যয়ন করে। তাঁহার জীবন বংশানুক্রমে ব্যক্তিগত ধর্মপরায়ণতা ও সরকারি নীতির আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলাম-আল্লাহর বাণী

হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রধান পদবী রাসুলুল্লাহ, 'আল্লাহর বার্তাবাহক'। মুসলমানরা সর্বদাই বার্তাকে উহার বাহক মুহম্মদের (সঃ) উপর প্রাধান্য দিয়া আসিতেছে। খ্রিষ্টান ধর্মের যিশুর ন্যায় মুহম্মদ (সঃ) ইসলামের কেন্দ্র নহেন। কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে খ্রিষ্টানরা যেরূপ খ্রিষ্টের লোক, মুসলমানেরা অনুরূপ মুহম্মদের (সঃ) লোক নহে। বরং তাহারা গ্রন্থের লোক। এই গ্রন্থ পবিত্র কোরআন—যাহা আল্লাহর বার্তা।

এই বার্তাকে বলা হয় ইসলাম এবং যাহারা ইহা গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বলে মুসলিম। 'ইসলাম' শব্দটি আবার তিনটি ব্যঞ্জনবর্ণের মূল 'সলম' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ 'আনুগত্য'। শব্দটির আরেক অর্থ 'শান্তি', কারণ যুদ্ধে শত্রুর আত্মসমর্পণের (আনুগত্য) পরই আসে শান্তি। এই কারণে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে আরবি অভ্যর্থনা 'আস-সালামু আলাইকুম'— অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক'। বিংশ শতাব্দীর কোনো কোনো অতি আধুনিক মুসলমান দাবি করেন ইসলামের অর্থ 'শান্তির ধর্ম'। তবে ইতিহাসগতভাবে ইসলামের অর্থ 'আনুগত্যের ধর্ম' —আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য। মূল সলমের উপর ভিত্তি করিয়া বিবেচনা করিলে ইসলামের ব্যকরণসিদ্ধ গঠন অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায় বশ্যতা। মুসলিম অর্থ- 'যে বশ্যতা স্বীকার করিল', মুসলিমা অর্থ- 'যে (স্ত্রীলোক) বশ্যতা স্বীকার করিল'। অনারব ইসলামি দেশে 'মুসলিম' শব্দের পরিবর্তে 'মুসলমান' ব্যবহার করা হয়।

এই ব্যাখ্যায়, যে-ই আল্লাহর ইচ্ছার উপর আনুগত্য প্রকাশ করে সে-ই মুসলমান। কারণ এই শব্দের সরল অর্থ হইতেছে— সে আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। ইসলামের বর্ণনা অনুসারে প্রথম যিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তিনি ইব্রাহীম (অঃ)। অবশ্য এই অর্থে একজন ইহুদী যেমন 'মুসলমান' তেমনি একজন খ্রিষ্টানও। ইসলামের এই ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং কোনো একদিন ইহা সর্বজনীন হইবার ক্ষেত্রে কাজে আসিতে পারে। তবে, আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে শুধুমাত্র একটি অতি ক্ষুদ্রশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এমন ব্যাপক ভিত্তিতে চিন্তা করেন, তাঁহারা সুফী। ইসলামের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যাটিই ইতিহাসগতভাবে সঠিক। অতএব, ইসলাম অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা। ইহার রূপ আল্লাহর বার্তাবাহক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিকট যথাযথ অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইসলাম নামে প্রচলিত ধর্ম আল্লাহর ইচ্ছার নিকট ব্যক্তি বিশেষের আত্মসমর্পণের কিছু শর্ত রহিয়াছে। মানুষ আল্লাহর আওতাধীন বসবাস করিতে স্বীকৃত— এই স্বীকৃতির স্বরূপ তাঁহার বার্তাবাহকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত কাজ আল্লাহ কর্তৃক জারিকৃত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের তুলনায় ইসলাম আইনের আলোচনাকে প্রধান্য দিয়া থাকে। আইনকে ইসলাম ধর্মতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে।*

---

* নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১১।

ইসলামি বিশ্বে আল্লাহর আইন বা শরিয়ত অধ্যয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান। প্রথমে একটি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব আইনের পটভূমি প্রদান করে। এই তত্ত্বের রূপরেখা এবং ব্যবহারবিধি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই রূপ পবিত্র কোরআনের পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যায়।

বশ্যতার শর্তাবলী কমপক্ষে দশটি। ইহাদের পাঁচটি হইল বিশ্বাস বা ঈমান সংক্রান্ত, বাকী পাঁচটি অনুশীলন বা ধর্মীয় বিধি সংক্রান্ত—যাহার অপর নাম ইবাদত।

'ঈমান' ঃ বিশ্বাস

১। আল্লাহর একত্ব ঃ ইসলামের প্রথম ও সর্বপ্রধান নীতি হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (সম্পূর্ণভাবে) আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই। আল্লাহর একত্ব ইসলামি বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি। ইহা ছাড়া সবকিছু বাতুল বা অর্থহীন। খ্রিষ্টান ধর্মের ত্রিত্বকে (Trinity) পবিত্র কোরআন (১১২ অধ্যায় পূর্বে বর্ণিত)** আল্লাহর প্রতি অপবাদ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইসলাম ধর্মের মতে শিরক বা আল্লাহর অংশীদার হইবার ধারণাটিকে ক্ষমাহীন পাপ মনে করা হয়। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর্তা, আইনদাতা, বিচারক, প্রতিপালক, ত্রাণকর্তা ও আদেশকারী। আল্লাহ অনেক গুণের বা সিফাতের অধিকারী— তিনি করুণাময় ও দয়ালু। কিন্তু এই গুণাবলী তাঁহার মহিমা, শক্তি ও ক্ষমতার নিকট ম্লান হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ তাঁহার নামের আসমা-উল-হুসনা', মাধ্যমে সর্বাধিক পরিচিত। তাঁহার নাম ও গুণাবলী সমার্থক বলিয়া মনে হয়। মুসলমানদের তসবিহর মধ্যে ৯৯টি পুতি আছে, যেগুলির প্রত্যেকটি আল্লাহর ৯৯টি নামের প্রতিনিধিত্ব করে। এইসব নামের কয়েকটি হইল নাসির, 'বিজয়ী'- ফাতাহ্ 'উন্মুক্তকারী', কাহ্হার- 'পরাস্তকারী', ও ওয়াহ্হাব - 'প্রদানকারী'। এক শক্তিশালী ও সর্বোৎকৃষ্ট আল্লাহর উপর এই আপোসহীন বিশ্বাসই যে ইসলামের শক্তির প্রধান উৎস তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য রহিয়াছে। পরবর্তীকালের মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এইসব সমস্যা লইয়া অনেক বিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তবে ইসলামে এই আলোচনাগুলিকে বুদ্ধিপ্রসূত আমোদ-প্রমোদ বলিয়া গণ্য করা হয় যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে অনাবশ্যক। একজন মুসলমান বুদ্ধিগতভাবে যত সজাগই হউন না কেন তাহার মধ্যে একটি আত্মসমর্পণমূলক (ইসলাম) উপলব্ধি রহিয়াছে, এই উপলব্ধি অপরিবর্তনীয়।

২। **নবুয়ত ঃ** ইসলাম মূলত যুগধর্মী। ইহা বিশ্বাস করে মানব ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং শেষ বিচার সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য কাহাকেও না কাহাকেও প্রেরণ করিয়াছেন। কোরআনে এইসব মানুষকে প্রায়ই নবী— প্রত্যাদৃষ্ট ব্যক্তি, বা রসুল— 'বার্তাবাহক' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ ও ইহুদীদের ইয়াহওয়ে এবং খ্রিষ্টানের স্বর্গীয় পিতা একই ধারণার অভিব্যক্তি, সেহেতু আদম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) পর্যন্ত যে সমস্ত মহাপুরুষ প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহারা ইহুদী-খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের অধিকারী। অনুরূপ মানবজাতির ইতিহাসকেও একই ইহুদী-খ্রিষ্টান ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। যাহারা ইতিমধ্যে বা ভবিষ্যতে এই প্রকৃত ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সহিত অর্থাৎ ইসলামের সহিত নিজদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে বা করিবে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে মানবেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্যদের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ

** উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৫।

আল্লাহর বার্তাবহ নহে ও তাহাদের গ্রন্থসমূহ আল্লাহর বাণী হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে।

আল্লাহ যুগে যুগে বার্তাবাহক (নবী) প্রেরণ করিয়াছেন। আদম (আঃ) হইলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। ইব্রাহীম (আঃ) শুধু একজন নবীই নন বরং তিনি প্রথম মুসলমানও বটে। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং যেখানে তাঁহাকে যাইতে আদেশ করা হইয়াছিল সেখানেই তিনি গিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলামি মতানুসারে মুসা, দাউদ, যিশু (ঈসা) এবং তৌরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত মহাপুরুষগণই (আঃ) বার্তাবাহক বা নবী। তবে বহুসংখ্যক নবীর মধ্যে পবিত্র কোরআনে মাত্র ২৮ জনের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চারিজন আরব– যাঁহাদের বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ নাই। ইহাদের একজন হইলেন "দুই শিং বিশিষ্ট" যাঁহাকে ব্যাখ্যাকারিগণ মহান আলেকজান্ডার বলিয়া বিশ্বাস করেন। অসমসাহসিক কার্যাবলীর জন্য এই ব্যক্তিটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি উপকথার নায়ক হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

হযরত মুহম্মদকে (সঃ) শেষ নবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কখনও কখনও তাঁহাকে 'শীলমোহর' হিসাবে বা অধিক সচরাচর তাঁহাকে খাতাম-উন-নবীঈন "নবীগণের সমাপ্তি ঘোষক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁহার পর আর কোনো নবী হইবে না। আল্লাহ মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতিতে এতগুলি নবী পাঠাইয়াছেন– এই কথা চিন্তা করিয়া উপসংহারে উপনীত হইতেও কিছুটা বিসদৃশ লাগে যখন আমরা অনুভব করি তিনি ১৩০০ বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে আরেকজন পাঠাইবেন না। এই অনুমান মুসলমানদের নিকট অনেক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। শিয়া সম্প্রদায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) শেষ নবীত্বের কথা স্বীকার করিয়াও বারজন ইমামে বিশ্বাস করে যাঁহারা মুহম্মদের (সঃ) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উত্তরাধিকারী ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রশাখা।* আধুনিক বাহাই মতাবলম্বিগণ ইসলামের মূল যুগধর্মী চরিত্র গ্রহণ করিয়া হযরত মুহম্মদের (সঃ) শেষ নবী হইবার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

বোধ হয় অধিকাংশ মুসলমান হযরত মুহম্মদকে (সঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে কোরআনে এই ধরনের বিশ্বাসের কোনো শাস্ত্রীয় তত্ত্ব নাই। মুহম্মদ (সঃ) একাধিকবার স্বীয় অতিমানবীয় ক্ষমতার কথা বা কোরআন ব্যতীত অন্য কোনো অলৌকিক ঘটনার কথা অস্বীকার করিয়া নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলিতেন। তিনি এবং ইব্রাহীম, মুসা ও যিশু (ঈসা) সমমর্যাদার নবী (আঃ) যাহাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রধান নবী হিসাবে গণ্য করা হয়। শেষোক্ত হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই জন্য যে, তিনি আল্লাহর নিকট হইতে সর্বশেষে বাণী পাইয়া আসিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে এই চারি জন প্রধান নবীর বিশেষ বিশেষ উপাধি রহিয়াছে। ইহা হযরত মুহম্মদের (সঃ) ব্যক্তিগত বিনয়ের পরিচয় বহন করে যে, তাঁহার উপাধি সবচাইতে শিষ্ট। কোরআনে ইব্রাহীমকে (আঃ) বলা হয় খলীলুল্লাহ, 'আল্লাহর বন্ধু', মুসাকে (আঃ) বলা হয় কলীমুল্লাহ 'আল্লাহর মুখপাত্র', যিশুকে বলা হয় রূহুল্লাহ্ 'আল্লাহর আত্মা' এবং কালীমাতুল্লাহ্, 'আল্লাহর কথা। মুহম্মদকে (সঃ) বলা হয় রসুলুল্লাহ, 'আল্লাহর বার্তাবাহক' এবং কোনো কোনো সময় শুধু নবী, বার্তাবাহক।

৩। **ধর্মগ্রন্থ** ঃ আল্লাহর একত্ববাদের পর ইসলামে ইহা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টান ধর্মে নিউ টেস্টামেন্ট (ইঞ্জিল) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানত এই জন্য যে ইহা যিশুখ্রিষ্টের জীবনচরিত যিনি এই ধর্মের মূলকেন্দ্র। অপরদিকে ইসলামে হযরত মুহম্মদ (সঃ) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানত এই

* নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৬।

জন্য যে তিনি সেই গ্রন্থের (পবিত্র কোরআন) বাহক যাহা এই ধর্মের মূলকেন্দ্র।

নবীদিগকে পাঠাইবার সময় আল্লাহ প্রত্যেককে এক একখানি গ্রন্থ দান করেন। প্রত্যেক গ্রন্থই সেই যুগের মানুষের পথ প্রদর্শনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বহন করে। কোনো কোনো সময় আল্লাহ তাঁহার একজন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর নিকট এই ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করেন। ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর শেষ গ্রন্থ পবিত্র কোরআন শেষ নবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিকট পড়িয়া শুনান বলিয়া সাধারণ বিশ্বাস। রক্ষণশীল মুসলমানদের মতে পবিত্র কোরআন আল্লাহর কথা– কালাম যাহা সৃষ্টি করা হয় নাই। অন্য কথায়, আল্লাহ কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেও কোরআন ছিল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে এই ধর্মগ্রন্থ আল্লাহর অসৃষ্ট কথা। আল্লাহর বাণীর মূর্তরূপ হিসাবে ইহার আলোচ্য বিষয়ে চরম উৎকর্ষতা কিম্বা ইহার ভাষায় পরম সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা অননুকরণীয়। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদের (সঃ) প্রদত্ত একমাত্র অলৌকিক জিনিস হইল ইজাজ বা অলৌকিক কোরআন। রক্ষণশীল ইসলামি মতে গোপনীয় না রাখিয়া বা সমালোচনা না করিয়া ইহাকে অনুকরণ করিতে হইবে। শিরক– 'পৌত্তলিকতা' যেরূপ মারাত্মক পাপ, তদরূপ বেদায়াত–কোরআনের আইন পরিবর্তন বা ঐগুলি হইতে বিমুখ হওয়াও দণ্ডনীয় অপরাধ।

সমস্ত পন্থা ও বিধিবিশ্বাস ও অভ্যাস পবিত্র কোরআনসম্মত হইতে হইবে। মুহম্মদের (সঃ) নিকট কোরআন বিভিন্ন সময় 'অবতীর্ণ' বা নাযিল হইয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন। অতএব মুহম্মদ (সঃ) কোরআনের প্রণেতা নহেন। আল্লাহ ইহার গ্রন্থকার এবং মুহম্মদ (সঃ) প্রকৃতপক্ষে ইহার লিপিকার। হযরত মুহম্মদের (সঃ) গুরুত্ব কোরআনের একটি প্রতিফলন মাত্র। মুসলমানগণ এই মহাগ্রন্থ এবং কোরআনের অনুসারী– যাহার মধ্যে ইসলামের শর্তাবলী, আত্মসমর্পণ, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা মুহম্মদের (সঃ) অনুসারী নয় এবং অনুরূপভাবে নিজেদেরকে মুহম্মদীয় বলাটা পছন্দ করে না। কোরআন যেহেতু মুহম্মদের (সঃ) নিকট আরবি ভাষায় প্রেরিত হইয়াছে সেহেতু রক্ষণশীলগণ সর্বদা ইহার অনুবাদের প্রতি বীতস্পৃহ। বিশ্বের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ আরবি জানে না। কিন্তু প্রায় সমস্ত মুসলমান তাহাদের ভাষায় আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা মোটামুটি কোরআন পাঠ করিতে পারে– যদিও ইহার বেশির ভাগ তাহারা বুঝে না। আল্লাহর প্রকৃত শব্দাবলী বার বার পাঠ করিবার মধ্যে পূণ্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানী মতে, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টও (তৌরাত ও ইঞ্জিল) আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ) নবীদ্বয়কে দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কোরআন যেহেতু সর্বশেষ আল্লাহর বাণী সেই জন্য ইহার পূর্ববর্তী সবগুলি ইহা দ্বারা বাতিল হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও ইহা অধিক কার্যকরী।

মহাগ্রন্থের মতবাদ ইসলামে সহনশীলতা ও কঠোরতা প্রদান করে। ইহা মুসলমানদিগকে ইহুদী ও খ্রিষ্টান এবং পরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে সহনশীল করিয়াছে। এই মহাগ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম সমগ্র মানব জাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে- মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি এবং মহাগ্রন্থহীন জাতি। ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ আহলি-কিতাব, 'মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি'। এই জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত না হইলে তাহাদিগকে ইসলামের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্মে থাকিতে দেওয়া উচিত। এই মতবাদের ফলে ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ যথেষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ মুসলমানদের মধ্যে বাস করিবার সুযোগে পাইয়াছে। বস্তুত খ্রিষ্টান ইউরোপে যখনই ইহুদীদের উপর উৎপীড়ন

চালানো হইয়াছে তাহারা তখনই মুসলিম দেশে গিয়া শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মহাগ্রন্থের মতবাদ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে 'মিল্লাত' বা স্বায়ত্তশাসিত 'সম্প্রদায়' নামে পরিচিত পদ্ধতির উৎস। উল্লেখ করা যাইতে পারে মিল্লাত এমন একটি শব্দ যাহা ধর্মীয় শ্রেণীর ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অনারবদের মধ্যে কোনো কোনো সময় ইহা রাজনৈতিক জাতীয়তা প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়।

অধিকন্তু এই মতবাদ কিছুটা সুযোগ-সুবিধাও সৃষ্টি করে। ইরানের জরথুস্ত্রদিগকে 'মহাগ্রন্থহীন জাতি' হিসাবে গণ্য করা হইত। ফলে ইসলামি বিশ্বে তাহাদের কোনো স্থান ছিল না। প্রাথমিক বিজয়ীদের নিকট যখন প্রতীয়মাণ হয় যে সবাইকে দীক্ষিত, হত্যা বা নির্বাসিত করা যায় না তখন তাহাদের 'ব্যাপারে' কিছুটা সহনশীলতা অবলম্বন করিতে হয়। ফলে জরথুস্ত্রদেরকে 'মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে সরকারিভাবে এই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করা না হইলেও আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) ও অগণিত সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ভারতবর্ষের মুসলিম রাজন্যবর্গ এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের সহিত (মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতিদের ন্যায়) ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তবে আধুনিক মুসলমানদের জন্য মিল্লাত পদ্ধতিটি যেমন বিরক্তিকর তেমনি একটি হতবুদ্ধির কারণও বটে। ইহা বরং সুস্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য হইতে আমদানিকৃত জাতীয়তার ভাবধারা প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক এবং ইহা দ্বারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ একই জাতিতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা আবার জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ইসলামী ভাবধারার সহিত সংঘাতেরও সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর মুসলিম দেশসমূহ একদিকে গণতান্ত্রিক হইতে চায় এবং সমস্ত নাগরিকদিগকে সমানাধিকার প্রদান করিতে চায়, আবার অপরদিকে মুসলমানও থাকিতে চায়। ফলে তাহারা নিজেদেরকে পরস্পরবিরোধী আবর্তে জড়াইয়া ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকগুলি মুসলিম দেশে মিল্লাত পদ্ধতিও রাখা হইয়াছে আবার পাশাপাশি আধুনিক শাসনতন্ত্রও প্রদান করা হইয়াছে, যাহা সকলের প্রতি সমতার কথা ঘোষণা করে। কোনো কোনো দেশে অসমুসলিমগণ উচ্চ পদমর্যাদা আশা করিতে পারে না, এমন কি আধুনিক মুসলমানদের যথেষ্ট শুভাকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, তাহারা দ্বিতীয় স্তরের নাগরিক।

উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহাগ্রন্থের মতবাদ ইসলামে কঠোরতা আনয়ন করিয়াছে। অসৃষ্ট আল্লাহর বাণী হিসাবে কোরআন একটি নিরুদ্ধ গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। কেহ ইহার মৌলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে বা ইহাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাট করিতে পারে না। কোরআনের ধর্মীয় ক্রমবিকাশও আইনসংক্রান্ত মতবাদের ভিক্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার যে কোন প্রচেষ্টাকে গর্হিত বলিয়া গণ্য করা হয়।

৪। শেষ বিচার ঃ কোরআনের অত্যন্ত সুস্পষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে পরকালের বিষয় যথা বেহেশত, দোজখ, শেষ বিচারের দিন, পুনরুত্থান এবং কিয়ামত ও দোজখের প্রান্ত সম্পর্কে অতি সামান্য বক্তব্য আলোচনা করা হইয়াছে। এইসব ভাবধারায় মুসলমানদের বিশ্বাস খ্রিষ্টানদের ন্যায়ই। তবে স্মরন রাখিতে হইবে যে, এইখানে হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মধ্যস্থতাকারী মনে করা হয় না। একমাত্র "যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং কাজে ন্যায়নিষ্ঠ" এবং যাহারা ধর্মের জন্য শহীদ তাহারাই বেহেশতে যাইবে।

৫. ফেরেশতা ও জ্বীন ঃ কোরআনে এইগুলিকে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট জীব, যাহারা সর্বদা তাঁহার ইবাদত করে এবং

তাঁহার আদেশ পালন করে। তাহাদের কর্তব্য হইল মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা, শেষ বিচারের দিন সাক্ষী হওয়া, আল্লাহর আরশ বহন করা এবং সাধারণত যাহাদিগকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন তাহাদের কাজে লাগা। জ্বীনকেও আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্মবিশ্বাসী। কতকগুলি জ্বীনকে আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে তাহারা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে এবং নবীকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তাহাদের নেতা ইবলিস্ যে একজন ফেরেশতা ছিল কিন্তু আদমের বশ্যতা স্বীকার না করায় সে আল্লাহর আশির্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

'ইবাদত' বা অনুশীলন

একজন মুসলমানের নিকট এইগুলি ঈমানের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।* যদিও উপরে বর্ণিত দফাগুলি বিশেষ করিয়া আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং মহাগ্রন্থ একটি রীতি স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু ইবাদতের দফাগুলিকে আরকান বা ইসলামের স্তম্ভ বলিয়া গণ্য করা হয়।

১। **সাক্ষ্য** ঃ প্রত্যেক মুসলমানকে তাহার ঈমান সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে হইবে বা তাহার বিশ্বাস সম্পর্কে সাক্ষ্য শাহাদাত দিতে হইবে। ইহা প্রকৃতপক্ষে এক বাক্যে ইসলামের ধর্মমত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ "আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাইঃ মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহর বার্তাবাহক।" ইহা আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশ করে এবং আল্লাহ্র বার্তবাহক কর্তৃক প্রচারিত আনুগত্যের শর্তাবলীর স্মারক। ইসলামি বিশ্বে ইহা বার বার উচ্চারিত বাক্য। নবজাতকের কানে কানে ইহা বলা হয়, তাহার দ্বারা সমস্ত জীবনে ইহা প্রায়শঃই আবৃত্ত হয় এবং কবরে যাইবার পূর্বে ইহা তাহার মুখ নিঃসৃত শেষ বাক্য। বিশ্বাসীদিগকে নামাজে ডাকিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামের যুদ্ধসমূহে ইহা মুসলমানদের যুদ্ধানাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বাক্য একজন অমুসলিমকে ইসলামের পতাকাতলে একীভূত করে।

২। **সালাত বা নামাজ** ঃ একজন মুসলমান, পুরুষ বা স্ত্রীলোককে দৈনিক পাঁচ বার নামাজ আদায় করিতে হয়। প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, মধ্যাপরাহ্নে, সূর্যাস্তে এবং রাত্রে। নামাজ আরবিতে এবং মক্কার দিকে মুখ করিয়া পড়িতে হয়। নিয়মমাফিক নামাজের আরম্ভ হইতে শেষ অবধি অংশকে একটি রাকায়াত বলে। জোহর, আছর, এবং এশার নামাজের প্রত্যেকটিতে চারি-রাকায়াত আছে আবার মাগরিবের নামাজে তিন রাকায়াত এবং ফজরের নামাজে দুই রাকায়াত আছে। মুয়াজ্জিন মসজিদের মিনার হইতে মুসলমানদিগকে দৈনিক পাঁচবার নামাজের আহ্বান করে। আধুনিক যুগে সেই আহ্বানকে টেপরেকর্ড করিয়া লাউডস্পীকারের সাহায্যে মিনার হইতে বাজানো হয়।** যে ব্যক্তি নামাজ পড়িবে তাহাকে পাক-সাফ হইতে হইবে। এই পাক-সাফের কাজটি হইল বিধিসম্মত উপায়ে হাত ও মুখমন্ডল ধৌত করা। অতঃপর পানি দ্বারা মস্তক ও পা মর্দন করা। পানি দুস্প্রাপ্য হইলে এই সমস্ত কাজ মাটি দ্বারা করা যায়। নামাজের সময় কতকগুলি শারীরিক কসরত করিতে হয়। সেইগুলি হইল, সোজা হইয়া দাঁড়ানো, হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর রাখিয়া মেরুদণ্ড বাঁকানো, নিতম্বের উপর বসা এবং ভূমিতে প্রণত হওয়া। মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম কিন্তু বাধ্যতামূলক নহে।

---

* সুন্নী মুসলমানদের মতে, ঈমানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছুই হইতে পারে না। -অনুবাদক

** তবে এই প্রক্রিয়ায় আজান সম্পন্ন হইবে না বলিয়া সুন্নি আলেমগন মত প্রকাশ করেন।–অনুবাদক

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাগণ নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে যাইতেন, কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রচলন নাই। যেইখানে সুবিধা– বাড়িতে কর্মস্থলে বা মসজিদে নামাজ আদায় করিতে হইবে। নামাজের বেশির ভাগই মসজিদে পড়া হয় ব্যক্তিগতভাবে। সমিতিভুক্ত নামাজ ইসলামে নাই বলিলেই চলে। 'মসজিদের তালিকাভুক্তি' হইবার কোনো রেওয়াজ নাই। ইসলামে কোনো পুরোহিত শ্রেণী নাই, কোনো পুরোহিতের পদে নিয়োগের রীতি নাই এমন কি সুস্পষ্ট কোনো পুরোহিততন্ত্রও নাই। ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ সম্পন্ন করান, কাফনের কাজ সমাধা করেন এবং কোনো কোনো সময় ইসলাম প্রচার করেন তাহাদিগকে আরবিভাষী দেশগুলিতে বলা হয় ইমাম, ইরানে বলা হয় মোল্লা এবং তুরস্কে বলা হয় হোজ্জা। বড় বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে বলা হয় ওলামা–জ্ঞানী। তাঁহারা সাধারণত বিদ্যালয় ও ধর্মতাত্ত্বিক মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। মুসলিম বিশ্বে মহাবিদ্যালয়গুলিতে শুধু ধর্মপ্রচারকই সৃষ্টি করে না বরং উকিল এবং কোরআনের ভাষা আরবির শিক্ষকও সৃষ্টি করা হয়।

৩। **দান ঃ** দান বা যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। যাকাত ভিক্ষা নহে। ইসলামে দুই প্রকারের দান আছে। প্রথমটি সদ্‌কা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভিক্ষা দান, যাহা সব ধর্মেই রহিয়াছে। অন্যটি যাকাত, বাধ্যতামূলক দান, যাহা কর প্রদানের সমতুল্য। ইসলামি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই কর সমস্ত মুসলমানদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। সরকার ইহাকে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় কাজে ব্যবহার করিত। সাধারণত একজন লোকের আয় হইতে শতকরা আড়াই ভাগ প্রদানই যাকাত। অবশ্য ইহা কখনও সমভাবে কার্যকরী হয় নাই।

যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে শুধু মুসলমানদের উপরই ধার্য করা হয়। 'মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত জাতি' জিজিয়া বা ব্যক্তিগত কর নামে একটি ভিন্ন ধরনের কর প্রদান করিত। ইহা নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হইত। নীতিগতভাবে যেহেতু ইসলামের সমস্ত যুদ্ধই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য পরিচালনা করা হয় তাই অমুসলিমদিগকে এই বিশেষ কর প্রদান করিতে হয়। কোনো মসজিদ, প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় না থাকিলে সমস্ত স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সরকারই আদায় করে। জায়গা জমি এবং নগদ অর্থ আদায়কৃত এই সমস্ত দান পূর্বেও এবং এখনও ওয়াকফ বা ধর্মীয় দান-খয়রাত নামক একটি বিশেষ খাতে সরকার গচ্ছিত রাখে। সমস্ত আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে একটি সংস্থা বা ধর্মীয় দান-খয়রাত আওকাফের মন্ত্রিসভা থাকে।

৪। **সওম বা রোজা ঃ** মুসলিম পঞ্জিকার সমগ্র নবম মাসে রমজান পালন করা হয়। ইহা ইসলামের পূর্বেও আরবদের জন্য পবিত্র ছিল এবং পরেও অনুরূপ পবিত্র বোধ হয় এইজন্য যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই মাসে স্বর্গীয় আহ্বান লাভ করেন। রোজা বা উপবাস প্রাতঃকালের পূর্বে সাধারণত একবেলা খাওয়ার পর আরম্ভ হয় এবং সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া সন্ধ্যার সময় রোজা ভঙ্গ করা হয়। এই সময় রাত্রিবেলা জাগ্রত অবস্থায় এবং কোরআন পাঠে কাটানো উচিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশে রোজার সমগ্র মাসে অফিস-আদালত সকাল বেলায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কোনো কোনো সময় রেস্টুরেন্টগুলিকেও খুলিতে দেওয়া হয় না।

৫। **হজ ঃ** আর্থিক সচ্ছলতা থাকিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে অন্তত একবার মক্কায় যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি তীর্থ গমন বা হজ্জ সমাপন করে তাহাকে 'আল-হাজ্ব' উপাধি দেওয়া হয় এবং অনারব দেশে উপাধি হয় হাজী। মক্কা এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বের হজের

নিয়ম-কানুন ইসলামের বহুপূর্বে প্রচলিত নিয়ম-কানুনের মতোই।* বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রত্যেক বৎসর হজ পালন করে। এই অভিজ্ঞতা যে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত উঁচুদরের তাহা প্রশ্নাতীত। অধিকন্ত হজ বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একাত্ববোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

৬। **ধর্মীয় যুদ্ধ ঃ** কোনো কোনো মুসলমান বিশেষ করিয়া খারেজি মতবাদের অনুসারিগণ ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলিয়াছেন। কোরআনের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ এবং মুসলমানের কর্তব্য হিসাবে ইহার কথা উল্লেখ আছে। "তোমাদের যুদ্ধের আদেশ হইয়াছে যদিও ইহা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়; কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, তোমাদের জন্য যাহা উত্তম উহাকে তোমরা অপছন্দ কর।"– (কোরআন ২ ঃ ২১৬) 'অতঃপর পবিত্র মাসগুলি অতিক্রম করিবার পর পৌত্তলিকদিগকে যেখানেই আপনি পান হত্যা করুন এবং তাহাদিগকে (বন্দী) করুন এবং তাহাদিগকে অবরোধ করুন এবং তাহাদের জন্য এক একটি অতর্কিত আক্রমণের চৌকি প্রস্তুত করুন। কিন্তু তাহারা যদি অনুতাপ করে এবং নামাজ আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তাহাদের পথ উন্মুক্ত করুন। দেখুন! আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"- (কোরআন ৯ ঃ ৫) এইগুলি এবং এইরূপ অন্যান্য বাক্যের জন্যই ইসলামের এই বিস্তৃতি। বস্তুত মুসলমানরা ইসলামি রাষ্ট্র দার-আল-সালাম বহির্ভূত সমস্ত ভূখণ্ডকে দার-আল হারব বা যুদ্ধ এলাকা বলিয়া বিবেচনা করে।** তবে বিগত কয়েক বৎসরে এই ধর্মাবলম্বী এই আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। সর্বশেষ এই আহ্বান দেওয়া হয় ১৯১৪ সালের শরৎকালে– যখন ওসমানী সুলতান তদানীন্তন ইসলামের খলিফা ব্রিটিশ ও ফরাসিদের বিরুদ্ধে সর্বান্তকরণে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। খুব বেশিসংখ্যক লোক ইহাতে কান দেয় নাই। মুসলমান আরবগণ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। অনেক আধুনিক জাতীয়তাবাদী ইহাকে দারিদ্র্য, রোগ, নিরক্ষরতা তেমনি উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করে।

৭। **সৎ কাজ ঃ** বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে উপরে বর্ণিত দফাগুলি ছাড়াও ইসলামে একটি সাধারণ ধারণা রহিয়াছে যাহাকে ইহছান বলা হয় এবং যাহাকে 'সৎকাজের, নামে অনুবাদ করা যায়। জুয়াখেলা, সুদখাওয়া, মাদক দ্রব্য পান করা এবং শূকরের মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন রহিয়াছে। মুসলমানদের জন্য অনাথদের যত্ন নেওয়া, দয়ালু হওয়া, সৎ ব্যবসা করা এবং ক্ষমা করা কর্তব্য। সাধারণভাবে যেখানেই থাকুক একজন মুসলমানকে হালালসিদ্ধ কাজ করিতে উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং হারাম নিষিদ্ধ হইতে দূরে রাখা হয়, বাকি কাজ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

---

* উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩০, ৩১।

** ইহা সঠিক নহে। একটি দেশ দার-আল-হারব হইবার জন্য কতকগুলি বিধি বিধান রহিয়াছে। অধিকন্তু শারীয়া অনুয়ায়ী একটি দেশ শাসিত হইলে তাহা দার-আল-সালাম হয়। কিন্তু দার-আল-হারব একটি দেশকে খলিফা বা ইমাম কর্তৃক ঘোষণা করিতে হয়, এমনিতেই হয় না।– অনুবাদক।

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামি রাষ্ট্রের প্রারম্ভ

প্রথম চারি খলিফা

আবুবকর ৬৩২ - ৬৩৪, ওমর ৬৩৪ - ৬৪৪
ওসমান ৬৫৪ - ৬৪৬, আলী ৬৫৬ - ৬৬১

উত্তরাধিকারের সমস্যা

হযরত মুহম্মদ (সঃ) ৬৩২ সালের ৮ই জুন পরলোকগমন করেন। জীবিতকালে তিনি নবী, বিচারক, বাদশাহ, ধর্মীয় নেতা ও সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিতেন। কেহ তাঁহার অধিকারে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যু ছিল অন্তত দুইজন 'ব্যক্তির' পরলোকগমন– একজন আল্লাহ্‌র নবী এবং অন্যজন রাষ্ট্রপ্রধান। আল্লাহর শেষ প্রেরিত পুরুষ হিসাবে নবীর কোনো উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রনায়কের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে তাঁহার দায়িত্বের, যথা প্রধান সেনাপতি, আইনদাতা, বিচারক ইত্যাদির জন্য একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন, যাহাকে খলিফা বলা হয়।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) দেহ কবরে অর্পণ করিবার পূর্বেই উত্তরাধিকারের বিষয় লইয়া একটি তিক্ত বিবাদের সূত্রপাত হয়। খলিফা পদের জন্য একাধিক প্রার্থী দণ্ডায়মান হয়। এই বিবাদ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে এবং ইসলামের ইতিহাসকে রঞ্জিত করে। নবী-নৃপতির দেহের চতুর্দিকে উত্থিত যুক্তি কোনো কোনো সময় যুদ্ধের সূত্রপাত করে। একভাবে আজও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, 'ইসলামে খিলাফতের ন্যায় অন্য কোনো বিষয় এত অধিক রক্তপাত ঘটায় নি।'

হযরত মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক রূপান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হইল গোত্রীয় বা জাতীয় ভ্রাতৃত্বকে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বে রূপদান। তিনি মানুষের ভ্রাতৃত্বের চাইতেও অধিক প্রচার করেন মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব। আধুনিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মতবাদ ইসলামে স্থান পায় না। স্বয়ং নবী-নৃপতি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি উঁচুদরের জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

যতদূর জানা যায়, হযরত মুহম্মদের (সঃ) কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি কাহাকেও তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান নাই। এই ব্যাপারে তিনি বোধ হয় গোত্রীয় রীতি অনুসরণ করেন। আরবগণ 'সালিশি' যুগের হিব্রুদের ন্যায় সারা জীবনের জন্য তাহাদের নেতা নির্বাচনে অভ্যস্ত ছিল। এই পদের যোগ্যতা বিচার করা হইত আলোচ্য সময়ে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী। তবে অনেকেই দাবি করে যে, মুহম্মদ (সঃ) আলীকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু মনোনীত উত্তরাধিকারের শত্রুগণ সেই 'উইল' ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাই হউক, বিষয়টি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া পড়ে যে, উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিবার পূর্বে কেউ নবীকে কবর

দেওয়ার কথা চিন্তাও করে নাই।

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর সংবাদ ঘোষিত হইবার পর আনসার নামীয় মদীনাবাসী আওস ও খাজরাজ বংশের নেতৃবৃন্দই প্রথম মাঠে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা ছিলেন মক্কাবাসীদের চিরাচরিত শত্রু এবং তাঁহাদের নগরীতে সেই শত্রুর অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তার হউক ইহা তাঁহারা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারেন না। নিজেদের মধ্যে তাহারা যুক্তি প্রদান করেন যে, আরবদের জন্য একজন নবী দান করিয়া কোরাইশরা যে সম্মান পাইয়াছেন তাহাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট থাক উচিত। তাঁহারা মনে করেন নবীকে সাহায্য দানকারী মদীনাবাসীদিগকে একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করিবার সম্মান দেওয়া উচিত। তবে তাহাদের সমস্যা ছিল সেই ব্যক্তি আওস হইবেন না খাজরাজ হইবেন।

আনসারগণ যখন ক্ষমতা লইয়া নিজেদের মধ্যে বিতর্কে ব্যস্ত তখন মুহাজিরগণ অর্থাৎ কোরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা হযরত মুহম্মদের (সঃ) সহিত মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা অলসভাবে বসিয়া ছিলেন না। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহারা নবীর মসজিদে একত্রিত হন। আনসারগণ একটি সিদ্ধান্তে প্রায় উপনীত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আবুবকর, ওমর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অনেকেই আনসারদের সভাস্থলে দ্রুত হাজির হন। সেখানে, সেই সভাকক্ষে যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তাহা আমেরিকার একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কনভেনশনের লোকপ্রসিদ্ধ ধূম্রাবৃত মন্ত্রণাকক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমর সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর তিনি এই ঘটনা বিবৃত করেন।

আবুবকর আনসারদিগকে দৃঢ়ভাষায় বলেন, আরবগণ সমষ্টিগতভাবে শুধুমাত্র কোরাইশদের আধিপত্য স্বীকার করিবে। এই উক্তির যথার্থতা আনসারদিগকে বিচলিত করে। কা'বার রক্ষাকর্তা হিসাবে কোরাইশ ছিল খুবই প্রসিদ্ধ গোত্র। হযরত মুহম্মদ (সঃ) যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাহাদের মর্যাদা তো খর্ব হয়ই নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনসারগণ অতঃপর একটি পরিষদ হিসাবে গোত্রীয় নেতাদের একটি সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ছিল নিষ্ফল। যে একতা হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরবদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িত। প্রত্যেকের মনোভাব ইতিমধ্যে কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। এই সময় ওমর এক পর্যায়ে আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য বা বায়আত প্রকাশ করেন। মুহাজিরগণ ইহার অনুসরণ করে। অতঃপর আনসারদের নড়বড়ে দল ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহারাও অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ করেন। ওমর তাঁহার বর্ণনা শেষ করেন এই বলিয়া, আমরা সা'দ ইবনে ওবদ্দার (যাহাকে আনসারগণ নির্বাচিত করিতে চাহিয়াছিলেন) উপর পতিত হইলাম এবং কে যেন বলিল আমরা তাহাকে হত্যা করিয়াছি ঃ আমি বলিলাম আল্লাহ্ তাহাকে হত্যা করিয়াছেন।"

নেতৃত্বের সংঘর্ষে আরেকটি দল ছিল যাহার কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত হন। তাঁহারা হইলেন নবীর নিকটতম পরিবার, যাঁহারা পরলোকগত নেতার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত থাকিবার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। মৃত্যুশয্যার চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন আয়েশা, তাঁহার স্ত্রী—যাঁহার হাতের উপর নবী (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ফাতিমা—নবীর একমাত্র জীবিত কন্যা, কন্যার স্বামী হযরত আলী—যিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) চাচাত ভাই এবং আরো অন্যান্য কয়েকজন। তাঁহারা নিশ্চিতভাবে ধারণা করিয়াছিলেন, নবীর চাচাত ভাই, জামাতা এবং

একমাত্র বংশধরের স্বামী হিসাবে আলীই একমাত্র স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারের দাবিদার। পরে দাবি করা হয় নবীর তথাকথিত একটি 'অছিয়তনামা' ধ্বংস করা হয়, যাহাতে উত্তরাধিকারী হিসাবে আলীর নাম উল্লেখ ছিল। কথিত আছে, ফাতিমা তাঁহার স্বামীর স্বপক্ষে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন এবং ছয়মাস পর্যন্ত আলী আবুবকরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিরত থাকেন, কিন্তু উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আবুবকর

কোরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে বয়স ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবুবকরই ছিলেন প্রথম। তিনি হযরত মুহম্মদের(সঃ) অতি ঘনিষ্ট বন্ধু এবং তাঁহার শ্বশুরও ছিলেন। তিনিই হন প্রথম খলিফা, খলিফায়ে রাসুল আল্লাহ্ "আল্লাহ্র বার্তাবাহকের প্রতিনিধি"। কিঞ্চিতাধিক দুই বৎসর তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসন ইসলামের অধীনে আরবের পুনঃঐক্য সাধনার্থে অতিবাহিত হয়। হযরত মুহম্মদের (সঃ) প্রতি আরব গোত্রগুলির আনুগত্য ছিল অগভীর এবং তাহাদের উপর তাঁহার আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার মতো সময় তিনি পান নাই। নবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সংযোগ রক্ষাকারী শক্তিশালী কবচ তাহারা ছিন্ন করে। ইহা হইল যাকাত বা কর প্রদান। কর প্রদানের সঙ্গে অপরিচিত একটি জাতির পক্ষে যাকাত একটি অর্থনৈতিক বোঝা, যাহা তাহাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথের অন্তরায়। কোনো কোনো গোত্র ইসলাম হইতে যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা ভুলিবার পথ অবলম্বন করে। অন্যান্য গোত্রগুলি কোরাইশ গোত্রের দ্বারা পরাজিত হইবার ভয়ে নিজস্ব নবীর দাবি করে। আবুবকর ও তাঁহার উপদেষ্টাদের নিকট ইহা অসহনীয় মনে হয় এবং তাঁহারা শক্তির দ্বারা এই হুমকির মোকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইসলামের পতাকাতলে সমগ্র মদীনা বশীভূত। এইবার মক্কাবাসিগণ আরবের অবশিষ্টাংশে যুদ্ধ চালাইয়া যান। এই সমস্ত যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁহার চমৎকার সৈন্য পরিচালনায় গোত্রগুলি একের পর এক পরাজিত হয়। ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে আবুবকর যখন মৃত্যুশয্যায়, খালিদের বিজয়ী বাহিনী তখন কোনো কোনো বিদ্রোহী গোত্রকে সিরিয়ায় পশ্চাদ্ধাবিত করে এবং বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে পরাজিত করে।

ওমর

উত্তরাধিকার লইয়া যাহাতে কোনো বিবাদের সূত্রপাত না হয় সেইজন্য আবুবকর তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী হিসাবে ওমরের নাম উল্লেখ করিয়া যান। খলিফার পিছনে সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও ওমর ছিলেন আবুবকরের সর্বঘনিষ্ট পরামর্শদাতা। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষি ও উদ্যমশীল ব্যক্তি, যিনি তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন, শুধু একজন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী নহেন বরং নবীর একজন শ্বশুরও। তাঁহার পুরা নাম ওমন ইবন আল-খাত্তাব। তাঁহার অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে মরুভূমির আরবগণ আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইয়া সম্মুখের সব কিছুকে গ্রাস করে। এক যুগের মধ্যে তাহারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে মিসর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। একই সঙ্গে তাহাদের বাহিনীর আরেকটি শাখা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া মধ্য ইরানের দিকে অগ্রসর হয়। সেই যুগের দুইটি সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের উপর একটি অধীনস্থ ও অশিক্ষিত জাতির এই দর্শনীয় ও দ্রুত বিজয় ঐতিহাসিকদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয় এবং

এইজন্য ইহা অনেক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তবুও হুনদের দ্বারা রোম বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং মোঙ্গলদের দ্বারা চীনাগণ বিজিত হইয়াছেন। এইগুলির কারণ খুঁজিয়া বাহির করা খুব কষ্টসাদ্য ব্যাপার নহে।

কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কল্পনার সাম্রাজ্য আরবদের বাহিরে বিস্তার লাভ করে নাই। খলিফা থাকাকালে আবুবকর ছিলেন সম্পূর্ণ কর্মব্যস্ত, তাই ইরাক ও সিরিয়ায় যাইবার জন্য খালিদকে আদেশ করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু খালিদ ইতিমধ্যেই সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাই এইসব বিজয়ের ব্যাপারে আবুবকর সম্মতি প্রদান করেন। তবে ওমর সজ্ঞানে পরিকল্পনা রচনা করিয়া এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

আরব উপদ্বীপের বেদুইনগণ কর্তৃক উত্তরের ফারটাইল ক্রিসেন্ট লুণ্ঠন বোধ হয় প্রথম নহে। খুব সম্ভবত আসিরীয়, ব্যাবীলনীয়, কলদীয় ও ফুনিসীয় সেমিটিকগণ উপদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। হিব্রুগণ বহির্বিশ্বে একটি ধর্মীয় ছাপ রাখিয়া যায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আরবগণও একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তৎসঙ্গে একটি ধর্মও চাপাইয়া দেয়।

নূতন ধর্ম বিস্তারের জন্য বহু কর্মপন্থার নায়ক ওমরকে ইসলামের ইতিহাসে সেন্ট পলের সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু সেন্ট পলের ন্যায় তিনি রোমের নিকট আশ্রয় চান নাই বরং তিনি রোম ও ইরানের সাম্রাজ্যকে হুমকি প্রদর্শন করেন এবং পরাজিত করেন। তিনি একজন আরব, ইসলামের একজন একাগ্র অনুসারী এবং যে ধর্মতন্ত্রের জন্য তিনি আমীর-উল-মুমেনীন বা 'বিশ্বাসীদের সেনাপতি' সেই ধর্মে একজন পাকা বিশ্বাসী। তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশ্য তিনটি– একটি হইল, আরবকে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল করিয়া একটি আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি সমস্ত অমুসলিম এমনকি খ্রিষ্টান ও ইহুদীদিগকেও আরব হইতে বহিষ্কার করেন, যাহাতে আরবদেশ সম্পূর্ণভাবে একটি মুসলিম ভূমিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল, সেই সাম্রাজ্যে ইসলাম একমাত্র ধর্ম না হইলেও অন্তত প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল, যেহেতু আল্লাহ ও পবিত্র কোরআনের ভাষা আরবি সেইহেতু সাম্রাজ্যের ভাষাও আরবি হয়। ওমর ও তাঁহার সভাসদগণ বিশ্ব ইতিহাসে এইসব পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রথম বা শেষ জাতি নহেন, কিন্তু তুলনামূলকভাবে তিনি এবং তাঁহার অনুসারিগণ ছিলেন বেশি কৃতকার্য।

ইসলামের সৌভাগ্য, ওমর একাকী ছিলেন না। যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে দুইজন অত্যন্ত মেধাবী সেনাপতি খালিদ-ইবনে-ওয়ালিদ এবং আমর-ইবনে-আল-আসও ওমরের মতো যৌবনসুলভ উৎসাহে উদ্দীপ্ত ছিলেন। ইসলামের প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়াও তাঁহারা ইহার মধ্যে বিরাট দুঃসাহসিক কর্মের উপকরণের সন্ধান লাভ করেন। অধিকন্তু ওমর ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ আরবের বাহিরে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করিবার উত্তেজনা লাভ করেন। নবীর (সঃ) পতাকা অনুসরণকারী অস্থির বেদুইনগণ তাঁহার মৃত্যুর পর নূতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের ইচ্ছামতো চলিতে থাকে। আবুবকর তাহাদিগকে পুনরায় পরাজিত করেন, কিন্তু তাহারা তবুও অস্থির থাকিয়া যায়। মুসলমান হিসাবে তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা বা অন্যের তাঁবু লুণ্ঠনাক্রমণের অভ্যাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লুণ্ঠনাক্রমণ ছিল তাহাদের পুরুষানুক্রমিক স্বভাব যাহা এত সহজে ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। অতএব, ওমর তাহাদিগকে আরবের বাহিরে অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে, একদিকে স্বদেশে তিনি বেদুইনদের অস্থিরতা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং অপরদিকে

বিদেশে নূতন সরকারের জয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলেন। ইহা ছাড়া গোত্রীয় লোকদিগকে আরবের বাহিরে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা তেমন দুরূহ ব্যাপার ছিল না, কারণ, ইরান ও বাইজান্টিয়ামের ধনসম্পদ ছিল সীমাহীন। এই অর্থনৈতিক পুরষ্কারের সম্ভাবনায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদিগকে একটি ভয়াবহ বাহিনীতে পরিণত করে। মুসলিম বেদুইনগণ বিশ্বাস করে যে, নিহত হইলে তাহারা বেহেশতে যাইবে, জয়ী হইলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইবে। খুব কম সংখ্যক সৈন্যই নিহত হইবার আশায় যুদ্ধে যোগদান করে। একজন মুসলিম ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, আবুবকর লোকদিগকে জেহাদে বা ধর্মীয় যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং গ্রীকদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি করায়ত্ত করিবার সম্ভাবনা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন।

যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও দরিদ্র মদীনা সরকারের রাজস্ব আদায়ের আকাঙ্ক্ষার বিষয়কেও নিশ্চয়ই হেলা করা যায় না। কোরআন বলে, "ঐশীগ্রন্থপ্রাপ্ত লোকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর ... যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা রাজস্ব প্রদান করে ... ।" প্রথম দুই খলিফার অভিজ্ঞতা হইল শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া আরবের গোত্রীয় লোকদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করা যায় না। অতএব, তাঁহারা আরবের বাহিরে 'মহাগ্রন্থপ্রাপ্ত লোকদে'র নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য গোত্রীয় লোকদিগকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। স্বীয় কৃতকার্যতায় তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হন। শীঘ্রই তাঁহাদের দাবি তিনটি শব্দে পরিণতি লাভ করে– 'ইসলাম, রাজস্ব অথবা অসি।'

অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের প্রসারতায় ধর্মীয় উদ্দেশ্যের উপর জোর দেন। ইসলামের ইতিহাসের অধিকাংশ আধুনিক ব্যাখ্যাদানকারী ইহাকে ছোট করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান। পূর্ববর্তীগণ যদিও বাড়াবাড়ি করিয়াছেন তবে পরবর্তীগণ ইতিহাস পাঠে দারিদ্র্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাবিজয়ে ইসলাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নাই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। ইসলামই ছিল প্রত্যেক মুসলমানের যুদ্ধ ধ্বনি এবং প্রত্যেক গোত্রের পুনর্মিলনের ভিত্তি। ইসলাম ছাড়া বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হইত না এবং এই ঐক্য ছাড়া তাহারা নিছক লুণ্ঠনাক্রমণকারী দলে পরণত হইতেন। ওমর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন স্তরে একটি সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকটি আরবের অন্তরে আল্লাহ্, মুহম্মদ (সঃ), যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, রাজস্ব, শাহাদত ও বেহেশত সমস্তই ছিল একই অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

প্রত্যেক কিছুর ন্যায়, বিজয়ের কারণসমূহ আক্রমণকারীর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল নহে। উত্তরের দুই বৃহৎশক্তি– বাইজান্টিয়াম ও ইরান শতাব্দীকাল ধরিয়া একে অন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এমন কি আরব বাহিনীগুলি যখন উত্তর দিকে অভিযানরত তখনও বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারস্য বিজয়ে বিভোর– পারস্যবাসিদেরকে তিনি পিছু হটিতে বাধ্য করেন এবং তিনিও তখন পরিশ্রান্ত। অন্যদিকে পারস্যের শাহানশাহ পারভেজ তখন মৃত। পারভেজের মৃত্যুর পর ৬২৮-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ভিতর ইরানের সিংহাসন কয়েকবার হাতবদল হয়। ইহার পর শাহ ইয়াজ্‌দাজারদ শাহানশাহ নিযুক্ত হন। পরিশ্রান্ত ও রক্তক্ষয়ী বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসি উভয়েই তখন মনে প্রাণে শান্তি কামনা করিতেছিল। মোটের উপর তাহারাই ছিল তখন যে কোনো শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী। কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে–তাহাও আবার নোংরা মরুভূমির বেদুইনগণ, ইহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

যুদ্ধে অর্থ ব্যয় হয় এবং অর্থ আসে জনগণের কাছ হইতে। যুদ্ধের ব্যাপক খরচ এবং উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের উচ্চমানের খরচ যোগাইবার দরুন বাইজান্টিয়াম ও ইরানের জনসাধারণ তখন বিশাল করের বোঝায় ভারগ্রস্ত।

অধিকন্তু, খ্রিষ্টান ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মের প্রাথমিক শক্তি নিঃশেষ হইয়া তখন বাইজান্টিয়ামে সীমাহীন ধর্মতাত্ত্বিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর দিকে ইরানে পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচরে আরম্ভ হইয়াছে। যিশু খ্রীষ্টের মাত্র একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাসী মনোফিজাইটগণ এবং তাঁহার অলৌকিক ও মানবীয় এই দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী খ্রীষ্টানদের মধ্যে তখন তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। যিশু খ্রিষ্টের প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছা কার্যকরী করিবার জন্য হেরাক্লিয়াস এক অভিনব প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইহা কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। উপরন্তু ইহা একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি করে।

ইরানে জরথুস্ত্রদের মোবেদগণ (The Mobeds) অধৈর্য হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রীয় ধর্মের বোঝা হাল্কা করিবার জন্য মনিচানিজম ও মাজদাকিজমের ন্যায় ধর্মীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই লোকদের নিকট সাধারণ ও ধর্মতাত্ত্বিক দিক হইতে সরলভাবে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা টাটকা বায়ুর নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সমতুল্য ছিল। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আরব উপদ্বীপের উত্তরে ফারটাইল ক্রিসেন্টে অনেকগুলি আরব গোত্র বসবাস করিত। ইহাদের কেহ কেহ ছিল দক্ষিণের গোত্রগুলির আত্মীয় স্বজন। ইহারা নিশ্চয়ই তাহাদের গ্রীক ও পারস্যবাসি উপপ্রভুদের নিকট হইতে মুক্তি লাভের সুযোগকে স্বাগত জানায়।

যাযাবর বাহিনী কর্তৃক সুসভ্য জাতিকে জয় করা ইতিহাসে কোনো নূতন ঘটনা নহে। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই ক্ষেত্রে বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসিদের ক্ষমতা এত বিশাল ছিল যে আবুবকর তাঁহার সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং ওমরও ছিলেন খুবই বিতর্ক। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিদল ছিলেন অপরিচিত। অতএব, মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতির জন্য অন্য কাহারো চাইতে এইসব সেনাপতিদিগকেই অধিক সম্মান দেওয়া উচিত।

৬৩৪ সালের দিকে অনেক সতর্কতামূলক অগ্রগতির পর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ পূর্ব সিরিয়া আক্রমণ করেন। তিনি এই কাজসম্পন্ন করিতে পারিতেন না যদি না বাইজান্টাইনদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আরব ঘাসানীয়গণ তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিত। ৬৩৫ সালের ফেব্রুয়ারির দিকে খালেদ দামেস্ক নগরী অবরোধ করেন। তিনি অধিবাসিদিগকে তিনটি শর্ত প্রদান করেন– যাহা ইসলামের পরবর্তী যুদ্ধসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পরিণত হয়। এই শর্তগুলি হইল ইসলাম গ্রহণ করা, জিজিয়া প্রদান করা অথবা যুদ্ধ করা। ৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে দামেস্ক আত্মসর্ম্পণ করে। এক বৎসর পর ৬৩৬ সালের আগস্টে ইয়ারমূকে হেরাক্লিয়াস ও খালেদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের জয়ের ফলে বাইজান্টাইন সম্রাটকে সমগ্র সিরিয়া ও ফিলিস্তিন মুসলমানদের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। ৬৩৭ সালে সিরিয়া এবং ৬৩৮ সালে জেরুজালেমের পতন হয়। এইভাবে সংক্ষিপ্ত চারি বৎসরে আরবগণ ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাইজান্টাইন প্রদেশগুলির প্রভুত্ব অর্জন করে।

সিরিয়াকে কেন্দ্র হিসাবে রাখিয়া আরবগণ আর্মেনিয়া, জর্জিয়া ও উত্তর ইরাকের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়।

আমর-ইবনে-আল-আস যিনি মোটামুটি মিসরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথায় সেনাবাহিনীর একটি উপদল পরিচালনা করেন। এই পরিচালনার অনুমতি প্রদানে ওমর দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ৬৩৯ সালের দিকে তিনি সীমান্তে উপনীত হন এবং লিউসিয়াম ও হেলিপোলিশের দিকে অগ্রসর হন। নববলে বলীয়ান হইয়া তিনি নীল নদের পাড় ঘেঁষিয়া প্রসিদ্ধ নগরী আলেজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৬৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা পদানত করেন।

পশ্চিমে এইসব অভিযান চলাকালে ইসলামের তৃতীয় সেনাপতি সা'দ ইবনে আবি ওয়াককাস* প্রায় ৬০০০ সৈন্য লইয়া ইরাকের দিকে অগ্রসর হন। তিনটি প্রধান যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রথমটি সংঘটিত হয় কাদিসিয়া নামক স্থানে ৬৩৫ সালের জুন মাসে এক উত্তপ্ত ধূলিঝড়ের দিনে। ইহাতে রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যবাসিগণ পরাজয় বরণ করে। দুই বৎসর পর ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী আরব গোত্রসমূহের সাহায্য লইয়া সা'দ সাসানীয়দের রাজধানী তেসীফন অবরোধ করেন। ৬৩৭ সালে এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর পতন হয়। নগরীর ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই আরব সৈন্যদের কল্পনাতীত ছিল। ফলে তাহারা হৃদয় ভরিয়া তেসীফন লুণ্ঠন করে। কথিত আছে যে, তাহারা রন্ধনকার্যের জন্য কর্পূর ব্যবহার করে, হলুদ খণ্ড, বা সাফরার (স্বর্ণ) পরিবর্তে 'সাদা খণ্ড' বা বায়দা (রৌপ্য) বিনিময় করে। স্বর্ণ তাহারা ইতিপূর্বে দেখে নাই, রৌপ্য তাহাদের নিকট মোটামুটি পরিচিত। ইয়াজদাজারদের সেনাবাহিনীর একটি অংশ আরবদের সঙ্গে নেহাবান্দ বা আধুনিক হামাদানের নিকটে মিলিত হয় এবং ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হয়। মার্ভ এলাকার কোনো এক স্থানে শাহ্ স্বয়ং একজন লোভী চাষীর হাতে নিহত হন এবং এইভাবে ২২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাসানীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এইভাবে প্রায় আট বৎসরের মধ্যে আরবগণ মরুভূমি হইতে নির্গত হইয়া এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়– যাহা পশ্চিমে মিসর হইতে মধ্য ইরান এবং এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও তাহারা ইহা সম্পূর্ণভাবে জয় করে নাই, কিন্তু তবুও এই বিজয় খুবই হৃদয়গ্রাহী। ইরান ও বাইজান্টিয়াম একে অপরের যতটুকু ক্ষতি করিতে পারে নাই আরবগণ তাহাদের উভয়কেই তাহা করিতে সক্ষম হয়।

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যকে জানিবার জন্য এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসরের জনগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধ অথবা দামেস্ক, জেরুজালেম, ও আলেকজান্দ্রিয়ার আত্মসমর্পণের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা এখন ইহাকে স্মরণ করিলেও ইসলামের বিজয়ের গর্ব লইয়া স্মরণ করে। তাহাদের এক বিরাট অংশ এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং আরবি ভাষা গ্রহণ করিয়া আরব সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে গর্ব অনুভব করিতেছে। কিন্তু পারস্যবাসিদের ব্যাপার ভিন্ন। তাহারা এখনও কাদিসিয়ার যুদ্ধ এবং আরবদের হাতে পরবর্তী পরাজয়গুলির কথা তিক্ততার সহিত স্মরণ করে। ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের জনগণ ছিল একটি বিদেশী শক্তির অধীনে, অর্থাৎ বাইজান্টাইনদের। আরবদের হাতে বাইজানটিয়ামের পরাজয়কে জনগণ তাই প্রভু পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করিয়াছিল। অতএব এই ধরনের পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে পারস্যবাসিগণ কাহারো অধীনস্থ ছিল না বরং জাতীয়তাবাদের

---

* *সাদ ইবনে আবিওয়াক্কাস। -অনুবাদক*

প্রতি তাহাদের আস্থা ছিল প্রবল। আরবদের বিজয়ের ফলে পারস্যবাসিদের মর্যাদা প্রভু হইতে ভৃত্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়, যাহা তাহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সচেতনভাবে আরব নেতৃত্ব ধ্বংস করিবার প্রয়াস পায়। ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাহারা আরব সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভাঙ্গিয়া দিতে সক্ষম হয়। তাহারা আরবি ভাষা বলিতে অস্বীকার করে এবং সুযোগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এই ভাষা লেখা বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ হইতে তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবগণ হইতে পৃথক বলিয়া চিহ্নিত করে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধের তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পর পারস্য কবি ফেরদৌসী এই ভাবধারাকে তাঁহার 'শাহমানা'– বা 'নৃপতিদের গ্রন্থ' নামক কাব্যে অমর করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইবার কাল পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস কাব্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। পারস্যের স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খুব কমই আছে যে এই কাহিনীর সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ মুখস্থ বলিতে পারে না। সিপাহবদের যুদ্ধের প্রাক্কালে 'সেনাপতি' রুস্তম পরাজয়ের পূর্বাভাস দান করেন এবং তেসীফনে তাঁহার ভ্রাতার নিকট এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখেন।

"উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া এবং টিকটিকির মাংস ভক্ষণ করিয়া এই নোংরা ও পাদুকাহীন আরবদের কাইয়ানের তাজ পরিধান করিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। হে অদৃষ্ট! তোমার মাথায় সহস্র ধিক্কার।"

পারস্যবাসিগণ তাহাদের পরাজয় ভুলিয়া যায় নাই। পারস্যবাসিগণ যে 'ইয়াজদাজিরদী ক্যালেন্ডার' ব্যবহার করে তাহার প্রথম বৎসর ধরা হয় শেষ সাসানীয় রাজার মৃত্যু বৎসররূপে। পারস্যবাসিগণ ওমরকেও ভুলে নাই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একটি বিশেষ দিনে তাঁহার কুশপুত্তলিকা দাহ করা ছিল ইরানে চিরাচরিত প্রথা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ২৩ শে নভেম্বর ৬৪৪ সালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। ইহা বোধ হয় কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় যে তাঁহার আততায়ী ছিল আবু লুলু ফিরোজ নামে একজন পারস্যবাসি।

পঞ্চম অধ্যায়

বিস্তৃতি ও প্রশাসনিক সমস্যা

ইসলামি শাখা-প্রশাখার দ্রুত বিস্তৃতির ফলে নিয়ম-কানুন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। অথচ এইগুলি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নাই। শাসন কার্যের সরলতা ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আবুবকরের শাসন প্রণালী ছিল মুহম্মদ (সঃ)-এর ন্যায়। রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) ন্যায় তাহার কর্মস্থল ছিল মদীনার মসজিদ। সেখানে তিনি মুসলমানদের নামাজে ইমামতি, বিভিন্ন দলের সমস্যাদির বিচার এবং সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করিতেন। ইসলামি সম্প্রদায় ছিল তখনও তুলনামূলকভাবে ছোট এবং সমস্যাবলীও পরিচিত ও সাধারণ। গোত্রসমূহের অনেক দিনের রীতি অনুসারে যোদ্ধাগণ কোনো বেতন লইতেন না। প্রত্যেক সৈন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইত এবং হত্যাকৃত শত্রুর যাবতীয় তৈজসপত্রের মালিক হইত। রাষ্ট্রের আয় তখনও বেশিরভাগ আসিত যাকাত এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ হইতে– যাহা হযরত মুহম্মদ (সঃ) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

বিশাল ভূখণ্ড আয়ত্তে আসিবার পর এইগুলির শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাঁহাকে ইসলামের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলিবার পশ্চাতে তাঁহার শাসন সংক্রান্ত নীতির কার্যকারিতা যেমন রহিয়াছে তেমনি ইসলামের জন্য তাঁহার নূতন ভূখণ্ড বিজয়েও নিহিত। ইহা নির্ধারিত করা খুবই দুষ্কর যে ওমরের নামে প্রচলিত সমস্ত নীতির স্রষ্টা স্বয়ং তিনি, নাকি এগুলির স্রষ্টা তাঁহার প্রপৌত্র উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) অথবা অন্য কেহ যিনি মর্যাদার জন্য ওমরের নাম ব্যবহার করেন।

রসুলের (সঃ) প্রতি ওমরের অকুণ্ঠ ভক্তি দৃষ্টে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব হযরতের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন। বস্তুত ওমরের প্রচলিত নীতিমালা রসুলের (সঃ) আদর্শকে প্রতিভাত করে। ইসলামি সম্প্রদায় এই প্রথমবারের মত নূতন ইসলাম গ্রহণকারী অনারব সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনারব বিজিত জাতিগুলিকে লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা অনারবদের ইসলাম গ্রহণ উদ্ভূত সমস্যার চাইতে কম কঠিন ছিল।

পথপ্রদর্শক হিসাবে ওমরের সম্মুখে ছিল রসুল (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আদর্শ ও ঘটনাবলী। তিনি জানিতেন, হযরত মুহম্মদ (সঃ) একজন আরব– যাঁহাকে আল্লাহ্‌তালা ঐ ঐশীবাণীসমেত অনারবদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই বাণী অনারবদের নিকট হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, ইসলামি সম্প্রদায়,

---

* *পাঠকদের উম্মাহ বা সম্প্রদায় এই উক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হইতে হইবে। প্রথমে উহা বুঝাইত মুসলমান আরব সম্প্রদায়কে। কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত লেখকগণ ইহা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই ভাবার্থে ইহা আধুনিককালেও ব্যবহৃত হয়।*

উম্মাহ্* হইল সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, সমস্ত মানবজাতির নহে। অধিকন্তু একটি বিশাল ভূখণ্ড তাঁহার আয়ত্তে আসিবার ফলে ওমর একটি সুদৃঢ় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আরবে অবস্থিত সেই কেন্দ্রে এই ভ্রাতৃত্বের অখণ্ডতা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ওমর ইসলামকে ব্যাখা করেন– যাহার অর্থ হইল, হযরত রসুলের (সঃ) বাণী গ্রহণকারী আরব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। অনারব মুসলমানগণও এই মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে সামিল হইতে পারে কিন্তু ইহার অভ্যন্তরীণ চক্রের অংশ হইতে পারে না– এই সম্মান আরবদের একচেটিয়া প্রাপ্য।

জেরুজালেমে তাহাদের নিজস্ব সায়নাগগের মধ্যে কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিবার ফলে ইহুদিগণও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক পৌত্তলিক ইহুদি ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম গ্রহণ করে, যদিও ইহুদিগণ তাহাদের দীক্ষার ব্যাপারে কোনো চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তদ্বারা ইহা বুঝায় নাই যে এই সমস্ত দীক্ষিত লোকজন 'ইসরাইল বংশের' সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করিবে। সায়নাগগে ইহুদিগণ 'নবদীক্ষিত আঙ্গিনা' (The Court of the Proselytes) নামক একটি স্থান নির্দিষ্ট করে। নবদীক্ষিত লোকজন ঐ স্থান পর্যন্তই প্রবেশ করিতে পারিত, তাহার চাইতে অধিক নহে। প্রায় অনুরূপভাবে ওমর ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন– যদ্বারা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বলিতে শুধু আরব মুসলিমদের মধ্যস্থিত বিশেষ সুবিধাভোগীদিগকে বুঝায়। এই ব্যাখ্যা সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিভিন্ন আদেশ জারি করেন– সেইগুলি উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে সঠিক অনুধাবন করা যায়।

প্রথমত, তিনি সমস্ত অমুসলিমদিগকে আরব হইতে বহিষ্কার করেন। আজ পর্যন্ত অমুসলিমদিগকে আরব দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য করা হয় না। দ্বিতীয়ত, তিনি আরবদিগকে বিজিত দেশে ভূমি ক্রয় করিতে বাধা প্রদান করেন। তাহাদের নিজস্ব 'আবাস ভূমি' বলিতে সর্বদা আরবকেই বুঝাইবে। তৃতীয়ত, আরব রক্ত অবিমিশ্র রাখিবার জন্য এবং আরব সামরিক আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহ এমন কি নবদীক্ষিতদের সঙ্গে হইলেও অপছন্দ করেন। চতুর্থত, বিজিত লোকদের সঙ্গে আরব যোদ্ধাদের সংমিশ্রণ ও ভ্রাতৃত্ববোধ রোধ করিবার জন্য তিনি সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যাঁহারা সুপরিচিত তাহারা প্রধান নগরগুলির শহরতলীতে অবস্থিত সেনানিবাসগুলির কথা স্মরণ করিতে পারেন। মুসলিম সেনানিবাসগুলির মধ্যে যেগুলি পরে নগরীতে পরিণত হয় সেইগুলি হইল মিসরের ফুসতাত, প্যালেস্টাইনের রমলা এবং ইরাকের কুফা ও বসরা।

অতএব চাষাবাদ, ব্যবসা এবং জেলাগুলির স্থানীয় প্রশাসন স্ব স্ব অধিবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা মুসলমানদের উপকারার্থে পরিশ্রম করে, এবং তাহাদিগকে রাইয়া (Raiya) বা পশুপালক নামে অভিহিত করা হয়। খ্রিষ্টান ভূখণ্ডে কার্যাবলীর দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে স্থানীয় বিশপদের হাতে এবং ইরাকে থাকে 'দেহকান' বা দেশীয় জমিদারদের হাতে।

ওমরের প্রধান নীতির একটি এই যে, বিজিত ভূখণ্ডের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ও জমির মালিক আরব-মুসলমান সমাজ– উম্মাহ্। রাষ্ট্রের আয় আসে বিভিন্ন উৎস হইতে– সে নগদে হউক বা উৎপন্ন দ্রব্যে হউক। একটি হইল খুম্‌স্ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ যাহা রসুল (সঃ) করিয়াছিলেন। আরেকটি জিজিয়া বা অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত রাজকর।

তৃতীয় উৎস সমস্ত অনারব চাষীদের উপর ধার্যকৃত ভূমির কর। মোট আয় এত বৃহৎ অঙ্কের যে ইহার ফলে আরবদিগকে যাকাত হইতে নিস্কৃতি প্রদান করা হয়।* সমস্ত আয়ের মালিক যেহেতু উম্মাহ্ তাই যুদ্ধ, শাসনব্যবস্থা এবং জনহিতকর কার্যের সমস্ত খরচ মিটাইবার পর অবশিষ্ট অর্থ আরবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য ওমর লোক গণনার আদেশ দেন ও একটি কার্যালয় স্থাপন করেন। ইহাকে তিনি পারস্যের 'দিভান' নামক প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে 'দিওয়ান' নামে অভিহিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হইল ভাগবন্টন করা। উপরোক্ত নীতি আরবদিগকে শক্তিশালী করে। সমস্ত আরব মুসলিম উম্মাহ্‌র আভ্যন্তরীণ পরিষদের সভ্য। আরবদিগকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং যেহেতু তাহারা আরব তাই যাকাত প্রদান না করা ছাড়াও তাহারা একটি বার্ষিক ভাতা ভোগ করে।

লোক গণনার মাধ্যমে সমস্ত আরবদিগকে ইসলামি ধর্ম বিশ্বাসের মেয়াদ, রসুলুল্লাহর (সঃ) সেবা, গোত্রের মধ্যে প্রতিপত্তি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়। সকলের উপরে থাকেন রসুলের (সঃ) পরিবার– যাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা বাৎসরিক ১২০০০ দিরহাম (প্রায় ৩০০০ ডলার) ভাতা পান, পরবর্তী পদে থাকেন হযরত মুহম্মদের (সঃ) সহচরবৃন্দ যাঁহারা তাহার সহিত মক্কা হইতে হিজরত করেন, তারপর আসেন তাঁহার মদীনার সহচরবৃন্দ– যাঁহাদের প্রত্যেকে গড়ে বাৎসরিক ৫০০০ দিরহাম ভাতা লাভ করেন। অতঃপর বিভিন্ন আরব গোত্রের নারী, পুরুষ ও ছেলেমেয়েদিগকে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসের মেয়াদ অনুসারে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। সর্বনিম্ন সৈনিক বাৎসরিক ৬০০ দিরহাম ভাতা লাভ করেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতেন না তাহারা প্রত্যেকে কমপক্ষে ২০০ দিরহাম লাভ করেন। অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকদের দাবি যাহাই হউক না কেন, এই কথা ঠিক যে আরবগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। রসুল (সঃ) স্বয়ং না হইলেও অন্তত ওমর ও তাঁহার সহচরবৃন্দ আরববাদকে ইসলামের সহিত চিহ্নিত করেন।

তবে আরবদের এই প্রাধান্যের নীতি সময়ের অগ্নিপরীক্ষায় টিকিতে পারে নাই। আজ হইক, কাল হউক বিশাল অনারব জনতা যে কারণেই ইসলাম গ্রহণ করুন না কেন, তাহারা কোরআনকে ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিবে– যদ্বারা আরব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে ব্যাপক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিবে। শীঘ্রই অনেক অনারব মুসলমান নিজদিগকে আরব হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন, কেহ কেহ পদাবনতি হইতে বাঁচিবার জন্য, অন্যরা ভাতা পাইবার জন্য, কিছুসংখ্যক মর্যাদা পাইবার জন্য। এইভাবে শত শত ব্যক্তিবর্গ আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নিজদিগকে স্বয়ং মুহম্মদের (সঃ) বংশধর বলিয়া দাবি করে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর এইসব মর্যাদা ও সুবিধাভোগী বংশধরগণ মুসলিম বিশ্বের বিশেষত অনারব দেশে বহু রহিয়াছে।

---

* *লেখকের এই মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। বস্তুত ওমরের (রাঃ) সময়ও যাকাত হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি প্রদান করা হয় নাই। এমন কি আরবে ঘোড়ার সংখ্যা কম থাকাতে তিনি প্রথম দিকে ঘোড়ার উপর যাকাত নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু পরে ইরাক ও পারস্য বিজয়ের পর ঘোড়ার উপর ওমর (রাঃ) কর নির্ধারণ করেন। (বিস্তৃত বিবণের জন্য ইমাম আবু ইউসুফ রচিত কিতাব-আল খারাজ পৃ ; ২১ ৩১ এবং বালাজুরী পৃঃ৭ দ্রষ্টব্য)। -অনুবাদক।*

ওসমান

ওমরের নীতি আশানুরূপ সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল না হইবার কারণ তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে দুর্বলতম শাসনকর্তা। ওমর যখন জানিতে পারিলেন– পারস্যবাসি আততায়ীর আঘাত হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন না, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা মনোনীত করিবার জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আলী এবং ওসমান উভয়েই এই কমিটির সদস্য। আলীকে হতাশ করিয়া ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। ওসমান ইবনে আফফান তখন ৭০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তিনিও আলীর ন্যায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) জামাতা। তিনি কোরাইশ বংশের অভিজাত উমাইয়া উপগোত্রের লোক– যে গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন। রসুলের (সঃ) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাবি অনুসারে মক্কা অধিকারের পর এই উমাইয়াগণ অক্ষতভাবে বাঁচিয়া যায়।

উমাইয়াগণ মদীনায় বসতি স্থাপন করিয়া ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্নস্তরে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই বোধ হয় ওসমান নির্বাচিত হন। ফলে তাঁহার পরিবর্তে কার্যত উমাইয়া বংশের হাতেই রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা চলিয়া যায়। কোমলমতি, উৎসাহহীন এই বৃদ্ধ লোকটি জনসাধারণের কার্যাবলীর চাইতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতকেই বেশি প্রাধান্য দেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহার পরিবারের লোকদিগকে বিশ্বাস করিতে থাকেন। ফলে শীঘ্রই তাঁহার উমাইয়া আত্মীয়-স্বজন বিজিত প্রদেশগুলির শাসনকর্তা হিসাবে পুরাতন ও বিশ্বাসী যোদ্ধাদের স্থলাভিষিক্ত হন। এমন কি তিনি মিসর বিজয়ী আমর ইবনে আসকে গভর্নর পদ হইতে অপসারণ করিয়া তদস্থলে রসুল (সঃ) কর্তৃক ধিকৃত তাঁহার পালিত ভাইকে নিয়োগ করেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ওমরের আদেশ অমান্য করিয়া বিজিত দেশে জায়গাজমি দখল করিলে ওসমান না দেখার ভান করেন। অকোরাইশ আরবগণ এই আইন পছন্দ করিত না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ওমরের ভয়ে উহার বিরোধিতা করিতে সাহস করে নাই, তাঁহারাও ওসমানের এই অমনোযোগিতায় উৎসাহ লাভ করে।

সামরিক অভিযানগুলি আন্দোলনের ঢেউ বিদ্যমান থাকিবার ফলে অব্যাহত থাকে, ওসমানের প্রচেষ্টায় নহে। নৌ-আক্রমণে বাইজান্টাইনদের নিকট হৃত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি ৬৪৬ খ্রিষ্টাব্দে পুনরাধিকার করা হয়। উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম বাহিনী বার্বার এলাকার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া ত্রিপলী ও প্রাচীন কার্থেজ অধিকার করে। ওসমান বার্বারদিগকে মহাগ্রন্থের লোক হিসাবে মর্যাদা দান করেন। ৬৫২ খ্রিষ্টাব্দে মুসলমানগণ ন্যুবিয়ানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করিতে আরম্ভ করে। সিরিয়ায় আরেকজন উমাইয়া বংশের সদস্য মুয়ারিয়ার নেতৃত্বে আক্রমণ পরিচালিত হয়। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তাহাদের প্রথম নৌযুদ্ধে সফলতা লাভ করে এবং সাইপ্রাস অধিকার করিয়া রোড্স-এর দিকে অগ্রসর হয়। উত্তরে মুসলমানগণ আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার কিয়দংশ দখল করে এবং পূর্বে আধুনিক আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের প্রান্তদেশে অগ্রসর হয়।

তবে ইসলামের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি অধিকতরভাবে অভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষত ওসমানের অব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে তিনি কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন– যিনি রসুলের (সঃ) প্রতি থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চাচাত ভাইকে খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি ছাড়াও ওসমান গভর্নর পদ নগদ অর্থ বা সুন্দরী ক্রীতদাসী উপঢৌকনের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। ফলে রসুলের (সঃ)

ঘনিষ্ঠতম সহচরদের অনেকেই তাঁহার বিপক্ষে চলিয়া যান। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াতে আলী ও তাঁহার সমর্থকগণ যে উৎসাহ প্রদান করেন তাহা একটি সাধারণ সত্য।*

ওসমানের স্থায়ী কৃতিত্ব হইল পবিত্র কোরআনের একত্রীকরণ। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে, কুফার বিদ্রোহ তাঁহার এই অবদানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং পরিণামে তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষত যেখানে আলীর সমর্থক শক্তিশালী, তিনি ক্রমশ জনসমর্থনহীন হইয়া পড়েন। কুফায় পণ্ডিতগণ কোরআনের মূল পরিবর্তন করিয়া উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরিত আয়াতগুলি বিনষ্ট করিবার দোষে ওসমানকে অভিযুক্ত করেন। এই আন্দোলন মিসরে আলীর বন্ধুদিগকে ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে। মিসরীয়গণ আরেক ধাপ অগ্রসর হইয়া ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ৫০০ সৈন্যের একটি দল মদীনায় প্রেরণ করে এবং খলিফার গৃহ অবরোধ করে। শোনা যায় সৈন্যগণ দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় তিনি কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে রত ছিলেন এবং এই অবস্থাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতানুসারে তাঁহার হত্যাকারী ছিল তাঁহার বন্ধু প্রথম খলিফা আবুবকরের পুত্র মুহম্মদ। এইভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা ভয়াবহ মৃত্যুবরণ করেন।

আলী

ওসমান হত্যার এক সপ্তাহ পর আলী খলিফার পদ গ্রহণ করেন। তিনি রসুলের (সঃ) চাচাত ভাই ও জামাতা এবং তাঁহার পুরাতন সহচরদের মধ্যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন বলাটা সঠিক নহে। যাঁহারা তাঁহাকে রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) 'একমাত্র' ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য তাঁহার সমর্থকগণ তাঁহাকে চতুর্থ খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন মাত্র। যেই খেলাফত তাঁহার নিকট হইতে তিনবার ছিনাইয়া লওয়া হয় তাহা শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হয়– ইহাই হইল তাঁহার সমর্থকদের ধারণা। কিন্তু আলী এবং তাঁহার সমর্থকদের দুর্ভাগ্যবশত ইতিমধ্যে খেলাফতের অনেক প্রার্থী সৃষ্টি হইয়াছে।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর চব্বিশ বৎসর পর একটি নূতন জাতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে যাহা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া অনেক দূর–দূরান্ত সফর করিয়াছে এবং ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। নিত্য নূতন আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছে এবং বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। মরুভূমির সাধারণ জীবন অপসারিত এবং তৎসঙ্গে যাঁহারা রসুলের (সঃ) সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন এবং ভক্তিজনিত ভয়ও সুদূর পরাহত। আলীর খেলাফত আরম্ভ হইবার অনতিকাল পরেই তাঁহার দুই আপন সহচর তালহা ও জোবায়ের, তাঁহাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন।

তিন দশেকের ব্যবধানে স্বার্থপরায়ণ মুসলমানগণ উত্তরাধিকারের সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনটি মতামতের সৃষ্টি হয়। একদল বিশ্বাস করে যে, রসুলের (সঃ) উত্তরাধিকারী কোরাইশ বংশ হইতে হইবে। রসুলের (সঃ) মৃত্যুর অনতিকাল পরে মক্কা ও

---

* *হযরত ওসমান (রাঃ) বিরুদ্ধে আনীত এই সমস্ত অপবাদ অতি পুরাতন। আধুনিক অনেক গ্রন্থে এইগুলিকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে তিনি এই সমস্ত দোষের উর্ধ্বে ছিলেন।– অনুবাদক।*

মদিনাবাসীদের মধ্যে এই যুক্তি মৌলিকরূপে দেখা দেয়। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দের অঘোষিত একটি সভায় আবুবকর মনোনীত হন। ওমর তাঁহার পূর্ব খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হন। ওমর কর্তৃক একটি কমিটির দ্বারা ওসমান নির্বাচিত হন। দৃশ্যত এই নিয়মগুলি গ্রহণযোগ্য। কোরাইশ বংশের সমস্ত সদস্যই যেহেতু খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি তাই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দল সাধারণ্যে 'বৈধতাবাদী' (Legitimists) নামে সুপরিচিত। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, খেলাফত একটি ঐশ্বরিক পদ এবং নিযুক্ত ব্যক্তি ঐশী আদেশে এই পদে সমাসীন হন। ঐশী আদেশে মুহম্মদের (সঃ) রসুলরাজা হইবার বিষয়টি যেহেতু প্রশ্নাতীত, তাহারা যুক্তি প্রদান করেন যে, উত্তরাধিকারীও সেইহেতু রসুলের (সঃ) পরিবার হইতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মুহম্মদের (সঃ) জামাতা, চাচাত ভাই এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে আলীই বৈধ উত্তরাধিকারী। তাঁহার পর নেতৃত্ব যাইবে তাঁহার পুত্রদের নিকট অর্থাৎ হযরত মুহম্মদের (সঃ) পৌত্র প্রভৃতির নিকট। বৈধতাবাদিগণ 'শিয়ানে আলী' বা আলীর সার্থক এবং পরবর্তীকালে শুধু শিয়া নামে পরিচিত।

তৃতীয় দল মুসলমানদের মধ্যে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে খেলাফত কোনো বিশেষ পরিবারের অধিকার নহে। তাঁহারা পবিত্র কোরআনের আদেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করেন যে, মহত্ত্ব পুণ্য কাজের উপর নির্ভরশীল, রক্ত সম্পর্কের উপর নহে। তাঁহাদের নীতি অনুযায়ী একজন ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারে। সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে তাহারা অতি শুদ্ধচারী এবং তাহারা রসুলের (সঃ) বাণী অনুযায়ী সাধারণ জীবন ভালবাসেন। প্রথমে আলীর সৎজীবন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সমর্থক হয় এবং তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধাচারণ করেন। পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাহারা খারেজী বা 'দলত্যাগী' নামে পরিচিত হয়। ইসলামের খাঁটি আদর্শ রক্ষার্থে তাহারা স্বেচ্ছায় যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং পরবর্তী খলিফাদের শরীরের কাঁটার ন্যায় অবস্থান করে।

খুব সম্ভবত তালহা ও জুবায়ের আশংকা পোষণ করেণ যে, খেলাফত কোরাইশকে বাদ দিয়া শুধু আলী পরিবারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) যুবতী স্ত্রী আয়েশা আলীকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করিতেন। তিনি বসরায় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করেন। এইভাবে ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ রসুলের (সঃ) মৃত্যুর ২৪ বৎসর পর ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বসরা শহরের উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়। একদিকে তাঁহার জামাতা এবং অপরদিকে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী। ইহা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত, কারণ আয়েশা একটি উটের উপর সওয়ার হইয়া যোদ্ধাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। এই যুদ্ধে আলী জয়ী হন। তিনি আয়েশার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে মদিনায় প্রেরণ করেন।

এই সমস্যা তিরোহিত হইবার পর কুফায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আলী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ওসমান কর্তৃক নিযুক্ত প্রায় সব লোককে তিনি অপসারিত করেন এবং রসুলের (সঃ) আদর্শে সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষকে নিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারের সূচনা করেন। তবে তিনি তখনও অধিক শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। সিরিয়ার গভর্নর এবং ওসমানের একজন আত্মীয় মুয়াবিয়া আলীকে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করেন। এক শুক্রবার মুয়াবিয়া নিহত খলিফা ওসমানের রক্তাপ্লুত জামা প্রদর্শন করিয়া আলীকে এই হত্যার ষড়যন্ত্রের অংশীদার বলিয়া অভিযোগ করেন। এইভাবে উমাইয়াগণ আলীর উত্তরাধিকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে।

তবে অন্যান্য বিষয়েও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। আলীর খেলাফত পর্যন্ত মুসলমানগণ এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। অশিক্ষিত, নিরস্ত্র কিন্তু উৎসাহী আরব মুসলমান এবং সিরিয়া, ইরাকের সুশিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এত অধিক ধন-সম্পদ এবং এই ব্যাপক শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া যায়। অধিকন্তু, ব্যবহারিক অর্থে এই বিশাল নূতন সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য বিজিত লোকদের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন হয়। অতএব, আরবদের বাহ্যিক গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাবেক বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসিদের আওতাধীন এলাকাগুলির মধ্যে ঘটে। গ্রীস- রোমান সংস্কৃতির বাহক সিরিয়া আধিপত্য লাভ করিবে, নাকি পারস্য-সংস্কৃতির বাহক ইরাক আধিপত্য অর্জন করিবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলিম আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মদিনা ইতিমধ্যেই ইহার প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

দুই বাহিনী– আলী তাঁহার ইরাকীদের লইয়া এবং মুয়ারিয়া তাঁহার সিরীয়দের লইয়া, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ে সিফ্‌ফিন নামক স্থানে মিলিত হয়। বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কোরআন ঝুলাইয়া সিরীয়গণ চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং সন্ধির প্রস্তাব করে। আলীর শৌর্যবীর্য ও ধর্মপরায়ণতা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে ঢাকিয়া ফেলে বলিয়া তিনি কোরআনের ভিত্তিতে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মধ্যস্থতাকারিগণ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে আলীর অনুসারীদের এক বিরাট অংশ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করায় আলীর উপর বিরক্ত হইয়া পড়ে। "আল্লাহ ছাড়া কোনো মধ্যস্থতাকারী নাই" এই জিগির তুলিয়া তাহারা দলত্যাগ করে। আলী এইসব খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাহরাওয়ান নদীর পাড়ে তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

মধ্যস্থতার সভায় কি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা দুষ্কর। তবে তাহাতে বিভিন্ন অভিযোগ এবং প্রত্যাভিযোগ উত্থাপিত হয়। ঘটনা যাহাই হউক, সর্বস্বীকৃত খলিফা আলী সজ্ঞানে বা ভুলক্রমে মধ্যস্থতা মানিয়া লইয়া খেলাফতে স্বীয় অধিকারকে বিঘ্নিত করেন। নিছক একজন গভর্নর মুয়াবিয়া খেলাফতে তাঁহার আইনানুগ দাবির ভান করিয়া জয়লাভ করেন। মধ্যস্থতাকারিগণ উভয়কেই 'ক্ষমতাচ্যুত' করেন। ইহার অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাহারা আলীকেই ক্ষমতাচ্যুত করেন, কারণ মুয়াবিয়া তখন খলিফা ছিলেন না, তবে তাহারা একজন নূতন খলিফা নির্বাচিত করিবার পন্থা সম্পর্কেও প্রস্তাব করেন নাই। ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মুয়ারিয়া স্বয়ং জেরুজালেমে নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমবারের মতো ইসলামে দুইজন খলিফার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে মসজিদে যাইবার সময় আলী একজন খারেজীর আক্রমণে আহত হন এবং দুইদিন পর পরলোকগমন করেন।

আলীর হতাশ অনুসারিগণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে হাসান সমাগত অনিবার্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিচলিত হন। এই সময় মুয়াবিয়া অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে, হাসান অবসর গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী তাঁহার আবাসগৃহে চলিয়া যাইতে রাজি হইলে তিনি তাঁহাকে একটি রাজকীয় ভাতা ও নিরাপত্তা প্রদান করিবেন। হাসান তাহাই করেন। অতঃপর মুয়াবিয়া দামেস্কে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া ইসলামের অবিসংবাদিত খলিফায় পরিণত হন।

এইভাবে সনাতন খলিফাদের যুগ শেষ হয়। এই যুগটিকে খাঁটি ধর্মতন্ত্রের যুগ হিসাবে মান্য করা হয়, যখন আল্লাহর আইনই ছিল দেশের আইন এবং সুন্নাহ্ বা রসুলের (সঃ) আদর্শ ছিল একমাত্র পথ যাহাকে প্রত্যেকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন প্রায় সব মুসলমান সর্বদা কার্যক্ষেত্রে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে এই যুগের কথা উল্লেখ করে এবং এই যুগের আদর্শ ফিরিয়া পাইতে চায়। ইসলামের কোনো কোনো ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই যুগকে 'প্রজাতান্ত্রিক' ও 'গণতান্ত্রিক' উভয়ভাবে উল্লেখ করেন। প্রজাতান্ত্রিক এইভাবে বলা যায় যে, একমাত্র আলী ব্যতীত কখনও পারিবারিক বংশে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হয় নাই। গণতান্ত্রিক ইহা নিশ্চয়ই ছিল না। বড় জোর ইহাকে একটি স্বল্পলোকশাসিত রাজ্য (Oligarchy) বলা যায়। নীতিগতভাবে খেলাফতে কোরাইশদের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান একটি অতি ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী দলের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইত।

কৃষ্ণ সা গ র
বাইজান্টীয়গণ
কায়রোয়ান
ভূ ম ধ্য সা গ র
দামেস্ক
জেরুজালেম
ফুস্তাত
তেসিফোন
কুফা
রাই
পারসিপোলী
মক্কা
লোহিত সাগর
আরাল
সির
ইসলামের বিস্তৃতি
খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল ৬৩২-৬৬ খ্রীঃ
উমাইয়াদের আমল ৬৬১ - ৭৫০ খ্রীঃ
আব্বাসীয়দের আমল ৭৫০ - ৮০০ খ্রীঃ
০
৬০০
মাইল
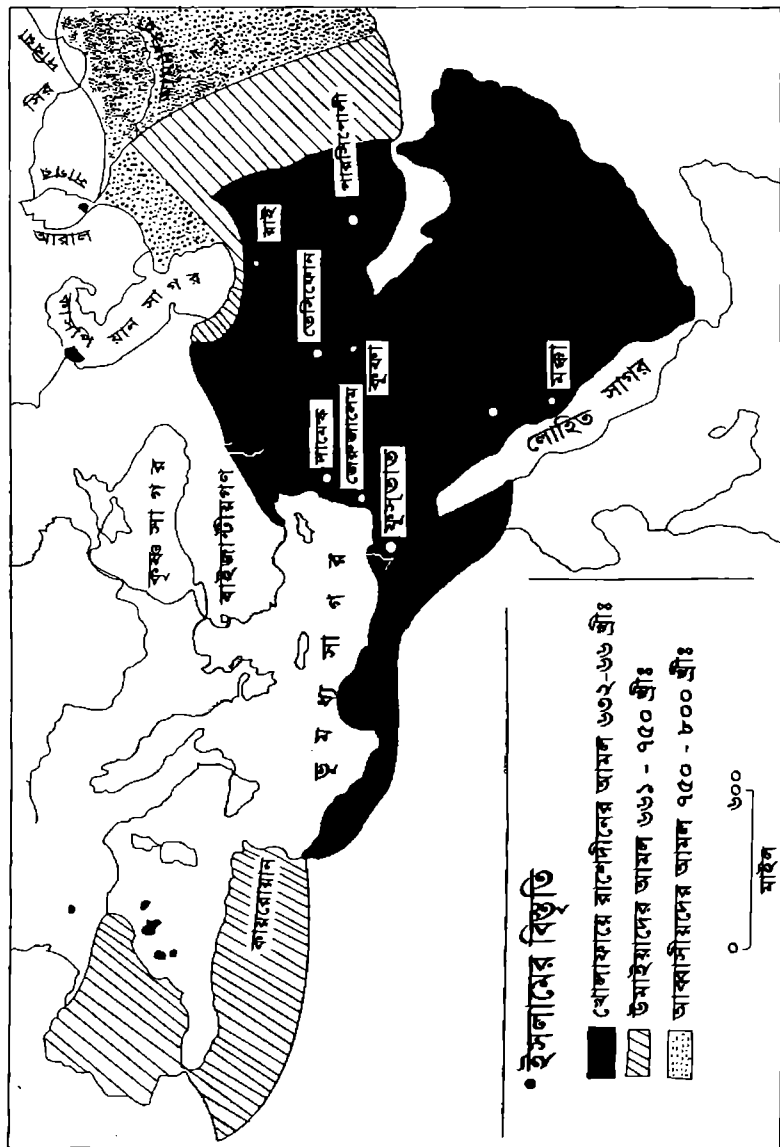
ষষ্ঠ অধ্যায়

উমাইয়া বংশ ৬৬১ - ৭৫০

সুফিয়ান শাখা

মুয়াবিয়া ১ম (৬৬১-৬৮০) ইয়াজিদ ১ম (৬৮০-৬৮৩) মুয়াবিয়া ২য় (৬৮৩)

মারওয়ান শাখা

মারওয়ান ১ম (৬৮৩ - ৬৮৫), আবদ আল-মালিক (৬৮৫-৭০৫), ওয়ালিদ ১ম (৭০৫-৭১৫), সুলায়মান (৭১৫-৭১৭), ওমর ২য় (৭১৭ - ৭২০), ইয়াজিদ ২য় (৭২০-৭২৪), হিশাম (৭২৪-৭৪৩), ওয়ালিদ ২য় (৭৪৩-৭৪৪), ইয়াজিদ ৩য় (৭৪৪), ইব্রাহীম (৭৪৪), মারওয়ান ২য় (৭৪৪ - ৭৫০)

মুয়াবিয়ার খেলাফতের পদে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি বিশ্বে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। মদিনা যুগের 'প্রজাতন্ত্র' পরিত্যাগ করিয়া নিজ বংশকে তিনি বাইজান্টাইন ও পারস্য ধাঁচে গঠন করেন। তবে ঐতিহ্যবাদীদিগকে দেখাইবার জন্য এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হইবার রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহার পুত্র ইয়াজিদকে আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট হাজির করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করিবার সুযোগ দান করেন। কিন্তু এই রীতি শীঘ্রই পরিত্যাগ করা হয়। ফলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা পরিবারের মধ্যে যিনি সর্বশক্তিশালী তিনিই উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও কোনো খলিফাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না এবং উমাইয়া খলিফাদের তালিকা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে একজন খলিফার রাজত্বকাল ছিল গড়ে মাত্র ছয় বৎসর। মাত্র চারিজন দশ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন। পরবর্তীদের মধ্যে তিনজন এক বৎসরও স্থায়ী হন নাই।

উমাইয়াদের সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য লাভ করি সেগুলি আসে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আব্বাসীয় ঐতিহাসিকদের নিকট হইতে। তাঁহারা সেই বংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং ইহার শাসকদিগকে আমোদপ্রিয় ও মদ্যাসক্ত এবং জোরপূর্বক খেলাফত দখলকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই বর্ণনা ইহাদের অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের সবাই মদ্যাসক্ত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন না, এমন কি তাহাদের অনেকে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং ইহার সীমান্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। উমাইয়া খলিফাগণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হন, যাহার মধ্যে ধর্ম ও কৃষ্টির পরস্পরবিরোধী উপাদান বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা শাসনকার্যের ব্যাপারেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উমাইয়াগণের কৃতিত্ব একেবারে তুচ্ছ নহে।

খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যেকে ৩০০ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের পর কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে 'খ্রিষ্টান' রাষ্ট্র এবং অশোকের নেতৃত্বে 'বৌদ্ধ' রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সংগ্রামশীল বিজয়মুখী ইসলামের ক্ষেত্রে এই প্রথা প্রযোজ্য নহে। রসুলের

(সঃ) জীবদ্দশায় লোকজন বিভিন্ন কারণে এবং কোনো কোনো সময় পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যে ইসলামে যোগদান করে। অনেকে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁহারা বিশ্বাসীদের মূল খুঁটিতে পরিণত হন এবং সময়ের সাথে সাথে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য অতন্দ্রপ্রহরী হিসাবে কাজ করেন। প্রথমদিকে খারেজিগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিঘোষিত নীতিকে রক্ষা করিবার জন্য আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অনেকেই নিছক সুযোগ সুবিধার জন্য ইসলামের বাণী গ্রহণ করেন। উমাইয়া বংশের সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কাবাসিগণ নিশ্চয়ই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুহম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিরর্থক দেখিয়া তাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন এবং নূতন আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহারা ইসলামের আইন মানিয়া চলেন এবং রীতিনীতি পালন করেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ছিল না বলিয়া তাঁহারা ইসলামের জন্য তাঁহাদের স্বীয় উন্নতি বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা করিতেন না।

আবার অনেকে এরূপও ছিলেন যাহাদিগকে জোরপূর্বক ইসলামের আওতায় আনা হয়। ইহাদের অনেকেই ছিল বেদুইন আরবের গোত্রগুলির লোক। ইহাদিগকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) পরাজিত করেন কিন্তু পুনরায় আবুবকরকে ইহাদিগকে জয় করিতে হয়। তাহারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিতে আগ্রহী ছিল। বিদেশীদের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে পারিলেই শুধু তাহারা মদীনার আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উমাইয়াগণ তাহাদের পূর্বসূরিদের ন্যায় গোত্রীয় লোকদিগকে রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে এবং তাহাদের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধেও ইহাদিগকে ব্যবহার করে। খাঁটি ইসলামপন্থিগণ উমাইয়াদিগকে ঘৃণা করেন এবং ওলামাগণ ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। অপরদিকে সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল উমাইয়াদের হাতে। ফলে খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি যুদ্ধে তাহারা জয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।

বাইজান্টিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আরবদের জন্য তখনও বিজয়ের অসম্পূর্ণ কাজ ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। ইহার ধন-সম্পদ ইসলামের যোদ্ধাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালে মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে জলে ও স্থলে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু বোধ হয় ওসমান হত্যার দ্বারা সৃষ্ট গৃহযুদ্ধের ফলে তিনি এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়া সম্রাট তৃতীয় কন্সটান্সকে (৬৪২-৬৬৮) কর প্রদান করিয়াও শান্তি কিনিতে সম্মতি প্রদান করেন।

খলিফা হিসাবে তাঁহার অবস্থান দৃঢ় করিবার পরই মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কাজ আরম্ভ করেন। ৬৬৮ সালের শীতকালে তাঁহার একজন সেনাপতি পরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক সাহার্য্যপুষ্ট হইয়া কনস্টান্টিনোপল হইতে বসফরাসের অপর পাড়ে কালসিডনে (আধুনিক কাদিকয়) পৌঁছেন। পরবর্তী বসন্তে তাহারা রাজধানী অবরোধ করে। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং সম্রাট চতুর্থ কন্সটান্টাইন আরবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উৎসাহী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সফলতা অর্জন সম্ভব হয় নাই। অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয় কিন্তু এই অভিযান খলিফার নিকট রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ হইয়া

উঠে। ইয়াজিদকে এই অবরোধের নায়ক বলিয়া স্বীকার করা হয়। ফলে খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে ইয়াজিদের নাম ঘোষণা করিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে সুবিধা হয়।

তবে উমাইয়াগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাহাদের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে নাই। সমুদ্র পথে কয়েকটি যুদ্ধ ছাড়াও এশিয়া মাইনরের সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করা আরবদের একটি নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন কার্যে পরিণত হয়।

কনস্টান্টিনোপলের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে খলিফা সুলায়মানের (৭১৫-৭১৭) রাজত্বকালে। তাঁহার ভ্রাতা মাসলামা বসফরাসের উভয় পাড় অধিকার করেন এবং ৭১৬ সালের আগস্ট হইতে ৭১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখেন। এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত। এই বিবরণে আরবগণ কর্তৃক নাপথা এবং অবরোধের জন্য বিশেষ ধরনের গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়াও তাহারা বসফরাসের উপর শিকল টাঙ্গাইয়া যোগাযোগের ব্যবস্থাও সহজ করিয়াছিল। আরবদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'গ্রীক ফায়ার' বা গ্রীক আগুনের বিষয়ও এই বিবরণে উল্লেখ আছে। শেষ পর্যন্ত মারাশের অধিবাসী একজন সিরিয়ান এবং এক নূতন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট লিউ রাজধানী রক্ষা করেন। আরব শিবিরের দুর্ভিক্ষ ও রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অত্যাধিক কনকনে শীতের দ্বারা তিনি সাহায্য লাভ করেন। তবে মাসলামা কিছুতেই হাল ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নূতন খলিফা দ্বিতীয় ওমরের আদেশে তিনি অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অনেক বৎসর পর ৭৮২ সালে আব্বাসীয় খলিফা মাহদীর সময় আরবগণ পুনরায় কনস্টান্টিনোপল অধিকারের চেষ্টা করে। এই সময় বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সম্রাজ্ঞী আইরীন অতি দ্রুত খলিফাকে 'কর' প্রদান করিতে সম্মত হন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরবগণ কখনও এশিয়া মাইনরে আধিপত্য লাভে সক্ষম হয় নাই। বিভিন্ন উপায়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা ওসমানীয় সুলতান মুহম্মদ 'দিগ্বীজয়ী'র দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়।

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তার

৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে আরবগণ তিউনিশিয়ায় কায়রোয়ান নামক সামরিক নগরী নির্মাণ করিয়া ইহাকে উত্তর আফ্রিকা বা আরবদের কথিত ইফরিকিয়া বিজয়ের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আরবগণ বাইজান্টাইনদিগকে এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমানগণ কর্তৃক কার্থেজ অধিকারের সাথে সাথে বাইজান্টাইন শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে নিযুক্ত গভর্নর মুসার নেতৃত্বে মিসর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা আরব শাসনের আওতাধীনে আসে এবং পূর্বের ন্যায় মিসর হইতে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া সরাসরি দামেস্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণ হেমিটিক (Hamitic) নামে পরিচিতি শাখার লোক এবং খুব সম্ভবত তাহারা সেমিটিক জাতীয়। তাহাদের মধ্যে উপকূলীয় শহরের অধিবাসীবৃন্দ খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রথম দিকে অনেক খ্রিষ্টান পণ্ডিতের জন্ম দেয়। এই সব পণ্ডিতের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইলেন সেন্ট অগাস্টাইন। বার্বার গোত্রগুলির মধ্যে উপরের দিকে বাসকারী সংখ্যাগুরু লোকজনদের নিকট খ্রিষ্টান ধর্ম তেমন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বার্বারগণ মুসলিম আরবদের অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহারা ইসলামের

অনুগামী হইয়া যায় এবং আরও বিজয়ের জন্য তাহারা আরববাহিনীগুলির সঙ্গে যোগদান করে।

৭১১ খ্রিষ্টাব্দে মুসার একজন বার্বার সহকারী তারিক একটি সম্পূর্ণ বার্বার আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে স্পেনে প্রবেশ করেন। তারিক একটি বিশাল পাহাড়ের নিকটে তাহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। 'জাবাল-আল-তারিক' বা তারিকের পাহাড় যাহা বর্তমানে জিব্রাল্টার নামে খ্যাত এখনও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। তাঁহার অভিযানের ফলে সে দেশের অতি গোলযোগপূর্ণ অবস্থা প্রকাশ পায়। ৭১১ সালের বসন্তে লুণ্ঠনাক্রমণ হিসাবে সূচিত অভিযানের দ্বারাই গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে স্পেনের অর্ধেক বিজিত হয়।

স্বীয় ভৃত্যের নয়নাভিরাম কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসা ১০,০০০ আরব সিরীয় সেনাবাহিনী লইয়া স্পেনে প্রবেশ করেন এবং তারিক কর্তৃক পাশ-কাটাইয়া যাওয়া কিছুসংখ্যক নগরী তিনি জয় করেন। টলেডোতে তিনি তারিকের সহিত মিলিত হইবার পর তাহাকে তিরস্কার করেন এবং বিনা অনুমতিতে কাজ করিবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করেন। অতঃপর স্পেনে মুসলমানদের অগ্রগতি দেশ বিজয়ের পরিবর্তে বিজয়ী বাহিনীর কুচকাওয়াজের রূপ পরিগ্রহ করে। ৭১৩ সালে মুসার সেনাবাহিনী বিস্কে উপসাগরে পৌছে।

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের আদেশক্রমে মুসা তাঁহার পুত্র আবদ্-আল আজীজকে বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তারিকসহ্ দামেস্ক অভিমুখে ফিরিয়া যান। শত শত বন্দী, ভিসিগথিক রাজপুত্র, দাসী, ক্রীতদাস এবং বিপুল যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ইহা ছিল একটি সগৌরব শোভাযাত্রা। মুসা দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের পর খলিফা সুলায়মান সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তারিকের সঙ্গে মুসা যেরূপ ব্যবহার করেন তিনিও মুসার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেন। 'অবাধ্যতার' জন্য তিনি মুসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার নিকট হইতে ধনসম্পদ কাড়িয়া লন। কথিত আছে যে মুসা হেজাজের এক অখ্যাত কোণে দরিদ্র ভিক্ষুক অবস্থায় মারা যান।

ইতিমধ্যে মুসলমানগণ স্পেন বিজয় সমাপ্ত করেন এবং ইহাকে আল-আন্দালুস (বোধ হয় 'ভ্যান্ডালদের দেশ') নামে অভিহিত করেন। ৭১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমানগণ পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের গ্রাম এবং গির্জাগুলিতে আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত ৭৩২ সালে হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যু শতবার্ষিকীতে আবদ-আল-রহমানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী প্রসিদ্ধ টুর্সের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল দ্বারা পরাজিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের আক্রমণসমূহ অব্যাহত থাকিলেও এবং এভিগণ ও লিয়ন্স-এর ন্যায় বিভিন্ন ফরাসি শহরসমূহ মুসলমানদের দখলে থাকিলেও মুসলমানদিগকে পশ্চিম ইউরোপের নিরাপত্তার পথে চিরস্থায়ী হুমকি বলিয়া মনে করার পর্ব শেষ হয়।

প্রায় ৮০০ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ স্পেনে অবস্থান করে। ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ক হইতে বহিষ্কৃত উমাইয়াগণ করডোভায় রাজধানী স্থাপন করিয়া স্পেনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। বহু শতাব্দী যাবৎ স্পেনের মধ্য দিয়া ইসলামি ভাবধারা পাশ্চাত্যে প্রবাহিত হয়। আরবগণ কর্তৃক বিজিত দেশগুলির মধ্যে স্পেনই একমাত্র দেশ যাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয় নাই। আবার ইহাই একমাত্র দেশ যাহা খ্রিষ্টানগণ কর্তৃক পুনঃবিজিত হয় এবং যাহার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবলুপ্ত। স্পেনের ইসলামের কাহিনী, অধিকাংশ বার্বার ও সিরীয় (মূর) কার্যকলাপের বিবরণ এবং হৃদয়গ্রাহী– যাহা এই গ্রন্থের আওতার বাহিরে।

এশিয়ায় অগ্রগতি

বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় ছাড়াও উমাইয়াগণ অন্তত কিছুকালের জন্য ইরাক ও ইরানের বিদ্রোহী অধিবাসীদিগকে শান্ত রাখিতে সক্ষম হয়। আধুনিক উজবেকিস্তানের শির-দরিয়া (জাক্সারটাস) নদীর অপর তীরেও তাহারা একটি ঘাঁটি লাভ করে এবং তুরানিয়ানদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে। এই অভিযান আবদ-আল-মালিকের খেলাফতের সময় আরম্ভ হয় এবং প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে শেষ হয়। এই অভিযানগুলির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মক্কার নিকটবর্তী তায়েফের জনৈক স্কুল শিক্ষক হাজ্জাজ-ইবনে-ইউসুফ। পারস্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে রক্তপিপাসু অত্যাচারী হিসাবে এবং আরবগণ তাঁহাকে ইসলামের রক্ষাকারী হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি নয় বৎসর মক্কা শাসন করেন এবং সিংহাসনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ধ্বংস করেন। প্রাচ্যের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি অনেক 'কর্তনোপযোগী মস্তক' অবলোকন করেন এবং সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী তিনি ১,২০,০০০ শিরোচ্ছেদ করেন।

ইরানকে শান্ত করিবার জন্য তিনি কয়েক সহস্র আরববাহিনী কোতাইবার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন, যিনি মার্ভ ও বল্‌খ্ (আধুনিক আফগানিস্থানে) অধিকার করিয়া আমু-দরিয়া (গ্রীক, 'অক্সাস' আরবি, 'জাইহান') অতিক্রম করেন। ৭০৫ ও ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি অভিযানে বোখারা ও সমরখন্দ এবং খারিজিম (খিভা) অধিকার করেন। এইগুলি আধুনিক উজবেকিস্তানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। পরে তিনি উত্তরে শিরদরিয়া (গ্রীক, 'জাক্সারটাস' আরবি, 'সাইহান') নদী অতিক্রম করিয়া তুর্কি-বৌদ্ধ শক্তিশালী অবস্থানগুলিতে হাজির হন এবং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন।

আরেকজন সেনাপতি, মুহম্মদ-আল-সাগাফী (মুহম্মদ -বিন-কাশেম) দক্ষিণে ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৭১০ ও ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মাকরান, বেলুচিস্তান, হায়দরাবাদ দখল করেন এবং উত্তরে সিন্ধু নদ ধরিয়া পাঞ্জাবের মূলতানে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের এই অংশকে ক্রমে হিন্দু ধর্মীয় আনুগত্য হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং পরে এইগুলি মুসলমান এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ইহা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের মূল এলাকায় রূপান্তরিত হয়।

উমাইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর কর্তৃক প্রায় একটানা বিস্তৃতির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিস্তৃতির ফল হইল আমুদরিয়া হইতে সুদান পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য। এই কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিশাল আকার ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইতে আরম্ভ করে। আব্বাসীয়গণ ক্ষমতায় আসিবার সময় পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে ইহা আরও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। যাহা পিছনে ফেলিয়া আসে তাহা একটি সংযুক্ত ইসলামি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন মাত্র।

সপ্তম অধ্যায়
উমাইয়াদের সময় অভ্যন্তরীণ উন্নতি

প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির যুদ্ধ এবং অগাধ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বেদুইন গোত্রগুলিকে একাধারে ব্যস্ত ও সুখী রাখে। তবে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এইসব গোত্র তাহাদের তেজস্বিতা নিঃশেষ করিয়া ফেলে। তাহাদের একটি বড় অংশ নিজেদের অর্জিত সম্পদ উপভোগ করিবার জন্য মরুভূমির পুরাতন আবাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। অবশিষ্টাংশ বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে ছড়াইয়া পড়ে এবং বসতি এলাকার সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

এতদসত্ত্বেও শাসক বংশ অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়, অবশ্য এইগুলির কোনোটিই এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্যা নহে। আরবগণ যেহেতু সাধারণভাবে কৃষিকার্যকে মর্যাদাহীন মনে করিত এবং আবাসিক জীবনের বিড়ম্বনার সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক রাখিত তাই মুয়াবিয়া এবং তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ শাসনকার্যের জন্য বিজিত জাতিগুলির মধ্যে বিশেষত পারস্যবাসি ও গ্রীকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, এই বংশের তিনজন করিৎকর্মা খলিফাদের মধ্যে খলিফা হিশাম (৭২৪ -৭৪৩) সাসানীয় রাজাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা পাহলভী ভাষা (মধ্য পারস্য) হইতে অনুবাদ করিয়া লন।

শাসন ব্যবস্থা
সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিলঃ

১। কুফা—যাহা ইরাক, ইরান, ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ঘাঁটি হিসাবে কাজ করে;
২। হিজাজ, আরব উপদ্বীপের জন্য;
৩। জজিরা, সিরিয়া ও উত্তরাঞ্চলের জন্য;
৪। মিসর এবং স্পেন;
৫। ইফরিকিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের জন্য।

প্রত্যেক প্রদেশে একজন প্রতিনিধি থাকেন, যাঁহাকে 'আমীর' বা 'সাহেব' বলা হয় যিনি খলিফার দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রদেশের সমস্ত কাজের কৃতিত্ব থাকে প্রতিনিধির হাতে। তিনি বিভিন্ন এজেন্ট ও বিচারক নিযুক্ত করেন এবং প্রদেশের রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকেন। প্রদেশের উদ্বৃত্ত খাজনা তিনি রাজধানী দামেস্কে প্রেরণ করেন। খলিফা প্রায়ই তাঁহার নিজস্ব কর আদায়কারী প্রেরণ করেন, কিন্তু উমাইয়া খেলাফতের শেষের দিকে খলিফাগণ এত দুর্বল ছিলেন যে, রাজ-প্রতিনিধিগণই কার্যত শাসক হইয়া যান। প্রতিনিধিগণ বিশাল ধন-সম্পদ আয়ত্ত করেন। একমাত্র প্রতি শুক্রবার জুম্মার খোতবায় খলিফার নাম বিশেষভাবে পাঠ করিবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা খলিফার অধীনস্ত লোক।

বিচরকগণ শুধু মুসলমানদের জন্য বিচারে বসেন। অমুসলিমগণের জন্য তাহাদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী পৃথক বিচারের ব্যবস্থা ছিল। এইসব প্রতিষ্ঠানে মুসলমানগণ অর্থ সাহায্য

করেন। তাহা ছাড়া এতিমদের জায়গা সম্পত্তিও তাঁহারা পরিচালনা করেন।

অনেক যুগ ধরিয়া উমাইয়াগণ বাইজান্টাইন ও পারস্য মুদ্রা ব্যবহার করেন। যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া তাহারা বোধ হয় এই মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। অধিকন্তু তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অতি ব্যস্ত থাকেন বলিয়া এইসব বিষয়ের প্রতি নজর দিতে পারেন নাই। প্রাথমিক খলিফাগণ নিশ্চয়ই ইসলামের ভাবমূর্তি ভঙ্গ করিতে এবং মুদ্রার উপর কোনো ছাপ অঙ্কিত করিতে ইতস্তত করেন। আবদ-আল-মালিকই (৬৮৫—৭০৫) প্রথম খলিফা যিনি নূতন মুদ্রা তৈয়ার করেন– যাহা তাঁহার নিজস্ব ছাপ এবং পবিত্র কোরআনের বাণী বহন করে। সাসানীয় রাজা খসরু আনুশিরের রাজত্বকালে পারস্যে তুলনামূলকভাবে সরল কর প্রথা ছিল। সভাসদ, নাইট সম্প্রদায়, রাজলিপিকার এবং রাজার চাকর-বাকরের জন্য করপ্রথা রহিত ছিল। পূর্বোল্লিখিতগণ ছাড়া সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত লোককে মাথাপিছু একটি করিয়া কর প্রদান করিতে হইত। কৃষক ও ব্যবসায়ী তাহাদের আয়ের এক নির্দিষ্ট শতাংশ নগদে বা দ্রব্যমূল্যে প্রদান করিত। প্রাথমিক খলিফাগণও এইভাবে পারস্যের করপ্রথার একটি মুসলিম সংস্করণ চালু করেন। সাধারণত পারস্যের অভিজাত শ্রেণীর ন্যায় আরব মুসলমানদিগকেও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অমুসলিমগণ অথবা 'মহাগ্রন্থের জাতিগুলি' নিয়মিত জিজিয়া কর প্রদান করেন। কৃষকদের মর্যাদা, যাহারা উমাইয়াদের সময় ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনারব (ওমর আরবদিগকে ভূমি ক্রয় করিতে বারণ করেন), মোটেই পরিবর্তিত হয় নাই। তাহারা সেই পারস্য বা বাইজান্টাইন এজেন্টদের নিকট যে কর প্রদান করিত এখনও সেই একই কর প্রদান করে। ফলে আরবগণ এবং তদনুরূপ ইসলাম ও বাইজান্টাইন এবং পারস্য সামাজ্যে প্রচলিত ভূমি ভোগ-দখলের শর্ত পরিবর্তন করে নাই এবং আধুনিক সময় পর্যন্ত ইহা মূলত ঐরকমই থাকে।

তবে আরবগণ যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিল জমি ভোগ-দখলের শর্ত অনুরূপ সহজ থাকে নাই। প্রথমত আরবের বাহিরে আরবদের ভূমির মালিকানা নিষিদ্ধ করিবার আইনটি ছিল একাধারে অবাস্তব এবং অজনপ্রিয়।। ওসমানের পরিবারস্থ লোকজন ভূমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অন্যভাবে বিষয়টি চিন্তা করেন। এই নীতি এমন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে উমাইয়াদের সময় আরবগণ শুধু নিজেরাই জমি ক্রয় করে নাই বরং সরকারের নিকট হইতে জনগণের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 'ইজারা' নেয়। নিজেরা আরব এবং মুসলমান বিধায় নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য তাহাদিগকে কোনো কর প্রদান করিতে হইত না।

দ্বিতীয়ত প্রাথমিক যুগের নেতৃবৃন্দ দুইটি সমস্যায় পতিত হন। একটি হইল সমস্ত জাতীয়তা পরিহার করিয়া সমগ্র মুসলমানদিগকে এক সমাজভুক্ত করিবার ইসলামি দাবি এবং অপরটি হইল তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদের অনুভূতির দাবি। তাঁহারা মনস্থির করিতে অপারগ হন যে, সমস্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবেন, নাকি শুধু আরব মুসলমানদিগকে এই সুবিধা প্রদান করিবেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ওমর অন্ধ দেশহিতৈষণার পথ গ্রহণ করেন। প্রথম যুগের উমাইয়াগণ আরবগণের উচ্চপদমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। যতদিন অগ্রগামী মুসলিম বাহিনীগুলি রাজধানীতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রেরণ করিতে থাকে ততদিন কে কর প্রদান করিল বা কে অব্যাহতি পাইল, তাহাতে কোনো খোঁজ-খবর ছিল না।

কিছু কিছু ত্যাগ করিবার মতো যথেষ্ট সম্পদ শাসকশ্রেণীর নিকট তখন ছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বিস্তৃতি শিথিল হইয়া আসার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীলতায় পদার্পণ করিলে সরকার ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করে।

উমাইয়াদের মধ্যে অত্যন্ত ধার্মিক খলিফা দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন। একজন খলিফার প্রধান দায়িত্ব হইল জনগণকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, কর আদায় করা নহে। ফলে তিনি সমস্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করেন। তবে জিজিয়া কর কিছু দিনের জন্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। এই দোদুল্যমান অবস্থা অমুসলিম ও অনারব ভদ্রসম্প্রদায়কে একটি নিদারুণ অর্থনৈতিক অবস্থায় নিক্ষেপ করে, কারণ তাহারা জানে না এক খলিফা হইতে অন্য খলিফার কর প্রথা কিরূপ হইবে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষত ইরানে অসন্তোষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহা উমাইয়াদের পতনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

জীবন ও অবকাশ

মরুভূমির কঠোর ও শুষ্ক জীবন হইতে বাহির হইয়া বাইজান্টাইন ও পারস্য নগরসমূহের কেন্দ্রের চাকচিক্য ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে আগমন, দারিদ্র্যের তাঁবু হইতে ভোগবিলাসের কোলে পতন, বিশাল সম্পদ এবং অনেক ক্রীতদাস-দাসীর মালিকানা—এই সমস্ত কিছু আরবদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিতে একটি ছাপ রাখিয়া যায়। এই সমৃদ্ধিশালী আরবদের চরিত্রগঠনের পথে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত ইসলামের অনাড়ম্বর শিক্ষা ছিল অতি স্বল্প পরিসরময়। সুতরাং তাহারা এই সমস্ত গুণের প্রতি মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া নিজেদিগকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং পূণ্যকাজের বাহ্যিক রীতিনীতি পালন করত তাঁহারা নিজদিগকে সদ্যপ্রাপ্ত সম্ভোগের সাথে গা ভাসাইয়া দেন। ওসমানও এই উত্তম জীবনের প্রতি অমনযোগী ছিলেন না। অতএব ওসমান হইতে আরম্ভ করিয়া উমাইয়া খলিফা এবং তাহাদের প্রতিনিধিরা যেন দশম পোপ লিওর (১৫১৩-১৪২১) সেই প্রসিদ্ধ বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ্ আমাদিগকে এই সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, চল আমরা ইহা উপভোগ করি।'

আবুল ফারায আল্-ইস্পাহানি (৮৯৭-৯৬৭) নিজেকে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের বংশধর বলিয়া দাবি করেন। তিনি কিতাব আল-আঘানী (গানের গ্রন্থ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি 'সর্বাধিক বিক্রিত' পুস্তকের সম্মান লাভ করে। লেখক এই গ্রন্থ রচনায় যেরূপ আনন্দ লাভ করেন পাঠকগণও ইহা পাঠ করিতে অনুরূপ আনন্দ লাভ করেন। অতি পরিশ্রম করিয়া তিনি উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের আরবদের বিভিন্ন ঘটনাবলী, গান, গল্প, কবিতা, খেলাধুলা, অবসর বিনোদন, কৌতুক ইত্যাদি বহু কিছু সংগ্রহ করেন যাহা শ্রোতাদিগকে আনন্দ দান করে। তিনি ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ। সাহিত্য ও সঙ্গীত সংগ্রহকারী এবং একজন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক। বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এই গ্রন্থকে 'আরবদের সামাজিক বিবরণ' বলিয়া বিবেচনা করেন।

খলিফা বা সেনাপতি যেই হউন না কেন, কেহই ইস্পাহানির নিরীক্ষা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। মুয়াবিয়া কিভাবে গল্প ও কবিতা শুনিয়া এবং গোলাপী শরবত পান করিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিত্তবিনোদনে মগ্ন থাকিতেন তিনি তাহার চিত্র অঙ্কন করেন। অন্যান্যদের মত

খলিফাদের মদ্যপান করিবার অভ্যাসের কথাও বর্ণনা করেন। কথিত আছে যে, ইয়াজিদ প্রত্যহ, প্রথম ওয়ালিদ প্রত্যেক দিন; হিশাম প্রত্যেক শুক্রবার নামাজের পর; আবদ আল-মালিক মাসে একবার মদ্যপান করিতেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদ মদের জ্বালায় সাঁতার কাটিতেন এবং প্রত্যেকবারে একঢোক পান করিতেন।

ধনী আরবগণ শিকার এবং ঘোড়দৌড় ভালবাসিতেন, কারণ উভয় খেলাই আরবদের দেশীয়। প্রথম ইয়াজিদের শিকারী কুকুর ছিল। এইগুলির পায়ে সোনালী বলয় ছিল এবং প্রত্যেক কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক একটি বিশেষ রক্ষক নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম ধনীগণ মোরগের লড়াই এবং পাশাখেলা উপভোগ করিতেন।

দাবাখেলা ভারতবর্ষ হইতে এবং অক্ষখেলা (Back garmon) ইরান হইতে আরবে আসে। অক্ষখেলায় (ফার্সি, নার্দ, আরবি, তাওলা) আধুনিক আরবগণ পারস্যভাষায় গণনা করিতেন। পরে উভয় খেলাই ইউরোপে চালু করা হয়, যেখানে 'রুক' হইল ফার্সি রুখ্ (Rokh) এবং চেকমেট (Cheackmate) হইল ফার্সি শাহ্মত (রাজা পরাজিত), যেভাবেই হউক ফার্সি ফিল (হাতি) আরবি আল-ফিল এবং স্পেনীয় এলালফিল (Elalfil) ইংরেজিতে বিশপ নাম ধারণ করে, আবার ফার্সি উজির ইংরেজিতে কুইন নামধারণ করে।

কিতাব আল-আঘানীর গ্রন্থকারের সরবরাহকৃত অতি চমৎকার তথ্য হইল পবিত্র নগরী মক্কা ও মদিনার অবসর বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও পাপকার্যের কেন্দ্রস্থলে রূপান্তর লাভ। অতি মূল্যবান ভাতাপ্রাপ্ত আরবদের একটি বিরাট অংশ জীবন উপভোগ করিবার জন্য আরবদের মধ্য শহরে তাহাদের 'জন্মভূমিতে' যান। সেখানে থাকিত ক্লাব, মদ্যশালা, অপকীর্তির গৃহসমূহ ও চমৎকার সেলুন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত বেলীনৃত্য পরিবেশক, আদি সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়িকার দল। অসংখ্য ক্রীতদাসী প্রভুদের সেবায় নিয়োজিত থাকিত। প্রভুরা কুশানে হেলান দিয়া রূপালী বা সোনালী পাত্র হইতে মদ পান করিত। এই সমস্ত অনুষ্ঠিত হইত কা'বা এবং রসুলের (সঃ) মাজারের অতি সন্নিকটে।

ইমাম হোসেনের কন্যা এবং রসুলের (সঃ) নাতনী সুকাইয়নার (অনারবদের সকিনা) ন্যায় মহিলার গৃহও মদীনায় এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল।* তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ অনেক স্বামীকে আকর্ষণ করে এবং সবাই তাঁহার ইচ্ছা ও মোহিনীশক্তির বশীভূত হয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও বাস্তব কৌতুক ছিল শহরে আলোচনার বস্তু। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (এই পেশাকে রসুল (সঃ) নিষেধ করিয়াছেন) এবং ফ্যাসানের প্রবক্তা। তাঁহার কেশের বাহার সাম্রাজ্যের সমস্ত মহিলাদের জন্য অনুকরণীয় ছিল।

---

* মুলত এই উক্তি ভিত্তিহীন। কিতাবুল আঘানী একটি রসাত্মক গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থের তথ্য ইতিহাসের তত্ত্ব হইতে পারে না। সৈয়দা সকিনার ব্যাপারে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন; "প্রথম যুগের হাকামীয়দের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শহীদে কারবালা হোসাইনের কন্যা আস-সৈয়দা সুকাইয়না বা সকিনা যাঁহাকে 'যশ, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সৎগুণাবলীর দিক দিয়া তাঁহার সমকালীন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথমা হিসাবে বিবেচনা করা হইত। তাঁহার বাসগৃহ ছিল কবি, ফকিহ্ (আইন শাস্ত্রবিদ) এবং সর্বস্তরের জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের আশ্রয়স্থল। তাঁহার বাসগৃহের সভাগুলি ছিল প্রদীপ্ত ও প্রফুল্ল এবং সর্বদা তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় প্রাণোজ্জ্বল।" আমীর আলী, হিস্টরী অব দি সারাসিন্স। পৃঃ ২০১—২০২ দ্রষ্টব্য— অনুবাদক।

মক্কার নিকটবর্তী তায়েফের আকর্ষণ ছিল অন্যতম। সেখানে নবীর (সঃ) একজন অনুসারীর কন্যা এবং প্রথম খলিফা আবুবকরের নাতনী আয়েশা বাস করিতেন। তিনি সুকাইয়নার ন্যায় অত বিবাহ করেন নাই কিন্তু স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি পর্দা দিতে অস্বীকার করেন।**

হাজার হাজার হজ্জ্বযাত্রী এই দুই নগরীতে হজ্জের সময় আসিতেন এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করিতেন। অবশ্য এমন অনেকেও ছিলেন যাহারা এইগুলিকে অপছন্দ করিতেন।

খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী

চাকচিক্যময় অবসর বিনোদন ও পরম সুখের নিচে লুক্কায়িত থাকে সমস্যা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উমাইয়াগণ দুইটি প্রাথমিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। একটি হইল খেলাফতের উত্তরাধিকারের চিরন্তন প্রশ্ন। এই প্রশ্নে বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আলীর মৃত্যু এবং পরে মুয়াবিয়ার খেলাফতের গদীতে আরোহণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় যে, একমাত্র কোরাইশ বংশের লোকেরাই এই উচ্চপদের আশা করিতে পারে। খারেজীদের মতানুসারে যে কোনো লোক বংশ মর্যাদার সমর্থন ছাড়াই একমাত্র খাঁটি ধর্মীয় নৈতিকগুণাবলীর দ্বারা খলিফা হইবার উপযুক্ত-- এই নীতি পরিত্যাক্ত হয়। আইনানুগ পন্থীদের (Legitimist) মতানুসারে খেলাফত একমাত্র আলীর বংশধরদেরই প্রাপ্য– এই যুক্তিবাদীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা কোরাইশদের দাবি সমর্থনের মাধ্যমেও এই সমস্যার সমাধান হয় নাই, কারণ কোরাইশদের মধ্যেও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেকে সর্বোত্তম বিবেচনা করিতেন। কোরাইশ গোত্রগুলির মধ্যে যাহারা ক্ষমতার বাহিরে, তাহাদের বিবেচনায় খেলাফতের জন্য উমাইয়াগণ মোটেই উপযুক্ত নহেন। এই উমাইয়াগণই হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মক্কা হইতে বহিষ্কার করেন, ইহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ইহারাই ইসলাম গ্রহণ করেন শেষ অবলম্বন হিসাবে।

এইসব সমস্যার মধ্যে উমাইয়াদের সামনে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়, তাহা হইল স্থানীয় আরব গোত্রসমূহের বিদ্রোহ। ইসলামের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা গোত্রপ্রীতি সাময়িকভাবে রহিত করা হইয়াছিল, যদিও ওসমানের মাধ্যমে পুনরায় ইহা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং উমাইয়াদের সময় পুরাপুরিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নূতন সমাজে এই গোত্র-আনুগত্য উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবদের মধ্যে এক তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপ গ্রহণ করে। উত্তর আরবদিগকে সাধারণত কায়সীয় এবং দক্ষিণ আরবদিগকে সাধারণত কালবীয় বা ইয়ামানীয় বলা হয়। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় অতি দীর্ঘ ও তিক্ত, যাহা উমাইয়া বংশের পতনের একটি কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বংশের সুফীয়ানীগণ দক্ষিণ আরবদের সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে প্রথম মারওয়ান তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন উত্তর আরবদের সহায়তায়। পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ তাঁহাদের মাতার বংশ অনুসারে উত্তর আরব বা দক্ষিণ আরবদের কোন্দলের শিকারে পরিণত হন।

** লেখক যে প্রকারের পর্দার কথা বলিতে চান সেরূপ পর্দা তখনও মুসলিম সমাজে চালু হয় নাই। মহিলাদের পৃথকভাবে থাকিবার প্রথা পারস্যে প্রচলিত ছিল অনেক প্রাচীনকাল হইতে। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের রাজত্বকালে মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রচলন হয়।–অনুবাদক।

কন্যা ফাতিমার মাধ্যমে খেলাফতের মালিক রসুলের (সঃ) বংশধরগণ ও তাঁহার সমর্থকগণ এই দাবি আলীর মৃত্যুর পরও পরিত্যাগ করে নাই। ফলে হাসান ও হোসাইন উমাইয়া-প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাব্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাসান সাম্রাজ্যের দাবির চাইতে হেরেম রক্ষা করিতে অধিক উদ্যোগী বলিয়া মনে হয়। তাই বার্ষিক এক লক্ষ দিরহাম ভাতা গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী এক ভিলায় অবসর জীবন-যাপন করিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহাকে রাজি করাইতে সক্ষম হন। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় একশত বিবাহ করিয়া তালাক দেন এবং যদ্বারা তিনি মিতলাক বা 'তালাকদানকারী' উপাধি অর্জন করেন। কথিত আছে যে, ৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সম্ভবত অন্তঃপুরের কোন্দলে তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তবে শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে, মুয়াবিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি একজন ইমাম ও শহীদ।

কনিষ্ঠভ্রাতা হোসাইন ভিন্নপ্রকৃতির। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্খী। পারস্য উপসাগরের উপরে অবস্থিত কুফা নগরীতে একত্রিত দলের তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রদান করেন। ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়াজিদ খলিফা হইলে হোসাইন তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন এবং গোপনে মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফায় তাঁহার অনুসারীদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এইসব অনুসারিগণ ইতিমধ্যে ইয়াজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। হোসাইনের দুর্ভাগ্য. ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার পরিবার-পরিজনের ক্ষুদ্র দলটি আধুনিক বাগদাদের দক্ষিণে কারবালা নামক এক মরুদ্যানে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। তথায় প্রায় সমস্ত পুরুষদিগকে হত্যা করা হয়, হোসাইনের শিরচ্ছেদ করা হয়, মহিলা ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হয়।

খেলাফত লাভ করিবার জন্য সমর্থকদের বিভিন্ন অকৃতকার্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ। কারবালার ঘটনাকে অন্য যেকোন অবস্থায় খুব সম্ভবত আরেকটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করা হইত। বস্তত সে সময় এই ঘটনাটি তেমন কোনো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই। তবে ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে কারবালার এই হঠাৎ আক্রমণ একটি গুরত্বপূর্ণ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। মৃত আলী ও হোসাইন প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নিকট তাঁহাদের জীবিত স্বত্বার চাইতে সমধিক ভয়াবহ শত্রু হিসাবে প্রতীয়মান হন। হোসাইন শহীদের নেতায় পরিণত হন এবং দশই মুহররম (৬৮০) তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী খেলাফতের বিরোধীদের মহাসম্মেলনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় শোভাযাত্রা মেসোপটেমিয়ার দেবতা তামমুজ (Tammuz) এর মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আত্মহত্যাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি আন্দোলন ও তিনটি শহীদ লইয়া আলীর সমর্থকগন ইসলামের মূলকেন্দ্র হইতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতঃ আদর্শ ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বলিত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করে।

আলীর বংশ খেলাফতের একমাত্র দাবিদার নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে আলীর সঙ্গে খেলাফত লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন জুবায়ের। তিনি এই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ [হযরত মুহম্মদের (সঃ) স্ত্রী আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র] প্রথমে হোসাইনের পক্ষ অবলম্বন করেন। হোসাইনের বিয়োগান্ত মৃত্যুর পর তিনি নিজেই খেলাফত দাবি করেন।

৬৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে ইয়াজিদ মদীনা ও মক্কায় একটি অভিযান প্রেরণ

করেন। এই দুই শহরে আবদুল্লাহর শক্তিশালী সমর্থক ছিল। মক্কা অবরোধ করিয়া বোমা* বর্ষণ করা হয়, ফলে কা'বা ভস্মীভূত হয় এবং কৃষ্ণপাথর ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ইয়াজিদ মারা যান এবং অভিযান কোনো সফলতা লাভ করিতে ব্যর্থ হয়। হেজাজ, ইরাক ও মিসরে আবদুল্লাহ খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। রক্তক্ষয়ী বিবাদে পরিশ্রান্ত জনসাধারণের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ছিলেন জনসমর্থনহীন উমাইয়াগণ ও চরমপন্থী আলী বংশের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যম। অধিকন্তু ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়াদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ তাঁহার রাজধানী মক্কা হইতে দামেস্কে স্থানান্তর করিতে রাজি হইলে তিনি সিরিয়াতেও জনস্বীকৃতি লাভ করিতেন। তবে তিনি মুসলমানদের যেদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা মক্কা ও মদীনাকে ইসলামের ধর্মীয় রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে দেখিতে চান বলিয়া দামেস্কের ন্যায় একটি অনারব শহরে রাজধানী স্থানান্তর করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না।

ইতিমধ্যে উমাইয়াদের মারওয়ানী শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান দক্ষিণ আরবদের সমর্থন লাভ করিয়া দামেস্কে ক্ষমতায় আসেন এবং উত্তর আরবদিগকে পরাজিত করেন। এই উত্তর আরব অধিবাসীরা ৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দ মারয্দাবিক নামক স্থানে আবদুল্লাহকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তবে আবদুল্লাহ ৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত হেজাজে খলিফা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর দুষ্টমতি হাজ্জাজ মক্কার দ্বিতীয় অবরোধের সময় তাহাকে পরাজিত করেন। হাজ্জাজ আবদুল্লাহর মস্তক দামেস্কে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর সাথে মুসলমানদের পুরাতন-পন্থীদের প্রভাব শেষ হয় এবং তদসঙ্গে 'ইসলামের জন্মভূমি' আরব উপদ্বীপের প্রভাবও সমাপ্ত হয়।

আরব বনাম অনারব মুসলমান

নবগঠিত সাম্রাজ্যের মুসলিম সমাজে সর্বনিম্নে বিরাজ করে ক্রীতদাসগণ– সাদা, কালো ও হলদে। এইসব ক্রীতদাসগুলিকে তুর্কিস্তান হইতে, মধ্য আফ্রিকা এবং ইরান হইতে, স্পেন ও ফ্রান্সের বিস্তৃত ভূ-খণ্ড হইতে আনা হয়। ইসলাম দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে নাই। ইসলামি আইনে যদিও অন্য একজন মুসলমানকে দাস করা নিষেধ কিন্তু কার্যত যেসব ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় না। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক উল্লেখিত ক্রীতদাসদের সংখ্যা হইতে বিচার করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি বাদ দিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ কিয়দংশে দাস অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সেনাবাহিনীতে একজন ভাড়াটিয়া সৈন্যের পরিচর্যার জন্যও ক্রীতদাস রাখা হইত বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

দাস ব্যবসা ছিল বেশ সচল লাভজনক। ইহা উনবিংশ শতাব্দী এবং আরবের কোনো কোনো অংশে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ ও ক্রীতদাসদের মধ্যে আইন সম্মত বিবাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু উপপত্নী রাখার অনুমতি রহিয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এইসব ক্ষেত্রে জন্মলাভ করা ছেলেমেয়ের মালিক হয় প্রভু এবং এইগুলিকে স্বাধীন বিবেচনা করা হয়। তবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাস মুক্ত করাকে ইসলামে পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের জন্য পুণ্যের কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ধার্মীক লোকগণ প্রায়ই তাঁহাদের ক্রীতদাস মুক্ত করিতেন।

* বোমা বর্ষণ বলিতে পাথুরে বোমাকে বুঝায়। ইহা মানজানিক নামক এক প্রকার হাতিয়ার হইতে নিক্ষেপ করা হয়।- অনুবাদক।

ক্রীতদাসদের পর উপরের সারিতে থাকে জিম্মিগণ বা ঐশীবাণী প্রাপ্ত ধর্মগুলির সদস্যবৃন্দ যথা ইহুদি, খ্রিষ্টান ও সাবিয়ান। ইহাদের সম্পর্কে কোরআন শরীফের প্রথম দিকে উল্লেখ রহিয়াছে। পরে আরব নেতৃবৃন্দ দেখিলেন 'মহাগ্রন্থের অধিকারী' নয় এরূপ সবাইকে হত্যা করা সম্ভব নহে। তাই তাঁহারা ইরানের জরথুস্ত্র এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারদিগকেও 'মহাগ্রন্থের অধিকারীদের সুযোগ দান করেন।'* একজন জিম্মিকে যেহেতু মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না, কারণ সেনাবাহিনী ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, তাই জিজিয়া কর প্রদান করে। জিম্মিকে তাহার নিজস্ব ধর্মীয় বিচারালয়ে বিচার করা হয় এবং স্বীয় ধর্ম পালন করিতে দেওয়া হয়। কোনো কোনো সময় জিম্মিকে উচ্চপদেও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ঐগুলি নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম মাত্র ঃ তবে সাধারণত অমুসলিম হইল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক, যাহার কাপড় চোপড়, কেশ-বিন্যাস, ঘোড়ায় চড়ার পদ্ধতি এবং সরকারি অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ থাকে। মুসলিম বিচারালয়ে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। দ্বিতীয় ওমরের ন্যায় ধার্মিক খলিফাগণও অত্যন্ত কঠোর আইন-কানুন চাপাইয়া দিয়া এমন কি, অত্যাচার করিয়া জিম্মিদের ধর্মান্তর করিতে চেষ্টা করেন। কালক্রমে এইসব অপমান হইতে পরিত্রাণের আশায় অনেক লোক মুসলমান হইয়া যায়।

জিম্মিদের উপরের সারিতে থাকে অনারব মুসলমান— যাহাদিগকে মাওয়ালি বা বন্ধু বলা হয়। এই সারির লোক এবং আরব মুলমানদের মধ্যে বিদ্যমান মর্যাদাই আসলে যত অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের কারণ। অনারব মুসলমানদের প্রথম ধাক্কা নামিয়া আসে পারস্যবাসিদের উপর, কারণ মাওয়ালীদের মধ্যে তাহারা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। অনারবের আরবি শব্দ আজম। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'আজমী' দ্বারা প্রায় সর্বস্থলেই একজন পারস্যবাসিকে বুঝায়। আরবদের মধ্যে ইরানের আরেক নাম 'আজমদের দেশ' বলিয়া প্রচলিত, যাহা আজও ব্যবহৃত হয়।

স্বীয় বিশ্বাসে, জোরজবরদস্তিতে বা প্রয়োজনে ইসলাম গ্রহণকারী এইসব লোক স্বভাবতঃই পবিত্র কোরআনের সমাজ শ্রেণীমূলক বক্তব্যের উপর বেশি আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। অপরদিকে আরবগণ প্রথম ওমরের নেতৃত্বে পবিত্র কোরআনকে আরও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ব্যাখ্যা করিতে থাকে। উমাইয়া সমাজের ভিত্তি ছিল আরবদের আধিপত্যের উপর। তাই নূতন ধনাঢ্যগণ নবদীক্ষিতদের সহিত তাহাদের নূতন সুবিধাদি ভাগাভাগি করিতে মোটেই রাজি ছিল না। আরবগণ সামরিক ব্যাপার ব্যতীত কোনো কিছুই নবদীক্ষিতদের সহায়তা ছাড়া পরিচালনা করিতে পারিত না— এই ধারণা তাহাদের মধ্যে একটি হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। এই হীনমন্যতাকে তাহারা আরব জাতি প্রাধান্য দ্বারা পোষাইয়া লইতে এবং বিজিত লোকদের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করে। অনারবদের উপর বিরাট করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। আরবদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক উপায়ে তাহাদিগকে অপমানিত করা হয় এবং তাহাদিগকে আরবদের 'মক্কেল' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে অন্ধ দেশহিতৈষী ছিলেন বোধ হয় আবদ-আল মালিক, যিনি তাঁহার ভৃত্য ইরানের শাসনকর্তা হাজ্জাজের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আদেশ জারি করেন যে, অতঃপর শাসনকার্যের সমস্ত নথিপত্র পারস্য ও গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আরবিতে

---

* উপরে দ্র: পৃঃ ৪৮।

লিখিতে হইবে। তিনি আরবি অক্ষরযুক্ত নূতন মুদ্রা চালু করেন এবং জনসাধারণকে চিঠিপত্র আরবি ভাষায় লিখিতে বাধ্য করেন। কথিত আছে যে, পারস্য ভাষায় লিখিবার অপরাধে হাজ্জাজ হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন। আঘানীতে আমরা দেখি, কোনো পারস্যবাসি তাহার নিজস্ব দেশের প্রশংসা করিলে খলিফা তাহার উপর অত্যাচার করেন। 'হিস্ট্রি অব বোখারা'র গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, যেসব পারস্যবাসি আরবি ভাষায় নামাজ পড়িবার জন্য অতি অল্প আরবি জানিত তাহাদিগকে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া নামাজের শব্দগুলি একজন আরবকে দিয়া উচ্চারণ করানো হইত। ইহাতে এই ইঙ্গিত বহন করে যে প্রাথমিক যুগের দীক্ষিতদিগকে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় নামাজ পড়িতে দেওয়া হইত।

অবশ্য এইসব অপমানে সমস্ত মাওয়ালী, বিশেষত পারস্যবাসিগণ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। ফলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যে কোনো আন্দোলনকে সে শিয়া হউক বা খারেজী বা যাহাই হউক না কেন, তাহারা সমর্থন জ্ঞাপন করে। হাজ্জাজের কঠোর হস্ত কয়েক বৎসরের জন্য শান্তিরক্ষা করিলেও পরিণামে উমাইয়া বংশ অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়।

৭৪০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নবীর চাচা আব্বাসের বংশধর আব্বাসীয়গণ খেলাফতে তাহাদের অধিকার দাবি করে। শীঘ্রই শিয়া, পারস্যবাসি এবং অন্যান্য যাহারা কোনো না কোনো কারণে উমাইয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তাহারা সবাই আব্বাসীয় পতাকাতলে সমবেত হয়। ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দে খ্যাতনামা পারস্যবাসি যুবক আবু মুসলিম খোরাসানী আব্বাসীয়দের কৃষ্ণপতাকা উত্তোলন করেন। রসুলুল্লাহর (সঃ) পতাকার রংও ছিল কৃষ্ণ বর্ণ। পারস্যবাসিদের দ্বারা গঠিত একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে খোরাসানী, খোরাসানের রাজধানী মার্ভ অধিকার করেন। দুই বৎসর পর ইরাক অধিকার করা হয় এবং ৭৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার আব্বাসের তৃতীয় দৌহিত্র আবুল আব্বাসকে কুফার খলিফা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শেষ উমাইয়া খলিয়া দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে জাব নদীর তীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে দামেস্কের পতন হয়।

উমাইয়া বংশের সদস্যবৃন্দ এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করত হত্যা করা হয়। তবে অন্তত একজন যুবরাজ, হিশামের দৌহিত্র আবদ-আল রহমান পলাইয়া যান এবং অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার পর স্পেনের উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতাদখল এক নবযুগের সূচনা করে। প্রথম ওমরের সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্টা করিবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়দের জয় লাভের ফলে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য সিরিয়া হইতে ইরানে চলিয়া যায়। নূতন রাজধানী হয় ইরানের সীমান্তে অবস্থিত কুফায়। অনারবগণ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে এবং নূতন সরকারে পারস্যবাসিগণ প্রধান প্রধান পদ অধিকার করে। আরব আধিপত্যের ভাবধারা আরবদের সহিত মরুভূমিতে চলিয়া যায় এবং বিংশ শতাব্দীর আরও ব্যাপক 'প্যান-আরব' ভূমিকার পূর্বে ইহা আর শোনা যায় নাই। আরবগণ চলিয়া গেলেও ইসলাম রহিয়া গেল এবং ইসলামের ছদ্মবেশে অনেক ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির অগ্রগতি চলিতে থাকে এবং ইহা কখনও পারস্য কখনও ওসমানীয় এবং কখনও ভারতীয়।

অষ্টম অধ্যায়
আব্বাসীয় সরকার ও সমাজ

আব্বাসীয় খেলাফতের ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয়টি ৮৪২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ মোঙ্গল হালাকু কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত। আব্বসীয় শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দুইজন, হারুন-আল-রশীদ ও মামুন প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্য ছয়জন খলিফা রশীদ ও মামুনের ন্যায় তেমন বিখ্যাত না হইলেও তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে স্ব স্ব কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। ক্ষমতার দিক হইতে মূলত আব্বাসীয় বংশ ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়। ইহার পর খলিফাগণ নামে মাত্র ক্ষমতায় ছিলেন, যাহাদের সাম্রাজের উপর কোনো আধিপত্য ছিল না এবং প্রাসাদের উপরও কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। এই সমস্ত খলিফাদের মধ্যে অনেকে এমন অধঃপতিত ছিলেন যে, রাজধানী বাগদাদ নগরীতেও তাঁহারা শক্তিশালী ওমরাহদের হাতে প্রায় বন্দী দশায় বসবাস করিতেন। এইসব ক্ষমতাবান লোক কিছু কিছু পারস্যবাসি ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তুর্কি, যাহারা ইচ্ছা অনুযায়ী খলিফাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিত কিংবা সিংহাসনে বসাইত এবং জীবনের প্রত্যেক কর্মই তাহাদের আদেশানুযায়ী করান হইত। বাগদাদের বাহিরে এবং রাজধানীর আরও দূরে সাম্রাজ্য এমনভাবে বিভক্ত ছিল যে কখনও কখনও দুর্বল খলিফাগণ তো দূরের কথা, খলিফাদের শাসনকারী ক্ষমতাবান লোকদেরও কোনো আধিপত্য থাকিত না। ঐ সমস্ত জায়গায় বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল– সেইগুলি খলিফাদের অবস্থিতির প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় কাজ করিত।

খলিফা হিসাবে নাম ঘোষণা হইবার পর আবুল আব্বাস কুফার মসজিদে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি আল-সাফ্‌ফাহ উপাধি ধারণ করেন, যাহার সর্বজনস্বীকৃত অনুবাদ হইল 'রক্তপত্র'। ইহার দ্বারা তিনি দুইটি রীতির সূচনা করেন। পরবর্তী প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফাও এক একটি উপাধি ধারণ করেন, যথা মনসুর, মেহেদী, রশীদ প্রমুখ। বস্তুত খলিফাগণ তাঁহাদের উপাধি দ্বারাই প্রধানত পরিচিত। দ্বিতীয় রীতি হইল, খলিফার পার্শ্বে জল্লাদের দণ্ডায়মান থাকা।

প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও পূর্ব-কোরাইশ বংশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক
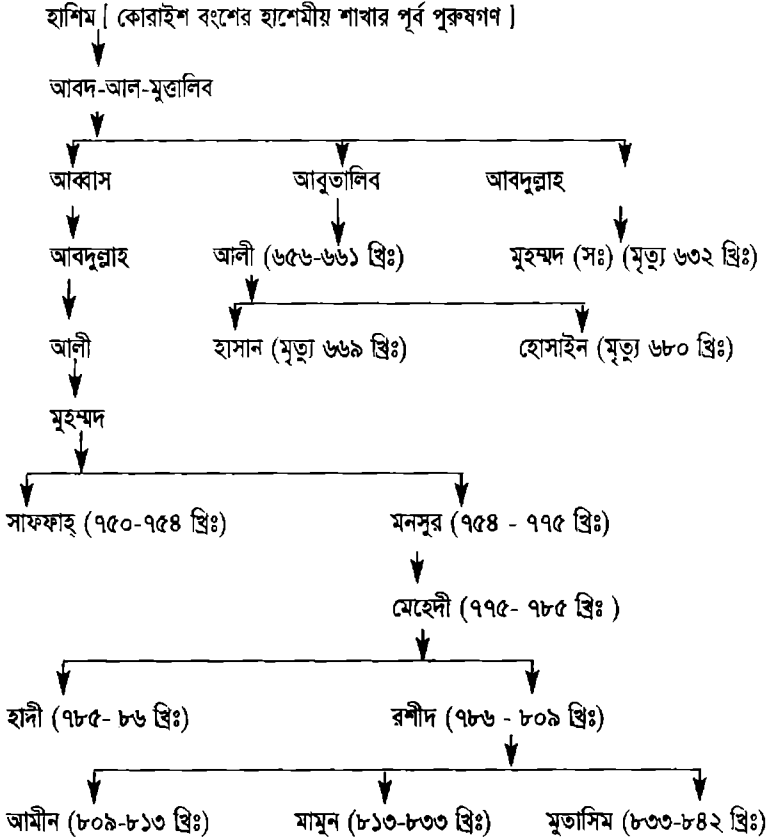
স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আব্বাসীয়গণ মূলত ক্ষমতায় আসেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দল যথা শিয়া, খারেজী, রক্ষণশীল ধর্মপন্থী, পারস্যবাসী এবং অন্যদের ক্ষোভকে ব্যবহার করিয়া। প্রত্যেক দলের নিকট আব্বাসীয়গণ ন্যায্য কাজের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, ফলে প্রত্যেক দল স্ব স্ব উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। ঝুঁকি ছিল প্রবল, কিন্তু তাহাদের পদক্ষেপে কোনো বাধাই রাখা হয় নাই।

নূতন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ্ এবং আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনাহীন মনসুর উমাইয়া বিরোধীদের হাত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। এক অভিনব পদ্ধতিতে তাহারা এক দল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করেন। আব্বাসীয়দের এই সমস্ত বন্ধুদের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেন প্রসিদ্ধ আবু মুসলিম খোরাসানী। এই উল্লেখযোগ্য পারস্যবাসীর প্রকৃত নাম বেহযাদান। বাহ্যত তিনি মুসলমান কিন্তু জরথুস্ত্র হিসাবে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়।

যাহাই হউক, তিনি আব্বাসীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাই তাহাদের কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁহার সৈন্যগণ কালো উর্দি পরিধান করে বলিয়া তাহারা ব্লাক-শার্ট হিসাবে পরিচিত। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, সফলতার জন্য আব্বাসীয়গণ আবু মুসলিম ও তাঁহার পারস্য সৈন্যদের নিকট অনেকাংশে ঋণী। খুব সম্ভবত আব্বাসীয়দের দ্বারা উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার পর তিনি তাহাদের কবলমুক্ত হইতে চাহেন। মোটামুটিভাবে আব্বাসীয়দেরও অনুরূপ একটি পরিকল্পনা ছিল। উমাইয়াদিগকে পরাজিত করিবার জন্য আবু মুসলিমকে ব্যবহার করিয়া তাহারাও তাঁহার কবলমুক্ত হইতে চাহেন। স্বীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আব্বাসীয়গণ অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়। ৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে মনসুর তাঁহার প্রসাদে আবু মুসলিমকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেইখানে তাঁহাকে হত্যা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া ইরানে বিশেষত খোরাসানে এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, ইহা দমন করিবার জন্য আব্বাসীয়দের প্রায় এক শতাব্দী সময় লাগে।

আব্বাসীয়গণ কর্তৃক রক্ষণশীল জনসাধারণের সমর্থন লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল উমাইয়াদের তথাকথিত ধর্মবিমুখতা। উমাইয়াদের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আব্বাসীয়গণ একটি খাঁটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করেন। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁহারা অগ্রসর হন। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের উমাইয়া সমগোত্রীয়দের চাইতে কোনো অংশে কম জাগতিক ছিলেন না, তবে তাঁহারা ধার্মিকতার ভান করিতে জানিতেন। তাঁহারা ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনসাধারণের উপর ইসলাম চাপাইয়া দেন, নিজেরা ধর্ম মতাবলম্বী হন এবং ইসলামে সর্বপ্রথম তাঁহারাই একটি অনুসন্ধিৎসু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্মিকতার প্রতীক হিসাবে আব্বাসীয় খলিফাগণ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং জুমার নামাজে রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) জামা পরিধান করিতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ রাজনৈতিকভাবে যতই দুর্বল হউন না কেন, ধর্মীয়ভাবে তাঁহারা গোঁড়া ধার্মিকতার লক্ষণ হিসাবে মুতাসিম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য খলিফাগণ তাঁহাদের নামের শেষে আল্লাহ্ শব্দ যুক্ত করেন, যথা-আল-মুতাসিম বি-আল্লাহ্ (বিল্লাহ উচ্চারিত)।

উমাইয়াদের ক্ষমতা আব্বাসীয়দের নিকট হস্তান্তরের সময় ইরানের গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ তখনও অমুসলিম ছিল। উমাইয়াগণ আরব প্রাধান্যে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের নীতি উচ্চ শ্রেণীর পারস্যবাসীদের স্বার্থে সংঘাতে পতিত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। মোটামুটিভাবে জনসাধারণ ছিল বিচ্ছিন্ন। তবে আব্বসীয়গণ আরব প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের উপর জোর দেন, এবং জনসাধারণের উপর ইহা চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করেন। যে সমস্ত দল আব্বাসীয়দিগকে ক্ষমতায় আসিতে সহায়তা করিয়াছিল তাহারা তাহাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া সবাই প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। এইসব দলের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু ছিল পারস্যবাসীগণ– যাহারা উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয়দেরও বিরুদ্ধ দলে পরিণত হয়। পারস্য বিরোধিতার রূপ তিনটি– ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক। কিন্তু তাহাদের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইল, আরব শাসন হইতে মুক্তি লাভ।

পারস্য বিরোধিতার প্রথমরূপ হইল ধর্মীয়। আব্বাসীয়দের ধর্মনীতি যেহেতু জনসাধারণের জীবন ও আচার ব্যবহার পদ্ধতিকে বিচলিত করিয়া তোলে, তাই সাধারণ মানুষ তাহাদের একমাত্র উপকরণ লইয়া ইহার প্রতিবাদ করে। তাহারা বিভিন্ন ধর্মীয় বিদ্রোহে

লিপ্ত হয়। আবু মুসলিমের হত্যার পর মাগীর ধর্মাবলম্বী সিন্‌বাদ নামক তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দে কাবা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। অতি স্বল্প আয়াসে খলিফা তাঁহাকে ধ্বংস করেন। তবে ৭৬৭ সালে অসতাডসিস (Ostadsis) নামক আরেকজন নিজেকে নবী বলিয়া দাবি করেন এবং আবু মুসলিমের পুনরাবির্ভাব বলিয়া ঘোষণা করেন। অসতাডসিসের পর আরও একজন নবীর উদয় হয়। তাহাদের সবাই হতাশাগ্রস্ত ও ক্রুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে ত্বরিত সমর্থন লাভ করে বলিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। নবীদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন মুকান্না বা খোরাসানের পর্দাবৃত নবী যিনি ৭৭৬ সালে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সহস্রাধিক অনুসারী সাদা বস্ত্র পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে 'শ্বেত-জামা' বলা হইত। তাহাদের কাজ ছিল কাফেলা লুট, মসজিদ ধ্বংস এবং যাহারা আজান দেয় বা আজানের জবাব দেয় তাহাদিগকে হত্যা করা। মুকান্না দাবি করেন যে, আবু মুসলিম একজন দেবতা ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্রোহ এমন ধ্বংসাত্মক ছিল যে, খলিফা মেহদীকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। প্রায় মুসলিম ঐতিহাসিক পর্দাবৃত নবীর উপর পৃষ্টার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করেন।[১]

পর্দাবৃত নবীর বিদ্রোহকে অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর ধরা হইলেও বাবক খোররামদীনের বিদ্রোহ ছিল সুবিন্যস্ত ও ভয়াবহ। আবু মুসলিমের হত্যার ষাট বৎসর পরে বাবক তাঁহার অনুসারীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই ঘটনাকেই ব্যবহার করেন। বাবকের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র ও মায়্দাকীয় ধর্মের সংমিশ্রণ, যাহাকে বলা হয় খোররামদীন, 'উত্তম ধর্ম'। তাঁহার অনুসারীদিগকে বলা হয় 'উত্তম ধর্মের অনুসারী' এবং তাহাদের উর্দির জন্য তাহারা রেড শার্ট বা 'লাল-জামা' নামে সুপরিচিত। তাঁহার আন্দোলনও ছিল ইসলাম বিরোধী এবং বিশ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত তিনি খলিফা মামুন ও মুতাসিম -এর শরীরের বিষফোঁড়া হিসাবে অবস্থান করেন।

সম্ভবত বাবক মূলত আজারবাইযানের একজন মেষপালক। খলিফাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত ৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে আফশীন নামক মুতাসিমের একজন পারস্যবাসী সেনাপতি বাবককে বন্দী করিয়া আব্বাসীয়দের আবাসস্থল সামাররায় আনয়ন করেন। একটি হস্তির পিঠে চড়াইয়া বাবককে নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। খলিফা তাহার শিরোচ্ছেদের আদেশ প্রদান করেন। এক হাত কাটিয়া ফেলিবার পর বাবক সেই হাত দ্বারা তাঁহার মুখ মর্দন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, রক্তশূন্যতার দরুন তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। দর্শকগণকে তাঁহার সেই অবস্থা দেখাইতে তিনি নারাজ। ইহাতে তাহারা মনে করিবে যে, ভয়ে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয়।[২]

---

১. *মিশৌরীর সেন্ট লুই ও কেনসাস সিটিতে "দি ভেইলড্ প্রফেট অব খোরাসান" (খোরাসানের পর্দাবৃত নবী) নামে একটি ভ্রাতৃবৎ সংগঠন আছে; তাহারা বিশ্বাস করে যে, "পর্দাবৃত নবী (!) ছিলেন খোরাসানের নেভার, নেভারন্যান্ডের পৌরাণিক ব্যক্তি। বোধহয় এই প্রতিষ্ঠান ইহার নামকরণ করিয়াছে টমাস মূরের "লালারুখ" কাহিনী হইতে যাহার নায়ক খোরাসানের পর্দাবৃত নবী।*

২. *অদৃষ্টের পরিহাস, অনতিবিলম্বে ধর্মত্যাগের অভিযোগে স্বয়ং আফসীনেরও বিচার করা হয়। এবং তাহাকে হত্যা করা হয়। বিচারালয়ে তাহাকে দুইজন ইমামকে মারিবার অভিযোগে, তাহার গৃহে জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থ সসম্মানে রাখিবার অভিযোগে এবং খতনাহীন থাকিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এই সমস্ত অভিযোগ তিনি স্বীকার করেন।*

আব্বাসীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের বিদ্রোহের দ্বিতীয় স্বরূপ ছিল রাজনৈতিক। বাবকের বন্দীকারী পারস্য সেনাপতি আফশীন ছিলেন এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একজন পারস্য অভিজাত হিসাবে তিনি ছিলেন আরব বিরোধী কিন্তু গণবিদ্রোহ তিনি পছন্দ করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর পারস্যবাসিগণ জনসাধারণের মতামতকে আমল দিতেন না। তাঁহারা মনে করেন যে ভিতরে থাকিয়া ধূর্ততার সহিত এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের আরব বিরোধী উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারিবেন। বাবকের বিদ্রোহের ন্যায় বিভিন্ন গণবিদ্রোহ পারস্য অভিজাতদের মূল আন্দোলনকে নস্যাৎ করিয়া দিবে মাত্র।

স্বীয় পরিকল্পনায় অভিজাতগণ বেশ কৃতকার্য হন এবং আব্বাসীয় সরকার ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। আব্বাসীয়গণ পারস্য অনুকরণ এত ব্যাপকভাবে করেন যে, প্রথমে তাঁহাদিগকে অনেকে আরব রক্তের সাসানীয় 'রাজন্যবর্গ' বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহা উমাইয়াদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেহ যদি মনে করেন যে, পারস্যবাসীগণ ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং পারস্য সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এমনকি কাপড়-চোপড়ও রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে তবে এই বক্তব্য কিছু বাড়াবাড়ি হইবে না।

শুরুতেই সাফফাহ প্রধান উজিরের পদ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান উজির সমস্ত ব্যাপারে খলিফার নামে কাজ করিতেন এবং কার্যত তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আব্বাসীয়দের এক অনুশাসন বাক্য প্রচলিত আছে, যে ব্যক্তি উজিরকে মান্য করে সে খলিফাকে মান্য করে এবং যে ব্যক্তি খলিফাকে মান্য করে সে আল্লাহ্‌কে মান্য করে।

প্রধান উজিরের পদের প্রথম অধিকারী ছিলেন খালেদ-ইবনে-বারমাক। তিনি এক উল্লেখযোগ্য পরিবারের কর্তা ছিলেন, যে পরিবার অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল প্রধান উজীরের পদে বহাল থাকে। খালেদ বাল্‌খে বসবাসকারী একজন পারস্যবাসী। তাঁহার পিতা ছিলেন এক বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত বা বারমাক। একজন পারস্যবাসী ও শিয়া হওয়া সত্ত্বেও খালেদ তাঁহার পুত্র ইয়াহ্‌ইয়া এবং প্রপৌত্র ফজল ও জাফর প্রথম পাঁচজন খলিফার অধীনে পরপর উজির হন। বারমাকীয়দের ক্ষমতা, বদান্যতা, সম্পদ ও লোভনীয় জীবিকা আরব্য রজনীর গল্পসমূহের অংশবিশেষ। সামরিক ও বেসামরিক কার্যাবলীর দায়িত্ব থাকে তাঁহাদের হাতে। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকর্তা, সেনাপতিদের নিযুক্ত ও বরখাস্ত করেন। এমন কি খলিফার গৃহাধ্যক্ষের প্রার্থিগণকেও তাঁহাদের সম্মতি আদায় করিতে হয়। কথিত আছে যে, হারুন-আল-রশীদ তাঁহাদের সম্মতি ছাড়া খাজাঞ্চিখানা হইতে টাকা উঠাইতে পারিতেন না। তবে হারুনের মেজাজের একজন খলিফা কাহারও সঙ্গে ক্ষমতা বন্টন করিতে পারেন না। হারুন, তাঁহার ভগ্নী আব্বাসা এবং ইয়াহ্‌ইয়ার পুত্র জাফর একসঙ্গে বড় হইয়াছেন এবং পরস্পর ঘনিষ্ঠ ও সহচর ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও বারমাকীয়দের ক্ষমতা ও তাহাদের শিয়া ধর্ম, এতদসঙ্গে আব্বাসা ও জাফরকে কেন্দ্র করিয়া এক সম্ভাব্য অপবাদ তাহাদের পরিবারের ধ্বংস আনয়ন করে। জাফরকে হত্যা করা হয় এবং ইয়াহ্‌ইয়া ও ফজল বন্দী অবস্থায় মারা যান। তবে ইহা দ্বারা উজির পদের বিলোপ বা পারস্য প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই।

আব্বাসীয় ক্ষমতার প্রতি পারস্য বিরোধিতার তৃতীয় স্বরূপ ছিল সাহিত্যিক। ইহাকে শো'বিয়া আন্দোলন কলা হয়। ইহা উমাইয়া বংশের সময় আরবদের জাতীয় প্রাধান্যকে প্রতিহত করিবার জন্য অনারব মুসলমানগণ (পারস্য ও অপারস্য) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের অধিকাংশ উদ্যোক্তা ছিলেন সরকারি অফিসসমূহের অনারব সেক্রেটারিগণ। লেখনীর মাধ্যমে তাঁহারা একদিকে আরবদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ

চালান, অন্যদিকে নিজেদের জাতীয়তাকে অনুপ্রাণিত করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করেন।

আব্বাসীয়দের শাসনামলে শো'বিয়া একটি পারস্য সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে, যাহার উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক রচনা, ফার্সি গ্রন্থসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে পারস্য সংস্কৃতির বিশেষ গুণের পুনর্জাগরণ এবং পারস্য সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাহারা ছিলেন সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রসৈনিক যাহারা ধর্ম ও নৈতিকতায় সন্দিগ্ধতার ভাব উৎসাহিত করেন এবং ধর্মচ্যুতিকে আশ্রয় দান করেন। কোনো সন্দেহ নাই যে ইহাদের কেহ কেহ অতি ধূর্তভাবে ইসলাম বিরোধী ছিলেন। তাহাদের দুইজন সদস্য, সাহিত্য প্রতিভা ইবনে মুকাফ্ফা এবং অন্ধ কবি বশ্শর ইবনে বরদ্কে যথাক্রমে খলিফা মনসুর ও মেহদী ধর্মচ্যুতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

সরকার ও প্রশাসন

আল-সাফ্ফাহ বা মনসুর কেহই কুফায় নিরাপদ বোধ করেন নাই। আল-সাফফাহ নিকটবর্তী হাশিমিয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং মনসুর টাইগ্রিস নদীর তীরে বাগদাদ নামক এক ক্ষুদ্র পারস্য গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নগর অসংখ্য পার্ক, সুন্দর বাগান, প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ, শত সহস্র মসজিদ ও সরকারি স্নানাগারের জন্য প্রসিদ্ধ। ক্ষমতা, জ্ঞান, বাণিজ্য ও অবসর বিনোদন এবং সহস্র ও একরাত্রির শাহারযাদের কাহিনীর দৃশ্যাবলীর কেন্দ্র হিসাবে বাগদাদ বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠে। রাজ্যের সব রাস্তা বাগদাদ অভিমুখী এবং এইসব রাস্তায় সমসাময়িক বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের লোকজন পরিদৃশ্যমান। নগরী ছিল সমৃদ্ধশালী ও জাঁকালো এবং খলিফা ও উজিরগণ কল্পনাতীত অংকের টাকা পয়সা খরচ করিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হারুন আল-রশীদের স্ত্রী জোবায়দা স্বর্ণের পাত্র ছাড়া খাদ্য পরিবেশন করিতেন না এবং অতি মূল্যবান প্রস্তরখচিত জুতা না হইলে পরিধান করিতেন না। একবার মক্কার হজ্ব যাত্রায় তিনি ত্রিশ লক্ষ দিনার খরচ করেন। ভাবী উত্তরাধিকারী মামুন ও তাহার নববধূ পুরানের বিবাহের দিন বর-বধূ অলঙ্কারখচিত সোনালী আরামকেদারায় উপবিষ্ট থাকাকালীন সময়ে এক সহস্র মানানসই মুক্তা তাহাদের উপর বর্ষণ করা হইয়াছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি ক্রীতদাসী উপহার প্রদান এবং কবি, ভাঁড় ও অন্যান্য তোষামোদকারীকে সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ ছিল অতি মামুলি ব্যাপার।

কামাসক্ত কবি এবং হারুনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু নোয়াস ঠিকই গাহিয়াছেন ঃ

"যৌবন এবং আমি, আমরা দৌড়িলাম
প্রমোদের এক দুঃসাহসিক দৌড়
পাপের কোনো খতিয়ান নাই
কিন্তু শীঘ্রই আমি ইহার পরিমাপ করিলাম।"
বন্ধু এই গান গাহিবার সময় হারুন খুব সম্ভবত উপস্থিত ছিলেন।
"এস সোলাইমান,আমার নিকট গান কর
এবং তাড়াতাড়ি আমার জন্য শরাব আন!
দেখ, ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত
পরিষ্কার সোনালী জোব্বায়।
মিটিমিটি করিয়া বোতল ঘুরিতে ঘুরিতে,
আমাকে এক পেয়ালা দাও যাহাতে ডুবিয়া যাইতে পারি

আকাশ কোণে, তা যত উচ্চই হোক
মুয়াজ্জিনকে আযানের সুর ধ্বনিতে দাও।"

হারুনের আরেক সমালোচক-কবি ছিলেন আবু আল-আতাহিয়্যা, যিনি চকচকে সমস্ত কিছুতে ধ্বংস অবলোকন করেন এবং খলিফাকে সতর্ক করেন ঃ

"যত ইচ্ছা নিরাপদে বাস করুন;
প্রাসাদের উচ্চতা যথেষ্ট নিরাপদ।
দিন রাত্রির মুখে ভাসিয়া
মসৃণকে অমসৃণের চেয়ে আরামপ্রদ লাগে।
কিন্তু যখন তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে আরম্ভ করে
তোমার ফুসফুসের সম্পূর্ণ বিপরীতে,
তখন নিশ্চিত জানিয়ে রাখ প্রিয়,
তোমার জীবন অলস জিহ্বার ন্যায় অথর্ব।"[১]

খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন কক্ষের সম্পদ ও সৌন্দর্যে এতই হতবাক হইয়া যান যে তাহারা প্রায়ই গৃহাধ্যক্ষের দফতরকে দরবার কক্ষ বলিয়া ভ্রম করিতেন। এই পরিবেশে প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন।

একটি পরিষদের দ্বারা দেশ শাসিত হয়, যাহার সভাপতি ছিলেন প্রধান উজির। পরিষদের সদস্যবর্গ ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তাগণ যাহাদিগকে কখনও কখনও উজিরও বলা হয়, প্রধান বিচারক, এবং সেনাবাহিনীর প্রধান। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির মধ্যে একটি হইল রাজস্ব বিভাগ। রাজ্য জয় হইতে যেহেতু কোনো যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ছিল না, তাই বিজিত দেশ হইতেই রাষ্ট্রকে রাজস্ব আদায় করিতে হইত। নীতিগতভাবে সমস্ত জমির মালিক মুসলমান সম্প্রদায় বা উম্মাহ। কিন্তু কার্যত ছয় প্রকার জমি ছিল ঃ

১. যেসব জমি খলিফার ব্যক্তিগত সম্পতি ছিল। তিনি ধর্মীয় জাকাত ও উশর ছাড়া রাষ্ট্রকে অন্য কোনো কর প্রদান করিতেন না।
২. যেসব জমি সৈন্যদিগকে তাহাদের সামরিক কার্যের জন্য দেওয়া হয়। এইগুলি হইতে রাষ্ট্র কর লাভ করে।
৩. খলিফার অধিনস্থ পতিত জমি– যে গুলিকে খলিফা যাহাকে ইচ্ছ দান করিতে পারেন।
৪. যেসব জমি মালিককে তাড়াইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কোনো কর প্রদান করে না, শুধু জাকাত দেয়।
৫. যেসব জমির আসল মালিক ফিরিয়া আসিয়াছে বা তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। ইসলাম গ্রহণ করিবার পরও তাহাদিগকে ভূমি কর প্রদান করিতে হইত।
৬. যেসব জমির মালিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে কোনো সম্পর্ক রহিয়াছে–ইহারা একটি নির্ধারিত অঙ্ক প্রদান করে।

---

১ এই কবিতাগুলি "এনথলজী অব ইসলামিক লিটারেচার" এ পাওয়া যায়। সম্পাদক জেমস ক্রিটজেক, পৃঃ ৮৬-৮৮।

ব্যবসার লভ্যাংশের উপরও একটি বিশেষ কর ছিল কিন্তু ইহার পরিমাণ নির্ধারণ করা দুষ্কর। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদের 'এক-তৃতীয়াংশ' সরকারের নিকট চলিয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়িগণ অনুযোগ করিত। রাজস্বের অন্যান্য উৎসের মধ্যে ছিল অমুসলিমদের নিকট হইতে আদায়কৃত মাথাপিছু কর (জিজিয়া) বা শান্তি কর এবং কখনও কখনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বল প্রয়োগের রীতি ছিল চিরাচরিত। এই কাজের জন্য একটি 'বাজেয়াফতি সংস্থা' বিদ্যমান ছিল। খলিফা হইতে অধঃস্তন প্রত্যেক কর্মকর্তা তাহার নিচের পদাধিকারি কোনো অভিযোগ বা অন্য কোনো কারণে পদচ্যুত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হইত। নীতিগতভাবে সরকারি খাজাঞ্চিখানার বা বায়ত-আল-মালের দুইটি হিসাব থাকে– একটি খলিফার জন্য এবং অপরটি রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু কার্যত উভয়ের উপরই খলিফার আধিপত্য ছিল। নীতিগতভাবে মুসলমানদের নিকট হইতে আদায়কৃত সমস্ত কর মুসলমান দরিদ্র, এতিম, আগন্তুক ও যুদ্ধের জন্য খরচ করিবার কথা। সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা যায়, প্রথম আব্বাসীয় খলিফা মৃত্যুর সময় চারিটি জামা ও পাঁচটি পাজামা রাখিয়া যান, কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা মনসুর মৃত্যুর সময় ৬,০০,০০০ দিনার রাখিয়া যান। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে বাজেট ছিল সমতাপ্রাপ্ত, কিন্তু ৯০৮ সালে এরূপ ছিল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও খারাপ হইয়া যায়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়-খাতের দুইটি ছিল রাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় দেহরক্ষীর জন্য খরচ। খলিফার শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হয় এইভাবে যে, ৮৬৭ সালে দেহরক্ষীর খরচ ছিল বিশ কোটি দিনার, যা সমগ্র সাম্রাজ্যের বার্ষিক ভূমিকরের দ্বিগুণ। বাকি অর্থ ধনী নাগরিকদিগকে বহন করিতে হইত। ব্যয় খ্যতের অন্যান্যগুলি হইল পবিত্র নগরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সীমান্ত চৌকি, হাশেমীয় শাখার সদস্যদের ভাতা এবং আমলাদের বেতন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ডাক ব্যবস্থা বা বারিদ। এই ব্যবস্থা উমাইয়াগণ সাসানীয়দের নিকট হইতে লাভ করে। জনগণের জন্য ইয়াহ্ইয়া বারমাকী ইহাকে বৃহত্তর রূপ দান করেন। বিভিন্ন সরাইখানা সড়কগুলির উপর নির্মিত হইত। এই কারণে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য বাগদাদে একটি ডাক সময়সূচি নির্বাচিত রাখা হইত। বর্তমানের ন্যায় তখনও এই বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী ও ভ্রাম্যমান দোকান প্রভৃতিকে ব্যবহার করিত। সম্ভবত একমাত্র পার্থক্য ছিল যে, আব্বাসীয় গুপ্তচর প্রধান তাঁহার অধীনে অনেক বৃদ্ধ মহিলাকে ব্যবহার করিতেন, যাহা তাহাদের পূর্ববর্তীরা করিতেন না।

প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগগুলি ছিল অডিট, বিচারালয় ও পুলিশ। পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহতাসিব–যিনি গণনৈতিকতা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত। বিচারালয়গুলি ছিল রাজধানীর প্রধান বিচারকের তত্ত্বাবধানে, যাঁহার প্রতিনিধি প্রত্যেক শহরে ছিলেন। তাঁহাকে কাজী বলা হইত। কাজী ইসলামি ধর্মীয় আইন, শরীয়তে অভিজ্ঞ এবং স্থানীয় বিচারালয়গুলির সভাপতিত্ব করেন। ধর্মীয় দানছত্র, এতিম ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সম্পত্তি নিষ্পত্তি করা, বিবাহ ও তালাক এবং উত্তরাধিকারও তাহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিচার বিভাগের আওতায় একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থাও ছিল যাহা বিভিন্ন কাজের মধ্যে কর্মকর্তাদের অত্যাচার, কর সংক্রান্ত অভিযোগ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা এবং সরকারি এবাদত খানার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয়গণও চিরাচরিত উত্তরাধিকারের সমস্যার সম্মুখীন হন।

উমাইয়াদের ন্যায় খলিফা কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্তির প্রথা চলিতে থাকে। কিন্তু ইহা আব্বাসীয়দিগকে উমাইয়াদের মতোই তেমন কোনো সাহায্য করে নাই। অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় হারুন-আল-রশীদের মৃত্যুর পর। তিনি তাহার উভয় পুত্রকে বয়স অনুপাতে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন দান করেন– প্রথমে আমীন এবং তারপর মামুন। মামুন– যাহার মাতা ও স্ত্রী উভয়েই পারস্যবাসী- পারস্যবাসীদের পূর্ন সমর্থনে খেলাফত দাবি করেন। তিনি বাগদাদ অভিমুখে অভিযান করেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া খলিফা হন। তবে চারি বৎসর পর তিনি শিয়াদের সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন এবং অষ্টম শিয়া- ইমাম আলী আল রেজাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। এই ঘটনা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাহাকে রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এবং দুই বৎসরের সংগ্রামের পর তিনি তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। তিনি খেলাফত পুনরায় লাভ করেন। কথিত আছে যে, তিনি খোরাসানে ইমাম রেজাকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ইমামের মৃত্যুতে সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি তাহার বিশ্বাসী সেনাপতি তাহেরকে খোরাসানে প্রেরণ করেন। তাহের তাহার জন্মভূমি খোরাসানে যাইয়া পূর্বাঞ্চলের প্রথম স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও জুমার নামাজ হইতে খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন।

বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষি

আরবগণ ব্যবসার তুলনায় কৃষিকার্যকে অবজ্ঞা করিত। রসুলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং একজন কৃতকার্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম সর্বদাই ব্যবসায়ীদিগকে শ্রদ্ধা করে। বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে বেশ তৎপরতার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। বাগদাদের ঘাটে চীনা জাহাজগুলির আনাগোনা ছিল অতি সাধারণ দৃশ্য। এক অংশ হইতে আরেক অংশে উৎপন্ন দ্রব্য বন্টন করিবার জন্য সাম্রাজ্যের চারিদিকে প্রশস্ত রাস্তাঘাট ছিল। কাফেলার সারি চাউল,লিনেন কাপড়,পশম,মদ, কিংখাব, মুক্তা,কাচ, ধাতবদ্রব্য,ফল, সুগন্ধীমার্বেল,কার্পেট, টেবিল, কুশান, ভাজা করিবার পাত্র, ট্রে-গামলা,ঔষধ এবং অন্যান্য অসংখ্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া শহরে আনিত। একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত অংশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল অতি জাকালো ও লাভজনক। চীনে মুসলমানগণ একটি ব্যবসায়ী কলোনী স্থাপন করিয়া সেখান হইতে চীনাপাত্র ও পশমি কাপড় আমদানি করিত। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা মসল্লা ও রং আমদানি করিত। রাশিয়ার সহিত তাহারা উলের ব্যবসা করিত এবং আফ্রিকার সঙ্গে হাতির দাতের ব্যবসা করিত। রাশিয়া ও জার্মানিতে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাক্ষ্য বহন করে।

এমন একটি লাভজনক বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিতে হয়। বাহরাইনের মুক্তা,ইয়েমেনের ইস্পাত-তরবারী, শিরাজের মদ, কাশানের টালি এবং ইরানের কম্বল ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। চীনাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া ইরাক,ইরান ও মিসরে আব্বাসীয়গণ অনেকগুলি কাগজের কল চালু করে। তবে সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষিভিত্তিক। প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং বিশেষত বারমাকীয়গণ ইরাক, খোরাসান এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বাধ, খাল, পানি সরবরাহের কূপসমূহ নির্মাণ করেন। তৎকালে সমগ্র এলাকা বর্তমানের চাইতে অধিক উর্বর ছিল। ইহা এখনকার তুলনায় অধিক গম, চাউল, খেজুর, সুতা, ফল, সুপারি, কমলা, তরমুজ

ও তরি-তরকারি উৎপন্ন করিত এবং বন্টন করিত। উপরন্তু সাম্রাজ্যের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হিসাবে ক্রীতদাস প্রথা তো ছিলই।

বৈদেশিক সম্পর্ক

আব্বাসীয়রা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন রাজ্য জয়ের উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং আরব যোদ্ধাগণ হয় মরুভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছে অথবা জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে ভূখণ্ডের সঙ্গে আব্বাসীয়গণ অতি অল্প যোগ করিতে সক্ষম হয়। বাগদাদে অবস্থানকারী দেহরক্ষীগণ ছাড়া তাহারা কোনো স্থিতিশীল সেনাবাহিনীও রাখে নাই। ফলে তাহাদের অধিকাংশ বিদেশী সম্পর্ক নির্ভর করে প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং উপঢৌকন দেওয়া ও নেওয়ার উপর।

তবে এই সাধারণ অবস্থার একটি ব্যতিক্রম হইল বাইজান্টিয়ামের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কনস্টান্টিনোপলের সম্পদরাশি তখনও হাতছানি দিতেছিল এবং এশিয়া মাইনর বিজয় একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (৭৭১-৭৭৫) আরব আক্রমণকারীদিগকে এশিয়া মাইনরের সর্বদক্ষিণ সীমান্তে হটাইয়া দেয়। ৭৮২ খ্রিস্টাব্দে মেহদী তাহার পুত্র হারুনের অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বসফরাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সম্রাজ্ঞী আইরীন শান্তি ভিক্ষা করিলে শান্তি স্থাপন করা হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় আরব শক্তির পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল বলিয়া আরবগণ শান্তির মাসুল আদায় করিয়া ও শান্তি স্থাপন করিয়া খুশি হয়। অপরদিকে বাইজান্টাইনদেরও নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ হয়।

পরে সম্রাট প্রথম নাইসফরাস (৮০২-৮১১) চুক্তি ভঙ্গ করেন। এই খবর শুনিয়া হারুন এতই রাগান্বিত হন যে, তিনি একখানা পত্র লেখেন। এই পত্রখানা এত প্রসিদ্ধ যে প্রত্যেকই ইউরোপীয় ঐতিহাসিকই তাহা হইতে উদ্ধৃতি দেন। "বিশ্বাসীদের অধিনায়ক হারুনের নিকট হইতে একজন রোমানা কুলাঙ্গার নাইসফরাসের নিকট ..."। হারুন একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাহারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর আদায় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এশিয়া মাইনর অধিকার করা আরবদের ভাগ্যে ছিল না। কিন্তু তুর্কিদের মাধ্যমে ইসলাম ইহা জয় করে।

ইউরোপীয় লেখকগণ প্রমাণ করেন যে, হারুন-আল-রশীদ ও শার্লেমেন সমসাময়িক ছিলেন। শার্লেমেনের প্রতিনিধিবৃন্দ 'পারস্যের সম্রাট আরনের' নিকট হইতে উপঢৌকন আনয়ন করেন। তবে মুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দ এই সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। খুব সম্ভবত স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলিফা শার্লেমেনের বন্ধুত্ব কামনা করেন। বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে বিবাদমান অবস্থা শার্লেমেনকে উপকৃত করে। তবে উপঢৌকন বিনিময় ব্যতীত আর কোন লাভ ইহাতে হয় নাই।

আব্বাসীয় সমাজ

আব্বাসীয় যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের মধ্যে একটি হইল—আরব স্বাতন্ত্র্যনীতি পরিহার করিয়া সমাজ আন্তর্জাতিক হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যের বিশালত্ব, ক্রীতদাস-দাসী প্রথার কল্যাণে আরব, পারস্যবাসী, সিরীয়, মিসরীয়, বার্বার, তুর্কি ও ভারতীয়গণ একে অন্যের মধ্যে সংমিশ্রিত হইয়া যায়। এই সংমিশ্রণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয় শহরের কেন্দ্রগুলিতে। আঘানীর গ্রন্থকারের ন্যায় মুসলিম লেখক প্রধানত খলিফা ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন ও

অবসর বিনোদনের কথা বর্ণনা করেন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমরা এতটুকু জানি যে অসংখ্য সরকারি স্নানাগার ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের ছিল। আধুনিক যুগের ন্যায় ছোট ছোট শহর এবং বড় বড় গ্রামগুলিতে এই ধরনের সুযোগ ছিল। নবাগতদের জন্য হোটেলের সুবন্দোবস্ত ছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহারা সর্বদা মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারিত। ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্য মহিলাগণ পৃথক জীবন-যাপন করিত এবং তাহাদের কাজ ছিল গৃহস্থালি ও শিশুদের লালন পালন করা। চারিজন আইনানুগ স্ত্রী পর্যন্ত সিদ্ধ ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকার দরুন আমরা অনুমান করিতে পারি যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিত এবং চারিজন স্ত্রী না হইলেও কমপক্ষে অর্ধ-ডজন ক্রীতদাসী উপপত্নী রাখিত। মধ্যপ্রাচ্যে কখনও চেয়ার- টেবিল ব্যবহৃত হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর লোকজন মাদুরাবৃত কেদারা ও কুশানে বসিত এবং নিম্নশ্রেণীর লোকজন মাদুরের উপর বসিত। বৃহৎ গোলাকার তাম্রনির্মিত পাত্রে খাদ্য পরিবেশন করা হইত। যেসব পরিবারে মাথাপিছু বাসন যোগাইতে পারিত না তাহারা একটি সাধারণ পাত্রের চতুর্দিকে বসিয়া আহার করিত।

জনগণের এক বিরাট অংশ, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এবং নিম্নশ্রেণীতে, মুসলমান হয় নাই। প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে অমুসলিমদের বৃহদাংশ ছিল জরথুস্ত্র, তারপরই নেসতোরিয় খ্রিষ্টান; ইহুদিদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আব্বাসীয়গণ ধার্মিকতার ভান করিত এবং মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদদিগকে খুশি করিবার জন্য অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করিত। খলিফাগণ, যথা হারুন আল-রশীদ, মুতাওয়াক্কিল ও অন্যান্যগণ এই ব্যাপারে বিশেষ কঠোর ছিলেন। জিম্মিগণ কোনো উপাসনালয় নির্মাণ করিতে পারিত না। আরব বিজয়ের পর যেগুলি নির্মাণ করা হইয়াছিল ঐগুলিকে আদেশক্রমে ধ্বংস করা হয়। তাহাদিগকে বিশেষ পোশাক পরিধান করিতে হইত এবং কাহারো কাহারো মাথার অগ্রভাগে ছাপ মারিয়া দেওয়া হইত। তাহাদের ঘর মুসলমানদের ঘরের চাইতে উঁচু করিতে পারিত না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনো সাক্ষ্য বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইত না। রাজধানী হইত দূরে শাসনকর্তার দরবারে জিম্মিগণকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জিজিয়া কর দিতে হইত। রসিদের পরিবর্তে তাহাদিগকে একটি ছাপ দেওয়া হইত, যাহা তাহারা গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এতদসত্ত্বেও ইসলামে সহিষ্ণুতা ছিল। অনেক খ্রিষ্টান ও ইহুদি ব্যবসায়ী, দরবারের চিকিৎসক, দার্শনিক এবং উজির হিসাবেও উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। তবে কোনো জরথুস্ত্রকে কোনো অনুষ্ঠানে এইভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল বা সহিষ্ণুতা দেখানো হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। অতএব সহজেই অনুমেয় যে অত্যাচারের প্রচণ্ড ধাক্কা বহন করিতে হইয়াছিল সমস্ত জরথুস্ত্র এবং নিম্নশ্রেণীর খ্রিষ্টান ও ইহুদিদিগকে। উমাইয়াদের প্রচারিত আরব প্রাধান্য ইরান ও সিরিয়ার অভিজাতবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। অপরদিকে আব্বাসীয়দের ধর্মীয় উৎসাহ গ্রাম্য জনসাধারণের অধিকাংশকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। বোধ হয় তাহাদের ক্রন্দন আঘানীর গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আহ্ উমায়াদের অত্যাচার যদি ফিরিয়া আসিত
আহ্ আব্বাসীয়দের বিচার যদি নরকে যাইত।"

নবম অধ্যায়
ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগ

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মিত হয় প্রচারণা ও শূন্য প্রতিশ্রুতির ইট দ্বারা, কিন্তু ইহার পায়ের তলায় মাটি ছিল না। সমাজের বিভিন্ন অংশে যাহারা আব্বাসীয় ক্ষমতারোহণের উপর আশা রাখিয়াছিল এখন অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

অবজ্ঞা করিবার ফলে আরবগণ অসন্তুষ্ট হয়, সিরিয়াবাসিগণ অসন্তুষ্ট হয় ক্ষমতা হারাইয়া, শিয়াগণ প্রতারণার জন্য, পারস্যবাসিগণ উত্তরাধিকার হারাইয়া এবং অমুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হয় অপমানের জ্বালায়, খারেজিগণ প্রায় নাস্তিক হইয়া উঠে এবং সর্বদা সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। প্রায় এক শতাব্দীর 'মধু চন্দ্রিমায়', খলিফাগণ তাঁহাদের বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতা সাম্রাজ্যকে অখণ্ড রাখিবার জন্য ব্যয় করেন নাই, এক জাতি গঠনের কথা বাদই দেওয়া গেল। অধিকাংশ জনহিতকর কাজের কৃতিত্ব বারমাকীয় ও অন্যান্য উজিরদেরই প্রাপ্য। 'সোনালী যুগ' খলিফাদের সজ্ঞান প্রচেষ্টার চাইতে বরং স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ক্রমগতিতে আসিয়াছে। তবে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল, যেমন মামুন। কিন্তু মোটের উপর খলিফাগণ মত্ত থাকেন ক্ষমতা ও উপভোগে, এবং নিজদিগকে তাঁহারা ঘাতক ও দেহরক্ষীদের দ্বারা আবৃত রাখেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাগণ আরও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। তাঁহাদের খোরাসানি দেহরক্ষিগণ নিস্তেজ হইয়া যায় বা বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করে। তখনও আত্মকলহে লিপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরবগণ পারস্যবাসীদের অবধারিত দুরভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণা হইতে খলিফাকে উদ্ধার করিতে তেমন উৎসাহি হইয়া উঠে নাই। স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মু'তাসিম (৮৩৩-৮৪২) দেহরক্ষী হিসাবে তুর্কিদের আনয়ন করেন। তুর্কিগণ যেমন সাহসী ও অনুগত তেমনি বর্বর ও অশিক্ষিত। আরব ও পররস্যবাসিগণ একে অপরকে ধ্বংস করিবার উপায় হিসাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করিবে খলিফা এই আশা করেন। মু'তাসিমের মাতা একজন তুর্কি ক্রীতদাসী হইবার ফলেও এই ব্যবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

যাহাই হউক, দেহরক্ষী হিসাবে খোরাসানিদের স্থলাভিষিক্ত তুর্কিগণ ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের গুণ্ডামি ও ব্যভিচার বাগদাদে এমন ত্রাসের সৃষ্টি করে যে, খলিফা নিকটবর্তী সামাররায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষীদিগকেও লইয়া যান। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম হইবার পূর্বে খলিফাগণ বাগদাদে ফিরিয়া যান নাই। কিন্তু রাজধানী সামাররায় থাকুক বা বাগদাদে থাকুক, অসুবিধা থাকিয়াই যায়।

তুর্কিগণ খলিফার কার্যে যোগদান করিবার কয়েক বৎসর পর তাহারা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর কৃতিত্ব অর্জন করে। ৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিগণ নিজেদেরকে এইরূপ শক্তিশালী মনে করে যে, তাহারা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে। তখন হইতে ৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কিগণ খলিফাদের মনোনীত ও পদচ্যুত করিত এবং অবশিষ্ট

সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া উঠিয়াছিল। শীঘ্রই তাহাদের নেতা আমীর-আল-উমারা (প্রধান সেনাপতি) উপাধি লইয়া প্রধান উজির হন এবং হতভাগ্য খলিফাদিগকে তাঁহাদের অর্থহীন মর্যাদা লইয়াও থাকিতে দেন নাই। তাঁহাদের তিনজনকে অন্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং পরে তাঁহাদিগকে বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। বাগদাদের এই অবস্থায় আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ সাম্রাজ্যের প্রায় সমগ্র অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া রাজধানীর আধিপত্য হইতে স্বাধীন হইয় যান।

পশ্চিমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

আব্বাসীয় আধিপত্য হইতে যেসব এলাকা পৃথক হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রথম হইল স্পেন। উমাইয়াদের পতনের ছয় বৎসর পর তাহাদের এক যুবরাজ, আবদ-আল-রহমান, সুদূর আন্দালুসিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেন এই গ্রন্থের আলোচনা বহির্ভূত হইলেও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া উমাইয়াগণ তথায় একটি শক্তিশালী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। কেন্দ্রীভূত শক্তি হিসাবে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হিসাবে মুসলমানগণ স্পেনে ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর তৃতীয় ফিলিপ তাহাদিগকে চিরতরে বহিষ্কার করেন। স্পেনে খেলাফতের প্রধান অবদান হইল, ইহা মুসলিম দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্য শিল্পের ইউরোপে প্রবেশের প্রধান পথ হিসাবে কাজ করে।

উত্তর আফ্রিকায় ইমাম হাসানের একজন প্রপৌত্র ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ এক শিয়া বিদ্রোহে জড়িত হইয়া পলায়ন করেন এবং মরক্কোর ফেজ নামক স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৭৮৮ হইতে ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং প্রথম রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করে।

আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন খলিফা হারুন কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা ইব্রাহীম ইবনে আল-আঘলবের নামানুসারে পরিচিত আঘলাবীয়গণ (৮০০-৮০৯ খ্রিঃ)। তিনি তিউনিসিয়ায় একটি স্বাধীন সুন্নি রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সমউৎসাহী একজন উত্তরাধিকারী একটি নৌবহর নির্মাণ করেন এবং মাল্টা ও সিসিলি অধিকার করিয়া ইতালির উপকূলে লুণ্ঠনাক্রমণ করেন।

মিসরে দুইটি স্বল্প স্থিতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্য একের পর এক স্থাপিত হয়। উভয়টিই তুর্কি। প্রথমটি তুলুনীয়গণ ৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একজন ক্রীতদাসের পুত্র আহমদ ইবনে তুলুন ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে মিসরে পাঠান হইয়াছিল। তিনি গোলযোগের সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তিনি সিরিয়ার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। ফলে ৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এই বংশ নেতৃত্ব হারাইয়া ফেলে। দ্বিতীয় বংশ, ইখ্শিদীয়গণ ৯৩৫ হইতে ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। হামদানীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হওয়া পর্যন্ত তাঁহারাও কিছু দিনের জন্য সিরিয়া ও ফিলিস্তিন শাসন করেন। শেষোক্তটি ছিল আর এক ক্ষুদ্র বংশ যাহা উত্তর সিরিয়ায় পতাকা উত্তোলন করে এবং আলেপ্পো ও হোম্‌সে কেন্দ্র স্থাপন করে। তাহারা ৯২৯ হইতে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। আঘানীর গ্রন্থাকার ইসফাহানী এবং মুতানাব্বী ও মাররী নামে দুইজন খ্যাতনামা কবির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাহারা খ্যাতি অর্জন করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য হইল ফাতেমীয় নামে পরিচিত শিয়া বংশ। পরবর্তীকালে

এই বংশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ, যিনি ৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে আঘলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরানের ইসমাইলী সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুনের একজন বংশধর।[১] মুসলিম বিশ্বের সমস্ত অংশে মিশনারি শাখা বিস্তারকারী ইসমাইলী শিয়াগণ তাহাদের মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর আফ্রিকাকে বাছিয়া নেন। ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ তাঁহারা সমগ্র মিসরে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেখানে তাঁহারা কায়রোকে রাজধানী হিসাবে বাছিয়া লইয়া খেলাফতের দাবি করেন। এইভাবে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইসলামে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফতের সৃষ্টি হয়–আব্বাসীয়, ফাতেমীয় ও স্পেনের উমাইয়াগণের।

অন্যান্য ইসলামি বংশসমূহের ন্যায় ফাতেমীয়গণ যত শীঘ্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে তত শীঘ্রই অধঃপতনের মুখে পতিত হয়। তাহাদের সৌভাগ্যবশত তাহাদের পতন অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পতনের সঙ্গে সংগঠিত হয় এবং ১১৭১ সালে ক্রুসেড-খ্যাত সালাদীন (সালাহ্-আল-দীন) কর্তৃক পরাজিত হওয়া পর্যন্ত তাহারা টিকিয়া থাকে।

শিয়া খেলাফত হিসাবে ফাতেমীয়গণ পারস্য ছাঁচে গঠিত, যদিও তাহাদের শাসনপদ্ধতি ছিল অনেকটা আব্বাসীয়দের ন্যায়। তাহাদের প্রধান কাজ ছিল ইসলামি মতবাদ প্রচার এবং শিয়া শক্তির বিস্তৃতি। ফাতেমীয়গণ ৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পসিদ্ধ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। সমগ্র ফাতেমীয় যুগে ইহা ছিল একটি শিয়া শিক্ষাকেন্দ্র। পরে সুন্নিগণ আজহার অধিকার করে। বিশ্বের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ইহা আজও বিদ্যমান।

পূর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

পূর্বাঞ্চলে বাগদাদের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পশ্চিমের অনেক পরে আরম্ভ হয়। খোরাসানের এক পারস্য ক্রীতদাসের পুত্র তাহেরই প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মামুনের একজন বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। অষ্টম শিয়া ইমাম রেজার হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠান হয়।[২] খোরাসানে পৌঁছিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহের শুক্রবারের নামাজে খলিফার নাম বাদ দেন–যাহাকে স্বাধীনতার নিশ্চিত চিহ্ন হিসাবে ধরা যাইতে পারে। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ৮৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রথম সচেতন পারস্য রাজ্য হইল ইয়াকুব সাফফার (তাম্রকার) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাফফারীয় রাজত্ব (৮৬৭-৯০৩)। তাঁহার কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব ইরানের সিস্তান, যদিও কোনো এক সময় তিনি সমগ্র ইরানের উপর কর্তৃত্ব করেন। খলিফা মু'তামিদের (৮৭০-৯০৩) বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম এক অভিযান (অকৃতকার্য) পরিচালনা করেন। তিনি সমস্ত সরকারি চিঠিপত্রে পারস্য ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং পারস্য সাহিত্যের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দ্বিতীয় পারস্য ক্ষুদ্র রাজ্য, সামানীয়গণ (৮৭৪-৯৯৯)। ইহারা সামান নামক একজন পারস্য অভিজাতের বংশধর বলিয়া দাবি করে। মধ্য ও উত্তর ইরানের এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানার বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের আধিপত্য ছিল এবং তাহাদের রাজধানী ছিল বোখারায়।

---

১. *নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৮।*

২. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৬।*

সামানীয়দের হাতে পারস্য সাহিত্য ইহার স্বকীয় রূপ ধারণ করে। তাহাদের দরবারে রাযী, আবিসেনা, রুদাকী, বালামী ও অন্যান্যদের ন্যায় বিখ্যাত পারস্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থান লাভ করেন।

৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ অভিমুখে প্রবাহিত তুর্কিদের ক্ষুদ্র স্রোত বৃহদাকার ধারণ করে এবং শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহাদের কেহ কেহ পূর্বদিকে নিজস্ব রাজত্ব স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল গজনভীয়গণ (৯৬২-১১৮৬)। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আলপতিগীন সামানীয়দের একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং কালক্রমে আধুনিক আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে এক রাজত্ব গড়িয়া তোলেন। গজনভীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মাহমুদ (৯৯৯-১০৩০) যিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন। তিনি পশ্চিম ইরান হইতে উত্তর ভারত এবং ট্রান্স-অক্সিয়ানার সীমান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলের সর্বজনস্বীকৃত শাসক ছিলেন। ইরানে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী অনেক তুর্কি যোদ্ধাদের মধ্যে গজনভিগণ ছিলেন প্রথম। যদিও তাঁহারা তুর্কি কিন্তু কালক্রমে সবাই পারস্যবাসী হইয়া যান এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। সুবিখ্যাত ফেরদৌসী তাঁহার প্রসিদ্ধ শাহনামা (নৃপতিদের গ্রন্থ) মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেন।

পূর্বাঞ্চলে গজনভীদের সমসাময়িক ছিলেন উত্তর ইরানের বুয়ীদগণ। তাহাদের আদি আবাসভূমি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দায়লামান পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ অভিমুখে বাহির হইয়া ইসফাহান ও সিরাজ অধিকারের পর তাহাদের নেতা আহমদ ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অবরুদ্ধ খলিফা মুসতাকফী কর্তৃক বাগদাদে আমন্ত্রিত হন। খলিফা তাঁহার তুর্কি দেহরক্ষিগণের অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান। আহমদ আমির-আল-উমারা উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহার নাম শুক্রবারে খুতবায় পাঠ করা হয় ও মুদ্রায় ছাপা হয়।

খলিফা সুন্নি তুর্কিদের চাইতে পারস্য শিয়াদের হাতে তেমন আরামে ছিলেন না। নূতন দৃঢ়-মানব খলিফা মুসতাকফীকে অন্ধ করিয়া মু'তিকে (৯৪৬-৯৭৪) নিযুক্ত করেন। অদৃষ্টের পরিহাস তাহার নামের অর্থ 'অনুগত'। তাহারা শিয়া আচরণ চালু করেন। এক শতাব্দীরও অধিককালের (৯৪৫-১০৫৫) শাসন আমলে তাঁহারা শিরাজ হইতে শাসন পরিচালনা করেন, বাগদাদ হইতে নহে– যাহা ইতিমধ্যে ইহার সৌন্দর্য হারাইয়া ফেলে। পারস্য উৎপত্তির উপর জোর দিবার জন্য তাহারা শাহানশাহ (নৃপতিদের রাজা) উপাধি চালু করেন। সালজুক নামক একটি নূতন ও আরও উল্লেখযোগ্য দল বুয়ীদগণের স্থলাভিষিক্ত হয়।

তুর্কিদের এই নূতন দল মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ তুর্কিদের গুজ বংশের অন্তর্ভুক্ত। খুব সম্ভবত তাহারা পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে মিশনারি দল প্রেরণকারী নেসতোরীয় খ্রিষ্টানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।[১] তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে তাহারা খাঁটি সুন্নি মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের যুদ্ধংদেহী ও আগ্রাসী স্বভাব, তৎসঙ্গে বিবাদী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্বলতার ফলে তাহারা দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা খোরাসান, রায় ও মধ্য ইরান অধিকার করে। ১৮ বৎসর পর (১০৫৫) তাহাদের নেতা তুঘরিল বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলিফা কায়েম (১০৩১-১০৭৫) কর্তৃক আমির-আল-উমারা নিযুক্ত হন। এই রীতিটি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই একঘেঁয়ে হইয়া উঠে।

অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রাথমিক শাসকবৃন্দ যুগপৎ আগ্রাসী ও গঠনমূলক প্রকৃতির

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯।*

ছিলেন। সালজুকদের শাসকবৃন্দ ছিলেন তুঘ্‌রিল, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আরসালান এবং আলপ আরসালানের পুত্র জালাল-আল-দীন মালেক শাহ্। অর্ধ শতাব্দীকালের মধ্যে (১০৩৬-১০৯২) এই তিনজন তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাজিত করেন এবং ক্রীড়নক খলিফার নামে দেশ শাসন করেন। তবে সালজুকগণ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয় বলিয়া তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি ইরানের সালজুক নামে পরিচিত–রাজধানী মারাঘেহ্ (১০২৭-১১৯৪); আরেকটি এশিয়া মাইনরের সালজুক নামে পরিচিত, রাজধানী কোনিয়া (১০৭১-১২৯৯); এবং তৃতীয়টি সিরিয়ার সালজুক নামে পরিচিত, তাহাদের রাজধানী আলেপ্পো (১০৯৪-১১১৭)। ইহাদের মধ্যে পারস্য সালজুকগণ তাহাদের প্রসিদ্ধ পারস্য উজির নিজাম আল-মুলকের মাধ্যমে বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই উজির আলপ আরসালান ও মালেক শাহের অধীনে চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল কাজ করেন। বিভিন্ন নগরে তিনি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ হইল বাগদাদের নিজামিয়া। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্যবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়াম বর্ষপঞ্জী সংশোধন করেন। ওমর খৈয়াম তাঁহার রুবাইয়াতের জন্য বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতি হইল 'জালালী' পঞ্জিকা– যাহা বর্তমানে ইরানে চালু আছে। নিজাম আল-মূলক নিজে একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়াসতনামা' (শাসনালেখ্য)। এই গ্রন্থ তিনি মালেক শাহের পথ প্রদর্শনের জন্য রচনা করেন।

১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের সালজুকগণ খারজমের তুর্কিগণের দ্বারা পরাজিত হয়। এই তুর্কিগণ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে শিয়া ছিল। তাহাদের বংশ খারজমশাহ নামে পরিচিত। ইহাদের এক যুবরাজ আলা-আল-দীন মুহম্মদ (১২০০-১২২০) বাগদাদের সুন্নি খেলাফত বিলুপ্ত করিতে মনস্থ করেন। বৃদ্ধ ও অন্যন্যোপায় খলিফা নাসির নূতন 'তুর্কি' দলের অভিযানের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার শত্রু খারজমশাহের বিরুদ্ধে তুর্কিদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এ ব্যাপারে তিনি আশাতিরিক্ত ফল লাভ করেন। এই নূতন বংশ চেঙ্গিস খানের অধীনস্থ মোঙ্গল বলিয়া প্রমাণিত হয়।[১]

প্রায় ৩০০ বৎসর স্থায়ী ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায় মোটের উপর বংশগত ও ধর্মীয় কারণে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আঘলাবীয় ও তুলুনীয়দের ন্যায় কেহ কেহ নিজস্ব খ্যাতি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশে কাজ করে। অপরদিকে অন্যরা প্রধানত ফাতেমীয়গণ ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে পূর্বাঞ্চলে ধর্ম কোনো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। সেখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারস্য পৃষ্ঠপোষকতা। পারস্যবাসিগণ সচেতনভাবে ছিল আরব বিরোধী এবং পারস্য আধিপত্য পুনর্বহাল করিতে তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করে। ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার জনগণ, আংশিকভাবে সেমিটিক উৎপত্তি এবং আংশিকভাবে আরব আক্রমণের সময় বিজিত জাতি ছিল বিধায় আরবিকে তাহাদের কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। সত্য বলিতে কি সেখানে কিছু কিছু বাধাবিপত্তি ছিল, কিন্তু ঐগুলি তেমন শক্তিশালী ছিল না। তবে পূর্বাঞ্চলে পারস্যবাসিগণ আরবিকরণের চাপ প্রতিহত করে এবং আরবি বলিতে অস্বীকার করে। ইরানি মালভূমিতে বিক্ষিপ্ত তুর্কি বংশসমূহের কোনো কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ আরবির চাইতে ফার্সি বলিতেই শিখে। বাগদাদের কেন্দ্রে অবস্থিতির ফলে এবং

---

১. নিচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩৭।

স্পেনের উমাইয়াগণ
কায়রোয়ান
ইদ্রিসীয়গণ
আগলাবীয়গণ
কনস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ
বাইজান্টীয়গণ
ভূমধ্য সাগর
তুলুনীয়গণ
ফাতেমীয়গণ
দামেস্ক
জেরুজালেম
কায়রো
বুয়াইহিদগণ
হামাদান
বাগদাদ
ইসপাহান
শিরাজ
আব্বাসীয়গণ
পারস্য উপসাগর
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
কাসপিয়ান সাগর
আরাল সাগর
সির দরিয়া
সামানীয়গণ
আমু দরিয়া
গজনভীয়গণ
ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগ
দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী
০
৬০০
মাইল

বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণের ফলে প্রায় মোঙ্গল যুগের আগমন পর্যন্ত আরবি ভাষা পাঠক্রমে মাধ্যম হিসাবে চালু থাকে। কিন্তু ফার্সি সর্বদা মুখের ভাষা হিসাবে বিরাজ করে। ৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সাফফারীদের সময় হইতে এই ভাষা এমন কি তুর্কি ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহেরও প্রশাসনের ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, 'আব্বাসীয় খলিফাগণ তাহা হইলে এতদিন কিভাবে টিকিয়া থাকিলেন?' প্রকৃতপক্ষে, অন্তত ৮৫০ হইতে ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোনো না কোনো শক্তিশালী লোক বা 'যুবরাজ' একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে খেলাফতকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁচাইয়া রাখে। ইহার প্রধান কারণ এই পদের মর্যাদা এবং মুসলিম জনগণের অন্তরে ইহার সুউচ্চ আসন। খলিফার নিকট হইতে 'অভিষেক' গ্রহণ করা এইসব যুবরাজের একটি রীতিতে পরিণত হয়। সম্ভবত জনসাধারণকে বিশেষত ধর্মীয় নেতাদিগকে দেখাইবার জন্য এই অভিষেক লওয়া হয়। খলিফাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এইসব নিযুক্তপত্র প্রদান করিতেন। অতি অল্প-কয়েকজনের মধ্যে যাহারা এরূপ সরকারি 'নিয়োগপত্র' পান নাই তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াকুব সাফফার। হিস্ট্রী অব সিস্তানের (সিস্তানের ইতিহাস) অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াকুবকে খলিফার অনুমতিপত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হ্যাঁ-সূচক উত্তর প্রদান করেন। তিনি অতঃপর তাহাদিগকে উহা দেখিতে আমন্ত্রণ জানান। তাহাদের সকলে একত্রিত হইলে তিনি তাহার সহকারীকে সেই 'অনুমতিপত্র' আনিতে আদেশ করেন। আমন্ত্রিতদের ত্রাসের মধ্যে সেই সহকারী একটি কুশান লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেই কুশানের উপর ছিল একটি খোলা তরবারি। ইয়াকুব কয়েকবার সাংঘাতিকভাবে সেই তরবারি ঘুরাইয়া ধর্মীয় নেতাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আল-সাফফাহর (আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা) নিকট এরূপ একটি তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অনুমতিপত্র ছিল কিনা। একত্রিত জমায়েত ভয়ে এবং যুক্তির জোরে বাক্যহীন হইয়া পড়েন। ইহা দেখিয়া ইয়াকুব বলিলেন, 'এখন আপনারা যখন আনুমতিপত্র দেখিলেন তখন বাড়ি যাইতে পারেন।'

খলিফাদিগকে বাঁচিতে দেওয়ার আরেকটি কারণ হইল আইনানুগতার চিন্তা। অধিকাংশ সুন্নি দল বিশ্বাস করেন যে, খলিফা কোরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া উচিত। বিবদমান যুবরাজগণ এইরূপ কোনো দাবি সম্ভবত উত্থাপন করিতে পারেন নাই। বিবাহের মাধ্যমে তাহাদের কেহ কেহ আব্বাসের পরিবারের সহিত নিজদিগকে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন কি শিয়াগণও—যাহারা আব্বাসীয়দিগকে আইনানুগ খলিফা বলিয়া বিশ্বাস করেন না— জনতার ভাবাবেগকে ভয় করিতেন। ফাতেমীয়গণ ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাগদাদ অধিকার করেন এবং কায়েমকে আলীর বংশের সপক্ষে খেলাফতের দাবি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন। সালজুক তুঘরিল বন্দী খলিফাকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। খলিফাকে হুমকি প্রদর্শনকারী আরেকজন শিয়া ছিলেন মুহম্মদ খারজমশাহ। তিনি—চেঙ্গিস খান কর্তৃক ধ্বংস হইবার পর আর কোনো সুযোগ লাভ করেন নাই।

এইভাবে আব্বাসীয় বংশ বাগদাদ ধ্বংসের পরও ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। সেই সময় ওসমানীয় সুলতান সেলিম মামলুকদিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রহসনের সমাপ্তি ঘটান এবং খলিফাকে বন্দী করেন।

দশম অধ্যায়
ধর্ম, আইন ও নীতিশাস্ত্র

সাংস্কৃতিক দিক হইতে বলিতে গেলে, ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও ইরানে আরব বিজয় ছিল বাইজান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়ের অগ্রগামী সভ্যতাগুলির উপর অসভ্যতার আক্রমণ। এ পর্যন্ত জরিপকৃত ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চারিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম দুইটি ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১]

১। **'নেতৃস্থানীয় খলিফাদের' যুগ**[২] **ঃ** প্রধান কার্যক্রম ছিল সামরিক বিজয়গুলির স্থিতিশীলতা আনয়ন করা এবং মরুভূমি হইতে আমদানিকৃত সরল ধর্ম প্রচার করা।

২। **উমাইয়া যুগ ঃ** তখনও প্রাচীন বেদুইন সংস্কৃতিঘেঁষা এবং গৃহযুদ্ধে ভারাক্রান্ত। তাহা সত্ত্বেও ইহা ধর্মকে বাইজান্টাইন এবং পারস্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনয়ন করে ও ইসলামি সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম ও আচরণ সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

৩। **প্রাথমিক আব্বাসীয়দের অনুকরণের যুগ ঃ** যখন অনৈসলামিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে আরবিতে অনুবাদ করা হয়।

৪। **আব্বাসীয়দের পতন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থানের সময় সৃজনশীলতার যুগ ঃ** যখন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও অন্যান্যরা তাহাদের করায়ত্ত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

ইসলামি সংস্কৃতির উপর অনুবাদ বা অনুকরণের যুগের প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন, কারণ ইহা ব্যতীত অসংখ্য মুসলিম পণ্ডিতদের সৃজনশীল অবদান সম্ভব হইত না। অধিকন্তু ইহা মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, এই সংস্কৃতি মিসরীয়, গ্রীক, পারস্য, সিরীয়, ভারতীয় ও চীনা উপাদানের সংমিশ্রন, যাহা আরব উপদ্বীপ হইতে নীত মৌলিক সরল ধর্ম হইতে বহুদূরে। তবে এই আদি সরল ধর্মকে কখনও ত্যাগ করা হয় নাই। সমস্ত জ্ঞান, পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে উমাইয়া বংশীয় আবদ-আল-মালিক সাসানীয় শাসন পদ্ধতিকে আরবিতে অনুবাদের আদেশ প্রদান করেন। আরব শাসকবৃন্দ নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপাদান হইতে সাহায্য অনুসন্ধান করেন। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের [illegible]কালে বিশেষত হরুন-আল-রশীদ ও মামুনের সময় ব্যাপকভাবে অনুবাদ করা হয়। শেষোক্তজনই 'বায়ত-আল-হিকমা' (জ্ঞান ভবন) প্রতিষ্ঠা করেন যাহার প্রধান কাজ ছিল বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা ও অনুবাদ করা। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের একটি গৌরবপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তাহারা যদিও নিষ্ফল উপভোগে বিরাট অর্থের অপচয়ে লিপ্ত ছিলেন,

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৩, ৭০।*

২. *মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রথম চারি খলিফার ব্যাপারে সর্বদা 'রাশেদীন' বিশেষণটি ব্যবহার করেন।*

তবুও বুদ্ধিজীবীদিগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানেও কখনও পিছপা হন নাই। কোনো কোনো খলিফা তাহাদের শত্রু বাইজান্টিয়ামের সম্রাটদের নিকট গ্রন্থ চাহিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রামাণ্য নথিপত্রে দেখা যায় ঃ অনুবাদ সংস্থার সদস্যবৃন্দ ছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনধারী বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁহারা নির্বিচারে সমস্ত প্রকারের কার্যাবলী অনুবাদ করেন– গ্রীক, পাহলভী, লাতিন, সংস্কৃত, চীনা, সিরিয়াক, নাবাতিয়ান ও অন্যান্য ভাষা হইতে এসব অনুবাদ করা হয়। অসংখ্য অনুবাদের তালিকা দেখিলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাহারা গ্রীক হইতে অনুবাদ করেন দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও সাহিত্য; সংস্কৃত হইতে অংক, চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতির্বিদ্যা এবং নাবাতিয়ান হইতে কৃষিকার্য ও যাদুবিদ্যার গ্রন্থ।

বস্তুত সমস্ত অনুবাদকই ছিলেন অনারব এবং কেউ কেউ ছিলেন অমুসলিম। অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ইসলামি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন ইবনে মুকাফফা (মৃত্যু ৭৫৭ খ্রিঃ) একজন জরথুস্ত্র; হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮০৯-৮৭৩ খ্রিঃ) একজন খ্রীষ্টান এবং সাবিত ইবনে কুররাহ (মৃত্যু ৯০১ খ্রিঃ) - একজন সাবিয়ান।

ইবনে মুকাফফার প্রকৃত নাম রুজবেহ ফার্সি, কিন্তু তিনি তাঁহার অপমানসূচক আরবি ডাকা নামেই অধিক পরিচিত। যাহার অর্থ 'কুঞ্চিত' ব্যক্তির পুত্র, কারণ তাঁহার পিতার হাত উৎপীড়নে কোঁকড়াইয়া গিয়াছিল। ইসলাম ধর্মে তাঁহার দীক্ষা ঐকান্তিক কিনা তাহা সন্দেহজনক। কোনো এক সময় তিনি শেষ উমাইয়া খলিফার দরবারে সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন এবং আব্বাসীয়দের সময়ও সেই কাজ অব্যাহত থাকে, যদিও তাহা স্বল্পকালীন। তাহার অনবদ্য অনুবাদগুলির মধ্যে একটি হইল খোদাইনামাহ্ (প্রভুদের গ্রন্থ)। ইহাকে 'সিয়ার আল-মূলুক-আল-আজম' (ইরানের রাজন্যবর্গের গুণাবলী) নামে তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। পরবর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকদের জন্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি আদর্শে পরিণত হয়। তবে, তাঁহার অনুবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হইল প্রাচীন বিশুদ্ধ সংস্কৃতি, পঞ্চতন্ত্র যাহাকে 'বিদপাইয়ের গল্প' নামে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রুজবেহ ইহাকে 'কালিলা ওয়া দিমনা' নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইহা একটি আনন্দাদায়ক কাহিনী, যাহাতে পশুরাও মানবরূপ ধারণ করিয়া সব রকমের দার্শনিক ও নৈতিক ভাবধারা আলোচনা করিয়াছে। প্রত্যেক ভাবধারা এক একটি উপদেশপূর্ণ গল্পের সাহায্যে উত্থাপন করা হইয়াছে এবং তাহাতে আরও অধিকসংখ্যক পশুর চরিত্র সংযোজন করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বের অনেক জাতির সাহিত্যের ক্লাসিকে পরিণত হয়। মূল সংস্কৃত ভাষার অনুবাদগুলি এখন নষ্ট হইবার ফলে এই অসাধারণ গুণি অনুবাদক রুজবেহ্ -এর প্রতি ঋণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি আরবি রচনায় পারস্য রীতি প্রচলন করে। নূতন নূতন উপমা, ব্যঙ্গ গদ্য অতি সাধারণ ও পরিচিত শব্দের মাধ্যমে ইহাতে প্রকাশ করা হয়। ইহা আরবি ভাষাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করে যাহা মাত্র কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একটি আদর্শ হিসাবে প্রচলিত ছিল। ইবনে মুকাফফা একজন শো'বিয়া নেতা।[১] কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার আরবিকে কোরানের চেয়েও উত্তম বলিয়া দাবি করিতেন। অন্তরে তিনি জরথুস্ত্র ছিলেন

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৮৯।*

বলিয়া সন্দেহ করা হয়, যাহা সম্ভবত সঠিক। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের আদেশে তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ অনুবাদক হইলেন হুনায়েন ইবনে ইসহাক। তিনি একজন নেসতোরীয় খ্রিষ্টান। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার প্রশিক্ষণ ছিল। কিন্তু অনুবাদক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ লাভ করেন না। নেসতোরীয় খ্রিষ্টান হিসাবে তাঁহার মাতৃভাষা ছিল সিরিয়াক। তাই তিনি আরবি ভাল জানিতেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা আরবিতে অনুবাদ করিতেন মামুন সেই গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিতেন। তাঁহার অনুবাদগুলির মধ্যে রহিয়াছে গ্যালেন হিপোক্রেটস্, প্লেটোর রিপাবলিক, এ্যারিস্টোটলের 'ক্যাটেগরিয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থ।

চারিজন খলিফার অধীনে তিনি চাকরি করেন। তিনি মোতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবেও কাজ করেন। তিনি কখনও মুসলমান হন নাই এবং বোধ হয় চোখ ঠারিয়া বলিতেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা যেখানে আছেন তিনিও সেখানে থাকিতে চান ঃ সে স্বর্গে হোক বা নরকে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে তৃতীয় জ্যোতিষ্ক ছিলেন সাবিত ইবনে কোররাহ নামক একজন সাবিয়ান (৮৩৬-৮৯১)।[২] তিনি নক্ষত্র উপাসক সাবিয়ানদের অন্তর্গত ছিলেন এবং স্বধর্মের সহচরগণসহ তৎকালে পরিচিত প্রায় সমস্ত অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ গ্রীক হইতে অনুবাদ করেন। তাহার অনুবাদগুলির মধ্যে রহিয়াছে আর্কিমিডেসের রচনাবলী, পারগার এ্যাপোলোনিয়াস, ইউক্লিড ও অন্যান্য। তিনি একটি অনুবাদক সংস্থা স্থাপন করেন যাহার প্রায় সদস্যই ছিলেন হুনায়েনের ন্যায় তাঁহার স্বীয় পরিবারের লোক। আনুমানিক দ্বিতীয় পুরুষে এই পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। হুনাইনের পরিবারের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম

ইসলামের সাধারণ ধর্মতত্ত্ব, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার বার্তাবাহকসহ কিছু রীতি ও আচার ব্যবহারের আইন মরুভূমির জীবনের জন্য যথেষ্টই মনে হয়। এমন একটি ধর্ম যাহা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়াছে, অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদসমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া জীবন এবং পরকাল সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার আবর্তে পড়িয়া নিরাবরণ হইয়া পড়ে। তদুপরি এই যুগের বিক্ষুব্ধ ইতিহাস এবং ইহার রক্তারক্তি, গৃহযুদ্ধসমূহ, গুপ্ত হত্যা, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ, উমাইয়াদের পার্থিব মনোভাব এবং অন্যান্য সমস্যা এমন কতকগুলি ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের অবতারণা করে যাহা ইসলামের নূতন ধর্মীয় সমাজকে রীতিমত কাঁপাইয়া তোলে।

প্রথম শ্রেণীতে যাহারা সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, তাহারা হইল খারেজিগণ।[৩] এইসব দলত্যাগকারিগণ পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত উদার এবং খেলাফতের প্রশ্নে আপোসহীন। তাহাদের মতে, যুগের প্রধান সমস্যা এই খেলাফত সমস্ত মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত, তা তাহারা যে জাতিরই হউক না

---

২. *উপরে দ্রষ্টব্য. পৃঃ ১০।*

৩. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৬৭।*

কেন। তাহারা জোর দিয়া বলে, "এমনকি একজন ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারে", তবে তাহাকে ন্যায়বান, চরিত্রবান এবং সুকর্মা হইতে হইবে। তাহারা 'পূণ্য কাজে মুক্তি' মতবাদ চালু করে এবং ক্রমশ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে কোনো লোক উত্তম কার্যের জন্য পরিত্রাণ পাইতে পারে– সে যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন। খারেজিগণ তাহাদের এই মতাদর্শের বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সর্বদা খড়গহস্ত থাকে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ কর্তৃক বাগদাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হয়। সাফফারীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুবের সেনাবাহিনীতে খারেজীদের এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের অপর পক্ষে ছিল আরেক শ্রেণী, যাহারা পাপ স্বীকারকে মুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করে। মানুষের কার্যাবলীর ব্যাপারে তাহারা মনুষ্য সিদ্ধান্তের বিলুপ্তিতে বিশ্বাসী এবং সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতি। এইজন্য তাহারা মুরজীয় নামে পরিচিত। ইহা ইসলামের বাস্তবতা ও উমাইয়াদের পার্থিব কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি প্রচেষ্টা মাত্র। তাহারা বলে কোনো লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষার কথা স্বীকার করিলেই– যেমন উমাইয়াগণ নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছে–সে একজন খাঁটি মুসলমান, তাহার কার্যাবলী যেরূপই হইক না কেন। এই দুই মতামতের মাঝখানে আসে মুতাযিলাদের মতামত। এই মতবাদ কিছুকালের জন্য একটি প্রধান ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু ছিল। তাহারা বিশ্বাস করে কোনো মুসলমান গুরুতর কোনো পাপ করিলে সে নিজেকে মূল সম্প্রদায়ের উম্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু কাফের হইয়া যায় না। স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করে যে মতবাদ কাদেরিয়গণ তাহা প্রচার করে। জাবরীয়গণ আবার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করে না এবং পবিত্র কোরআনের অদৃষ্টবাদীমূলক বাণীগুলির অনুকরণ করে।

তবে মুতাযিলাদের প্রধান অনুরাগ ছিল গ্রীক যুক্তিবাদের দ্বারা মুসলিম মানসে উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর প্রতি। এইগুলির একটি হইল আল্লাহ্‌র নাম লইয়া বিতর্ক। চিরাচরিত মতানুসারে আল্লাহ্‌র নাম ৯৯টি। মুতাযিলা যুক্তিবাদীদের মতানুযায়ী এইসব মনুষ্যগুণাবলী সদৃশ নামের মর্মার্থ অস্বস্তিকর। তদুপরি তাহারা বিশ্বাস করে যে, এই ধরনের নাম যুক্তির দিক হইতে পবিত্র কোরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত আল্লাহ্‌র একত্ববাদের পরিপন্থী । ফলে তাহারা আল্লাহ্‌র নামকে ঐশী গুণাবলী হইতে পৃথক মনে করে এবং আল্লাহ্‌র একত্ব রক্ষা করিবার জন্য বলে যে, আল্লাহ্‌র সত্তা এবং তাঁহার গুণাবলীর ধারণা পরস্পরবিরোধী নহে। তাঁহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হয় কোরআনকে কেন্দ্র করিয়া। রক্ষণশীল মত হইল পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র সৃষ্টিহীন বাণী এবং তাহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যুক্তিবাদী মুতাযিলাগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা ঘোষণা করে যে, কোরআনকে সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাই চিরঞ্জীব নহে। কোরআন সৃষ্টি বলিয়া শিক্ষা দিবার অভিযোগে এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করিবার অপরাধে উমাইয়া খলিফা হিশাম (৭২৪-৭৪৩) এইসব যুক্তিবাদী কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে মুতাযিলাগণ শক্তিশালী হয় এবং খলিফা মামুন তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাহাদের প্রভাবে পবিত্র কোরআনকে সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বাস করা অপরিহার্য বলিয়া তিনি একটি বিশেষ হুকুম জারি করেন। ইহাতে রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুতাযিলাগণ পূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে। এই সমস্ত স্বাধীন চিন্তার পুরোধাগণ

মামুন ও তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারীকে "একটি অনুসন্ধান সংস্থা" গঠন করিয়া এই নূতন মতবাদ যাহারা সমর্থন করে না তাহাদিগকে অত্যাচার করিতে প্ররোচণা দান করেন।

তবে, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রক্ষণশীলগণ এককালের প্রসিদ্ধ মুতাযেলী আবুল হাসান আলী আল-আশা'রীকে তাহাদের সমর্থক হিসাবে লাভ করে। তিনি মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৎপরিবর্তে দাবি করেন যে, মানুষের নানা কর্মধারার মধ্যে নির্বাচন স্বাধীনতা রহিয়াছে। অতএব মানুষ তাহার কার্যাবলীর জন্য দায়ী। আল্লাহ্ এবং তাঁহার নামের ব্যাপারে তিনি বলেন যে, আল্লাহ্‌র প্রত্যেক নামের এক একটি অর্থ আছে যাহা মানুষের সহিত প্রযোজ্য নামের অর্থ হইতে পৃথক। ফলে আল্লাহ্‌র জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞান হইতে পৃথক করা হয়। কারণ এই দুইটি গুণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জাতীয়।

গ্রীক ও অন্যান্য পদ্ধতির চিন্তাধারাও ইসলামে বলবৎ থাকে। আশা'রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারায় ইসলাম ও উপরোক্ত চিন্তাধারাগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা আনয়নের প্রচেষ্টা চলে। এই কাজ সম্পন্ন করেন মুসলমান রক্ষণশীলদের অনুকূলে বিশ্ববিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) । তিনি খোরাসানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি চমকপ্রদ জীবনযাপনের পর তাঁহার জন্মভূমিতেই পরলোকগমন করেন। তিনি প্রত্যেক দর্শন ও ধর্মমত পাঠ করেন এবং পর্যায়ক্রমে অনেকগুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত সেন্ট অগাস্টাইনের স্বীকারোক্তির সমগোত্রীয়। বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজ্জালী ইসলামতত্ত্ব শিক্ষাদান করিবার পর ইহা ত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন চিন্তার রাজ্যে চলিয়া যান। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ধর্ম-বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম' নামক গ্রন্থে তিনি ইসলাম, গ্রীক যুক্তিবাদ ও পারস্য মরমীবাদকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করেন। গাজ্জালীর মতানুসারে জ্ঞান দুই প্রকারের -

ক। যে জ্ঞান ধর্মতত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং

খ। যে জ্ঞান ধর্মতত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে। শেষোক্ত জ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও শিল্প অধ্যয়নে তিনি উৎসাহ দান করেন এবং কবিতা ও ইতিহাস পাঠের অনুমতি দান করেন। তাঁহার কার্যাবলী লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং সেন্ট থমাস একুইনাসের উপর তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। সেন্ট থমাস খ্রিষ্টান ঐশীবাণীর সঙ্গে গ্রীক যুক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন। অথচ মধ্যযুগীয় থমাসবাদ প্রটেস্ট্যান্ট সংস্কার ও পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে গাজ্জালী ও অন্যান্যরা মুসলিম রক্ষণশীলতাকে মধ্যযুগের যে গৃহে স্থাপন করিয়াছেন তাহা অধিককালই রহিয়া গিয়াছে। এই অর্থে 'মধ্যযুগীয় ইসলামের পরিসমাপ্তির ব্যাপারে কথা বলা সঠিক নহে, কারণ ইসলামের তথাকথিত মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কোনো হুমকিরই সম্মুখীন হয় নাই বরং অপরিবর্তিত থাকে।

শিয়া মতবাদ

এই পর্যন্ত আলোচিত ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলনসমূহ ইসলামে স্থায়ী কোনো ভাঙ্গন সৃষ্টি করে নাই। যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইসলামকে স্থায়ীভাবে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলে তাহা হইল শিয়া মতবাদ। স্মরণ করা যাইতে পারে যে আলীর সমর্থকগণ (শিয়া) খেলাফতের প্রশ্নে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান।[১] রাজনীতি বা যুদ্ধের দ্বারা দাবি প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইয়া

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৫৪।*

শিয়াগণ সংখ্যাগুরুদের দল হইতে চিরতরে পৃথক হইয়া যায় এবং ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সরকার ও নীতিশাস্ত্র সম্বলিত পৃথক একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মত শিয়ামতবাদে জরথুস্ত্র, নেসতোরীয় ও অন্যান্য মতবাদগুলির প্রতিধ্বনি জোরালোভাবে শোনা যায়। ইহা ইসলামে রহস্যবাদ, যাজকতন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ততন্ত্র, বর্ণবাদ ইত্যাদি আমদানি করে, যেগুলির অধিকাংশ সুন্নিরা বর্জন করিয়াছে। সুন্নিগণ কোরআনকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে, অথচ শিয়াগণ দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে মানুষকে। তিনি হইলেন ইমাম—যিনি নিষ্পাপ এবং যাঁহাকে তাহারা মানব-প্রভু মনে করে। কারবালায় তৃতীয় ইমাম হোসাইনের শাহাদতের ফলে শিয়াগণ তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতি লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সমস্ত প্রকারের আত্মাহুতি, সম্ভোগ, খেলাধুলা ও কবিতা ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুকে পৃথিবীর সমস্ত পাপের প্রতিনিধিরূপে অংকিত করিয়া রাস্তায় বাহির হইবার সুযোগ লাভ করে।

প্রথম ইমাম এবং রসুলুল্লাহর (সঃ) প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলী হযরত মুহম্মদ (সঃ) হইতে বার্তাবাহকের আলো লাভ করেন এবং তিনি ইহা তাঁহার বংশধর উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করেন বলিয়া শিয়ারা দাবি করে। ইহা শিয়াদিগকে এই দাবি করিবার সুযোগ দান করে যে মুহম্মদ (সঃ)-ই সত্যিকারের শেষ নবী, যাঁহার বার্তা আলীর মাধ্যমে তাঁহার বংশধরদের মধ্যে চিরস্থায়ী করা হইয়াছে। ইহাকে তাহারা এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তাহারা ইসলামের সাক্ষ্য, "আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নাই এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র বার্তাবাহক," এই স্বীকোরোক্তিতে সন্তুষ্ট নহে। ইহার সঙ্গে তাহারা সর্বদা একটি তৃতীয় বাক্য যোগ করে, "আমি বিশ্বাস করি যে আলী আল্লাহ্র প্রতিনিধি (ওয়ালী)"।

ইমামতের এই মতবাদ শিয়াদের রাজনৈতিক মতবাদের গুঢ়তত্ত্ব হিসাবে কাজ করে। শিয়াগণের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ধর্মতাত্ত্বিক। সুন্নি বা শিয়া কোনো মুসলমানই সন্দেহ উত্থাপন করে না যে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। শিয়াদের মতানুসারে যেহেতু তাঁহার পারলৌকিক ও ইহলৌকিক সমস্ত ক্ষমতা আলীর নিকট এবং পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে অন্যান্য ইমামদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে, অতএব ইমামই আইন অনুযায়ী সরকারের মালিক। ইমাম বা তাঁহার প্রতিনিধিদের অধীনে নয় এরূপ সুন্নি খলিফাগণসহ সমস্ত সরকার ক্ষমতার জোর দখলকারী। ফলে ইসলামের প্রথম তিন খলিফা, আবুবকর, ওমর ও ওসমানকে শিয়াগণ ক্ষমতার 'জোর দখলকারী' বিবেচনা করে।

শিয়াগণ প্রত্যাবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করে। জরথুস্ত্রদের ত্রাণকারীর প্রত্যাবর্তন, ইহুদী ধর্মের মছিহ্-এর আগমন এবং খ্রিষ্টান ধর্মে যীশুর 'দ্বিতীয় আগমন'-এর সঙ্গে ইহার প্রভূত মিল রহিয়াছে। অধিকাংশ শিয়া বিশ্বাস করে যে, ইমাম বার জন ছিলেন এবং ইহাও বিশ্বাস করে যে দ্বাদশ ইমাম, মাহদী (মসিয়াহ্) লুক্কায়িত রহিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় আগমন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে শিয়া ইসলামের আওতাভুক্ত করিবেন। নিম্নোক্ত পৃষ্ঠায় বার জন ইমামের নাম দেওয়া গেল।

১। আলী (মৃঃ ৬৬১)

২। হাসান (মৃঃ ৬৬৯) ৩। হোসাইন (মৃঃ ৬৮০)

৪। আলী জয়নাল আবেদীন (মৃঃ ৭১২)

জায়েদ ৫। মুহম্মদ আল-বাকের (মৃঃ ৭৩১)

৬। জাফর আস সাদেক (মৃঃ ৭৬৫)

ইসমাইল (মৃঃ ৭৬০) ৭। মুসা আল কাজেম (মৃঃ ৭৯৯)

৮। আলী আল রিজা (মৃঃ ৮১৮)

৯। মুহম্মদ আল জাওয়াদ (মৃঃ ৮৩৫)

১০। আলী আল হাদী (মৃঃ ৮৬৮)

১১। হাসান আল আসকারী (মৃঃ ৮৭৪)

১২। মুহম্মদ আল-মুনতাজার (মাহদী) (মৃঃ ৮৭৮)

শিয়াদের আরেক ভাগকে জায়দী বলা হয়। কারণ তাহারা হোসাইনের পৌত্র জায়েদ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া যায় এবং তাঁহাকে তাহাদের নেতা মনে করে। তাহারা প্রত্যাবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করে না এবং সুন্নিদের সহিত তাহাদের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে।

শিয়াদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দল হইল ইসমাইলিগণ বা সপ্তমিগণ। ষষ্ঠ ইমামের দুই ছেলে ছিল ইসমাইল ও মুসা। তিনি প্রথমে ইসমাইলকে ইমাম নিযুক্ত করেন কিন্তু ইসমাইলের মদ্যপানের অভ্যাস দেখিয়া তিনি পরে ইমামতি মুসাকে দান করেন। ইসমাইল তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে পরলোক গমন করেন। তাহা সত্ত্বেও এই দল ইসমাইলকে সপ্তম ইমাম মনে করে। তাহারা সাত 'নম্বরের' উপর 'গুপ্ত অজ্ঞাত রহস্যের' প্রবর্তন করেন। সমগ্র ইসলামে তাহাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত মিশনারী কার্যাবলীর একজন নেতা ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

আরেকটি সুপরিচিত শাখাকে এ্যাসাসিন বা আত্তায়ী (আরবি 'হাশিসীন') বলা হয়। কারণ, হত্যাযজ্ঞের কাজে বাহির হইবার পূর্বে তাহারা তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে হাশীশ

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯৬।*

(গাঁজা জাতীয়) ধূমপান করাইত। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-সাববাহ্ (মৃঃ ১১২৪ খ্রিঃ) কাজভীনের উত্তর-পশ্চিমে আল-বুরজ্ পর্বতের সুউচ্চ ও দুর্গম দুর্গ - আলামুতে তাহার প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। হাসান আল-সাব্বাহ্র কার্যাবলী মূলত রাজনৈতিক এবং বাহ্যত সুন্নি বিরোধী। বস্তুত সুন্নিদের সমর্থনকারীদিগকেও তাহারা বাধা প্রদান করে। নিজাম আল-মূলক ছিলেন একজন খাঁটি সুন্নি এবং তিনি অনেকগুলি নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এগুলিতে অন্যান্য বিদ্যা ও শাস্ত্রগুলির সঙ্গে আশা'রী মতবাদও শিক্ষা দেওয়া হইত। স্বভাবতঃই তিনি এ্যাসাসিনদের লক্ষ্যে পরিণত হন এবং আততায়ী ঘাতকের হাতে নিহত হন। আলামুতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযানই ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ধ্বংসকারী মোঙ্গলদের হাতে আলামুত বিজিত ও বিধ্বস্ত হয়।[২]

সূফী মতবাদ

সুফীবাদ বা ইসলামি অতীন্দ্রিয়বাদ ধর্মের ক্ষেত্রে আরও একটি সম্প্রসারণ। ইহার অনুসারিগণ কম্বলের তৈয়ারি জামা (সূফ) পরিধান করে বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। সুফীবাদ আরবিভাষী লোকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সর্বপ্রথম মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন কুফার প্রসিদ্ধ মহিলা রাবিয়া (মৃত্যু-৮০১ খ্রিঃ) ইসলামি ধর্মীয় ইতিহাসের কিছুসংখ্যক পণ্ডিতের মতানুসারে সুফীবাদ হইল 'ধর্মীয় ক্ষেত্রে পারস্য মনোভাবের সর্বোচ্চ প্রকাশ।' বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী গাজ্জালী, আত্তার, রুমী, হাফেজ প্রমুখ এই দাবির সত্যতা বহন করেন। বস্তুত প্রত্যেক ধর্ম ইহার নিজস্ব আকারের অতীন্দ্রিয়বাদ সৃষ্টি করে। ইসলামে, সুফিবাদ আশা'রী ধর্মতত্ত্বের আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াও বটে। সুফীদের মতানুসারে পৃথিবী আল্লাহর অভিব্যক্তি, এবং আল্লাহর গুণাবলী ও মানুষের মধ্যে একটি সত্যিকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। খ্রিষ্টানদের সন্ন্যাস প্রথা এবং বাইবেলের অতীন্দ্রিয়বাদী প্রকৃতি সুফিদিগকে আকৃষ্ট করে। রুমী বলেন, "যীশুর আশ্রম হইল অতীন্দ্রিয়বাদী লোকদের স্থান।" হাফেজের নিকট 'গীর্জা' আনন্দ ও উন্মত্ততায় পরিপূর্ণ; অপরদিকে 'মসজিদ' অন্ধকার ও কঠোর। সুফিগণ বিশ্বাস করেন যে, রক্ষণশীলতা ইসলামকে একটি কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়াছে। সুফিগণ সেই কুঠরী (কিস্‌র) ভাঙ্গিয়াছেন। এই কাজটি পাপ হইলেও প্রয়োজনীয়।

সুফিগণ প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের মত নিজদিগকে 'সঠিক পথের লোক' বলিয়া অভিহিত করে। এই ভাবধারা মূর্ত হইয়াছে এই দাবির মধ্যে যে মানুষের আত্মাকে তাহার সৃষ্টিকর্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং আল্লাহতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহাতে কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে ইহা পুনরায় আল্লাহর মধ্যে বিলীন হইতে পারে। 'পাখিদের কথোপকথন' নামক অনিন্দ রূপক গল্পে আত্তার পাখিদের (মানবকূল) গল্প বর্ণনা করেন। পাখিগণ 'কাফ' পর্বতের অপর পারে বসবাসকারী তাহাদের রাজা 'সি মোরগের' (আল্লাহ্) অনুসন্ধান করিতে গেল। তাহাদিগকে সাতটি উপত্যকা (শর্ত) অতিক্রম করিতে হয় ঃ

১। অনুসন্ধান

২। প্রেম

৩। বোধশক্তি

---

২. নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৪০।

৪। বিচ্ছিন্নকরণ

৫। ভাবসম্মিলন

৬। বিস্ময়

৭। মিলন এবং লীন।

রাজার অনুসন্ধানে বহির্গত হাজার হাজার পাখিদের মধ্যে মাত্র ৩০টি পাখি ফার্সি ভাষায় 'সি' (৩০) 'মোরগ' (পাখি) গন্তব্যস্থলে পৌছিল। অবশিষ্টগুলি পথিমধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল এবং অনেকগুলি নিজদিগকে বাঁচাইবার জন্য একে অন্যকে হত্যাও করিল। দুর্দশাগ্রস্ত ৩০টি পাখি যাহারা গন্তব্যস্থলে পৌছিল, রাজার উজির তাহাদিগকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রবেশ দ্বার খোলা হইল এবং পর্দা সরান হইল। তাহারা প্রবেশ করিয়া শান্তি লাভ করিল। কিন্তু একে অপরের দিকে তাকাইয়া তাহারা বুঝিল যে, তাহারাই 'সি' মোরগ (আল্লাহ) এবং সি মোরগ তাহারা ৩০টি পাখি ছাড়া আর কেহ নহে। বহির্দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাহারা নিজেদিগকে আদি অস্তিত্বে দেখিতে পাইল।

খোরাসানের জালাল-উদ্দীন রুমীকে (১২০৭-১২৭৩ খ্রিঃ) অতীন্দ্রিয়বাদীদের রাজা বলা হয়। তিনি এশিয়া মাইনরের কোনিয়ায় বাস করেন ও পরলোকগমন করেন। অতএব তাঁহার নাম রুমী (রোমান)। তাঁহার কবিতার গ্রন্থ মসনভী, দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত ঘটনাবলীতে পূর্ণ, যাহাতে আল্লাহ্র সঙ্গে মিলনের পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। একটি খাঁটি ও মার্জিত অন্তরে আল্লাহর সৌন্দর্য অধিক পরিষ্কারভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে। তিনি মৌলভীদের (তুর্কি, মেভ্লেভী) রীতি প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীতের তালে নৃত্য করে বলিয়া তাহারা 'নৃত্যরত দরবেশ' নামে পরিচিত।

শিরাজের হাফেজ অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে রুমীর চাইতে আরও অধিক আনন্দিত ও প্রফুল্ল। তিনি মদ, গোলাপ ও প্রেমকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন, যাহা পারলৌকিক অতি উচ্চমানের আনন্দদায়ক মদের ন্যায়, উপভোগ্যও তিক্তও। তিনি 'নাগীয়দের মন্দিরে প্রভুর আলো' দেখিতে পান এবং 'শরাবের পেয়ালায় (তাঁহার) প্রিয়ার চেহারা দর্শন' করেন।সমস্ত সুফীদের ন্যায় তিনি মনের উপর অন্তরের আধিপত্য বিশ্বাস করেন। "প্রেমের মঞ্চ পাণ্ডিত্যের মঞ্চের চাইতে অনেক উপরে। যে সে-প্রেমের চৌকাঠ চুম্বন করিতে পারে সে তাহার জীবন বিপদাপন্ন করিতে প্রস্তুত।"

তবে গাজ্জালীই (১০৫৮-১১১১ খ্রিঃ) একমাত্র মনীষী যিনি সুফীবাদকে পরীক্ষা করেন এবং পরে একজন ধর্মতত্ত্ববিদ-এ পরিণত হন। তিনিই সুফীবাদকে রক্ষণশীলদের সমাজে গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলেন। ফলে সুফিগণ কখনও ইসলামি সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হন নাই। শিয়া এবং সুন্নি উভয়ের মধ্যে সুফী রহিয়াছে এবং এইসব সুফীর আলাদা আলাদা পদমর্যাদাও রহিয়াছে। এইসব পদের একটি হইল বেকতাশী, যাহার মধ্যে সমস্ত ওসমানীয় সুলতানগণ অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি হইল কিজিলবাস বা 'লালমস্তক' যাহার নেতৃত্ব করেন ইরানের সাফাভীয় শাহগণ।[১] তবে অধিকাংশ সুফী পদের সঙ্গে রাজনীতি বা যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নাই।

---

১. *নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৭৪।*

আইন

ধর্ম বা আইন এই দুইটির কোনটি ইসলামে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা দুষ্কর। মুসলমানগণ মোটের উপর ধর্মের চাইতে আইনের শ্রেণীবিন্যাসে অধিক সময় ও চিন্তা ব্যয় করে। আইন ও ধর্ম একই মুদ্রার দুই পিঠ। আইন আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইসলাম হইল উহার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যম। মুসলমানদের বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রিষ্টানগণ আল্লাহর আইনকে দূষিত ও জটিল করিয়াছে এবং আল্লাহ হযরত মুহম্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন সেই দ্বিধা অপসারণের জন্য। মধ্যযুগে ইহুদী ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলাম ইতিহাসের অন্য কোনো যুগের তুলনায় অধিকতর একে অপরের নিকটবর্তী ছিল। বিশ্বের শাসনকর্তা আল্লাহর আনুগত্যের দাবি করে এবং মানুষকে আইন প্রদান করে- এই হিসাবে আল্লাহ সম্পর্কে তিনটি ধর্মের ধারণাই এক। ইহুদী ধর্মে আল্লাহ্ ইহা প্রদান করেন মুসা ও ধর্মযাজকদিগকে, খ্রিষ্টান ধর্মে প্রদান করেন খ্রিস্টের গীর্জাকে , ইসলাম প্রদান করেন হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়, উম্মাকে।

ইসলামি আইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইল পবিত্র কোরআন। কিন্তু বিস্তৃত সম্প্রদায় শীঘ্রই আবিষ্কার করিল, কোরআনের দ্বারা সকল মীমাংসা সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্কগুলি মুসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য করিল–এইসব ব্যাপারে হযরত মুহম্মদ (সঃ) হইলে কি করিতেন? অথবা রসুলুল্লাহ (সঃ) কি করিয়াছেন। প্রারম্ভিক বৎসরগুলিতে অনেকেই ছিলেন, যাহারা তাঁহাকে জানিতেন এবং তাহারা সেই ভিত্তিতে তাঁহার কর্মপন্থা (সুন্নাহ) বর্ণনা (হাদ্দাসা) করেন। এইভাবে কোনো জটিল সিদ্ধান্ত করিতে কোনো ধর্মীয় বা নৈতিক বিতর্কের সমাধান করিতে, কোনো জটিল আইনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিতে, কোনো নূতন আদর্শ উথাপন করিতে হাজারো কাজ সমাধা করিতে হাদিস বা রসুলের (সঃ) কর্মপন্থা ব্যবহৃত হইত। অতি গভীর ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন হইতে শুরু করিয়া তিনি যেভাবে দাঁত পরিষ্কার করিতেন বা তরমুজ খাইতেন সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার কর্মপন্থা দৃষ্টান্ত হইয়া যায়।

মুসলমানগণ সময়ের দিক দিয়ে হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিকট হইতে যতদূর সরিয়া গিয়াছে হাদীসের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় ৬,০০,০০০ হাদিস চালু হয়। হাদীস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয় এবং মুসলিম 'ইতিহাস সংকলন' বিদ্যার পথিকৃত হইয়া উঠে। প্রত্যেক হাদীসের দুইটি অংশ আছে ঃ একটি বক্তা বা বক্তার ক্রমধারা (ইসনাদ) এবং একটি মূল বচন (মতন)। নিম্নে বোখারীর সংকলন হইতে লওয়া হাদীসটি হইল ইহার যথার্থ উদাহরণঃ

আবদুল্লাহ ইবনে আল-আসওয়াদ আমাকে বলিয়াছেন ঃ আল-ফজল ইবনে আল-আতা আমাদিগকে ইসমাইল ইবনে উমাইয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাইফীর বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত আবু মাবাদকে বলিতে শুনিয়াছেন, "আমি ইবনে আব্বাসকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'যখন হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক, মুয়াদকে ইয়েমেনে পাঠান, তিনি তাহাকে বলিলেন... ।[১]

---

১. *ইংরেজিতে Said Mu'adh to Yaman লেখা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Sent Mu'adh to Yaman হইবে। - অনুবাদক*

বিশ্বাসযোগ্যতার দিক হইতে হাদিস তিন প্রকারের আছে ঃ খাঁটি, মোটামুটি খাঁটি ও দুর্বল। পরীক্ষা করিবার ভিত্তি হইল বক্তার ক্রমধারার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর, মূল বচনের প্রকৃতির উপর নহে। নীতি হইল, এই ক্রমধারা নির্ভরযোগ্য হইলে মূল বচন সত্য।

ছয়টি খাঁটি হাদীস-সংকলন রহিয়াছে কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল বোখারার অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে-ইসমাইল-আল বোখারীর (৮১০-৮৭০ খ্রিঃ) সংকলন। ১৬ বৎসরে তিনি যে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে প্রায় সাত হাজার হাদীস খাঁটি বক্তার বলিয়া বাছিয়া লন। এইসব সংকলনের স্থান কোরআনের পরেই এবং ইহাদের প্রামাণিকতা। প্রশ্নাতীত কোরআন ও হাদীস আল্লাহর আইন, শরিয়তের সমষ্টি- যাহা পরে ইসলামি আইনশাস্ত্রের ভিত্তিমূল হইয়া দাঁড়ায়।

তবে ইসলাম খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে বলিয়া বিভিন্ন বেসামরিক, অপরাধমূলক ও রাজস্বসংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়- যাহা দেশ ভেদে বিভিন্ন প্রকারের এবং বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। ঐসব সমস্যা সমাধানের জন্য আরও দুইটি আদর্শ যোগ করা হয়। একটি হইল 'কিয়াস' বা সাদৃশ্য; ইহা ব্যবহৃত হয় যখন কোনো সমস্যাকে কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ দ্বারা সমাধান করা যায় না। অন্যটি হইল 'ইজমা' বা জাতির সমষ্টিগত মত- যাহা উত্তম পন্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য একটি চমৎকার উপাদানে পরিণত হয়।

বিচারকগণ নিজস্ব বিচার বা রায়ের আশ্রয়ও নিতে পারেন, কিন্তু ইহা কখনও নির্ভরযোগ্য অনুমোদন লাভ করে নাই। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইজমা বা কিয়াস প্রযোজ্য হইবে তখনই শুধু যখন পবিত্র কোরআন ও হাদীস হইতে কোনো সাহায্য পাওয়া যাইবে না।

আইনের প্রতিষ্ঠানসমূহ

কোরআন ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং স্থান-কালের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সাতটি আইনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তন্মধ্যে চারিটি সুন্নিদের মধ্যে এবং তিনটি শিয়াদের মধ্যে।

১। হানাফী প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) ঃ ইহার নামকরণ হয় ইমাম আবু হানিফার নামে। তিনি প্রায় ৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি উমাইয়াদের বিরোধী ছিলেন এবং পরে আব্বাসীয়দেরও বিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং ৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি জেলখানায় মারা যান। তিনি কোনো গ্রন্থ নিজে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা প্রচারিত মতাদর্শ বিশ্বের সুন্নি মুসলমানদের অর্ধেকেরও অধিক লোক অনুসরণ করে। তিনি সাদৃশ্য বা কিয়াস ও সমতার আদর্শের উপর জোর দেন- যাহা 'প্রাকৃতিক আইনের' উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তাঁহারটি সবচাইতে সহিষ্ণু। কথিত আছে যে তিনি মনে করিতেন কোরআনকে অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত এবং নামাজ আরবি ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও পরিচালনা করা যায়। ওসমানীয় তুর্কিগণ হানাফী ব্যবস্থা অনুসরণ করে এবং ইহা ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ায়ও প্রচলিত।

২। মালেকী প্রতিষ্ঠান (সুন্নি) ঃ এই প্রতিষ্ঠান মদীনার মালিক ইবনে আনাস (৭১৫-৭৯৫ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৭০০ আইনানুগ হাদীসের দ্বারা সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থ প্রথমবারের মতো জাতির সমষ্টিগত মতের (ইজমা) আদর্শ চালু করে। ইহা হানাফী

প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অধিক রক্ষণশীল এবং মিসর বহির্ভূত উত্তর-আফ্রিকার মুসলমানগণ ইহার অনুসরণ করে।

৩। **শাফেয়ী প্রতিষ্ঠান (সুন্নি)** ঃ রক্ষণশীল মালেকী এবং উদার পন্থী হানাফীদের মধ্যবর্তী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ী একজন কোরাইশ বংশধর। তিনি প্রায়ই বাগদাদ ও কায়রোতে বসবাস করিতেন। তিনি দুই চরমপন্থীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রক্ষা করেন এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবান্বিত করিতে সক্ষম হন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি 'আইনের উৎসসমূহ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—যাহা হাদীসের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাবলীর উপর রচিত। তাহার নীতি ইন্দোনেশিয়া, মিসর, পূর্ব-আফ্রিকা ও লেবাননে অনুসরণ করা হয়।

৪। **হাম্বলী প্রতিষ্ঠান (সুন্নি)** ঃ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রিঃ)। তিনি ইসলামি মৌলিকতাবাদের পুরোধা ছিলেন। তিনি জাতির সমষ্টিগত মত (ইজমা) সাদৃশ্য (কিয়াস) নিজস্ব রায় এবং কোরআন ও হাদীসের অক্ষর বহির্ভূত যে কোনো কিছুই প্রত্যাখ্যান করেন। মামুনের প্রতিষ্ঠিত 'অনুসন্ধান সংস্থা'র দ্বারা তিনি ধৃত হন এবং তাঁহার দুই উত্তরাধিকারীদের আমলেও জেলে থাকেন। ইবনে হাম্বলকে বেত্রাঘাত করা হয়, শিকলাবদ্ধ করা হয় ও বন্দী করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার মত পরিবর্তন করেন নাই। জনপ্রিয় হইবার পক্ষে অতি রক্ষণশীল এই রীতির অনুসারী মাত্র ত্রিশ লক্ষ—তাহারা হইল আরবের ওয়াহাবীদের একটা অংশ।

৫। **জাফরী প্রতিষ্ঠান (শিয়া)** ঃ ইমামী প্রতিষ্ঠান নামেও পরিচিত। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও ধর্মব্যবস্থা। ইহা কিয়াস, ইজমা ও রায় প্রত্যাখ্যান করে। সুন্নিগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদের চারিটি প্রতিষ্ঠান আইন সম্পর্কে যাহা প্রয়োজন তাহা ব্যক্ত করিয়াছে-অতএব নূতন কোনো মত বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। তবে জাফরীগণ বিশ্বাস করে যে লুক্কায়িত ইমামই সত্যিকারের রাষ্ট্র প্রধান। তাহার অবর্তমানে তিনি তাহার মুখপাত্রগণের দ্বারা শাসন করেন - যাহাদিগকে 'মুজ্তাহিদ' বলা হয়। অর্থ্যাৎ তাহারা ইমামের আদর্শ ব্যাখ্যাকারী। সাধারণত একসঙ্গে তিনজন বা চারিজন মুজতাহিদ থাকেন। তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হয় না বরং শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের সবাই তাহাদেরকে জ্ঞানী, ধার্মিক ও ফতওয়া জারি করিবার মতো গুণের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করিয়া লয়। ফতওয়া বিশ্বাসীদের নিকট অবশ্য পালনীয়। সমস্ত শিয়া দ্বাদশ পন্থিগণ এই প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ করে।

ইসলামের শিয়া মতবাদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু, অনেকদিন যাবৎ সুন্নিগণ ইহার অনুসারীদিগকে জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে। তাই ইমামী প্রতিষ্ঠান ইহার অনুসারীদের ধর্মমত লুক্কায়িত রাখিতে অনুমতি দান করে, অবশ্য যদি সে মনে করে যে ধর্মমত প্রকাশ করিলে তাহার জীবনাশংকা রহিয়াছে। ইহাকে 'তাকিয়া' বলে।

বিবাহের ব্যাপারে, ইমামী প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন হইতে ৯৯ বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য সাময়িক আইনানুগ বিবাহের (মোতা) অনুমতি দান করে। এই সব মিলনের সন্তান-সন্ততির মালিক পিতা এবং এই সব সন্তান স্থায়ী বিবাহের সন্তানদের সমান অংশ লাভ করে না।

৬। **ইসমাইলী প্রতিষ্ঠান (শিয়া)** ঃ ষষ্ঠ ইমামের পুত্র ইসমাইলের নামে ইহার নামকরণ হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও জাফরীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইহাতে ইমামের শুধু একজন মুখপাত্র থাকে, যাহার মধ্যে ইমামের 'আত্মা' বাস করে। এবং যাহার মধ্যে ইমামের 'আলো' বিচ্ছুরিত

হয়। ফলে ইহা নেতার ন্যায় উদার এবং রক্ষণশীল। এই পদ বংশানুক্রমিক, ইহার অতি প্রসিদ্ধ নেতা আগাখান (১৮৭৭-১৯৫৭ খ্রিঃ), যিনি তাঁহার বংশক্রম হাসান সাব্বাহ-এর সঙ্গে যোগ করেন। তিনি তাঁহার পৌত্র করিম খানকে নূতন নেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। ইসমাইলিগণ ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব-আফ্রিকায় ইতঃস্তত ছড়াইয়া আছে।

৭। **জায়দী প্রতিষ্ঠান (শিয়া) ঃ** চতুর্থ ইমামের পুত্র জায়দের নামে ইহার নামকরণ করা হয়। ইহা লুক্কায়িত ইমামে বিশ্বাস করে না এবং সুন্নি ইসলামের অতি নিকটবর্তী। ইহারা ইয়েমেনে সংখ্যাগুরু।

নীতিশাস্ত্র

নীতিশাস্ত্র আইনের (শরিয়ত) সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শরিয়ত মুসলমানদের জীবনের প্রত্যেক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব নীতিগুলি শরিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে না তাহা মানুষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে সে তাহার সমাজের রীতি অনুসারে ইহার কর্মপন্থা স্থির করিতে পারে। মুসলমানদের সমস্ত কাজ ৫টি শ্রেণীর যে কোনো একটিতে পড়ে ঃ

১। **বাধ্যতামূলক** (ওয়াজীব) ঃ এইসব কাজ সম্পন্নকারী বেহেশতে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। এবং এইগুলির অবহেলাকারী দোজখের শাস্তিভোগ করে।

২। **প্রশংসনীয়** (মোস্তাহাব) ঃ যেসব কাজ করিতে সুপরিশকরা হইয়াছে। করিলে পুরস্কৃত করা হয় কিন্তু না করিলে কোনো শাস্তি দেওয়া হয় না।

৩। **অনুমোদিত** (মোবাহ্) ঃ যেসব কাজ আইনগতভাবে নিরপেক্ষ, যেগুলি করিলে পুরস্কৃত করা হয়। না করিলে শাস্তিও প্রদান করা হয় না।

৪। **ভর্ৎসনাপূর্ণ** (মাকরূহ্) ঃ এই জাতীয় কাজগুলি অনুমোদন করা হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধও নহে। না করাটা প্রশংসনীয় কিন্তু করিলে শাস্তি প্রদান করা হয় না।

৫। **নিষিদ্ধ** (হারাম) ঃ সেইসব কাজ যাহা করিলে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইসলামে কিছুসংখ্যক নীতিবিদ মনে করেন, একই কাজ উপরোল্লিখিত শ্রেণীগুলির একাধিকেও পড়িতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামী সমাজের মধ্যে মিথ্যা বলা ও লোক হত্যা করা নিষিদ্ধ এবং তবুও অবস্থাভেদে এইগুলি ক্রমবর্ধমান হারে অনুমোদিত শ্রেণীভুক্ত হয় এবং শেষ প্রান্তে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে, এইগুলি বাধ্যতামূলক কর্তব্যে পরিণত হয়।

একাদশ অধ্যায়
দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা

প্রথম যুগের মুসলমানদের মতে দর্শন একটি 'বিদেশী বিজ্ঞান', তাই ইসলামি ধর্মতত্ত্বের প্রতি ইহা একটি হুমকিস্বরূপ, তবে মুসলমানগণ এই হুমকির মোকাবিলা করিতে বাধ্য হয়, কারণ গ্রীক দর্শনের সহিত সুপরিচিত অনেক নব-মুসলিম ইসলামকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সূত্রপাত করে। মুতাযিলাদের ন্যায় এই ধরনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে। মুসলমানদিগকে যে বিষয়টি অধিকতর অনুরাগী করে তাহা হইল শরিয়ত, যাহা একটি রাষ্ট্র ব্যতীত কার্যকরী করা যায় না এবং রাষ্ট্রকেও আবার একটি খলিফা ছাড়া অখণ্ড রাখা যায় না। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই খেলাফতই নূতন সমাজের প্রধান সমস্যা। কারণ খলিফাগণ যতই দুর্বল হইতে থাকেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফাদের উদয় হইতে থাকে, ততই এই সমস্যা আরও জটিল হইতে থাকে। ফলে মুসলিম দার্শনিকগণ রাজনৈতিক দর্শনের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা দর্শনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা লইয়া আলোচনা করিলেও তাঁহাদের প্রধান সমস্যা ছিল সরকার। তাঁহাদের নিকট অন্যান্য কার্যাবলীর চেয়ে প্লেটোর 'রিপাবলিক' ও অ্যারিস্টোটলের 'পলিটিক্স' অধিকতর আগ্রহের বিষয় ছিল। এমন কি ইসলামি ধর্মতত্ত্বও প্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়া রাজনৈতিক।

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরবর্তী শতাব্দীগুলি এবং সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এখানে বলা উচিত যে, মুসলিম রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন চারিটি ধারা হইতে গৃহীত। একটি হইল কোরআন এবং ইহাতে সন্নিহিত 'রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব'। দ্বিতীয় হইল মুসলিম রাজনৈতিক দার্শনিকদের অবদান। তৃতীয়টি হইল যুবরাজদের পথনির্দেশের জন্য লিখিত উপদেশ, যাহাকে "ব্যবহারিক বিধান" বলা যাইতে পারে–যাহা উপরোল্লিখিত দুইটি ধারাকে সন্নিবেশিত করিতেও পারে–আবার নাও করিতে পারে। সর্বশেষ ধারা হইল ইরানী–তুর্কি নীতিমালা–যেগুলি মোটামুটি প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। পরবর্তী যুগসমূহের মুসলিম সরকারগুলি উপরে বর্ণিত ধারাসমূহের দুইটি বা তিনটি বা চারিটির বিভিন্ন ধরনের সংযোগের প্রকাশ। কোরআন এবং ইহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মতত্ত্ব-রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১] নিম্নে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন এবং ব্যবহারিক বিধানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও কয়েকটি কথা সন্নিবেশিত হইল।

নবম শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দি ছিলেন আরবদের মধ্যে প্রথম দার্শনিক। সমগ্র মধ্যযুগে এবং আধুনিক যুগের প্রথম দিকে তিনিই একমাত্র মনীষী ছিলেন বলিয়া তিনি 'আরবদের দার্শনিক' উপাধি অর্জন করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকাবলী হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে বেশি কিছু বলা যায়

---

১. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪৬, ৪৭।

না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তিনি প্লেটো ও অ্যারিসটোটলের মতামতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইসলামের প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিকদের একজন ছিলেন ট্রান্সঅক্সিয়ানার এক তুর্কি আবু নাসর আল ফারাবী (৮৭০-৯৫০ খ্রিঃ) যিনি 'দ্বিতীয় শিক্ষকের' খ্যাতি অর্জন করেন, যেখানে অ্যারিসটোটল হইলেন প্রথম। জ্ঞানী মুসলিমদের মধ্যে গ্রীক দর্শনের হুমকিজনিত দ্বিধাকে তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করেন।[১] 'গ্রীক চিন্তাধারার কয়েকটি দিক ইসলামের সঙ্গে আপোসপূর্ণ, কিন্তু অন্যগুলির সঙ্গে নহে। রাজা হইবার জন্য গ্রীক দর্শন যেখানে একজন দার্শনিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সেইখানে ইসলাম একজন নবী পাইয়াছে। গ্রীকদের নিকট আইন হইল মানুষের সৃষ্টি, অথচ মুসলমানদের নিকট আইন হইল আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট।

'আদর্শ নগরীর অধিবাসীদের মতামত (Opinions of the Citizens of the Virtuous City) নামক গ্রন্থে, ফারাবী, দার্শনিক ও রসুলের সমস্যাকে উভয়ের সংযুক্তির দ্বারা সমাধান করেন। একমাত্র উদ্ভাবনশীল (রসুলের কার্যাবলী) ও জ্ঞানী (দার্শনিকের কার্যাবলী) রসুল-দার্শনিকই রাষ্ট্র গঠন করিতে ও আইন জারি করিতে সক্ষম।

ফারাবীর পদাংক অনুসরণ করেন বোখারার একজন পারস্যবাসী আবু আলী হোসাইন ইবনে সীনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ)। আবিসিনা নামে পশ্চিমী সাধারণ্যে পরিচিত, এই লোকটি নিঃসন্দেহে সর্বকালের মহাজ্ঞানীদের একজন। তিনি ফারাবীর কার্যাবলীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট ঋণের কথা স্বীকার করেন। 'শাফা' নামক তাঁহার বিশ্বকোষরূপী গ্রন্থে তিনি তাঁহার সময় পর্যন্ত গ্রীক দর্শন নামে পরিচিত সমস্ত কিছু প্রচুর টীকা সহকারে সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক দর্শনে তিনি ছিলেন সংযোগকারী। তিনি ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র ও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। নবী হওয়া সর্বোচ্চ মানবিক জ্ঞানের ফলশ্রুতি বলিয়া তিনি ফারাবীর যুক্তিকে সংযত করেন। নবুয়তের কাজ হইল আইন জারি করা যাহা মানুষ পালন করে। তবে ফারাবীর সঙ্গে তিনি একমত হন যে নবীর অবর্তমানেও একটি উত্তম সমাজ গঠন করা সম্ভব।

এইসব মনীষী এবং তাঁহাদের সমসাময়িক যাঁহারা তাঁহাদিগকে অনুসরণ করেন, সবাই তাঁহাদের সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, এই যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতা হইল খেলাফতের পতন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান। বিশেষত শিয়া প্ররোচনামূলক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফাতেমীয়গণ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রাসী। এক শতাব্দীর উমাইয়া ও আব্বাসীয় ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে কায়রো হইতে ট্রান্সঅক্সিয়ানা পর্যন্ত সমগ্র সাম্রাজ্যে বৃহৎ নগরীসমূহ গজাইয়া উঠে। এই সমস্ত শহরে কেন্দ্রস্থলগুলির বণিক, কারিগর ও নব্য ব্যবসায়িগণ ছিল ধনী, বিশ্বজনীন এবং নূতন নূতন ভাবধারায় বিমোহিত। সচরাচর জনসাধারণই দুর্বল খলিফাদের অমিতব্যয়িতার আঘাত সহ্য করিত এবং তাহারা ছিল খুবই অসুখী, এইটাই সাধারণ নিয়ম।

সাধারণত শিয়াগণের, বিশেষত ইসমাইলীদের, একটি সুপরিচালিত মিশনারী প্রতিষ্ঠান ছিল যদ্বারা তাহারা জনসাধারণকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য খলিফার বিরুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিত। অধিকন্তু বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তাহারা শহরের কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং রক্ষণশীল সুন্নিদের বিরুদ্ধে তাহারা ইসলামের সঙ্গে

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০৪।*

হেলেনীয় ও পারস্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ব্যাপারে উৎসাহ দান করে। ফাতেমীয়গণ কার্যত বাগদাদ দখলই করিয়াছিল। সুন্নিদের পক্ষাবলম্বনকারী, সেলজুক নেতা তুঘরীলের ক্ষমতা যদি না থাকিত, তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ হইত।[১] ফারাবী শিয়া হামদানীয়দের অধীনে আলেপ্পোতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবিসিনা বোধ হয় একজন শিয়া ছিলেন এবং এক ইসমাইলী পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার যে কাজ ফারাবী ও আবিসিনা আরম্ভ করেন তাহা "নিখাদ ভ্রাতৃত্ব" (Brother of Sincerety) নামে উন্নতিশীল এক অধঃগোপনীয় সমাজের দ্বারা অব্যাহত রাখা হয়। অধিকাংশ ইসমাইলীদের দ্বারা উৎসাহিত এইসব দার্শনিক 'শিক্ষা ক্লাবসমূহ' শহরের কেন্দ্রগুলিতে স্থাপন করা হয় এবং এতদ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে আধা-রাজনৈতিক কার্যাবলী চালু রাখা হয়।

ধর্মনিরপেক্ষকরণের ধারার মধ্যে আবিসিনা একটি সমাজতান্ত্রিক আকৃতি উদ্বোধন করেন। তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে তিনি পুরাতন পারস্য নীতির সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকে তিনি পেশা অনুসারে ভাগ করেন, যথা শাসক, প্রশাসক, কারিগর, কৃষক ইত্যাদি। ইহা আরবগণ কর্তৃক অনুসৃত বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে সমাজের বিভক্তিকরণের বিরোধী। এই স্থলে জোর দিয়া বলিতে হইবে যে, ফারাবী ও আবিসিনা উভয়েই বিশ্বাসী মুসলমান, যাঁহারা গ্রীক চিন্তাধারা এবং সুফীবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ধর্মের একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি এবং একটি রাজনৈতিক দর্শন খুঁজিয়া লইতে হইয়াছিল যাহা 'আইনানুগ' শাসক বলিয়া ঘোষিত হইতে উৎসুক এবং খলিফার চেয়ে শক্তিশালী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আবিসিনা কর্তৃক পুনঃপ্রবর্তিত সামাজিক প্রথা ক্ষমতাশালী লোকদিগকে আইনানুগত্যের সুযোগ প্রদান করে যাহারা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় না হইয়াও শাসনকার্যকে তাঁহাদের পেশা বিবেচনা করিতে পারেন।

আবিসিনার মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে যুবরাজদিগকে শাসন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এইসব গ্রন্থকে সাধারণত ব্যবহারিক বিধান বা 'যুবরাজদের দর্পণ' নামে উল্লেখ করা হয়। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হইল ১০৮২ খ্রিষ্টাব্দে জিয়ারিদ ক্ষুদ্ররাজ্যের জন্য লিখিত গ্রন্থ 'কাবুসনামা' এবং অন্যূন ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকদের জন্য লিখিত গ্রন্থ 'সিয়াসতনামা'। এই সমস্ত গ্রন্থে সাসানীয় রাজাদের নিকট হইতে গৃহীত ঘটনাবলী, বাণী ও উদাহরণের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়। এইগ্রন্থগুলিকে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন গঠনের ব্যাপারে আরেকটি প্রভাব বলিয়া বিবেচনা করা হয়, যাহা গ্রীকও নহে ইসলামিও নহে। উদাহরণস্বরূপ 'কাবুসনামায়' আমরা দেখিতে পাই যে, রাজার দায়িত্ব হইল কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা। কারণ, "উত্তম সরকার রক্ষা করা হয় সেনাবাহিনী দ্বারা, সেনাবাহিনী পালন কর হয় স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা, স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করা হয় ভূস্বামীদের (দেহকান) করা দ্বারা; এবং ভূমি খামারগুলি রক্ষা পায় কৃষকদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সদাচরণের মাধ্যমে।"

স্বভাবতঃই ফারাবী ও আবিসিনার উপসংহার রক্ষণশীলদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। উভয়ে মনে করেন নবুয়ত ঐশীবাণীর মাধ্যমে আল্লাহর একটি বিশেষ দান নয় বরং একটি

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯৯।*

স্বাভাবিক অবস্থা যাহা চিন্তাশক্তি অথবা 'কার্যকরী বুদ্ধিমত্তা'র মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। তাঁহাদের মতানুসারে কোনো রসুল বা ইসলামি ঐশীবাণী ছাড়াই "আদর্শ নগরী" প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেলজুকদের ক্ষমতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রক্ষণশীলগণ এইসব ধর্মবিরোধী মতামতের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান এবং শাফেয়িগণ ইসমাইলীদের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও খুলিয়া বসে। রক্ষণশীল ধর্মতত্ত্ববিদদের অতি ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষক নিজামুল মুলক প্রশাসনের সমস্ত বিভাগে রক্ষণশীল বেসামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেন। প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রত্যেক ধারায় এবং সমাজে মুসলিম শরিয়ত কার্যকরী করিবার জন্য এই রক্ষণশীল আমলাগণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। সুন্নি রক্ষণশীলদের সমর্থনে তাঁহার কার্যকলাপের জন্যই নিজামুল মুল্‌ক শিয়া ইসমাইলীয় দলের অন্তর্ভুক্ত এ্যাসাসিনদের নিযুক্ত ঘাতকের দ্বারাই নিহত হন।

তবে রক্ষণশীলগণ দার্শনিকদের প্রভাবও দূর করিতে পারে নাই, অবস্থার বাস্তবতাও দূর করিতে পারে নাই। এমন কি নিজামুল মুল্‌ক তাঁহার গ্রন্থে অমুসলিম পারস্য ঐতিহ্য ও নীতিশাস্ত্র সন্নিবেশিত করেন। গাজ্জালী যিনি সেলজুকদের আমলে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন, উম্মার ঐক্য অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য বলেন, খেলাফতের পদের জন্য ধার্মিকতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। ফলে, খলিফার পক্ষে শাসনকারী সুলতানের হাতে আইনগতভাবেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা যায়। গাজ্জালীর মতানুসারে, খলিফার নাম শুক্রবারের খোতবায় উল্লেখ এবং মুদ্রায় খোদাই, উম্মার ঐক্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ইবনে তায়মিয়্যা (১২৬৩-১৩২৮ খ্রিঃ) মৌলিক ভাববাদী হাম্বালী প্রতিষ্ঠানের লোক ছিলেন। তিনি মামলুকদের সময় ধর্মচর্চা করেন, যখন কোনো খলিফাই ছিলেন না। তিনি আরও মারাত্মক আপোস-মীমাংসা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের শক্তি রাখেন, তিনিই আইনানুগ শাসক, তবে তিনি যদি শরিয়ত পালন করেন। তাঁহার নিকট "সুলতান, সেনাবাহিনী ও অর্থ ছাড়া ধর্ম যেমন নিষ্ফল; ধর্ম ছাড়া সুলতান, সেনাবাহিনী ও অর্থও তেমনি নিষ্ফল।" ইহা হইতে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ হইল এই দাবি যে, একজন সুলতান (খলিফা নহে) আল্লাহ্‌র ক্ষমতা বলেই শাসন করেন। ওসমানীয়গণ সেই সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপই গ্রহণ করে।

বিজ্ঞান ও মানবিকতা

মধ্যযুগের ঐতিহ্য অনুযায়ী মুসলিম বিদ্বানদের জ্ঞানের এক বিস্তৃত পরিসর ছিল। একজন দার্শনিকের পক্ষে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হওয়া, গণিত শাস্ত্রে সমীকরণগুলির সমাধানে সক্ষম হওয়া এবং সঙ্গীত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর (শুধু কয়েকটি নাম করিলে) জ্ঞানগর্ভ সমীক্ষা রচনা করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। তাঁহাদের কয়েকজন, যথা ওমর খাইয়াম অবসর বিনোদনের জন্য কবিতা লেখেন। মুসলমানগণের মতে বিজ্ঞান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত – 'ধর্মীয় বিজ্ঞান' ও 'শারীরিক বিজ্ঞান'। মানবিকতাকে সাধারণত এবাদিয়্যাত বলা হয়। পদ্য ও গদ্য অন্তর্ভুক্ত এইগুলির অধিকাংশই ছিল নৈতিক গল্প। এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝিতে ছিল ভূগোল ও ইতিহাস।

চিকিৎসাবিদ্যা

প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় পারস্য খ্রিষ্টানদের দ্বারা। আরব অধিকারের সময় ইরানের গুন্ডিশাপুরে অবস্থিত সাসানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতালটি চালু ছিল। বাদগাদে হারুন কর্তৃক নির্মিত হাসপাতালটি পারস্য ধাঁচে তৈয়ারি এবং ইহা পারস্য

নাম 'বিমারীস্তান' হিসাবে পরিচিত। চিকিৎসাবিদ এবং ঔষধবিজ্ঞানী উভয়কেই বিশেষ পরীক্ষায় পাস করিতে হইত। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চিকিৎসাবিদগণ পথ গ্রহণের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকিতেন। গুণ্ডিশাপুর হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন জিব্রীল ইবনে বখতিশু নামে একজন খ্রিষ্টান। তিনি এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্যরা আব্বাসীয়দের রাজ-চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। গ্রীক ও পারস্য চিকিৎসা বিয়ষক গ্রন্থের আরবি অনুবাদকারী এবং অন্যান্য বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের মধ্যে হুনায়েন ইবনে ইসহাক, (৮০৯-৮৭৩ খ্রিঃ) ইউহান্না ইবনে মাসাওয়েহ (৭৭৭-৮৫৭) নামক চক্ষু চিকিৎসাবিদগণ ও তাবারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি মৌলিক কাজ করেন পারস্যবাদী-রাযী ও আবিসিনা। মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযী (৮৬৫-৯৮৫ খ্রিঃ) আধুনিক ইরানের রাজধানী তেহ্রানের নিকটবর্তী রায় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁহার নাম হয় 'রাযী'। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সামানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় অতিবাহিত করেন এবং কিছুকালের জন্য বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ 'আল-হাভী' (চিকিৎসাবিদ্যার ব্যাপক গ্রন্থ) লাতিন ভাষায় এবং পরে ফরাসি, জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়। শল্যচিকিৎসায় তিনি সুতার পলিতা (Seton) আবিষ্কার করেন এবং মূত্রগ্রন্থির পাথর, গুটিবসন্ত ও হাম রোগের উপর গবেষণা করেন। দর্শনের গ্রন্থসমূহে যুক্তিবাদের সপক্ষে ওকালতী করেন বলিয়া তাহাকে রক্ষণশীলদের কোপানলে পতিত হইতে হয় এবং স্বীয় দর্শন ও ব্যক্তিগত আচরণের জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ত দিতে হয়।

আবিসিনা, যিনি দার্শনিক ও একজন বিখ্যাত চিসিৎসাবিদ, তিনিও গণিতশাস্ত্র, শিল্পকলা ও সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। অতি অল্পসংখ্যক উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে যাহারা আংশিক আত্মজীবন চরিত রাখিয়া গিয়াছেন তিনি তাহাদের মধ্যে একজন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কোরআন আয়ত্ত করেন এবং সাহিত্যেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি একজন পুরাদস্তুর চিকিৎসাবিদ হইয়া উঠেন এবং সামানীয় বাদশাহের চিকিৎসার জন্য তাহাকে তলব করা হয়। সেখানে তাহাকে বাদশাহের বিশাল গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় এবং 'পরবর্তী আঠার মাস' তিনি অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। ১৮বৎসর বয়সে তিনি "এইসব বিজ্ঞান আয়ত্ত করেন," অর্থাৎ দর্শন, তর্ক শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। এই মনীষী দাবি করেন যে, চিকিৎসাবিদ্যা কোনো "জটিল বিজ্ঞান নহে" এবং চিকিৎসাবিদ্যার উপর তাহার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ 'কানুন' রচনা করেন। ইহা চিকিৎসাবিদ্যার উপর অন্যান্য কার্যাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি ছোঁয়াচের উপর এবং পানি ও মাটির দ্বারা রোগ বিস্তারের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। মেটিরিয়া মেডিকার উপর তিনি এক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন যাহাতে শতশত ঔষধের শ্রেণীবিন্যাস করেন ও সেইগুলি সর্ম্পকে অভিমত প্রকাশ করেন।

তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খলার ভিতর অতিবাহিত হয়, কারণ তাহাকে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে হয়। যুদ্ধযাত্রা ব্যতীত তিনি কখনও ইরান ত্যাগ করেন নাই। রক্ষণশীল মনোভাবের অভাবের ফলেও তিনি অভিযুক্ত হন। রাযীর তুলনায় তিনি নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে যথেষ্ট সময় লইয়াছিলেন। ফলে আবিসিনা নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন ঃ

"তোমরা চিৎকার কর যে আমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছি
এবং আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ কর ; তবুও আমি বলি
আমার ন্যায় একজন লোকের অবিশ্বাস
আকাশের স্তম্ভগুলিকে কাঁপাইয়া দিত।
রসুলুল্লাহর নামে আদায়কৃত সমস্ত মানুষের নামাজ
আমার নামাজ-- তবুও আমার গুলি অনবদ্য ঃ
আমার কোনা সুচিন্তিত মত নাই, কোনো কাজই
আমি নিয়ন্ত্রিত করি না।
কিন্তু আমার আত্মা পার্থক্য বলিয়া দেয়,
তাহা হইলে এই সেই ব্যক্তি যাহাকে তোমরা
কাফের বল?
বলিয়া যাও, দোষী সাব্যস্তকারিগণ, কিন্তু ভালভাবে
বিবেচনা কর ঃ
আমি যদি তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া থাকি, যিনি
আমার জন্মকে গুণান্বিত করিয়াছেন,
তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে কোনো খাঁটি মুসলমানই
থাকিবে না।[১]

তিনি ১০৩৭ খ্রিষ্টাব্দে হামাদানে পরলোকগমন করেন এবং সেখানে তাহাকে সমাহিত করা হয়।

গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র

গণিত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ গ্রীক ও ভারতীয় সূত্র হইতে তথ্য আহরণ করে। গণিত শাস্ত্রে মুসলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হইল আরবি সংখ্যা– যাহা তাহারা ভারতীয়দের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করে। অবশ্য এইগুলি আয়ত্ত করিতে তাহাদের বেশ সময় লাগিয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বড় বড় মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন মুহাম্মদ আল-খারাজামী, যাহার গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে আরবি সংখ্যা ও বীজগণিতের প্রবর্তন হয়। অংকের 'এলেগরিজম' নামকরণ হয় তাহারই নামানুসারে। জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে আরেকজন পন্ডিত আবু রায়হান আল-বেরুনী (৯৭৩-১০৪৮খ্রিঃ)। তিনি গজনভী রাজ্যের নৃপতিদের জন্য কাজ করিতেন। পৃথিবীর নিজস্ব অক্ষপথে আবর্তনের ভিত্তিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করেন। দিনপঞ্জি সংস্কারে ওমর খাইয়ামের বিরাট অবদান ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[২] বাগদাদের ধ্বংসকারী হালাকু খান আজারবাইজানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এইখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ খোরাসানের নাসির আল-দীন তুসি জটিল

---

১. *ফার্সি হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত এবং জন লেওইন কর্তৃক কবিতা আকারে রূপান্তরিত।*

২. *উপরে দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৯৯।*

জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করেন, যথা আর্মিলারি চক্র (armillery sphere) সরল্লোনিত উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (mural quadrant) অয়নন্তকালীন আর্মিল (solastitide armil)। তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তালিকাসমূহ (Tables) অনেক শতাব্দী পর্যন্ত আদর্শ হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু মানমন্দিরসমূহ ছিল। অধিকাংশ মুসলিম জ্যোতিষী সেই যুগে ধারণা করেন যে, পৃথিবী গোল এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাহারা পৃথিবীর আকার ও ব্যাস পরিমাপ করেন যাহা নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

মুসলিম পন্ডিতবর্গ রসায়ন বিদ্যা (আলকিমিয়া), পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এবং উদ্ভিদবিদ্যায়ও উৎসাহী ছিলেন। পরীক্ষার জন্য তাহাদের ল্যাবরেটরি ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রসায়নবিদদের একজন ছিলেন জাবির ইবনে-হাইয়ান (মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়দের নিকট তিনি 'গবির' নামে পরিচিত)। তিনি পদার্থকে উত্তাপ দ্বারা চূর্ণ ও লঘুকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং বাষ্প পরিষ্কৃতকরণ, তরলকরণ ও বাঁধনের নিয়ম জানিতেন। মধ্যযুগীয় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইউরোপীয়দের ঋণের পরিমাণ পাওয়া যায় রসায়নবিদ্যা, সুরাসার,রসাঞ্জন (antimony) ও অন্যান্যগুলির আরবি মূল শব্দের মধ্যে।

ভূগোল

বিজয় ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই মুসলমানরা পৃথিবী সম্পর্কে অবহিত হয়। আব্বাসীয় যুগে অনেক ভূপর্যটক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও ভূগোলবিদের উদ্ভব হয়, যাহারা তাহাদের পর্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহারা টলেমীর প্রভাবেই ছিলেন, কিন্তু ভ্রমণের পর তাঁহারা ভিন্নরূপ লক্ষ্য করেন। ফলে ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন ও রাশিয়া সম্পর্কে তাঁহারা একগাদা বৃত্তান্তমূলক উপাদান তৈয়ার করিতে সক্ষম হন। খারাজামী পৃথিবীর একটি মানচিত্র অংকন করেন, যাহা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল।

ইবনে খোরদাদবেহ অন্যূন ৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ইরানের পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাঁহার নাম প্রমাণ করে যে, তাহার পিতা একজন জরথুস্ত্র ছিলেন। "সড়ক ও দেশসমূহ" নামক গ্রন্থে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই যুগের চারিটি প্রধান বাণিজ্যিক পথ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। একটি স্পেন হইতে দক্ষিণ ইউরোপ ও এশিয়া মাইনর হইয়া কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। আরেকটি সিরিয়া ও ইরানের মধ্য দিয়া উত্তর আফ্রিকাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছিল। তৃতীয়টি পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁসিয়া পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। চতুর্থটি একটি সমুদ্রপথ, লোহিতসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া সিংহল ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত খোরাসানের ইয়াকুবী ৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে "দেশসমূহের গ্রন্থ" নামক একটি পুস্তক রচনা করেন, যাহা ভূ-সংস্থান ও বিশেষত অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে।

সেই যুগের দুইজন ভূগোলবিদ ছিলেন পার্সাপালিশের ইসতাখরী (আনুমানিক ৯৫০ খ্রিঃ) এবং জেরুজালেমের মুকাদ্দাসী (আনুমানিক ৯৮০ খ্রিঃ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম রঙীন মানচিত্র তৈয়ার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে বিশ বৎসরেরও অধিককাল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মৌলিক ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে বসবাসকারী একজন সমধিক প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ছিলেন ইদ্রিসী (মৃঃ ১১৬৬ খ্রিঃ) যিনি তাঁহার পূর্বের মুলসমান ভূগোলবিদদের অবদানের সার রচনা করেন। পৃথিবী একটি গোলক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস এবং তাঁহার মানচিত্রসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভুল। তাঁহার মতানুসারে চীন ও রাশিয়ার উত্তরের দেশসমূহ গগ্‌ ও ম্যাগগ্‌দের দেশ।

তাঁহার মানচিত্র আধুনিক মানচিত্রের উল্টা, অর্থাৎ উত্তর নিচের দিকে ও দক্ষিণ উপরের দিকে। এই ভূগোলের বৃত্তান্তে গ্রীক ক্রীতদাস ইয়াকুতের (রুবী) ১১৭৯-১২২৯ খ্রিঃ) নাম উল্লেখ না করিয়া উপসংহারে আসা উচিত নহে। তিনি স্বাধীন হইবার পর পাণ্ডুলিপিসমূহ লিখিয়া ও বিক্রয় করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের অর্থ যোগাড় করিতেন এবং যেখানে খুশি বিচরণ করিতেন। তাঁহার প্রচুর নোটসমূহের দ্বারা "নগরসমূহের অভিযান" নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয় যাহাতে নামগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো।

ইতিহাস

ইসলাম একটি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্ম এবং প্রত্যাদেশের সহিত জড়িত রহিয়াছে সময়, স্থান, ব্যক্তি ও ঘটনা– যাহার সব কিছুই ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টি করে। অন্যান্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগুলির ন্যায় ইসলামেও ইতিহাস 'উম্মার' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত একটি ঐশী পরিকল্পনা। তদুপরি ইহুদী-খ্রিষ্টান ঐতিহ্য অনুযায়ী শেষ নবী হইবার ব্যাপারে হযরত মুহম্মদের (সঃ) যে দাবি উহাতে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের নবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বোধ হয় একদিকে দেশ জয় লইয়া ব্যস্ততা, অপর দিকে যোগ্য ব্যক্তির অভাবের দরুন আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজ বন্ধ ছিল। তবে উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনার জন্য বেশ উপাদান তৈয়ার করা হয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রুজবেহ্ (ইবনে মুকাফফা)[১] কর্তৃক পারস্য নৃপতিদের উপর লিখিত গ্রন্থের আরবি অনুবাদ ইতিহাস এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্মের আদর্শ হইয়া উঠে। তবে এই ছাঁচ হইতে দুই প্রকারের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। একটি হইল বিষয়বস্তুতে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মোটের উপর শুধু বাইবেলের বর্ণনায় এবং ইসলামের ধর্মীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর আগ্রহী হন। তাঁহারা চীন, রোম বা যেসব জাতির কথা বাইবেলের ইতিহাসে উল্লেখ নাই ঐসব দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি তাহাদের 'বিশ্বের' ইতিহাসগুলিতে, যেগুলি সাধারণত পৃথিবীর সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ হয় এবং গ্রন্থকারের সময় পর্যন্ত আসিয়া শেষ হয়, সেইগুলিতেও তাঁহারা অবাইবেলীয় এবং অনৈসলামিক কার্যাবলী বাদ দেন। এই ক্ষেত্রেও তাহারা একই ঢালাও ছাঁচ হইতে বাহিরে যান নাই। পারস্য আদর্শ হইতে দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এই যে, হাদীস বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিবার ফলে তাঁহারা বক্তার ক্রমধারা হইতে সরাসরি উদ্ধৃত বচন লইয়া ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস রচনা করেন।

আরব, পারস্যবাসী সুন্নি ও শিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ইতিহাস রচনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা উল্লেখ করা যায় না। ইহাদের এক বিরাট অংশ তাঁহাদের লিখিত পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন–যাহা সাধারণত আদম হইতে আরম্ভ করিয়া লেখকের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ইতিহাস রচনা প্রাধান্য লাভ করে–যাহা পূর্ববর্তী রীতি ও অভ্যাস হইতে পৃথক। ইহা পরবর্তী যুগের জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক উপাদানের এক সম্পদ রাখিয়া যায় তবে বর্ণনানুক্রমিক রচনার ধারা শেষ হইয়া যায় নাই। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও বহু 'ইতিহাসের' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যাহা আদম হইতে আরম্ভকৃত।

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০৩।*

আরব বিজয়ের উপর আলোচনাকারী দুইজন ঐতিহাসিকের একজন হইলেন মিসরীয়, ইবনে আবদ-আল-হাকিম (মৃত্যু ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দ), যিনি মিসর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন। অন্যজন হইলেন পারস্যবাসী ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-বালাজুরী (মৃত্যু-৮৯২ খ্রিষ্টাব্দ) যিনি আরব বিজয়ের একটি ব্যাপক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। দুইজন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস লেখকের মধ্যে একজন হইলেন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের তাবারিস্তান প্রদেশের মুহাম্মদ আল-তাবারী (৮৩৮-৯২৩ খ্রিঃ)। কোরআনের উপর একটি আদর্শ আলোচনা ছাড়াও তিনি 'নবী ও রাজন্যবর্গের ইতিহাস' রচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি তাঁহার সংগৃহীত উপাদানগুলি সতর্কতার সঙ্গে বক্তাদের লাইনসহ পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সজ্জিত করিয়া পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য আদর্শে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ হিসাবে সমান খ্যাতি অর্জনকারী আরেকজন হইলেন বাগদাদের ভূপর্যটক আবুল হাসান আলী আল-মাসূদী (মৃত্যু ৯৫৬ খ্রিঃ)। গুটিকয়েকের মধ্যে তিনিও একজন যিনি বর্ণনানুক্রমিক ধারা হইতে পৃথকভাবে ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সোনালী চারণ ক্ষেত্র ও স্বর্ণের খনি" সভ্যতার একটি সমকালীন ইতিহাস। তিনি ভারতীয়, পারস্যবাসী, রোমান ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের সম্পর্কে লিখিয়া প্রচলিত রীতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীপূর্ণ – যেগুলি নিঃসন্দেহে তিনি পর্যটনের সময় সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাহিত্য

সাহিত্যের ক্ষেত্রে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) কবি ও কবিতা অপছন্দ করিতেন, কিন্তু কাহিনী বলায় তাঁহার কোনো আপত্তি ছিল না। অথচ দেখা গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহার অনুসারিগণ খুব বেশি উপাখ্যান সৃষ্টি করে নাই কিন্তু পৃথিবীর অন্য যেকোনো সাহিত্যের লেখকের চেয়ে হয়ত অনেক বেশি কবিতা রচনা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাসানীয় যুগের পারস্য সাহিত্যের অলংকার ও ভাব প্রকাশের মার্জিত কৌশল আরবি ভাষাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। শোয়'বিয়াদের মৌলিক ও অনুবাদ উভয় প্রকারের রচনাবলী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১] এইগুলি পরে 'মাকামা' (গুচ্ছ) নামক এক প্রকারের রচনাশৈলীর রূপ ধারণ করে যাহা মার্জিত ও সূক্ষ্ম উপায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনা করে। বসরায় হারিরীর 'মাকামাত' (১০৫৪- ১১২২ খ্রিঃ) এই প্রকৃতির অতি প্রসিদ্ধ গল্পগুচ্ছ।

'গানের গ্রন্থ' (কিতাবুল আঘানী) ছাড়া গদ্যে তেমন গুরুগম্ভীর সাহিত্য রচনা আর নাই। তবে হাল্কা ধরনের রচনার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হইল, 'একসহস্র ও এক রজনী'। ফার্সি মূল গ্রন্থ 'হাজার আফসানাহ' (এক সহস্র গল্প) হইতে জনৈক জাহাসিয়ার (মৃত্যু-৯৪২ খ্রিঃ) ইহা প্রস্তুত করেন। মূল পটভূমি এবং শহরযাদসহ একই নায়ক ও একই নায়িকা ব্যবহার করিয়া অনুবাদক তাঁহার নিজস্ব কয়েকটি গল্প ইহাতে যোগ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন লেখক এই গ্রন্থ নকল করিবার সময় বিশ্বের সমগ্র অংশ হইতে আরও গল্পসমূহ যোগ করেন, কিন্তু পটভূমিকা অক্ষুণ্ন রাখেন। মিসরের মামলুক যুগের শেষ ভাগে ইহা বর্তমান

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৮৯।*

আকার ধারণ করে এবং ইংরেজিতে 'আরব্য রজনী' নামে পরিচিত হয়। সম্ভবত ইহা পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনুদিত সাহিত্য কর্ম।

প্রাক -ইসলামি আরবি কবিতার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে আলোচিত হইয়াছে।[১] তাহাতে দেখা যায় উমাইয়াগণ আরবি কবিতার প্রাক-ইসলামি বিষয়বস্তুকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। আরবি ও পারস্য কবিগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গীত মরু প্রেমের গল্পসমূহের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ একটি হইল লায়লা ও মজনুর প্রেমের গল্প।

আব্বাসীয় যুগে পারস্য প্রভাব প্রবেশ করে। যদিও আরবি কবিতার প্রধান ধারার খুব বেশি পরিবর্তন হয় নাই। তবুও এই যুগে পারস্য রচনাশৈলী প্রাধান্য বিস্তার করে। পাঠক ইতিমধ্যেই শোয়া'বিয়া কবি বাশশার ইবনে-বুরদ, ধর্মনিরপেক্ষ কবি আবু নোয়াস এবং গুরুগম্ভীর আরবি কবি আবু আল-আতাহিয়্যার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন।[২]

ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে পারস্য ভাষার পুনরুত্থান হয়। ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে দেশপ্রেমিক সাফ্‌ফারীয় ও সাসানীয়গণ সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ফার্সি ভাষা ব্যবহার করে। এমনকি তুর্কি রাজ্যগুলিকেও ফার্সি ভাষা প্রভাবান্বিত করে ও এই ভাষাকে তাহাদের চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহার করা হয় বলিয়া তুর্কিগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠে। এই ভাষা নূতন ফার্সি নামে পরিচিত হইয়া উঠে যাহা পাহলভী বা মধ্য ফার্সি হইতে পৃথক।

সুফীবাদের আলোচনায় রুমী, আত্তার, হাফিজ ও অন্যান্য কবি হইলেন আবুল কাশেম ফেরদৌসী যিনি পৌরাণিক যুগ হইতে আরব বিজয় পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 'শাহনামা' বা 'নৃপতিদের গ্রন্থ' ফার্সি সাহিত্যে অতি চমৎকার কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। আরেকজন কবি নিজামী লায়লা-মজনুর প্রেমের কাহিনী রচনা করেন। আর যে তিনটি প্রেমের কাহিনী কবিগণ পুনঃ পুনঃ গাহিয়াছেন তাহা হইল জোশেফ (ইউসুফ) ও জোলেখা, ভিশ ও রামীন এবং ফরহাদ (এক প্রস্তর কর্তনকারী) ও শিরী (এক সম্রাজ্ঞী)। ফার্সি সাহিত্যের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় কবিদের নগরী শিরাজের আরেক জ্যোতিষ্কের নাম উল্লেখ করিতে হয়, তিনি হইলেন সাদী। তাঁহার গুলিস্তান নামে গদ্যে ও পদ্যে লিখিত ছোট গল্পের সংকলন প্রত্যেক পারস্য বিদ্যালয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক।

এখানে উল্লেখ্য যে, কবিগণ খলিফা ও যুবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, কারণ তাঁহারা বিজ্ঞান বা সাহিত্যের চেয়ে তোষামোদে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ফলে ফার্সি ও আরবি কবিতায় অনেক বাগাড়ম্বর এবং তোষামোদ সম্বলিত শব্দের সুকৌশল বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগণ তাঁহাদের জীবিকার জন্য এইসব করিতে বাধ্য হন এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ধনী হইয়া উঠেন। প্রত্যেক কবি এক একজন পৃষ্ঠপোষক খোঁজেন বলিয়া প্রত্যেক যুবরাজের নিজস্ব এক একটি কবি-বন্ধুর দল ছিল। ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে কিছুসংখ্যক যুবরাজ কয়েকজন যোগ্য কবি আকর্ষণ করার ব্যাপারে একে অপরের প্রতি অহংকারের দৃষ্টিতে দেখেন। কবিতা রচনা করা একটি জীবিকার উপায় হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেক উপলক্ষ-জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, যুদ্ধ, বিজয়, একটি প্রাসাদ নির্মাণ বা একটি সাফল্যজনক শিকার—কবিতার এক লোভনীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। উপযুক্ত পংক্তির জন্য কবি নিযুক্ত করা অভিজাতদের রীতিতে পরিণত হয়। কখনও কখনও কবিগণ একই কবিতা একাধিক

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩০।*
২. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৮৯।*

পৃষ্ঠপোষকের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে আলাদা আলাদা পারিতোষিক আদায় করেন। যদি সঠিক পারিশ্রমিক বা উপযুক্ত উপহার না আসে তবে কবি সেই পৃষ্ঠপোষককে ব্যঙ্গ করিয়া বেকুফ বানান এবং সর্বদা চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উপায়ে তাঁহার দোষ বর্ণনা করেন। কবিদের শব্দের ক্ষমতা কখনও কখনও যুবরাজদের হাতের তরবারির চেয়ে সুতীক্ষ্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই কবিগণের কেউ কেউ এতগুলি মধুর তোষামোদে এবং কখনও কখনও তীক্ষ্ণ বিদ্রুপাত্মক কবিতা রচনা করা সত্ত্বেও তাঁহাদের নিজস্ব সময়ে কিছুসংখ্যক চিরস্থায়ী কবিতাও রচনা করিয়াছেন যেইগুলি পাঠকের আত্মাকে অভিজ্ঞতার উচ্চমার্গে পৌছাইয়া দেয়।

স্থাপত্য শিল্প ও শিল্পকলা

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো শিল্পী 'মুসলিম শিল্পকলা,' কথাটি বিভ্রান্তিকর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কারণ ধর্মীয় দিক হইতে ইসলাম কতক শিল্পকলা নিষিদ্ধ করে এবং অন্য কতকগুলির প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত করে। ইহা যেরূপ সত্য তেমনি ইহাও সত্য যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) কবিতা চর্চা অপছন্দ করিয়াছিলেন এবং মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসলামের অনুসারিগণ যেমন এইগুলি হইতে বিরত থাকে নাই তেমনি শিল্পকলা হইতেও হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই। গোত্রীয় সঙ্গীতের সম্পদ, যেগুলিকে পরে গান রচয়িতা ও গায়কগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সংযোজন করেন–এইগুলি ছাড়া আরবগণ শিল্পকলায় অধিক কিছু আনয়ন করে নাই। কিন্তু বাইজেন্টিয়ামের খ্রিষ্টান এবং ইরানের জরথুস্ত্রগণের ধর্মীয় শিল্পকলার সংস্পর্শে আসিয়া আরবগণ বেশিদিন নিষ্প্রাণ থাকিতে পারে নাই। ফলে, ইসলামের ধর্মীয় গণ্ডির বাহিরে শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়, যদিও ইহা কখনও ইসলামের ধর্মীয় সমর্থন লাভ করে নাই।

উপরোল্লিখিত শিল্পকলাসমূহের মধ্যে স্থাপত্যশিল্প একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রম, কারণ ইসলামে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এই প্রয়োজনীয়তা অদ্ভুত ধরনের; অতএব নব্য মুসলমানদের শিল্পজ্ঞানকে মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত করা হয়। ইসলামি স্থাপত্য শিল্পে প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প ও সাধারণ। অজু করিবার জন্য মসজিদের বাহিরে একটি ফোয়ারা বা কূপ নির্মাণ করা হয়। ফলে রাস্তা হইতে একটি মসজিদের স্বাভাবিক প্রবেশদ্বার দালানের ভিতরে নহে বরং কূয়া ও ফোয়ারাযুক্ত একটি প্রশস্ত আঙ্গিনায়। তাহাছাড়া মুসলমানগণের প্রয়োজন হয় একটি উঁচু জায়গার, যেখান হইতে মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য আহ্বান করিতে পারে (আজান দিতে পারে)। ইহার জন্য তাহারা মসজিদের সংলগ্ন লম্বা, গোলাকৃতি বা চতুষ্কোণ থাম নির্মাণ করে। হিব্রু 'মিনোরা' শব্দ হইতে ইহাকে 'মিনার' বলা হয়।

মসজিদের ভিতরের অংশের জন্য ইসলামের দুইটি চাহিদা রহিয়াছে। একটি হইল ঃ মক্কার দিকে লক্ষ্য যাহাকে কিবলাহ বলা হয়। মসজিদ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হয় যাহাতে নামাজী মক্কার (কাবা) দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে পারে। ইহা যেহেতু সঠিক হইতে হইবে তাই 'মিহ্‌রাব' নামে একটি নামাজের কুলুঙ্গী নির্মাণ করা চিরাচরিত নিয়ম হইয়া যায়। মিহ্‌রাব শব্দটি ফার্সি 'মিহরাভেহ্‌' হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ কুলুঙ্গী বা মিথ্‌রার (মিত্রের) গুম্বুজ। মসজিদের মিহ্‌রাব আকারে ও নামে ইহার হুবহু অনুকরণ। আরেকটি চাহিদা হইল একটি উচ্চ বেদি– মিম্বার বা একটি সিঁড়িজাতীয় গাঁথনি, প্রায়ই 'বহনযোগ্য' যাহার সর্বোচ্চ সিঁড়িতে বসিয়া ধর্মীয় নেতা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে নির্মিত অধিকাংশ মসজিদ ও প্রাসাদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। উমাইয়া স্থাপত্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে যেইগুলি এখনও টিকিয়া আছে সেইগুলি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ এবং জেরুজালেমের 'প্রস্তরের গম্বুজ' (Dome of the Rock)। আব্বাসীয় ইমারতগুলির মধ্যে সামারার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এবং অন্যূন ৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ইসফাহানের অপেক্ষাকৃত উত্তম উপায়ে রক্ষিত জুমা মসজিদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইতিহাসবিদদের মতে সাধারণত উমাইয়া স্থাপত্য শিল্পে বাইজেন্টাইন প্রভাব এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পে পারস্য প্রভাব দৃষ্ট হয়। সাসানীয়গণ ডিম্বাকার ও অঙ্গহীন গম্বুজ এবং খিলান ও ঘূর্ণায়মান বুরুজ আবিষ্কার করে। মুসলমানগণ সেইগুলি অনুকরণ করে।

প্রাণীর ছবি আঁকার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার ফলে মসজিদগুলি রঙিন টালি দ্বারা অলংকৃত হয়, যেইগুলি ইরানের কাসান শহরের নামানুসারে 'কাশি' নামে পরিচিত হয়। টালির উপর কারুকার্য কখনও কখনও অতি সুন্দর জ্যামিতিক বা ফুলের নকশায় করা হয়। প্রতিভাশালী শিল্পিগণ নিজদিগকে ক্যালিগ্রাফীর (অতি সুন্দর হস্তলিপি) মাধ্যমে প্রকাশ করেন। ইহা মসজিদকে অলংকৃত করিবার জন্য ধর্মীয় বিধিসম্মত উপায়ে কোরআন বা কোরআনের বাক্যকে টালির উপর খোদাই করিবার এক প্রকারের শিল্প। ইসলাম যদিও প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ করিয়াছে কিন্তু খলিফাগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং খলিফা মুতাসিম সামাররায় অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদের দেয়ালসমূহ নগ্ন ছবি দ্বারা অলংকৃত করেন। ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে শিল্পিগণ গ্রন্থসমূহে চিত্র সংযোজন করেন। ফেরদৌসীর 'নৃপতিদের গ্রন্থ'– ইহার উপাখ্যান ও গল্প সহকারে শিল্পাভিব্যক্তির জন্য খুবই উর্বর। ইহাই ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পকলার প্রারম্ভ, যাহার জন্য পারস্যবাসিগণ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

কোরআন তেলাওয়াতই একমাত্র সঙ্গীতের শাখা যাহা ইসলামের অনুমোদন লাভ করে। তবে ইহা এতই ঢালাও ছাঁচের যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহাতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বিদ্বান ব্যক্তিগণ গ্রীকদের অনুকরণে সঙ্গীত তত্ত্বের উপর লিখিয়াছেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উন্নতি খুব কমই হইয়াছে। সঙ্গীত রচয়িতা ছিল, গায়ক ছিল, যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ ছিল এবং নৃত্যশিল্পী ছিল। কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহাদের সবাইকে ব্যবহার করা হইত আনন্দ উৎসবের জন্য।[১]

পূর্বোল্লিখিত সংস্কৃতির জরিপে যাহা প্রকাশ পায় তাহাতে বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, সর্বাধিক সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপ সাধিত হইত ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে (আনমুানিক ৯০০-১২০০ খ্রিঃ), যখন খলিফাগণ ছিলেন দুর্বল এবং যুবরাজগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও এই সময়ে উন্নতি অব্যাহত থাকিবার কারণসমূহ খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার নহে। প্রথমত আরব বিজয় পরিশ্রান্ত সমাজগুলির উপসম হিসাবে কাজ করে, যেইগুলি কিছুকালের জন্য অলস হইয়া পড়িয়াছিল। আরবগণ কর্তৃক আনীত ধর্ম চিন্তাশক্তির উদ্ভবের জন্য কোনো নূতন উত্তেজক পদার্থ হিসাবেও কাজ করে নাই, যাহা মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত ধর্মে ছিল না, অথবা আরবি ভাষাতেও সংস্কৃতি প্রকাশের জন্য এমন কোনো লুক্কায়িত শক্তি ছিল না যাহা অন্যান্য ভাষায় পাওয়া যাইত না। তবে এই কথা সত্য যে, ইসলামও আরবি পুনঃজাগরণের হাতিয়ার হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই পর্যায়ে নিজেরাও নূতনভাব লাভ করে এবং সমৃদ্ধশালী হয়। মধ্যপ্রাচ্যের লোকজন যে স্থানে পড়িয়াছিল সে

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৭৭।*

স্থান হইতে তাহারা পুনরায় যাত্রা শুরু করে এবং অস্থিরতা ও যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও তাহাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে, কারণ তাহাদের অলসতা বিজয়ের মাধ্যমে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং জীবনীশক্তি পুনরুত্থিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত বাগদাদের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপে একটি পরোক্ষ সাহায্য হিসাবে কাজ করে। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, আব্বাসীয়গণ ধর্মীয় মতবাদ বজায় রাখিতে ব্যস্ত ছিল এবং তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যাচার ও অনুসন্ধিৎসা ত্যাগ করে নাই। খলিফাদের দুর্বলতা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁহাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতে সাহায্য করিয়াছে, যাহার অভাবে তাঁহারা সৃষ্টিধর্মী হইতে পারিতেন না। স্বাধীন যুবরাজগণ হয় ধর্মীয় মতবাদ বুঝিতেন না অথবা পরোয়া করিতেন না। তাঁহারা বুদ্ধিজীবীদিগকে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করেন, অথচ ঐসব বুদ্ধিজীবীদিগকে বাগদাদে ধর্মীয় মহাপুরুষগণ অবিরত ধর্মহীনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকেন। এইসব সৃষ্টিতে কোনো শক্তিশালী খেলাফত অনুমতি দিতেন কিনা সন্দেহ এবং ইহা প্রতীয়মান হয় এইরূপে যে, সেলজুকগণ যখন রক্ষণশীলদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং গাজ্জালী তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, পাণ্ডিত্য এবং সৃজনীশক্তি তখন নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করে। রক্ষণশীল ইসলামের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে 'মধ্যযুগ' আরম্ভ করে। ইহার 'নবজাগরণ' আরম্ভ হয় বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে এবং 'সংস্কার' এখনও আরম্ভ হয় নাই।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Andrae, Tor, Mahammed : *The Man and His Faith.* New York : Harper and Brothers, 1960.

Arberry, A.J., *The Holy Koran : An Introduction with Selection.* New York : The Macmillan Company, 1953.

Arnold, Sir Thomas, and Alfred Guillaume, eds., *The Legacy of Islam.* London : Oxford University Press, 1931.

Browne, E. G., *Arabian Medicine.* Cambridge, England : Cambridge University Press, 1921.

Cragg, Kenneth, *The Call of the Minaret,* New York : Oxford University Press, 1956.

Creswell, K. A. C, *Early Muslim Architecture* : Umayyads, Early Abbasids and Tulunids (2 vols), Oxford : Clarendon Press, 1932-1940.

Donaldson, Dwight M., *The Shi'ite Religion : A History of Islam in Persia and Irak.* London : Lazac, 1933.

Faris, Nabih A., *Arab Heritage.* Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1944.

Gibb. H. A. R., *Arabic Literature : An Introduction. London* : Oxford University Press, 1962.

Mohammedanism, An Historical Survey. London : Oxford University Press, 1946.

Hitti, Philip K., *History of the Arabs* (7th ed.). New York : The Macmillan Company, 1961.

Jeffery, Arthur, *The Qur' an as Scripture,* New York : R. F., Moore, 1952.

Jurji, Edward, *The Middle East : Its Religion and Culture.* Philadelphia : Westminster Press, 1956.

Khadduri, Majid, *War and Peace in the Law of Islam,* Baltimore : John Hopkins Press, 1955.

Le Strange, Guy, *Baghdad During the Abbasid Caliphate.* London : Oxford University Press, 1924.

Lewis, Bernard, *The Arabs in History.* London : Hutchinsons University Library, 1950.

Morgan, Kenneth W., ed., *Islam - The Straight Path.* New York : The Ronald

Press, 1958.

Nicholson, Reynold A., *A Literary History of the Arabs.* Cambridge. England : Cambridge University Press, 1962.

Pope, Arthur Upham, *An Introduction to Persian Art Since the Seventh Century A.D.* New York : Charles Scribner's sons, 1931.

Robinson, J. Stewart, ed., *The Traditional Near East.* Englewood Cliffs. N. J. : Prentice Hall, 1960.

Rosenthat, E.I.J., *Political Thought in Medieval Islam,* Cambridge. England : Cambridge University Press, 1962.

Von Grunebaum. Gustav E. ed., *Unity and Variety in Muslim . Civilization.* Chicago : University of Chicago Press, 1955.

Watt, W. Montgomery, *Muhammad, Prophet and Statesmen.* London : Oxford University Press, 1961.

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারিগণ

দ্বাদশ অধ্যায়
আত্মরক্ষায় ইসলাম

ইসলাম ও খ্রিষ্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের একটি হইল এই যে, মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ইহা জীবনীশক্তি আহরণ করে যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তৃতির মধ্য হইতে। অন্য দুইটি প্রধান ধর্মের বেলায় এরূপ ঘটে নাই। সঠিকভাবে বলিতে গেলে খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রথম ৩০০ বৎসর পর্যন্ত উভয় ধর্মই সংখ্যালঘু ধর্ম হিসাবে টিকিয়া থাকে। উভয় ধর্মেরই অনুসারীগণ অত্যাচারিত হয়। ইহার অনপনেয় চিহ্ন প্রত্যেকটির মধ্যে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে ইসলামের অনুসারিগণ অত্যাচারিত হয় নাই এবং সংখ্যালঘু সমাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই। বরং অন্যান্য সমাজের উপর বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এইসব ঘটনা তাহাদের সমাজে অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক, অধিকাংশ ইউরোপীয়ান বা ইউরোপীয় মধ্যপ্রাচ্যের, ইসলামি আন্দোলনকে 'ধর্ম', 'সাম্রাজ্য' ও ' সংস্কৃতি' এই তিনটি পৃথক সত্তায় ভাগ করিয়া বলিতে চায় যে, "ইসলাম ধর্ম" সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই কথা বলিলে যুগের সমগ্র ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। সঠিকভাবে বলিতে গেলে ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য মহৎ। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরিয়া ইসলাম ও উহার রসুল (সঃ) কে পাশ্চাত্যের লোকেরা হীনচিত্রে চিত্রিত করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ভাবধারা হইল ঐগুলির সংশোধন করা এবং সত্যকে সত্যায়িত করা। তাহাদের মতে যেহেতু রাজ্যজয়ের মাধ্যমে একটি ধর্ম প্রচার করা হইয়াছে– এই উক্তি ভ্রান্ত, তাই তাহারা বলিতে চেষ্টা করেন যে, ইসলামে দেশ বিজয়ের যুদ্ধগলি "ইসলামি ধর্মের" প্রচারের জন্য নহে, বরং একটি "ইসলামি সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য।

মুসলমানগণ, সে ধর্মতত্ত্ববিদই হউন বা ঐতিহাসিক হউন, এই মত গ্রহণ করেন না। তাহাদের মতানুসারে সাম্রাজ্য ও ধর্ম এক কথা। রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধগুলি আল্লাহর আদেশে সংঘটিত হয় এবং সেনাবাহিনী তাহার জন্য যুদ্ধ করে। প্রথম যুগের মুসলমান লেখকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ রসুলল্লাহ (সঃ) যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাহা সবিস্তারে এবং যথেষ্ট গর্বের সহিত বর্ণনা করেন। তরবারি হাতে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ছবি একজন মুসলমানের কাছে মোটেই অসঙ্গত নহে, অথচ যীশুখ্রিষ্ট বা যুদ্ধের তরবারি আন্দোলিত কোনো ছবি যোদ্ধাবেশে সজ্জিত একজন খ্রিষ্টান বা বৌদ্ধকে মর্মাহত করিবে।

বদরের যুদ্ধ (৬২৪ খ্রিঃ) হইতে, যাহাতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন, একাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলি পর্যন্ত ইসলামের সেনাবাহিনী কোনো বড় আকারের পরাজয়ের সম্মুখীন হয় নাই। আরবদের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী সেলজুক ও অন্যান্য তুর্কি বংশসমূহ খাঁটি মুসলমান হিসাবে আগমন করে এবং আল্লাহর খলিফার অধীনে রক্ষণশীল ও উম্মার ঐক্য শক্তিশালী করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক বিজয় তাহাদিগকে একই অনুভূতি প্রদান করে যে আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে আছেন। অতএব তাহাদের অগ্রাভিযান

অপ্রতিরোধ্য। এশিয়া মাইনরের প্রাচীর তাহাদের অতিক্রমের পক্ষে অতি উঁচু মনে হইলেও তাহারা কখনও ইহার আশা ত্যাগ করে নাই। ১০৭১ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকগণ বাইজেন্টাইনদিগকে মাঞ্জিকার্তের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এশিয়া মাইনরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তাহাদের আশা আরো দৃঢ় হয়। শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইসলামকে যেরূপ শেষ ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন, অনুরূপভাবে খলিফারা মনে করেন, তাঁহাদের অধীনস্থ ইসলামি সাম্রাজ্যই হইবে প্রথম যে সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আয়ত্তাধীনে আনয়ন করিবে।

ক্রুসেডসমূহ

এইরূপ একটি মানবিক ও ধর্মীয় মনোভাবের উপর প্রথম আক্রমণ আসে ইউরোপ হইতে ক্রুসেডের আকারে। ইউরোপীয়গণ ইসলামের সেনাবাহিনীকে তাহাদের স্বীয় ভূমিতে পরাজিত করিয়া ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমানদের মনে এমন একটি মর্মদহনের সৃষ্টি করে যে, আজও উহা আক্ষেপ ও বিরক্তিকর মানসিকতার সৃষ্টি করে। আসল ব্যাপার হইল, ইসলামের ইতিহাসে ক্রুসেডগুলি একটি অপসৃয়মান অধ্যায় মাত্র। ঐগুলি ক্ষণিকের জন্য ইসলামের অগ্রগতি ব্যাহত করিলেও পরে তাহা ওসমানীয়দের দ্বারা পুনরায় আরম্ভ হয়। তাহা সত্ত্বেও অধিকাংশ আরবিভাষী মুসলমানদের মনে ক্রুসেডগুলি ইসলামি সমাজের বুকে একটি কলঙ্কের ন্যায় বিদ্যমান।

ক্রুসেডগুলি ইউরোপের ইতিহাসে প্রবেশ করে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মযুদ্ধগুলির সঙ্গে। স্বভাবতঃই এইগুলি দুই অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বিভিন্ন কারণে ক্রুসেডগুলি সংঘটিত হয়। প্রথমত, এইগুলিকে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমাগত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টান-পাশ্চাত্যের একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সিরিয়ার সুন্নি সেলজুক ও মিসরের শিয়া ফাতেমীয়দের মধ্যে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে খ্রিষ্টান তীর্থ যাত্রীদের প্যালেস্টাইনে তাহাদের পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শন করা খুবই বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, ফাতেমীয় খলিফা হাকীম কর্তৃক খ্রিষ্টানদের পবিত্র সমাধির গির্জা ধ্বংস হইবার ফলে ইউরোপে ধর্মীয় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চতুর্থত, এশিয়া মাইনরে সেলজুকদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে জেনোয়া, পিশা ও ভেনিশের লাভবান ব্যবসা হুমকির সম্মুখীন হয়। এই ব্যবসাকেন্দ্রগুলি তাহাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ক্রুসেডারদিগকে সাহায্য করে। পঞ্চমত, ইতিমধ্যেই ইউরোপে ইসলামের দুর্বলতার লক্ষণ প্রকটিত হইয়া পড়ে। ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টিল ও আরবগণ স্পেনের মুসলমানদের নিকট হইতে আন্দালুসিয়া কাড়িয়া লয়। ১০৬০ খ্রিষ্টাব্দে নরমানগণ সিসিলি অধিকার করে। ১০৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানদের হাতে ভূমধ্যসাগরের ক্ষমতা বলিতে কিছুই থাকে নাই। তদুপরি মুসলমানদের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধের কথা খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ষষ্ঠত, ক্রুসেডারদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা খ্রিষ্টের জন্মভূমিকে মুক্ত করিতে এবং "অবিশ্বাসীদিগকে" ধর্মান্তর করিতে ইচ্ছুক ছিল। তাহারা এই কাজটি তরবারি দ্বারা করিতেছে এইরূপ ধারণা শুধুমাত্র এ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের ন্যায় গুটিকতেক ব্যক্তির বিবেককে আহত করিয়াছিল। সপ্তমত, অনেক ভূমিহীন নাইট, যুবরাজ ও অভিজাত ভূমির মালিকানা লাভ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। অষ্টমত, এমন অনেকেই ছিল যাহারা পৃথিবী দেখিবার জন্যই এই দুঃসাহিক কাজে নামিয়াছিল। এই দুঃসাহসিকতার পিছনে সম্ভবত প্রাচ্যের রূপকথার ন্যায় সম্পদের কিছু অংশ লাভের

আকাঙ্ক্ষাও থাকিতে পারে। নবমত, জনসাধারণের অনেকেই অত্যাচারিত ও বিরক্ত বলিয়া কিছুটা পরিবর্তনের আশায় এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সর্বশেষ কারণ হইল, এশিয়া মাইনরের সেলজুকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট এলেক্সিয়াস কমেনাস ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রোমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্য প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অস্ত্রধারণ বার্তা', ঘোষণা করেন, এবং অধিকাংশ ইউরোপ এই আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দেয় যেন তাহারা এইরূপ একটি আদেশের অপেক্ষায় ছিল।

প্রথম ক্রুসেডটি ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এইযুদ্ধে বইলনের গডফ্রে, লরাইনের বল্ডউইন এবং তুলুসের রেমণ্ডের নেতৃত্বাধীনে প্রায় ১৫০,০০০ লোক (সবাই সৈন্য নহে) কন্সট্যান্টিনোপলে একত্রিত হয়। ১০৯৭ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং নিকাইয়া, ইস্কি শহর ও তারসুস অধিকার করে। সেখান হইতে বল্ডউইনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আর্মেনিয়া দখল করে, অপরদিকে আরেক বাহিনী এন্টিওক দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকূল অবরোধ করিয়া কোনো গুরুতর বাধা ছাড়াই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম জবর দখল করে এবং মুসলমান ও খ্রিষ্টান উভয়কে সমভাবে হত্যা করে। গডফ্রে জেরুজালেমের রাজা হন। উত্তরে এন্টিওক ও পূর্বে এডেসা পর্যন্ত উপকূলীয় অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে ইউরোপীয় সামন্ত প্রথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়।

বিজয় লাভ করিবার পর অধিকাংশ ক্রুসেডরগণ স্বদেশে ফিরিয়া যায়। যাহারা থাকিয়া যায় তাহারা ইউরোপের নাইটদের দ্বারা শক্তিশালী হইয়া এবং বাণিজ্য নগরীগুলির নৌবহরের সতর্কতায় প্রায় ৫০ বৎসর অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করে। ক্রুসেডারগণ কখনও জর্দান নদীর পূর্বে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা দক্ষিণে আকাবা হইতে উত্তর-পূর্বে টাইগ্রীসের উজান পর্যন্ত যাইতে সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দ্বারা বিভক্ত একটি অঞ্চলে ইতিমধ্যে কয়েকটি নূতন রাজ্য সৃষ্টি এই এলাকার সাধারণ চিত্রকে তেমন পরিবর্তন করে নাই। সময়ের বিবর্তনে খ্রিষ্টান রাজ্যগুলি তাহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের পদাংক অনুসরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করে। কখনও কখনও মুসলমান ও খ্রিষ্টানগণ তাহাদের স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্য পর্যন্ত প্রার্থনা করে।

ইতোমধ্যে ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমানদের ভিতর ইমাম আল-দ্বীন জঙ্গী নামক জনৈক ক্রীতদাসের মাধ্যমে এক নূতন তারকার উদয় হয়। তিনি ১১২৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষণস্থায়ী জঙ্গী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ক্রুসেডারদের হাত হইতে অতি সহজেই তিনি এডেসা অধিকার করেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মাহমুদ দামেস্ক ও আলেপ্পো অধিকার করেন এবং তাঁহার কুর্দি ক্রীতদাস শিরকোহ্ টলটলায়মান মিসরের ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে এই কুর্দের ভ্রাতুষ্পুত্র, সালাহ্উদ্দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব (সালাদিন) নামে একজন যুবক জুমা'র নামাজের খোৎবা হইতে ফাতেমীয় খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন মাত্র এবং উহাই ছিল ফাতেমীয়দের পরিসমাপ্তি। একজন খাঁটি সুন্নি হিসাবে তিনি আব্বাসীয় খলিফার নাম পুনর্বহাল করেন- যিনি সালাহ্উদ্দীনের অবস্থিতি সম্ভবত জানিতেনও না এবং তাহাকে খুব কমই গ্রাহ্য করিতেন। ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মিসরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আইয়ুবী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হিত্তিনের যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদিগকে পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং শীঘ্রই জেরুজালেম, এন্টিওক, ত্রিপলী ও টায়ার পুনর্দখল করেন।

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক্রুসেডের (১১৮৯-১১৯২ খ্রিঃ) সূচনা করে। জার্মানির ফ্রেডরিক বারবারোসা, ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড দি লায়ন হার্টেড এবং ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস— এই তিনজন মহাপ্রতাপশালী ইউরোপীয় সম্রাটের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ফলে এই ক্রুসেডে কৃতিত্বের চাইতে খ্যাতিই অর্জিত হয় বেশি। দুই বৎসর অবরোধের পর তাঁহারা এ্যাকর অধিকার করেন এবং ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপন করেন। এই ঘটনার পরেই সালাহ্উদ্দীন পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহার পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, যাহারা এই সমস্ত বংশের গতানুগতিক ধারায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ক্রুসেডারগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাহারা জেরুজালেম এবং অন্যান্য উপকূলীয় শহরগুলি দখল করে।

আইয়ুবীদের দুর্বলতা আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থানের পথ সুগম করে। আইবাক নামক এক ক্রীতদাস কায়রোতে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া ১২৫২ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের মামলুক (ক্রীতদাস) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ দাস-রাজা বাইবার্স (১২৬০-১২৭৭ খ্রিঃ) এক নাগাড়ে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এবং ফিলিস্তিনে অনেকগুলি নগরী অধিকার করেন ও উত্তরে এন্টিওক দখল করেন। তাহার উত্তরাধিকারিগণ এই চাপ বলবৎ রাখেন এবং ১২৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শেষ ক্রুসেডারদিগকেও বিতাড়িত করেন।

প্রায় ২০০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ক্রুসেডগুলি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে একটি অধ্যায়মাত্র। উহারা ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগের ধারা পরিবর্তন করে নাই। যুদ্ধের সময়ের চাইতে শান্তির সময়ই ছিল অধিক এবং শান্তির সময় খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ধর্মহীন মুসলমানদের উপর নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব লইয়া আগত ক্রুসেডারগণ শীঘ্রই তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। ফ্রাংকগণ শীঘ্রই মুসলমানদের অতি উচ্চ সংস্কৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং একমাত্র ধর্ম ব্যতীত উহাদের সবগুলিই তাহারা অনুসরণ করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ফ্রাংকো নামে অভিহিত করিত।

এইসব নব নব রুচি লইয়া ক্রুসেডারগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে ব্যবসায়িগণ এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করে এবং শীঘ্রই ইউরোপের বাজারগুলিতে চিনি, মরিচ, লবঙ্গ, আদা, কম্বল, চিত্রিত পর্দা, মসলিন, ভেলভেট, সার্টিন, আয়না, জপমালা ও বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় বিদেশ হইতে আনীত বাণিজ্য-সম্ভার প্রদর্শন আরম্ভ করে। যুদ্ধকলায় ফ্রাংকগণ মুসলমানদের নিকট হইতে বার্তাবাহী কপোতের ব্যবহার শিক্ষা করে এবং মুসলমানগণ ফ্রাংকদের নিকট হইতে গুলতির ব্যবহার ও ভারি বর্ম পরিধান শিক্ষা করে।

দুইশত বৎসরের ক্ষণবিরতির যুদ্ধবিগ্রহ উভয় পক্ষে অসদিচ্ছার বীজ বপন করে এবং যুদ্ধের প্রচারণা অব্যাহত থাকে। ইউরোপে ইসলাম সম্পর্কে অনেক অপতথ্য পরিবেশন এই সময়ে আরম্ভ হয় এবং তাহা সত্ত্বেও অনেক সৎলোক ছিলেন। তাঁহারা পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন। মুসলিম চিকিৎসকগণ পীড়িত ফ্রাংকদের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণায় সর্বদা বিস্মিত হন। এ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিস ও রেমণ্ডলালের ন্যায় লোকও মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের চাইতে ভালবাসায় মিলিত হইবার নীতিতে বিশ্বাস করেন। অনেক আন্তঃধর্মীয় বিবাহও সংঘটিত হয়। লেবানন, সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের বহুসংখ্যক নীল-চক্ষু বিশিষ্ট কালোকেশী মহিলা এই বিবাহের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মোঙ্গলগণ

পশ্চিম মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানগণ যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তখন পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ আরেকটি নূতন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত যেকোন ঘটনার চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক ও নিষ্ঠুর। বহির্মোঙ্গলিয়ার উচ্চ ভূমিতে বৈকাল হ্রদের চতুষ্পার্শে অবস্থানকারী মোঙ্গলগণ চীনের বিশাল প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেই সভ্যতাকে পরাভূত করে এবং পশ্চিমাঞ্চলের খারিজমের মুসলিম ক্ষুদ্র রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরবি ও ফার্সি উভয় ভাষাতেই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ বাছবিচার ছাড়া তুর্কি, তুর্কমান, তাতার ও মোঙ্গল শব্দ ব্যবহার করেন। উপরোল্লিখিত সবাই যেহেতু একে অপরের সহিত ভাষাগতভাবে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু মনে হয় ইসলামের আবির্ভাবের অনেক আগে হইতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম উভয় পার্শ্বে তুর্কিগণ বাস করিত। পূর্ব পার্শ্বের গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলির মধ্যে ছিল উজবেক ও তুর্কমানগণ এবং পশ্চিম পার্শ্বের সুপরিচিতদের মধ্যে ছিল খাযার ও বুলগারগণ। উদাহরণস্বরূপ, সেলজুক ছিল তুর্কমান। এশিয়া মাইনরের সেলজুলগণ কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম অঞ্চলের তুর্কিদের সহিত মিলিত হয়। তবে, মোঙ্গলগণ সম্পূর্ণ নবাগত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহারা এই অঞ্চলে আগমন করে। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের মহাপ্রতাপ ও খ্যাতির ফলে অনেক তুর্কিও নিজদিগকে মোঙ্গলদের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিস খানের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

তে মূ চীন ১১৫৫ হইতে ১১৬২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বহির্মোঙ্গলিয়ায় বসবাসকারী মোঙ্গল-দের এক ক্ষুদ্র দলপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন। সাহসিকতা ও ধূর্ততার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রগুলিকে একত্রিত করিয়া চীনের বিশাল প্রাচীর অতিক্রম করেন। সভ্য চীনাগণ উত্তরের লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে এই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিলেন। চেঙ্গিস খান চীনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে যেসব সভ্যতা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলি আর ধ্বংস করেন নাই। চীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার শাসন পশ্চিমে তিব্বত ও সিনকিয়াং পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উহাই ছিল চীনের স্বাভাবিক সীমান্ত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী চেঙ্গিসের পশ্চিমাঞ্চলে সশস্ত্র অভিযানের কোনো উদ্দেশ্যে ছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

কেন্দ্রস্থল হইতে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তিনি কেন অগ্রসর হইবার আদেশ দেন তাহা কখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। একটি তথ্য অনুসারে জানা যায় আব্বাসীয় খলিফা নাসির খারিজমের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য কামনা করেন।[১] আধুনিক গবেষকগণ এই তথ্যের উপর সন্দেহ পোষণ করেন এবং ইহাকে প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা যায় না বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন। আরেক তথ্য অনুসারে জানা যায়, চেঙ্গিস খান পশ্চিমাঞ্চলে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং তথায় (খারিজম) শাহের এক শ্যালক ও উতরারের সীমান্ত শহরের গভর্ণর সেই ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করেন এবং তাহাদের সম্পদশালী বাণিজ্য সম্ভার বাজেয়াপ্ত করেন। এই কার্য এবং দোষীদিগকে হস্তান্তর করিতে খরিজমের মুহম্মদ শাহের অনিচ্ছা মহাপ্রতাপশালী খানকে এমন রাগান্বিত করে যে, তিনি গোত্রীয় দলপতিদের একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভা খারিজমের রাজ্য আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯৯, ১০১।*

হইয়াছে। ইহাও সম্ভব যে একটি বসতিপূর্ণ ও সভ্য চীনের সম্রাট হিসাবে চেঙ্গিসের পক্ষে তাঁহার অস্থির ও যোদ্ধা মোঙ্গল গোত্রীয় লোকদিগকে শায়েস্তা করিয়া রাখা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে হয়। ইহাই ছিল তাহাদের একমাত্র পেশা যাহা তাহারা পছন্দ করিত।

যেভাবেই হউক, ১২১৯ খ্রিষ্টাব্দে সিনকিয়াং-এ এই তুষার স্রোত আরম্ভ হয় এবং ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইহার প্রাথমিক আক্রোশ শেষ হইলে দেখা যায় মোঙ্গলগণ ইরানী মালভূমি পদানত করিয়া উকরাইনের কিয়েভ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে মালভূমির অনেকগুলি নগরী, যথা বলখ, বোখারা, সমরখন্দ, মার্ভ, হ্যারাত, নিশাপুর ও রায় লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে হত্যা করা হয়। এই সমস্ত নগরীর কোনো একটিও ইহার আক্রমণপূর্ব আকারে পুনঃনির্মিত হয় নাই। পাঁচ লক্ষ জনসাধারণসহ রায় নগরীকে (প্রাচীন র‍্যাজেস) প্রকৃত অর্থে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেয়া হয়। তেহরানের দক্ষিণে এই নামের একটি গ্রাম ছাড়া সেই মহানগরীর আজ কিছুই অবশিষ্ট নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই নারকীয় কাণ্ড বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে লেখেন ঃ "তাহারা আসিল, লুণ্ঠন করিল, জ্বালাইয়া দিল এবং প্রস্থান করিল।" এইরূপ একটি ধ্বংসের পর পারস্যবাসিগণ যে পুনরায় উত্থিত হইয়া তাহাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চালু করিতে ও মোঙ্গলদিগকে নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইতে সক্ষম হইল তাহা ইতিহাসে এইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতানুসারে পারস্যবাসীদের মধ্যে ধৈর্য ও দৃঢ়তা ও অনুশীলনের গুণসম্পন্ন সুফীবাদের প্রসার না হইলে তাহারা এই নির্মম নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে পারিত না। ইহাও সত্য হইতে পারে যে, এই হত্যাকাণ্ড আত্মত্যাগ প্রত্যাকর্ষণের প্রেরণাযুক্ত সুফীবাদের অভ্যাস বাড়াইয়া দেয় বলিয়া পরবর্তী পারস্যবাসিগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার তোয়াক্কা না করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন মনোভাব লইয়া বসবাস করে।

ভিস্টুলা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব এক বিশাল সাম্রাজ্য জয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চেঙ্গিস খান ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। চেঙ্গিস খান সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়কদের মধ্যে অন্যতম–ইহাতে সম্ভবত কোনো সন্দেহ নাই। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তাঁহার সেনাবাহিনীর ঐক্য রক্ষা করা হইত। সম্পূর্ণ সেনাবিভাগ পুরাপুরি ঘোড়-সওয়ার বাহিনী দ্বারা সংগঠিত বলিয়া ইহা ছিল অত্যন্ত গতিশীল। প্রত্যেক সৈনিকের নিকট একটি এবং কখনও দুইটি অতিরিক্ত ঘোড়া থাকিত। একজন মোঙ্গল হিসাবে তিনি হঠাৎ আক্রমণ ও কৃত্রিম পশ্চাদপসারণের কৌশল সুনিপুণভাবে রপ্ত করেন। সম্ভবত চীনাদের নিকট হইতে তিনি বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করেন এবং শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য তিনি একটি ধ্বংসকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক আক্রমণের পূর্বে তিনি নগরগুলিতে সাধারণত আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দিতেন। যুদ্ধ ছাড়া কোনো নগরী আত্মসমর্পণ করিলে সমস্ত সম্পত্তির এক-দশমাংশ বাজেয়াপ্ত করা হইত এবং নাগরিকদের এক দশামাংশকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত। অবশিষ্টগুলিকে মোঙ্গল শাসনকর্তার দয়ার উপর ছাড়িয়া দেয়া হইত। কোনো নগরী বাধা প্রদান করিলে লুণ্ঠন ও হত্যা আরও অধিক ব্যাপক আকার ধারণ করিত। পারস্যবাসী একজন ঐতিহাসিক, যিনি পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট বলিয়া বুঝা যায়, নিম্নবর্ণিত কথাগুলি চেঙ্গিস খানের বক্তব্য বলিয়া উল্লেখ করেন ঃ "সর্বোত্তম আনন্দ হইল আমার শত্রুদের জয় করা, তাহাদের পশ্চাদধাবন

কন্সটান্টিনোপল
সেলজুকগণ
আর্মেনিয়া
এডেসা
দামেস্ক
জেরুজালেম
কায়রো
ফাতেমীয়গণ
টাইগ্রীস
ইউফ্রেটিস
নীলনদ
ক্রুসেড রাষ্ট্রসমূহ
আনুমানিক ১১৪০ খ্রীঃ
০ ১৫০ ৩০০
মাইল

করা, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন দৃশ্য দর্শন করা, তাহাদের ঘোড়ায় চড়া এবং তাহাদের কন্যা ও স্ত্রী হস্তগত করা।”

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমটি পিকিং-এ রাজধানী লইয়া মূল এলাকা, যাহার শাসকের উপাধি ছিল খাকান। সমগ্র সাম্রাজ্যের উপর তাহার নামমাত্র ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল রাশিয়ায় এবং রাজধানী ছিল ভলগা নদীর তীরে অবস্থিত কাজান-এ। রাশিয়ার ইতিহাসে মোঙ্গলগণ 'সোনালী বাহিনী' নামে পরিচিত। তৃতীয়টি ছিল ইরানে এবং রাজধানী ছিল আজারবাইজানের মারাঘেহ নগরী। পারস্যের ইতিহাসে মোঙ্গলগণ 'ইলখান' নামে পরিচিত।

ইলখান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চেঙ্গিস খানের পৌত্র হুলাগু (হালাকু) খান। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ যেসব এলাকা জয় করেন তিনি ১২৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐগুলিকে একত্রিত করিবার জন্য বাহির হন। অতি দৃঢ় মোঙ্গল প্রতিহতকারী ছিল এ্যাসাসীনগণ, যাহাদিগকে পূর্ববর্তী মোঙ্গল আক্রমণের স্রোত গ্রাস করে নাই। ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আলামুতের এ্যাসাসীনদের প্রধান ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। উভয়ের নিকট হইতে তিনি নৈরাশ্যজনক জবাব লাভ করেন। তবে ১২৫৬ খ্রিষ্টাব্দে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খান এ্যাসাসীনদের সুদৃঢ় ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করেন এবং তাহাদের প্রসিদ্ধ পার্বত্য দূর্গ আলামুত অধিকার করেন। দুই বৎসর পর হালাকু ও মোঙ্গলগণ বাগদাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হন। দুর্বল ও অবরুদ্ধ খলিফা মুতাসিমের পক্ষে দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না। তাহার পূর্বপুরুষগণ এই শক্তিশালী লোকদিগকে সম্মান দান করিয়া নিজেদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌত্তলিক হালাকু এইসব বিবেচনা গ্রাহ্য করেন নাই। খলিফার হত্যা 'বিশ্বের স্বাভাবিক রীতিকে বিপদগ্রস্ত' করিবে–এইসব সতর্ক বাণীতেও তিনি বিচলিত হন নাই। খলিফা ও তাঁহার সভাসদকে হত্যা করা হয় এবং নগরী লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পারস্য নগরীসমূহের ধ্বংসের তুলনায় বাগদাদের ধ্বংস কোনো অংশে কম হয় নাই।

এইভাবে আব্বাসীয়দের রাজত্বের অবসান হয়। তাঁহাদের সাঁইত্রিশ জন খলিফা ছিলেন, তন্মধ্যে আটজন প্রকৃত অর্থে শাসন করেন এবং অবশিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশ ৫০৮ বৎসর পর্যন্ত ক্রীড়নক হিসাবে রাজত্ব করেন। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো ঐতিহাসিক বাগদাদের পতনের বৈশিষ্টকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, যেমন কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ২০০ বৎসর পর কন্সট্যান্টিনোপলের পতনের ব্যাপারে বলিয়াছেন ঃ "উভয় নগরই অধঃপতনমুখী ছিল এবং এইগুলির পতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে নাই।”

হালাকু সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন কিন্তু মামলুকগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হন। ইহারা মিসরকে মোঙ্গল ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইলখানী ভূখণ্ড ককেসাস হইতে ভারত মহাসাগর এবং ইউফ্রেটিস হইতে আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। চেঙ্গিস খানের পরবর্তী বংশধরগণ সভ্যতা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পারস্যবাসিগণ যাহারা তুর্কি রাজ্যগুলিকে প্রভাবান্বিত করে, মোঙ্গলদিগকে সরকার ও সংস্কৃতির কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। প্রশাসনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইলখানিগণ নিজেদিগকে পারস্যবাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখে। এক বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ইরানকে চীনের সহিত বাণিজ্যপথ দ্বারা সম্পূর্ণ যুক্ত রাখা হয়– যাহাতে সর্বদা যোগাযোগ সহজ হয়।

মোঙ্গলগণ কর্তৃক আরোপিত শান্তির দ্বারা ঐসব বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মতবিনিময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের ক্ষুদ্রাকৃতির পারস্য শিল্পকলার মধ্যে চীনা প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ১২৭২ খ্রিষ্টাব্দে ইরানের মধ্য দিয়া পিকিং-এ ভ্রমণ করিবার কালে মার্কোপোলো তাব্রিজের উন্নতশীল শিল্পসমূহ, কাশানের সিল্ক ও কেরমানের কাপড়ের বুটির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মোঙ্গলগণ ছিল মূলত পৌত্তলিক। কিছুকালের জন্য ইরানের ইলখানগণ খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ইতস্তত দোলায়মান থাকে। ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সিকান জাঁপ্ল্যাভো ডি ক্যাপরিনির অধীনে পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট সুদূর মোঙ্গলিয়ার কারাকোরামে ধর্মীয় সংস্থা স্থাপন করিবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইলখানী যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ইরান বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের দৃষ্টি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে ক্রমাগত নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

ইলখানী রাজাদের আনুগত্য লাভের প্রতিযোগিতায় খ্রিষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইসলামই বিজয়ী হয়। গাজান খান (১২৯৫-১৩০৪ খ্রিঃ) একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন এবং চীনের খাকানদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মহাপ্রতাপশালী ইলখানদের মধ্যে তিনি অন্যতম। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে তিনিই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনামলে লাঞ্ছিত ও পদদলিত কৃষক সমাজ উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে। গাজান খান একটি সমতাভিত্তিক করপ্রথা প্রতিষ্ঠা করেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ-বিধি ঘোষণা করেন এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। গাজান ছিলেন শিয়া প্রভাবান্বিত একজন মুসলমান। তিনি অনেক মোঙ্গলকে তাঁহার পদাংক অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন এবং একজন নব্য মুসলমানের উৎসাহ লইয়া শুধু পৌত্তলিকদের মন্দিরগুলিই বিধ্বস্ত করেন নাই বরং খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়গুলিও ধ্বংস করেন। শিয়া দরবেশ প্রথা শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি অনেক কিছু করেন—যাহা ইরানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। এই প্রভাবের মধ্য হইতে সাফাভীয় বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

মোঙ্গলদের দ্বারা সংঘটিত এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংস সাধনের পর ইরানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ অবশিষ্ট থাকাটা আশ্চর্যের বিষয়। তবুও মোঙ্গল আক্রমণের মনোমুগ্ধকর ফলাফল হইল ইহা পারস্যের ইতিহাসের অত্যন্ত সাংস্কৃতিক সৃজনশীল যুগগুলির মধ্যে একটি যুগের সৃষ্টি করে। পারস্যবাসীদের জন্য ইহা একটি কৃতিত্বের বিষয় যে, তাহারা শুধুমাত্র নিজেদের সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নাই বরং মোঙ্গলদিগকেও সভ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। পারস্যবাসীদের বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ইহা তিন প্রকারে পরিচালিত হয়।

প্রথমত, পারস্যবাসিগণ আরবদের মত মোঙ্গলদিগকেও প্রভাবন্বিত করে এবং তাহাদিগকে পারস্য সংস্কৃতির সহিত একাত্ম করিয়া ফেলে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজত্বকালে পারস্যবাসিগণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ সংঘটিত করে, ধর্মীয় উত্থানে ইন্ধন জোগায়, প্রতিদ্বন্দ্বী আরব দলগুলিতে যোগদান করে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করে। তবে মোঙ্গল আমলে সম্মিলিত বিদ্রোহ বা উত্থানের কোনো চিহ্ন ছিল না এবং ব্যক্তিগতভাবে বোধ হয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদের মেধা ও ধূর্ততার মাধ্যমে মোঙ্গলদের পরিবর্তে ইরানের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের কাব্যে ব্যবহার করে।

মোঙ্গলদিগকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এইভাবে জয় করিবার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সর্বোত্তম দুইটি উদাহরণ সৃষ্টি করেন নাসির আল-দ্বীন তুসী ও রশীদ আল-দ্বীন ফজলুল্লাহ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হালাকুর সংস্পর্শে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি গাজানের সংস্পর্শে আসেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ ও বৈজ্ঞানিক নাসির আল-দ্বীন হালাকু খানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি মোঙ্গল বিজয়ীকে বাগদাদ অধিকার করিবার পরামর্শ দান করেন কিন্তু গ্রন্থাগার রক্ষা করিয়া গ্রন্থগুলিকে ইরানের ইলখানী রাজধানী মারাঘেহ-এ লইয়া আসিতে সম্মত করান। তিনি হালাকুকে একটি মানমন্দির নির্মাণ করিতেও উৎসাহ প্রদান করেন, যাহা পরে চীনা ও পারস্যবাসী উভয়ের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। উপরোল্লিখিত উভয় ব্যক্তিকে এবং সম্ভবত আরও অনেককেই পরবর্তীকালে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাঁহারা জীবনে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন এবং চির বিশ্রামে অবসর গ্রহণ করেন। পারস্যবাসিগণ যদিও আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক গর্ব বজায় রাখে। ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে মোঙ্গলিয়ায় অবস্থিত তাহাদের স্বদেশী কেন্দ্রস্থল হইতে ইরানের এই বিরাট ব্যবধানের জন্যই মোঙ্গলদিগকে সংমিশ্রিত করা সহজ হইয়াছিল। অলস জীবন যাপনে অনভিজ্ঞতার দরুন মোঙ্গলদের তাহাদের বিজিত লোক ছাড়া অন্য কাহারও নিকট হইতে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল না।

মোঙ্গল যুগে বাঁচিবার জন্য পারস্যবাসিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত দ্বিতীয় পন্থা ছিল শৈল্পিক সৃজনশীলতা। আরব আক্রমণের প্রথম ধাক্কা পারস্যবাসিদের শৈল্পিক সজীবতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে। পারস্যবাসিদের আকাঙ্ক্ষিত গুণগুলিকে ইসলাম ধ্বংস করিয়া দেয় এবং ইহার কঠোর প্রতিমূর্তি ধ্বংস সাধনের নীতিতে চিত্রকলা নিষিদ্ধ করে এবং শিল্পকলাবিদদিগকে কঠিন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। স্বীয় পারিপার্শ্বিকতা হইতে শিল্পীকে বিমুখ করিয়া নির্জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরে সে নিজেকে জ্যামিতিক রেখাচিত্রে ও ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে বস্তুনিরপেক্ষ শিল্পকলায় প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বদা সে তাহার ক্যানভাসের উপর বা কম্বলের উপর একটি বন্ধনী সৃষ্টি করে এবং পূর্বের ন্যায় নিজেকে কেন্দ্রীয় মেডালিয়নে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মোঙ্গলগণ বিভিন্ন গুণাবলী ধ্বংস করিয়াছে কিন্তু নিজস্ব কোনো ধর্মীয় মতামত না থাকায় তাহারা কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করে নাই। শিল্পী চিত্রকলা বা তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো আকারে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিত। বস্তুত একদা বর্বর মোঙ্গলদের ক্ষমতা পারস্য সংস্কৃতিকে ইসলামের গণ্ডিভূত প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং ইরানকে এশিয়া ও ইউরোপের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনয়ন করে। বিখ্যাত পারস্য ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র চীনা ও পারস্য চিত্রের সংমিশ্রণ। কপিকারক কর্তৃক দেওয়া গ্রন্থে শিল্পী যে কোনো ঘটনার যে কোনো চিত্র অঙ্কন করিতে পারিত। পারস্যবাসী শিল্পী ক্ষুদ্রাকৃশির চিত্রের চতুর্দিকে বন্ধনী অঙ্কন করিত, কিন্তু বন্ধনীর ভিতরের চিত্র কোনো কোনো স্থানে বন্ধনীর বাহিরেও চলিয়া যাইত ও উহা দ্বারা শিল্পী যত্রতত্র ঘুরিবার স্বাধীনতা প্রকাশ করিত।

মোঙ্গল আক্রমণের ধাক্কা সামলাইবার জন্য পারস্যবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত তৃতীয় পন্থা ছিল সুফীবাদ, যদ্দারা সে তাহার চতুস্পার্শে ভাঙিয়া পড়া বাস্তব পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। মোঙ্গল আধিপত্যের ভয়াবহতা এড়াইবার জন্য পারস্যবাসীর জীবনে সুফীবাদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সর্বোত্তম সৃজনশীল পারস্য প্রতিভার বিকাশেও সহায়তা করে। সুফীবাদ জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে পারস্যবাসিদের সচেতনতার বিরুদ্ধে একটি

প্রতিক্রিয়া - সে সচেতনতা মোঙ্গল ধ্বংসলীলার দ্বারা আরও প্রকট হয় - ফলে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে আত্মার সম্মিলন, আত্মাকে মুক্ত করিবার একটি পন্থায় পরিণত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পারস্য কবি লেখকের মধ্যে এই যুগের বেশ কিছু সংখ্যক মনীষী ছিলেন, যথা রুমী, হাফেজ, সাদী ও অন্যান্যগণ।[১] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পশ্চিমা অতীন্দ্রিয়বাদী, সমগ্র পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বভাবের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি এই ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের কোনো কিছুই উপভোগ করিতে পারেন না এবং তাই সন্ন্যাসীতে পরিণত হন। অপরদিকে পারস্যবাসী মোটামুটিভাবে পৃথিবীকে অস্বীকার করেন আবার তৎসঙ্গে যাহা তাহার নাগালের মধ্যে উহা তিনি উপভোগ করেন।

ক্রুসেডারগণের বহিষ্কার ও মোঙ্গলদের সংমিশ্রণের যুগ শেষ হইলে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আব্বাসীয়দের পতনের সময় হইতে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। এই অবস্থা কোনো নূতন কিছু নয় কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী।

প্রথমত, টাইগ্রীস, শাত-আল-আরব ও পারস্য উপসাগরের সাধারণ রেখা বরাবর ইরান ফারটাইল ক্রিসেন্ট হইয়া যায়। সাসানীয় শাসনের সময় এইরূপই ছিল। এই নদীগুলির উভয় পাড়ের লোকদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এক হইলেও কোনো অংশই অপর অংশের ভাগ্যের অংশীদার হয় নাই। এই প্রক্রিয়া নবম শতাব্দীর শেষ যুগগুলিতে আরম্ভ হয় এবং পরবর্তীকালে আরোও জোরদার হয়। ক্রুসেডারদের সময় সিরিয়ার সেলজুকগণ বারবার তাহাদের স্বগোত্রীয় ইরানের সেলজুকদের সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু এই প্রার্থনা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। অনুরূপভাবে পূর্বাঞ্চলের পারস্যবাসী ও তুর্কি উভয়েই মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ফারটাইল ক্রিসেন্টের শক্তিবর্গ তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে নাই। ইসলামের আগমনের পূর্বেকার সেই ভাগাভাগী মোঙ্গলদের আগমনের পরেও চলিতে থাকে। বাহ্যত একই ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে মুসলিম বিশ্বে যেরূপ পার্থক্য, অনুরূপ পার্থক্য অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ইলখানী আমলে ও পরে নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফার্সি ভাষা আরবি ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিভাবে সাফফারীয় ও সামানীয়গণ ফার্সি ভাষার পুনর্জাগরণ আরম্ভ করে তাহা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ফার্সি ভাষা অধিকতরভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু তবুও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যাবলী আরবিতেই লিপিবদ্ধ করেন। তবে মোঙ্গলদের আগমনের পর ফার্সি ভাষা প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বকীয়তা লাভ করে। কাব্যিক, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক সমস্ত রচনা ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। তবে পারস্যবাসিদের বিরাট সংখ্যাগুরু লোকজন তাহাদের নামাজ ও কোরআন তেলাওয়াত না বুঝিয়াই আরবি ভাষায় করে। ফলে ইলখান হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস একটি স্বাধীন ইতিহাস। ইহাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাকি অংশ জরীপ করা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের ন্যায়ই সমস্যাপূর্ণ।

এই ব্যাপারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইরানের মোঙ্গল আক্রমণের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। এই আক্রমণ ছিল ক্ষতিকারক। কারণ ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও রাজনৈতিক বশ্যতা এমন প্রকটভাবে সৃষ্টি করে যে ইহার ফলে রাজনৈতিক জাতীয় ঐক্যের

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ ঃ ১০৯, ১১০।*

উৎকর্ষ বাধাগ্রস্ত হয়। আইনহীনতার মধ্যে পারস্য আইন শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। যে কোনো বিষয়ে, বিশেষত রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করে। শ্রেষ্ঠ কবি সাদী (মৃত্যু ১২৯২ খ্রিঃ) লেখেন ঃ "স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে বলা বেশ ভালো, কিন্তু মাতৃভুমির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেওয়া বোকামী।" অপরদিকে মোঙ্গল আক্রমণ একটি আশীর্বাদস্বরূপ, কারণ ইহা পারস্যবাসীদিগকে আত্মার দিক দিয়া মুক্তি প্রদান করে এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করে। কোনো প্রকার ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে যেমন তাহাদের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ঠিক তেমনি আরবদের হীনমন্যতাবোধও তাহাদের ভিতর ছিল না। একটি নতুন সাংস্কৃতিক 'জাতীয়তাবাদী' পুরাতন রাজনৈতিক আধিপত্যের সংঘাতের স্থলাভিষিক্ত হয়। একবার সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেড় শতাব্দীর মধ্যে সাফাভীয় বংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্য আসে।

তৃতীয়ত, ক্রুসেডারগণের পর ফারটাইল ক্রিসেন্ট, আরব এবং মিসরও অতীতের গতানুগতিক অবস্থায় নামিয়া আসে। আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভের পর গুরুত্বহীন আরব উপদ্বীপ অনেক দিন হইতে কোনঠাসা হইয়া পড়ে। ইহার অধিবাসিগণ তাহাদের ঐতিহ্যবাহী মরুজীবন হইতে যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ঠিক অনুরূপভাবে সেই জীবনে ফিরিয়া যায়। ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের সম্পর্কও এমন এক ধাপে নামিয়া আসে যাহা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষার্থীদের সুপরিচিত। যেভাবেই হউক, মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্ট সমপর্যায়ে কখনও শাসন করিতে চায় অথবা উভয়েই একটি তৃতীয় শক্তির দ্বারা শাসিত হয়। ক্রুসেডের সমাপ্তির পর মামলুকদের অধীনস্থ মিসরই ফারটাইল ক্রিসেন্ট শাসন করে।

যাহা হউক, বাগদাদের পতনের পর হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস কোনো আরবিভাষী অথবা ফার্সিভাষী লোকদের ইতিহাস নহে। ইহার প্রধান নায়ক ছিল মূলত তুর্কিগণ। ইহারা হইল ওসমানীয় তুর্কিগণ, যাহারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং ইরানের পারস্য-তুর্কিগণ যাহারা সাফাভীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইরানের উন্নতি কিভাবে মোঙ্গলদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয় তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, ওসমানীয়গণ নূতনভাবে উহা আরম্ভ করে এবং উহাদের প্রতিই আমরা এখন নজর দিব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ওসমানীয় সুলতানাত

ওসমান ১ম (১২৯৯-১৩২৬), ওরহান (১৩২৬-১৩৬০), মুরাদ ১ম (১৩৬০-১৩৮৯) বায়েজীদ ইলদেরীম (১৩৮৯-১৪০২)।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে মুসলিম খেলাফত ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক যুদ্ধে তুর্কি সৈন্যগণ ইসলামের একটি কার্যকরী অগ্রসেনাবাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। তাহারাই ১০৭১ খ্রিস্টাব্দে আর্মেনিয়ার ভ্যান হ্রদের উত্তরে মাঞ্জিকার্তের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রোমান সম্রাট ডাইওজেন্সকে বন্দী করে। এই বিজয় মুসলমানদের জন্য এশিয়া মাইনরের পথ উন্মুক্ত করে এবং তুর্কি গোত্রগুলিকে পশ্চিমে সুদূর স্মার্ণা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। এই কাজ সম্পন্নকারী সেলজুক তুর্কিগণ শেষ পর্যন্ত ইরানে বসবাসকারী তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং এশিয়া মাইনরের সেলজুক অথবা মুসলমানদের ভাষায় 'রুম'-এর নামানুসারে 'রুমের সেলজুক' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক নাগাড়ে অনেকগুলি যুদ্ধের দ্বারা সেলজুকগণ এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে এবং ১৩০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাস্তবে অথবা নামে শাসনকার্য চালাইয়া যায়। এই যুগের অধিকাংশ সময় তাহাদের রাজধানী ছিল কোনিয়া (আইকানিয়াম)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কিদের অনেকগুলি নৃপতি ছিলেন যাহারা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদিগকে তাহাদের রাজধানীর প্রতি প্রলুব্ধ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট নিরাপত্তা প্রদান করেন। ৩০০ বৎসরের সেলজুক শাসনের দ্বারা সংঘটিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশের তুর্কিরূপ পরিগ্রহণ। পশ্চিমে কাস্পিয়ানের তুর্কিদের আগমনের প্রভাবে কিছু সংখ্যক যাযাবর তুর্কি এশিয়া মাইনরের গ্রামগুলিতে স্থায়ী কৃষিজীবীতে পরিণত হয়।

কিছু ব্যতিক্রমসহ ইসলামের সংস্পর্শে আগমনকারী তুর্কি গোত্রসমূহ সুন্নী মতামত গ্রহণ করে এবং ইহার নিয়মপ্রণালী ও বিধিনিষেধের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ ছিল যৌক্তিকতার চাইতে ভাবাবেগপূর্ণ। যুক্তিবাদের চাইতে আনুগত্যের অনভূতিই ছিল এক্ষেত্রে অতি প্রবল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের মধ্যে সুফী ধ্যান-ধারণার দ্রুত প্রসার তেমন আশ্চর্যজনক নহে। কারণ সুফীবাদ আনুগত্যের উপর জোর দেয় এবং খোদা প্রেমের উচ্চ প্রশংসা করে। সুফীবাদ, যাহা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টার দ্বারা আরম্ভ হয় তাহাই তুর্কি গোত্রসমূহের মধ্যে একটি সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রধানত খোদাপ্রেমের অভ্যাস করিবার জন্য সুফীবাদের অনুসারিগণ নিজদিগকে ভ্রাতৃসংঘে সংগঠিত করে। এইরূপ ভ্রাতৃসংঘ সুন্নী ও শীয়া উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে এবং তরিকা নামে খ্যাত হয়। তুর্কিদের নিকট কোনো জটিল ভাবধারার প্রতি আনুগত্যের চাইতে নেতার প্রতি ব্যক্তিবিশেষের আনুগত্যই অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল।

এই তরিকাগুলি, পরে দরবেশ উপাধি লাভ করে, একদিকে তুর্কিদিগকে একতাবোধ ও

আত্মীয়তার মনোভাব দান করে; আর অন্যদিকে তাহারা নিজদিগকে কতকগুলি অপরিচিত লোকদের মধ্যে দেখিতে পায়। এই তরিকাগুলির মধ্যে তাহারা তাহাদের গোত্রীয় ঐতিহ্য, যথা কঠোর শৃঙ্খলা, নেতার প্রতি আনুগত্য ও দুর্যোগে সহিষ্ণুতা ইত্যাদি প্রচলন করে। ইহাতে প্রত্যেক তরিকার একটি নেতা থাকেন, যিনি তাঁহার আত্মার অন্তর্দৃষ্টি, শৃঙ্খলা, ধার্মিকতা ও মহৎগুণাবলীর দ্বারা এই পদে উন্নীত হন। প্রত্যেক তরিকার খানকাহ্ নামে এক একটি কেন্দ্রস্থল থাকে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রস্থলের একজন নেতা থাকেন, যাঁহাকে শেখ (আরবি), দাদা (তুর্কি) অথবা পীর (ফার্সি) বলা হয়। ভাষান্তরে এগুলির প্রত্যেকটির অর্থ বয়োজ্যেষ্ঠ। নবাগত বা মুরীদ মস্তক মুড়ায় এবং 'আলোক প্রাপ্ত' বলিয়া স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত একটি কঠোর আত্মসংযম, পাঠাভ্যাস, নামাজ ও রাত্রির এবাদতের মধ্যে জীবন-যাপন করে। ধর্মীয় অনুশীলনীর জন্য তাহারা হাল্কা বা বৃত্তাকারে উপবেশন করে এবং ভাবাবেগে নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত কোরআনের একটি বাক্য যিকির বা জোরে জোরে পাঠ করে। কোনো কোনো তরিকায় সঙ্গীতের প্রচলনও রহিয়াছে। সুফী কবিতাগুলি গাহিতে গাহিতে ধর্মীয় উল্লাসে দরবেশগণ নাচিতে আরম্ভ করে ও নিজদিগকে আল্লাহ্র মধ্যে হারাইয়া ফেলে। 'আলোক প্রাপ্তির' পর কেউ কেউ চুল বড় হইতে দেয় এবং ধর্ম প্রচারে আত্ম নিয়োগ করে।

এই তরিকাগুলির সঙ্গে জড়িত থাকে 'সহভ্রাতাগণ' যাহাদের 'আখী' নামে একটি সংগঠন থাকে, যাহা অনেকটা 'অর্থনৈতিক সংস্থার' ন্যায়। তাহারা পীর বা বয়োজ্যেষ্ঠের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, উক্ত তরিকতের প্রচলিত কার্যক্রম ও প্রচারিত উপদেশাবলী পালন করে, যদিও তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত। এই শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত আরেক দল 'সহচর' হইল যোদ্ধাদল বা গাজী। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল 'কাফের' বা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ও ক্রীতদাস লাভ করা। জৈন-বৌদ্ধদের চিন্তাশীল শ্রেণীর শৃঙ্খলা যেরূপ জাপানের সামুরাই যোদ্ধাদলের উৎপত্তিতে উৎসাহ দান করে, প্রায় তদ্রূপ সুফী শ্রেণীগুলির কঠোর আত্মসংযম গাজী যোদ্ধার সৃষ্টি করে, যাহারা নেতার ইচ্ছাকে যেরূপ অন্ধভাবে পালন করে সেইরূপ একান্তভাবে 'ফতোয়া' নামক একগুচ্ছ আইনের অনুসরণ করে। এইসব তরিকার লোকজনকে তাহাদের পাগড়ীতে পরিহিত একটি বিশেষ ব্যাজ অথবা একটি বিশেষ ধরনের কাপড় পরিধানের দ্বারা চেনা যায়। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে এইসব তরিকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ধর্মীয় সন্তুষ্টি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সহায়তা করে। এইসব তরিকায় ধর্ম, বাণিজ্য ও যুদ্ধ একত্রে সন্নিবেশিত হয়। ইহারা আইন ও নেতার প্রতি আনুগত্যে বাধ্য এক শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। তুরস্কের ওসমানীয় বংশ এবং ইরানের সাফাভীয় বংশ উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুফী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্তটি সুন্নী এবং পরবর্তীটি শীয়া। বাইজেন্টাইনের স্ক্রীটেয়ো (Skritoi) নামক একটি দল দ্বারা এইসব গাজী যোদ্ধাগণ প্রভাবিত কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে মোঙ্গলদের আগমন এবং পরবর্তী বসতি স্থাপন, গাজী ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করিয়াছে।

ওসমানীয়দের উৎপত্তি কিংবদন্তীর সহিত মিশ্রিত। তাহারা মধ্য এশিয়ার ওঘুজ তুর্কি বংশোদ্ভূত। ১২৫১ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে কোনিয়ার সুলতানকে সাহায্য দানের পুরস্কার হিসাবে জনৈক ইরতোগ্রীল্কে উত্তর পশ্চিমে আনাতোলিয়ায় একটি জায়গীর প্রদান করা হয়। তাহার পুত্র ওসমান ইসলামের জন্য যুদ্ধকারী একজন গাজী নেতা। পরবর্তীকালে ইউরোপের ভাগ্যের প্রতি হুমকীস্বরূপ এই ঘটনাবলী যখন এশিয়া মাইনরে চলিতেছিল তখন

১২৫০ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং ইউরোপে হলি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক প্রাণত্যাগ করেন। মুরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কার করা হয়। তৃতীয় হেনরী ইংল্যান্ডে রাজত্ব করেন, মস্কোর রাজন্যবর্গ মোঙ্গল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন এবং জেরুজালেম হইতে ক্রুসেডারগণ বিতাড়িত হয়।

আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে ওসমান তাঁহার কার্যাবলী আরম্ভ করেন এবং ২৬ বৎসরের মধ্যে এশিয়া মাইনরের আধুনিক ইস্কি শিহ্র অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তোলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজেকে কোনিয়ার সুলতান হইতে স্বাধীন একজন আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন। অনুরূপ ছোট ছোট গাজী ক্ষুদ্র রাজ্য একইভাবে গড়িয়া উঠে, কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষে ঐগুলির শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। তবে ওসমানের বংশ ছিল একটি ব্যতিক্রম। তাহার বংশধরদের মধ্যে সাঁইত্রিশ জন সুলতান ৬২২ বৎসর পর্যন্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির অন্যতম একটি সাম্রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশধরগণ কখনও তাঁহাকে ভুলে নাই। তাহারা গর্বভরে নিজদিগকে 'ওসমানীয়' বলিয়া অভিহিত করে। অতএব আরবি উচ্চারণ 'ওসমান' থেকে ল্যাটিন অটোম্যান নামের উৎপত্তি হয় এবং প্রত্যেকে সিংহাসনে আরোহণের পর ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে ওসমানের তরবারি স্বীয় কটিতে ঝুলান।

এই ধরনের সুদীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকিবার কারণ সম্পর্কে যে কোনো লোকের মনে কৌতূহল জাগে। কিন্তু তাহার কার্য-কারণ বিবেচনা করিতে গিয়া তাঁহারা ইতিহাসের এমন একটি অমোঘ বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হয় যাহার কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে 'আখী'দের মধ্যে যোদ্ধা 'গাজী'গণ একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি লাভ করে। তাহারা এই শ্রেণীর ধর্মীয় অংশের লোকজনসহ এই সংঘবদ্ধ দলের অন্তর্ভুক্ত, এবং একে অপরের প্রতি ও প্রত্যেকে নেতার প্রতি অনুগত। প্রায়ই উল্লেখিত আরেকটি কারণ হইল ইসলামী বিশ্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভগ্নপ্রায় অবস্থা। এই দুর্বলতা যদিও ওসমানীয়দের ক্ষমতারোহণে সহায়তা করিয়াছে, তবুও ওসমানীয় বিজয়গুলি খুবই সহজ ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। বুরসা নগরী প্রায় ৯ বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিল। তবে ওসমানীয়দের একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ২০০ বৎসরের মধ্যে ওসমানের বংশধরদের একের পর এক আট পুরুষ ছিলেন স্থির সিদ্ধান্তের অধিকারী, উত্তম প্রশাসক এবং স্ব স্ব অধিকারের বলে নেতৃস্থানীয়। এই গুণাবলী তাহাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন সুলতানগণের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে তখন সাম্রাজ্য এত বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে যে ইহা খণ্ড বিখণ্ড হইতে আরও ২০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই শেষ বৎসরগুলিতে 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষটিকে' ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির স্বার্থেই জীবিত রাখা হয় বলিয়া মনে করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বুরসা নগরটি ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে পিতা ওসমানের মৃত্যুর সময় ওরহান অধিকার করেন। এই নগরটিতে ওরহান তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজ্যের বিস্তৃতির প্রতি মনোযোগী হন। গাজী ভ্রাতৃত্ব কোনো জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বরং আনুগত্য ও কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। ফলে নবাগত সবাইকেই তাহারা গ্রহণ করে। তবে শর্ত হইল, তাহাদিগকে মুসলমান হইতে হইবে এবং নেতার প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। উক্ত দশর্নীয় বিজয় লাভের পর অন্যান্য গাজী দলগুলিও ওরহানের সঙ্গে যোগদান করে এবং উত্তরোত্তর তাহার শক্তি বৃদ্ধি করে। তদুপরি ওরহান সম্পূর্ণ বিজ্ঞোচিতভাবে পরাজিত শত্রুকে

ধ্বংস করা বা ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার প্রচলিত ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করেন। 'মহাগ্রন্থের জাতি' হিসাবে এবং চিরাচরিত মাথাপিছু কর প্রদান করিয়া খ্রিস্টান ও ইহুদিকে বসবাস করিতে দেওয়ার মুসলমান ঐতিহ্যকে তিনি গ্রহণ করেন। এই নীতি ধ্বংসের চেয়ে অধিক স্থিতিশীলতা লাভ করে-যেগুলি দুর্বল বাইজেন্টাইন বা যুদ্ধরত দলগুলির অধীনে অতি শোচনীয় অবস্থায় ছিল।-

১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দে ওরহান পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওরহান এক উল্লেখযোগ্য আকারে রাজ্য বিস্তার করেন, তন্মধ্যে বুরসা, ইজনিক (নিকোশিয়া), ইজমিদ (নিকো-মেডিয়া) ও বারজামার (পারগামাম) ন্যায় সমৃদ্ধশালী নগরীগুলি ছিল অন্যতম। অন্যূন তিনটি ঘটনা তাহাকে সহায়তা প্রদান করে। একটি হইল দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাইজেন্টাইনের মধ্যে শত্রুতা। ইহারা হইলেন জন ক্যান্টাকুজেমাস এবং জন পেলিওলোগাস। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগদান করিয়া ওরহান ইউরোপে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি লুণ্ঠন কার্যের জন্য অস্থির গাজীদিগকে থ্রেস ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ছাড়িয়া দেন। ক্যান্টাকুজেমাসের কন্যা থিওডোরাকেও ওরহান বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সাহায্য হইল ব্লাক ডেথ্ নামক এক ধরনের ওলাউঠা রোগ-যাহা ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং যাহা সমগ্র বলকানে ছড়াইয়া পড়ে ও প্রত্যেক কিছুকে ধ্বংস করে। ওসমানীয়দের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য কোনো ক্রুসেডারদের আগমনের সম্ভাবনা থাকিলেও ব্লাক ডেথ্ উহাকে প্রতিরোধ করে। তৃতীয় সাহায্য হইল ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দের ভূমিকম্প-যাহা মার্মারা সাগরের ইউরোপীয় পাড়ে আঘাত হানে এবং গ্যালিপুলি ধ্বংস করে।

১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মুরাদ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হন। দুই বৎসর পর ইদীর্ন (আদ্রিয়ানোপল) তাঁহার করতলগত হয় ও এক শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রের রাজধানী থাকে। ওরহানের এই উচ্চাভিলাষী অশিক্ষিত পুত্রটি তাঁহার আদেশাবলী দস্তখত করিতেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি ও তিনটি আঙ্গুলের ছাপমোহর দ্বারা ; তিনি বিদ্যাশিক্ষা পছন্দ করিতেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমে তিনি বলকান পর্যন্তও অগ্রসর হন। তিনি খুবই চালাক ছিলেন। তিনি খ্রিস্টান রাজ্যগুলির একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের সবাইকে ধ্বংস করিতেন। তিনি বুলগেরিয়া, ম্যাসেডোনিয়া ও সার্বিয়ার কিয়দংশ জয় করেন। এশিয়া মাইনরে তিনি শক্তির মহড়া দেখাইয়া কূটনীতি প্রয়োগ করেন এবং আংকারা অধিকার করেন। তাঁহার সময় সংঘটিত সর্ববৃহৎ যুদ্ধ ছিল সম্ভবত কোসোভোর (১৩৮৯ খ্রিঃ) যুদ্ধ, যদ্বারা সার্বিয়া বিজিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। মুরাদ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বায়েজীদ তাঁহার অর্ধসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন।

বায়েজীদ (১৩৮৯-১৪০২ খ্রিঃ) ছিলেন প্রথম ওসমানীয় যিনি সম্রাটের বেশ ধারণ করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন চতুর, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার প্রাথমিক কার্যাবলীর একটি ছিল নিজেকে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা ইয়াকুবকে গলা টিপিয়া হত্যা করা। ধর্মীয় নেতাদিগকে তিনি এই কাজ কোরআনের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করিতে বাধ্য করেন। এই রীতি ওসমানীয়দের মধ্যে প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশ একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। তাঁহার নিষ্ঠুরতা ও দ্রুত কার্য সমাধার জন্য তাঁহার অধীনস্থ লোকজন তাঁহাকে ইলদেরীম (বজ্রাঘাত) নামে অভিহিত করেন।

তাঁহার সময় কনস্ট্যান্টিনোপল স্থলভাগে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সমুদ্রের দিক

হইতে এই নগরী অবরোধ করিবার মতো যথেষ্ট নৌশক্তি ওসমানীয়দের ছিল না। তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগকারী নাবিক গাজীদের সহায়তায় বায়েজীদ ১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে একটি নৌবাহিনী গঠনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁহার নৌবাহিনী আদ্রিয়টিকের উপকূলভাগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তাঁহার সেনাবাহিনী স্থলভাগে নিকোপোলিসের দিকে অগ্রসর হয়। এইসব বিজয় হাঙ্গেরীর রাজা সিজিসমণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে এবং তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইউরোপের অন্যান্য অংশের নাইটদিগকে মিলিত করিয়া একটি ক্রুসেডের আয়োজন করেন। প্রসিদ্ধ নিকোপোলিসের (১৩৯৬ খ্রিঃ) যুদ্ধে ইউরোপীয়-গণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের শত শত অভিজাতবর্গ বায়েজীদের করতলগত হয়। 'ক্রুসেড' আয়োজনের ইহাই বোধ হয় শেষ প্রচেষ্টা; কিন্তু ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিবার শেষ প্রচেষ্টা নহে। তবে বিজয়ী সুলতান তাঁহার অভিযান ইউরোপের পশ্চিম দিকে পরিচালনা না করিয়া দক্ষিণে গ্রীসের দিকে পরিচালনা করেন।

যাহা হউক, বায়েজীদের অন্তর গ্রীসের চেয়ে এশিয়া মাইনরেই বেশি নিবদ্ধ ছিল। তিনি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বজনস্বীকৃত শাসক হইতে চাহেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা নিজদিগকে 'সুলতান' উপাধিতে পরিচয় প্রদান করিলেও তিনি কায়রোতে ক্রীড়নক খলিফার সরকারি অনুমোদন প্রত্যাশা করেন। বাগদাদের পতনের পর মামলুক শাসকগণ তাহাদের অক্ষমতাকে বাহ্যত সম্মান দান করিবার জন্য হালাকুর সৈন্যদের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত পলাতক আব্বাসীয় পরিবারের একজন সদস্যকে লইয়া যান এবং খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে এশিয়া মাইনর জয় করা ছিল গাজী ঐতিহ্যের বিরোধী। গাজীগণ তাহাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা অপছন্দ করিতেন, বিশেষত ভ্রাতৃসংঘগুলির অধীন গাজীদের বিরুদ্ধে। মুরাদ আংকারা অভিমুখে অগ্রসর হন - অধিকাংশ ক্ষেত্রে কূটনীতির দ্বারা, কিন্তু বায়েজীদের অত ধৈর্য ছিল না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি খ্রিস্টান ভাড়াটিয়া সৈন্য আনিতে বাধ্য হন, যাহা এশিয়া মাইনরের গাজী রাষ্ট্রগুলিকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তোলে। বায়েজীদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাহাদের কেউ কেউ মিসরের মামলুকদের শরণাপন্ন হয়, এবং অন্যান্যরা এক নূতন বিজয়ী তৈমুরের সাহায্য প্রার্থনা করে। পূর্ব দিগন্তে তখন তৈমুরের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

মামলুকগণ

এই অদ্ভুত এবং অতুলনীয় ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালকমণ্ডলী ছিলেন কতিপয় দাস সমষ্টি যাঁহারা ১২৫০ হইতে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে মাত্র কয়েকজন শাসক মিসরের লোকদের জন্য শান্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অন্যথায় মামলুক আধিপত্য দেশের জন্য ধ্বংস ও জনসাধারণের জন্য দুঃখ-দুর্দশাই আনয়ন করিয়াছে। বস্তুত মিসরের জনসাধারণের ইতিহাস বোধ হয় সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার ইতিহাস। ফেরাউনদের পতনের পর হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মিসর পরস্পরবিরোধী এবং সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন জাতি দ্বারা শাসিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে মামলুকগণ ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

মামলুকগণের কোনো বংশ ছিল না। কারণ তাহাদের মধ্যে কোনো পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইহা ছিল ক্রীতদাসের কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্র - যাহাতে গড়ে এক একটি রাজত্বকাল ছিল পাঁচ বৎসর। শক্তিশালী

কোনো শাসকের মৃত্যুতে (প্রায়ই সংঘর্ষমূলক) বাকি ক্রীতদাসগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতার জন্য একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত। ক্ষমতায় সমাসীন থাকিবার জন্য দাস সুলতান আমীরদিগকে জমি ও সুবিধাদি দান করেন। এই আমীরগণও ছিলেন দাস এবং নিজেরাও দাস রাখিতেন।

মামলুক সুলতানগণ সাধারণত দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটিকে বলা হয় বাহ্‌রী (সমুদ্র), যাহারা ১২৫০-১৩৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ইহারা ছিলেন অধিকাংশ তুর্কি ও মোঙ্গল ক্রীতদাস। অন্যটি ছিল বুর্জী (দুর্গ), ১৩৮২ হইতে ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যাহাদের শাসন বাহরীদের শাসনকে কিঞ্চিত ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা ছিলেন অধিকাংশই কার্কাশিয়ান ক্রীতদাস, মাত্র দুইজন ছিলেন গ্রীক ক্রীতদাস। প্রত্যেক মামলুক জানিতেন যে, সুলতান হিসাবে তাঁহার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। অতএব তিনি অপব্যয়ের মাধ্যমে বিলাসবহুল জীবনযাপন করিতেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। মামলুক যুগে নির্মিত এবং এখনও বিদ্যমান কতিপয় অতি মনোমুগ্ধকর ইমারত প্রমাণ করে যে, অন্ততপক্ষে ইহাদের কয়েকজন উন্নত জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন।

মামলুক সুলতানগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দুইজন ছিলেন বাইবার্স (১২৬০-১২৭৭ খ্রিঃ) ও কালাউন (১২৭৯-১২৯০ খ্রিঃ)। বাইবার্স মোঙ্গল হালাকুর অগ্রগতি প্রতিহত করেন এবং ক্রুসেডারদিগকে একটি শোচনীয় আঘাত প্রদান করেন। কালাউন সিরিয়া শাসন করেন এবং কায়রোতে সে যুগের একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করেন। ইহা একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম যে, এতসব রক্তক্ষয় ও গোলযোগের মধ্যে মিসর সমগ্র ইসলামী বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হয়। কায়রো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হয়, যাহা লোহিত সাগরে পণ্য-সামগ্রী আনয়ন করে এবং সেখান হইতে উটের কাফেলায় ভূমধ্যসাগর লইয়া যায়। এই ক্রীতদাস সুলতানগণ আরবি শিখিবার কষ্ট স্বীকার করে নাই, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বাহ্যত সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করেন। সম্ভবত তাহারা নিজেদের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সমাধি ও মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত হন এবং এইভাবে ইসলামী বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে তাঁহাদের অবদান রাখিয়া যান। এই সমাধিগুলির মধ্যে অতি মনোমুগ্ধকর হইল কায়েতবে কর্তৃক নির্মিত ভাস্কর্য -যিনি ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

সম্মান বৃদ্ধির জন্য এবং অন্ততঃপক্ষে তাঁহার শাসন ক্ষমতাকে আইনানুগ করিবার জন্য, বাইবার্স নিহত আব্বাসীয় খলিফার একজন চাচাকে হস্তগত করেন, যিনি মোঙ্গলদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যান। বাইবার্স তাঁহাকে বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে খলিফা আল মুসতানসির নামে অভিষিক্ত করেন। পরে তিনি নূতন খলিফাকে লইয়া বাগদাদ জয় করিতে বাহির হন। মুসতানসির মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। অকুতোভয় বাইবার্স আব্বাসীয় বংশের আরেকজন সদস্য লাভ করেন এবং তাঁহাকে খলিফা আল-হাকিম নামে অভিষিক্ত করেন। হাকিম ও তাঁহার বংশধরগণ কায়রোতে মামলুকদের ক্রীড়নক হিসাবে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কাজ ছিল ধর্মীয় দানসমূহ পরিচালনা করা এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারী মামলুক সুলতানদের অভিষেক করা। এই 'খলিফাদের' একজন প্রথম বায়েজীদকে সুলতানের ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন।

তৈমুর

তৈমুর ১৩৩৬ খ্রিস্টাব্দে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কোনো এক যুদ্ধে তাঁহার এক পা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয় এবং তিনি খোঁড়া (ফার্সি, লঙ্গ) হইয়া যান বলিয়া তিনি তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত হন, যাহা ইউরোপীয় ইতিহাসে তামারলেন হইয়া যায়। তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম- যাহারা দাম্ভিক নৃপতিদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে আনন্দ লাভ করেন। তিনি যুদ্ধ করেন ও ধ্বংস করেন এবং কদাচ পরাজিত হন। স্থিতিশীল সাম্রাজ্যের কথা দূরে থাক, একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করিবার পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। অধিকাংশ পরবর্তী মোঙ্গল সম্রাটদের ন্যায় মনুষ্যজীবনের প্রতি তাঁহার বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। কেউ কেউ ছিল অন্যান্যদের চেয়েও অধিক শোচনীয়। তৈমুর মানুষের মাথা দিয়া পিরামিড নির্মাণ করিতে পছন্দ করিতেন- ইহা এক প্রকারের অভ্যাস যাহা তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ অনুসরণ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন শিল্পকলা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক এবং কোনো কোনো সময় তাঁহার শত্রুদের প্রতিও তিনি মহত্ত্ব প্রদর্শন করেন। সম্ভবত তাঁহার একটি মাত্র ভালবাসার বস্তু ছিল, তাহার সমরকন্দ নগরী। অন্যত্র প্রত্যেক স্থানের ধ্বংস সাধন করিয়া তিনি সমরকন্দ ও প্রতিবেশী বোখারা নির্মাণ করেন। সমরকন্দে এখনও তাঁহার সমাধি বিদ্যমান কিন্তু আর কিছু অক্ষত নাই।

চেঙ্গিস খান এবং বহু সংখ্যক তুর্কি সেনাপতিদের তুলনায় তৈমুর ছিলেন শিক্ষিত,এবং সাহিত্যে তাঁহার অতি সুন্দর জ্ঞান ছিল। দুই খণ্ড স্বরচিত জীবনচরিত তাঁহার কৃতিত্ব বহন করে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচয়িতার বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও এই দুই খণ্ড গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার রাজত্ব বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ 'আমার জীবনের দ্বাদশ বৎসর হইতে আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি, সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করি, দুঃসাহসিক কার্য সমাধা করি ও বহু সেনাবাহিনীকে পরাজিত করি। বিপদের সময় আমি আমার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শেষ পর্যন্ত আমি বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করি এবং আমার নামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করি।"

তৈমুর সোনালী বাহিনীর বিরুদ্ধে মস্কোর যুবরাজদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন। ১৩৮৮-১৩৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি উত্তরে সোনালী বাহিনীর লিথুয়ানিয়ান ও মস্কোবাসীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি মস্কোর উপকণ্ঠে উপনীত হন এবং ভ্যাসিলির (১৩৮৯-১৪২৫ খ্রিঃ) নিকট হইতে কর আদায় করেন। এই লোকটি সোনালী বাহিনীকে পর্যুদস্তকারী প্রথম মস্কোবাসী যুবরাজ দিমিত্রি দন্স্কয় এর পুত্র। সেখান হইতে তিনি ইরাক গমন করিয়া বাগদাদ ধ্বংস করেন এবং মিসরের মামলুকদের নিকট হইতে সমগ্র সিরিয়া ছিনাইয়া লন। অতঃপর তিনি গাজীদিগকে বায়েজীদের বিরুদ্ধে সহায়তা করিবার মত অবস্থায় উপনীত হন।

তৈমুরের শেষ অভিযান ছিল বায়েজীদের বিরুদ্ধে। সম্ভবত ইহাই তাঁহার সর্ববৃহৎ অভিযান। কারণ মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে ইরান ও সিরিয়ার অন্য কোথাও তৈমুর ওসমানীয়দের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত এরূপ কোনো রাষ্ট্রের মোকাবিলা করেন নাই, ১৪০২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে জুলাই সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বায়েজীদ পরাজিত ও বন্দী হন। তৈমুর সমগ্র এশিয়া মাইনর পদানত করেন এবং পশ্চিমে স্মার্না পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর পাছে পালাইয়া যায়

সেইজন্য তাঁহার বন্দী বায়জীদকে একটি লৌহ নির্মিত খাঁচায় করিয়া তিনি সমরকন্দ গমন করেন। পথিমধ্যে বায়েজীদ প্রাণত্যাগ করেন। মৃতদেহ সমরকন্দে পৌছাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

এশিয়া মাইনর ও বলকানে ওসমানীয় তুর্কিদের প্রতিষ্ঠা লাভ ছিল ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও ব্যবসায়ীদের জন্য একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হুমকিস্বরূপ। প্রথম হইতে পূর্বাঞ্চলে ওসমানীদের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিতে চেষ্টা করে। ক্যাস্টিলের তৃতীয় হেনরী (১৩৯০-১৪০৬ খ্রিঃ) ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে স্পেনের খ্যাতি ছড়াইবার জন্য তৈমুরের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তৈমুর বাণিজ্য সম্পর্কের প্রস্তাব সমেত ইংল্যাণ্ডের চতর্থ হেনরীর (১৩৯৯-১৪৬১ খ্রিঃ) নিকটও একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র ও হেনরীর উত্তর আদান-প্রদান করেন "আর্চবিশপ জন" নামক একজন ইংরেজ ধর্মযাজক, যিনি তাব্রিজে বাস করিতেছিলেন।

ইরানে আগত ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বোধ হয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন রায় গঞ্জালেস ডি ক্ল্যাভিজো-যিনি তৈমুরের দূতের সঙ্গে সমরকন্দ প্রত্যাবর্তনের পথে ভ্রমণ করেন। এই ব্যক্তি তাঁহার অভিজ্ঞতাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেন হইতে বাহির হন এবং লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাসমূহের পর তাব্রিজে পৌছেন। চিরাচরিত কাফেলার পথ ধরিয়া তিনি তেহরান, নিশাপুর, মাশহাদ ও অতঃপর সমরকন্দে গমন করেন, যাহা তাঁহার কাছে 'সেভীলের চেয়েও বড়' বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই প্রতিনিধি ও তাঁহার দলবল সমরকন্দে তৈমুরের অতিথি হিসাবে বাস করেন। ব্যাবিলন, মিসর ও চীন হইতে আগত অন্যান্য প্রতিনিধি দলও তথায় ছিল। ক্লাভিজো কর্তৃক পুনঃ পুনঃ উল্লেখিত খাদ্য তালিকার একটি ছিল ঘোড়ার মাংস, যাহা তুর্কমানদের অতি সুস্বাদু খাদ্য ছিল। ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ হইলেও মধ্য এশিয়ার তুর্কিগণ আজীবনের এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। ক্লাভিজো সমরকন্দের সুন্দর উদ্যানসমূহের ও শহরতলীর কথা বর্ণনা করেন, বাজারের বাণিজ্য সম্ভারের ভূয়সী প্রশংসা করেন-যাহার মধ্যে রহিয়াছে রাশিয়ার লিলেন কাপড় ও চামড়া, চীনের সিল্ক ও কস্তুরী এবং ভারতবর্ষের মসল্লা। ক্লাভিজো যেইভাবে আসিয়াছিলেন সেইভাবেই স্পেনে ফিরিয়া যান, এবং ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তৃতীয় হেনরীর দরবারে হাজির হন, কিন্তু ততদিনে তৈমুর পরলোক গমন করেন।

আংকারার যুদ্ধের পূর্বে তৈমুর যখন সিরিয়ায় ছিলেন তিনি উত্তর আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর চাইতে তাঁহার ইতিহাসের ভূমিকা অনেক বেশি প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ ভূমিকা বা মুকাদ্দিমা পাশ্চাত্যের ৫০০ বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত করে। তিনি ইতিহাসে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। গবেষণায় তাঁহার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান ও ব্যাখ্যা তাঁহাকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ঐতিহাসিকদের সঙ্গে স্থান দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি বিশ্বাস করেন যে, ইবনে খালদুনের ভূমিকা "এই পর্যন্ত সৃষ্ট যে কোনো সময় বা স্থানের যে কোন চিন্তাবিদের কার্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ।"

ইবনে খালদুন মামলুক সুলতান ফারাজের অধীনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি তৈমুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া শান্তির সন্ধানে ছিলেন। তৈমুর কৌশলী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে

সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট করিতেন না। তিনি ইবনে খালদুনের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইসব সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহাতে তৈমুরকে উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে মোটামুটি বিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পরে তিনি ইবনে খালদুনকে মিসর ও উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে বলেন। ইবনে খালদুন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন কিন্তু তিনি দিগ্বিজয়ীর নিকট তাঁহার ইতিহাসের দর্শন ব্যাখ্যা করিতে উদগ্রীব হইয়া পড়েন যাহা আসারিয়া মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। এই মতবাদকে কেউ কেউ 'জাতীয়তাবদ' নামে অভিহিত করেন, কেউ কেউ 'দলীয় একাত্মতা নামে, আবার কেউ কেউ 'সামাজিক একাত্মতা' নামে অভিহিত করেন। শাসনকারী লোকদের এই একাত্মতার জোরে সভ্যতাসমূহের উত্থান পতন হয়। কোনো সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিতে দলীয় একাত্মতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এই সভ্যতাই আবার একাত্মতাকে দুর্বল করিবার মূলে কাজ করে যাহা সেই সভ্যতার পতনের কারণ হইয়া পড়ে।

ইবনে খালদুন সম্ভবত মনে করেন যে, প্রাচীন তুর্কিদের মধ্যে যেহেতু 'সামাজিক একাত্মতা' বিদ্যমান ছিল সেহেতু ইসলামী সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে তৈমুরই ছিলেন সর্বোত্তম। কিন্তু তৈমুর ইহাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, যদিও তিনি ঐতিহাসিককে তাঁহার ভাষণ দিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

ইবনে খালদুন নিশ্চয়ই খুবই নিরাশ হন যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, তৈমুর ঐতিহাসিকের 'দলীয় একাত্মতার' নীতির চাইতে তাঁহার খচ্চরের প্রতিই অধিক আগ্রহী। তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎকারে তৈমুর ইবনে খালদুনের খচ্চরের প্রশংসা করেন বলিয়া ঐতিহাসিক অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উহা দিগ্বজয়ীকে উপহার প্রদান করেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে তৈমুরের সঙ্গে যাইতে কিছুটা আগ্রহান্বিত মনে হয়। বোধ হয়, দিগ্বিজয়ীকে তাঁহার প্রিয় নীতিতে উদগ্রীব করিতে তখনও আশাবাদী ছিলেন। বস্তুত ইবনে খালদুন বলেন যে, কায়রো যাইতে তাঁহার কোনো ইচ্ছাই নাই, এতদসত্ত্বেও তৈমুর তাঁহাকে বিদায় করেন।

আংকারার যুদ্ধের তিন বৎসর পর ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর প্রাণত্যাগ করেন। বায়েজীদের মুসলিম বিশ্ব শাসন করিবার স্বপ্ন ভাঙিয়া খান খান হইয়া যায় এবং মনে হয় ওসমানের বংশ অতর্কিতে শেষ হইয়া গেল। তবে, তৈমুরের পুত্রগণ এশিয়া মাইনর শাসন করিতে ব্যর্থ হন। বায়েজীদের অনেকগুলি পুত্র একে অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছু সংখ্যক গাজী আমীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অন্যরা বায়েজীদের বিবদমান পুত্রগণকে সমর্থন করেন। অবশেষে মুহম্মদ যুদ্ধ জয় করিয়া সিংহাসন লাভ করেন এবং ওসমানের বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

তৈমুরের বংশধরগণ ছিলেন তাঁহার ব্যতিক্রম। তাঁহারা নিজদিগকে দেশ জয়ের যুদ্ধে জড়িত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় তাঁহারা ছিলেন অকৃতকার্য প্রশাসক। তাঁহার পুত্র শাহরুখ ছিলেন খোরাসানের একজন উত্তম ও গুণী শাসক। একজন পৌত্র ইব্রাহীম শিরাজে সাহিত্যে উৎসাহ দান করেন। আরেকজন পৌত্র হোসাইন হিরাতে বিদ্যাশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জামী ও মীরখন্দের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলাম ও সাহিত্য আলোচনা করেন। আরেকজন পৌত্র উলুঘ বেগ যিনি সমরকন্দে শাসন কার্য পরিচারনা করিতেন, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জ্যেতিষশাস্ত্রবিদ, যাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নকশাগুলি ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে

লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং অত্যন্ত সঠিক ও এই ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান পাশ্চাত্যের নিকট অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাহা সত্ত্বেও তৈমুর দেড়শত বৎসরের জন্য সামন্ত যুদ্ধের সূচনা করেন এবং ইরানের জাগরণ ব্যাহত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর ইরানে দুইটি তুর্কি দলের আবির্ভাব হয়। একটি হইল কারা কয়ুনলু (Qara Qoyunlu) বা কৃষ্ণ মেষপালক (Black sheepmen) (১৩৭৮-১৪৬৯ খ্রিঃ) যাহাদের ভূখণ্ড তৈমুর কর্তৃক বিজিত হয় এবং তাহারা তাঁহার নিকট কর দিতে বাধ্য হয়। তবে বিজয়ীর মৃত্যুর পর তাহারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া নিজদিগকে তাব্রিজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বাগদাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আরেকটি হইল আক কয়ুনলু (Aq Kyunlu) বা শ্বেত মেষপালক (White sheepmen) (১৩৭৪-১৫০২ খ্রিঃ) যাহাদের শ্রেষ্ঠ নেতা উজুন (লম্বা) হাসান (১৪৪৩-১৪৭৮ খ্রিঃ) একটি রাজ্য গঠন করেন। ততদিনে কনস্টান্টিনোপলের পতন হয় এবং ইউরোপ পূর্বের চেয়ে আরও অধিক তুর্কি ভয়ে ভীত হয়। তাহারা তখনও ওসমানীয়দিগকে পূর্বদিক হইতে আক্রমণ করিতে পারে এমন একটি বন্ধুরাষ্ট্রের খোঁজ করিতে থাকে। তৈমুরের সাহায্য লইয়া ইউরোপীয়গণ যাহা করিতে চাহিয়াছিল তাহাই তাহারা উজুন হাসানের সাহায্যে লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে ভেনিস আগাইয়া আসে এবং উজুন হাসানের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন ক্যাটারিনো জেনো যাহার শাশুড়ী ছিলেন উজুন হাসানের স্ত্রী থিওডোরার বোন। উজুন হাসান জেনোকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ১৪৭৮ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে কোনো ফল হয় নাই। দ্রুত যোগাযোগের অভাবে এবং অস্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতে ওসমানীয়দের উপর সংঘবদ্ধ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের একমাত্র লাভ হইল এই যে, বহুসংখ্যক পারস্য ধাতু কারিগর ভেনিসে বসতি স্থাপন করে এবং তাহাদের শিল্পের নিদর্শন তৈয়ার করে। পরে নুরেমবার্গ অ্যাসবার্গের ন্যায় কেন্দ্রসমূহে এই নমুনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপের স্বর্ণ ও রৌপ্যকারগণ এইগুলি নকল করেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ওসমানীয় সাম্রাজ্য

মুহম্মদ ১ম (১৪১২-১৪২১)	সেলিম ১ম (১৫১২-১৫২০)
মুরাদ ২য় (১৪২১-১৪৫১)	সোলাইমান (১৫২০-১৫৬৬)
মুহম্মদ ২য় (১৪৫১-১৪৮১)	সেলিম ২য় (১৫৬৬-১৫৭৪)
বায়েজীদ ২য় (১৪৮১-১৫১২)	মুরাদ ৩য় (১৫৭৪-১৫৯৫)

আহম্মদ ১ম (১৫৯৫-১৬০৩)

বায়েজীদের[১] বন্দী হইয়া মৃত্যুবরণ, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এবং এশিয়া মাইনরে ওসমানীয় আধিপত্যের অবসানের আশংকা প্রতীয়মান হয়। দশ বৎসর পর্যন্ত বায়েজীদের চারি পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। পুত্রগণ হইলেন মুসা, ঈসা, মুহম্মদ ও সোলাইমান। এশিয়া মাইনরের গাজী আমীরগণ কোনো এক পক্ষ অবলম্বন করে অথবা তাহাদের স্বাধীন পথে চলিতে থাকে। সংঘর্ষের প্রথম দিকে ঈসাকে সরাইয়া ফেলা হয়। কিছুকালের জন্য মনে হইল সোলাইমানই জয়ী হইতেছেন, কারণ রাজধানী ইদীর্নের সভাসদবৃন্দ তাঁহাকে সমর্থন করেন। তবে মুসা ও মুহম্মদ তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা একত্রিত হইয়া সোলাইমানকে হত্যা করে। জীবিত দুই ভ্রাতা অতঃপর একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ওসমানীয় শক্তির মৌলিক ভিত্তিসমূহের প্রতি যিনি সমধিক আস্থাশীল ছিলেন তিনিই জয়ী হন। মুসা ছিলেন বিপ্লবাত্মক আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বাহর আল-দ্বীন সিমাওনার প্রভাবে আসেন এবং তাঁহাকে ইউরোপে প্রধান কাজী নিযুক্ত করেন। সিমাওনা ম্যানিকায়ান সমন্বয়বাদের প্রভাবে আসেন এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় একটি একক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুসা জনসাধারণের জন্য কল্যাণকর মতাদর্শ পোষণ করিতেন। সম্ভবত বায়েজীদ স্বয়ং তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্মগুলি ও জাতীয়তাসমূহ একত্রিত করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে তাঁহার নামকরণ করেন - মুসা (মোজেজ- ইহুদি ধর্ম), ঈশা (জেসাস-খ্রিস্টান ধর্ম), মুহম্মদ (ইসলাম), কাসিমীর (বলকান), ইরতোঘরিল (তুর্কি)। এই ধরনের ভাব অধিকাংশ তুর্কির জন্য ছিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তদুপরি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী, যাহারা জায়গীর ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের জন্য মুসার কল্পিত ত্যাগ স্বীকার করার পক্ষপাতী ছিলেন না।

অপরদিকে মুহম্মদের সবকিছুই ছিল তুর্কিদের পছন্দসই। তিনি গাজী ঐতিহ্য ও যুদ্ধের গুণাবলী পুনর্জীবিত করেন যেইগুলি মূলত ওসমানীয়দের শক্তির উৎস ছিল। শক্তিশালী গাজী

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫১।*

ও সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে মুহম্মদ ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতাকে পরাজিত করেন, এবং ইদীর্নে ওসমানীয়দের সুলতান হিসাবে অভিষিক্ত হন। তৈমুরের আগমন ওসমানীয় অগ্রগতিতে একটি বিরক্তিকর বিরতি বলিয়াই প্রমাণিত হয়। তৈমুর ওসমানীয় সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন নাই। মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসিতেই ইহাকে ব্যবহার করেন। ওসমানীয় সুলতানাত একটি সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং মুহম্মদ সেই ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করেন।

ওসমানীয় সেনাবাহিনী

সিংহাসন লাভ করিয়াই মুহম্মদের কাজ সম্পূর্ণ হইল না। এশিয়া মাইনরের তুর্কিগণ কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজি ছিল না। গাজী আমীরগণ প্রথমত এবং প্রধানত তাহাদের নিজেদের স্বাধীন কর্মধারা বজায় রাখিতে উদগ্রীব ছিলেন। আর অন্যদিকে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ঘৃণা করিতেন। ওরহান কর্তৃক গঠিত জান-নিসারী বাহিনী এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী যদি না থাকিত তবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হইত না।

ওসমানীয় সেনাবাহিনীর অন্তঃস্থলে ছিল জান-নিসারী বাহিনী (তুর্কি, 'ইয়ুনী সেরী' নূতন সেনাবাহিনী)। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধাশক্তিতে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গাজীগণ ঐসব নবাগত যাহারা তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধবন্দীদিগকে তাহারা ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম এবং সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। ওরহান এই নিয়মের প্রসার বৃদ্ধি করেন এবং পরে ধর্মীয় নেতাদের অনুমতিক্রমে রাজত্বের খ্রিস্টান জনগণকে তাহাদের পুত্রদের একশতাংশ কর হিসাবে দান করিতে বাধ্য করেন। ইহাদিগকে শৈশব হইতেই তাহাদের খ্রিস্টান পিতা-মাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইত এবং মুসলমান হিসাবে লালন-পালন করা হইত; তাহাদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইত না এবং তাহারা শুধুমাত্র সুলতানের প্রতি অনুগত থাকিত। ইহাদের মধ্য হইতে সুযোগ্যদেরকে রাজদরবারে বালকভৃত্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত এবং প্রশাসনিক উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইত। বাকিগুলিকে জান-নিসারী বাহিনীতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত। এই বাহিনীকেই ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনী বলা যায়। সুলতানের ক্রীতদাস হিসাবে ইহারা তাঁহার নিজস্ব হুকুমবরদার ছিল এবং ধর্মীয় নেতাদের কোনো উল্লেখ ছাড়াই তিনি যেইভাবে ইচ্ছা ইহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারিতেন।

স্বয়ং সুলতানের ন্যায় ইহাদের সবাইকে বক্তাশী দরবেশ তরিকায় দীক্ষিত করা হইত। তাহাদের উর্দিও ছিল বক্তাশীদের ন্যায়। তাহাদের শিরস্ত্রাণ ছিল সাদা পশু-লোমস বস্ত্রের, যাহার উপর হইতে একখণ্ড সাদা কাপড় কাঁধের উপর ঝুলানো থাকিত। এই কাপড় খণ্ডের উপর একটি চামচ আঁকা থাকিত, যদ্বারা বুঝানো হইত যে তাহাদের জীবিকা সুলতান হইতে আসে। প্রত্যেকে নিজ নিজ খাদ্য বহন করিবার থলিকে খুবই মূল্যবান মনে করিত, এবং শত্রুর নিকট ইহা হারানোকে খুবই অপমানজনক মনে করা হইত। তাহাদের অধিনায়ককে বলা হইত 'আগা'।

জান-নিসারী সর্বদাই ছিল পদাতিক বাহিনী এবং ইহাদের সহায়তায় থাকিত আযার নামে একটি অনিয়মিত পদাতিক বাহিনী। ঘোড়-সওয়ার বাহিনী তিনভাগে বিভক্ত ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিপাহী, যাহাদিগকে সামন্ত প্রভুগণ সরবরাহ করিত। সামন্ত প্রভুগণকে কোনো যোগ্য কাজের জন্য অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য জমি প্রদান করা হইত; দ্বিতীয়ভাগে ছিল আকিঞ্জী নামক রিজার্ভ ঘোড় সওয়ার বাহিনী, যাহাদিগকে যুদ্ধের সময় তলব করা হইত এবং ইহাদের কর্তব্য ছিল অগ্রে গমন করা এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা। প্রত্যেক ঘোড়-সওয়ারকে দুইটি ঘোড়া প্রদান করা হইত; তৃতীয়ভাগে ছিল রাজকীয় ঘোড় সওয়ার বাহিনী যাহা সর্বদা সুলতানকে ঘিরিয়া থাকিত। সাধারণত পদাতিক, ঘোড়-সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীতে বার জন অধিনায়ক থাকিত যাহারা 'বীরুন আঘালেরী' (বহিঃপার্শ্বের অধিনায়ক) নামে একটি পরিষদ গঠন করিত। অপরদিকে যেইসব অফিসারগণ দরবার রক্ষা করিত তাহাদিগকে বলা হইত 'আন্দেরুন আঘালেরী' (অন্দর অধিনায়ক)। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুইজন প্রধান সেনাপতি (বেলারবে) নিযুক্ত করা হয়, একজন ইউরোপের জন্য এবং আরেকজন এশিয়ার জন্য। পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর-ধনুক, ছোরা, রাইফেল এবং মুখোমুখি যুদ্ধের একটি ছোট তরবারি। ঘোড়-সওয়ার বাহিনী বর্শা ও লাঠি বহন করিত।

এই শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্রের সাহায্যে মুহম্মদ এশিয়া মাইনরে স্বাধীন তুর্কি নেতাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যকে পুনরায় একীভূত করেন। ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মুরাদ ইদীর্নে আসিয়া ক্ষমতা হাতে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। মুরাদ কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহের দরুন তাঁহার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। তাঁহার পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনায় এবং তাঁহার পুত্রের ব্যতিক্রমে, দ্বিতীয় মুরাদ ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সুলতান। তিনি তাঁহার পুত্রের পক্ষে দুইবার পদত্যাগ করেন কিন্তু জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। তুর্কি ভাষার উৎকর্ষ ও তাঁহার পুত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন।

তুর্কি ভাষা 'আলতাইক' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। মুসিলিম বিশ্বে যোগদানের সময় তুর্কিরা নিজেদের সঙ্গে কোনো লিখিত গ্রন্থ আনয়ন করে নাই। তাহারা তুর্কি ভাষায় কথা বলিত কিন্তু যোগাযোগের ভাষা ছিল ফার্সি এবং প্রায় সমস্ত তুর্কি রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন দ্বি-ভাষী। সেলজুকগণ এশিয়া মাইনরে আসিবার সময় নিজেদের সঙ্গে একটি তুর্কি ব্যাকরণ আনয়ন করে, যাহা ১০৭৪ খ্রিস্টাব্দে জনৈক মুহম্মদ কাশ্কাই প্রণয়ন করেন। তবে সেলজুকগণও ফার্সি ভাষায় তাহাদের দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করে এবং এই ভাষাকে সাংস্কৃতিক ভাষা বলিয়া মনে করে। মোঙ্গলগণ কর্তৃক ইরান ধ্বংস হইবার পর এশিয়া মাইনরের ওঘুজ তুর্কিগণ অন্যান্যদের নিকট লিখিত ভাষার প্রবর্তন করে। ইহাতে আরবি ও ফার্সি হইতে ধার করা অনেক শব্দ রহিয়াছে। পারস্যের সুফী কবি রুমী, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোনিয়ায় তাহার আবাস নির্মাণ করেন - সম্পূর্ণ ফার্সি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাহার পুত্র, সুলতান ভেলেদ একজন কবি, তুর্কি ও ফার্সি উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

মুরাদ তাঁহার ওসমানীয় পূর্বপুরুষদের ইতিহাস তুর্কি ভাষায় লিখিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং তুর্কি ও ফার্সি উভয় ভাষায় কবিতা লিখিতেন।

সমগ্র পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আরবি ছিল ধর্মীয় ভাষা, ফার্সি ছিল কবিতার ভাষা। অল্পবিস্তর ইহা যোগাযোগের ভাষাও ছিল। তুর্কি ছিল জনগণের সাধারণ ভাষা ও সামরিক আদেশের ভাষা।

মুহম্মদ ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তিনি একটি প্রসিদ্ধ বিজয় ও দুইটি পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তবে তিনি তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ বিজয়ের জন্য সুপরিচিত। কনস্টান্টিনোপল অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে ফাতিহ (বিজয়ী) উপাধি দেওয়া হয়। সুলতান হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই নগরী অধিকার করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবরোধ আরম্ভ হয় ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এবং ইহা ৫৩ দিন স্থায়ী হয়। নগরের দেওয়ালে বিরাট বিরাট পাথরের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। সোনালী শৃঙ্গের (Golden Horn) প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ছিল, ফলে তুর্কিগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। ৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কিয়েভের ভ্যারানজিয়ানগণ কর্তৃক অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া মুহম্মদ ৭০টি জাহাজকে চর্বিযুক্ত সড়কে পাহাড়ের উপর টানিয়া তুলিতে আদেশ দেন এবং বেড়ীর পশ্চাৎভাগে শৃঙ্গের (Horn) উপর ছাড়িয়া দেন। এই ধরনের ঘটনা নগরের অধিবাসীবৃন্দ আশা করে নাই। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে ২৯শে মে তুর্কি বাহিনী দেওয়ালের একটি স্থান ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সম্রাট প্যালিওলোগস, যিনি পোপের সাহায্য পাইলে ক্যাথলিক হইয়া যাইতে সম্মত হইয়া নাগরিকদের বিরাগভাজন হন, তিনি নিহত হন এবং ঐদিন অপরাহ্নে মুহম্মদ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি সরাসরি হ্যাজিয়া সফিয়া নামক বিরাট গীর্জায় গমন করেন এবং ইহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন।

মুহম্মদ নিশ্চয়ই কনস্টান্টিনোপলে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ চিরাচরিত ধ্বংস সাধন তিনি বেশিদিন স্থায়ী হইতে দেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি একটি সৈন্যকে হ্যাজিয়া সফিয়া হইতে একটি মোজাইক পাথর সরাইয়া ফেলিতে দেখেন এবং তাহাকে এই বলিয়া হত্যা করেন যে, "আমি বন্দী ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলি আমার অনুসারীদিগকে দিয়াছি, কিন্তু ইমারতগুলি আমার।" অধিকাংশ গীর্জাগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তিনি নগরে তুর্কি ও খ্রিস্টানদিগকে বসতি স্থাপন করিতে দেন। অর্থোডক্স চার্চের ধর্মযাজকদের মৃত্যু হইলে তিনি একটি নূতন ধর্মযাজক নির্বাচন করিতে আদেশ দান করেন এবং বাইজেন্টাইন সম্রাটদের রীতি অনুসারে তিনি তাহাকে একটি সোনার 'ক্রুশ' দান করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাগদাদের পতনের ন্যায় কনস্টান্টিনোপলের পতন ছিল একটি চরম আঘাত। তুর্কিগণ অনুভব করে যে, ইহা তাহাদিগকে দখল করিতে হইবে। তবে ইহা কেবল এইজন্য নহে যে, ইহা তাহাদের বাণিজ্যিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। পর্বতে আরোহণ করিবার সুপরিজ্ঞাত কারণের ন্যায়, ওসমানীয়দিগকে এই নগরী অধিকার করিতে হইয়াছিল কারণ ইহা সেখানে অবস্থিত ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের অভাবে এই নগরী এমন জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুলতান ইহাকে পুনরায় বসতিপূর্ণ করিতে বাধ্য হন।

ইহার পতনে প্রাচ্যে খ্রিস্টান শক্তির একটি প্রতীক ব্যতীত কার্যত ইউরোপ আর কিছু হারায় নাই। পক্ষান্তরে তুর্কিগণ একটি সুন্দর ও প্রসিদ্ধ রাজধানী লাভ করে। রাশিয়ার মস্কোর নৃপতিগণ কনস্টান্টিনোপলের পতনের ফলে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হন। তৃতীয় আইভান (১৪৬২-১৫০৫ খ্রিঃ) শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী সফিয়াকে বিবাহ

করেন। সম্রাট ছিলেন পোপের প্রহরী। ফলে আইভান বাইজেন্টাইন সম্রাটদের শিখা তাঁহার বর্মে স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র আইভান দি ট্যারিব্‌ল (১৫৩৩-১৫৮৪ খ্রিঃ) বাইজেন্টাইন সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হিসাবে জার উপাধি গ্রহণ করেন। রাশিয়ান অর্‌থডক্স চার্চের ভাষায় মস্কো তৃতীয় রোমে পরিণত হয় যাহা কখনও ধ্বংস হইবার নহে।

মুহম্মদ ইউরোপে তাঁহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন; বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করেন এবং ক্রিমিয়ার তাতার খানকে পরাজিত করেন। এশিয়া মাইনরে তিনি তাঁহার চিরস্থায়ী শত্রু-কারামানের খানদিগকে ধ্বংস করেন এবং শ্বেত মেষপালকদের (White Sheepmen) আশা-আকাঙ্ক্ষা নির্মূল করিয়া দেন।[১] কৃষ্ণ সাগর একটি তুর্কি হ্রদে পরিণত হয়। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য অর্জন করেন। ভেনিসকে শান্তিচুক্তি করিতে বাধ্য করা হয়। বেলগ্রেড অথবা রড্‌স অধিকার করিবার ব্যর্থতার মধ্যে তাঁহার দুইটি দুর্ভাগ্য নিহিত। ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

অতঃপর পরিচিত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সুলতানের মৃত্যুর পর যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয় উহাতে জনসাধারণ দ্বিতীয় বায়েজীদকে সমর্থন করে। তিনি সুলতান হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভ্রাতা জেম, পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সিংহাসন লাভে ব্যর্থ হন এবং ১৪৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ওসমানীয় মাপকাঠিতে বায়েজীদ কোনো যোদ্ধাব্যক্তি ছিলেন না যদিও জেম যতদিন ইউরোপের দরবারগুলিতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন ততদিন বায়েজীদের কার্যাবলী বিঘ্নিত হইতেছিল। তবে জেমের মৃত্যুর পর ওসমানীয়গণ নাভারিনায় একটি বিরাট নৌযুদ্ধে ভেনিসীয়দিগকে পরাজিত করে এবং ভূমধ্যসাগরে তাহাদের আধিপত্যের আশা নির্মূল করিয়া দেয়। মিসরের মামলুকগণ এবং ইরানের[২] সাফাভীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা উদীয়মান ইসমাইলের সঙ্গে আরও ভয়াবহভাবে বায়েজীদ সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তবে উভয় সমস্যাই বায়েজীদের উত্তরাধিকারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রুগ্ন বায়েজীদ তাঁহার তিন পুত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জান-নিসারীগণ সিংহাসনের সত্যিকারের শক্তিতে পরিণত হয় এবং পুত্রদের মধ্যে যোদ্ধা সেলিমের পক্ষাবলম্বন করে। সেলিম ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হন। যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার ডাকনাম ছিল ইয়াভূজ (অনমনীয়) এবং তাঁহার আট বৎসরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি অন্য যে কোনো সুলতানের চেয়ে অধিক ভূখণ্ড অধিকার করেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্যে তিনি সুখী হইতেন। তিনি স্বয়ং তিনটি ভাষায় কবিতা লিখেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ লোকদের নিকট ভীতিপ্রদ ছিলেন এবং অনেক উজীরকে তিনি বরখাস্ত করেন। "ফলে আপনি সুলতান সেলিমের উজীর হন"- উক্তিটিকে কোনো প্রশংসাসূচক উক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত না।

ইরানের শাহ ইসমাইলের কার্যকলাপ, এশিয়া মাইনরের অনেক শীয়াকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহার এবং মামলুকদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন সেলিমকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি ইসমাইলকে পরাজিত

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৫৮।*
২. *নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২০৩।*

করেন, কিন্তু ইহার ফলাফল চূড়ান্তরূপ লাভ করে নাই। যাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ওসমানীয়দিগকে ভূখণ্ড ও মর্যাদা দান করে, তাহা হইল দুই বৎসর পর মারজে দাবিক-এ মিসরের মামলুকদের উপর তাঁহার জয় লাভ।

পূর্বাঞ্চলে সেলিমের যুদ্ধের জন্য রাজ্য জয়ে মনস্থির করা ছাড়াও অন্যান্য কারণ ছিল। মামলুক সুলতান কানসাওয়াহ আল-ঘুরী শাহ ইসমাইলের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন করেন। অতএব ঘুরীর সেলিমের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে আগস্ট আলেপ্পোর উত্তরে মারজে দাবিক নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মামলুকগণ পরাজিত হয় এবং সমগ্র সিরিয়া ওসমানীয়দের করতলগত হয়। আলেপ্পো, দামেস্ক, বৈরুত ও জেরুজালেমের ন্যায় শহরগুলিতে তুর্কিগণ মামলুকদের অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিদাতা হিসাবে প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে সেলিম তাঁহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে নূতন মামলুক সুলতান তুমানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং কায়রোর বাহিরে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সমগ্র মিসর এবং আরবের পবিত্র নগরগুলি অতঃপর তাঁহার করতলগত হয়। ওসমানীয়গণ তাহাদের নূতন অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাইবার ন্যায় বিরাট সাম্রাজ্যসহ বাইজেন্টাইন সম্রাট ও আব্বাসীয় খলিফাদের উত্তরাধিকারী হয়। সেলিম শেষ ক্রীড়নক খলিফা মুতাওয়াক্কিলকে তাঁহার সঙ্গে কনস্টান্টিনোপল লইয়া যান এবং পরে তাঁহাকে কায়রোতে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দান করেন। সেখানে তিনি পরলোকগমন করেন। শেষ খলিফার 'ক্ষমতা' ওসমানীয় সুলতানদের হাতে ন্যস্ত করিবার বিষয়টি সত্য হইলেও তাঁহারা এই উপাধি গ্রহণ করিতে তেমন তাড়াহুড়া করেন নাই। তাঁহাদের অধীনস্থ লোকজন ওসমানীয় সুলতানদিগকে খলিফা হিসাবে অভিহিত করেন এবং সুলতানগণও ইহাতে কোনো আপত্তি করেন নাই। ক্রমশ প্রত্যেকে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করে। যতদূর জানা যায়, ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি ও রুশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কুচুক কাইনারজীর সন্ধিতে সর্বপ্রথম প্রশাসনিকভাবে এই উপাধির উল্লেখ করা হয়।

সেলিমের একমাত্র পুত্র সোলাইমান ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান হন এবং ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইহার ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে 'ঐশ্বর্যশালী' নামে সম্বোধন করেন। ওসমানীয় ইতিহাসে তিনি কানুনী (আইনদাতা) হিসাবে পরিচিত। সোলাইমান তাঁহার প্রপিতামহ বিজয়ী মুহম্মদের কর্মসূচি বাস্তবায়িত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং বেলগ্রেড ও রড্স অধিকার করিতে মনস্থ করেন। ইউরোপ তখন মুহম্মদের সময় হইতে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু সোলাইমানের সমসাময়িক পঞ্চম চার্লস, প্রথম ফ্রান্সিস ও অষ্টম হেনরী একে অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত এবং সংস্কার আন্দোলন লইয়া এত ব্যস্ত যে সোলাইমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত কোনো সময় তাঁহাদের নাই। ১৫২১ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট বেলগ্রেডের পতন হয়। পরবর্তী বৎসর সোলাইমান সুদৃঢ় দ্বীপ রড্স আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ উভয় পক্ষের জন্য ছিল রক্তক্ষয়ী। সোলাইমান অঙ্গীকার করেন যে আত্মসমর্পণের পর নাইটগণের মধ্যে যাঁহারা দেশত্যাগ করিতে চান তাঁহাদিগকে তাহাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ নিরাপদে যাইতে দেওয়া হইবে, এবং যাঁহারা স্বদেশে থাকিবেন তাঁহারা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিবেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য কর প্রদানে অব্যাহতি পাইবেন। একমাত্র ইহার পরই সেই দ্বীপ আত্মসমর্পণ করে। সোলাইমান উভয় অঙ্গীকারই রক্ষা করেন।

চারি বৎসর পর সোলাইমান ১,০০,০০০ সৈন্য লইয়া ভিয়েনার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

কর্মহীনতার ফলে জান-নিসারীগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে আগস্ট হাঙ্গেরীর মোহাক্‌স নামক স্থানে সুলতান একটি প্রধান যুদ্ধে জয় লাভ করার ফলে তিনি দানিয়ুব নদীর উভয় তীরে অবস্থিত বুদা ও পেস্ট অধিকার করিতে সক্ষম হন। তবে ভিয়েনা অধিকার করিবার মতো যথেষ্ট সৈন্য তাঁহার নিকট ছিল না, তাই তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।[১] ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে সোলাইমান পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃষ্টির দরুন তাঁহার যাত্রা ব্যাহত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি ভিয়েনা পৌছেন। ১২ই অক্টোবর ওসমানীয়গণ ভিয়েনার প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলে এবং একটি প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। সমাগত শীতকালের দরুণ জান-নিসারীগণ যুদ্ধ অব্যাহত রাখিতে অনাগ্রহী হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ওসমানীয়গণ ১৫ই অক্টোবর ফিরিয়া যায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ফার্ডিন্যান্ড যেহেতু ভিয়েনায় ছিলেন না তাই সুলতান এই নগরী অধিকার করিবার সমস্ত আগ্রহ হারাইয়া ফেলেন। ইহাই ছিল ইউরোপে ওসমানীয়দের সর্বশেষ অগ্রগতি। ইউরোপীয়গণ যে একটি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল কিনা সন্দেহ, কারণ তাহারা তখনও নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিল। লুথার 'তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' এই শিরোনামে একখানা নৈরাশ্যজনক প্রচারপত্র রচনা করেন। কিন্তু বাহ্যত তিনি মনে করেন যে রোম তুর্কিদের চাইতে অধিক ভয়াবহ। প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সেলিমের সময়কালীন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্মীয় নেতা একটি বক্তব্য জারি করেন যে, 'সত্তরজন খ্রিস্টান হত্যা করিবার চেয়ে একজন বিপথগামী পারস্যবাসীকে (শীয়া) হত্যা করা অধিক পুণ্যের কাজ।'

ওসমানীয় ইতিহাসে সোলাইমানের শাসন ছিল সবচাইতে গৌরবপূর্ণ। ইহার স্থিতিশীলতা ইহাকে স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের বৈশিষ্ট্য দান করে। ইস্তাম্বুলে রাজকীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বারকে বলা হইত আলীকাপু বা মহান দরবার[২] এবং কক্ষগুলি সর্বদা দপ্তর প্রধান, গার্ড, সিপাহী ও জান-নিসারীগণ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। সোলাইমানের আয় তাঁহার সমকালীন ইউরোপীয়দের চাইতে অনেক বেশি হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থের অধিকারী বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আয়ের উৎস ছিল ধর্মীয় আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। এইগুলি হইল মুসলমানদের নিকট হইতে যাকাত, অমুসলমানদের নিকট হইতে জিজিয়া এবং বিজিত রাজ্যের খাজনা। এই সব কর আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, খনি ও বাজার হইতে সংগ্রহকৃত কর এবং জরিমানা ও সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত অর্থ দ্বারা বর্ধিত হয়। তাঁহার বার্ষিক আয় দশ হইতে বার মিলিয়ন দুকাত (প্রায় ১০,০০০,০০০ ডলার) বলিয়া ভেনিসীয় পর্যটকগণ অনুমান করেন।

ওসমানীয় সুলতানগণ বিরাট হেরেম (অন্তঃপুর) পোষণ করিতেন। হেরেমের প্রায় সবাই খ্রিস্টান ক্রীতদাসী। এইগুলিকে খোজারা পাহারা দিত। খোজাগণের কর্তাকে বলা হয় 'কিজলার আগাচী' (মহিলা সংস্থার কর্তা)। সোলাইমানের হেরেমে প্রায় ৩০০ মহিলা ছিল। রীতি অনুযায়ী বালিকাগুলি প্রত্যেকদিন সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইত এবং সুলতান তাহাদিগকে

---

১. *ওসমানীয়গণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকারের কিছুদিন পরেই তাহারা ইহার নাম পরিবর্তন করেন। কখনো কখনো ইহাকে ইসলামবুল নামেও উল্লেখ করা হয়।*

২. *ওসমানীয় সরকারকে পোর্ট বা সাবলাইম পোর্ট (দরবার বা মহান দরবার) বলা ইউরোপীয়দের একটি রীতিতে পরিণত হয়।*

পরিদর্শন করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার রুমাল প্রদান করিতেন। ২৫ বৎসর বয়সে যে মেয়েগুলি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ব্যর্থ হইত সেইগুলিকে সাধারণত মহান দরবারের সিপাহীদের নিকট বিবাহ দেওয়া হইত।

ইউরোপীয় পর্যটকদের লিখিত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায়, বাণিজ্য পথগুলি উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া রাখা হয় এবং রাস্তার ধারে সরাইখানা থাকে । বড় বড় শহরগুলিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথক সাধারণ স্নানাগার থাকে এবং মাত্র চারি স্পার (প্রায় এক সেন্ট) খরচ করিলে যে কোনো তুর্কি স্নানাগারে এক ঘন্টা কাটাইতে পারা যায়। তখনকার দিনে বর্তমানের ন্যায় সাধারণ লোকদের খাদ্য ছিল রুটি, ভাত, ফল এবং কোনো কোনো সময় মাংস। ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ বলিয়া কোনো গৃহে তেমন মদ্যপান ছিল না, কিন্তু অনেক পান্থশালা ছিল যেইগুলি খুব সম্ভবত অমুসলিমগণ পরিচালনা করিত, যেখানে 'তুর্কিগণ প্রবেশ করিয়া সারাদিন মদ পান করে'। ওসমানীয়দের মধ্যে তাস খেলা অপরিচিত ছিল বলিয়া জানা যায়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক, কারণ একই সময়ে ইরানে এই খেলা খুবই সুপরিচিত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকগণ নগর পাহারার কাজে খুবই মুগ্ধ হয় এবং কেউ কেউ বলেন যে, ইউরোপের যে কোনো রাজধানীর চেয়ে ইস্তাম্বুল নিরাপদ।

সোলাইমানের রাজত্বকাল হইতে ওসমানীয় সম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। তিনি যদিও ক্ষমতাশীন ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার পারিষদদের লোভ বা তাঁহার নিজস্ব দপ্তর প্রধানদের উচ্চাকঙ্ক্ষা দমন করিতে পারেন নাই। জান-নিসারী বাহিনী অত্যন্ত বড় আকার ধারণ করে। ফলে ইহা সুসংহত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহারা অধিক সংখ্যায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। পুরাতন গাজী গুণাবলী অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সোলাইমান স্বয়ং গুণ অনুযায়ী পদোন্নতির বহুকালের ঐতিহ্য ভঙ্গ করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহচর ইব্রাহীমকে প্রধান উজীর পদে উন্নীত করেন। ঘটনাচক্রে ইব্রাহীম ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক। কিন্তু পরবর্তীকালে যোগ্যতার প্রতি দৃকপাত না করিয়া সুলতানের প্রিয়পাত্রদিগকে নিযুক্ত করা একটা রীতিতে পরিণত হয়।

দিওয়ানের (পরিষদ) সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করাও সুলতানের একটি রেওয়াজ ছিল। সোলাইমান এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তাঁহার প্রধান উজীরের হাতে ন্যস্ত করেন এবং এই সময়গুলি তাঁহার প্রিয়তমা খোররমের (ইউরোপীয়দের 'রোক্সলানা') সঙ্গে কাটান। খোররম ছিল একটি রুশ ক্রীতদাসী, যে পরে সুলতানের আইনানুগ স্ত্রীতে পরিণত হয়। এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার পুত্রদের স্বপক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং সোলাইমানকে অপর এক স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হত্যার আদেশ দিতে বাধ্য করেন। পরে সুলতান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বায়েজীদকে হত্যার আদেশ দান করেন। শেষ পর্যন্ত সিংহাসনের জন্য একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম ছিলেন চরিত্রহীন ও মদ্যপ। সেলিমের সংক্ষিপ্ত আট বৎসরের রাজত্ব সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়। তাঁহার পর অধিকাংশ সুলতানগণ দরবার কক্ষের চাইতে হেরেমকে অধিক ভালবাসেন। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সম্রাটের পুরাপুরি ক্ষমতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল সর্ব প্রধান শাসকের যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন মাত্র। এই ধরনের একটি সাম্রাজ্য অনাগ্রহী ও দুর্বল সম্রাটের অধীনে বেশি দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি

ওসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল একটি সামরিক শিবির (উর্দু)। যুদ্ধ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুলতান সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করিতেন এবং জান-নিসারী হিসাবে তিনি তাঁহার বেতন গ্রহণ করিতেন, তালিকায় তাঁহার নামও থাকিত সর্বাগ্রে। "যুবরাজের দর্পণে"[১] লিখিত একটি পুরাতন বিধি ওসমানীয় পারিষদবর্গ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতেন ঃ "সেনাবাহিনী ছাড়া কোনো সরকার হয় না, অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না, প্রজাসাধারণ ছাড়া অর্থ সমাগম হয় না।" খাঁটি মোঙ্গল প্রথানুযায়ী সামরিক সেনানিবাসের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান। তবে মোঙ্গলদের তুলনায় ওসমানীয়গণ ছিলেন সুন্নী মুসলমান এবং তাই তাহাদের সরকার ছিল ধর্মভিত্তিক। ইহার অর্থ এই যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামের উন্নতির জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। ইহা ছিল ইসলামের দেশ এবং ইসলামের জন্যই সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত। এমন কি, রাজধানীকে কখনও কখনও ইসলামবুলও বলা হইত। স্বভাবতই ইহা সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। তিনি ইহা দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, শেখ-উল-ইসলামের সঙ্গে যুগ্মভাবে ভোগ করিতেন। একজন সর্বোচ্চ সম্রাট ও একজন সর্বোচ্চ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে সমতা রক্ষা করা খুবই নাজুক ব্যাপার। ইহা সর্বদাই দোদুল্যমান ছিল। নিরাপদে বলা যায় যে, সমস্ত ওসমানীয় বিধি-নিষেধ ও আইন কানুন ছিল এই দুইয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।

ইতোমধ্যে আব্বাসীয় যুগে এবং ক্ষুদ্র রাজ্যের সময় এই নাজুক সমতা মূল্যায়নের ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রকৃত অবস্থা এবং গাজ্জালী ও ইবনে তাইমিয়্যার ন্যায় মনীষীদের লেখার জোরে, শরীয়তকে[২] সঙ্গে রাখিয়া যে কোনো লোক যথেষ্ট শক্তিধর হইলে আইনানুগভাবে মুসলমানদিগকে শাসন করিতে পারে। বাদশাহের ঐশী অধিকারে বিশ্বাসের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন জালাল আল-দ্বীন দাওয়ানী (১৪২৭-১৫০১ খ্রিঃ) যিনি তাঁহার আখলাক-ই-জালালীতে (জালালী ন্যায়শাস্ত্র) লিখিয়াছেন ঃ সুলতান একজন ব্যক্তি যিনি ঐশী সমর্থনের দ্বারা গৌরবান্বিত ... সার্বভৌমত্ব ... আল্লাহর দান এবং তাঁহার (সুলতানের) ঐশী অধিকার তাঁহার কার্যাবলী দ্বারা বিঘ্নিত হইবে না।" শরীয়ত ত্যাগ না করিয়া ওসমানীয় সুলতানগণ যতদূর সম্ভব তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই 'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি', রসুলুল্লাহর 'উত্তরাধিকারী', মুসলমানদের ধর্মগুরু 'বিশ্বের আশ্রয়' 'আল্লাহর ছায়া' এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে 'দুই হেরেম শরীফের নফর' (অর্থাৎ মক্কা ও মদিনা)-উপাধিসমূহ ব্যবহার করেন।

ওসমানীয়গণ ধর্মতন্ত্র ও সার্বভৌম রাজতন্ত্রের মধ্যে সমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন প্রধানত, ইরানি-তুর্কি ঐতিহ্য ব্যবহার করিয়া, যাহা সুলতানকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১৭।*

২. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১৮।*

প্রদান করে। তবে, ইহা একমাত্র উলামাদের (ধর্মীয় নেতাগণ) সম্মতিতে করা যাইত। উলামাগণ শরীয়তে এই ধরনের আইন আছে কিনা দেখিতেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সুলতানগণ ক্রীতদাস সম্পর্কীয় আইনসমূহ নিজেদের সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যেহেতু শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে ছাড়া স্বাধীন মুসলমানদের উপর তাঁহাদের কোনো আধিপত্য ছিল না, তাই সুলতানগণ প্রশাসনিক পদগুলি পূরণ করিতেন ক্রীতদাসের দ্বারা, যাহাদের উপর শরীয়তের উল্লেখ ছাড়াই তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। ফলে পাশাপাশিভাবে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। একটিকে সাধারণত বলা হয় মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং অপরটিকে বলা হয় 'প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান'। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এইরূপ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্থিতিশীল একটি বিশাল সাম্রাজ্যে বিধি-নিষেধসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। উপরোল্লিখিত শ্রেণীবিন্যাসকে অতি কঠোরভাবে লওয়া উচিত নহে, তবে ওসমানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের জন্য এইগুলি একটি কার্যোপযোগী পথনির্দেশক।

মুসলিম প্রতিষ্ঠান

ইহার সদস্য লওয়া হইত স্বাধীন মুসলিম জনগণ হইতে। তাঁহারা মাদ্রাসা নামক এক প্রকারের বিশেষ বিদ্যালয় লেখাপড়া করেন। এই ধরনের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ইসলাম ধর্ম, ইসলামী শিক্ষা এবং বিশেষভাবে ইসলামী আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইসব বিদ্যালয়ে হইতে বাহির হইয়া আসিত ভবিষ্যতে ধর্মপ্রচারক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, দরবেশ, নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোরআন পাঠক, কাজী ও মুফতীগণ। মতবাদ অনুযায়ী ইসলামে যেহেতু কোনো ধর্মযাজক বা পুরোহিত নাই, উপরোল্লিখিত পদসমূহের খ্রিস্টান নাম হইবে সাধারণত ধর্মযাজক, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আইনজ্ঞ। সমস্ত বিদ্যার্থী শরীয়ত পাঠ করে এবং কিছু সংখ্যক দরবেশের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া ইহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশ্বাস করে।

উপরোল্লিখিতদের মধ্যে যাহারা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্পর্শে আসেন এবং কখনও কখনও বিবাদে উপনীত হন তাঁহারা হইলেন আইনজ্ঞগণ, যাহাদিগকে কাজী বা মুফতী বলা হয়। সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ওসমানীয় বিচারালয়সমূহ এইসব লোক দ্বারা পরিচালিত। প্রশাসনিক সংগঠনের ন্যায়, বিচারের ক্ষেত্রেও ওসমানীয়দের দুইজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন, একজন আনাতোলিয়ার (এশিয়া মাইনর) জন্য এবং একজন রুমেলীর (ইউরোপ) জন্য। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রধান বিচারপতিকে বলা হইত কাজী আসকার (সেনাবাহিনীর বিচারক)। এই বিশাল ধর্মীয় সংগঠনের চূড়ায় ছিলেন শেখ-উল- ইসলাম, যিনি সুলতান ও তাঁহার প্রধান উপদেষ্টার ন্যায় শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকিতেন। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এইসব লোকজন কখনও কখনও খুবই শক্তিশালী ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি ছিল ওয়াক্ফ বা ধর্মীয় সম্পত্তিসমূহের পরিচালনা। ইহার নিকট বদান্যতা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধর্মীয় লোকদের দান করা জমি, অন্যান্য সম্পত্তির তহবিল খরচ ও পরিচালনা করিবার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তবে, ছোট শহরের মুফ্তী হইতে শেখ-উল-ইসলাম পর্যন্ত বিচারকের প্রধান কর্তব্য ছিল

প্রত্যেক মামলা পাঠ করা, শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ করা এবং একটি মতামত বা ফতওয়া জারি করা। কোনো মতামত জারি করিলেই মামলাটি নিষ্পত্তি হইত। অবশ্য শেখ-উল-ইসলামের ফতওয়ার জাতীয় গুরুত্ব ছিল। কমপক্ষে এগারজন সুলতান ফতওয়ার দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। শেখ-উল-ইসলাম প্রত্যেক ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশের উপর ভেটো প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি সাধারণত 'অলুর' (হইতে পারে) অথবা 'ওলমাজ' (হইতে পারে না) বলিতেন এবং সুলতানকে তাহা পালন করিতে হইত। কার্যক্ষেত্রে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা সুলতানের ক্ষমতা এবং শেখ-উল-ইসলামের সাহসের উপর নির্ভর করিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাগণ সাহসিকতা ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যথা-ভয়াবহ সুলতান সেলিম যখন আরবি শিক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী খ্রিস্টানদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দেন, তখন শেখ-উল-ইসলাম এই আদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করেন। আবার কখনও কখনও এইসব নেতা সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন, যথা-একজন নূতন সুলতানের ক্ষমতায় আরোহণের সময় পিতৃহত্যার ব্যাপারে ধর্মীয় অনুমোদন লাভ। এই মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগকে বলা হইত উলামা বা বিদ্বান লোক। শ্রেণীগতভাবে ইহারা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রায় সর্বদাই ছিলেন যে কোনো পরিবর্তনের বিরোধী।

প্রশাসনের প্রতিষ্ঠান

মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে ছিল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এই দলে ছিলেন সুলতান ও তাঁহার বংশ, প্রধান উজীর ও সরকারের কর্মকর্তাগণ, দরবারের সদস্যবৃন্দ এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী। সুলতান ও তাঁহার সন্তানগণ ব্যতীত সাধারণত প্রত্যেকেই ছিলেন মূলত খ্রিস্টান ও ক্রীতদাস। প্রধান উজীরের ন্যায় উচ্চপদে উন্নীত হইবার ফলেও কোনো ব্যক্তির ক্রীতদাস মর্যাদার পরিবর্তন হইত না। এই ক্রীতদাসের অধিকাংশকে লওয়া হইয়াছে দেভ্শিরমেহ্ বা কর হিসাবে। খ্রিস্টান বালক গ্রহণ করিবার নীতির মাধ্যমে ইহাদের অধিকাংশকে জান-নিসারী হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যতসম্পন্নগুলিকে দরবারে সভা-ভৃত্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাহারা কঠিন প্রশিক্ষণ লাভ করে। পঁচিশ বৎসর বয়সে ইহাদিগকে প্রদেশগুলিতে প্রেরণ করা হয় ক্ষুদ্র কর্মকর্তা হিসাবে। কেউ কেউ প্রধান উজীরের ন্যায় উচ্চপদেও উন্নতি লাভ করে। বস্তুত মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ব্যতীত সাম্রাজ্যের সমস্ত কর্মকর্তাগণই ক্রীতদাস। দেভ্শিরমেহ-এর মাধ্যমে আনা সমস্ত বালকদিগকে মুসলিম শিক্ষা দান করা হয় এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। জান-নিসারীগণ ছাড়া প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তাদিগকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলমান হিসাবে জন্মলাভ করিবার ফলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি ক্রীতদাস থাকিত না। তাহারা যেহেতু স্বাধীন তাই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে তাহারা কোনো পদ গ্রহণ করিতে পারিত না। ক্রীতদাস হিসাবে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুলতানের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন, শরীয়তের অধীনে নহে। এইভাবে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উপর সুলতানের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল এবং উলামাদের কোনো হস্তক্ষেপ এখানে চলিত না।

প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা ছিল দিওয়ান বা পরিষদ, যাহার সভাপতিত্ব করিতেন সুলতান। স্বাভাবিক সদস্যবর্গ ছিলেন উজীর, রুমেলী ও আনাতোলিয়ার বেলারবেগণ (অধিনায়ক), দুইজন কাজী আসকর, দুইজন দফতরদার (খাজাঞ্চি) এবং

দুইজন নিশাঞ্জী (চ্যান্সেলর)। এই উজীরদের প্রত্যেকের প্রদেশ, গ্রাম ও নগর পর্যায়ে স্ব স্ব নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ছিল। পরে নৌবাহিনীর অধিনায়ক (কাপুনদান পাশা) এবং জান-নিসারীদের অধিনায়কও (আগা) পরিষদের সদস্য হন। সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনের সৃষ্টি হয় সেনাবাহিনীর সহায়তার জন্য। যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক গভর্নরগণ তাহাদের নির্ধারিত সৈন্যসহ নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিতেন।

স্বভাবতই প্রশাসনিক যন্ত্র ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান ছিল। শরীয়ত যেহেতু একটি বিশাল ও সমস্যা সম্বলিত সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে নাই এবং ইহাকে সম্প্রসারণও করা যায় না, তাই নূতন সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে অন্য তিনটি উপায় বাহির করিয়া লয়। এইগুলি হইল, আদত, উরফ ও কানুন। আদত হইল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রীতি, যাহা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। উরফ হইল অধর্মীয় আইন যাহা সুলতানের ইচ্ছা অথবা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের বিচারের রায় হইতে উদ্ভূত। শরীয়তে কোনো সমস্যার সমাধান না পাইলে সাধারণত উরফ ব্যবহার করা হয়। কানুন হইল সুলতানের দাপ্তরিক রায় যাহা আদত, উরফ ও অন্যান্য কানুনের অগ্রভাগে ব্যবহৃত হয়। উলামাগণ এই তিনটির বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ এইগুলি শরীয়ত হইতে উৎপন্ন নহে। তদুপরি, এই উপায়গুলি সুলতানকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে তিনি শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করিতে আরও অধিকভাবে প্রলুব্ধ হন। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারের যুগে সুলতান ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উলামা ও সাংবিধানিকগণ বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া যান, যদিও আদর্শগতভাবে তাঁহারা ছিলেন পরস্পরবিরোধী।

অমুসলিমগণ

একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ওসমানীয়গণ প্রথমদিকেই বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার গাজী নিয়ম ত্যাগ করে এবং তৎপরিবর্তে 'মহাগ্রন্থের লোকদের' ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত সহিষ্ণুতার রীতি গ্রহণ করে। তুর্কিগণ অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে 'মিল্লাত' নামে উল্লেখ করে এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি 'মিল্লাত প্রথা' নামে পরিচিত হয়। ওসমানীয়দের খ্রিস্টান প্রজাগণ যেহেতু প্রায় সবাই ছিল সনাতন গীর্জার (Orthodox Church) সদস্য এবং যাবতীয় ধর্মীয় সংগঠনের অধিকারী, তাই ওসমানীয়গণ ইহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি পৃথক মিল্লাত মনে করিত। প্রত্যেক মিল্লাত, সে আর্মেনিয়ান হউক বা সিরিয়ান বা গ্রীক অথবা সার্বিয়ান অর্থোডক্স, অথবা ইহুদি হউক, এইগুলি ইহাদের স্ব স্ব ধর্মীয় সংগঠনের আওতাভুক্ত ছিল এবং ইহাদের আইনের অধীনে ছিল। ইহার দুইটি ফলাফল ছিল। একটি হইল এই যে, এইসব ধর্মীয় সম্প্রদায়, এই প্রথার দ্বারা সাম্রাজ্য বহির্ভূত অধিকাংশ খ্রিস্টানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিল। ধর্মীয় সংস্থা হিসাবে তাহারা উন্নতিশীল ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। দ্বিতীয়ত, এইসব মিল্লাতের উচ্চশ্রেণীর সদস্যবৃন্দ, যাহারা সুবিধাভোগী মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা উলামাদের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়েন এবং সাম্রাজ্যের যে কোন পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। একমাত্র ওসমানীয় ব্যাপারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের হস্তক্ষেপের পর এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পিছনে খ্রিস্টান সংখ্যালঘুদিগকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিবার দ্বারাই ওসমানীয়গণ এইসব মিল্লাত সম্পর্কে সন্ধিহান হইয়া পড়ে এবং পূর্বের ন্যায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন পরিত্যাগ করে। মিল্লাত প্রথা প্রবর্তনকে এইরূপ মনে করা উচিত নহে যে আইনের চোখে অমুসলিমগণ মুসলিমদের সমপর্যায়ভুক্ত।

কালক্রমে সমস্ত অমুসলিমদিগকে রায়ত (প্রজা) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, অপরদিকে মুসলমানদিগকে বলা হয় সাম্রাজ্যের তাবা (অনুসারী)।

আরবিভাষী অঞ্চলসমূহ

মোটের উপর তুর্কিগণ উপনিবেশ স্থাপনকারী ছিল না এবং সিরিয়া ও মিসরকে তাহারা নিশ্চয়ই উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহে নাই। আরবিভাষী লোকজন ছিল সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ স্বতন্ত্র অংশ। আরবগণ তাহাদের স্বধর্ম মতাবলম্বী হওয়ার কারণেই হউক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হউক, তুর্কিগণ ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরকে ইস্তাম্বুলের সরাসরি প্রশাসনিক আওতায় আনয়ন করে নাই। এতদঞ্চলে বিজয়ী সুলতান সেলিম ও পরবর্তী সুলতানগণের অধীনে স্থানীয় আমীরগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারা মহামান্য দরবারের নিকট কর প্রদান করিতেন মাত্র। ওসমানীয়গণ, বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর নজর রাখিবার জন্য একজন গভর্নর জেনারেল পাঠাইতেন মাত্র। প্রায় ৪০০ বৎসর পর্যন্ত ওসমানীয় শাসন সিরিয়াকে এমন এক শান্ত ভাব প্রদান করে যাহা এই দেশ উমাইয়া শাসনের পর আর লাভ করে নাই।

আরবিভাষী মুসলমানগণ কখনও ক্রীতদাস ছিল না এবং তাহারা মুসলিম প্রতিষ্ঠানে অতি উচ্চ আসন লাভ করে। বস্তুত ওসমানীয়গণ আরবদের সঙ্গে আনাতোলিয়ার তুর্কিদের চাইতে অধিক ভাল ব্যবহার করে। আনাতোলিয়ার তুর্কিদিগকে তাহারা বলিত "ইশেক তুর্ক" বা তুর্কির গর্দভ। ৪০০ বৎসরের ওসমানীয় শাসন আরব উন্নতিকে ব্যাহত করিয়াছে-এই মর্মে আধুনিক আরবদের প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী কোনো প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা যায় না। তুর্কিগণ আরবদের ভাষা এবং আরবদের প্রতিষ্ঠিত আইনকে সম্মান করিয়াছে। নিশ্চয়ই এইসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবগণ তুলনামূলকভাবে কোনো কোনো তুর্কিদের চাইতেও স্বাধীন ছিল।

আরবিভাষী লোকজন সমধিক উন্নতি লাভ করিতে অপারগ হইবার জন্য সম্পূর্ণভাবে ওসমানীয়দিগকে দায়ী করা যায় না।

মিসরের অসহনীয় অবস্থার জন্য ওসমানীয়গণ দায়ী নহে। কারণ তাহাদের স্থানীয় শাসকদিগকে বহাল রাখিবার নীতির ফলে ঘৃণিত মামলুকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ওসমানীয়গণ কর ছাড়া আর কোনো বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না। অতএব, পুরাতন মামলুক সুলতানগণ শেখ আল-বালাদ (প্রদেশের কর্তা) আমীর-আল-হজ্জ্ব (হজ্জ্বের নেতা) হিসাবে বহাল থাকেন। শেষোক্তটি ছিলেন মূলত সামরিক অধিনায়ক। এই উভয় কর্মকর্তাদের নিযুক্তির সময় ইস্তাম্বুলের দিওয়ানের সম্মতির প্রয়োজন হইত। এই স্থানীয় কর্মকর্তাগণ এবং তাহাদের সহকারীবৃন্দ পূর্বের ন্যায় সম্পত্তি ক্রোক করিত এবং দেশকে লুণ্ঠন করিত। তুর্কি গভর্ণর জেনারেল (পাশা) ছিলেন অসহায়। কোনো কোনো পাশা যাহারা স্থানীয় আমীরদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না- তাহারাও লুটতরাজে অংশ গ্রহণ করিত। মামলুক আমীরদের ইচ্ছানুযায়ী পাশাদিগকে বহিষ্কার করা হইত। ২৫০ বৎসরের সরাসরি ওসমানীয় শাসনে ১০০ জনেরও অধিক পাশা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই স্থানীয় আমীরের একজন প্রতিনিধি গাধায় সওয়ার হইয়া দুর্গে অবস্থিত পাশার আবাসস্থলে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিতেন, "ওহে পাশা, নিচে অবতরণ কর" এবং ইহাই সাধারণত তল্পিতল্পা গুটাইয়া ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য পাশার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মামলুক আমীরগণ এতই শক্তিশালী হইয়া পড়েন যে, ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মামলুক আলী বে মক্কা অধিকার করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। নেপোলিয়নের আগমন ও মুহম্মদ আলীর উত্থান পর্যন্ত মামলুকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।[১]

সাংস্কৃতিক জীবন

সার্বতভাবে তুর্কিগণ ছিল সৈনিক, বিশেষভাবে ইসলামের সৈনিক, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা এবং ইহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই হিসাবে তাহারা অনুভব করে যে তাহাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইল বিচারক হিসাবে শরীয়তকে তুলিয়া ধরা এবং প্রশাসক হিসাবে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা। তুর্কিদের সম্পদের মধ্যে ছিল কৃষক হিসাবে বা জমিদার হিসাবে জমির মালিকানা, অথবা চাকরি হইতে প্রাপ্ত বেতন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ন্যায় অন্যান্য লাভজনক দায়িত্বগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয় খ্রিস্টান ও ইহুদিদের হাতে।

ইসলাম এই সৈন্যদের নিকট অনেকাংশ ঋণী এবং তুর্কিগণ এই দৃশ্যে অবতরণ না করিলে ধর্মের কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনাই করা যায় না। সেলজুক তুর্কিগণ শীয়া ফাতেমীয় ও খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের হাত হইতে আব্বাসীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছে। তাহারাই এশিয়া মাইনরে সর্বপ্রথম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামের পতাকা সুদূর ভিয়েনার সিংহদ্বার পর্যন্ত বহন করে।

সৈন্য হিসাবে তুর্কিগণের মধ্যে সম্ভবত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মৌলিকতার অভাব ছিল, কিন্তু তাহারা শিক্ষা-দীক্ষার প্রশংসাকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাহাদের মধ্যে ইসলাম ও শরীয়ত যেহেতু আরবি ভাষায় প্রবর্তন করা হয়, তাই তাহারা এই ভাষাকে 'পবিত্র' বলিয়া মনে করিতে থাকে এবং ইহাকে ধর্মীয় ও আইনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকে। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে, তা সাহিত্য হউক বা শিল্পকলা, দর্শন অথবা অতীন্দ্রিয়বাদ, তাহাদের অতি প্রিয় ভাষা ছিল ফার্সি। পারস্য লোকগাথা তাহারা এমনভাবে আয়ত্ত করে যে তাহাদের প্রধান শত্রু ইরানের সাফাভীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুলতানগণ সাফাভীয়দিগকে কুলাঙ্গার 'তুরানীয়ানদের' সঙ্গে তুলনা করে, যাহারা ছিল সর্বজনস্বীকৃত তুর্কি পূর্বপুরুষগণ।

তুর্কিগণ শিক্ষার অনেক শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। মোল্লা খসরু ছিলেন বিজয়ী মুহম্মদের শাসনামলের একজন মহামান্য আইনশাস্ত্রবিদ। তাঁহার রচনাবলী আদর্শে পরিণত হয়। মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বকালে ইবনে কামালকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত। সম্ভবত যুদ্ধের প্রয়োজনে, তুর্কিগণ বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সৃষ্টি করে। তাঁহারা মধ্য ইউরোপে সল্যচিকিৎসা ও চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। চিকিসাবিদ্যায় তাহারা তুর্কি ভাষা ব্যবহার করিত, অথচ ইতিহাসশাস্ত্রে জনপ্রিয় ভাষা ছিল ফার্সি। তুর্কি ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় সরকারি ঘটনাবলী লইয়া-অভিযান ও বিজয়সমূহের বর্ণনা যাহার অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, তাহাদের আব্বাসীয় পূর্বসূরীদের অনুকরণে ব্যাপক ইতিহাস রচনা করেন। তবে কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক

---

১. *নিচেদ্রষ্টব্য পৃঃ ২৩০।*

জীবনচরিতের উপর প্রবন্ধ, শাসন পদ্ধতি, প্রাসাদের জীবন এবং এমনকি সাম্রাজ্যের পতনের কারণের উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তুর্কিগণ রচনাশৈলী ও ভাষা উভয় প্রকারে পারস্যদিগকে এমনভাবে অনুকরণ করে যে, একজন লেখক যেমন বলিয়াছেন ঃ "তুর্কি সাহিত্য ইসলামী ইরানের ভাবধারার সত্যিকারের অভিভাবক হইয়া উঠে।" ফজুলী (মৃত্যু ১৫৫৩ খ্রিঃ) ও আহমদ নাদিমের (মৃত্যু ১৭৩০ খ্রিঃ) ন্যায় মেধাবী কবিও ছিলেন যাঁহারা তুর্কি ভাষায় লিখেন। যাহারা সর্বদা কফি হাউসে গমন করিত তাহারা পেশাগত ও ভ্রমণশীল গল্পকার মেদ্দাহ (Meddah)-এর গল্প শ্রবণ করিত। তিনি কথ্যভাষায় কবিতার দ্বারা অলংকৃত গল্পের মাধ্যমে শ্রোতাদিগকে মোহিত করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রভাব এবং জনসাধারণের আকর্ষণ লাভ করিবার জন্য লোকগণ প্রচলিত ফার্সি-তুর্কির পরিবর্তে সহজ ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হন। শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেটাকে সম্ভবত একমাত্র খাঁটি 'তুর্কি' হিসাবে চেনা যায় তাহা হইল স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে। প্রাথমিক ওসমানীয় ইমারতসমূহ ছিল অধিকাংশ সেলজুক নমুনার, যেখানে পারস্য কারুকার্যে ঢাকা অসংখ্য ক্ষুদ্র গম্বুজ ব্যবহার করা হয়। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পর ওসমানীয়গণ শুধু মসজিদই নির্মাণ করে নাই, বরং প্রাসাদ এবং সরাইখানাসমূহও নির্মাণ করে। এইসব কিছুর মধ্যে বিশেষত মসজিদগুলির মধ্যে বাইজেন্টাইন স্থাপত্য ও পারস্য কারুকার্যময় নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ইহার নিজস্ব একটি নমুনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পী ছিলেন সিনান নামে একজন ক্রীতদাস-যিনি মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বকালে জীবনযাপন করেন। এই মেধাবী লোকটির নির্মিত সৌধরাজির মধ্যে রহিয়াছে, মসজিদ, বিদ্যালয়, রাজপ্রাসাদ, হাসপাতাল ও সরকারি স্নানাগারসমূহ। কিন্তু তাহার অতি প্রসিদ্ধ ভবনাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল সোলাইমানিয়া সমজিদ। ইস্তাম্বুলের সেন্ট সোফিয়া গীর্জার সন্নিকটে নির্মিত এই মসজিদটি ইহার পূর্বসূরী বাইজেন্টাইন সৌধটিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে।

ওসমানীয়দের পতন

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বের শেষভাগে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। সামরিক সংগঠন হিসাবে ওসমানীয় রাষ্ট্রের সজীবতা নির্ভর করে যুদ্ধ-বিগ্রহের উপর এবং ইহার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল লুঠ ও বিজিত জাতিসমূহের কর প্রদানের উপর। ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশের অন্যান্য জাতিসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশগুলির সুদীর্ঘ দূরত্বের কারণে সামরিক বিজয় এক রকম বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রতিরক্ষামূলক কর্তব্য পালন করিতে করিতে সৈন্যবাহিনী অস্থির হইয়া উঠে। সমগ্র সরকারি যন্ত্র ক্রমশ কঠোর পরিশ্রমে থামিয়া যায়। ভাঙ্গনের গতিতে প্রায় ৩০০ বৎসর লাগে। কিন্তু ইহার চিহ্ন ইতোমধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশ পায়।

সুলতান সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন বলিয়া দিওয়ানের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিতেন এবং স্বয়ং অভিযানসমূহ পরিচালনা করিতেন। তবে, সোলাইমান এই কর্তব্য প্রধান উজীরের উপর ন্যস্ত করেন। কিছুদিনের জন্য দিওয়ান কক্ষে এইটি মার্বেল পাথরের জাফরি নির্মাণ করিয়া সুলতানের স্বয়ং অংশ গ্রহণের কাহিনী প্রচলিত রাখা হয়। সুলতান সেই জাফরির পিছনে

থাকিয়া সবকিছু শুনিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। পরবর্তীকালে সুলতান এইসব ভনিতা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন এবং কি ঘটিতেছে তাহা খোঁজ নেওয়াও অপ্রয়োজনীয় মনে করিতে থাকেন। বহু বৎসরের চাকুরি ও যোগ্যতার মাধ্যমে উচ্চপদে উন্নতি প্রদান করিবার প্রতিষ্ঠিত নিয়মও সোলাইমান ভঙ্গ করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ইব্রাহীমকে দরবারের ভৃত্যের পদ হইতে প্রধান উজীরের পদে উন্নীত করেন।

তদুপরি, দেশ বিজয় বন্ধ হওয়ার ফলে সেই উৎস হইতে আয় তিরোহিত হইলে, সুলতান সর্বোচ্চ অর্থ প্রদানকারীর নিকট পদ বিক্রয় করিয়া দরবারের বিপুল খরচ জোগাইতে চেষ্টা করেন। ইহা ছিল দেভ্‌শিরমেহ্ হইতে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দিবার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। বেলারবে, প্রাদেশিক অধিনায়ক, ধনী ব্যক্তিবর্গ ও দলগুলি জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে বিভিন্ন পদ ক্রয়-বিক্রয় করেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আইন না থাকিবার ফলে কোনো কোনো সময় সুযোগ্য যুবরাজদিগকে বাদ দেওয়া হয়। এমনকি যুবরাজদের বিদ্যাশিক্ষাও রহিত করা হয়। তাহারা হেরেমে লালিত-পালিত হয় এবং সহচর হিসাবে লাভ করে নিরক্ষর খোজা ও মহিলাদিগকে। তৃতীয় মুরাদ ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা পরস্পরের তুলনায় মন্দ ছিলেন না।

এই নিয়মের ফলে যেইসব প্রধান উজীর সুলতানের নামে শাসন করেন তাঁহারা চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া এই পদে উন্নতি লাভ করিবার ফলে প্রধান উজীর স্বাধীন মতামতের অধিকারী ছিলেন না। তিনি সাধারণত হেরেমের মহিলা, খোজা, সেনাবাহিনী, উলামা অথবা এই জাতীয় সকলের নিকট ঋণী থাকিতেন, যাহারা নিজেদের স্বার্থে তাঁহার দ্বারা জনসাধারণকে শোষণ করিতে চাহিত। যেহেতু তাঁহার জীবন ছিল সুলতানের হাতে, যিনি আবার এক শ্রেণীর স্বার্থপরায়ণ দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন, সেইহেতু দলের সঙ্গে লুটতরাজে লিপ্ত থাকাই প্রধান উজীরের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। আবারও ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, কিছু সংখ্যক সাহসী ও সুযোগ্য প্রধান উজীর না থাকিলে সাম্রাজ্য যতদিন টিকিয়া ছিল ততদিনও টিকিতে পারিত না।

শক্তিশালী প্রধান উজীরদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কপ্রুলুগণ (Koprulu)- যাহারা আব্বাসীয় যুগের বারমাকীয়দের ন্যায় একটি পরিবার হিসাবে প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। মুহাম্মদ কপ্রুলুকে চতুর্থ মুহাম্মদের (১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রিঃ) মাতা, স্বীয় পুত্রকে প্রচলিত হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রধান উজীর হিসাবে তিনি ৩০,০০০ লোককে হত্যা করেন, যাহারা মুসলিম ও প্রশাসন উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল। তিনি ওসমানীয়দের সামরিক প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন এবং সামরিক অভিযানসমূহ গঠন করেন। তাঁহার পুত্র আহমদ ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত প্রধান উজীর হিসাবে অতি সম্মানের সহিত কাজ করেন। ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় সোলাইমান আহমদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাফা কপ্রুলুকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এইসব কঠোর প্রধান উজীরগণ যত যোগ্যই হউন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য এবং আগমন করিতেন দীর্ঘ ব্যবধানে। তাঁহারা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের পরিধি দীর্ঘ করিতে পারিতেন, ইহার রোগ সারাইতে সক্ষম ছিলেন না।

পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সেনাবাহিনীর দোষ সর্বাগ্রে ধরা পড়ে। কারণ

সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও দুর্বলতা ছিল ইহার সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেনাবাহিনীর অন্তরাত্মা জান-নিসারীগণ বিবাহের অনুমতি লাভ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা সৈন্যগণ তাহাদের প্রাথমিক আনুগত্য সুলতানকে না দিয়া তাহার পরিবারকে প্রদান করে, যাহার সবটুকু বিবাহের পূর্বে সুলতানেরা পাইতেন। তৃতীয় মুরাদের সময় এই সংগঠনের সদস্যদের পুত্রদিগকেও বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের খাতিরে বেকার মুসলমানদিগকে ভর্তি করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে দেভ্শিরমেহ পন্থা ত্যাগ করা হয় এবং জান-নিসারীগণ পার্শ্ব ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা যেহেতু আর ক্রীতদাস ছিল না, তাই তাহারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যাহাদের উপর সুলতানের আধিপত্য লোপ পায়। সংখ্যায় তাহারা বৃদ্ধি লাভ করে এবং দেশের অর্থনীতির উপর এক বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জান-নিসারীদের বেতনের টিকিট প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার সময় দেখা যায় তালিকাভুক্ত ১,৫০,০০০ এর মধ্যে মাত্র ২০০০ এর সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল।

সেনাবাহিনীর অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সিপাহীগণ, যাহারা ছিল সামন্ত অশ্বারোহী বাহিনী তাহারাও তেমন ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তৃতীয় মুরাদের সময় সামন্ত প্রভু ও দরবারের সদস্যগণ তাহাদের চাকর, ক্রীতদাস, খোজা ও অন্যান্যদিগকে সিপাহীর তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের বেতন পকেটস্থ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে ওসমানীয় অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বিলীন হইয়া যায়।

সরাসরি কর প্রথার পরিবর্তে জেলার কর সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করিবার প্রথা চালু করা হয়। কর তেমন উচ্চ ছিল না কিন্তু আদায় করিবার পন্থা ছিল জনগণের নিকট অত্যাচারমূলক। এক এক জেলার কর বাজারে বিক্রয় হইত এবং ক্রেতাকে গ্রামবাসীর খরচায় তাহার লাভ আদায় করিতে হইত। প্রশাসনের পদসমূহ যেহেতু উপঢৌকনের সাহায্যে লাভ করা যাইত, সেইহেতু প্রত্যেককে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে হইত, যাহাতে সে তাহার উপরওয়ালাকে এবং এইভাবে সুলতানকে পর্যন্ত অর্থের এক ভাগ প্রদান করিতে পারে।

উলামা, শাসকশ্রেণী, মিল্লাতের নেতা ও ব্যবসায়িগণ (যাহারা অধিকাংশই ছিল খ্রিস্টান) সবাই এই কাজে জড়িত ছিল এবং সমভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলিয়া অবস্থার পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। তাহারা এই প্রথা পছন্দ করিত কারণ ইহা তাহাদিগকে সুবিধাদি প্রদান করিয়াছে এবং ইহার উপরে কোনো শক্তিশালী লোক তাহারা চাহিত না। এই প্রথার প্রচলন চাহিত তাহাদের নিজস্ব উপকারার্থে, জনগণের জন্য নহে। এই প্রথা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহারা সর্বদা একত্র হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু একবার বিপদ কাটিয়া গেলে তাহারা তাহাদের লুটের কাজ চালাইয়া যায়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ক্রমাবনতির বর্ণনা করিবার সময় আরও দুইটি কারণ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। একটি হইল অর্থনৈতিক। আমেরিকার নূতন বিশ্ব আবিষ্কার ও ইউরোপের ব্যবসানীতি বহিঃপ্রকাশের ফলে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিবর্তিত হইয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসা গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে এবং সমুদ্রপথ স্থলপথের স্থান দখল করে। ইহা

ওসমানীয় অর্থনীতিতে মর্মাঘাত হানে বলিয়া পুঁজি খাটাইবার আর কোনো উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং সামগ্রিকভাবে স্বাধীন জাতিসমূহের মহাদেশ হিসাবে ইউরোপের উত্থান একই সময় সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক লোকজন বাজার ও কাঁচামালের খোঁজে চতুর্দিকে যাইতে আরম্ভ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় একটি পতনোন্মুখ বিশাল প্রতিমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ওসমানীয়দের ক্ষতির বিনিময়ে বিস্তৃতি লাভ করে মূলত সমগ্র ইউরোপের অংশগ্রহণে স্বাক্ষরিত ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দের কার্লোভিজের (Karlowitz) চুক্তি হইল ইউরোপে ওসমানীয় আধিপত্যের পরিসমাপ্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা।

ষোড়শ অধ্যায়
ইরানের সাফাভীয়গণ

ইসমাইল ১ম (১৫০০ - ১৫২৪)	সোলাইমান (১৬৬৭ - ১৬৯৪)
তাহ্মাসপ ১ম (১৫২৪ - ১৫৭৬)	হোসাইন (১৬৯৪ - ১৭২২)
ইসমাইল ২য় (১৫৭৬ - ১৫৭৮)	তাহ্মাসপ ২য় (১৭২২ - ১৭৩১)
খোদা বান্দেহ্ (১৫৭৮ - ১৫৮৭)	আব্বাস ৩য় (১৭৩১ - ১৭৩৬)
আব্বাস ১ম (১৫৮৭ - ১৬২৯)	নাদের সাহ আফসার (১৭৩৬ - ১৭৪৭)
সাফি (১৬২৯ - ১৬৪২)	করিম খান জান্দ (১৭৪৭-১৭৭৯)
আব্বাস ২য় (১৬৪২ - ১৬৬৭)	

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগের মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র এক হাজার বৎসর পরের মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র হইতে তেমন ভিন্ন রকমের নহে। সপ্তম শতাব্দীতে এই এলাকায় দুইটি শক্তির আধিপত্য ছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ছিল এশিয়া মাইনর, অধিকাংশ ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার উপর এবং তাহারা শাসন করিত কনস্টান্টিনোপল হইতে। ইরানের সাসানীয়গণ শাসন করিত টাইগ্রীস হইতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর হইতে ককেসাস ও আরাল নদী পর্যন্ত এই সমগ্র এলাকা। এই দুইটি সাম্রাজ্য একে অপরের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিতে করিতে নিজদিগকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলে যে শেষ পর্যন্ত তাহারা মরুভূমির আরবদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আমরা মধ্যপ্রাচ্যকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় দুইটি শক্তির দ্বারা একই এলাকায় কর্তৃত্ব করিতে দেখি ঃ এশিয়া মাইনরে ওসমানীয়গণ এবং ইরানে সাফাভীয়গণ। এই দুই সাম্রাজ্য উহাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে করিতে অচলাবস্থায় পতিত হয়। খুব স্বভাবতই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেমন কেউ কেউ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাইজেন্টাইন ও সাসানীয়গণ যেরূপ নিজদিগকে দুর্বল করিতে করিতে আরবদের হাতে পতিত হয়, অনুরূপভাবে ওসমানীয় ও পারস্যবাসিগণও নিজদিগকে দুর্বল করিতে করিতে ইউরোপীয়দের হাতে পতিত হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তাহার নির্ণয় করিতে যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তাহা এই আলোচনার আওতার বাহিরে। তবে এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল।

মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পারস্যবাসিগণ রাজনৈতিক কার্যাবলী ত্যাগ করে এবং নিজদিগকে সুফীবাদে নিমজ্জিত করিয়া অতীন্দ্রিয়বাদে তাহাদের সময় ব্যয় করে। তাহারা তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সজীব রাখে। নিজেরা রাজনৈতিক ও বংশানুক্রমিক কার্যাবলীতে উৎসাহিত না হইলেও যাহারা এই সবের মধ্যে ছিল তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মোঙ্গল ও বিভিন্ন তুর্কি বংশের মধ্যে যাহারা ইরানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়াছে তাহারা পারস্যবাসিদের সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং স্বল্প ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র ফার্সি ভাষা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচলন করে।

মোঙ্গল আক্রমণের পর হইতে ১৫০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে কোনো একক ও শক্তিশালী সরকার ছিল না। ইলখানগণ খ্রিস্টান ও ইসলামের মধ্যে কোনটি গ্রহণ করিবে ইতস্তত

করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত শেষোক্তটি গ্রহণ করে এবং আনাতোলিয়ার তুর্কিদের ন্যায় নিজদিগকে সুফী ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে। গাজান খান ধর্মের দ্বন্দ্বটির সমাধান করেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া যান। তিনি শেখ সফি জিলানী (মৃত্যু ১৩৩৪ খ্রিঃ) নামে একজন সুফীর প্রভাবে আসেন, যিনি কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে রাস্ত নামক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি শাখা গঠন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে সুফীদের সাফি শাখা শীয়া দলের সঙ্গে মিলিত হয়। সুন্নিদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও অনেক অজ্ঞলোক ছিল, যাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া যায় এবং অনেক সৈনিকও ছিল যাহারা অস্ত্রের জোরে শীয়া মতবাদ প্রসার করিবার জন্য উৎসাহী হয়। সাফাভীয়দের সামরিক অনুসারিগণ লাল শিরস্ত্রাণ পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে 'লাল মস্তক' বা কিজিলবাস বলা হইত।

কিজিলবাসের সদস্যগণ তাহাদের নেতার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের জন্য সুপরিচিত ছিল। এই নেতৃত্বপদটি উত্তম শীয়া ঐতিহ্য অনুসারে ছিল বংশানুক্রমিক। তাহারা প্রতিনিয়ত সুন্নি গাজী রাষ্ট্রগুলির সহিত এবং পরে এশিয়া মাইনরের ক্ষমতাসীন ওসমানীয়দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এশিয়া মাইনরে বহুসংখ্যক শীয়া সমর্থক ছিল যাহারা ওসমানীয়দের দেহে কাঁটার ন্যায় বিরাজ করে। সাফির সরাসরি বংশধর ইসমাইল, বাল্য বয়সে ইরানে ছিলেন এবং তথায় তাঁহার পিতা শেখ হায়দর ছিলেন এই শাখার নেতা। তিনি ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন। পিতার অনুসারীদিগকে লইয়া ইসমাইল ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আরদাবিল গমন করেন। তিনি তখন ১৩ বৎসর বয়স্ক। দুই বৎসরের মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য বালক সমগ্র শীরভান, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান জয় করেন এবং নিজেকে শাহ্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

সাফাভীয়গণ পিতার দিক হইতে সৈয়দ (রসুলুল্লাহ্‌র বংশধর) এবং মাতার দিক হইতে সাসানীয় সম্রাটদের বংশধর বলিয়া দাবি করে। এই দাবির কোনোটাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। সম্ভবত তাহারা আজারবাইজানের তুর্কি বা কুর্দিশ গোত্রের সদস্য এবং তাহাদের প্রাথমিক অনুসারিগণ ছিল তুর্কমান। ইসমাইলের মাতৃভাষা ছিল তুর্কি এবং তিনি সেই ভাষাতেই কবিতা লিখেন। বস্তুত ওসমানীয়গণ যখন ফার্সি ভাষা ব্যবহার করিয়া গৌরব বোধ করিত, ঠিক তখনই ইসমাইলের দরবারে তুর্কি ভাষা ব্যবহৃত হইত। তবে সাফাভীয়গণ অতি দ্রুত পারস্যবাসী হইয়া যায় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের নেতাদের ন্যায় পারস্যবাসিদের পদবী ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং বহির্বিশ্বের নিকট পারস্যবাসী হিসাবে পরিচিত হয়।

ইসমাইল সমগ্র ইরান জয় করেন এবং তাহাদিগকে শীয়া হইতে বাধ্য করেন। তিনি সুন্নিদের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং এশিয়া মাইনরের শীয়াদিগকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচনা প্রদান করেন। শীয়া মতবাদ ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং ইহা ওসমানীয়দের, বিশেষত সুলতান সেলিমের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিঘ্নিত করে, যিনি মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে চাহিয়াছিলেন। তদুপরি শীয়া মতবাদ ইরানকে ওসমানীয়দের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। সাফাভীয়গণ তুর্কি হইলেও তাহারা নিজদিগকে পারস্যবাসী হিসাবে পরিচয় দেয় এবং সাফাভীয় বংশ নিশ্চয়ই পারস্য জাতীয় স্বাধীনতা আনয়ন করে।

যাহাই হউক, ২০ বৎসর বয়সে শাহ ইসমাইল ইরানের অধিকর্তা হন এবং এশিয়া মাইনরে সুন্নিদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিদ্রোহের সূচনা করেন। দ্বিতীয়ত বায়েজীদ ও প্রথম সেলিম ছিলেন শাহ ইসমাইলের সমসাময়িক। প্রথম সেলিম, যিনি ইসমাইলকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, একটি আপোসহীন পন্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মোটের উপর ওসমানীয় সুলতান ইরান অধিকার করিতে আগ্রহী ছিলেন না এবং ইসমাইল তাঁহার

অভিযানসমূহ পূর্বদিকে পরিচালনা করিলে এবং এশিয়া মাইনরকে একাকী ছাড়িয়া দিলেই বায়েজীদ সন্তুষ্ট হন।

ফার্সি ও তুর্কি উভয় ভাষায় লিখিত কমপক্ষে দুইটি পত্রে বায়েজীদ ইসমাইলকে তাঁহার বিজয়সমূহের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং 'পিতৃসুলভ' উপদেশ প্রদান করেন। সুন্নিদের কবর ও মসজিদসমূহ ধ্বংস এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করিতে তিনি ইসমাইলকে নিষেধ করেন। তিনি ইহাও ইঙ্গিত দেন যে ইসমাইল তাঁহার অবস্থাকে অত্যন্ত সঙ্গীন করিয়া তুলিবেন কারণ, "পারস্যবাসিগণ এমন এক জাতি যাহারা এমন কোনো বাদশাহকে মান্য করিবে না যে তাহাদের একজন নহে।" তবে ইসমাইল সুন্নিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দেন। বায়েজীদ ওসমানীয় প্রজাদিগকে ইরান যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু ইরানের কোনো পর্যটককে অত্যাচার করেন নাই। ইতোমধ্যে শাহ ইসমাইল উজবেকদের উপর একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করেন এবং তাহাদের নেতা শায়বাক খানকে বন্দী করেন। ইসমাইলের প্রতি সুফী যোদ্ধাদের অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্য এত প্রবল ছিল যে, শাহের আদেশে কিজিলবাস সত্য সত্যই বন্দীর কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। ইসমাইল শায়বাকের মাথার খুলি সোনায় মোড়াইবার আদেশ দেন এবং সমগ্র জীবন ইহাকে মদের পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরের ছাল বানাইতে আদেশ দেন এবং ভিতরে ঘাস ভরিয়া বায়েজীদের নিকট প্রেরণ করেন। বায়েজীদের পুত্র সেলিম পিতার ন্যায় তেমন আপোস মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি ইসমাইলের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং অনেক পারস্য ও তুর্কি ঐতিহাসিক ইহাকে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুত ইসমাইলের ক্রমবর্ধমান শক্তি বিশেষত সেখানে বসবাসকারী বিপুলসংখ্যক শীয়া সমর্থক এশিয়া মাইনরের জন্য ছিল সরাসরি হুমকিস্বরূপ। তদুপরি সুন্নি প্রাচীনপন্থীদের রক্ষক হিসাবে ওসমানীয়গণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

সেলিম সুলতান হইবার পর ইসমাইল তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া কোনো পত্র প্রেরণ করেন নাই, বরং সুন্নিদের সম্পত্তি ধ্বংসের কাজ অব্যাহত রাখেন। সুন্নি প্রাচীনপন্থীদের রক্ষাকর্তা হিসাবে ইসমাইলের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা ছাড়া সেলিমের গত্যন্তর ছিল না। সেলিমকে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হয় এবং ইসমাইল পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়া ওসমানীয়দিগকে ইরানের অভ্যন্তরে আনিতে চেষ্টা করেন। ওসমানীয় সৈন্যগণ পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানে সন্তুষ্ট ছিল না। বোধ হয় গরম, দুর্গম পার্বত্য এলাকা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধ যুদ্ধে অনীহা- এইসব কারণেই তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল। এমনকি জান-নিসারীগণও ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল। তবে সুলতান তাঁহার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন এবং স্বীয় রাজত্বে শীয়াদিগকে পাইলেই হত্যা করেন। অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রায় ৪০,০০০ শীয়া সুফীদিগকে ধ্বংস করেন। প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট উর্মিয়া (রেজাইয়া) হ্রদের পশ্চিমে কলড্রন নামক স্থানে। ওসমানীয়গণ নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে ইহা কোনো চূড়ান্ত বিজয় নহে। সেলিম কিছুকালের জন্য তাব্রিজ আয়ত্তাধীন রাখেন। ২৮ বৎসর বয়স্ক শাহ ইসমাইল এই পরাজয়ে কিছুটা হতাশ হইয়া পড়েন এবং মদপানে আসক্ত হইয়া পড়েন। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে কলড্রনের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা ২০০ বৎসরের দুই নায়ক, ওসমানীয় ও পারস্যবাসীর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ইহা সাফাভীয়দিগকে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। তুর্কি ও পারস্য উভয় ঐতিহাসিকদের

বাড়াবাড়ির ফলে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তবে সঠিকভাবে এতটুকু বলা যায় যে ওসমানীয়দের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছাড়াও তাহাদের সঙ্গে বন্দুক ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সাফাভীয় বাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে বর্শা, ধনুক ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত কিজিলবাস অশ্বারোহী বাহিনী। তাহারা সবাই ছিল শাহ ইসমাইলের ধর্মীয়- উৎসর্গীকৃত লোকজন যাহারা মহিলাদের উৎসাহে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বাহ্যত মহিলাগণ তাহাদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাহারা দেখিত কামানের সম্মুখে ধর্মান্ধ সাহসের কোনোই মূল্য নাই। এই তুর্কি গোলন্দাজ বাহিনীই কলড্রনের যুদ্ধে এবং দুই বৎসর পর মামলুকদের বিরুদ্ধে মারজদাবিকে ওসমানীয়দিগকে বিজয় প্রদান করে। সাফাভীয়গণ আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে কলড্রনের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হয়।

শাহ ইসমাইল মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। কলড্রনের পরাজয় সত্ত্বেও তিনি দুইটি আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। প্রথমত, ইহা শীয়া এবং দ্বিতীয়ত, ইহা পারস্যবাসী। শাহ ইসমাইল ও তাঁহাদের পুত্র শাহ তাহ্মাসপ প্রথমোক্তটিতে অধিক আগ্রহী ছিলেন, অপরদিকে শাহ আব্বাস ও পরবর্তী সাফাভীয়গণ শেষোক্তটিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমগ্র ইরানের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার পর শাহ ইসমাইল ও তাঁহার কিজিলবাস শিষ্যগণ তরবারির মুখে লোকদিগকে শীয়া মতবাদে দীক্ষা দেন এবং শীয়া মতবাদের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন করেন। যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাতে পরিশ্রান্তপারস্যবাসিগণ তেমন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই সাফাভীয় প্রভুত্ব ও শীয়া মতবাদ গ্রহণ করে। শীয়া মতবাদ ইরানের শীয়া তুর্কিদিগকে এশিয়া মাইনরের সুন্নি তুর্কিগণ হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং এই ব্যবধান আজ পর্যন্ত ঘুচে নাই। ইরান এবং পূর্বাঞ্চলে শীয়া আধিপত্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুন্নিদিগকেও মধ্য এশিয়ার সুন্নিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং ওসমানীয় সুলতানদের খলিফা হিসাবে একটি সম্মিলিত ইসলামী বিশ্ব শাসন করিবার আশা ব্যাহত করে।

১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে শাহ ইসমাইলের মৃত্যু হইতে ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে মহান শাহ আব্বাসের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সাফাভীয়গণ প্রথম তাহ্মাসপ, দ্বিতীয় ইসমাইল ও মোহাম্মদ খোদা বান্দেহ এই তিনজন শাহের অধীনে পূর্বদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং পারস্য উপসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগরের উভয় তীর এবং টাইগ্রিস নদী হইতে ট্রান্সঅক্সিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। তাহারা ওসমানীয়দের হাত হইতে নিজেদের এলাকা মুক্ত রাখে, তাব্রিজ পুনর্দখল করে এবং দক্ষিণে বাগদাদ ও উত্তরে আর্মেনিয়া লইয়া ওসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পরাজিত হয় এবং কখনও জয় লাভ করে। শাহ্কে একচ্ছত্র নেতা মানিয়া একটি শীয়া ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। এই রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ছিল কিজিলবাসের যোদ্ধাশ্রেণী। সমগ্র দেশ কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলাকে একজন কিজিলবারেস অধীনে ন্যস্ত করা হয়- যিনি ইহাকে জায়গির হিসাবে শাসন করেন। বিনিময়ে তিনি যুদ্ধের সময় শাহকে সৈন্য সরবরাহ করেন এবং রাজস্বের একাংশ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এই কিজিলবাস সামন্ত প্রভুদের দ্বারাই সমগ্র দেশকে শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। শহরে ও গ্রামে দেশের সর্বত্র প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ আবু বকর, ওমর ও ওসমানকে অভিশাপ দেওয়ার

ভিয়েনা
কৃষ্ণ সাগর
ইস্তাম্বুল
বুরসা
আঙ্কারা
এথেন্স
ভূমধ্য সাগর
কায়রো
মিশর
লোহিত সাগর
বিতর্কিত
বাগদাদ
পারস্য উপসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আরাল সাগর
আমুদরিয়া
সির দরিয়া
ওসমানীয় এবং সাফাভীয় সাম্রাজ্য
১৭০০ খ্রীস্টাব্দ
ওসমানিয়া
সাফাভীয়
মূল ওসমানিয় ক্ষুদ্র রাজ্যঃ অন্যূন ১৩০০ খ্রীঃ
সাফাভীয়দের আদি বাসস্থান : অন্যূন ১৫০০ খ্রীঃ
০
৬০০
মাইল
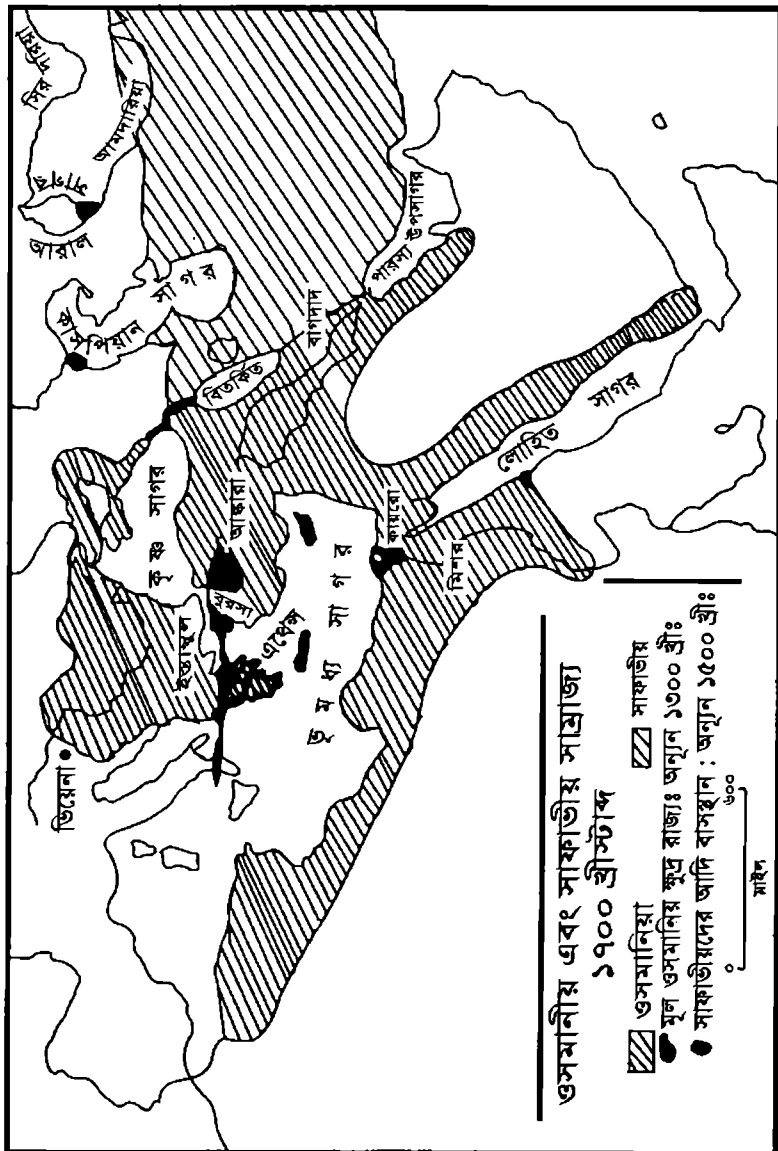
জন্য জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

পূর্বাঞ্চলে সাফাভীয়গণ এক বিরাট এলাকা শাসন করে। তাহাদের রাজধানী তাব্রিজ নিরাপত্তার দিক হইতে ওসমানীয় সীমান্তের অতি নিকটবর্তী বিধায় শাহ্ তাহ্মাসপ উত্তর-মধ্য ইরানের কাজভীন নামক শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিজিলবাস নেতৃবৃন্দ এমন ধনী ও শক্তিশালী হইয়া উঠেন যে, তাঁহারা উত্তরাধিকারের প্রশ্নেও হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রশ্ন সাধারণত সমগ্র ইসলামি বিশ্বে আরব, ওসমানীয় অথবা পারস্যবাসিদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট ও গুরুতর হইয়া উঠে। কিজিলবাসগণ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে একে অপরের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ক্রমশ কিজিলবাস শ্রেণীর "পরম খাঁটি নেতা" শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাশিয়ার বয়ারদের ন্যায় কিজিলবাস নেতৃবৃন্দ একজন একনায়কত্বের অধিকারী শাহের কেন্দ্রীভূত সরকারের চেয়ে তাহাদের নিজেদের কিছুসংখ্যক নেতার সম্মিলিত ক্ষমতা অধিকতর পছন্দ করেন। নরম স্বভাবসম্পন্ন অতীন্দ্রিয়বাদী শাহ মোহাম্মদ খোদা বান্দেহ- এর সময় তাহারা বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় এবং শাহকে একটি দুর্বল উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে প্রভাবান্বিত করেন। তাঁহাদের পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাহারা শাহের ভাবী উত্তরাধিকারী ও তাহার মাতাসহ অধিকাংশ সাফাভীয় যুবরাজকে হত্যা করে।

যাহা ইউক, ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উদ্ধার করা হয় এবং গোপনে তাঁহাকে খোরাসানে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েক বৎসর পর এই যুবরাজ অনুগত কিজিলবাসদের সহায়তায় বিবদমান নেতাদিগকে পরাজিত করেন এবং শাহ আব্বাস (১৫৮৭ খ্রিঃ) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ আব্বাসের সময় ইরান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। এক সহস্র বৎসরের ব্যবধানে অবিকল সাসানীয়দের ন্যায় সুবিস্তৃত এক ভুখণ্ডকে পুনরায় ইরান বলা হয়। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই কারণেই পারস্যবাসিগণ শাহ আব্বাসকে গর্ব ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করে এবং তাহাকে মহান উপাধিতে ভূষিত করে। শাহ আব্বাসের সৌভাগ্যবশত এমন এক সময় তিনি রাজত্ব করেন যখন ওসমানীয়দের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি কমপক্ষে পাঁচজন সুলতানের সমসাময়িক ছিলেন। উত্তরে রাশিয়া তখন ভয়াবহ আইভানের মৃত্যুর পর 'গোলযোগের সময়ে' নিপতিত হয়। শাহ আব্বাসের সমসাময়িক ছিলেন ভয়াবহ আইভান, বরিস গডিওনভ্ ও মাইকেল—ইহাদের ভিতর শেষোক্ত জন ছিলেন রোমানভদের লাইনের প্রথম। ফলে শাহ আব্বাস ওসমানীয় ও মস্কোবাসী উভয়ের ক্ষতির বিনিময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং অতি অল্প আয়াসে উত্তরে ট্রান্সঅক্সিয়ানায় এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু মালভূমিতে অনুপ্রবেশ করেন।

ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাহ আব্বাসের প্রথম কার্যাবলীর মধ্যে এইটি হইল, কিজিলবাস সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা হ্রাস করা। তাহাদের প্রতি তাঁহার শত্রুতার কারণ দুই প্রকার ঃ প্রথমত, ব্যক্তিগত কারণ, তাহারা তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক কারণ, তাহারা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে কিছুসংখ্যক লোকের সম্মিলিত শাসন কামনা করিত। তিনি নির্দয়ভাবে তাহাদিগকে হত্যা করেন। এতকিছুর পরও তিনি কিজিলবাস বাহিনী প্রতিপালন করেন, কিন্তু তাহাদের হাতিয়ার ছিল চিরাচরিত পুরাতন অস্ত্রসস্ত্র। তাহাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করিবার জন্য তিনি দুইটি বাহিনী গঠন

করেন, একটি হইল জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার অধিকাংশ খ্রিস্টান প্রজাদিগকে লইয়া এবং অপরটি হইল পারস্যবাসীদিগকে লইয়া। এই দুইটি বাহিনীকে তিনি আধুনিক বন্দুক ও গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

কিজিলবাসদিগকে ধ্বংস করিবার ফলে যোদ্ধাসুফীবাদও দুর্বল হইয়া পড়ে। শাহ আব্বাস তাঁহার পূর্বপুরুষদের ন্যায় ধর্মান্ধ শীয়া ছিলেন না। শাহ তাহ্‌মাসপ যেখানে খ্রিস্টানদিগকে তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিতে দিতেন না, পাছে 'কাফের' হিসাবে তাহারা ইহাকে অপবিত্র করিয়া দেয়, সেখানে শাহ আব্বাস বিদেশীদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং তাঁহার খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি সদয় হইবার জন্য সীমা অতিক্রম করিয়া যান। পরবর্তীকালে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে, খ্রিস্টান জাতিসমূহের সহিত কার্যকলাপে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিলেন, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা মানসিক ঔদার্য ছাড়া করিতে পারিতেন না।

তাঁহার নূতন রাজধানী ইসফাহানে তিনি বহুসংখ্যক আর্মেনিয়ানকে তাহাদের আবাসভূমি জোল্‌ফা হইতে আনয়ন করেন। ইসফাহানের জায়ানদেহ্ রুদ নদীর অপর তীরে তিনি নূতন জোল্‌ফা শহর নির্মাণ করেন এবং আর্মেনিয়ানদিগকে সেখানে বসবাস করিতে দেন। আরও অনেক আর্মেনিয়ান স্বেচ্ছায় সমগ্র ইরানে আসিয়া বসবাস করে। এশিয়া মাইনরের আর্মেনিয়ানদিগকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জামিন হিসাবে সম্ভবত শাহ আব্বাস এইসব আর্মেনিয়ানদিগকে আনয়ন করেন। তাহা সত্ত্বেও ইরানে আগমনের পর আর্মেনিয়ানদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তাহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের উপর উদারনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নিজস্ব বাড়ির মালিক হইতে পারিত, ঘোড়ায় চড়িতে পারিত এবং যে কোনো প্রকারের কাপড় পরিধান করিতে পারিত। ইহা এমন সুবিধা যাহা শাহ আব্বাসের পূর্বে এবং পরে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অমুসলিমগণ উপভোগ করিতে পারে নাই। ইরানের ব্যবসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিযোগ্য কাপড় সিল্ক, শাহের একচেটিয়া হইয়া যায় এবং আর্মেনিয়ান ব্যবসায়িগণ ইহা তাঁহার জন্য পরিচালনা করে। খ্রিস্টানদের সঙ্গে সদয় হইয়া এবং ক্যাথলিক মিশনগুলিকে ইরানে বাস করিবার অনুমতি দান করিয়া, তিনি ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করেন, পারস্য উপসাগরে অনেকগুলি ইউরোপীয় জাহাজের অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিতে চান এবং ওসমানীয়দের নিকট হইতে ব্যবসা ছিনাইয়া লইতে আশা করেন। বস্তুত চাতুরিমূলক মন্তব্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি রোমের কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান পাদ্রীকে বিশ্বাস করাইতে সক্ষম হন যে, তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে একরূপ প্রস্তুত। এক সময় তিনি এমন কি ইহা জানাইয়া দেন যে, তাঁহার রাজত্বের যে কোন মুসলমান ইচ্ছা করিলে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

শাহ্ আব্বাস অবশ্য একজন শীয়া মুসলমান ছিলেন এবং ওসমানীয়দের সুন্নি মতের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইরানের শীয়া মতবাদ সুদৃঢ় করিবার নীতি চালাইয়া যান। কয়েক বৎসরের মধ্যে পারস্যবাসিদের জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় ভাব ধারণ করে এবং শীয়া মতবাদ ও পারস্য জাতীয়তাবাদ এক এবং অভিন্ন হইয়া উঠে।

শাহ্ আব্বাস মাশ্‌হাদে অষ্টম ইমাম আলী আল-রিযার কবরের উপর একটি অতি সুন্দর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন এবং এই সৌধের নির্মাণ কাজ শেষ হইলে ইসফাহান হইতে পদব্রজে সেখানে তীর্থগমন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা

করেন। পরবর্তীকালে মাশহাদে তীর্থযাত্রা মক্কা ও হোসাইনের কবর কারবালায় তীর্থযাত্রার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি মাশহাদে গমন করে তাহাকে 'মাশহাদী' উপাধি দেওয়া হয় এবং মক্কা গমনকারী হাজী ও কারবালায় গমনকারী কারবালী-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া যায়। প্রথম ইমাম আলীর প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিবার জন্য সাফাভীর শাহ্গণ নিজেদেরকে আলীর চৌকাঠের কুকুর (Dog of the threshold of Ali) হিসাবে উল্লেখ করেন।

বাণিজ্য ও শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য শাহ আব্বাস অনেকগুলি কার্যক্রম অবলম্বন করেন। বাণিজ্যপথের উভয় পার্শ্বে তিনি বহু সরাইখানা ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন। দেশের সর্বাঞ্চলের অসৎ সরকারি কর্মকর্তাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এই জন্যই তিনি যে সাধারণ লোকের নিকট খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এই কথা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায়। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে জনগণের মধ্যে তাঁহার বিচরণ করিবার অভ্যাস অনেকগুলি গল্পের সূত্রপাত করিয়াছে, যেইগুলি আজও পারস্যে দাদীআম্মাগণ তাহাদের দৌহিত্রদিগকে শোনায়। তাঁহার যুগের অন্যান্য সম্রাটদের ন্যায় তিনিও অত্যাচারী ছিলেন এবং বহু লোককে তাঁহার আদেশে হত্যা করা হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, অবশিষ্ট তিনজনের একজনকে হত্যা করা হয় এবং দুইজনকে তাঁহার আদেশে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পুত্রদের বিরুদ্ধে প্রায় সবগুলি অপরাধই ছিল ভিত্তিহীন। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ আব্বাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমসাময়িক ভয়াবহ আইভানের ন্যায় তাঁহার কোনো উপযুক্ত উত্তরাধিকারীই অবশিষ্ট ছিল না, কারণ তিনি তাহাদের সবাইকেই হত্যা করেন।

সুন্নি ধর্মতন্ত্রের ন্যায় শীয়া ধর্মতন্ত্রও উলামাদের দ্বারা সাহায্যপুষ্ট হয়। ওসমানীয়দের শেখ-উল-ইসলামের সমপর্যায়ে সাফাভীয়দের ছিল মোল্লাবাশী যিনি সমস্ত উলামাদের প্রধান ছিলেন। তিনি অপর তিনজন বা চারিজনের ন্যায় মুজতাহিদ ছিলেন, অর্থাৎ লুক্কায়িত ইমামের প্রতিনিধি হিসেবে যে কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার ছিল। লুক্কায়িত ইমামই ছিলেন সত্যিকারের রাষ্ট্রপ্রধান। এইভাবে শীয়াগণ সুন্নিদের মত নিজদিগকে শরিয়তের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, যদিও ইহা তাহাদিগকে কোনো অংশে কম রক্ষণশীল করে নাই। উলামাদিগকে আইন ও ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যাপারে শাহ্ আব্বাস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিদেশী দূতগণ আগমন করিলে দূতদের সম্মানে আয়োজিত অভ্যর্থনায় সচরাচর উলামাগণ উপস্থিত থাকিতেন না। কখনও কখনও তাঁহারা এইসব অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু সাধারণত মদ্য পরিবেশন অথবা অতিথিদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তাঁহারা ভোজসভা ত্যাগ করিতেন। কিন্তু শাহ্ আব্বাসের বংশধরগণ উলামাদের নিকট ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। শাহ সুলতান হোসাইন ধর্মের দিক হইতে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন যে উলামাদের উপদেশ ব্যতীত তিনি কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন না। এই দুর্বল মতামতহীন শাহ্ আফগানদের নিকট তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা হারাইয়া ফেলেন। দ্বিতীয় তাহ্মাসপও তেমন উত্তম ছিলেন না। সৌভাগ্যের সৈনিক নামে পরিচিত 'ইরানের নেপোলিয়ন' শাহ নাদিরের উত্থান না হইলে সমগ্র সাম্রাজ্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। নাদিরের কৃতিত্ব অধিককাল স্থায়ী না থাকিলেও ইহা এমন সময় আত্মপ্রকাশ করে যখন ইহা ইরানকে স্থিতিশীলতা দান করে এবং

একটি শক্তিশালী সরকারসহ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে সহায়তা করে।

নাদির ছিলেন একজন তুর্কি এবং আফশার গোত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আফশার সাফাভীয়দের প্রতি অনুগত একটি তুর্কি গোত্র। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সাফাভীয় সেনাবাহিনীতে তিনি একজন অফিসার ছিলেন। সাফাভীয়দের দুর্বলতার ফলে ওসমানীয়গণ সুন্নি আফগানদের দ্বারা ইরান আক্রমণ করাইতে উৎসাহিত হয়। তাহাদের সাফল্য প্রসিদ্ধ পিটারের অধীনস্থ রুশ ও তৃতীয় আহমদের অধীনস্থ ওসমানীয়দের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে পিটারের মৃত্যুর ফলে রুশগণ তাহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, কিন্তু ওসমানীয়গণ তাহাদের শত্রুতা অব্যাহত রাখে এবং প্রথম মাহমুদই ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ তাহ্মাসপকে পরাজিত করেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইরান ককেসাসে পাঁচটি নগর ত্যাগ করে।

এই সমস্ত ঘটনায় নাদির সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই শাহের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং শাহের শিশুপুত্র তৃতীয় আব্বাসকে শাহ হিসাবে এবং রাজপ্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি অতঃপর চুক্তিভঙ্গ করেন এবং ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে শিশু শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং নাদির স্বয়ং ক্ষমতা দখল না করিয়া বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের প্রতিনিধিদিগকে একত্রিত করেন, যাহাতে তাহারা তাহাকে শাহ হইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন।

আজারবাইজানের দাস্ত-এ-মোঘাঁ-এ এই বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর্মেনিয়ান ক্যাথলিকাস নামক একজন প্রতক্ষদর্শী এই সম্মেলনের বিশদ বর্ণনা দান করেন। তাহাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাহার ধারণা অনুসারে এক সহস্র প্রতিনিধি ইহাতে অংশগ্রহণ করে। নাদির ঘোষণা করেন যে তিনি দেশকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি 'বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত' হইবার দরুন খোরাসানে অবসর বিনোদন করিতে চান। তিনি তখন ৪৮ বৎসর বয়স্ক। শাহ হইবার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা তখন প্রতিনিধিদের জন্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। পরদিন প্রতিনিধিদল তাঁহার তাঁবুর সম্মুখে একত্রিত হন এবং বলেন যে তাহারা বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চেয়ে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি তাহারা লাভ করিতে পারেন নাই। নাদির অতঃপর এইরূপ একটি দৃশ্যের অবতারণা করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি বলেন, তিনটি শর্তসাপেক্ষে তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

১। সাভাফীয় বংশের কোনো সদস্যকে সাহায্য না করিবার স্বপক্ষে তাঁহাদিগকে রাজি হইতে হইবে।

২। তাঁহার পুত্রকে আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসেবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রথম তিন খলিফাকে তাহারা অভিশাপ দিবে না এবং সুন্নিদিগকে অত্যাচার করিবে না।

• এই শর্তগুলি গ্রহণ করা হয় এবং ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মার্চ তিনি শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন।

নাদির শাহ শীয়াও ছিলেন না সুন্নীও ছিলেন না, বরং একজন স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শীয়া উলামাদের ক্ষমতা খর্ব করা এবং নিজেকে অন্ততপক্ষে সাময়িকভাবে হইলেও পূর্বদিকে তাঁহার ব্যস্ত থাকাকালীন সময়ে ওসমানীয়দের হাত হইতে রক্ষা করা। ১৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকার করেন। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২০শে

মার্চ, তিনি ভারতবর্ষের মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করেন এবং দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এই অভিযানে তিনি দুইটি মূল্যবান সিংহাসন, তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন ছাড়াও তাঁহার সঙ্গে করিয়া প্রসিদ্ধ মুক্তা কোহ্-এ-নূর এবং আরং অনেক ধনসম্পদ আনয়ন করেন, যাহার ফলে তিন বৎসরের জন্য তিনি পারস্যবাসীদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিতে সক্ষম হন। রুশ ও ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু এইগুলি বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ তাঁহার চরিত্র পরিবর্তন হইয়া যায়, তিনি সন্দেহপরায়ণ ও নিষ্ঠুর হইয়া যান। স্বীয় পুত্রকে তিনি অন্ধ করিয়া ফেলেন। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুন তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

অদৃষ্টের পরিহাস তাঁহার গুপ্তহত্যার কারণ চরিত্রহীনতা নহে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম। নাদির শাহ ছিলেন একজন স্বাধীন মতাবলম্বী। তিনি সমস্ত ধর্মকে একত্রীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন ও নূতন টেস্টামেন্টদ্বয়কে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করিবার আদেশ প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনকে তিনি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদিগকে তিনি ইরানে একত্রিত করেন এবং তাহাদিগকে বলেন যে, খোদা যদি এক হইয়া থাকেন তবে ধর্মও একটি থাকা উচিত। তিনি স্বয়ং মুহাম্মদ (সঃ) ও আলীর সমকক্ষ বলিয়া দাবি করিবার ফলে শীয়া ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। তিনি বলেন, তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাদের যুদ্ধের সাফল্যের ফলে এবং যুদ্ধের দ্বারা আমি এই পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছি।[১] ইসলামকে একত্রীভূত করিতে তিনি আগ্রহী হন। এই উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য ওসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদের নিকট একটি পাঁচধারার প্রস্তাব প্রেরণ করেন।

১। শীয়া মতবাদকে সরকারিভাবে ইসলামের পঞ্চম চিন্তাধারার পীঠস্থান বলিয়া স্বীকার করা হউক।[২]
২। মক্কায় শীয়াদের বিশেষ স্থান দেওয়া হউক।
৩। প্রত্যেক বৎসর ইরান হইতে হজ্জের জন্য একজন বিশেষ নেতা, আমীর আল-হাজ্ব প্রেরণ করা উচিত।
৪। ওসমানীয় ও পারস্যবাসিগণের মধ্যে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা উচিত।
৫। ওসমানীয় ও পারস্যবাসিগণের মধ্যে দূত বিনিময় করা উচিত।

নাজাফের শীয়া নেতৃবৃন্দ এই খবরে বিচলিত হইয়া পড়েন। তাহারা এই ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করেন এবং নাদির শাহের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন যাহা তাঁহার গুপ্তহত্যায় পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। নাদির শাহের ব্যর্থতা প্রমাণ করে, পারস্যবাসিগণ শীয়া মতবাদের প্রতি কতদূর গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল।

নাদির শাহের মৃত্যু আরও বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা করে। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মনে হইল করিম খান জান্দ-এর নেতৃত্বে শিরাজের একটি পারস্য বংশ এই অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তাহার অসময়ে মৃত্যুর ফলে উত্তরের তুর্কি কাজার বংশের আগা মুহাম্মদ ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা হস্তগত করিবার সুযোগ লাভ করেন। কাজার শাসনামলের ইরানের ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। ইহা পরে আলোচনা করা হইবে।

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৯, ১০১।*

২. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১৩।*

সপ্তদশ অধ্যায়

দুই শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

মোঙ্গল আক্রমণ ও বাগদাদের পতন ইরানের স্বাতন্ত্র্যকে খতম করে এবং ইহাকে ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, কূটনীতিবিদ ও দুঃসাহসিক কার্যের নায়ক—এইসব ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আনয়ন করে। ক্রুসেডারগণ ইরান ও পশ্চিমের বাকি মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তাহারা ইরানের শাসকদিগকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিতে সচেষ্ট হয়। ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ইউরোপীয়গণ ইলখান ও তিমুরীয়দের নিকট ধরনা দেয়। এই সম্পর্ক উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক হয় এবং মহান শাহ আব্বাস ইহাকে আরও সুদৃঢ় করেন।

ইহার অর্থ এই নহে যে, ইউরোপীয় দেশসমূহ ও ওসমানীয়দের মধ্যে কোনো বাণিজ্যিক বা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ইউরোপের অনেক দেশ ওসমানীয়দের সঙ্গে ব্যবসা করিবার জন্য একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তবে তুর্কিগণ আরও শত্রুভাবাপন্ন হইলে এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন করিলে, মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। শান্তির সময় তথায় কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং দূত বিনিময় হয়। প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলা সত্ত্বেও ভেনিস দীর্ঘকাল ওসমানীয়দের সঙ্গে ব্যবসা চালাইয়া যায়। তবে এইসব সম্পর্ক হয়ত যুদ্ধের ফলে বিনষ্ট হয় অথবা সর্বদাই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয়। সাধারণত যেইসব দেশের বিরুদ্ধে সুলতান বিবাদ আরম্ভ করেন, সেইসব দেশের দূতদিগকে বন্দী করা হয়। তদুপরি ওসমানীয়গণ সর্বদাই সজাগ ছিল যে, ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভের জন্য তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। ফলে যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, উহা খুবই শোচনীয় ছিল এবং পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা সেই সম্পর্ক দৃঢ়বদ্ধ ছিল না।

তবে ইরানের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাফাভীয়গণ অত্যন্ত ধর্মান্ধ অবস্থায়ও কখনও ধারণা করিত না যে, তাহারা কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য আল্লাহর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা আদিষ্ট হইবার বিষয় অনুভব করিলেও মনে করিত যে ইহা সুন্নিদিগকে দীক্ষিত বা ধ্বংস করিবার জন্য। বিপথগামী ওসমানীয়দিগকে তাহারা বা কাফের খ্রিষ্টানেরা যে-ই ধ্বংস করুক না কেন তাহাতে কিছুই যায় আসে না। ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যও যেহেতু ওসমানীয় শক্তিকে ধ্বংস করা ছিল সেইহেতু পারস্যে ইউরোপীয়গণ একে অপরের প্রতি সমতার ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। ইরান ইউরোপীয়দের নিকট প্রয়োজনীয় ছিল বা অন্ততপক্ষে তাহারা প্রয়োজনীয় মনে করিত- ওসমানীয়দের চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য। ইউরোপ পারস্যবাসিদের নিকট প্রয়োজনীয় ছিল ওসমানীয়দিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিবার জন্য এবং আরও গুরুত্ব সহকারে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার জন্য।

ইসলামের উপর পৌত্তলিক মোঙ্গলদের চমকপ্রদ বিজয় ইউরোপীয়দিকে মোঙ্গলদের সহিত একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে উৎসাহ প্রদান করে, যাহাতে তাহারা একদিকে ইসলামের অভিযানমূলক স্বভাবের মোকাবিলা করিতে পারে ও অপরদিকে মোঙ্গলদিগকে

খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারে। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট মোঙ্গলদের নিকট দুইটি দূত প্রেরণ করেন। এইগুলির একটিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন ইটালিয়ান পাদ্রী জীওভ্যানী ডি পিয়ানো কাপিনী। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মোঙ্গলীয়া পৌছেন এবং ওগতাই তাঁহার পিতা চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুই (১২২৬-১২৭০ খ্রিঃ) মোঙ্গলদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাহাদের নিকট একটি দূতদল প্রেরণ করেন।

আব্বাসীয়দের পতনের পর ইউরোপীয়গণ ইরানে অভিনন্দিত হইতেছে বলিয়া অনুভব করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তথায় আগমন করে। ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন মার্কোপোলো (১২৫৪-১৩২৪ খ্রিঃ) যাহার দুঃসাহসিক কার্যাবলীর লিপিবদ্ধ রূপ অনেক ইউরোপীয়দের পূর্বদিকে ভ্রমণ করিবার আগ্রহ উজ্জীবিত করিবার জন্য যথেষ্ট কাজে আসিয়াছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক বৎসরগুলিতে ইউরোপীয়গণ এই নূতন শক্রর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা অধিক পছন্দ করে। গাজান খানের (১২৯৫-১৩০৪ খ্রিঃ) রাজত্বকালে অবরুদ্ধ কনস্টান্টিনোপলের তুলনায় ইরানই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে। তাব্রিজ ছিল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র।

তৈমুরের দরবারে কাস্টিলের স্পেনীয় শাসকদের প্রেরিত দূতদের কথা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে।[১] আংকারার বায়েজীদের বিরুদ্ধে তৈমুরের একটি অভিযান পরিচালনার প্রাক্কালে তাহারা আগমন করে। তাহারা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এবং বিজয়ী আমীরের সঙ্গে পরে সমরকন্দে গমন করে। ইহা এবং অন্যান্য দূতদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সেই যুগের মধ্যপ্রাচ্যের জীবন ও সংস্কৃতি পাঠ করিবার পক্ষে অতি চমৎকার উপাদান।

সাফাভীয় নীতির ভিত্তি ছিল ওসমানীয়দের প্রতি শক্রতার উপর। ইরানে জাতীয় চেতনা দুর্বল হইয়া পড়ে বিশেষত মোঙ্গলদের ধ্বংসকার্য দ্বারা। তখন হইতে জনসাধারণ ধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়ে। সাফাভীয়গণ এই ভাবধারাকে ব্যবহার করে এবং শীয়া মতবাদকে নূতন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। সাফাভীয়গণ ইরানকে বাকি মুসলিম বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং ইউরোপীয়দের বন্ধুত্ব লাভ করে। শাহ আব্বাস বিশেষভাবে খ্রিস্টান আর্মেনিয়ানদের সহায়তা করেন, যাহাদিগকে তিনি ইসফাহানে আনয়ন করেন। তিনি তাহাদের জন্য গীর্জা নির্মাণ করেন এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যিক সুবিধাদি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। তাহাদিগকে আমদানি ও রপ্তানি কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ডাচ, ইংরেজ, রুশ, ফরাসি ও ভারতীয় ব্যবসায়িগণ ইরানে ব্যবসা করে। এমন কি ওসমানীয় ব্যবসায়িগণ শান্তির সময় ইরানে বাণিজ্যিক কাজ কারবার করাটাকে লাভজনক বিবেচনা করিত।

অর্থনৈতিক দিক হইতে পারস্যবাসিদের জন্য ইহা ছিল সুসময়, কারণ বাণিজ্যিক পথ ভূমধ্যসাগর হইতে সরিয়া যায়। ইউরোপীয়গণ অন্যান্য পথের সন্ধানে ছিল। পর্তুগালের নাবিক হেনরী মুসলমানদের নিকট হইতে পশ্চিম আফ্রিকার বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৬।*

এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা খুলিবার জন্য অন্তরীপের (কেপ) পথ ব্যবহার করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষ হইতে মসল্লা আমদানি আরম্ভ করে এবং নিজদিগকে পারস্য উপসাগরে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে শাহ ইসমাইলের রাজত্বকালে এডমিরাল আলবুকার্কের অধীনে পর্তুগীজ নৌবহর পারস্য উপসাগরের হরমুজে অবতরণ করে। তাহারা হরমুজ, বাহ্‌রাইন ও মস্কটে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরমুজ ছিল বিশ্বের অতি প্রসিদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। মিলটন তাঁহার 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক গ্রন্থে ইহার গৌরব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিসরের মামলুকগণ এবং ভেনিসের ব্যবসায়িগণ, যাহারা স্থলপথে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছিল, তাহারা এখন অবহেলিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সিনাই পর্বতের সেন্ট ক্যাথারিন মঠের এ্যবটকে (The Abbot of st. Catherine's Monastery at Mt. Sinai) রোমে পাঠানো হয়। মামলুকগণ ভেনিসসহ পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজদিগকে ব্যবসা করিতে বারণ করিবার জন্য পোপকে রাজি করাইতে চেষ্টা করে। মামলুকগণ এইজন্য খ্রিস্টানদের পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করিবার হুমকিও প্রদান করে।

প্রতিনিধিদল প্রেরণ বা হুমকির দ্বারা কোনো ফল না হইলেও কাহারও নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত নহে যে, ল্যাভাঁ'র স্থলপথের ব্যবসা অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে প্রাচ্যের সিল্ক, মসল্লা ও রং এবং ঔষধাদির প্রধান কাফেলার স্থান হিসাবে আলেপ্পো তখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। তবে ইহা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল জলপথে এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগর একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

শাহ ইসমাইলও পর্তুগীজদের হরমুজ অধিকারের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এক বৎসরের সলাপরামর্শের পর ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্কের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। পারস্য উপসাগরের পর্তুগীজ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি পারস্যের স্বীকৃতির বিনিময়ে পর্তুগীজগণ ইরানকে বাহরাইন দখল করিবার এবং বেলুচিস্তান ও মাকরানের উপকূলে জলদস্যুদিগকে দমন করিতে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। তাহারা ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করিতে রাজি হয়। ১৫৫১ ও ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজগণ যথাক্রমে প্রথমে শাহ তাহ্‌মাসপ ও দ্বিতীয় শাহ্ ইসমাইলের নিকট দূত ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ করে। এই উভয় সম্রাটই ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং তাঁহারা 'কাফেরদের' সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক পছন্দ করিতেন না। তবে ভাল সম্পর্ক ও ব্যবসা সমানে চলিতে থাকে।

স্পেন পর্তুগালকে গ্রাস করিবার পরও পারস্য উপসাগরে বাণিজ্যকুঠি ও কারখানাগুলির কাজ চালু থাকে। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ (রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রিঃ) ইরানে পিয়ার সায়মন মোর‍্যাল্‌স-এর নেতৃত্বে একটি দূতদল প্রেরণ করেন। শিপার সায়মন ফার্সি জানিতেন। ফিলিপ তিনটি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ঃ

১। ইরান ক্যাথলিকদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করুক।

২। ইরান পিয়ার স্পেনীয়দিগকে বিশেষ সুবিধাদি দান করুক।

৩। ইরান ওসমানীয়দের সহিত কোনো শান্তি চুক্তি সম্পাদন হইতে বিরত থাকুক। দৃশ্যত এইসব অনুরোধ ছিল সাফাভীয় নীতির অনুকূলে। প্রত্যুত্তরে একই পাদ্রীসহ একটি পারস্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 'বঁ ভয়েস' নামক সেই জাহাজটি পথিমধ্যে হারাইয়া যায়।

১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে দুইজন পর্তুগীজ পাদ্রী, একজন ফ্রান্সিসীয়, আলফন্সো করডেরো এবং আরেকজন ডোমেনিকান, নিকোলে ডি মেলো ইসফাহানে আসেন। শাহ্ আব্বাস তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেষোক্তজনকে শাহ একটি মুক্তাখচিত ক্রুশ উপহার প্রদান করেন। একটি গীর্জা ও ধর্মীয় ভবন নির্মাণের জন্য পাদ্রীদেরকে জমিও বরাদ্দ করা হয় এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ধর্মীয় কাজ চালাইয়া যান। ইরানকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য স্পেন বিশেষভাবে উদগ্রীব ছিল এবং শাহ্ আব্বাস কামনা করিতেন যে স্পেন ওসমানীয়দিগকে সমুদ্রপথে ব্যতিব্যস্ত করুক। খ্রিস্টানদের বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যস্থতা করিবার জন্যও তিনি ফিলিপকে অনুরোধ করেন। কিছু শর্তসাপেক্ষে হরমুজের মাধ্যমে ইরানের সমস্ত সিল্ক রপ্তানি করিতেও তিনি রাজি ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বৃটিশেরা দেখিল যে, পর্তুগীজ ও স্পেনীয়গণ অন্তরীপের (কেপ) পথ একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে; তাই তাহারা রাশিয়ার মধ্য দিয়া উত্তরের পথে বাণিজ্য প্রচেষ্টা চালায়। এই পথের সুবিধা ছিল এই যে, ইহা তাহাদিগকে ইরানে লইয়া যাইবে এবং চীনের শীতল এলাকার পথও মুক্ত করিবে; যেখানে ইংরেজদের পশমি কাপড়ের উত্তম বাজার পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহারা আশা করে। ভয়াবহ আইভানের দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ১৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ মস্কভী কোম্পানি গঠন করে। ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে এই কোম্পানির প্রতিনিধি এন্থনী জেংকিনসন মস্কো, অস্ত্রখান ও কাস্পিয়ান সাগরের পথে সাফাভীয় প্রথম শাহ তাহ্মাসপের রাজধানী কাজভিন গমন করেন। জেংকিনসন শাহ কর্তৃক উত্তমরূপে সংবর্ধিত হন নাই, কারণ শাহ তাঁহার দরবারে কাফেরদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে ইতস্তত করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল মস্কো হইতে কাস্পিয়ানের পথ ছিল দুর্যোগপূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই জন্য কোম্পানি কোনো লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তদুপরি তাহারা আবিষ্কার করে যে মোঙ্গলগণ ইংরেজদের পশমি বস্ত্র ব্যবহার করিতে তেমন আগ্রহী নহে। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দের দিকে বৃটিশও অন্তরীপের পথ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

শাহ আব্বাসের সময় এন্থনী শার্লী ও তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা রবার্ট নামে দুইজন ইংরেজ যুবক ইরানে আসেন। তাঁহারা ছিলেন সামরিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, কোনো ব্যবসার সঙ্গে যাহাদের কোনো সংশ্রব ছিল না। শাহ্ আব্বাস তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিঃসন্দেহে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার সেনাবাহিনীকে উন্নত করিবার ও ইউরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার উপায় দেখিতে পান। শাহ কর্তৃক তাঁহারা সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং উভয়ে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। রবার্ট শার্লী পারস্যের একজন খ্রিস্টান মেয়েকে বিবাহ করেন এবং সারাজীবন ইরানে অতিবাহিত করেন।

১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ আব্বাস ইউরোপে একটি বিরাট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। পারস্যের দূত হোসেন আলী বায়াত এন্থনী শার্লীর সমভিব্যাহারে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের শাসকবৃন্দ এবং পোপের নিকট পত্র লইয়া যান। পত্রে শাহ এন্থনীকে একজন 'প্রিয় ভ্রাতা' হিসাবে পরিচয় দেন, যিনি স্বেচ্ছায় ইরানে আগমন করেন এবং যাঁহার সঙ্গে "একই প্লেট হইতে আমরা আহার করি এবং একই পাত্র হইতে মদ পান করি।" সমগ্র দলের সঙ্গে একজন মোল্লা (শিয়া আলেম), দুইজন বা তিনজন ক্যাথলিক পাদ্রি, পাঁচজন দোভাষী, চৌদ্দজন চাকর, চারিজন দারোয়ান এবং বত্রিশটি উট বোঝাই উপঢৌকনসমূহও প্রেরণ করা হয়।

কাস্পিয়ান সাগর অভিমুখে ৫০০ মাইল ভ্রমণ করিতে এই দলের এক মাস সময় অতিক্রান্ত হয়, এবং আরও দুই মাস সময় লাগে সমুদ্র পার হইতে। রাশিয়ায় তাহারা বরিস গডিওনভের আতিথ্য গ্রহণ করে এবং ছয় মাসের দুরূহ অভিজ্ঞতার পর আর্চেঙ্গেলের পথে ইউরোপ গমন করে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে তাহারা প্রাগ পৌঁছে এবং দ্বিতীয় রুডলফ্ কর্তৃক অভ্যর্থনা লাভ করে। রাজা ওসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য শাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রতিনিধিদলকে আর বেশি দূর অগ্রসর না হইবার প্রস্তাব প্রদান করেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিনিধি দলটি ইটালি অভিমুখে রওয়ানা হয়। ভেনিস তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে রাজি ছিল না কারণ, ইতোমধ্যে ভেনিসীয়গণ ওসমানীয়দের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং তখন ইস্তাম্বুলের একটি প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছিল। রোমে শার্লী ও বায়াতের মধ্যে মনোমালিন্য হয় বলিয়া পোপ অষ্টম ক্লিমেট তাহাদিগকে পৃথকভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বাহ্যত শার্লী পোপের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, ককেসাসের অর্থোডক্স খ্রিস্টানদিগকে রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারী হইতে বাধ্য করিবার ব্যাপারে শাহ্ সহযোগিতা করিবেন।

বায়াত ও শার্লী তথায় আলাদা হইয়া যান। শার্লী স্পেন গমন করেন এবং সেখান হইতে ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ইরানে আর কখনও ফিরিয়া আসেন নাই। বায়াত স্পেন গমন করেন এবং জাহাজে করিয়া ইরানে ফিরিবার পরিকল্পনা করেন। তবে স্পেন ত্যাগের প্রাক্কালে একজন ধর্মান্ধ খ্রিস্টান এই মুসলিম মোল্লাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আরও মারাত্মক হইল এই যে, পারস্যবাসিদের মতানুসারে প্রতিনিধিদলের তিনজন সদস্য খ্রিস্টান হইয়া যায়। একজন ছিলেন প্রতিনিধির ভ্রাতুষ্পুত্র আলী কুলী যিনি রাজা ফিলিপকে ধর্মীয় পিতা মানিয়া খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার নাম দেওয়া হয় ডন ফিলিপ। দ্বিতীয় জন প্রতিনিধিদলের প্রধান সচিব উরুষ বে, যিনি রানীকে ধর্মীয় মাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া খ্রিস্টান হন এবং পারস্যের ডন জুয়ান হিসাবে পরিচিত হন। তৃতীয়জন বুনিয়াদ বে, যিনি ডন দিয়াগো নামে খ্রিস্টান হন। প্রতিনিধি ও তাঁহার দলের অবশিষ্ট লোকের পরে কি হইল তাহা সুনিশ্চিত বলা যায় না। খুব সম্ভবত এই ধরনের শোচনীয় কাজ কারবারের জন্য তাঁহারা মৃত্যু অবধারিত দেখিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় শাহের নিকট ফিরিয়া না যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে একজন পারস্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে একটি পারস্য দূত একজন স্পেনীয় প্রতিনিধি সহকারে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই দূতকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। পরে শাহ আব্বাস স্পেনীয়দিগকে এই বলিয়া তাঁহার কাজের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে পারস্য প্রতিনিধি "তাঁহার সহচরদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করিয়াছে

যে তাহাদের অনেকেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে রাজি হয় এবং তাহার (নিহত প্রতিনিধির) অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইউরোপে থাকিয়া যায় ... ।"

প্রথম প্রতিনিধিদলের দ্বারা কোনো ফল লাভে ব্যর্থ হইয়া শাহ্ আব্বাস ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে এন্থনীর ভ্রাতা রবার্ট শার্লীকে প্রেরণ করেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ড। ইটালিয়ন ও স্পেনীয়গণ রবার্ট প্রতিনিধি দলের সহিত সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করে নাই। কারণ তাহারা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বৃটিশের প্রবেশ পছন্দ করে নাই। এই সমস্ত সরকার এন্থনী শার্লীকে তাঁহার ভ্রাতার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করে। তবে বৃটিশ ইতোমধ্যেই ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করিয়া ব্যবসা বিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শাহ্ আব্বাসের আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের জাহাজ পারস্য উপসাগরে আগমন করে এবং কোম্পানি ইসফাহানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি ইঙ্গ-পারস্য বাহিনী পর্তুগীজ স্পেনীয় ব্যবসায়ীদিগকে হরমুজ ও বাহরাইন হইতে এবং পরে মস্কট ও বসরা হইতেও বহিষ্কার করে। ইংরেজগণ লেভার লেবানন ব্যবসায়েও অংশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তথায় ফরাসিদের অবস্থা সুদৃঢ় থাকার ফলে তাহারা বাগদাদে একটি শাখা স্থাপন করে। ইরানে বন্দর আব্বাস, হরমুজের স্থলাভিষিক্ত হয়। শাহ্ আব্বাস এই নূতন বন্দর নির্মাণ করেন এবং ইংরেজগণ তাহাদের অধিকাংশ ব্যবসা সেখানে চালাইয়া যায়। তাহাদের শাখাসমূহ ছিল ইসফাহান, শিরাজ, বসরা ও বাগদাদে।

ইতোমধ্যে ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ডাচগণ মঞ্চে অবতরণ করে এবং ১৬০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি প্রতিষ্ঠানে একত্রীভূত করে। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে ডাচগণ বন্দর আব্বাসেও একটি ব্যবসাকুঠি নির্মাণ করে। শাহের সঙ্গে তাহাদের ব্যবসা ছিল ডাচ পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে পারস্যের কম্বল, পশমি কাপড়, সিল্ক ও বুটিদার কাপড় গ্রহণ করা। ইহা ইংরেজদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং ফলে ইংরেজ ও ডাচ ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ আব্বাসের মৃত্যুর সময় ইসফাহান ও শিরাজের বাজারে অনেকগুলি বিদেশী পণ্যের গুদাম বিদ্যমান ছিল। শাহ্ সাফির (১৬২৯-১৬৪২ খ্রিঃ) রাজত্বকালে ডাচদের ব্যবসা ছিল সরগরম এবং পারস্য বাণিজ্যের প্রকৃত আধিপত্য ছিল ডাচদের হাতে। দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাসের সিংহাসনারোহণের সময় ইরানের ব্যবসা ডাচদের একচেটিয়া আয়ত্তে থাকে। তাহারা আমদানি কর হইতে মুক্ত ছিল, তবে বিনিময়ে বাৎসরিক ৬০০ গাঁইট সিল্ক খরিদ করিতে হইত। সিল্ক ছাড়াও তাহারা পারস্য কম্বল, ফল ও মদ রপ্তানি করিত। তবে পারস্যের ব্যবসায়িগণ ডাচদের সঙ্গে ব্যবসা করা পছন্দ করিত না। অভিযোগ ছিল এই যে, ডাচগণ সামান্য বিনিময়কারী এবং শিল্পকলায় অতীব পারদর্শী। পারস্যবাসিগণ ডাচদের মতো পরিশ্রান্ত ও সবজান্তা প্রতিযোগিদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে নারাজ।

ইউরোপীয়দের প্রতি সাফাভীয়দের আতিথ্য জার্মানদিগকেও আকৃষ্ট করে। ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ ইসমাইল ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে পঞ্চম চার্লসের বন্ধুত্ব কামনা করেন। দুই বৎসর পর শেষ পর্যন্ত চার্লসের উত্তর ইরানে পৌছিতে পৌছিতে শাহ্ ইসমাইল মারা যান। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় রুডল্ফ (১৫৭৬-১৬১২ খ্রিঃ) এন্থনী শার্লীকে আতিথ্য দান করেন এবং প্রত্যুত্তরে ইরানে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। জার্মান দূত

দৃশ্যত বরিস গডুনভকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং উভয় শাসকের পত্র লইয়া ইরান পৌছেন। পত্রগুলি যখন পৌছে তখন শাহ্ আব্বাস ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একটি সাফল্যজনক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। ইতোমধ্যে বরিস গডুনভ্ রাশিয়ার আত্মকলহের গোলযোগে জড়াইয়া পড়েন এবং রাশিয়ার সঙ্গে জার্মান দুতের চুক্তি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।

সাফাভীয় সময়ে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয়ান ইরানে কাজ নেয় এবং মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক লাভ করে। ইউরোপীয়দিগকে আকর্ষণ করিবার নীতিতে শাহ্ আব্বাস বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে আপ্যায়নের ব্যাপারে দরাজদিল ছিলেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রায়ই তিনি নগরের বাহিরে চলিয়া যান। অতিথিদিগকে পুরা সামরিক পোশাক ও বাজনার সহিত গার্ড অব অনার প্রদান করিয়া গ্রহণ করেন। অতিথিদের জন্য মদ ও বরফের পানি লইয়া ক্রীতদাসগণও নিকটেই থাকিত। ইউরোপীয়দিগের নিকট অমুসলিমদের প্রতি তাঁহার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবার জন্য খ্রিস্টান, ইহুদি ও জরথুস্ত্র সম্প্রদায়গুলির নেতৃবৃন্দকেও অভ্যর্থনায় নিমন্ত্রণ করা হয়। সবচাইতে অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল এই যে, বিদেশী অতিথিদিগকে আপ্যায়নের জন্য ২৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়া রাখা হয়। প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে, এইসব মহিলাদের সবাই পর্দাহীন থাকে। পাদ্রীদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন হইবার জন্য শাহ আব্বাস স্বীয় নীতি হইতে এইরূপ বিচ্যুত হইয়াছিলেন যে, তাহারা মনে করিত, তিনি যে কোনো সময় খ্রিস্টান হইয়া যাইতে পারেন এবং তাহাদিগকে নিরুৎসাহ হইতে হয়- এমন কিছুই শাহ্ করিতেন না। এক বৎসর রমজান মাসে খ্রিষ্টমাস পড়িলে, শাহ্ তাঁহার নিয়মানুসারে ইসফাহানের আর্মেনীয় আবাসভূমিতে একটি অভ্যর্থনার জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি মদ পান করেন এবং অতঃপর স্পেনীয় দূতের কানে কানে বলেন, "রোমে পোপের সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহাকে বলিবেন রমজান মাসে কাজী, মুফতী এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সম্মুখে আমি কিভাবে মদ পরিবেশন করিলাম। তাঁহাকে বলিবেন যে, খ্রিস্টান না হইলেও আমি প্রশংসার যোগ্য।"

সামাজিক উপকরণসমূহ ছাড়াও ইউরোপীয়গণ বিশেষ বাণিজ্য সুযোগ লাভ করে। সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও প্রশাসকদের নিকট কঠোর আদেশ থাকে যে তাহারা যেন ফিরিঙ্গি (ইউরোপীয়) ব্যবসায়ীদের জন্য যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইরানে থাকাকালীন নিজেদের আইনের আওতায় পড়িবার সুবিধাও ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া হয়। ইউরোপীয়দিগকে এই সমস্ত সুবিধা দিবার ব্যাপারে সাফাভীয়গণ একা ছিল না। ওসমানীয়গণ এই ধরনের সুবিধা ফরাসিদিগকে প্রদান করে। সুলতান মহামহিমান্বিত সোলাইমানের প্রদত্ত এইসব সুযোগের দ্বারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত ফরাসিদিগের উপর ফরাসি রাজদূতের এখতিয়ার স্বীকার করা হয়। ইহা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, এইসব সুবিধাদি দেওয়া হয় ভদ্রতার খাতিরে এবং সমতার ভিত্তিতে। তাহাদের মনে ইহা ছিল 'মহাগ্রন্থের লোকদের' নিকট মিল্লাত প্রথার প্রয়োগ মাত্র। পরবর্তীকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইহাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরে শর্ত (Capitulation) নামে খ্যাত এই রীতি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগ পর্যন্ত চালু থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পারস্য উপসাগরে ব্যবসা শ্লথ হইতে থাকে। ইহার কারণ হইল ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ এশিয়ার আরও পূর্বে সবুজতর চারণ ভূমি ও সমধিক মুনাফা লাভ করে। তদুপরি ইরানে রাজনৈতিক অবস্থা জটিলতর হইতে থাকে এবং ক্রমশ

দুর্বল সাফাভীয় শাহগণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে আফগানদের ইরান আক্রমণের ফলে সেই দেশে ডাচ ব্যবসা দুর্বল হইয়া পড়ে। নাদির শাহ ইংরেজদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তাহারা তাঁহাকে ওসমানীয় অভিযানে সাহায্য করে নাই, অথচ ডাচগণ করিয়াছিলেন। তবে তিনি বাদশাহ হইবার পর তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং বৃটিশদের সঙ্গে নূতন কোনো চুক্তি না করিয়া পুরাতনগুলি চালু করেন। করিম খান জান্দ ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আমদানিকৃত মালপত্রের শুল্ক এবং বন্দরসমূহের নিয়ন্ত্রণ লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে পারস্য উপসাগরের বুশাহার বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বসরা একমাত্র বন্দর হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ একদিকে ইউরোপীয়গণ এবং অপরদিকে পারস্যবাসী ও ওসমানীয়দের মধ্যে সম্পর্কে সমতার কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে নাই। ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজগণ বসরায় সোলাইমান পাশাকে তাঁহার 'পাশা' পদ লাভ করিতে সহায়তা করে এবং ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে একইভাবে বুশাহার (বুশায়ার)-এর ভাগ্য নিরূপণে সাহায্য করে। এইভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগ আরম্ভ হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয়দের সহিত দুই শতাব্দীর সম্পর্ক ইরান বা ওসমানীয় সাম্রাজ্যে তেমন কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। তুর্কি ও পারস্যবাসী উভয়ে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে সর্বাধুনিক কামান ও মর্টার বানাইবার কৌশল নকল করে। কিন্তু তাহাই সবকিছু বলিয়া মনে হয়। সেই ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বায়েজীদের রাজত্বকালে স্পেনের ইহুদি বাস্তুত্যাগীগণ একটি ছাপাখানা বসাইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু সুলতান তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। পাছে কোরআন ছাপানো হয় সেই ভয়ে শেখ-উল-ইসলাম ইহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পরে ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে অবশ্য ইহুদিদিগকে একটি ছাপাখানা বসাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত হইল তাহারা শুধু হিব্রু ভাষায় ছাপার কাজ করিবে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহুদিদের ন্যায় একই শর্ত মোতাবেক আর্মেনীয়দিগকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে একই রকমের অনুমতি গ্রীকদিগকেও দেওয়া হয়। ১৭২১ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুলতান যে কোনো কিছু তুর্কি ভাষায় ছাপাইবার অনুমতি দান করেন। ইউরোপের অন্য সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ করা হয়, এমন কি ঘড়িও নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ ইহা মুয়াজ্জিনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মুয়াজ্জিন হইলেন যিনি লোকদিগকে নামাজের জন্য ডাকেন।

এইসব ব্যাপারে ওসমানীয়দের চাইতে পারস্যবাসিগণ আরও অধিক উদার হইলেও, এইক্ষেত্রে দর্শনীয় কিছু নাই। শাহ আব্বাস একটি ছাপাখানা আমদানি করিলেও তিনি ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কোনো প্রমাণ নাই। শাহ সাফীর নিকট ইউরোপীয় কামান প্রস্তুতকারকগণ ছাড়াও একজন ঘড়ি নির্মাতা, একজন স্বর্ণকার, একজন হীরা কর্তনকারী ও একজন শিল্পকলাবিদ ছিল। দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ইংল্যাণ্ড হইতে লকার ও এঞ্জেল নামে দুইজন শিল্পকলাবিদ আনয়ন করেন এবং ইহাদের কল্যাণে সম্রাটের কিছু সংখ্যক আবক্ষ ছবি এখনও বর্তমান।

বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তুর্কি ও ইরান উভয়েই পাশ্চাত্যের নিকট দুর্বোধ্য। আল্লাহর বিধানসম্বলিত ধর্ম হিসাবে ইসলাম নিজেকে শেষ ধর্ম, অতএব সম্পূর্ণ, বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে মুসলমানগণ শীয়া হউক বা সুন্নি হউক মনে করে না যে, খ্রিস্টান ধর্মের ন্যায় অসম্পূর্ণ

ধর্মের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার আছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শেখ-উল ইসলাম এবং অসংখ্য উলামা ইউরোপীয়গণের সহিত কখনও কোনো বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক স্থাপন করিতে দেয় নাই। ইরানে শীয়া ধর্ম পারস্য পৃষ্ঠপোষকতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং এমন একটি ধর্মান্ধ ও গোঁড়া বেষ্টনী সৃষ্টি করে যে, তেমন কোনো কিছু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তদুপরি ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যপ্রাচ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন খ্রিস্টান ও পাদ্রী। ইহাদের মানসিকতা ছিল মোটের উপর মধ্যযুগীয় এবং তাঁহারা তৎকালে ইউরোপে সংগঠিত সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নাই বরং তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাহাদের মুসলিম সহযোগীদের ন্যায় তাঁহারাও আবদ্ধ অন্তরের অধিকারী ছিলেন। ফলে মধ্যযুগীয় ইসলামকে তাহাদের দিবার মতো কিছুই ছিল না। অতএব কোনো পক্ষই অপর পক্ষের নিকটবর্তী হইবার আগ্রহ অনুভব করে নাই। মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সংঘাত ইসলামের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে এই ব্যাপারে তাহারা কোনো প্রতিক্রিয়াই প্রদর্শন করে নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়
সাফাভীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি

সাফাভীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ওসমানীয়দের ন্যায় ইসলামী ও তুর্কি। তবে পার্থক্য এই যে ইহারা শীয়া ও পারস্যবাসী। ওসমানীয়দের তুলনায় সাফাভীয়গণ কোনো সশস্ত্র ছাউনী (যদিও তাহারা একটি সেনাবাহিনী পোষণ করিত) প্রতিষ্ঠা করে নাই এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। ইরানে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি সাফাভীয় প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাই এইগুলি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তুর্কি বিষয়ক দিকগুলি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সাফাভীয়গণ নিজেরা তুর্কি হইবার ফলে বেলার বে, শেখ-উল-ইসলাম প্রভৃতি একই নাম ব্যবহার করে, কিন্তু একই মর্যাদার জন্য নহে। সম্ভবত ওসমানীয় অফিসারদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গের উপাধি সাফাভীয় সরকারি সংগঠনের সর্বনিম্ন ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ পারস্যবাসিদের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রাদেশিক প্রশাসককে বলা হইত সুলতান। শেখ-উল-ইসলাম ও বেলার বে সাফাভীয়দের মধ্যে ওসমানীয়দের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ পদের নিকটেও ছিল না।

ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে সাফাভীয় শাহ্গণ তুলনামূলকভাবে ওসমানীয় সুলতানদের চাইতে স্বাধীন ছিলেন। সুন্নিদের নিকট চারি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান শরীয়তকে নিখুঁতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে।[1] চারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সীমা হইতে বিচ্যুতি বা নূতন উদ্ভাবনকে সর্বদা বিরক্তির চোখে দেখা হয়। ওসমানীয় উলামাগণ ধর্মীয় আইনের হানাফি প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মতামত ব্যক্ত করেন, এবং সুলতান ফতোয়া নামে প্রকাশিত ঐসব সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। শীয়াগণ শরীয়তকে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক, লুক্কায়িত ইমামের মুখপাত্র সময়ের প্রয়োজনে আইনকে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। বিশ্বাস করা হইত যে, এইসব মুখপাত্র বা মুজতাহিদগণ ব্যাখ্যা দান করিবার জন্য লুক্কায়িত ইমাম কর্তৃক আদিষ্ট হইতেন। এই পন্থায় মুজতাহিদের মতামতকে ইমামের মতামত বলিয়া গণ্য করা হইত- এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক মনে করা হইত।

দুইটি বিষয় শীয়া সমাজকে অযথা কঠোরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রথমত, সাধারণত একই সময় তাহাদের মধ্যে দুইজন মুখপাত্র থাকিতেন। কখনও কখনও চারি বা পাঁচজনও হইতেন এবং এইসব লোকজন স্বভাবতই কোনো বিশেষ মামলার ক্ষেত্রে সর্বদা একে অপরের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছিতেন না। দ্বিতীয়ত, এইসব মুখপাত্র নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোনো ধর্মযাজকমূলক সংগঠন ছিল না। যে কোনো লোক মুজতাহিদ হইতে চাহিলে তাঁহাকে শীয়া ধর্মতত্ত্ব ও আইন পাঠ করিতে হইত কিন্তু তাঁহাদের সকলে আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদায় উঠিতে পারিতেন না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও তাঁহাদের পুণ্যবান, বিচারশক্তিসম্পন্ন ও সাধারণ বিবেচনার সুনাম থাকিতে হইত। সাধারণ অবস্থায় নিখুঁত সুনামের অধিকারী

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১২, ১১৩।*

উলামাদের কোনো লোককে বেসরকারি ও জনমতের ভিত্তিতে মুজতাহিদ বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কোনো কোনো সময় শাহ অথবা সমাজের কোনো উচ্চ কর্মকর্তা কোনো লোককে বারবার এবং প্রকাশ্যে তাঁহার মতামত চাহিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন এবং এইভাবে মুজতাহিদ হিসাবে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠা করিতেন। ফলে কোনো শীয়া সমাজে মুজতাহিদগণ সম্মিলিত মতামত ব্যক্ত করিতে রাজি হইলে ইহার ফল খুবই অনমনীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল হইতে পারিত। অপরদিকে কোনো সুচতুর শাহ বা সরকার মুজতাহিদদিগকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগাইতে চাহিলে, অনেকগুলি সংযোজন বা বিচ্যুতি ঘটাইতে পারিলে তাহা করিতে পারিতেন। এইসব বিচ্যুতি শীয়া ও সুন্নি ইসলামে সমভাবে অভিসম্পাতযোগ্য।

সাফাভীয়দের যুগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরানে শাহ ও শীয়া উলামাদের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রথম পর্যায়ের শাহদের মধ্যে ছিলেন মহান শাহ আব্বাস (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রিঃ) এবং নাসের আল-দ্বীন শাহ কাজার (১৮৪৮-১৮৯৬ খ্রিঃ) যাঁহারা উলামাদের সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহাদের সময় এক প্রকারের পারস্পরিক বুঝাপড়ার মতো অবস্থা বিদ্যামান ছিল যাহা নির্ভর করিত শক্তি ও কার্যক্ষমতার উপর। কোনো কোনো সময় তাঁহারা আলেম শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের স্বীয় ইচ্ছা চাপাইতে পারিতেন এবং কোনো কোনো সময় তাঁহারা উলামাগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের শাহদের মধ্যে ছিলেন নাদির শাহ্ (১৭৩৬-১৭৪৭ খ্রিঃ) এবং রেজা শাহ্ পাহলভী (১৯২৪-১৯৪১ খ্রিঃ), যাঁহারা উলামাদের উপর তাঁহাদের ইচ্ছা চাপাইয়া দেন এবং আলেমদের প্রভাব ধ্বংস করিয়া দেন। উভয় শাহ্ই এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে ধর্মীয় দানগুলিকে (ওয়াকফ) তাঁহারা সহজেই বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন, যেইগুলি ছিল বংশপরম্পরায় শীয়া ও সুন্নি উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎস। উলামাগণ নাদির শাহকে যখন বলিলেন যে, এই ধরনের তহবিলগুলি ধর্মীয় স্কুল ও মসজিদের জন্য খরচ করা উচিত, যেখানে শাহের সাফল্যের জন্য দোয়া করা হয়। তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের দোয়া নিষ্ফল প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ বিগত ৫০ বৎসরে দেশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহাদের সৈনিকগণ যেহেতু এই ধ্বংস প্রতিরোধ করিয়াছে, তাই তাহারাই সত্যিকারের 'ধর্মের শিষ্য' এবং ওয়াকফগুলি হইতে তাহাদেরও অংশ পাওয়া উচিত।

তৃতীয় পর্যায়ে সাফাভীয় শাহদের অধিকাংশ [যথা শাহ্ সুলতান হোসাইন (১৬৯৪-১৭২২ খ্রিঃ)] হইতে কাজার যুগ পর্যন্ত ছিল শীয়া উলামাদের আধিপত্যে। ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার আওতাভুক্ত যে কোনো সমাজ উলামাদের মতবাদ বা একনায়কের ইচ্ছায় অনমনীয় হইত অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হইত। প্রথমোক্ত অবস্থায় সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ দুইটি সমান শক্তি বিদ্যমান থাকিবার ফলে ঐগুলি একে অপরকে নিরপেক্ষ করিবে যদ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত হইতে পারে। ইহার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল নাসের আল-দ্বীন কর্তৃক বৃটিশকে প্রদত্ত সুবিখ্যাত একচেটিয়া তামাকের ব্যবসা (১৮৯২ খ্রিঃ)। মুজতাহিদগণ ইহার বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারি করেন। ধূমপানের বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক একটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় যে, স্বয়ং শাহ তাঁহার হুক্কার জন্য তামাক ক্রয় করিতে ব্যর্থ হন এবং সেই চুক্তি বাতিল করিতে বাধ্য হন।

তদুপরি, ইরানের শাহদের মধ্যে একমাত্র সাফাভীয়গণ মুর্শিদ-এ কামিল বা অত্যন্ত খাঁটি নেতা (অর্থাৎ সুফী শ্রেণীর) হিসাবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। রসুলুল্লাহ

(সঃ) এর কথিত বংশধর হিসাবে এবং সুফী শ্রেণীর সত্যিকারের নেতা হিসাবে তাঁহারা বিশেষ কিছু ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাফাভীয় শাহ্‌গণ, বিশেষত প্রথমদিকেরগুলি তাঁহাদের মধ্যে শুধু শাহ্ নহে বরং ধর্মীয় নেতৃত্বের সংমিশ্রণও ঘটাইয়াছিলেন। ফলে ধর্মীয়, রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল এবং তাহাদের মধ্যে উদার প্রকৃতির শাহ্‌গণ একটি স্বাধীন পথ অবলম্বন করেন। তাই সাফাভীয় সরকারি সংগঠন ওসমানীয়দের ন্যায় মুসলিম ও শাসনকারী প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত ছিল না। এককভাবে, ক্ষমতার মালিক ছিলেন ইমাম, যাহার মুখপাত্র ছিলেন মুজতাহিদগণ। তবে প্রথমদিকের সাফাভীয় যুগে খাঁটি নেতা হিসাবে শাহ ধর্মীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ইমামের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে শাহের ক্ষমতা হ্রাস পাইলে মুজতাহিদগণ আরও ক্ষমতার অধিকারী হন। তদুপরি, ইরানে শাহের অধীনে বিচার ও ধর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় সংগঠনের উপরে, কিন্তু ওসমানীয়দের ব্যতিক্রমে সরকারের প্রশাসনিক পরিষদে ইহার কোনো ভূমিকা ছিল না।

সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান শীয়া আলেম ছিলেন মোল্লাবাসী যিনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং শাহের ধর্মীয় উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন। তাঁহার কোনো প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় কর্তব্য ছিল না। শাহের ক্ষমতা ও ব্যাক্তিত্বের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল পরোক্ষ।

সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ছিল উলামাদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, যাহা একটি 'বিচারের দিওয়ান, দ্বারা পরিচালিত হইত। সপ্তাহে চারিদিন ইহা মিলিত হইত এবং ছয়জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত ছিল ঃ

১। সদর-এ-খাস, যাঁহার উপর উত্তর অঞ্চলের এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির বিচারের দায়িত্ব ছিল।

২। সদর-এ-আম, যাঁহার উপর দেশের অবশিষ্ট অংশের বিচারের দায়িত্ব ছিল।

৩। ইসফাহানের কাজী, যিনি তাঁহার স্বীয় গৃহে বিচারালয় বসাইতেন।

৪। শেখ-উল-ইসলাম, যাঁহার হাতে বিবাহ ও তালাকের মামলার দায়িত্ব ছিল।

৫। দারোগা যিনি পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন।

৬। সেনাবাহিনীর ধর্মীয় উপদেষ্টা, যিনি সৈন্যদের ধর্মীয় প্রয়োজনগুলির দেখাশুনা করিতেন এবং তাহাদের বেতনের রশিদে দস্তখত করিতেন।

উপরোল্লিখিত সবগুলি পদে শাহ্‌ই নিযুক্তি দান করিতেন। শুধু প্রথম দুইজন সদর ও মোল্লাবাসী খাজাঞ্চিখানা হইতে তাঁহাদের বেতন লইতেন। দিওয়ানের দায়িত্ব ছিল প্রদেশগুলিতে জজ, ধর্মপ্রচারক ও পুলিশ নিযুক্ত করা। ইহার সভাপতি থাকিতেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি—যাহাকে দিওয়ান বেগ বলা হইত। তিনি দিওয়ানের সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করিতেন। সপ্তাহে চারি দিন তিনি দিওয়ানের সভাপতিত্ব করিতেন এবং সপ্তাহে দুইদিন নিজ গৃহে অধর্মীয় উরফ মামলাগুলি নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার একটি জায়গীর থাকিত এবং সমস্ত জরিমানার শতকরা ১০ ভাগ তিনি পাইতেন।

সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যাবলী প্রধান উজীরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি শাহের ডান পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আদেশগুলিতে দস্তখত করিতেন ও শাহের স্বপক্ষে কাজ করিতেন। তাঁহার কোনো বেতন ছিল না। তাঁহার আয় ছিল জায়গীর ও উপঢৌকনসমূহ হইতে।

তাঁহার নিচে প্রশাসন দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটির কাজ ছিল প্রদেশ সংক্রান্ত। প্রদেশগুলি চারিজন উচ্চশ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা শাসিত হইত। সর্ব উপরে ছিলেন প্রাদেশিক গভর্নর এবং তাঁহার নিচে ছিল জেলা নিয়ন্ত্রক, যাঁহাকে জেলা কমিশনার (খান) বলা হয়, এরূপ একজন কর্মকর্তার সাহায্যে তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ যাঁহাদিগকে সুলতান বলা হইত। এইসব কর্মকর্তাদের সবার পদ অনুযায়ী জায়গীর ছিল। তাঁহাদের কাজ ছিল কর আদায় করা, তাঁহাদের স্থানীয় সৈন্যদের বেতন দেওয়া এবং প্রত্যেক বৎসর একটি বিশেষ অঙ্কের অর্থ শাহের নিকট প্রেরণ করা। এই অর্থ ছাড়াও তাঁহারা শাহের নিকট উপঢৌকনসমূহ প্রেরণ করিতেন। এইসব কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের শাহের সন্নিকটে কোনো একজন থাকিতেন যিনি যথাযোগ্য উপহারের বিনিময়ে তাঁহার সম্পর্কে খুব প্রশংসা করিতেন এবং তাঁহাকে সুবিধাদি দানের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রশাসনের দ্বিতীয় শাখার কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী, দরবার ও রাজস্বের তত্ত্বাবধান করা। প্রথম দিকের সাফাভীয়গণের শক্তির প্রধান উৎস ছিল কিজিলবাস গোত্রগুলি। সরকারে এইগুলির প্রতিনিধিত্ব করিতেন দুই ব্যক্তি। একজনকে বলা হইত প্রধান খলিফা, যিনি বিভিন্ন গোত্রের খলিফাদের (সুফী শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা) সভাপতি। সুফীদের দৃষ্টিতে প্রধান খলিফা ছিলেন খাঁটি নেতা অর্থাৎ শাহের সহকারী। কিজিলবাসের দ্বিতীয় প্রতিনিধি ছিলেন কুরসীবাসী, যিনি ছিলেন গোত্রগুলির নিযুক্ত নেতা। তিনি যোদ্ধাদিগের বেতন প্রদান করিতেন। উভয় ব্যক্তি তাহাদের জায়গীর ছাড়াও বেতন পাইতেন।

শাহ্ আব্বাস কিজিলবাসের ক্ষমতা ভাঙিয়া দেন এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বলিত তিনটি সেনাবাহিনী শাখা গঠন করেন। একটি ছিল গোলন্দাজ বাহিনী, দ্বিতীয় ছিল রাইফেল বাহিনী, যাহাদিগকে গ্রামের ফার্সিভাষী জনসাধারণ হইতে বাছিয়া লওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ছিল 'দাস' বাহিনী যাহাদিগকে জর্জিয়ান, কারকাসিয়ান ও আর্মেনিয়ান হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। সাধারণ অর্থে, ইহারা সত্যই ক্রীতদাস ছিল কিনা তাহা সন্দেহজনক। তাহাদের প্রায় সবাই ছিল খ্রিস্টান। 'শাহের ক্রীতদাস' হইবার ব্যাপারে তাহাদের ধর্মে কোনো বাধা ছিল না এবং তাহারা ইহাতে গর্ব অনুভব করিত। এইসব বাহিনীর প্রত্যেকের নিজস্ব পদের অধিনায়ক থাকিতেন- যিনি শাহ্ ও প্রধান উজীরের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রত্যেক অধিনায়ক একটি জায়গীরের মাধ্যমে তাঁহার আয় লাভ করিতেন।

শাহের দরবারে অফিসারদের একটি বিশাল দল ছিল। প্রটোকল প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তিগত সচিব, চিকিৎসক ও জ্যোতিষী, দারোয়ান, খানসামা, আস্তাবল প্রধান এবং অন্যান্যদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের নাম উল্লেখ করা যায় না। প্রধান গৃহাধ্যক্ষ (Chief Chamberlain) ছিলেন শাহের হেরেমের দায়িত্বে। ওসমানীয়দের ন্যায় সাফাভীয়দের হেরেমও সাধারণত কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। পারস্য মহিলাগণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে তাহাদের ভগ্নিদের চাইতে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত বলিয়া মনে হয়। সাফাভীয়গণ তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইত এবং মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তম তীরন্দাজ ছিল ও সত্যই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। পরাজয়ের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ অথবা দ্রুত পশ্চাদপসারণের সময় খোজাদের প্রতি সমস্ত মহিলাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইত। কখনও কখনও বাজারে 'মহিলা দিবস' পালন করা হইত। এইসব দিবসে হেরেমের মহিলাগণ শহরের মহিলাদের সহিত মিলিত হইত। শাহ্ আব্বাস কর্তৃক ইসফাহানের বীথিকা নির্মাণ শেষ হইলে তিনি বীথিকায় একটি মহিলাদের বৈকাল উদ্বোধন

করেন। সেখানে মহিলাগণ বৃক্ষ সুশোভিত রাস্তায় ইতস্তত ভ্রমণ করে। মহিলাদিগকে একটি বিশেষ স্থানও দেওয়া হয় যেখান হইতে তাহারা মুহুর্মুহু বাজি পোড়ানো ও বাতি জ্বালানো অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এইগুলি শাহদের অতিপ্রিয় চিত্তবিনোদনের খেলা। যে কেউ কল্পনা করিতে পারে যে, অতি নিভৃত ও আশ্রিত জীবনের অধিকারিনি এই মহিলাগণ কিরূপ আগ্রহ লইয়া এইসব অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকিত।

রাজস্ব এমন একজনের কর্তৃত্বাধীন ছিল যিনি শাহের নিকট দায়ী থাকিতেন। শাহের ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। প্রত্যেক কিছুর মালিক ছিলেন শাহ। রাজস্ব বিভাগে একজন ছিলেন টাঁকশালের দায়িত্বে। রাজধানীতে সমগ্র দেশের জন্য রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার হইত। তাম্রমুদ্রা স্থানীয়ভাবে তৈয়ার করা হইত এবং প্রত্যেক বৎসর ঐগুলি পরিবর্তন করা হইত।

রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে আরেকজন কর্মকর্তা ছিলেন যিনি ন্যায্য মূল্যের দায়িত্বে ছিলেন। সাফাভীয় যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইরানে সুবিন্যস্ত সমাজ প্রথা বিদ্যামান ছিল। উত্তম ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রত্যেক সমাজের নেতার (শ্বেতশ্মশ্রু) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরগুলি পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদিগকে কাষ্ঠখণ্ডে পদাদি আটকাইয়া বাজার প্রদক্ষিণ করানো হইত।

শাহ ও সরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল প্রত্যেক প্রদেশ হইতে গৃহীত কর। ইহা নগদ ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় প্রকারে লওয়া হইত যথা- সিল্ক, ঘোড়া, ক্রীতদাস, তৈল, মদ, চাউল প্রভৃতি। শাহের নিজস্ব ভূমি হইতেও আয় হইত। শাহ আব্বাস কর্তৃক কিজিলবাস শক্তি ধ্বংস করিবার পর এইসব সামন্ত প্রভুদের খাসজমিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ইহা হইতে উদ্ভূত আয় ছিল বেশ মোটা অংকের। রাজস্বের তৃতীয় উৎস ছিল আয়কর হইতে। গবাদি পশুর বার্ষিক কর ছিল অর্ধেক, সমস্ত সিল্ক ও সূতিবস্ত্রের কর ছিল এক-তৃতীয়াংশ, সেতু ও রাস্তার শুল্ক, অমুসলিমদের মাথাপিছু কর (জিজিয়া), আমদানি শুল্ক প্রভৃতি। আয়ের অতি মূল্যবান উৎস ছিল তামাক বিক্রয় ও চাষাবাদ। পর্তুগীজগণ ইরানে তামাকের প্রচলন করে এবং ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। শাহ আব্বাস নিজে ধূমপান পছন্দ করিতেন না এবং কেউ তাঁহার সামনে এই কাজ করিতে সাহস করিত না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর ধুমপান একটি জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়।

পঞ্চম আয়ের উৎস ছিল বিবিধ উপাদান হইতে, যথা- সম্পত্তি বাজেয়াফত, বিদেশী প্রতিনিধিদলের নিকট হইতে উপঢৌকন এবং এই ধরনের আয়। শাহের ভবনাদি নির্মাণের সময় মিস্ত্রিগণ কর্তৃক স্বল্প বেতন গ্রহণ করা একটি চিরাচরিত প্রথা ছিল। প্রত্যেক বৎসর সাম্রাজ্যের আয় ৭০০০,০০০ হইতে ৯০০০,০০০ তুমান বলিয়া অনুমান করা হয়। বাৎসরিক খরচের পরিমাণ জানা যায় নাই, কিন্তু ইহা আয়ের চেয়ে কম ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সাফাভীয় রাজাদের তহবিল পরিপূর্ণ ছিল।

সাফাভীয়গণ কর্তৃক প্রচলিত রীতিগুলির মধ্যে একটি ছিল উপাধি দান করা- যথা 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ', রাজত্বের তত্ত্বাবধায়ক এবং এই ধরনের আরও অনেক। কোনো কোনো সময় এইসব উপাধিসমূহ হইতে বংশানুক্রমিক এবং কোনো কোনো সময় এইগুলি একজন হইতে লইয়া আরেকজনকে দেওয়া হইত। যেহেতু অধিকাংশ পদবিধারিগণ হইতেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবর্গ সেইহেতু ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই পিতা হইতে পৌত্র বা এই ধরনের উপাধিপ্রাপ্ত অর্ধ ডজনের পার্থক্য নিরূপণ করিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান।

সাফাভীয়দের নিজস্ব ঐতিহাসিক ছিলেন। শাহ্ আব্বাসের রাজত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির মধ্যে একটি হইল 'আব্বাসের ইতিহাস'* তবে এই ধরনের গ্রন্থসমূহ ইহাদের ওসমানীয় প্রতিলিপির ন্যায় শাহের কার্যকলাপের দৈনিক ঘটনাপুঞ্জী বিশেষ। এইগুলিতে প্রায়ই শাহ ও তাঁহার নীতির অতিরঞ্জিত চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। সৌভাগ্যবশত অনেক ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে কেউ কেউ ইরান সফল করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করেন এবং জনজীবন সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, যাহাদের সঙ্গে তাঁহারা বসবাস করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহাদের রিপোর্টের মাধ্যমেই সরকারি ঐতিহাসিকদের নির্মিত বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব।

অধিকাংশ লোক তাহাদের অবসর সময় কাটায় কফি হাউসে। শাহ্ আব্বাসের একজন সমসাময়িক ওসমানীয় সুলতান চতুর্থ মুরাদ সমস্ত কফি হাউসগুলি বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন, অথচ শাহ্ আব্বাস ইরানে এইগুলিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং প্রায়ই এইগুলিতে যাতায়াত করিতেন এবং অনেক সময় বিদেশী অভ্যাগতদিগকে এইগুলিতে লইয়া যাইতেন। এইসব কফি হাউসগুলি ছিল বর আদান-প্রদানের কেন্দ্র। এইগুলিতে পর্যটকগণও আসিত, এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিত। দরবেশ আসিতেন যাঁহারা কিছু অর্থের জন্য শাহ্নামাহ হইতে ইরানের নায়কদের গল্প আবৃত্তির দ্বারা শ্রোতাদের বিমোহিত করিতেন। সাফাভীয়গণ প্রাক-ইসলামী যুগের অনেক অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ দান করিত, যথা বিষুব অয়ন সন্ধির সময়ের অনুষ্ঠানাদি, বসন্ত বিষুব (নওরোজ) যাহা নূতন বৎসর আনয়ন করে। তখনকার ন্যায় এখনও ইহা ইরানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ইহা ছাড়া ছিল গোলাপ অনুষ্ঠান এবং পানির অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যাহা সাধারণ মানুষকে তাহাদের ছকবাধা জীবনের ঘানি হইতে কিছুটা পরিত্রাণ লাভের সুযোগ দান করিত।

জনসাধারণ যেইসব খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করিত সেইগুলি হইল মোরগ, নেকড়ে ও ষাঁড়ের লড়াই, তাসখেলা, দড়াবাজি খেলা, দড়ির উপর হাঁটিবার খেলা, পুতুল নাচ এবং শুধু অভিজাতদের জন্য ছিল পলো খেলা। সাফাভীয় যুগের পূর্ব হইতেই শারীরিক ব্যায়াম ছিল ইরানে একটি সাধারণ অভ্যাস এবং আধুনিককাল পর্যন্ত ইহা চালু রহিয়াছে। শারীরিক ব্যায়ামে যাহারা অবসর যাপন করিত তাহারা একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করিত এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত এইসব ভ্রাতৃসংঘ চালু রহিয়াছে। তাহাদের কেন্দ্রকে বলা হইত শক্তির গৃহ এবং বিশেষ পালনীয় বিধিসম্বলিত তাহাদের একটি শ্রেণী ছিল। বাদ্যের তালে তালে তাহারা ব্যায়াম করিত। সাধারণ বাদক হইত মধুর স্বরের একজন লোক যে শাহনামা হইতে পারস্যের নায়কদের দুঃসাহসিক কার্যের গল্পসমূহ কবিতাকারে আবৃত্তি করিয়া শুনাইত।

ইসলাম এবং বিশেষত শীয়া ইসলাম, ইহার অনুসারীদের জীবনে খুব বেশি অনুষ্ঠানের দিন আনয়ন করে নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) ঐশী আদেশ লাভ ও কোরবানির (ঈদ-উল-আযহা কোরআনের দ্বারা অবশ্য পালনীয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে উদ্‌যাপিত) বার্ষিক অনুষ্ঠান ছাড়া বাকিগুলি হইল শোকের অনুষ্ঠান। আলী ও হাসানের মৃত্যুর জন্য শোক দিবস ছিল এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিয়োগান্ত কারবালার ঘটনা, যেখানে হোসাইন তাঁহার জীবন বিসর্জন দেন। শীয়া মতবাদের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন স্বরূপ সাফাভীয়গণ এইসব দিবস পালনে উৎসাহ প্রদান করিত এবং জনসাধারণ মসজিদসমূহে ভিড় করিত এবং মোল্লাদের

---

* *History of Abbas*

দ্বারা ঐসব গল্পসমূহের পুনরাবৃত্তি শুনিয়া ক্রন্দন করিত এবং অসংখ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করিত।

দশম মুহররমের কারবালার ঘটনা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ (মুহররম মুসলিম চান্দ্রমাসিক পঞ্জিকার প্রথম মাস)। দেশের সর্বত্র ঐদিন শোভাযাত্রা থাকিত। নগরগুলিতে জেলাসমূহ হইতে আগত শোভাযাত্রার উৎকর্ষ লইয়া একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিত। এইসব শোভাযাত্রায় রক্তাপ্লুত শবাচ্ছাদানিতে মুড়িয়া মৃত দেহসমূহ ও হোসাইনের একটি মস্তকহীন দেহ লইয়া তাহারা রাস্তা প্রদক্ষিণ করিত। উমাইয়া খলিফা ইয়াযীদকে এইসব শোভাযাত্রায় মনুষ্যরূপে সাজানো হইত এবং ইহা সুন্নিদিগকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য দর্শকদিগকে সুযোগ দান করিত। ইয়াযীদের সৈন্যগণ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হোসাইনকে হত্যা করিয়াছিল। প্রত্যেক শোভাযাত্রায় শত শত লোক অংশগ্রহণ করিত। কেউ কেউ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিত। আবার অনেকে একগুচ্ছ শিকল দিয়া নিজেদের উন্মুক্ত পিঠে আঘাত করিত। দশম দিবসে ধর্মীয় অনুভূতি চরম আকার ধারণ করিলে একটি নূতন দল শোভাযাত্রায় অবতীর্ণ হইত। এইসব লোক সাদা শবাচ্ছাদানিতে আবৃত থাকিত এবং প্রত্যেকে তাহার ডান হাতে একটি ছোট ছোরা ধরিয়া রাখিত আর বাম হাতে সে তাহার সঙ্গীর কোমরবন্ধনী ধরিয়া রাখিত। তাহারা নিজেদের মস্তকে আঘাত করিতে করিতে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া প্রদক্ষিণ করিত। সর্বদা তাহারা অন্ত্যেষ্টিকালের শোকসূচক গান করিত এবং সমবেত কণ্ঠে 'ইয়া হোসাইন', 'শাহ্ হোসাইন' বলিয়া ধ্বনি দিত।

সাফাভীয় যুগের শেষের দিকে 'অনুরাগের খেলা' প্রচলিত হয়। ভ্রাম্যমাণ নায়কদের দল সম্পূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও তুলি দ্বারা চেহারা সজ্জিত করিয়া কারবালার বিভিন্ন দৃশ্যের বাস্তব ও কল্পিত ঘটনাবলী গ্রামে ও শহরে চৌরাস্তাগুলিতে নাটকীয় আকারে প্রদর্শন করিত।

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা ছিল তুলনামূলকভাবে নির্জীব যুগ। আব্বাসীয় খলিফাদের সময় শীয়া মতবাদকে ধর্মবিরুদ্ধমত বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং ফলে ইহা সবরকমের স্বাধীন চিন্তবিদদিগকে প্রলুব্ধ করে। শীয়াদের মধ্যে সাধারণত বাধাহীন বুদ্ধিবৃত্তিমূলক অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়। তবে সাফাভীয়দের সময় শীয়া মতবাদ রাষ্ট্রের ধর্মের মর্যাদা লাভ করে এবং একটি অত্যন্ত কঠোর ধর্মান্ধ গোঁড়া ধর্মে পরিণত হয়। বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে ইহা যে বন্ধ্যাযুগ ছিল তাহার প্রমাণ এই যে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পরে ইরান মাত্র দুইজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক প্রস্তুত করিয়াছে। একজন শিরাজের মোল্লা সাদ্রা (মৃত্যু- ১৬৪১ খ্রিঃ) এবং আরেকজন সাবজাভারের হাজী মোল্লা হাদী।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Alderson, A.D., *The Structure of the Ottoman Dynasty,* Oxford : Clarendon Press, 1956.

Arberry, A. J., *Classical Persia : Literature,* London; George Allen of Unwin, Ltd., 1958.

Browne, E. G., *A Literary History of Persia* (4 vols), Cambridge, England: Cambridge University Press, 1964.

Bosworth, C. E., *The Islamic Dynasties,* Edinburgh : The University Press, 1967.

Eversley, G. J. S. and Chirol, Valentine, *The Turkish Empire from 1288 to 1922,* London : T. Fisher Unwin, 1923.

Fisher, Sydney, Nettleton, *The Foreign Relations of Turkey, 1481-1512,* Urbana, Ill : University of Illinois Press, 1948.

Hasluck F. W., *Christianity and Islam Under the Sultans,* Oxford, England : Oxford University Press, 1929.

Howorth, H.H, *History of Mongols* (4. vols), London: Longmans & Green, 1870-1927.

Kritzeck, James, ed, *Anthology of Islamic Literature,* New York : Holt, Rinehart & Winston, 1964.

Le Strange, Guy, *Mesopotamia and Persia Under the Mongols in the 14th Century A. D.,* London : Royal Asiatic Society. 1903.

Lockart, Laurence, *Nadir Shah-A Critical Study Based Mainly Upon Contemporary Sources,* London : Luzac, 1938.

Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam,* Cambridge, England : Cambridge University Press, 1962.

Merriman, R. B., *Suleiman the Magnificent,* 1520-1566. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1944.

Runciman, Steven, *A History of the Crusades* (4 vols) Cambridge. England : Cambridge University Press. 1951-58.

Spular, Bertold, *The Muslim World, Part II-The Mongol Period,* Leiden, Netherlands : E. J. Brill, 1960.

Sykes, Sir Percy, *History of Persia* (2 vols. 3rd. ed.). London : Macmillan, 1951.

Wittek, Paul, *The Rise of the Ottoman Empire.* London : Royal Asiatic Society, 1938.

Wright, Walter, Trans, *Ottoman Statecraft,* Princeton. N. J. : Princeton University Press, 1935.

তৃতীয় খণ্ড

সাম্রাজ্যবাদ ও জাগরণ

উনবিংশ অধ্যায়
ওসমানীয় সাম্রাজ্য লইয়া সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামী বিশ্ব মধ্য ইউরোপ হইতে মধ্যএশিয়া এবং মরক্কো হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। ৩০০ বৎসরেরও অধিক সময় পর্যন্ত ইহার ভাগ্য ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত লোকদের হাতে। পশ্চিমে ইহার ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল সাফাভীয়গণ এবং ভারতবর্ষে মোগলগণ। তুর্কি বংশ ছাড়াও, এই তিনটি সাম্রাজ্যের লোকদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। তাহারা সকলেই ছিল মুসলমান। আবৃত্তি করিত একই কোরআন, নামাজ পড়িত কাবার (মক্কার) দিকে মুখ করিয়া এবং তাহারা ইসলামের ধর্মীয় আইন অর্থাৎ শরীয়তকে মান্য করিত। তদুপরি তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজন ফার্সি সাহিত্য পছন্দ করিত এবং প্রায়ই সেই ভাষায় চিঠি-পত্রাদি আদান-প্রদান করিত। একজন 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' লোকের মূল্যায়ন করা হইত পারস্য সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা ও আচার-ব্যবহারের মাপকাঠিতে।

কিন্তু তবুও এই তিনটি সাম্রাজ্য কখনও একত্রিত যেমন হয় নাই, তেমনি পরিকল্পনায় সহযোগিতাও করে নাই। সুদূর ব্যবধান ও যোগাযোগের অভাবও এইজন্য কিয়দংশে দায়ী। তবে প্রধান কারণ হইল এই যে, সাফাভীয় ইরান ছিল ধর্মের দিক হইতে শীয় এবং ইহার মধ্যবর্তী পভৌগোলিক অবস্থান ওসমানীয় ও মোগলদের দুইটি সুন্নি সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। অপরদিকে ধর্মীয় পার্থক্য বাদ দিলে দেখা যায় ইরান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এবং মধ্য এশিয়ার গোত্রসমূহের সাময়িক আক্রমণ ব্যতীত তাহাদের সীমান্তগুলি খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল।

সাফাভীয় ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান গোঁড়া ধর্মীয় শত্রুতা, দক্ষিণ মোসোপটেমিয়ার নাজফ ও কারবালায় অবস্থিত শীয়া পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্ব লইয়া এবং পূর্ব এশিয়া মাইনরে শীয়া বসতিগুলির বিবাদের দ্বারা আরও ঘোরতর আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইরান ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্তকারী চিরাচরিত বাণিজ্যপথ দার্দানালিশ ও বসফরাস প্রণালীতে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্যই সাফাভীয় শাহ্‌গণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন নৃপতিদের সঙ্গে মিত্রতাসুলভ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ইহা যখন অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন ব্যবসায়ী দলগুলি ভূমধ্যসাগর ও ক্রমশ লেবাননের মধ্য দিয়া এই বাধা অতিক্রম করে এবং পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে। নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় জাতিসমূহ এই প্রবল শত্রুতার দ্বারা উপকৃত হয়, কারণ সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কিয়দংশে ওসমানীয় এবং পারস্যবাসিগণ ইউরোপের ব্যবসায়ী ও জাতিসমূহকে বিশেষ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের ব্যাপারে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

ওসমানীয় ও সাফাভীয়দের শত্রুতা সৃষ্টির ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার চেয়ে ভাষাগত পার্থক্যই বোধ হয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজারবাইজান ও উত্তর-পশ্চিম ইরানের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসিগণ ছিল তুর্কিভাষী। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি জাতিদ্বয়কে বিভক্ত করিয়া রাখে এবং একটিকে 'পারস্যবাসি' আর অপরটিকে 'তুর্কি' বলিয়া

চিহ্নিত করে। অমুসলমানদের বিরুদ্ধে ইসলামের সীমান্ত বিস্তৃতির কোনো উদ্দেশ্য শীয়াদের থাকিলেও সাফাভীয়গণ উহাকে নিরুৎসাহ করে। তৎপরিবর্তে তাহারা সুন্নিদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। বিশেষত ওসমানীয় সুন্নিদিগকে যেখানেই পাইত ধ্বংস করিত এবং শীয়াদিগকে ইমামত 'জবরদখলকারী'দিগকে (অর্থাৎ ইসলামের প্রথম তিন খলিফাকে) অভিশাপ দিতে বাধ্য করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নবজাগরনের সূচনা হয়, তখন ইসলামী বিশ্বে বন্ধ্যাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মোগল সাম্রাজ্য তখন পতনের সম্মুখীন এবং পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের শিকারে পরিণত হইয়াছে। সাফাভীয়গণ ধ্বংসের পথে এবং ওসমানীয়গণ যদিও সাম্রাজ্যের বৃহৎ আকারের দরুন তখনও বেশ শক্তিশালী, কিন্তু পতনের দিক দিয়া সাফাভীয়দের তেমন পশ্চাতে ছিল না।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওসমানীয় সাম্রাজের পতনের জন্য শুধু ইউরোপ দায়ী ছিল না। সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ইতোমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং নিজেদের দুর্বলতার দরুন সাম্রাজ্য এমনিতেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। খণ্ড খণ্ড অংশগুলি কুড়াইয়া লইবার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি ঘটনাচক্রে সেখানে ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে ওসমানীয় সাম্রাজ্য পরবর্তী ২০০ বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারিত না। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কোনো কোনো বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ দেওয়ালের লিখন দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁহাদের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই।

এই বিদ্বান লেখকদের মধ্যে একজন কোজী বে, যিনি সুলতান চতুর্থ মুরাদ ২১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবস্থার উপর একটি রিপোর্ট লেখেন। সম্ভবত অনেকগুলি অযোগ্য সুলতানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যোগ্য এই সুলতান স্বয়ং অথবা তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা, এই ধরনের একটি রিপোর্ট লিখিতে আদেশ দেন। যাহাই হউক, কোজী বে অস্বাভাবিক পরিষ্কার ভাষায় সাম্রাজ্যের অধঃপতন বর্ণনা করেন এবং রিসালাহ্ নামে পরিচিত তাঁহার রিপোর্টে ইহার কারণ ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, "সুলতান নিজেকে 'অলক্ষণীয়' করিয়া তুলিয়াছেন এবং হেরেম জীবনের মধ্যে ব্যস্ত রাখিয়াছেন। হেরেমের প্রভাবের ফলে 'সুলতান স্বয়ং শাসন করেন না এবং প্রধান উজীরকেও এই কাজ করিতে দেওয়া হয় না; সত্যিকারভাবে ক্ষমতা রহিয়াছে নিগ্রো খোজা ও ক্রীতদাসীদের হাতে।" সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক পতনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং ইহার জন্য প্রধানত করের বোঝা ও প্রশাসনের নীতিহীনতাকে দায়ী করেন। তিনি সিপাহী সংগঠনের সমালোচনা করেন। এই সৈন্যগুলিই সুলতান চতুর্থ মুরাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং জান-নিসারীগণ এই বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করিলেও কোজী বে তাহাদিগকে সমালোচনা হইতে রেহাই দেন নাই।

প্রায় ১৫ বৎসর পর সুলতান ইব্রাহীমের (১৬৪০-১৬৪৮ খ্রিঃ) রাজত্বকালে একজন অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকার 'নসিহতনামাহ্' বা 'উপদেশবাক্য' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি চরিত্রহীনতা এবং সর্বোচ্চ মূল্যদাতার নিকট কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁহার উপদেশ, সম্ভবত সুলতানের প্রতি ছিল করের বোঝা হাল্কা করা এবং কৃষকদের মধ্যে কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে বেতন প্রদান

করা। তাঁহার যুক্তি ছিল নির্ধারিত কর প্রথা প্রচলিত করা এবং পুণ্যবান মুসলমানদিগকে কর আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী জ্যোতিষ্ক ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাজী খলিফা (১৬০৮-১৬৫৭ খ্রিঃ)। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি গ্রন্থ 'দস্তুর আল আমাল' বা কাজকর্মের নীতি অনেকাংশে পারস্যের যুবরাজ দর্পণের ন্যায়।[১] তিনি পুরাতন আপ্তবাক্য পুনরুল্লেখ করেন, "রিজাল (কাজকর্মের) লোকজন ছাড়া রাষ্ট্র হয় না, মাল (সম্পদ) ছাড়া রিজাল হয় না এবং প্রজা ছাড়া মাল হয় না।" আবি সিনার ন্যায় তিনি রাষ্ট্রকে চারি স্তম্ভবিশিষ্ট দলের সঙ্গে তুলনা করেন— উলামা, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী ও কৃষক। তিনি দাবি করেন যে, রাষ্ট্র রুগ্ন হইয়াছে এবং এই রোগের কারণ হিসেবে তিনি যেইগুলিকে দায়ী করেন সেইগুলি হইল উচ্চ কর বোঝা, জনগণের প্রতি অত্যাচার এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিভিন্ন পদ বিক্রয়।

এই পতনোন্মুখ অবস্থায়ই ওসমানীয়গণ ভিয়েনার বিরুদ্ধে তাহাদের শেষ অভিযান পরিচালনা করে। ভিয়েনা অনেকদিন যাবৎ তাহাদের কবল হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই অভিযান চতুর্থ মুহম্মদ ও তাঁহার অযোগ্য প্রিয়পাত্র প্রধান উজির কারা মুস্তাফা কর্তৃক ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত হয়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে কারা মুস্তাফা ভিয়েনা অবরোধ করেন এবং দুই মাস পর্যন্ত নগরীর উপর গোলা নিক্ষেপ করেন। কাউন্ট স্টারহেমবার্গ -এর সেনাপতিত্বে নগরীর প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে বলিয়া কারা মুস্তাফা নগরীর আত্মসমর্পণ আশা করিতেছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন যে, পোল্যাণ্ডের রাজা জন সোবিস্কি ৭০,০০০ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, তবুও কারা মুস্তাফা তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ করিবার জন্য যেমন কিছু করেন নাই ঠিক তেমনি তাহাদের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনার ব্যাপারেও কিছু করেন নাই। সেই ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ সংগটিত হয় ১৬৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। ওসমানীয় বাহিনী পরাজিত হয়, অস্ট্রিয় ও পোলগণ তাহাদের বিজয় অব্যাহত রাখে। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ওসমানীয়গণ অস্ট্রিয়ানদের নিকট সমস্ত হাঙ্গেরি এবং ভেসোমিয়ানদের নিকট মোরিয়া, কোয়িনথ্ ও এথেন্স হারাইয়া ফেলে। ওসমানীয়গণ মুহম্মদকে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় সোলাইমানের (১৬৮৭-১৬৯১ খ্রিঃ) স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে। সোলাইমান ৪ বৎসরের মধ্যে খুব কম সময়ই হেরেম হইতে বাহির হইয়াছেন। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেডের পতন হয়। বাধ্য হইয়া সোলাইমান আহম্মদের ভ্রাতা মুস্তাফা কপরুলকে প্রধান উজীরের পদ গ্রহণ করিবার আহ্বান করেন। কিছুকালের জন্য তিনি সীমান্তরেখা আঁকড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হন কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইতোমধ্যে ইহার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অবস্থার মোকাবিলা করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ান্ত আঘাত করেন সেভয়ের রাজা ইউজীন ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দে জেন্তার যুদ্ধে। দুই বৎসর পর কার্লোইজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কার্লোইজ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করে। ইহা হইল অনেকগুলি আদেশকৃত শান্তি চুক্তির মধ্যে একটি, যাহা তুর্কিগণ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় কূটনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে অতঃপর তুর্কিগণ ইউরোপের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হইয়া দাঁড়াইবে না। অপরদিকে ওসমানীয়গণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিল যে, তাহাদের

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১৭।*

সাম্রাজ্য ইউরোপীয় দেশগুলির কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি ওসমানীয়গণ উপলব্ধি করিতে বাধ্য হয় যে, - ইউরোপীয়গণ মনে করেন, সুলতান খলিফা এমন একটি সাম্রাজ্য শাসন করেন যেখানে খ্রিস্টান 'সংখ্যালঘু'দের সংখ্যা, মুসলিম 'সংখ্যাগুরু'র চেয়ে অনেক বেশি এবং এই ব্যতিক্রম তাহারা আর চলিতে দিতে রাজি নহে।

ইউরোপে ওসমানীয় তুর্কির চিরাচরিত শত্রু ছিল অস্ট্রিয়া, পোল্যাণ্ড ও ভেনিস। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে নগররাষ্ট্রের কোনো উল্লেখ ছিল না। ভেনিস ছিল পতনোন্মুখ এবং শীঘ্রই ইহা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। পোল্যাণ্ড ছিল চতুর্দিকে রাশিয়া, প্রুসিয়া ও অস্ট্রিয়ার ন্যায় উদীয়মান শক্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বে এই অসহায় দেশ ঐসব পরিবেষ্টিত দেশসমূহের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় এবং ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ইহা তাহার কাহিল স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় নাই। সমগ্র অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অস্ট্রিয়া মোটামুটি শক্তিশালী ছিল কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় ইহাও ছিল পতনোন্মুখ। অস্ট্রিয়া ছিল অনেকগুলি জাতি সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ। ফলে ইহা অত্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়ে এবং সর্বদা বিভক্ত হইবার উপক্রম হয়। রুশদের সংকল্প ও পদক্ষেপ না থাকিলে অস্ট্রিয়া ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে ওসমানীয়দের বিরাট এলাকায় হুমকি দেওয়ার ন্যায় সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিত না।

ওসমানীয়গণ রুশদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানিত না। শুধু এতটুকু জানিত যে, তাহারা ছিল তুর্কিদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাতারদের দাস। কৃষ্ণসাগরের উত্তরে ওসমানীয় সুলতানগণ এক বিরাট এলাকার মালিক ছিল, যাহার ফলে এই সাগর সুলতানদের একটি নিজস্ব হ্রদে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে তাহাদের নিকট আকর্ষণীয় কিছু ছিল না বলিয়া তাহারা রুশদের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল।

তবে রুশ শাসকবর্গ ওসমানীয়দিগকে ভুলেন নাই। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, রুশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি ছিল বাইজেন্টাইন প্রতিষ্ঠান ও নৈতিকতার উপর রচিত। রাশিয়ার আইন, স্থাপত্যশিল্প, বর্ণমালা ও ধর্ম লওয়া হয় বাইজান্টিয়াম হইতে। মোঙ্গল আধিপত্যের পূর্বে রুশ ব্যবসার অধিকাংশই ছিল দক্ষিণের সঙ্গে। রুশগণ তাহাদের মুসলিম শাসনাধীন স্বধর্মীয়দের সঙ্গে সর্বদা একাত্মতা বোধ করিত। মস্কোর রাজা তৃতীয় আইভান (১৪৬২-১৫০৫ খ্রিঃ) শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের এতিম ভ্রাতষ্পুত্রী সোফিয়া প্যালিওলোগাসকে বিবাহ করিলে তিনি অনুভব করেন যে, সোফিয়ার সঙ্গে তিনি বাইজেন্টিয়ামের ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতাকেও বিবাহ করিয়াছেন। ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে সোফিয়ার পৌত্র ভয়াবহ আইভান যিনি নিজেকে বাইজেন্টাইন সম্রাটদের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন, 'সমস্ত রুশদের জার' বলিয়া নিজেকে অভিষিক্ত করেন। রাশিয়ার গীর্জার নেতৃবৃন্দ এই নীতি উপস্থাপিত করেন যে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণের দ্বারা রোমের পতন এবং তুর্কিদের দ্বারা কন্সটান্টিনোপলের (দ্বিতীয় রোম) পতনের ফলে 'তৃতীয় রোম' মস্কো অতঃপর খ্রিস্টান ধর্মের রাজধানী হইল এবং সমস্ত খ্রিস্টান বিশেষত অর্থোডক্সদের অভিভাবক হইল। রুশদের নিকট কন্সটান্টিনোপল ছিল সর্বদা 'জারগ্রাদ'। রুশদের জারের পক্ষে অবিশ্বাসী মুসলমানদের নিকট হইতে জারগ্রাদ পুনরায় জয় এবং সমস্ত অর্থোডক্সদিগকে তুর্কি জোয়াল হইতে মুক্ত করিবার চাইতে উপযুক্ত আর কি হইতে পারে।

রুশদিগকে দক্ষিণ অভিমুখে পরিচালনা করিবার জন্য ধর্মীয় ও রাজকীয় ঐতিহ্য একমাত্র শক্তি নহে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণের এক বিরাট অংশ ছিল স্লাভ। রুশ

রাষ্ট্র শক্তিশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদেশী ক্ষমতাধীন অন্যান্য স্লাভদের প্রতি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা' সুলভ আচরণ করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে স্লাভ রাশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী মতবাদে পরিণত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উদ্দেশ্য হিসাবে অর্থোডক্স মতবাদ ও স্লাভবাদ এবং উষ্ণ জলের বন্দরের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রসিদ্ধ পিটার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক রুশ জার বা রাষ্ট্রপ্রধান, পুঁজিবাদী বা কমিউনিস্ট, কূটনীতি বা যুদ্ধের দ্বারা প্রণালী ও কন্সটান্টিনোপলের উপর আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। ইহা তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইত না যদি না পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলি একাকী বা সম্মিলিতভাবে রাশিয়ার প্রণালীর পথ বন্ধ করিত। অন্য যে কিছুর তুলনায় ইহাই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দীর্ঘজীবী হওয়ায় সাহায্য করিয়াছে এবং জীবিত করিয়াছে।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ান রাশিয়ার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে তিলসিট প্রণালীতে অবাধ গতিবিধি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। রাশিয়া কর্তৃক ইস্তাম্বুল অধিকারে বাধাপ্রদান করিবার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হিটলার বিংশ শতাব্দীতে প্রণালী ও পারস্য উপসাগর এলাকায় সোভিয়েত রাশিয়ার দাবিকৃত 'আইনানুগ' স্বার্থ স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্য তথাকথিত ট্রুম্যান মতবাদ (Truman Doctrin) জারি করেন এবং একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুভেচ্ছা লইয়া পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও গ্রেট বৃটেনকে লইয়া সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন (CENTO) প্রতিষ্ঠা করেন। রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল হস্তগত করা হইতে বিরত রাখিবার ব্যাপারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাধারণ নিয়মে শুধুমাত্র একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনের গোপন চুক্তিতে সংঘটিত হয়, যখন বিজয় লাভের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারার সময় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি ও রাশিয়া ইস্তাম্বুল ও প্রণালী সত্যি সত্যি রাশিয়াকে প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের উল্লাসের কালে ইংল্যাণ্ড, জার্মানি ও ফ্রান্স রাশিয়ার সম্মুখে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষার উপর জোর দেয়, যদিও তাহারা স্বয়ং সেই অখণ্ডতা উত্তর আফ্রিকা ও ফারটাইল ক্রিসেন্টে ভঙ্গ করে। তাহাদের এই কার্যের কারণ হইল তাহারা বিশ্বাস করে যে নীতিগতভাবে প্রণালী ও পারস্য উপসাগর এলাকা হইল 'অন্তস্থল' এবং যে-ই এই অঞ্চল শাসন করিবে সেই বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে। রাশিয়াকে এই সুযোগ দিতে তাহারা নারাজ, আবার অন্য কোনো দেশ ইহা লাভ করুক তাহাও তাহারা চায় না। ফলে ইউরোপের কূটনীতিতে অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন হইল সেই অঞ্চলের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কিভাবে সেই নাজুক অবস্থায় 'ক্ষমতার ভারসাম্য' রক্ষা করা যায়।

যাহা হউক, এইসব কিছুর অধিকাংশ সংঘটিত হয় সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর কিছু অংশে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সমস্যাবলী তাহাদিগকে রাশিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানে বাধা দান করে। তদুপরি ওসমানীয় সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে ইহার অস্তিত্ব অস্ট্রিয়া বা রাশিয়া দ্বারা বিঘ্নিত হয় নাই। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া কর্তৃক ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা যে সম্ভব হয় নাই তাহা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির হস্তক্ষেপের দরুন নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্য বেশ শক্তিশালী

এবং অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া তখনও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণের সময় প্রায়ই রাশিয়া প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অস্ট্রিয়া তাহা অনুসরণ করে মাত্র।

রাশিয়ার প্রসিদ্ধ পিটার, যিনি কৃষ্ণসাগরে একটি ঘাঁটি প্রস্তুত করিবার আশা পোষণ করেন, ইতোমধ্যে কৃষ্ণসাগরের আজভ অধিকার করেন। তবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে তুর্কিদিগকে আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং রাশিয়ার অপপ্রচারের শিকার হন এবং দৃশ্যত বিশ্বাস করেন যে তিনি বেসারাবিয়ার অধিবাসিগণ কর্তৃক মুক্তিদাতা হিসাবে সম্বর্ধিত হইবেন। সামরিক কৌশলে কিছুটা অসাবধান হইবার ফলে প্রাথ নদী পার হইবার পর তিনি রীতিমত অবরুদ্ধ হন। জীবন লইয়া ফিরিবার জন্য তাহাকে প্রাথের সন্ধি মানিয়া লইতে হয়; আজভ ত্যাগ করিতে হয় এবং কৃষ্ণসাগরে একটি নৌবাহিনী মোতায়েন রাখিবার দাবি ছাড়িয়া দিতে হয়। তুর্কিগণ রুশদিগকে ধ্বংস করিবার একটি সুযোগ হারায়।

তবে ওসমানীয়গণ ভেনিসের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দে ঘোরিয়া পুনরায় জয় করে। জনসাধারণ ভেনিসীয়দের দ্বারা এমন কঠোরভাবে শোষিত হয় যে তাহারা পুনরায় ওসমানীয়দের নিকট ফিরিয়া যাইতে আগ্রহী হয়। অস্ট্রিয়গণ তুর্কি বিজয়সমূহের দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং মহামান্য সুলতানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে। রাজা ইউজিন ওসমানীয়দিগকে কয়েক দফা আঘাত করেন এবং তাহাদিগকে পিটারওয়ার্দীনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইটালিতে স্পেনীয় নীতিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ১৭১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্যাসরোভীজের উদারমূলক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভেনিস হইতে জয় করা সমস্ত এলাকা অস্ট্রিয়া তাহার আয়ত্তে রাখে। ওসমানীয়গণ হাঙ্গেরির বাকি অংশ এবং ওয়ালাচিয়া হারায়, কিন্তু ভেনিস হইতে জয় করা অংশ তাহাদিগকে রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ইরানের শক্তিশালী শাসক নাদির শাহের সহিত ওসমানীয়দের সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে এবং ক্রিমিয়া কৃষ্ণসাগরের বহু দুর্গ আক্রমণ করে। অস্ট্রিয়া এই গণ্ডগোলে অংশগ্রহণ করে কিন্তু অস্ট্রিয়দিগকে পিছু হটানো এবং রুশদিগকে দূরে রাখিবার মতো যথেষ্ট শক্তি ওসমানীয়দের ছিল। ফলে ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্ট্রিয়া পরাজিত হয় কিন্তু রাশিয়া পুনরায় আজভ লাভ করে এবং তুর্কি জাহাজে করিয়া মালপত্র পার করিবার শর্তে কৃষ্ণসাগরে ব্যবসা করিবার অধিকার ছাড়া বেশি কিছু পায় নাই।

বেলগ্রেডের চুক্তির পর ৩০ বৎসরের জন্য ওসমানীয়গণ একটি শান্তির যুগ উপভোগ করে। ১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহ নিহত হন এবং ইউরোপীয় দেশগুলি অস্ট্রিয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০-১৭৪৮ খ্রিঃ) এবং সপ্ত বৎসরের যুদ্ধে (১৭৫৬-১৫৬৩ খ্রিঃ) জড়াইয়া পড়ে। ওসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদ (১৭৩০-১৭৫৪ খ্রিঃ) তৃতীয় ওসমান (১৭৫৪-১৭৫৭ খ্রিঃ) এবং তৃতীয় মুস্তাফা (১৭৫৭-১৭৭৩ খ্রিঃ) নিজদিগকে শক্তিশালী করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। বস্তুত সপ্ত বৎসরের যুদ্ধের সময় প্রুশিয়ার মহান ফ্রেডারিক সুলতানকে অস্ট্রিয়া আক্রমণ করিবার উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করেন। সুদক্ষ প্রধান উজিরদের মধ্যে সম্ভবত শেষ উজির রাগেব পাশা ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি মিত্রতার সন্ধির খসড়া রচনা করেন কিন্তু উলামাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা ইহাতে জড়াইতে অস্বীকার করেন। এক বৎসর পর দ্বিতীয় ক্যাথারিন রাশিয়ার মহারাণী হন কিন্তু ওসমানীয়দের পক্ষে নিজদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অথচ ইহা তখন হয়ত সুলতানের পক্ষে সুবিধাজনক হইত। সাত বৎসর পর উলামাদের সম্মতি লইয়া সুলতান রুশ আক্রমণ হইতে পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জন্য অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও সুইডেনের সমন্বয়ে গঠিত 'সন্ধিসূত্রে' (Confederation) যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত যে শুধু পোল্যাণ্ড বিভক্ত হয় নাই তাহা নহে বরং যে দেশ কোনো উপকার লাভ করে নাই তাহা হইল তুরস্ক।

সুলতান অতি সন্দেহের চোখে পোল্যান্ডের উপর রুশ মতলব লক্ষ্য করেন। বিখ্যাত ক্যাথারীনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে ইউরোপের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাথারীন পোল্যাণ্ডের উপর রুশ আধিপত্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের সিংহাসন খালি হয় এবং ইহা ক্যাথারীনকে রুশ হস্তক্ষেপের আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ দান করে। ক্যাথারীনের কৌশলে এবং প্রুশিয়ার প্রসিদ্ধ ফ্রেডারিকের সহায়তায় কাউন্ট স্ট্যানিসলাস পনিয়াটোভস্কি নামক ক্যাথরীনের একজন সাবেক প্রেমিককে রাজা মনোনীত করা হয়। রুশ সম্রাজ্ঞী বলিতেন, "পনিয়াটোভস্কির অধিকার ছিল, অন্য যে কোনো প্রার্থীর (রাজা হইবার জন্য) তুলনায় নগণ্য এবং তাই অধিকভাবে রাশিয়ার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" পনিয়াটোভস্কি কৃতজ্ঞই ছিলেন এবং ক্যাথারীনই ফ্রেডারিককে পোল্যাণ্ড ভাগ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করেন।

রাশিয়া ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সদস্য ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই সুলতান মুস্তাফাকে তাঁহার অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। স্বীয় বাহিনী প্রস্তুত না থাকিলেও ক্যাথারীন এই সুযোগকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁহার বর্তমান প্রেমিক গ্রেগরী অরলভ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যাহা দ্বারা রুশ নৌবহরকে ইউরোপ ঘুরাইয়া ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক অর্থোডক্স ও বলকান স্লাভদের তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বসন্তকালের প্রথম দিকে গ্রেগরীর ভ্রাতা আলেক্সি অরলভের অধীনে একটি রুশ স্কোয়াড্রন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় এবং তুরস্কের উপকূলে উপস্থিত হয়। তবে ওসমানীয় মিল্লাত প্রথার দ্বারা খ্রিস্টান জনগণ তুলনামূলকভাবে স্বায়ত্তশাসিত ছিল এবং রুশ আধিপত্যের বিনিময়ে তাহারা এই সুবিধা ত্যাগ করিতে রাজি ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বলকানের জনসাধারণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে তাহা ছিল তখন তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, রুশদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য নহে।

রুশগণ চিয়স ও চিসমে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে এবং ওসমানীয় নৌবহরের দলশুদ্ধ ধ্বংস করিয়া দেয়, কিন্তু নৌবহরের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াও রুশগণ ইস্তাম্বুল পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে ক্যাথারীনকে স্বীকার করিতে হয় যে "নৌবহর কিছুই করিতেছে না।" স্থলযুদ্ধ ছিল মন্থর এবং কালক্ষেপণকারী। রুশ অগ্রগতি এত মন্থর ছিল যে প্রুশিয়ার ফ্রেডারিককে সকৌতুকে মন্তব্য করিতে শোনা যায় যে ইহা একটি "খোঁড়া ও কানার মধ্যে" অনুষ্ঠিত যুদ্ধ। তবে রুশ অগ্রগতি অস্ট্রিয়ার বিপদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সে অনতিবিলম্বে সুলতানদের সঙ্গে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার সন্ধি স্বাক্ষর করে। অতঃপর অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ক্যাথারীন ও ফ্রেডারিক ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের বিভক্তির সময় অস্ট্রিয়াকে অংশীদার করিতে সম্মত হন। পোল্যান্ডের বিভক্তির

ফলে তুর্কিগণ তাহাদের প্রতিরক্ষা আরও সুদৃঢ় করে, কারণ তাহারা সঠিকভাবেই বিশ্বাস করে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য লইয়াও শক্তিবর্গ অনুরূপভাবে ছিনিমিনি খেলিবেই। যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সুলতান মুস্তাফার মৃত্যুর ফলে তুর্কিদের প্রতিরক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে। একই বৎসর পুগাচেভের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্যাথারীনের বিরুদ্ধে একটি চাষী বিপ্লব ব্যাপক আকার ধারণ করে। উভয় পক্ষ সরাসরি আলাপ আলোচনা চালায় এবং ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে কুচুক কাইনারজি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।

এই প্রসিদ্ধ চুক্তির শর্তানুসারে ক্রিমিয়া স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এবং রাশিয়া কার্চ এবং বাভা ও নাইপার নদীর মধ্যবর্তী এলাকা অধিকার করে এবং প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াতের অধিকারসহ কৃষ্ণসাগরে স্বাধীন নৌচালনার সুবিধা লাভ করে। সুলতান মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং গ্রীক দ্বীপসমূহ স্বীয় আওতাভুক্ত রাখেন কিন্তু তিনি ৪,৫০০,০০০ রুবল ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য হন।

এই চুক্তিটিকে বিশেষত ইহার সপ্তম ও চতুর্দশ ধারার জন্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। চতুর্দশ ধারা অনুযায়ী ইস্তাম্বুলে রাশিয়াকে একটি সাধারণ গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় যাহা "সর্বদাই সেই (রুশ) সাম্রাজ্যের পাদরীবর্গের আশ্রয়ে থাকিবে ...।" সপ্তম ধারা অনুযায়ী রাশিয়াকে কিছু অস্পষ্টভাবে বর্ণিত অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে রুশগণ সুলতানের খ্রিস্টান প্রজাবৃন্দের রক্ষাকারী দাবি করিবার ব্যাপারে এই ধারাগুলি ব্যবহার করে। তবে এই দুইটি ধারা ব্যতীত চুক্তিতে তেমন আর নূতন কিছু ছিল না। বিদেশী দেশসমূহকে সন্ধি দ্বারা আত্মসমর্পণের সুবিধা প্রদান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়।[১] এইসব সন্ধি ছিল প্রধানত বাণিজ্যিক সুবিধাদির জন্য কিন্তু প্রায় সর্বদাই ইহাতে ধর্মের কথাও উল্লেখ করা হইত। এই ধরনের শেষ সন্ধি লাভ করে ফ্রান্স ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দে যাহা দ্বারা সমস্ত রোমান ক্যাথলিকদিগকে ফরাসিদের আশ্রয়ে দেওয়া হয়। যদিও এই চুক্তিতে শুধু সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিদেশী রোমান ক্যাথলিকদিগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু ফরাসিগণ এমনভাবে আচরণ করে যেন তাহারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রোমান ক্যাথলিক প্রজাবৃন্দেরও আশ্রয়দানকারী। তবে পূর্ববর্তী সন্ধি এবং কুচুক কাইনারজির চুক্তি মোতাবেক গৃহীত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সন্ধির মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তী সন্ধিসমূহ স্বাধীনভাবে প্রদান করেন সুলতান স্বয়ং এবং তাহার ব্যবসার সমৃদ্ধির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য। কুচুক কাইনারজির চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সন্ধি পরাজয়ের শাস্তি হিসাবে সুলতানের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। যদিও "মহামান্য সুলতান খ্রিস্টান ধর্ম ও ইহার গীর্জাসমূহের প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবার ওয়াদা প্রদান করেন ...।" রাশিয়া বিজয়ী হিসাবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য এই চুক্তিকে সুবিধাজনক কারণ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিত।

পরবর্তী যুগে সুলতানকে যখন শান্তিতে বসবাস করিতে দেওয়া হয় তখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবান্বিত করে। ক্যাথারীনের সর্বশেষ প্রেমিক পটেম্‌কিন তাঁহার রাজকীয় প্রভুর সীমান্ত বৃদ্ধির পূর্বানুরাগ জানিতেন এবং 'গ্রীক পরিকল্পনা' নামে বিজয়ের কুখ্যাত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হাতে লওয়া হয়। ইহার এক অংশকে বলা

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃ: ১৮৯।*

হইবে 'ভ্যাসিয়ার রাজ্য' এবং ইহার রাজা হইবেন পটেম্‌কিন আর প্রধান অংশ কন্সটান্টিনোপলকে রাজধানী রাখিয়া ক্যাথারীনের নবজাত কনিষ্ঠ পৌত্রের (১৭৭৯ খ্রিঃ) জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে। সেই পৌত্রের নাম যথার্থভাবে কন্সট্যান্টাইন রাখিবার জন্য তিনি আদেশ প্রদান করেন। অস্ট্রিয়া যে কুচুক কাইনারজির চুক্তি অনুযায়ী সুলতানের নিকট হইতে দালালী হিসাবে বুকভিয়া প্রদেশ লাভ করে, যাহাতে সে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে, সেও 'গ্রীক পরিকল্পনায়' অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার হিসাবে অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফকে সার্বিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদান করা হয়।

অভিলাষ, কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত বহুদিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহড়ার পর ক্যাথারীন কুচুক কাইনারজির চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়া অধিকার করেন। তিন বৎসর পর তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট জোসেফকে ক্রিমিয়ার একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন এই অধিকারের উৎসব পালন করিবার জন্য। পটেম্‌কিন আয়োজিত স্থল ও নৌবাহিনীর মহড়ায় সুলতান প্রথম আবদুল হামিদ (১৭৭৩-১৭৮৯ খ্রিঃ) শঙ্কিত হন এবং ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয় ও রুশ-অস্ট্রিয়ান আঁতাতের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

যথানিয়মে রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশত ওসমানীয়গণ আরও কম প্রস্তুত ছিল। প্রাথমিক রুশ-অস্ট্রিয়ান বিজয়গুলির দ্বারা ক্যাথারীন তাঁহার 'গ্রীক পরিকল্পনা' কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ লাভ করেন। তিনি পুনরায় আশা করেন যে বলকান খ্রিস্টানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। এই যুদ্ধও ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ ক্যাথারীনকে 'গ্রীক পরিকল্পনা' ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যু (১৭৯০ খ্রিঃ) আঁতাতকে দুর্বল করিয়া ফেলে। ইংল্যাণ্ড, প্রুশিয়া ও হল্যাণ্ডের চাপ সৃষ্টির ফলে অস্ট্রিয়ার নূতন সম্রাট লিউপোল্ডকে কোনো লাভ ছাড়াই ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট সুলতানের সঙ্গে সিস্তভার সন্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করে। কয়েক মাস পর (জানুয়ারি, ১৭৯২ খ্রিঃ) ক্যাথারীন জ্যাসীর সন্ধি করেন এবং তাঁহার সীমান্ত নাইস্তার নদী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন এবং এইভাবে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি পাকাপোক্ত করেন।

ক্যাথারীন 'গ্রীক পরিকল্পনা' সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন নাই। তিনি ইহা তাঁহার ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ইচ্ছাপত্রে উল্লেখ করেন এবং ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের অস্ট্রিয়ান-রুশ সন্ধিতে সন্নিবেশিত করেন। ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর ফলে কন্সটান্টিনোপল বিজয়ের জন্য একটি নতুন যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হয়।

বিংশ অধ্যায়
পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও ওসমানীয়গণ

পতনের প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় ওসমানীয় সাম্রাজ্য উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় এই সাম্রাজ্য পরাজয়ের পর পরাজয় অবলোকন করে এবং ইহা নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোনো প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। নেতৃবৃন্দ কোনো প্রতিকারমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নাই বা এই ব্যাধির কারণও অনুসন্ধান করেন নাই। অধিকাংশ সুলতানের মনোভাব ছিল "স্বাভাবিক কার্যকলাপে" সীমাবদ্ধ। সুলতানের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল হেরেম জীবন এবং সেই ধরনের জীবিকার ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য পদমর্যাদা বিক্রয়। স্বল্প কয়েকজন সুলতানের মধ্যে যাঁহারা সত্যিই সর্বাধিক লক্ষ্য করিতেন তাঁহারা দেখেন যে পৃথিবী অতি দ্রুততার সহিত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী এত নূতন ও ব্যাপক যে অতি বিচক্ষণ সুলতানগণও ঐগুলি বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালীগণও ঐগুলির সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারেন না।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য একটি সামরিক ছাউনী হিসাবে অবস্থান করে। এই ছাউনী সুসংগঠিত সৈন্য সরবরাহের দ্বারা শক্তিশালী। অর্থনৈতিক দিক দিয়া কৃষক, ব্যবসায়ী ও কারিগরগণের দ্বারা এই সমাজ লালিত-পালিত যাহারা রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল এবং শরিয়তের ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় সংগঠনের (উলামা) দ্বারা প্রতিপালিত। সাম্রাজ্য শাসিত হইত স্বয়ং সুলতানের প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক বুর্জুয়াদের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রশাসনের সংগঠন ও পন্থা উভয়টি নৈরাশ্যজনকভাবে কার্যহীন হইয়া পড়ে। ইউরোপে উদারতাবাদ, গণতন্ত্র, শিল্পোন্নয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের ফলে সামন্তবাদের ধ্বংস সাধিত হয়, গীর্জার ক্ষমতা হ্রাস এবং সেনাবাহিনী জাতীয়করণ করা হয়। যদিও ওসমানীয়দের ধর্মীয়, সামরিক ও সামন্ত প্রথা ইউরোপের ন্যায় ছিল না, তবুও ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শতাব্দীর সমস্যাবলীর সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে সক্ষম হয় নাই। শতাব্দীর সমস্যার মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ক্ষমতা এবং তাহাদের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ, অতুর্কিদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং উন্নতি ও পবির্তনের জন্য স্বয়ং তুর্কিদের অস্থির স্পৃহা।

সেকেলে হওয়া ছাড়াও ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। সাম্রাজ্য ২৬টি ভেলায়েতে (প্রদেশ) বিভক্ত ছিল এবং এইগুলি প্রায় ১৬০টি লিভার সমষ্টি। ভেলায়েতের এবং প্রায়ই লিভার গভর্নরকে বলা হইত পাশা এবং এই পদটিকে বলা হইতে পাশালিক। একটি প্রাচীন বিস্মৃতপ্রায় মঙ্গোলীয় রীতি অনুসারে ভেলায়েত পাশার পতাকায় তিনটি ঘোড়ার লেজ থাকিত এবং লিভাপাশার পতাকায় থাকিত দুইটি অথবা একটি ঘোড়ার লেজ, ইহা নির্ভর করিত লিভার আকার ও গুরুত্বের উপর।

পাশালিকগুলি বিক্রয় করা হইত এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট এইগুলি যাইত। কৃষক

ও প্রাদেশিক ব্যবসায়ীদের শ্রমের বিনিময়ে ভাগ্য গড়িবার ইহা ছিল সর্বোত্তম পন্থা। যতদিন পর্যন্ত পাশাগণ ইস্তাম্বুলের সিদ্ধান্তানুযায়ী অর্থ প্রেরণ করিতেন ততদিন সুলতান এই অর্থ আদায়ের সূত্র সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করিতেন না। তাই সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোকদের জন্য পাশালিক ছিল ঈপ্সিত বস্তু। নগদ অর্থের বিনিময়ে ইহা লাভ করা যাইত এবং নগদ অর্থের অপ্রতুলতার ফলে ক্রেতাদের সংখ্যা সীমিত থাকিত। যাহারা সক্ষম হইত তাহারা গ্রীক, আর্মেনিয়ান অথবা ইহুদি মহাজনদের নিকট হইতে অর্থ ধার করিত এবং প্রকৃত অর্থে পাশালিককে উচ্চ সুদের বিনিময়ে বন্ধক দিত। অর্থ আদায় নিশ্চিত করিবার জন্য পাশার 'সেক্রেটারি' হিসাবে মহাজন তাহার এজেন্ট নিযুক্ত করিত। সেক্রেটারিগণ পাশাদের চাইতে অধিক নির্দয় হইত। তাহারা সুলতান, পাশা, মহাজন ও নিজেদের আয় নিশ্চিত করিবার জন্য অসহায় কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট শোষণ করিত।

জনসাধারণের জীবন মরণ পাশাদের হাতে থাকিলেও এবং সুলতানের অনুকরণে পাশাগণ দরবার ও হেরেম রাখিলেও তাঁহারা সর্বশক্তিমান ছিলেন না। কিছু সংখ্যক স্থানীয় ক্ষমতাশালী লোকজনও ছিল যাহারা প্রায়ই পাশাদিগকে অমান্য করিত এবং এই দুইজনের মধ্যে সংঘর্ষে অধিবাসিগণ আরও অধিক কষ্টভোগ করিত। আনাতোলিয়ায় দেয়ার বে' (উপত্যকার প্রভু) নামে পরিচিত অনেক বংশানুক্রমিক যুদ্ধনেতা ছিল, যাহারা সম্ভবত গাজী নেতাদের বংশধর ছিল এবং যাহারা ওসমানীয় শক্তির নেতৃস্থানীয় মহলের অনুগত ছিল, তাহারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের পুরাতন স্বাধীনতা পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করে।

দেয়ার বে'র চাইতে আরও অধিক কুখ্যাত ছিল গ্রীক ফ্যানারিয়টগণ। মিল্লাত প্রথায় ইস্তাম্বুলের গ্রীক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক ছিরেন সাম্রাজ্যের সমস্ত অর্থোডক্স খ্রিস্টানদের প্রধান। প্যাট্রিয়ার্কের অফিসগুলি গোল্ডেন হর্নের পাড়ে বাতিঘরের (ফ্যানার) নিকটে অবস্থানের ফলে ইহার সদস্যদিগকে ফ্যানারিয়ট বলা হইত। ইহারা সবাই ছিল গ্রীক। ইহারা সাম্রাজ্যের অ-গ্রীক লোকজন যথা রুমানিয়ান, সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান ও অন্যান্য অর্থোডক্সদিগকে শোষণ করিত। পরে সমস্ত কর্মকর্তাদের মুসলমান জাতিভুক্ত হইবার পূর্বশর্ত শিথিল করা হইলে এইসব ফ্যানারিয়টগণ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক কার্যাবলীতে দোভাষীর কাজ করে। এইসব পদে বহাল থাকাকালে তাহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের জন্য ও তাহাদের গ্রীক পৃষ্ঠপোষকদের জন্য প্রচুর অর্থ সমাগম করে। কাফেলার পথগুলি নিরাপদ ছিল না, রাস্তা ও সেতুগুলি মেরামত হইত না এবং স্থানীয় যুদ্ধ ও রাহাজানিসমূহ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ বিকল করিয়া ফেলে।

সাম্রাজ্যের অর্থনীতির পক্ষে অভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার চাইতেও অধিক মারাত্মক ছিল ইউরোপের ঘটনাবলী। বাণিজ্যিক পথগুলি পরিবর্তন হইয়া যায়। নূতন সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার ও জাহাজ নির্মাণ উন্নতির ফলে ভূমধ্যসাগরে সচল ইউরোপীয় বাণিজ্য কয়েক যুগের জন্য পারস্য উপসাগরে এবং পরে পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ইউরোপের ক্রমবর্ধমান শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ওসমানীয়দের হস্তনির্মিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায়। তদুপরি, নতুন বিশ্ব হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণ চলিয়া যাইবার ফলে অর্থনীতির কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহরগুলি হইতে পশ্চিম ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়। এইসব কিছুতে

ওসমানীয় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং দুর্নীতিমুক্ত হইলেও সাম্রাজ্যের ব্যবসায়িগণ পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও চুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইত না।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের অচলাবস্থা, সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ও রুশদের হাতে পরাজয়, দুর্নীতি ও অসদুপায় বৃদ্ধি এবং ব্যবসার স্থান পরিবর্তনের ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাহাতে পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ তিরোহিত হইয়া যায়। যাহাদের নিকট অর্থ ছিল তাহারা বিনিয়োগ করিতে হয়ত জানিত না অথবা ভয় করিত কিংবা তেমন আগ্রহান্বিত ছিল না।

তবে সরকারের সংগঠন অপরিবর্তনীয় থাকে। সুলতান, উজীর, বুর্জুয়া, উলামা ও মহাজনগণ তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের পদমর্যাদায় যতবেশি সম্ভব অর্থ সমাগম করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সুলতান জান-নিসারীদের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না, কারণ তাহাদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি একগুয়েমিও সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই একদা কার্যকরী শক্তি যাহা সুলতানের ক্ষমতা রক্ষা করিত, তাহা প্রতিক্রিয়াশীল উলামাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যায় এবং যেসব সুলতান পূর্বাবস্থা পরিবর্তনের সাহস করিতেন তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীতে মিসর বিদ্রোহ করে, আরবের ওয়াহাবীগণ খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে, লেবাননের দ্রুজেজ (দুর্জি) মেরোনাইটগণ স্বায়ত্তশাসিত সরকার গঠন করে, বলকানের জাতীয় শ্রেণীসমূহ স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত স্বয়ং পাশাগণও কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বসে।

এইসব সত্ত্বেও 'ইউরোপের রুগ্ন লোকটি' আরও এক শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। কথিত আছে যে রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে এই নামে সম্বোধন করেন। বস্তুত ওসমানের বংশ রোমানদের চেয়ে কয়েক বৎসর অধিক জীবিত থাকে। সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতানুসারে মনে হয়, সাম্রাজ্য আর একদিনও টিকিতে পারিত না, কিন্তু ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী সাম্রাজ্য যে এতদিন টিকিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এমন এক প্রথা গড়িয়া উঠে যাহাতে প্রধান সেনাপতি হিসাবে সুলতান উপকৃত হন। যতদিন পর্যন্ত সুলতান শক্তিশালী ছিলেন ততদিন সমাজের এক অংশ হইতে অন্য অংশে তাঁহার কৃপা পরিবর্তন করিতেন এবং পরিণামে সবাই শান্তিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে ও সন্তুষ্ট থাকিত।

কিন্তু দুই শতাব্দীতে যখন সুলতানাতের ক্ষমতা নিম্নস্তরে নামিয়া যায় তখনও এই প্রথা নষ্ট হয় নাই। তৎপরিবর্তে ইহা থাকিয়া তো যায়ই বরং এমন গুটিকতকের শাসনের উপকারে আসে যেখানে সচরাচর সুলতান ছিলেন একজন সদস্য মাত্র। সুবিধাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারিত হইয়া যায়। এই শ্রেণীবিন্যাসে সুলতান ছিলেন হেরেমের মহিলাদের প্রভাবাধীন। মহিলাগণ ছিলেন আবার শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী খোজাদের করতলগত। তাহা ছাড়া ছিলেন সামরিক অধিনায়কগণ, উলামাগণ, পাশাগণ, মহাজনগণ এবং বিভিন্ন অমুসলিম মিল্লাতসমূহের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ। ইহারা এই প্রথার দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ মুসলমান ও অমুসলমান সকল জনগণকে শোষণ করিয়া মুনাফা লইতেন। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রায়ই নিষ্ঠুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছিল তাহাদের প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ। কিন্তু কখনও

বহিরাগত কোনো শক্তি বা সংস্কারের জন্য অভ্যন্তরীণ কোনো সদিচ্ছার দ্বারা এই প্রথা হুমকীর সম্মুখীন হইলে তাহারা সবাই এক দলভুক্ত হইয়া যাইতেন এবং হুমকির মোকাবিলা করিবার জন্য একে অপরকে সমর্থন করিতেন। বিপদ কাটিয়া যাওয়া মাত্রই তাহারা পুনরায় ইহার সঙ্গ লইতেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীয় ভার ও দুর্নীতির ফলেই ওসমানীয় ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িত, যদি না ইউরোপীয় জাতিগুলি কখনও একাকী এবং প্রায়ই সম্মিলিতভাবে এই নড়বড়ে সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন করিত। ইউরোপীয় ইতিহাসে 'প্রাচ্য প্রশ্ন' (The Eastern Question) বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মূল হইল এই রুগ্ন লোকটি মৃত্যুর পর ইহাকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অক্ষমতা। ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কেহই অন্যান্য শক্তিগুলিকে পরাজিত করিয়া এই সাম্রাজ্যের মালিক হইবার মতো যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল না। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটি শক্তি ভীত ছিল পাছে অন্য কোনো শক্তি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। নির্দয়, ষড়যন্ত্র, গোপন চুক্তি, প্রতারণা এবং যুদ্ধ এই সমস্ত ছিল কূটনৈতিক যুদ্ধের অংশবিশেষ। যখনই কোনো দেশ বা কয়েকটি দেশের সমষ্টি প্রাধান্য লাভ করে তখন অবশিষ্ট দেশগুলি 'ভারসাম্য' ফিরিয়া আসা পর্যন্ত ওসমানীয়দের সাহায্যে আগাইয়া আসে। যখন ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এই সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে তখন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং পরে জার্মানির ন্যায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ শোষণের ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের গুটিকতকের শাসনে অংশগ্রহণ করে এবং এই অবস্থাকে দীর্ঘজীবী করে। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইবার পক্ষে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি যেমন ছিল খুবই বেসামাল এবং ঠিক তেমনি রাশিয়া বাস্তব হইবার পক্ষে ছিল খুবই মেসিয়ানিক প্রভাবযুক্ত। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও ইউরোপীয় শক্তিগুলি ওসমানীয়দিগকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং তাহারা সফলতাও লাভ করিত যদি না তুর্কিগণ স্বয়ং সহজমরণ প্রণালী ব্যবহার করিয়া মৃতদেহকে কবর দিত।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপারে জড়িত ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ছয়টি ঃ অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি, রাশিয়া, গ্রেট ব্রটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও ইটালি। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া প্রধানত ওসমানীয়দের ইউরোপীয় এলাকাগুলির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ফলে তাহাদের আগ্রহ প্রায়ই সংঘর্ষে পরিণত হইত। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে হাপ্‌সবার্গগণ ওসমানীয় চাপের মুখে ছিল এবং তাই তাহারা অনুভব করে যে ভূখণ্ড বাছিয়া লইবার ব্যাপারে তাহাদেরই প্রথম সুযোগ লাভ করা উচিত। আরও বিশেষভাবে তাহারা দানিয়ুব এবং এড্রিয়াটিক ও এ্যাজিয়ান সাগরের মোহনার কর্তৃত্ব দাবি করে। তবে তাহাদের কিছু সমস্যা ছিল, যেইগুলি ওসমানীয়দের ন্যায়ই। অস্ট্রিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান শাসকশ্রেণী ছিল জার্মান ও ম্যাগিয়ার গোষ্ঠীভুক্ত, অথচ যাহাদিগকে তাহারা শাসন করিত তাহারা ছিল অধিকাংশই স্লাভ। শাসক শ্রেণীর ধর্ম ছিল রোমান ক্যাথলিকবাদী। অথচ প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অর্থোডক্স ধর্মাবলম্বী। ওসমানীয়দের ন্যায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ানগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীকে এক জাতিভুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে উদীয়মান জাতীয়তাবাদের চেতনায় স্বাধীনতার আন্দোলনকে উৎসাহ দান করে এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অপরদিকে রুশগণ ছিল অধিকতর সমজাতীয়। তাঁহাদের জাতীয়তাবাদের চেতনা সীমান্ত ছাড়াইয়া যায় এবং ওসমানীয় অথবা অস্ট্রিয়ানদের অধীনস্থ বলকানের স্লাভদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তদুপরি একমাত্র স্বাধীন অর্থোডক্স দেশ হিসাবে রুশগণ ইতোমধ্যেই সুলতানের অধীনস্থ অর্থোডক্স প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা দাবি করিয়াছে- ইহা এমন একটি দাবি যাহা হাপস্‌বার্গগণ কর্তৃক অপছন্দনীয় হয়, কারণ তাহারাই অর্থোডক্স লোকদিগকে শাসন করিত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে রুশগণ প্রবল চাপ অনুভব করে কারণ ওসমানীয়গণ দক্ষিণ রাশিয়ার প্রধান নদীগুলির শাখাসমূহ শাসন করিত। তাহারা সর্বদা উষ্ণজলের বন্দরের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের বিস্তৃতির প্রচেষ্টাকে যুক্তিযুক্ত করে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয়দিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ইহাদের কোনো একটিই একাকী তেমন শক্তিশালী ছিল না, আবার এই ব্যাপারে এই উভয় দেশের সম্মিলনও সম্ভবপর ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে ওসমানীয়দের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য রাশিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বৃটিশ ও ফরাসিগণ তুর্কিদের ভাগ্যের ব্যাপারে আগ্রহী হইয়া উঠে এবং তাহাদের স্বপক্ষে হস্তক্ষেপ করে।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রধান স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক এবং ইউরোপের ভারসাম্য রক্ষা করা। ভূখণ্ডের উপর কোনো উদ্দেশ্য তাহাদের থাকিলেও উহা তেমন মুখ্য ছিল না। তাহাদের ভূখণ্ডজনিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ আফ্রিকা ও এশিয়ার রাজ্যগুলির উপর। গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় নীতি নির্মিত ছিল ভারতবর্ষের নিরাপত্তা এবং ইহার দিকে পরিচালিত প্রধান পথগুলির উপর। মধ্যপ্রাচ্যে ইহার অর্থ হইল পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং এইগুলির চতুর্দিকের স্থানগুলির।

ফ্রান্স প্রধানত আগ্রহী উত্তর আফ্রিকা ও লেবাননের উপর। লেবাননে সীমান্ত যেহেতু সর্বদা সন্দেহজনক ছিল তাই সে এবং গ্রেট বৃটেন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্যথায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনকারী প্রথম দেশসমূহের মধ্যে সে ছিল একটি এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই চুক্তি অনেকবার পুনঃস্থাপিত করা হয়। ফরাসি ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও মহাজনগণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে ব্যাপক হারে টাকা খাটায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, সুলতান অর্থোডক্স প্রজাদের ব্যাপারে রুশেরা যেমন আগ্রহী ছিল তেমনি ফরাসিগণও রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের ব্যাপারে অনুরূপ আগ্রহী ছিল। ফিলিস্তিনের খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলির উপর যেহেতু অর্থোডক্স ও রোমান ক্যাথলিক উভয়ে কর্তৃত্ব দাবি করে তাই রাশিয়া ও ফ্রান্স সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

জার্মান ও ইটালি ছিল এই দৃশ্যে নবাগত। জার্মানির স্বার্থ ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক এবং রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করিবার জন্য সুলতানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। ইটালির ভূমিকা ছিল বৈশিষ্ট্যহীন, কিন্তু অন্যান্যরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত সে তখন লিবিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

তবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের একে অপরের সহিত এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক কোনো যুক্তিযুক্ত রূপ ধারণ করে না। ইহা সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়া যেরূপ একনিষ্ঠভাবে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয় অনুরূপভাবে ফ্রান্স

ও ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ ইতোমধ্যে দুইটি শিক্ষা লাভ করে। প্রধানত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, যাহা একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। সমস্ত তুর্কিগণ যে সংস্কারের বিষয়ে একমত হয় তাহা হইল সামরিক ক্ষেত্রে, যদিও জোড়াতালি ও অযোগ্যতা তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্রবলভাবে বাধা দান করে। দ্বিতীয় শিক্ষা হইল, তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে যে এক ইউরোপীয় জাতিকে অপর একটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া যায়। অতঃপর ওসমানীয়গণ ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে সমস্ত অমুসলিমদিগকে 'যুদ্ধস্থল' এবং শক্তিশালী শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে, দুইটি ইউরোপীয় দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী তাহাদের প্রজাসাধারণ একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে, কারণ ওসমানীয়দিগকে তাহারা আরও ভয়াবহ শত্রু বলিয়া মনে করে। ইহা লক্ষ্য করিয়া ওসমানীয়গণ বুঝিতে পারিল যে, তুর্কিদের সহিত শত্রুতা করিবার ব্যাপারে সমস্ত ইউরোপীয়গণ একমত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় বিবাদগুলি তুরস্কে অবস্থানকারী তাহাদের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তার লাভ করে। এবং ওসমানীয়গণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, তাহারা একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলাইতে পারে। শতাব্দীর শেষের দিকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের মাধ্যমে ওসমানীয়গণ এই বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠে তবে মোটের উপর তুর্কিগণ কোনো সুদূরপ্রসারী নীতি গ্রহণ করে নাই বরং একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া সাধারণত সমস্যাবিশেষে কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লব ছিল ওসমানীয় সুলতানদের জন্য সাময়িক বিরতি। পরবর্তীকালে তাহারা ইহার দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু সাময়িকভাবে ইহা ইউরোপীয়দিগকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে যে তাহারা ওসমানীয়দের প্রতি কোনো নজর দেওয়ারও অবকাশ পায় নাই। তবে নেপোলিয়নের আবির্ভাবে সমগ্র অবস্থার পরিবর্তন হয়, কারণ তিনি তাঁহার বিশ্বজনীন পরিকল্পনায় ওসমানীয়দিগকে এবং এমনকি পারস্যবাসীদিগকেও জড়িত করেন। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণ করিলে ওসমানীয়গণ ফরাসিদের সহিত তাহাদের সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোনো মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় নাই, কারণ নেপোলিয়নের আক্রমণ বৃটিশ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

নেপোলিয়ন যে বৎসর মিসর আক্রমণ করেন সেই বৎসর ২৭ বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় সেলিম সুলতান হন (১৭৯৯-১৮০৭ খ্রিঃ)। তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে একজন এবং সাম্রাজ্যের শক্তি পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক যুবককে লেখাপড়া ও দেখাশোনা করিবার জন্য তিনি ইউরোপে প্রেরণ করেন, ছাপাখানা পুনরায় চালু করেন এবং সমস্ত কিছুর চেয়ে জরুরি সেনাবাহিনীকে পূনর্গঠন করিতে চেষ্টা করেন। জান-নিসারীদিগকে স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া তিনি নূতন উর্দি (সামরিক পোশাক) ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া একটি নূতন বাহিনী গঠন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জান-নিসারীদিগকে এই বাহিনীর

চালচলন অনুসরণ করিতে উৎসাহ দান করা; কিন্তু তাহারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলিয়া তেমন কিছু ফল লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

ইতোমধ্যে ইউরোপ ইহার প্রায়ই পরিবর্তনশীল সন্ধি পুনস্থাপনের যুগে প্রবেশ করে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির মিত্র জোটে যোগদান করে এবং সুলতানও এই জোটে যোগদান করুন তাহা দাবি করে। এই দাবি ওসমানীয়দগিকে ফ্রান্সের আরও ঘনিষ্ঠতায় ঠেলিয়া দেয়; কিন্তু নিজেকে কোনো পক্ষের অন্তর্ভুক্ত না করিবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি সেলিমের ছিল। তবে স্বীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের উদ্দেশে ফরাসি অফিসার ও কারিগরদিগকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি এই বন্ধুত্বকে ব্যবহার করেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অস্টারলিজে নেপোলিয়নের বিজয়ের পর সুলতান ফরাসিদের আরও ঘনিষ্ঠ হন এবং রাশিয়ার স্বার্থের ব্যাপারে বৈরীভাবাপন্ন হন। ইহার ফলে রাশিয়া ও ইংল্যান্ড উভয়ের রুদ্ররোষ তাঁহার উপর পতিত হয়। উভয়েই ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সত্য সত্যই একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অকেজো নৌবহর প্রণালীতে প্রেরণ করে।

এই গোলযোগের মধ্য দিয়া দুইটি ঘটনা ওসমানীয় ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করিয়া দেয়। একটি হইল এই যে জান-নিসারীগণ তাহাদের সুরুয়ার কেতলী উল্টাইয়া দেয়, যাহা হইল বিদ্রোহের আলামত, এবং ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সুলতানের পদচ্যুতি ঘোষণা করিয়া একটি ফতোয়া জারি করিবার জন্য শেখ-উল-ইসলামকে সম্মত করে এবং তদ্স্থলে সুলতানের বিনম্র চাচাত ভাই চতুর্থ মুস্তফাকে সিংহাসনে বসায়। আরেকটি ঘটনা হইল রাশিয়ার প্রথম আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তিলসিটে মিলিত হন এবং একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রাণালীতে রাশিয়ার অবাধগতি প্রদানের ব্যাপারে নেপোলিয়ন সম্মত না হইলেও এই ধরনের বন্ধুত্ব ছিল ওসমানীয়দের জন্য একটি আঘাতস্বরূপ।

দানিউবের ওসমানীয় সেনাবাহিনী রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের এই সাময়িক বিরতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং মুস্তফাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় মাহমুদের (১৮০৭-১৮৩৯ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মাহমুদ ছিলেন ওসমানের বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ উত্তরাধিকারী। তদুপরি তিনিই ছিলেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ কর্মক্ষম ও ক্ষমতাশালী শাসক। সাম্রাজ্যের অনেক সুদূরপ্রসারী সংস্কারের উদ্বোধনকারী হিসাবে তিনি খ্যাত।

১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া পুনরায় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই সময় নেপোলিয়ন তাহাকে বিরত করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। রুশগণ তাহাদের চিরাচরিত মন্থর অগ্রগতি আরম্ভ করে, কিন্তু ১৮১১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইউরোপের অবস্থার অবনতি ঘটে। পাছে ফ্রান্স ও তুরস্ক উভয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় সেই ভয়ে প্রথম আলেকজাণ্ডার শান্তি স্থাপন করিতে আগ্রহী হন। অপরদিকে নেপোলিয়ন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য মাহমুদকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন। পরাজয়ে ক্লান্ত এবং ফরাসি দুমুখো নীতিতে বিরক্ত মাহমুদ রাশিয়াকে প্রাথ নদী বরাবর বেসারাবিয়া ছাড়িয়া বুখারেস্টের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এক মাস পর নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। তুর্কিগণ যদি ঘটনাপ্রবাহ জানিত তবে

নেপোলিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইত। যে পরিণতি নেপোলিয়নের ঘটে তাহা সম্ভবত ঘটিত না।

ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল, রাশিয়ার নিকট ভূখণ্ড ত্যাগ করিবার অপরাধে দ্বিতীয় মাহমুদ স্বীয় প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করেন। তিন বৎসর পর প্রথম আলেকজান্ডার, যিনি নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত, কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করিয়া প্রসিদ্ধ পিটারের স্বপ্ন পূরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় পরিকল্পনা 'পবিত্র বন্ধুত্বকে' (Holy Alliance) শক্তিশালী করিবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মেটারনিকের প্রভাবেও উদ্বুদ্ধ হন, যিনি 'আইনানুগতার' নীতিতে অবিচল থাকেন। এই নীতি ফরাসি বিপ্লব কর্তৃক বিঘোষিত প্রজাতান্ত্রিক মতামতের বিরুদ্ধে সুলতানসহ প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারিতার স্বীয় ক্ষমতা ধারণ করিবার অধিকারকে তুলিয়া ধরে। প্রথম আলেকজান্ডার মেটারনিকের উপদেশে কর্ণপাত করেন কিন্তু গ্রীকগণ করে নাই। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তাহারা তাহাদের 'আইনানুগ' প্রভু ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং প্রায় ৩০,০০০ তুর্কিকে হত্যা করে। ওসমানীয়গণ ইস্তাম্বুলের গ্রীকদিগকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সমগ্র ইউরোপ জাগ্রত হয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারা নহে, বরং এইজন্য যে গণতন্ত্রের জন্মভূমি গ্রীস তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এক শতাব্দী পর ইহুদিবাদের ব্যাপারে যাহা হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় উদারপন্থীগণ, পৌরাণিক পণ্ডিতবর্গ এবং গণতন্ত্র অভিলাষীগণ 'ফিলহেলেন' (Philhelene) সমিতিসমূহ গঠন করে, গ্রীক বিদ্রোহীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্ব স্ব সরকারগুলিকে গ্রীকদের স্বপক্ষে সুলতানের বিরোধিতা করিবার জন্য উৎসাহিত করে। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি গ্রীক 'জাতীয় পরিষদের' (National Assembly) সভা বসে এবং ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সুলতান তাঁহার স্বল্প সাজসরঞ্জাম বিশিষ্ট সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহাত্মক জান-নিসারীদিগকে লইয়া এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হন এবং ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার নামেমাত্র অনুগত মিসরের মুহাম্মদ আলীকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ আলী, যিনি এই ধরনের একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, গ্রীকদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহীম ন্যাভারিনোয় অবতরণ করেন এবং একনাগাড়ে অনেকগুলি সফল অভিযানের পর এথেন্স অধিকার করিতে সক্ষম হন। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বিদ্রোহ প্রায় ধ্বংস হইয়া যায় এবং গ্রীক স্বাধীনতাকে একটি হৃত বিষয়ে পরিণত করে।

এইসব কিছু চলাকালীন সুলতান নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আক্ষেপ করিতে ছিলেন যে তাঁহার মিসরীয় ভৃত্যের ইউরোপীয় শিক্ষিত সেনাবাহিনীই এই কাজ সমাধা করিল অথচ জান-নিসারীগণ স্বীয় দেশে বেকার বসিয়া রহিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জান-নিসারী বাহিনী ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে এক বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। সময়ে অগ্রগতিতে ইহা সুলতানাতের প্রগতির পথে এক জগদ্দল পাথর ও হুমকিতে পরিণত হয়। জান-নিসারী বাহিনী এত শক্তিশালী, দুর্নীতিপরায়ণ ও অলস হইয়া উঠে যে তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সুলতানদিগকে পদচ্যুত ও সিংহাসনে আরোহণ করায়, প্রধান উজিরদিগকে হত্যা করে এবং

সংস্কারের প্রত্যেক প্রত্যেক প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করে। তাহাদিগকে কাবু করিবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সুলতান সেলিম প্রাণ হারান। তবে মাহমুদ এই গুরুত্বপূর্ণ পদেক্ষেপ গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তিনি একটি নূতন গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন এবং ইহাদের হাজার হাজার সৈন্যকে ইস্তাম্বুলে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি জান-নিসারীদিগকে ইউরোপীয় ধরনের সামরিক কুচকাওয়াজ গ্রহণ করিতে আদেশ দান করেন। জান-নিসারীগণ তাহাদের নিজস্ব কুচকাওয়াজ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করতঃ রাজপ্রাসাদের দিকে ধাবমান হয়, যাহার ফলে তাহাদিগকে অসংখ্য গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। তাহারা তাহাদের ব্যারাকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রায় সবাই ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত গোলন্দাজ বাহিনী ব্যারাকগুলির উপর গোলা নিক্ষেপ করে। সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি নগরীতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। অতঃপর এই বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষণা করিয়া সুলতান একটি আদেশ জারি করেন। এই ঘটনার গুরুত্বকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অতিরঞ্জিত করা যায় না, কারণ ইহা শুধু সামরিক সংগঠনের পথই উন্মুক্ত করে নাই বরং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারও খুলিয়া দেয়। জান-নিসারীদের উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীলগণ অতঃপর অকেজো হইয়া পড়ে।

মাহমুদের প্রশংসা ম্লান হইয়া যায় যখন স্মরণ করা হয় যে গ্রীক ঘটনা তখনও শেষ হয় নাই। রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস (১৮২৫-১৮৫৫ খ্রিঃ), যাহার নিকট 'আইনানুগতার' ব্যাপারে মেটারনিকের বুদ্ধিমত্তা ছিল না, গ্রীক বিদ্রোহকে রুশ সংবিধানানুযায়ী ঘুরাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। বৃটিশ ও ফরাসিগণ গ্রীকদের স্বপক্ষে জনমতের প্রবল চাপে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। এই জনমত ইংল্যান্ডের লর্ড বায়রন এবং ফ্রান্সের চ্যাটুব্রান্ডের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। তাঁহারা ইহাও আশঙ্কা করেন যে রাশিয়া ইহাকে ওসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার একটি ছল হিসাবেও ব্যবহার করিতে পারে। অতএব গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই তিন শক্তিধর সম্মিলিতভাবে গ্রীকদের সঙ্গে আপোস করিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করে। ইহা মাহমুদ অস্বীকার করেন, যাহার ফলে এই তিনটি ইউরোপীয় শক্তির সংযুক্ত নৌবহর ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ন্যাভারিনোয় ওসমানীয় নৌবহর ধ্বংস করে এবং ইব্রাহীমকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করে।

সুলতান ক্ষতিপূরণ দাবি করেন এবং রাশিয়া ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে এককভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। চিরাচরিতভাবে রুশগণ ছিল মন্থরগতিসম্পন্ন, কিন্তু জান-নিসারীদিগকে ধ্বংস করিবার পর একটি নূতন বাহিনী গঠন করিবার মতো যথেষ্ট সময় ওসমানীয়গণ লাভ করে নাই। এক বৎসর পর ইদির্ন (আদ্রিয়ানোপল) অধিকার করিয়া রুশগণ ইস্তাম্বুলের আশঙ্কাজনক নিকটে অগ্রসর হয়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে এবং মাহমুদকে শান্তির প্রস্তাব করিতে প্রবল চাপ প্রদান করে। আদ্রিয়ানোপলের চুক্তির দ্বারা (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৯ খ্রিঃ) 'তিন শক্তির' নিশ্চয়তায় সুলতান গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করেন, সার্বিয়াকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করেন এবং দানিয়ুবের মোহনা রাশিয়াকে প্রদান করেন।

আদ্রিয়ানোপলে চুক্তির পর প্রায় শতাব্দী পর্যন্ত সুলতানের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মিসরের মুহাম্মদ আলী পাশার সহিত আভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রতি অথবা সংস্কারের প্রচেষ্টার প্রতি।

এই উভয় বিষয়ই পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। সুলতান তাঁহার ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের সহিত তুলনামূলকভাবে শান্তিতেই দিন যাপন করেন। ইতোমধ্যে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের গোলযোগে নিপতিত হয়, যাহার প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যেও সংক্রামিত হয়। একই বৎসর মার্কস ও এঙ্গেল্‌স্ কমিউনিস্ট গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেন। চারি বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স একনাগাড়ে অনেকগুলি বিপ্লবের মধ্য দিয়া রাজতন্ত্র হইতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে এবং পরে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে পরিবর্তিত হয়, যাহাতে একনায়ক হিসাবে আগমন করেন আরেকজন বোনাপার্টি, লুই নেপোলিয়ন।

লুই নেপোলিয়ন, যিনি পোপকে তাঁহার দুর্যোগে সাহায্য করেন এবং পুনরায় সম্রাট হইবার জন্য তাঁহার বিদ্রোহের সময় ভ্যাটিকান দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হন, নিজেকে একজন বিশ্বস্ত ধর্মপুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে উদগ্রীব হন। সুলতানের রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের উপর ফ্রান্সের স্বার্থ পুনঃঘোষণা করিয়া এবং ফিলিস্তিনের খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের ব্যাপারে ভ্যাটিকানকে বিশেষ সুবিধা দান করিয়া তিনি এই কাজ সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। তদুপরি এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রথম নিকোলাসের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিহত করে, যিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'ভ্রাতা' সম্রাট হিসাবে স্বীকার করেন নাই, এবং ফ্রান্সের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্বের অধিকার লইয়া রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মধ্যে সর্বদা বিবাদ ছিল। ওসমানীয়দের ফিলিস্তিন অধিকারের পর হইতে সুলতান সর্বদা কখনও একদল এবং কখনও আরেক দলকে আধিপত্য দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য কখনও কখনও মুসলমানদের হাতে এইসব স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও চাবি অর্পণ করা হয়। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সংঘর্ষ হয় এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের দিকে সুলতান আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৬১ খ্রিঃ) অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফরাসি আধিপত্যের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জার প্রথম নিকোলাস, যিনি ইহাকে রাশিয়ার সম্মানের প্রতি এক বিরাট আঘাত বলিয়া বিবেচনা করেন, মেনশিকভকে সুলতানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার জন্য প্ররোচিত ও প্রভাবান্বিত করিতে প্রেরণ করেন। সুলতান ফরাসিদের প্রকাশ্য সহায়তা ও বৃটিশদের প্রচ্ছন্ন উৎসাহে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানমূলক জবাব প্রদান করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কে আরম্ভ করে তাহা সঠিক করিয়া বলা দুষ্কর। নিজের সম্মান সমুন্নত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাশিয়া গ্রেট বৃটেনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে 'নিশ্চিত' হয় এবং স্বীয় সাফল্যে উপর আস্থাশীল হয়। প্রথম নিকোলাস পরামর্শ দান করেন যে মৃতপ্রায় 'রুগ্ন লোকটির' সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যাপারে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন একে অপরের সহিত সহযোগিতা করুক। ফ্রান্স স্বীয় লব্ধসুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে উদ্যোগী হয়। সে দৃশ্যত গ্রেট বৃটেনের নিরপেক্ষতা আশা করে নাই। ওসমানীয়দের পক্ষে ইহা অভাবনীয় সুযোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ সুলতান গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ের সহায়তা লাভের ব্যাপারে সাধারণ বিপত্তি এবং ভারতবর্ষের রাস্তার নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারের ভীতি–উভয় কারণ একত্র হইয়া বৃটেনের এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রধান বিবদমান দলগুলি ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্য, বৃটেন ও ফ্রান্স। পরে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া একে অপরের সহিত একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন

করে এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগদান করে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এই যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। বিজয়ী পক্ষের অংশভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই চুক্তিতে স্বার্থান্বিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ প্রাকারান্তরে ওসমানীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এই ঘোষণার দ্বারা যে, যে কোনো কার্যকলাপ যাহা এই সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে বিপদগ্রস্ত করে উহাকে "ইউরোপীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে গণ্য করা হইবে"। ইউরোপীয়গণ সংস্কার দাবি করে এবং অন্ততপক্ষে কাগজে-কলমে তাহা লাভ করে। সুলতানের ফরমান, হাত্তি হুমায়ুন ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে জারি করা হয় এবং উহা দ্বারা সুদূরপ্রসারী সংস্কারসমূহ হাতে লওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত ওসমানীয়গণ অন্ততপক্ষে বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতি লাভ করিবার জন্য উত্তম স্বভাবের নমুনা হিসাবে কিছু 'সংস্কার' প্রদর্শন করে।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সংস্কারের ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আগ্রহান্বিত হয় প্রধানত তাহাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, বিশেষত অর্থনৈতিক বিষয়ে, তদুপরি তাহাদের নিজস্ব নাগরিকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যও বটে, যাহারা উদারনৈতিক মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মানব জাতির উপকার সাধনের আলোকপ্রাপ্তিতে আশান্বিত হয়। পশ্চিম ইউরোপীয়গণ তখনও রুশ অনধিকার প্রবেশ হইতে সুলতানের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু পশ্চিমা শক্তিবর্গ আবিষ্কার করে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে জীবিত রাখাটাই অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিক লাভজনক এবং ইউরোপীয় মহাজনগণ এই লুঠে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে।

অন্যূন ২০০ বৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্য অপমানিত ও পরাজিত হয়, বিশাল ভূখণ্ড হারায়, কিন্তু সুলতান অন্ততপক্ষে অর্থনৈতিক দিক দিয়া বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত থাকেন। ওসমানীয় সুলতানদের ঘাটতি পূরণের অনেক পথ ছিল। তাঁহারা মুদ্রামান হ্রাস করেন, তাঁহাদের প্রজাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁহারা দেশীয় মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার করেন। বিদেশী ব্যাংক ও সরকার হইতে টাকা ধার করিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না। যতদূর সম্ভব ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান অস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সর্বপ্রথম বৃটেন ও ফ্রান্স হইতে টাকা ধার করেন। একবার দ্বার উন্মুক্ত হইবার পর সুলতানগণ ধার করিতে থাকেন। স্থানীয় ব্যাংক মালিকগণ এবং ইউরোপীয় মহাজনগণ এমন অধিক হারে মুনাফা অর্জন করেন যে তাহারা এই অভ্যাসকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতে থাকেন। শতকরা ৫৫ভাগ বাটার হারে কর্জ এবং শতকরা ১২ টাকা সুদের হার নিশ্চয়ই লাভজনক। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যখন সুলতান হন (১৮৭৬-১৯০৯ খ্রিঃ) তখন দেশ প্রকারান্তরে কর্জের পংকিলে নিমজ্জিত। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রশিয়ার বিরুদ্ধে ওসমানীয়দের পরাজয়ের ফলে সুলতানের উপর ১০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ বসান হয়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র সাম্রাজ্য খাতকের আসনে বসে। বৃটিশ, ফরাসি, ডাচ, জার্মান, অস্ট্রিয়ান ও ইটালিয়ান লগ্নীদাতাগণ ওসমানীয় সরকারি ঋণের জন্য প্রশাসনিক পরিষদ স্থাপন করে এবং সাম্রাজ্যের রাজস্বের উৎপাদন ও আদায় উভয় বিভাগে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্তরগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই পরিষদ হিসাবের জমায় স্থিতিশীলতা আনয়ন করে এবং বিদেশী পুঁজির গতিতে উৎসাহ প্রদান করে। প্রথমবারের মতো সাম্রাজ্যের

প্রজাসাধারণ উন্নয়নে যৎসামান্য অংশীদার হইতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকে অনুভব করে যে সুলতানের কর্তৃত্বে অবস্থিত সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠানগুলি এইগুলির কিছুর মধ্যে নাই।

ইউরোপীয় লগ্নীদাতাগণ সাম্রাজ্যের বিশাল অনুন্নত ভূখণ্ডের কাঁচামাল এবং উন্নয়নের সুযোগ সুবিধা লাভ করে যাহা স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত তুলনীয়। ওসমানীয়গণ রাস্তা, রেলপথ, শহরের আলো, পানি এবং সর্বপ্রকারের সরকারি পূর্তকার্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইউরোপীয়গণ টাকা ঋণ দিতে এবং সুবিধাদি লাভ করিতে সদা প্রস্তুত। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বিসমার্ক চিন্তা করেন নাই যে বলকানবাসিগণ 'একটিমাত্র পোমেরানিয়ান পদাতিক সৈন্যের হাড়ের' সমতুল্য। বিশ বৎসর পর দ্বিতীয় উইলহেলমের অধীনে জার্মানগণ তুর্কিদের নিকট শুধু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় নহে বরং আনাতোলিয়ায় রেলপথ নির্মাণেও ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয়বার ইস্তাম্বুল সফর করেন এবং এইবার তিনি দামেস্ক ও জেরুজালেম গমন করেন। প্রাচ্যে ড্রাঙ্গনাস অস্টেন (Dranganch Osten) উদ্বোধন করা হয় এবং প্রসিদ্ধ বার্লিন হইতে বাগদাদ রেলপথ মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। ইহা বৃটিশ, ফরাসি ও রুশদিগকে এমন ভীত করে যে তাহারা নিজেদের পার্থক্য ভূলিয়া যায় এবং জার্মানদের পূর্বদিকের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে।

প্যারিসের চুক্তির পর দুই যুগ ধরিয়া ইউরোপীয়গণ নিজেদের সংঘর্ষ, একত্রীকরণের যুদ্ধ এবং অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা ওসমানীয়দিগকে কিছু অবকাশ প্রদান করিবার কথা, কিন্তু তাহা করে নাই। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ এবং পশ্চিম ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব বলকানের প্রজাসাধারণের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির জন্ম দেয়। সার্বগণ স্বাধীনতার প্রয়াসী হয়, গ্রীকগণ আরও ভূখণ্ডের আশা করে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয় এবং রুমানিয়ায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

যেই গতি ও নির্মমতার সহিত ওসমানীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের দমন করে তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপের শিক্ষিত উদারপন্থীগণ ভয়াভিভূত হইয়া পড়ে এবং তুর্কিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য দল পাকাইতে থাকে। অপরদিকে পশ্চিম-ইউরোপের সরকার ও শিল্পপতিদের রক্ষা করিবার মতো যথেষ্ট লাভজনক অর্থের বিনিয়োগ ছিল বলিয়া তাহারা এইসব মানবিক বিবেচনার দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। রুশ ও অস্ট্রিয়ানগণ এতদ্বারা তুর্কিদের সঙ্গে তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার সুযোগ লাভ করে। ইউরোপের শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি সমাধানের জন্য ইস্তাম্বুলে সমবেত হয়। সুচতুর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, যিনি সংস্কারবাদীদের দ্বারা মাত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন (৩১শে আগস্ট, ১৮৭৬ খ্রিঃ), শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সম্মত হন। ইহা বৃটিশদিগকে খুশি করে কিন্তু রুশদিগকে নহে, কারণ তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ফ্রান্স তখন জার্মানির হাতে পরাজয়ের ক্ষত সারাইতে ব্যস্ত। বিসমার্ক বলকানে তেমন আগ্রহী নহেন, এবং বৃটেনে জনমত তুর্কিদের ব্যাপারে এমন সমালোচনামুখর যে, তাহারা নেতৃবৃন্দকে ওসমানীয়দের স্বপক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিবার ব্যাপারে নারাজ।

১৮৭৭ হইতে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে তুর্কিগণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু রুশদিগকে ঠেকাইতে ব্যর্থ হয়, যাহারা ইস্তাম্বুলের মাত্র দশ মাইল নিকটস্থ স্যানস্টেফানো ইয়াশীলকার গ্রামে পৌঁছিয়া যায়। আবদুল হামিদ স্যানস্টেফানোর চুক্তিতে (১৩ই মার্চ,

১৮৭৮ খ্রিঃ) স্বাক্ষর করেন, যদ্বারা ইউরোপে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও চলিয়া যায়। এই চুক্তি মন্টেনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে স্বাধীনতা দান করে এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে স্বায়ত্তশাসন দান করে। তবে এই চুক্তির মূলে ছিল কৃষ্ণসাগর হইতে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট বুলগেরিয়ার সৃষ্টি। তদুপরি পূর্ব এশিয়া মাইনরে সুলতান এক বিশাল ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এসব কিছু ছাড়াও হৃতমনোবল সুলতান প্রায় ৩০০,০০০,০০০ রুবল ক্ষতিপূরণ দান করিতে সম্মত হন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় গ্রীকদের নিকট হইতে—যাহারা তাহাদের ভূখণ্ডজনিত আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি দেখিতে পায়, সার্বদের নিকট হইতে— যাহারা বহু সংখ্যক সার্বদিগকে বিরাট বুলগেরিয়ার প্রজা হইয়া যাওয়ায় আক্ষেপ করে, অস্ট্রিয়ানদের নিকট হইতে—যাহারা তাহাদের পূর্বদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ দেখিতে পায়, এবং বৃটিশদের নিকট হইতে- যাহারা প্রধানমন্ত্রী ডিজরাইলীর নেতৃত্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। জার্মানিসহ এইসব দেশ রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং স্যানস্টেফানোর চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য বার্লিনের সম্মেলন (১৩ই জুন, ১৮৭৮ খ্রিঃ) আহ্বান কর।

বার্লিনের চুক্তি স্যানস্টেফানোর চুক্তির স্থালাভিষিক্ত হয় এবং ইহা সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক, যাহা বলকান সমস্যার কোনো সমাধানই উপস্থাপিত করে নাই। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করা হয় এবং ইহার কিছু অংশ তুরস্ককে দেওয়া হয়; অস্ট্রিয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কর্তৃত্ব অর্জন করে; সার্বিয়া ও মন্টোনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করে; রাশিয়া বেসারাবিয়ার ন্যায় বাটুম ও কারস্ অধিকার করে, গ্রীক কিছু ভূখণ্ড লাভ করে এবং গ্রেট বৃটেন সাইপ্রাস লাভ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তৎসঙ্গে ওসমানীয়গণ ইউরোপীয় শক্তিসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি নিয়োজিত করেন, কিন্তু ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ নিরাশাব্যঞ্জক। প্রথম মহাযুদ্ধ নাগাদ সুলতান তাঁহার ইউরোপীয় ভূসম্পত্তির প্রায় সবকিছুই হারাইয়া ফেলেন এবং ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও উত্তর আফ্রিকায় তাঁহার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকে শুধু নামে মাত্র।

একবিংশ অধ্যায়
আরবিভাষী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ

১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মিসরে নেপোলিয়নের অভিযানকে সাধারণত আরবিভাষী বিশ্বে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাইতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কিছুসংখ্যক মুসলিম নেতৃবৃন্দের চক্ষু উন্মোচন করিতে ইহা এক অদ্ভুত উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই অঞ্চলের সঙ্গে ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন উভয়েই কিছুটা পরিচিত ছিল। ক্রুসেডের সময় হইতে লেবাননের শন ও সিল্ক উভয়বিধ ব্যবসার জন্য এবং রোমান ক্যাথলিক ও ফরাসিদের প্রতি সমবেদনশীল মেরোনাইটদের জন্য ফ্রান্স লেবাননের প্রতি আগ্রহশীল ছিল। মেরোনাইট খ্রিস্টান ও দ্রুজেসদের সদাসংঘটিত যুদ্ধে ফ্রান্স সর্বদাই মেরোনাইটদের সহায়তায় আগাইয়া আসে। মধ্যপ্রাচ্যে ভূম্যধিকারী এবং ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশগণ দ্রুজেসদের পক্ষ অবলম্বন করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পারস্য উপসাগরে অনুপ্রবেশ করে এবং বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক ও আলেপ্পোতে ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বৃটিশ কোম্পানির গভর্নর ওয়ারেন সুয়েজে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল স্থলপথে ভূমধ্যসাগরে মালপত্র প্রেরণ করিবার জন্য ইহাকে একটি কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের জন্য বৃটিশ মিসরের মামলুক শাসকদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের উত্থানের দ্বারা আরও জটিল আকার ধারণ করে। নেপোলিয়নের বিরাট পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের প্রধান যুদ্ধস্থল ইউরোপে রাখিয়া বৃটেনকে সকল দিক হইতে হয়রানি করা। ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ ছিল নিশ্চয়ই নাজুকতম। সম্ভবত একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন অথবা মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্নও তাঁহার ছিল। তিনি যে তাঁহার দলের সঙ্গে অনেক বেসামরিক লোককেও লইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণ করে যে স্বদেশে এবং বিশাল পৃথিবীতে যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার অভিযান মিসরে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সম্যক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালনা করেন এবং আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকদিগকেও সঙ্গে রাখেন। মিসরে নেপোলিয়ন মামলুকদের হাত হইতে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য ত্রাণকর্তার মূর্তি ধারণ করেন। তিনি নিজেকে ইসলাম ও ওসমানীয় সুলতানের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু মিসরের মালিক ছিল ওসমানীয়গণ এবং মহামান্য দরবার নেপোলিয়নের অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন নাই। বৃটিশও কালবিলম্ব না করিয়া ইহা দেখাইয়া দেয় এবং সুলতান একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বৃটিশদের সহায়তায় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে।

মুহাম্মদ আলীর উত্থান

নেপোলিয়ন বৃটিশদিগকে নাজেহাল করিতে যেমন ব্যর্থ হন ঠিক তেমনি তাঁহার নিজস্ব খ্যাতি বৃদ্ধি করিতেও ব্যর্থ হন। তাঁহার সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করিবার অনেক পূর্বে তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপোলিয়নের অভিযানের সময় দুইটি আনুষঙ্গিক ঘটনা না ঘটিলে প্রত্যেক কিছু হয়ত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়া যাইত। এইগুলির একটি হইল, নেপোলিয়নের সঙ্গী পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক প্রসিদ্ধ রসেতা পাথর (Rosetta stone) আবিষ্কার যাহা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার দ্বার উন্মোচনে মূল্যবান চাবিকাঠি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। নেপোলিয়নের বিদ্বানবর্গ মিসরের প্রাকৃতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলের সঠিক তথ্যের এক মহাসম্পদও প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় অনুষঙ্গ হইল একটি দুর্ঘটনা, যাহার জন্য নেপোলিয়ন দায়ি ছিলেন না। ঘটনাটি হইল মিসরে সুলতান কর্তৃক প্রেরিত অভিযাত্রী বাহিনীতে মুহাম্মদ আলী নামে একজন যুবককে প্রেরণ করা হয়, যিনি মিসরের ইতিহাসকে পরিবর্তন করিয়া দেন। নেপোলিয়নের অভিযান ইউরোপের ক্ষমতা সপ্রমাণ করে, কিন্তু মুহাম্মদ আলী ছিলেন গুটিকতকের মধ্যে একজন যিনি এই ক্ষমতার উৎস অনুধাবন করেন এবং পাশ্চাত্য হইতে সেইগুলি ধার করিয়া মিসরকে আধুনিক বিশ্বে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন।

মুহাম্মদ আলী ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবত তিনি পারস্য ও তুর্কি বংশোদ্ভুত ছিলেন। তিনি কি একজন তামাক বিক্রেতা ছিলেন অথবা একজন তামাক ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। সঠিক যাহা বলা যায় তাহা হইল এই যে, ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি আলবেনিয়ান সেনাদলের সহিত মিসরে গমন করেন তখনও তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর মুহাম্মদ আলীই সেই শূন্যতা পূরণ করেন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি মিসরের পাশা নিযুক্ত হন। তখন হইতে বৎসর অতিক্রমের সাথে সাথে মুহাম্মদ আলীর ভাগ্যতারকা উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অনতিকাল পরেই বৃটিশগণ সন্দেহ করে যে ফ্রান্সের হাত হইতে তাহারা মিসরকে রক্ষা করিয়াছে শুধুমাত্র ইহাকে মুহাম্মদ আলীর হাতে ন্যস্ত করিবার জন্য। অপরদিকে ফরাসিগণ অনুভব করে যে নিজেরা যাহা করিতে পারে নাই তাহা সম্ভবত মুহাম্মদ আলীই করিতে সক্ষম, তাই তাহারা তাঁহাকে সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করিতে আরম্ভ করে।

তবে মুহাম্মদ আলী ফরাসিদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যান নাই। তিনি ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র, কারিগরিবিদ্যা ও শিক্ষার আধিপত্য উপলব্ধি করিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফরাসিদিগকে অনুরোধ করেন। ফরাসি নৌ ও সামরিক বিশেষজ্ঞদিগকে মিসরে আনয়ন করত সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তিনি একটি নূতন সামরিক ও নৌবাহিনী গঠন করেন। ফরাসি ধারার স্কুল খুলিয়া তিনি ফরাসি পুস্তকাবলী আরবিতে অনুবাদও করেন। তিনি কৃষি বিশেষজ্ঞদিগকে আনয়ন করেন এবং ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুলা, নীল ও তিলের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া তোলেন। তিনি জাহাজ ও পোতাশ্রয়ও নির্মাণ করেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এইসব কিছু তিনি ইসলামের গৌরব বা মিসরীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য করেন নাই। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার নিজের জন্য এবং তাঁহার বংশধরদের জন্য।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে আরবে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া ওয়াহাবিদের[১] ধর্মীয় রাজনৈতিক

১. *নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৬১।*

বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত সুলতানের আদেশও তিনি পালন করেন। কয়েক বৎসর পর ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার জন্য গ্রীকগণ বিদ্রোহ করিলে সুলতান পুনরায় মুহাম্মদ আলীর সাহায্য চাহিয়া পাঠান। মুহাম্মদ আলীর পুত্র ইব্রাহীম ১০,০০০ সৈন্য লইয়া তথায় গমন করেন এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করিয়া ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে নাভারিনোয় মিসরীয় নৌবহরকে ধ্বংস না করিলে তিনি এই অভিযানে সফলতাই লাভ করিতেন।[২]

এইসব কিছু চলাকালে বৃটিশ মুহাম্মদ আলীর সম্ভাব্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজেদিগকে শক্তিশালী করিতে ব্যস্ত থাকে। আরব উপদ্বীপে তাহারা বাব-আল-মান্দেব ও এডেন অধিকার করে। পারস্য উপসাগরের মস্কট ও বাগদাদে তাহারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। সিরিয়ায় তাহারা সুলতানের হাত দৃঢ় করে এবং খোদ মিসরে মুহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে মামলুকদের ক্ষমতার পুনরুত্থান করিতে চেষ্টা করে। বৃটিশদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করা এবং নিজেকে মামলুকদের হাত হইতে রক্ষা করা এই উভয় উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আলী এক নাগাড়ে কয়েকটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে মামলুকদের দুইজন প্রভাবশালী নেতাকে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। মাত্র একজন নেতা বাকি থাকে। মুহাম্মদ আলী তাঁহাকে এবং মামলুকদের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এক ভোজসভায় দুর্গে আমন্ত্রণ করেন। তথায় ভোজের পর তিনি তাহাদের সবাইকে হত্যা করান। এইভাবে মামলুকদের ক্ষমতা লোপ পায় ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় আসে এবং একই উপায়ে ধ্বংস হইয়া যায়।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ আলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সিরিয়া আক্রমণ করিয়া মূল ক্ষমতা দখল করিবার জন্য তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সময় সমুপস্থিত। তিনি দাবি করেন যে গ্রীক বিদ্রোহে মহামান্য দরবারের সাহায্যে যাইবার পুরস্কার হিসাবে সুলতান তাঁহাকে সিরিয়ার পাশা পদ প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পুনরায় তিনি তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমের নেতৃত্বে যথেষ্ট সাজসরঞ্জামপূর্ণ একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তেমন কোনো বাধাবিপত্তি ছাড়াই মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া অধিকার করে এবং ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাহারা এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হইয়া ওসমানীয় সেনাবাহিনীকে কোনিয়ায় পরাজিত করে। ওসমানীয় সুলতান মাহমুদ এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে তিনি রাশিয়ার সাহায্য চাহিয়া পাঠান। প্রভাব বিস্তার করিবার এই সুবর্ণ সুযোগের আশায় রাশিয়ার জার সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুলে সৈন্য প্রেরণ করেন। ফরাসিগণ, যাহারা সর্বদাই মুহাম্মদ আলীকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন, এই কার্যে শঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শিষ্যকে শত্রুভাবাপন্ন সুলতানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করে। মুহাম্মদ আলী তাহাদের কথামত কাজ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবং তৎপরিবর্তে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউন্ডের বিনিময়ে তাঁহাকে বাৎসরিক ভিত্তিতে মিসর, সিরিয়া ও ক্রীটের পাশা পদ প্রদান করা হয়। তবে রুশগণ ইস্তাম্বুল ত্যাগের প্রাক্কালে হুনকিয়ার ইস্কেলেসির চুক্তি সম্পাদন করে যদ্বারা অভ্যন্তরীণ অবস্থা মোতাবেক তাহারা তুরস্কে সৈন্য প্রেরণের অধিকার লাভ করে।

এইভাবে মিসর এবং সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্টকে ইউরোপীয় ক্ষমতার রাজনীতির আবর্তে টানিয়া আনা হয়। সিরিয়ায় মিসরীয়গণ তাহাদের ভারতবর্ষের পথে হুমকি সৃষ্টি করিলে বৃটিশগণ বিচলিত হয়। মুহাম্মদ আলীর সাহায্যদাতা ফরাসিগণ ঘটনার বৈপরীত্বে

---

২. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩৬, ২৩৭।*

শঙ্কিত হয় এবং বৃটিশদের ন্যায় হুনকিয়ার ইস্কেলেসির চুক্তির ফলাফলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। সুলতান তাঁহার ভৃত্যের হাতে পরাজয় বরণ করিতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আলী এইভাবে তাঁহার ঘৃণার পাত্র দ্বিতীয় মাহমুদকে ধ্বংস করিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আট বৎসর ধরিয়া ইব্রাহীম যোগ্যতা ও প্রগতিশীল উপায়ে সিরিয়া শাসন করেন। বহু শতাব্দীকালের মধ্যে এই প্রথম মুসলমান, খ্রিস্টান, দ্রুজেস ও ইহুদিগণ একত্রে শান্তিতে বসবার করে। ইব্রাহীম যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হন এবং সিরিয়াবাসীদের উপর অতি ঘৃণিত বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীর চাকুরি চালু করেন। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে।

এইরূপ বিশ্বজনীন অসন্তোষে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় নাই। জার্মান জেনারেল ফন মল্টকের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুলতানের সেনাবাহিনী ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং নাজি বে ইব্রাহীমের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। এই যুদ্ধের কিছুদিন পর সুলতান মারা যান এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই আলেকজান্দ্রিয়ায় ওসমানীয় নৌবাহিনী মিসরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। নূতন সুলতান মুহাম্মদ আলীর দাবি মানিয়া লইতে রাজি হন। পুনরায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বৃটেন রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়াকে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি চুক্তিতে রাজি করাইতে সচেষ্ট হয়, যদ্বারা মুহাম্মদ আলীকে মিসরের বংশানুক্রমিক পাশা পদ এবং আজীবন দক্ষিণ সিরিয়ার আধিপত্য দান করা হয়। মুহাম্মদ আলী এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বৃটিশ সেনাবাহিনী সিরিয়ায় অবতরণ করে। তাহাদের বন্ধু দ্রুজেসদের সহায়তায় বৃটিশ বৈরুত অধিকার করে এবং ইব্রাহীমকে পরাজিত করে। ফ্রান্স একটি কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করে, কারণ তাহারা বৃটেনের ন্যায় রুশ অভিপ্রায়ে শঙ্কিত ছিল এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। মুহাম্মদ আলী পরাজিত হন এবং মিসরের বংশানুক্রমিক পাশা পদ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রণালীর প্রতিনিধি সভা (Straits Convention) হুনকিয়ার ইস্কেলেসির চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় যদ্বারা সমস্ত জাতির যুদ্ধ জাহাজের জন্য প্রণালী বন্ধ করা হয়। এইভাবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ওসমানের বংশকে উৎখাত করিবার প্রথম প্রধান প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ইহা সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া রাখিয়া যায়। ইহা মিসরকে তাহার ভয়ানক হতবুদ্ধিতা হইতে উদ্ধার করে, ইহা মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টকে সরাসরি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পথে টানিয়া আনে এবং সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল, ইহা আরবিভাষী বিশ্বকে ইউরোপীয় কারিগরিবিদ্যার ক্ষমতার স্বাদ প্রদান করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স, রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার খপ্পরের বিরুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। সময় সময় তাহারা অসন্তোষ সহকারে বলকানস্থ সুলতানের প্রজা জাতিসমূহের প্রতি নজর দেয়, যাহারা স্বাধীনতা দাবি করে। তবে উপরোল্লিখিত নীতিসমূহ এই দুই জাতিকে ফারটাইল ক্রিসেন্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভঙ্গ করিতে বাধা দান করে নাই।

সিরিয়া-লেবানন

বহুদিন পর্যন্ত ধর্মীয় শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল সিরিয়া লেবাননের ইতিহাসের অংশবিশেষ। শুধু মুসলমান, খ্রিস্টান ও দ্রুজেসগণই একে অপরের বিরুদ্ধে বিবদমান ছিল না, বরং ইসলাম

ও খ্রিস্টান উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশাখার মধ্যেও বিবাদ ছিল। ইব্রাহীম তাঁহার মিসরীয় সৈন্যগণ লইয়া যখন এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন লেবানন তখন দ্বিতীয় বশীর (১৭৮৮-১৮৪০ খ্রিঃ) কর্তৃক শাসিত সিরিয়ার পাশার একটি অংশ ছিল। তিনি শিহাবের বংশের একজন উত্তরাধিকারী, যাহারা ১৬৯৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে গোলযোগের সময় এই বংশ তিনটি ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এই কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম পরিবর্তন করিতেন। দ্বিতীয় বশীরের নামকরণ হয় একজন খ্রিস্টান হিসাবে কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন একজন মুসলমান। মিসরীয়দের এই এলাকা দখলের সময় তিনি ছিলেন একজন দ্রুজে। তিনি ইব্রাহীমের সহিত সহযোগিতা করেন যদিও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছুসংখ্যক নিম্নমানের শেখ সুলতানের প্রতি অনুগত থাকেন। ইব্রাহীমের উৎসাহে বশীর পাশ্চাত্যের জন্য লেবাননের দ্বার উন্মুক্ত করেন। ফরাসি ব্যবসায়ী ও বৃটিশ জাহাজসমূহ ছাড়াও ফরাসি ও আমেরিকান মিশনারিগণও এই অঞ্চলে আগমন করেন।

ইব্রাহীমের পরাজয়ের সহিত বশীরের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁহাকে মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। এতদঞ্চলে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোটের উপর মেরোনাইট খ্রিস্টানগণ ফরাসিদের পক্ষাবলম্বন করে। আর অর্থোডক্সগণ রুশদের, দ্রুজেসগণ বৃটিশদের এবং মুসলমানগণ সুলতানের পক্ষাবলম্বন করে। ফারটাইল ক্রিসেন্টে সুলতান অথবা রুশদের যেহেতু তেমন কোনো ক্ষমতা ছিল না তাই ইহার প্রধান নায়ক ছিল ফরাসি ও বৃটিশগণ যাহারা তাহাদের শিষ্য যথাক্রমে মেরোনাইট ও দ্রুজেসদের মধ্যে কাজ করে।

কিছুকালের জন্য মহামান্য দরবার পাঁচটি ইউরোপীয় শক্তির ছত্রছায়ায় এই অঞ্চল শাসন করিবার জন্য শাসনকর্তা প্রেরণ করে। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে শক্তিবর্গ একটি যৌথ আধিপত্য সৃষ্টি করে, যথা উত্তরে মেরোনাইটগণ এবং দক্ষিণে দ্রুজেসগণ। দ্রুজেসগণ প্রায় ১৪,০০০ মেরোনাইটিকে হত্যা করিলে এই দুই দলের মধ্যে সংঘটিত ছোট ছোট যুদ্ধ ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে এক প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। মেরোনাইটদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ফরাসিগণ একটি অভিযান প্রেরণ করে, কিন্তু সৈন্যগণ পৌঁছিবার পূর্বেই ওসমানীয়গণ সেই এলাকায় শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। রাশিয়ার সহায়তায় ফরাসিগণ লেবাননকে একটি আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে চায়। মহামান্য দরবারের সহায়তায় বৃটিশগণ এই প্রচেষ্টায় বাধা দান করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস নাগাদ ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এবং দরবার ইস্তাবুলে 'রেলমেন্ট অর্গানিক' (Reglment Organique) স্বাক্ষর করিতে সক্ষম হয়। ইহা অনুসারে দরবারের মনোনীত একজন খ্রিস্টান শাসনকর্তার অধীনে লেবাননকে স্বায়ত্তশাসিত ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

মিসর

ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যায় সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কার্যাবলী মিসরে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মুহাম্মদ আলীই ছিলেন মিসরের আসল কর্তা এবং ইস্তাম্বুলের কোনো হস্তক্ষেপই সেখানে ছিল না। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু নাগাদ মুহাম্মদ আলী প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করেন এবং মিসরের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। রাজস্ব আদায়, পানি সেচের কর্তৃত্ব ও গণনিরাপত্তার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের একটি কাঠামো তৈয়ার করেন।

মামলুকদের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করা সমস্ত জমি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহার অংশবিশেষ তিনি তাঁহার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবকে দান করেন। অবশিষ্ট জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এইগুলি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়া হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এইসব জমি মালিকদের নামে রেজিস্ট্রি করা হয় এবং ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে, জমি পরিবারের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং এইভাবে একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। তুলা, তামাক ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যে তিনি রাষ্ট্রের একচেটিয়া নীতি স্থাপন করেন। সরকার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে এবং অতি উচ্চ লাভে বিক্রয় করে। তাহার শাসনের প্রায় ৪০ বৎসরে মিসরের চাষোপযোগী এলাকা ৩,২০০,০০০ একর হইতে ৪,১৫০,০০০ একরে উন্নীত হয়, রাজস্ব ১,২০৩,৫০০ পাউন্ড হইতে ৪,২০০,০০০ পাউণ্ডে উন্নীত হয় এবং রপ্তানি ২০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পায়।

তিনি কারখানাও নির্মাণ করেন, কিন্তু এইগুলি সাধারণত ব্যর্থ হয়। কারণ মিসরে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর, জ্বালানি অথবা খুচরা যন্ত্রাংশ ছিল না। অর্থনৈতিক দণ্ড ছিল দোলায়মান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুহাম্মদ আলীর লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণের ফলে এইসব কারখানা চালু থাকে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ওসমানীয় বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে মুহাম্মদ আলীর শিল্প সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। এই চুক্তির ফলে একচেটিয়া কারবার ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বৃটিশগণ সরাসরি জনসাধারণ হইতে ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করে। এই চুক্তি মিসরে কার্যকরী করা হয় এবং ইহা দেশকে শিল্পোন্নত করিতে বাধা দান করে। মুহাম্মদ আলীর সংস্কারসমূহ জীবনধারণের মান এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু এইগুলি উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভ।

মিসরের দুর্ভাগ্য, মুহাম্মদ আলীর উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন অধিকাংশই অযোগ্য ও অমিতব্যয়ী। তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী আব্বাস ছিলেন একজন ধর্মান্ধ, যিনি মুহাম্মদ আলী কর্তৃক আনীত ফরাসি উপদেষ্টাদিগকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ছয় বৎসরের কুশাসন অনুল্লেখযোগ্য এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার হত্যার পর পেটুক সাঈদ ক্ষমতায় আসেন।

সুয়েজ খাল

সাঈদের অনেক ইউরোপীয় বন্ধু ছিলেন। ইহাদের ভিতর ছিলেন মিসরের ফরাসি রাজনৈতিক প্রতিনিধির পুত্র সুদক্ষ ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্স। তিনি সুয়েজ খাল পুনরায় চালু করিবার বিষয় চিন্তা করেন, যাহার অংশবিশেষ ফেরাউনগণ খনন করিয়াছিলেন। সাঈদের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডি লেসেপ্স কায়রোতে আগমন করেন এবং খাল খনন করিবার একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। অধিকাংশ বিশ্ব যখন এই খবরে তেমন মনোযোগ প্রদান করে নাই, তখন ফ্রান্সে এক ক্ষুদ্র অংশ অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠে। অনুরূপ এক ক্ষুদ্র অংশ গ্রেট বৃটেনে দিশেহারা হইয়া উঠে এবং এই কাজে বাধাপ্রদান করিবার জন্য ইহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে। এই অনুমতিপত্রে মহামান্য দরবারের সম্মতি প্রয়োজন হয়। সেসময় বিদ্যমান ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃটেনের মত এক বন্ধুর বিরাগভাজন হওয়া দরবারের উপায় ছিল না। এমন নহে যে ইংল্যাণ্ড মিসরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কামনা করিত না। বস্তুত মিসর অন্য যে কোনো দেশের তুলনায় বৃটেনের সঙ্গেই অধিক ব্যবসা করিত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ বাণিজ্যের

শতকরা ৪১ ভাগ ছিল মিসরের আমদানি এবং ৪৯ ভাগ ছিল মিসরের রপ্তানি। তবে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ভাবধারায় প্রভাবিত ছিল। ইহা সত্য যে এই খাল লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের দূরত্ব বেশ সংক্ষিপ্ত করে কিন্তু অনুরূপভাবে ইহা ভারতবর্ষে বৃটিশের আধিপত্য খর্ব করিতে অন্যান্য শক্তিকে সহায়তা করে এবং মিসর ও পারস্য উপসাগরের এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করিতে সুযোগ দান করে।

কিন্তু ডি লেসেপ্স্ ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন ও ইটালি হইতে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ইউনিভার্সেল সুয়েজ মেরিটাইম ক্যানাল কোম্পানি (Campagnin Universelle du Canal Moritime de Suez) গঠন করেন। সমাপ্ত করিবার তারিখ হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য কোম্পানিকে অনুমতিপত্র দান করিবার ফলে সাঈদ পছন্দনীয় শেয়ার লাভ করেন, যদ্বারা তাঁহাকে মূল লাভের শতকরা ১৫ ভাগ দেওয়া হয়। খাল খনন করিবার জন্য তিনি পাঁচ ভাগের চারি ভাগ শ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাহারা কোম্পানিকে সহায়তা দান করিতে পারেন তাঁহারা শেয়ার লাভ করেন, যাহা লাভের শতকরা ১০ ভাগ দাঁড়ায়। এ ছাড়াও প্রতি শেয়ারে ৫০০ ফ্রাংকের ৪০০,০০০ শেয়ার ছিল সাধারণ স্টকে। সুলতানের অনুমতি ছাড়াই ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে খনন কার্য আরম্ভ হয়, যদিও ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সাঈদের মৃত্যুর সময় খননের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

সাঈদের দেশভ্রমণ, জনহিতকর কার্যাবলী এবং উচ্চ জীবিকার ফলে ৩০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ হয়। এই কর্জ সাঈদের অমিতব্যয়ী উত্তরাধিকারী ইসমাইলকে তেমন বিচলিত করে নাই, কারণ মিসরের তখন সমৃদ্ধির যুগ। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ফলে মিসরীয় তুলার চাহিদা বেশ বাড়িয়া যায় এবং তুলা হইতে প্রাপ্ত ইসমাইলের রাজস্ব স্বাভাবিক হইতে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। ইসমাইল অনুমতিপত্র অনুমোদন করেন এবং চুক্তিবদ্ধ বাধ্যতামূলক শ্রমিক সরবরাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দান করেন। খাল খনন কার্য চলা অবস্থায় ইসমাইল তাঁহার ইমারত নির্মাণকার্যের উন্মাদনার প্রতি মনোযোগ দেন। কায়রোর বিশাল আবেদীন প্রাসাদসহ বিভিন্ন প্রাসাদসমূহ তিনি নির্মাণ করেন। তিনি সরকারি ভবনাদি নির্মাণ করেন, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেন, রেলপথ সম্প্রসারণ করেন এবং এমন ব্যয়বহুল কারখানাসমূহ নির্মাণ করেন যাহা চালু করা সম্ভব হয় নাই। তিনি ইউরোপের রাজধানীসমূহ ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় আতিথেয়তা এবং ব্যয়বহুল উপঢৌকনাদি প্রদানে তিনি অমিতব্যয়িতার পরিচয় দেন। দরবারে দেয় বাৎসরিক কর তিনি প্রায় দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেন এবং বিনিময়ে তাঁহার শাখায় উত্তরাধিকারের আইন প্রতিষ্ঠাসহ খেদিভ উপাধি লাভ করেন।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননকার্য যখন শেষ হয় ইসমাইল আতিথেয়তায় ঊর্ধ্ব সংখ্যা ১,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ করেন। খাল দৈর্ঘ্যে হয় ৯৩.৫ মাইল, ৯৬ হইতে ১১০ গজ হয় প্রস্থে এবং গভীরতায় হয় ৩৫ ফুট। ভূমধ্যসাগরের সাঈদ বন্দর হইতে ইহা আরম্ভ হয় এবং লোহিত সাগরে সুয়েজ পর্যন্ত শেষ হয়। ইহা খননে ১২ বৎসর সময় ব্যয় হয়। হাজার হাজার অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের প্রিন্সেস ইউজীন, অস্ট্রিয়ার সম্রাট জোসেফ এবং প্রুসিয়ার যুবরাজ। তাঁহার নির্মিত নাট্যভবনে প্রাচীন মিসরীয় ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত কাহিনী ভারদীয় আইদা (Verdi's Aida) প্রথমবারের মত ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চস্থ করা হয়।

বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরাট খরচ যোগ না করিয়াও এই খাল খনন করিতে মিসরের খরচ

পড়ে ১১,৫০০,০০০ ফ্রাংক। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে কোম্পানি কোনো মুনাফা অর্জন করিতে পারে নাই। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলের ভাড়ার একটি তালিকা প্রস্তুত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এই খাল সমস্ত দেশের জাহাজের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল কনভেনশন প্রস্তুত করা হয় এবং ইহাতে অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, বৃটেন, ইটালি, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, স্পেন ও তুরস্ক স্বাক্ষর করে। ইহাতে বলা হয় যে, খাল "সর্বদা শান্তির সময়ের অনুরূপ যুদ্ধের সময়েও যে কোন পতাকাবাহী প্রত্যেক বাণিজ্য অথবা যুদ্ধ জাহাজের জন্য অবাধ ও খোলা থাকিবে।"গ্রেট বৃটেন প্রথম মহাযুদ্ধে তাহার শত্রুদেরকে অবাধ প্রবেশে বাধা দান করিবার মাধ্যমে এই চুক্তি ভঙ্গ করে। অনুরূপভাবে ইতোপূর্বে সে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের খাল-চুক্তি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ভঙ্গ করিয়াছিল। যাহা হউক, কোম্পানির বাণিজ্যিক তৎপরতা অক্ষুণ্ন থাকে এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা পর্যন্ত তাহা সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল। খালের কৌশলগত স্থান এবং ইহার নিয়ন্ত্রণ অথবা আয়ত্তাধীন রাখিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়– যাহার ফলে মিসর ইউরোপীয় শক্তিসমূহের প্রভাবে পতিত হয়।

ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ এবং বৃটিশ আধিপত্য

ইসমাইল অমিতব্যয়িতার গভীর পঙ্কে পতিত হন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পর তুলার মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে ইউরোপের অবিবেচক ব্যাংক মালিকদের নিকট হইতে দুর্বহ শর্তে তিনি বিরাট অর্থ ঋণ করেন। শর্তের মধ্যে ছিল বাটা, উদার কমিশন এবং প্রবল সুদের হার। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ প্রায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের কোঠায় পৌছে। শুধু সুদের বোঝা দাঁড়ায় বাৎসরিক মোট ৫১,০০০,০০০ পাউণ্ডে। মাথাপিছু সরকারি ঋণ আসে ১৪ পাউণ্ড; তৎসঙ্গে পরিচর্যা খরচ দাঁড়ায় ১ পাঃ ১৫ সিঃ ১০ ডি, যাহা ছিল সম্ভবত পৃথিবীর সর্বোচ্চ খরচ। নির্বিকার ইসমাইল তাঁহার নূতন নূতন পরিকল্পনার ব্যয় বাবদ ফালাহীনদের[১] কর বাড়াইয়া দেন। এই উৎসও নিঃশেষ হইয়া গেলে তিনি তাঁহার খালের স্টকের সমস্ত সাধারণ শেয়ার বৃটেনের নিকট ৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। ইহার ফলে প্রাক্তন শত্রুভাবাপন্ন ইংল্যাণ্ডকে এই খালে রাজনৈতিক স্বার্থের ন্যায় অর্থনৈতিক স্বার্থও প্রদান করিতে হয়।

খেদিভের ঋণগ্রস্ততার তুলনায় এই অর্থ ছিল অতি তুচ্ছ অংক। ঋণ দাতাগণ শংকিত হইয়া তাহাদের দাবির জন্য চাপ দিতে থাকে। বিসমার্কের প্ররোচনায়, যাহার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সও যোগ দেয়, সুলতান ইসমাইলকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে তাঁহার কোমল স্বভাবের পুত্র তৌফিককে বসাইতে সম্মত হন। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে স্বীয় জাহাজে ইসমাইলের প্রস্থানের ঘটনা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তাহার প্রপৌত্র ফারুকের একই বন্দর দিয়া বহিষ্কারের সূচনা করে। খেদিভের এই পরিবর্তনের ফলে মিসরের বন্ধকী হইতে উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ইউরোপের ব্যাংক মালিকেরা খালের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। দুইজন কন্ট্রোলারের দ্বারা তাহারা কাজ করে–যদ্বারা দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয়। ফরাসি মসিয়ে দ্যঁ ব্লিনিয়ার্স (Mousieur de Bligners) মিসরের ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ মেজর ইভ্‌লীন বেয়ারিং কর আদায়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

---

১. *মিসরের সাধারণ মানুষদিগকে ফালাহীন বলা হয়।-অনুবাদক।*

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণকারিগণ যাঁহারা মিসরের সত্যিকারের শাসকে পরিণত হন, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ঋণ পরিশোধের আইন (A Law of Liquidation) পাস করেন। এই আইন দেশের ঋণ ৯৮,৩৭৭,০০০ পাউণ্ড এবং শতকরা ৪ ভাগ সুদ নির্ধারণ করে। সরকারের বাৎসরিক আয় হইতে বাজেটের প্রয়োজনীয় একটি অংক পৃথক করিয়া রাখা হয়, অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অংক ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা হয়। উন্নয়নের জন্য আর কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। জনগণ যত কঠোর পরিশ্রমই করুক না কেন, তাহাদের আয়, জীবনধারণের অংশ বা তাহার চেয়েও কম বাদ দিয়া, বাকি অংশ ঋণ পরিশোধ করিতে খরচ হয়।

প্রথম মিসরীয় বিদ্রোহ

ব্যয় সংকোচনের নামে সামরিক অফিসারসহ এক বিরাট সংখ্যক চাকুরিজীবীকে হয় বরখাস্ত করা হয় অথবা অবসরগ্রহণ করানো হয়। কিন্তু তৎসঙ্গে বিদেশীগণ বেশ উচ্চহারে বেতন গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সংকোচনের দ্বারা তুর্কি বা কারকাশিয়ান উচ্চপদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। বিরাট কর-বোঝা, সরকারি কর্মচারিদের অযোগ্যতা, বিদেশীদের উপস্থিতি, যাহারা তুর্কিদের সহিত হৃদ্যত্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয় - এই সবকিছু মিসরীয়দের মধ্যে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে। বহু শতাব্দীর পর এই প্রথম সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারবৃন্দ, যাহাদের সবাই ছিলেন মিসরীয়, প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তাঁহাদের নেতা, আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র এবং একজন ফাল্লাহের পুত্র কর্ণেল আরাবি প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এই প্রতিবাদ একটি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মামুলী ধারণা ছাড়া সুসংগঠিতও ছিল না, সুচিন্তিতও ছিল না। ইহার বিভিন্ন স্তরে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ, সিভিল সার্ভেন্টস ও সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত মিসরীয়। দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তৌফিক অফিসারদের দাবি স্বীকার করেন। কিছু দুর্ভাগ্যজনক বাড়াবাড়ির ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং কিছুসংখ্যক ইউরোপীয় ও মিসরীয় নিহত হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ ইহাকে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করে। মহামান্য দরবার নিরপেক্ষতার ভূমিকা পালন করে এবং ফ্রান্স সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দাবি করিলেও শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকে। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে গ্রেট বৃটেনকে একাকী কার্যক্ষেত্রে রাখা হয় এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে হস্তক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, গ্রেট বৃটেন ঐরূপ সুযোগের অপেক্ষাতেই দিন গুনিতেছিল। তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স, ইহার সরকারের পরিবর্তনের ফলে এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানির মতলবের ভয়েও নিরপেক্ষ হিসাবে সরিয়া যায় এবং আশা করে যে গ্রেট বৃটেনও একই পন্থা অবলম্বন করিবে এবং পরে তাহারা আরাবির সঙ্গে একটি পরামর্শে আসিতে চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে গ্রেট বৃটেনকে মিসরে ভীত-সন্ত্রস্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের একমাত্র উদ্ধারকারীর ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা বৃটেনকে মিসরে অবিসম্বাদিত শাসক বানাইয়া দেয়।

যাহাই হউক, ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুলাই বৃটিশরা আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা বর্ষণ করে। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোর উত্তরে তেল আল-কবীর নামক স্থানে বৃটিশ সেনাবাহিনী আরাবির বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মিসরের পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করে। আরাবিকে সিংহলে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় সংগঠনের অভাবে। কিন্তু

ভিতরে ভিতরে এই আন্দোলন আরো শক্তভাবে দানা বাধে এবং গতিশীলতা লাভ করে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে আরেক দল জুনিয়ার অফিসার জামাল আবদুল নাসের নামক জনৈক কর্ণেলের নেতৃত্বে সর্বশেষ অমিসরীয় শাসককে বলপূর্বক বাহির করিয়া দেয় এবং দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে।

মিসরে সৈন্য প্রেরণের সময় বৃটিশ ওয়াদা করে যে, "খেদিভের ক্ষমতা বহাল করিবার জন্য দেশের অবস্থা ও সত্যিকারের সংগঠন যখনই স্বাভাবিক হইবে তখনই" ফিরিয়া যাইবে। বৃটিশ সৈন্যগণ যে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের মাটিতে অবস্থান করে তাহার সম্ভবত যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকিতে পারে। তবে মিসরীয়দের এবং অধিকাংশ এশিয়াবাসীদের ধারণা এই যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসার আরেক চালাকি মাত্র।

বৃটিশদের অধীনে মিসর

১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত (কিছুসংখ্যক মিসরীয় ঐতিহাসিকের মতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) স্থায়ী সরাসরি ও পরোক্ষ বৃটিশ শাসন ছিল এই দেশের জন্য একটি মিশ্র আশীর্বাদ। মিসরীয়গণ ওসমানীয় ও বৃটিশ উভয়ের অধীনে ছিল, কিন্তু ওসমানীয়গণ ছিল বৃটিশদের অধীনে। এই দ্বৈত সাম্রাজ্যবাদে বৃটিশগণ নিশ্চয়ই ওসমানীয়দের চেয়ে অধিক যোগ্য ছিল। ভারতবর্ষের রাস্তার নিরাপত্তার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এবং ঘটনাচক্রে উত্তম জনসংযোগের জন্যও তাহারা একটি প্রতিযোগিতামূলক মিসর সৃষ্টি করিতে আগ্রহী হয়।

দ্বৈত শাসনের ভণিতা ত্যাগ করা হয় এবং মিসরের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বৃটিশ অতি সুযোগ্য ও বিচক্ষণ সাবেক মেজর ইভ্‌লীন বেয়ারিং লর্ড ক্রোমারকে উপ-প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করে। ওসমানীয় সুলতান ছিলেন নামেমাত্র শাসক এবং তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন খেদিভ, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা ছিল লর্ড ক্রোমারের হাতে। তিনি ৩০ সদস্য বিশিষ্ট ১৬ জন নির্বাচিত ও ১৪ জন নিযুক্ত একটি 'আইন' পরিষদের মাধ্যমে শাসন করেন। এই পরিষদ ছিল বাস্তবে পরামর্শদাতার মতো। প্রত্যেক মিসরীয় মন্ত্রীর জন্য ছিলেন একজন বৃটিশ উপদেষ্টা এবং প্রত্যেক গভর্নরের জন্য একজন বৃটিশ পরিদর্শক।

ক্রোমার বাধ্যতামূলক শ্রম বিলুপ্ত করেন, ফালাহীনের স্বপক্ষে কর প্রথার পুনর্বিন্যাস করেন, জাতীয় ঋণ সংকোচিত করেন এবং পানি সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য বিধান ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যাবলীর উন্নয়ন করেন। এইসব সংস্কার প্রশাসনিক আদেশে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল এবং ক্রোমার এইগুলিকে সুশৃঙ্খল ও যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করেন। তবে যেসব সংস্কার সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা কার্যকরী করিতে হয়, যথা-জমি ভোগদখলের শর্ত, ওয়াকফ, শিক্ষা এবং এই ধরনের কার্যাবলীতে তিনি নিজেকে জড়িত করেন নাই। ক্রোমারের অধীনে মিসর অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বনির্ভরশীল হইয়া উঠে এবং একটি ভারসাম্যমূলক বাজেটের অধিকারী হয়। মাথাপিছু আয় এবং তৎসঙ্গে জীবনের মান উন্নীত হয়। তদুপরি শান্তি ও শৃঙ্খলার দরুন মিসরের কৃষিকাজ ও বৈদেশিক ব্যবসার প্রসার সাধিত হয়। শতাব্দীর শেষের দিকে তুলার দাম বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসায় শর্তাবলী মিসরের অনুকূলে যায়। অপরদিকে বৃটিশ এক ফসলের কৃষিনীতির উপর নির্ভর করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে উপেক্ষা করে। খনিবিষয়ক কাজে উৎসাহ প্রদান করিলেও তাহারা সংগোপনে শিল্পায়নের বিরোধিতা করে। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মিসরের শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা ৩৫,০০০ ছাড়াইয়া যায় নাই।

ইউরোপের সহিত মিসরের সান্নিধ্যের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ধারা সহযোগীর ন্যায় বিরোধী, সামাজিক পরিবর্তনে বিবর্তনবাদীদের ন্যায় বিপ্লবপন্থী সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। সহজেই বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার যে কোন বহিঃপ্রকাশকে দাম্ভিক লর্ড ক্রোমার ক্রমশ বিরক্তির চোখে দেখেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার এলডন গর্স্ট এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কিচেনার মোটামুটি একই ভাবধারা পোষণ করেন, কিন্তু ইহারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য। লর্ড ক্রোমার অতি অল্প সংখ্যক বৃটিশ অফিসার রাখেন, কিন্তু গর্স্ট ও কিচেনারের সময় ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে যোগ্যতা হ্রাস পায়। গ্রেট বৃটেনের পক্ষে মিসরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নিরাপত্তাই বিপন্ন ছিল না, তৎসঙ্গে সুয়েজ খাল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগও বিপন্ন হইত। অতএব বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মিসরের ইতিহাস হইল মিসরীয়দের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের আগ্রহ বনাম বৃটিশদের সুযোগ প্রদানে অনীহার কাহিনী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়
ইরানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ

আধিপত্যের জন্য আরবিভাষী বিশ্বের ন্যায় ইরানেও ইঙ্গ-ফরাসি সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং প্রায় একই কারণে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফ্রান্স ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে চায় এবং ইংল্যাণ্ড সেই উপমহাদেশে যাইবার পথ নির্বিঘ্ন রাখিতে উৎসুক। তবে ইরানে রাশিয়ার স্বার্থ ফ্রান্সের চাইতে আরও মৌলিক। উষ্ণ-জলের বন্দরে ইহার চিরাচরিত প্রয়োজনের দোহাই দিয়া ইহা কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার কথা রাশিয়া গভীরভাবে চিন্তা করে কিনা তাহা পুরাপুরিভাবে জানা যায় নাই। এইরূপ একটি পরিকল্পনা থাকিলে তাহা সে পারস্য উপসাগর অথবা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া বাস্তবায়িত করিতে পারিত। ফলে বৃটিশ রাজকীয় নীতির মূলকথা দাঁড়ায় রাশিয়াকে ইরান গ্রাস করিবার পথে বাধা প্রদান করা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরগুলিতে আফগানিস্তান ইরানের অংশবিশেষ ছিল। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইরানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আগ্রহ প্রায় বিলীন হইয়া যায় এবং ইরানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস সেই দেশে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীতে পরিণত হয়।

১৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে নাদির শাহের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হইলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরের জান্দ বংশের সময় (১৭৫০-১৭৯৪) ইরান তবুও পশ্চিম এশিয়ায় গণ্য করিবার মত শক্তি হিসাবে বিরাজমান ছিল এবং ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা বন্ধুত্ব কামনা করিবার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন শিল্পবিপ্লব, সাম্রাজ্য বিস্তার, মতবাদের পরিবর্তন এবং বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতিতে ব্যস্ত, ইরান তখনও তাহার প্রতিবেশী ওমসানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় এমন সব নৃপতিদের দ্বারা শাসিত হয় যাঁহারা প্রায় সম্পর্ণভাবে এইসব অগ্রগতির ব্যাপারে নির্লিপ্ত। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আগত কাজার বংশ মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র ইতিহাসে সম্ভবত একমাত্র বংশ যাহার প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যান্য বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতর প্রাপ্ত সাধারণ উৎসাহ ও পৌরুষত্ব ছিল না। ১৭৯৪ হইতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী কাজার বংশের প্রায় প্রত্যেক শাহ ছিলেন অযোগ্য, কল্পনাশূন্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং স্বার্থপর। তাঁহারা শুধু ইউরোপের উন্নতির প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারেই অজ্ঞ ছিলেন না বরং তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় দেশের পুরাতন ঐতিহ্য মোতাবেক কাজও করিতেন না, চলাফেরাও করিতেন না। ফলে তাঁহারা উভয়ের রুশ শক্তি এবং দক্ষিণের ইংল্যাণ্ডের চাপের মাঝখানে পতিত হন।

উত্তর ইরানের মাজান্দারানের তুর্কি কাজার গোত্রের বংশধর আগা মুহাম্মদ ছিলেন একজন নিষ্ঠুর ও সাহসী যুবক। তাঁহার মানসিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণ বোধ হয় এই যে পাঁচ বৎসর হইতে তিনি শিবির জীবনে সংস্থাপিত হন। শিরাজ নগরীতে করিম খান জান্দের দরবারে তিনি জামানত হিসাবে অবস্থান করেন এবং কোমল স্বভাব শাসক হইতে তিনি সদয় ব্যবহার লাভ করেন। করিম খানের মৃত্যুর পর আগা মুহাম্মদ মাজান্দারানে পলায়ন করেন এবং কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহের পর ক্ষমতার এক দুর্বোধ্য লড়াইয়ের

মাধ্যমে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সিংহাসন লাভ করেন ও তেহরানকে তাঁহার রাজধানী হিসাবে গড়িয়া তোলেন। তিনি দেশকে একত্রীভূত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ক্যাথারিনের আদেশে ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে রুশ সেনাবাহিনী ককেশাস আক্রমণ করে। কিন্তু সেই বৎসরেই সম্রাজ্ঞী মারা যান এবং জার পল, যাহার নীতি ছিল তাঁহার মাতার নীতির বিরোধিতা করা, এই অভিযান বন্ধ করিয়া দেন। এক বৎসর পর আগা মুহাম্মদ তাঁহার নিজস্ব ভৃত্যগণ কর্তৃক নিহত হন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফতেহ্ আলী শাহ্ (১৭৯৭-১৮৩৪) তাঁহার চাচার অধিকাংশ খারাপ স্বভাবগুলির অধিকারী হন। তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ ছিল তাঁহার অস্বাভাবিক লম্বা দাঁড়ি এবং প্রায় ২০০০ শাহজাদা ও শাহজাদীর পিতৃত্ব। প্রায় সূচনা হইতেই তাঁহাকে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, যাহার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতবর্ষ অভিমুখী আফগানিস্তানের রাস্তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উৎসুক বৃটিশ আশা করে যে শাহ সেই অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করিবেন। অপরদিকে জার পল ও নেপোলিয়ন গ্রেট বৃটেনকে অপদস্থ করিবার জন্য শাহের সঙ্গে একটি চুক্তি করিতে চান।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তেহরানে প্রেরিত অনেকগুলি প্রতিনিধিদলের প্রথম দলে ইংল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন মেলকমকে প্রেরণ করে। ফ্রান্সের সহিত চুক্তি না করিবার জন্য তিনি শাহকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন। তিনি একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদন করেন যদ্বারা বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে করমুক্ত করা হয় এবং বিনা শুল্কের বৃটিশ থানকাপড়, লোহা, ইস্পাত ও সীসা আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে ফ্রান্স ও রাশিয়া তাহাদের যুগধর্মী বিবাদে লিপ্ত হয় এবং ফলে নেপোলিয়ন ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন, তবে শর্ত হইল ইরান ইংল্যাণ্ডের সহিত তাহার পূর্বচুক্তি বাতিল করিবে। এই প্রস্তাবে শাহ সম্মত হন এবং বিভিন্ন সলাপরামর্শের দ্বারা ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে ফিংকেস্টাইনের সন্ধি (Treaty of Finkenstein) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসরণে নেপোলিয়ন জেনারেল গর্ড্যানের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল পারস্য সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান করা এবং কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারির কারখানা নির্মাণ করা। তবে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন ও জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মধ্যে তিলসিটে অনুষ্ঠিত বন্ধুত্বের চুক্তির ফলে এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৃটিশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে স্যার হ্যারফোর্ড জোনসের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধিদল ইরানের সহিত ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে পারস্য সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান করা এবং শাহকে ১২০,০০০ পাউণ্ড অর্থ সাহায্যের একটি ধারাও সন্নিবেশিত হয়। ইহার পরপরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রতিনিধিত্ব করিয়া মেলকমের নেতৃত্বে ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে এক বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ দল প্রেরণ করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তখন বৃটিশ সরকার ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে এবং কখনও কখনও দল দুইটি পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যেও কাজ করে। শাহ অথবা তাঁহার কোনো উপদেষ্টা এই সুবিধা অথবা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন না।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের পর হইতে রুশগণ ইরানের ক্ষতির বিনিময়ে ককেশাসে রাজ্য বিস্তারের অভিযান পরিচালনা করে। রাশিয়া ওসমানীয়গণ বা যে কোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই এই অভিযান শিথিল হইয়া যায়। পারস্য সেনাবাহিনী তখন ছিল শাহজাদা আব্বাস মীর্জার অধিনায়কত্বে, যাহাকে কাজার বংশের অত্যন্ত যোগ্য লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কখনও ফরাসিদের দ্বারা কখনও বৃটিশদের দ্বারা। সমস্ত বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় সৈন্য পরিচালনায় সমঝোতা ছিল না এবং সৈন্যগণও ছিল বিমূঢ়। যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ ও শ্লথ সময়ের প্রধান যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে আসলান্দাজে। গ্রেট বৃটেন নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে যেহেতু রাশিয়ার সঙ্গে একটি সমঝোতায় উপনীত হইয়াছে তাই পারস্য সেনাবাহিনীতে কার্যরত অধিকাংশ বৃটিশ অফিসারদিগকে তাহারা ফেরত লয়। ইহার দ্বারা পারস্য সৈন্যদের মধ্যে কতটুকু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে রুশগণ এক বিরাট বিজয় লাভ করে। বৃটিশ তাহাদের সহিত সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার করে এবং পারস্যবাসিগণ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর গুলিস্তানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে ইরান ককেশাসে পাঁচটি নগর হারায় এবং জর্জিয়া ও দাঘেস্তানের উপর তাহার দাবি প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে রাশিয়া সিংহাসনে আব্বাস মীর্জার দাবি সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রাশিয়ার সমর্থন গ্রহণ করিয়া শাহজাদা রাশিয়াকে ইরানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আহ্বান জানান। পাছে পিছনে পড়িয়া যায় তাই গ্রেট বৃটেনও ইহার সমর্থনে রাশিয়ার সহিত হাত মিলায়। ইহার পর সর্বশেষ শাহজাদা ব্যতীত প্রত্যেক কাজার শাহজাদা সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় রুশ ও বৃটিশমন্ত্রী সমভিব্যাহারে রাজধানী গমন করেন। নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইবার ফলে রাশিয়া ককেশাসে তাহার নূতন এলাকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হয়। ইহা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে পারস্যবাসিগণ তাহাদের পরাজয়কে চূড়ান্ত জ্ঞান করে নাই এবং তাহাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরায় লাভ করিবার ইচ্ছা তাহারা সর্বদা পোষণ করে।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত গ্রেট বৃটেন তখন ইরানে ইহার অবস্থিতি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গোর অস্‌লে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ইরানের সহিত একটি 'চূড়ান্ত চুক্তি' সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ইরান গ্রেট বৃটেনের সহিত যুদ্ধরত যে কোনো ইউরোপীয় শক্তির সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিন্ন করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে, গ্রেট বৃটেনের সহিত শত্রুভাবাপন্ন যে কোন সেনাবাহিনীকে ইরানে প্রবেশে বাধা দান করিতে এবং খারিজম, তাতারিস্তান, রোখারা ও সমরখন্দের খানদিগকে (যাহরা শাহকে কর প্রদান করে) ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসরমান যে কোন আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে বাধাদানে সম্মত করাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অপরদিকে গ্রেট বৃটেন রাশিয়ার সহিত ইরানের সীমান্ত মীমাংসায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে, কোনো ইউরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইরানের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘটিত কোনো সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ না করিতে, এবং ইরানকে বার্ষিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে।

১৮১৫ হইতে ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে এই যুগে ফতেহ্ আলী শাহ অভ্যন্তরীণ শত্রুদের সহিত তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিতে ব্যস্ত হন। অতএব আফগানিস্তানকে করদানে বাধ্য করিতে এবং ১৮২১-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। এই

শেষোক্তটি হইল ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দের কলড্রনের যুদ্ধের পর দুই জাতির মধ্যে সূচিত দীর্ঘ ও নিষ্ফল অভিযানের শেষ অভিযান। ওসমানীয়গণ যেহেতু তখন গ্রীক বিদ্রোহ লইয়া ব্যস্ত তাই রুশগণ তুর্কিদিগকে আক্রমণ করিয়া রুশদের হাতে বিপর্যস্ত সম্মান পুনরায় লাভ করিবার জন্য আব্বাস মীর্জাকে প্ররোচনা দান করেন। অতীতের অনেক যুদ্ধের ন্যায় এবারের পারস্য-তুর্কি যুদ্ধও ছিল অসমাপ্ত এবং আর্জেরুমের সন্ধির মাধ্যমে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এই সন্ধির দ্বারা কোনো এলাকার পরিবর্তন হয় নাই।

এরিভান অঞ্চলে গোচ্‌কা অধিকার করিবার সময় রাশিয়া ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে ইরানের বিরুদ্ধে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমে পারস্য বাহিনী বেশ সফলতা লাভ করে এবং ককেশাসে অনেক হৃতনগর পুনর্দখল করে। তবে ফতেহ্ আলী শাহ্, যাহার ধনলিপ্সা তাঁহার লম্বা দাঁড়ির ন্যায়ই প্রসিদ্ধ, স্বর্ণমুদ্রা প্রতিরক্ষায় ব্যয় না করিয়া তাঁহার কোষাগারে জমা করেন। গোলাগুলির ভাণ্ডার ছিল শূন্য এবং বেতনের অভাবে সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ছাঁটাই করা হয়। বৃটিশদের ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী ইরানের সাহায্যে আগাইয়া আসিবার কথা থাকিলেও তাহারা ইরান আক্রমণকারী এই অজুহাতে আগাইয়া আসিতে অস্বীকার করে। প্রকৃত ব্যাপার হইল ইংল্যাণ্ড তখন রাশিয়ার সহিত সবেমাত্র একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। ফলে পারস্য বাহিনী, কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করা সত্ত্বেও এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ব্যর্থ হয় এবং পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তাব্রিজের ন্যায় প্রধান নগরও অধিকার করা হয়। পারস্যবাসিগণ শান্তি প্রস্তাব করিতে বাধ্য হয়, এবং ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কমাঞ্চাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করে।

ইরানের পরাজয় ছিল চূড়ান্ত। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে ইরান তাহার সমগ্র অঞ্চল হারায়। সীমান্ত চিহ্নিত হয় আরাস নদী, আটচল্লিশ সমান্তরাল রেখা বরাবর, দক্ষিণে লাংকারান পর্যন্ত এবং পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের আস্তানার পর্যন্ত। তদুপরি রুশ আমদানিকৃত দ্রব্যের উর শুল্ক নির্ধারণ করা হয় শতকরা ৫ ভাগ এবং ইরান রাষ্ট্র বহির্ভূত নীতি (Extraterritoriality) গ্রহণ করিতে এবং ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দান করিতে স্বীকৃত হয়। তুর্কমাঞ্চাইয়ের সন্ধি এক নূতন যুগের সূচনা করে। কারণ ঐ তারিখের পর হইতে ইরান সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে নাই। এই ব্যাপারটি বৃটিশ অনুধাবন না করিয়া পারে নাই, কারণ সে ইরানকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। নিঃস্ব শাহজাদাকে ১৫০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিবার পর বৃটিশ ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে চূড়ান্ত চুক্তির কিয়দংশ বাদ দিতে সক্ষম হয়, যে অংশে গ্রেট বৃটেন অঙ্গীকার করিয়াছিল যে কোনো ইউরোপীয় দ্বারা ইরান আক্রান্ত হইলে সে ইরানকে সাহায্য প্রদান করিবে।

শাহজাদা আব্বাস মীর্জা ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান এবং তাঁহার পিতা ফতেহ্ আলী শাহ্ তাঁহার এক বৎসর পর ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। নূতন উত্তরাধিকারী ছিলেন আব্বাস মীর্জার পুত্র মুহাম্মদ। কিন্তু সিংহাসনের অন্যান্য আরও দাবিদারও ছিলেন। যুবক মুহাম্মদ শাহ্ এক সেনাবাহিনী লইয়া তেহরান অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন বৃটিশ জেনারেল স্যার হেনরী লিন্ডসে বেথুন। রুশ ও বৃটিশ উভয় মন্ত্রীবর্গ তাহার সঙ্গে গমন করেন। অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নিরস্ত করিবার পক্ষে ইহাই ছিল যথেষ্ট। তবে এমন অনেক বোকাও ছিলেন যাহারা এই ব্যাপারে আরও কিছুকাল চেষ্টা করেন।

যুবক শাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রুশ মন্ত্রীর আগমন গ্রেট বৃটেনের জন্যও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার। অতঃপর বৃটিশ আশংকা করে যে ফরাসিগণ হয়তো ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। ফ্রান্সকে কাবু করিবার পর এই ভীতি রাশিয়ার দিকে যায়। রুশগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল কিনা তাহা একটি অনুমানের ব্যাপার, তবে সুযোগমত তাহারা ক্যাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমের ন্যায় পূর্বের ভূখণ্ডও অধিকার করিতে চেষ্টা করে। এইসব অঞ্চল যেহেতু ভারতবর্ষের দিকে, তাই স্বভাবতই বৃটিশগণ ভয় করে পাছে রুশগণ সেইদিকে অগ্রসর হইতেও আগ্রহান্বিত হয়। অতএব আফগানিস্তান এবং ইহার দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এলাকা গ্রেট বৃটেনের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে।

আফগানিস্তান এবং কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলের উপর আধিপত্য ঘোষণাকারী পারস্যবাসিগণ পশ্চিমে তাহাদের হৃত এলাকা পোষাইয়া লইবার জন্য এতদঞ্চলে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তবে বৃটিশগণ এই পরিকল্পনায় সায় দেয় নাই, কারণ রুশ অগ্রগতি বাধা দান করিবার পক্ষে তাহারা পারস্যবাসীদিগকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে নাই। তদুপরি বৃটিশগণ যথার্থভাবে বিশ্বাস করে যে কাজার শাহগণ রুশদের প্রতি সংবেদনশীল এবং ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের ব্যাপারে তাহারা হয়তো একটি চুক্তিও করিয়া ফেলিতে পারে। ফলে ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তুর্কমাঞ্চাইয়ের চুক্তির তারিখ হইতে প্রায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের প্রধান ইতিহাস হইল উত্তর-পূর্ব দিক হইতে রাশিয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে গ্রেট বৃটেনের মন্থর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতির কাহিনী। অধিকাংশ ইরান যে কবলিত হয় নাই তাহা ইরানের ক্ষমতার জন্য নহে বরং এইজন্য যে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন কেহই একে অন্যকে এই দেশ গ্রাস করিতে দেয় নাই।

মুহাম্মদ শাহ তাঁহার ১৩ বৎসর রাজত্বের অধিকাংশ সময় আফগানিস্তানে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিতে ব্যয় করেন। বৃটেন এইবার পুনরায় ইরানের সহিত স্বাক্ষরিত তাহার ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের চূড়ান্ত চুক্তি ভঙ্গ করে গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিয়া। মুহাম্মদ শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। কাজার নৃপতিগণ, যাহাদের নিজস্ব কোনো যোগ্যতা ছিল না, তাহারা কোনো যোগ্য প্রধান উজীরকেও বেশিদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। মুহাম্মদ শাহ অতি সুযোগ্য আবুল কাসেম কায়েম মাকামের মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন এবং তদস্থলে তাঁহার গৃহশিক্ষক হাজী মীর্জা আঘাসীকে নিযুক্ত করেন, যাঁহার কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং একগুয়েমী দেশকে আরও ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়ে দেয়। মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের একটি হইল বাবী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবের আগমন। পরের একটি অধ্যায়ে এই ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র নাসের আল-দ্বীনকে শাহ করিবার জন্য বৃটিশ ও রুশ উভয় মন্ত্রিবর্গ তাব্রিজ হইতে তেহরানে লইয়া যান। কাজারদের রীতি ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে আজারবাইজানের গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত করা, যাহার রাজধানী ছিল তাব্রিজ। নাসের আল-দ্বীন ছিলেন কাজার শাহদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তাঁহার ৫০ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি তেমন কোনো গঠনমূলক ঐতিহ্য রাখিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় প্রধান উজীর মীর্জা তর্কিখান আমীর কবিরের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা না দিলে হয়তো এই কাহিনী ভিন্নরূপ ধারণ করিত। এই উজীর ছিলেন নিঃসন্দেহে ইরানের একজন সুযোগ্য ব্যক্তি, যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে এই সুউচ্চ পদে সমাসীন হন।

১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় নাসের আল-দ্বীন ছিলেন ১৬ বৎসর

বয়স্ক। আফগানিস্তানে ইরান ও গ্রেট বৃটেনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক কসরতের পর ইরান হেরাত নগর অধিকার করে। একই বৎসর গ্রেট বৃটেন কর্তৃক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পক্ষে এই কাজ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা হয়। একটি বৃটিশ সেনাবাহিনী হেরাত অভিমুখে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অন্যান্য বৃটিশ বাহিনী পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত বুশাইয়ার দখল করিবার পর মোহাম্মারেহ নগর (পরবর্তীকালে ইহাকে খোররাম শহর বলা হয়) অধিকার করে। এই নগরটি করুন ও শাত-ইল-আরবের নদীসমূহের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পরে একটি বৃটিশ নৌবাহিনী করুন নদীতে যাইয়া আহ্‌বাজ অধিকার করে। দৃশ্যত পারস্যবাসীদের কোনো বাধা ছাড়াই এইসব কাজ সমাধা করা হয় এবং বাধা যাহাও দেওয়া হয় তাহাও ছিল বিশৃঙ্খল।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইরান আফগানিস্তান ত্যাগ করত ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয়। ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের সঙ্গে যে কোনো বিবাদে বৃটেনের মধ্যস্থতা মানিয়া লইতেও ইরান রাজি হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং সেই বিদ্রোহ দমন করিতে বৃটিশ তাহাদের সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করে। এই বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং ইহার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পথ পরিষ্কার রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা সহজ করা হয় আফগানিস্তানের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের দ্বারা। হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্বতশ্রেণীর নিরাপত্তা ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে যাইতে বৃটিশদের কোনো প্রয়োজন ছিল না। ইহার ফলে মধ্য এশিয়া এবং কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব অঞ্চলে রুশগণ নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিবার সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ এবং প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর ফলে রাজ্য বিস্তারের অভিযান চালাইবার মত অবস্থা রাশিয়ার ছিল না। অধিকন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ক্রীতদাসের মুক্তি এবং অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সংস্কার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইউরোপে ইটালি ও জার্মানির একত্রীকরণের যুদ্ধের ফলে আলেকজাণ্ডার পুনরায় তুরস্ক এবং বিশেষত কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন, কারণ একত্রীকরণ যুদ্ধের ফলে দেশে কিছু স্থিতিশীলতা আসে। সেই অভিযানের বর্ণনা এত দুরূহ যে তাহা এইখানে ব্যক্ত করা যায় না। তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে রুশ সৈন্যগণ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বোখারা, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে খিভা এবং ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে খোকন্দ অধিকার করে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মার্ভ অধিকারের পর রাশিয়া কাস্পিয়ানের সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হয়। ইরান আটক নদীকে নূতন সীমান্ত হিসাবে মানিয়া লয় এবং এইভাবে সে নদীর উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকা রাশিয়ার নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক ইরানকে গ্রাস করা এখন সম্পূর্ণ। আটক নদী ও আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত রুশ অগ্রগতিতে গ্রেট বৃটেন যেরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই, অনুরূপভাবে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র পারস্য এলাকা অধিকার করিবার ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনকে রাশিয়া কোনোরূপ বাধা প্রদান করে নাই। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রেট বৃটেন সামরিক অভিযানের পরিবর্তে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে। ১৮৭০ হইতে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বেলুচিস্তানের কিছু ছোটখাট বিদ্রোহ এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে কিছু সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। এইগুলির প্রত্যেকটিতে গ্রেট বৃটেন

মধ্যস্থতাকারী হিসাবে আগাইয়া আসে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে মাকরান সীমান্ত কমিশন (Makran Boundary Commission), ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সিস্তান মধ্যস্থতা কমিশন (Sistan Arbitration Commission) এবং ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পারস্য-বেলুচিস্তান সীমান্ত কমিশন (Perso-Baluchistan Boundary Commission) গঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় সিস্তান কমিশন নাগাদ ইরানের বিনিময়ে বৃটিশ-ভারতের সীমান্ত বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম ইরানের ন্যায় আজারবাইজানও দুইভাগে বিভক্ত হয়- রুশ ও পারস্য; দক্ষিণ পূর্বেও অনুরূপ বেলুচিস্তান দুইভাগে বিভক্ত হয় - বৃটিশ ও পারস্য।

ইরানের ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহার ভূখণ্ড দখলের পর্ব শেষ হয়। কোনো দেশই অপর পক্ষকে অতঃপর আর কোনো অঞ্চল দখল করিতে দেয় নাই তবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার অনেক পূর্বেই এই দ্বন্দ্ব ইহার দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পর্বে প্রবেশ করে এবং প্রায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে ইরান প্রকাশ্যভাবেই একটি মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে বিরাজ করে এবং রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে মাত্র, জনগণের কল্যাণের কোনো দায়-দায়িত্ব তাহাদের ছিল না।

ভারতীয় বিদ্রোহকে ইরানের এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তাৎক্ষণিক কারণ বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সংঘর্ষ চলকালীন সময়ে এবং পরেও যখন বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষের পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন তখন দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। টেলিগ্রাফের সাহায্যে লণ্ডনের সহিত দিল্লীর যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইরানের প্রয়োজন হয়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে স্থলপথের টেলিগ্রাফ নিয়মপত্র (Overland Telegraph Convention) স্বাক্ষরিত হয়- যদ্দারা ওসমানীয়দের রাজধানীকে বাগদাদের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই লাইনকে কারমানশাহ, হামাদান, তেহরান ও বুশাইরের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য বৃটিশ শাহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করিবার জন্য ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানি গঠিত হয় এবং তেহরানকে তাব্রিজ ও ওডেসার সহিত সংযুক্ত করা হয়। এইসব লাইনের দ্বারা ইরান যে বেশ লাভবান হয় ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা শুধু প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সাহায্য করে নাই, বরং ইহা ইরানের বিচ্ছিন্নতা দূর করে এবং ইরানকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাবধারার সান্নিধ্যে আনয়ন করিতে সহায়তা করে। তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রথম অনুমতিপত্র আরও অনেক অনুমতি পত্রের দ্বার উন্মুক্ত করে- শুধু বৃটিশদের জন্য নহে বরং রুশদের জন্যও। রুশগণ সর্বদা বৃটিশদের সমানাধিকার দাবি করে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে দেওয়া টেলিগ্রাফের অনুমতিপত্র ছিল ৪৮ বৎসরে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া উভয়কে দেওয়া অনেকগুলি অনুমতিপত্রের প্রথম। এইসব অনুমতিপত্র এবং ঋণ ক্রমশ দেশের উৎপাদিত শক্তিকে বিদেশী কর্তৃত্বের অধীনে ন্যস্ত করে এবং এক সুদূরপ্রসারী অনুমতিতে পর্যবসিত করে– যেগুলি ছিল তৈল সংক্রান্ত- যেগুলি বৃটিশদিগকে দেওয়া হয় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এবং রুশদিগকে দেওয়া হয় ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্যারন জুলিয়াস দি রয়টার নামে একজন দেশজাত বৃটিশ প্রজা নাসির আল-দ্বীন শাহের নিকট হইতে ৭০ বৎসর মেয়াদী রেলপথ নির্মাণ, খনিজ সম্পদ আহরণ,

একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, পানির কল নির্মাণ, নদীপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির এক বিরাট একক অনুমতিপত্র লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি সমস্ত শুল্কের আয় এবং দেশের অধিকাংশ সম্পদের মালিক হন। পরবর্তী বৎসর শাহ প্রথমবারের মত ইউরোপ সফরে গিয়া দেখিলেন যে রুশগণ এই অনুমতিপত্রের বিরোধী। এই কারণে তিনি ইহা নাকচ করিতে বাধ্য হন।

পারস্য সেনাবাহিনী প্রথমে ফরাসিদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় বৃটিশদের দ্বারা, পুনরায় আবারও ফরাসিদের দ্বারা, তারপর ইটালিয়দের এবং পরে অস্ট্রিয়ানদের দ্বারা। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাহাদের প্রশিক্ষণের ভার পড়ে রুশদের হাতে। রুশগণ একটি কোশাক ব্রিগেড প্রস্তুত করে। ইহা রুশ অফিসারগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ইহাদের পোশাক হয় রুশদের কোশাক সৈন্যদের ন্যায়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে ইহাই একমাত্র সুসংগঠিত বাহিনী হিসাবে অবস্থান করে।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নিম্ন করুন নদীকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করিবার জন্য বৃটিশ একটি অনুমতিপত্র লাভ করে। পর বৎসর পূর্ববর্তী অনুমতিপত্র নাকচ করিবার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে শাহ ব্যারন দি রয়টারকে একটি নূতন অনুমতিপত্র দান করেন। ইহার দ্বারা তিনি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব পার্শিয়া নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে ব্যাংক নোট চালু করিবার অনুমতিও লাভ করেন। ইহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রাশিয়াকেও একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয় (Banque D' Escompte de Persi)। ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে মুদ্রিত কাগজের টাকা শুধু বিলে উল্লেখিত শহরগুলিতে আদান-প্রদান করা হয়। এক নগর হইতে আরেক নগরে গমনেচ্ছু পর্যটকদিগকে নির্দিষ্ট নগরে সেই টাকা বিনিময়ের জন্য একটি কশিমন প্রদান করিতে হইত, যেন তাহারা ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতেছে।

অনুমতিপত্রসমূহের মধ্যে মারাত্মক ছিল ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের তামাক সংবিধান, যদ্দারা বৃটিশকে ইরানের সমস্ত তামাকের উৎপাদন, বিক্রয় ও রফতানির একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। বিনিময়ে শাহ বাৎসরিক ১৫,০০০ পাউণ্ড এবং লাভের এক-চতুর্থাংশ লাভ করিতেন। অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানি, শেয়ার বিক্রয়ের প্রচারপত্র অনুসারে, বাৎসরিক ৫০০,০০০ পাউণ্ড মুনাফার আশা করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয় সাম্রাজ্যও ফরাসিদিগকে প্রায় অনুরূপ কিন্তু সীমিত একটি অনুমতিপত্র প্রদান করে এবং বিনিময়ে সরাসরি বাৎসরিক ৬৩০,০০০ পাউণ্ড লাভ করে। পারস্য অনুমতিপত্র ছিল ব্যাপক এবং ৫০ বৎসরের জন্য কার্যকর; পক্ষান্তরে তুর্কি অনুমতিপত্র ছিল শুধু অভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য এবং ৩০ বৎসরের জন্য দায়ী। ফরাসি অনুমতিপত্র যেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের অগোচরে থাকে, সেখানে ইরানের অনুমতিতে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ বিরোধের সৃষ্টি করে। যে দেশের এক বিরাট সংখ্যাগুরু নারী-পুরুষ ধূমপান করে সেখানে এই ধরনের বিরোধ ধামাচাপা দেওয়া যায় না। যে তামাক তাহারা উৎপন্ন করে সেই তামাক কেন বৃটিশদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয় তাহা জনসাধারণের বোধগম্য হয় না। ইরানে সমস্ত প্রকার পাশ্চাত্য ও অমুসলিম অনুপ্রবেশের বিরোধী উলামাগণ জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে এবং সরকারকে এই অনুমতিপত্র নাকচ করিতে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহ অনুমতিপত্রের বিরোধিগণকে গ্রেফতার করেন। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিতর্ক চলিতে থাকে। অতঃপর শ্রদ্ধেয় শীয়া মুজতাহিদ, হাজী মীর্জা হাসান শিরাজি তাঁহার আবাসস্থল ইরাকের সামাররা হইতে এক ফতোয়া জারি করেন। সেই ফতোয়ার দ্বারা

অনুমতিপত্র নাকচ করা পর্যন্ত পারস্য মুসলমানদের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়। এই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য এত প্রখর ছিল যে শাহ শেষ পর্যন্ত সেই অনুমতিপত্র নাকচ করিতে বাধ্য হন।

তবে এই নাকচে ইরানের ৫০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে খরচ হয়। এই অর্থ নূতন প্রতিষ্ঠিত ইম্পেরিয়াল ব্যাংক হইতে ৬ শতাংশ সুদের বিনিময়ে ঋণ লইয়া কোম্পানিকে প্রদান করা হয়। সুদ প্রদানের জন্য পারস্য উপসাগরের শুল্ক বিসর্জন দিতে হয় এবং মূল ঋণ ৪০ বৎসর পর প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ইহাই ছিল ইরানের প্রথম বৈদেশিক ঋণ। ইহার পর আরও অনেক ঋণ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ সম্পদ বৃটিশ-রুশ মহাজনদের হাতে চলিয়া যায়।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নাসের আল-দ্বীন শাহ মুসলিম চান্দ্র সন অনুযায়ী শাহানশাহ হিসাবে এক বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের পহেলা মে, শুক্রবার, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে শাহ তেহরানের দশ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শাহ্ আবদুল আজিমের মাজার জেয়ারত করিতে যান। সেখানে কেরমানের জনৈক মীর্জা রেজার গুলিতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই আততায়ী ছিল কুখ্যাত সৈয়দ জামাল আল-দ্বীন আফগানীর শিষ্য।[১] আফগানী ছিলেন একজন প্যান-ইসলামী নেতা, যাঁহাকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে শাহ ইরান হইতে বহিষ্কার করেন। তিনি দ্বিতীয় সুলতান আবদুল হামিদের আশ্রয়ে বাস করেন। সুলতানের এক সম্মিলিত ইসলামী বিশ্বের খলিফা হইবার বাসনা কাহারও অবিদিত নহে। ইরানে প্যান-ইসলামী আন্দোলন তেমন কোনো জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না, এবং এই হত্যা তামাক আন্দোলনের সহিত জড়িত বলিয়া মনে হয় না। শাহ যে নিহত হইবেন তাহা আফগানী একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই অনুরাগী শিষ্য, শাহের সহিত যাহার ব্যক্তিগত শত্রুতাও ছিল সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে।

এইভাবে ইরানের শেষ স্বেচ্ছাচারী শাহের জীবনাবসান হয়। নিকৃষ্ট শাহ্দের বংশে তিনিই ছিলেন সম্ভবত সুযোগ্য শাহ্। তিনি তিনবার ইউরোপ সফর করেন ১৮৭৩, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। এইসব সফরের দ্বারা দেশের কোনো উপকার হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন দেখিলেও তিনি সেইগুলিকে ইরানের জন্য উপকারী মনে করেন নাই। কারণ সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবধারাকে তিনি তাঁহার দেশে কঠোরভাবে দমন করেন। কিন্তু তিনি ইউরোপের বেলে নর্তকীদের ছোট ঘাগড়া পছন্দ করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের মহিলাদিগকে সেইগুলি পরিধান করিতে উপদেশ দেন। লম্বা এবং কখনও আটসাঁট পাজামার উপর বেলে নাচের ঘাগড়া পরিধান করা ইরানের মহিলাদের একটি ফ্যাসানে পরিণত হয়। শাহ তাঁহার ইউরোপ সফরের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ বৃত্তান্তও রাখিয়া যান।

মনোনীত উত্তরাধিকারী মুজাফফর আল-দ্বীন তখন তাব্রিজে ছিলেন। বৃটিশ ও রুশ মন্ত্রীবর্গ সমভিব্যাহারে তিনি তেহরানে আসেন এবং শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি তখন ৪৩ বৎসর বয়স্ক এবং কিছুটা রোগা; চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ইউরোপ গমন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাই শাহ হইবার পর তিনি ইউরোপ সফর করিতে ব্যাকুল হইয়া

১. *সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী কখনও কুখ্যাত ছিলেন না। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁহাকে নব জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়-অনুবাদক।*

পড়েন। কিন্তু ট্রেজারিতে কোনো টাকা ছিল না এবং বেলজিয়ান শুল্ক উপদেষ্টাগণ শীঘ্র টাকা প্রদান করিতে সক্ষম ছিলেন না। বেলজিয়ান শুল্ক উপদেষ্টাদের কর্মকর্তা এম নাউসকে প্রাক্তন শাহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তবে রুশ ব্যাংক, একমাত্র পারস্য উপসাগর ব্যতীত সমস্ত দেশের শুল্ক আদায়ের বিনিময়ে পাঁচ শতাংশ সুদের হারে শাহকে ২,৪০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দান করে। রাশিয়াকে একমাত্র মহাজন বানাইবার জন্য শর্ত দেওয়া হয় যে, উক্ত অর্থ হইতে ৫০০,০০০ পাউণ্ড ইম্পেরিয়াল (বৃটিশ) ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা হইবে- তামাকের গোলমালে এই অর্থ ঋণ হয়। এই ঋণ, মুনাফা ও কমিশন আদায় করিবার পরও যথেষ্ট টাকা হাতে থাকে এবং সেই টাকায় ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শাহ ইউরোপ গমন করেন।

দুই বৎসর পর শাহ পুনরায় রাশিয়ার নিকট হইতে ৪ শতাংশ সুদের হারে দশ লক্ষ পাউন্ডের এক ঋণের বন্দোবস্ত করেন। এই ঋণের সহিত রুশ-পারস্য সীমান্তের জুলফা হইতে তাব্রিজ, কাজভিন ও তেহরান পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের অনুমতিপত্রও দেওয়া হয়। এই ঋণের সঙ্গে শুল্ক আইন পুনর্বিবেচনার একটি শর্তও জুড়িয়া দেওয়া হয়। বেলজিয়ান অফিসার এম নাউসকে সাধারণত ইরানের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণাদি তাহা সমর্থন করে না। তাঁহার পরিবর্তিত শুল্ক নীতি ইরানের জন্য অধিক অর্থাগমের বন্দোবস্ত করে, কিন্তু ইহা গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও সন্তুষ্ট করে।

এই অনুৎপাদিত ঋণের প্রকাণ্ড বোঝা, দুর্নীতিপরায়ণ রুশভাবাপন্ন পারস্য কর্মকর্তাদের সহিত সমতুল্য দুর্নীতিপরায়ণ ইংরেজ ভাবাপন্ন কর্মকর্তাদের বিবাদ, জনসাধারণের সহিত প্রধান উজিরের (সদর-এ আজম) দুর্ব্যবহার এবং সাধারণ গণজাগরণের (পরের একটি অধ্যায়ে ইহা আলোচনা করা হইবে) ফলে একটি 'বিচার সভার' দাবি উত্থিত হয়। সাধারণ মানুষ যাহা বুঝে এবং দাবি করে তাহা হইল 'বিচার'। তবে শিক্ষিত উলামাগণ ইহার দ্বারা মুসলিম শরিয়তের প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপীয় শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় ইহার দ্বারা বুঝায় একটি 'শাসনতন্ত্র'। সে যাহাই হউক, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ৫ই আগস্ট শাহ অতি সহজেই একটি রাজকীয় ফরমানের দ্বারা এই দাবি মঞ্জুর করেন। এই ঘোষণা শাহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় ও একটি 'মজলিশ' গঠন করিবার আদেশ প্রদান করে এবং শাসনকার্যের জন্য একটি বিধি ব্যবস্থা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করে।

ইহাই ছিল সেই বৎসর শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার ভিত্তি। সাধারণত শাসনতন্ত্র খসড়ার পূর্বে বিদ্রোহাদি সংঘটিত হয়, কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র জারি করিবার পরে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। সমস্ত সংঘর্ষে—সরকার পরিবর্তন এবং এমনকি বংশ পরিবর্তনেও শাসনতন্ত্র অপরিবর্তনীয় থাকে এবং সমগ্র এশিয়ার ইহা সর্ব পুরাতন শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়।

পারস্য তৈল : প্রথম পর্ব

মধ্যপ্রাচ্যে তৈলের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকজন জানিত। নূহের নৌকা সমুদ্র উপযোগী করা হয় আলকাতরার দ্বারা, যাহা এক প্রকারের তৈলজাত দ্রব্য। ইরানের জরথুস্ত্রগণ তাহাদের কোনো কোনো ধর্মীয় অগ্নিমন্দির নির্মাণ করে প্রজ্বলিত প্রাকৃতিক গ্যাসের চতুষ্পার্শ্বে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের কোনো কোনো অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে অল্প অল্প তৈল নির্গমনের ফলে ছোট ছোট কূপের সৃষ্টি হয় এবং এই অপরিশোধিত তৈলের বন্টনের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে একটি ছোট শিল্পও গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইরানের শাহ ব্যারন দি রয়টারকে যে ব্যাপক অনুমতিপত্র দান করেন উহাতে তৈলের কথাও উল্লেখ

ছিল।[১] ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম ইরানের প্রাচীন সুসা এলাকায় ফরাসি প্রত্নতত্ত্ব অভিযাত্রীদলের নেতা অধ্যাপক জ্যাকোস দ্য মর্গান দেশের সেই অঞ্চলে তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দাবি করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে কেতাবচি খান নামক একজন ইরানি আবগারী কর্মকর্তা এই প্রবন্ধের দ্বারা চমৎকৃত হন এবং ফরাসি পুঁজিপতিদিগকে তৈল অনুসন্ধানে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে ব্যর্থ হইয়া তিনি ইরানে নিযুক্ত প্রাক্তন বৃটিশ মন্ত্রী স্যার হেনরী ড্রামন্ড উল্‌ফ (Sir Henry Drummond Wolf) - এর শরণাপন্ন হন। উলফ্ কেতাবচিকে তাঁহার বন্ধু এবং একজন অষ্ট্রেলীয় তৈল উত্তোলনকারী উইলিয়াম নক্স ডি আরকি (Willium Knox D' Arcy) -এর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

পারস্যের তৈলের সহিত অবিস্মরণীয় নাম ডি' আরকি কখনও ইরানে গমন করেন নাই। সেখানে তিনি ভূতত্ত্ববিদ প্রেরণ করেন এবং আশাপ্রদ রিপোর্ট লাভ করিবার পর তাঁহার প্রতিনিধি আলফ্রেড ম্যারিয়টকে একটি অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করিতে প্রেরণ করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ইরানের পক্ষে মুজাফফর আল-দ্বীন শাহ্ এবং ডি' আরকির পক্ষে ম্যারিয়ট একটি অনুমতিপত্র স্বাক্ষর করেন। এই অনুমতিপত্রে উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ ছাড়া ইরানের সমগ্র অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুমতির মেয়াদ নির্ধারিত হয় ৬০ বৎসর। এই সময়ের পর সমস্ত যন্ত্রপাতি, ভবনাদি এবং কারখানা কোনো ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ইরানের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত পক্ষ পারস্য সরকারকে ২০,০০০ পাউণ্ড নগদে এবং ২০,০০০ পাউণ্ড শেয়ার বাবদ, তৎসঙ্গে বাৎসরিক লভ্যাংশের শতকরা ১৬ ভাগ দিতে স্বীকৃত হয়।

সাত বৎসর কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পর ডি আরকি ও তাঁহার সঙ্গিগণ যখন সমগ্র পরিকল্পনাটি ত্যাগ করিবার বিষয় চিন্তা করেন, তখন হঠাৎ আহবাজের উত্তর-পূর্বে মাছজিদ-ই সোলাইমান অঞ্চলে ব্যবসা ভিত্তিক পরিমাণে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই স্মরণীয় তারিখটি হইল ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে। এক বৎসর পর ২,০০০,০০০ পাউণ্ড পুঁজি লইয়া ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানি গঠিত হয়। ততদিনে পারস্য বিপ্লব দুই বৎসরের পুরাতন। পারস্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে দেখা যায়, সদস্যগণ তৈলের অনুমতিপত্র লইয়া আলোচনা করেন কিন্তু তাঁহাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রবল গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানি প্রায় ৩০টি কূপ খনন করে এবং নিকটস্থ তৈল পরিশোধ কেন্দ্রের সহিত একটি পাইপ লাইন নির্মাণ করে। পরিশোধন কেন্দ্রটি পারস্য উপসাগরের আবাদান দ্বীপে নির্মাণ করা হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পর কোম্পানি বখতিয়ার গোত্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সহায়তা লাভ করে। তৈল ক্ষেত্রে এই গোত্রের জমি ছিল। পরে যুদ্ধাধিপতি শেখ খাজালের সহিতও চুক্তি করা হয়। আবাদান অঞ্চলে শেখ ভূ-সম্পত্তি দাবি করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় নাগাদ বৃটিশ নৌ-বিভাগ বৃটিশ নৌবাহিনীকে কয়লার পরিবর্তে তৈল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। স্বল্পমূল্যে তৈল লাভ করিবার জন্য এবং ইরানের সমৃদ্ধশালী তৈলকূপগুলি হইতে অন্যান্য দেশগুলিকে বাধা দান করিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বিভাগ তেল কোম্পানির অনেকগুলি শেয়ার ক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। ফলে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৪৩।*

মে মাস নাগাদ বৃটিশ তৈল কোম্পানির একজন প্রধান ও নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারের মালিকে পরিণত হন। একমাস পর বৃটিশ কমন্সসভা এই ক্রয় অনুমোদন করে। ২,২০০,০০০ পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়া বৃটিশ নৌ-বাহিনী ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং দুইজন পদাধিকার বলে মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানি ও ইহার শাখাসমূহের নীতিমালার উপর ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করে। এই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের তৈল জাতীয়করণ পর্যন্ত বৃটিশ নৌবাহিনী ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানি হইতে বিশেষ মূল্যে তৈল ক্রয় করে। এই মূল্যের পরিমাণ কত বা বৃটিশ নৌবাহিনী আদৌ কোনো মূল্য দিত কিনা, তাহা কোম্পানি কখনও প্রকাশ করে নাই।

ইরানে বৃটিশ ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ ডি' আরকির অনুমতিপত্র হইতে বাদ দেওয়া হয়। বাহ্যত রুশ সরকার, সম্ভবত বাকুর তৈল ক্ষেত্রগুলির জন্য, উত্তর ইরানে এই ধরনের কোনো অনুমতিপত্র দাবি করে নাই। তবে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে একজন রুশ ব্যবসায়ী এ এম খোসতারিয়া, রুশ সরকারের সহায়তায় ইরানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ভস্তক আল-দলেহ্ (Vosuq al-doleh)-এর নিকট হইতে একটি অনুমতিপত্র লাভ করে। এই অনুমতিপত্র ছিল উত্তরের জিলান, মাজানদারান ও আস্রাবাদ প্রদেশগুলি হইতে ৭০ বৎসর মেয়াদী একটি তেল আহরণের চুক্তি। অনুমতিপত্রের বাকি শর্তগুলি ডি' আরকির শর্তসমূহের ন্যায়। পারস্যের আইনানুসারে সমস্ত অনুমতিপত্র ছিল পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ; কিন্তু ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ডি' আরকিকে অনুমতি প্রদান করিবার সময় এই আইন ছিল না। খোসতারিয়ার অনুমতিপত্রকে পার্লামেন্ট কখনও অনুমোদন করে নাই এবং তাই ইহাকে বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক সমস্ত অনুমতিপত্র প্রত্যাখ্যানের ফলে সমগ্র বিষয়টি ধামাচাপা পড়িয়া যায়। পারস্যবাসিগণ মনে করে যে বিষয়টি ঐখানেই সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভুল বুঝে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তুর্কি জাগরণ

বিগত ২০০ বৎসরের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সে তুরস্কের হউক, ইরানের হউক বা আরবিভাষী বিশ্বেরই হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোকাবিলায় অত্র অঞ্চলের সরকার ও জনগণের প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। এইসব মোকাবিলা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পকলাভিত্তিক। জনগণ বিভিন্নভাবে এইসব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং খুব সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি নাগাদ এই প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকিবে।

তবে একটা জিনিস নিশ্চিত এবং তাহা হইল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতের দ্বারা দুই ধরনের বিপ্লব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই বিপ্লব হইল একই অবস্থার দুইটি প্রকারভেদ মাত্র, সেই অবস্থা হইল জাতীয়তাবাদ। একটি হইল ঔপনিবেশিক শক্তির নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভের বিপ্লব এবং অপরটি হইল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব। স্বাধীনতার বিপ্লব তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং সর্বদাই দর্শনীয় ও সংযোগশীল। সমাজের সমস্ত দোষের জন্য যেহেতু বিদেশীদিগকে দায়ী করা হয়, তাই সমাজের সর্বস্তরের লোক সাধারণত একত্রিত হইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লোকদের মধ্যে যাহার নিজের ভাবধারার উপর সাহস এবং কিছুটা গর্ব রহিয়াছে সে-ই প্রায়শ নায়ক হইয়া যায়।

পরিবর্তনের বিপ্লব সাধারণত দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য ও কৌশলগত হয়। নায়ককে যেহেতু প্রয়োজনের খাতিরে একজন সংস্কারক হইতে হয় তাই তাহাকে সমালোচনা করিতে হয় এবং কখনও কখনও প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান ধ্বংস করিতে হয়, সে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক হউক বা শিল্পকলাজনিতই হউক। এই ধরনের কার্যকলাপ মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে। বিবদমান দলগুলি হাতের কাছে প্রাপ্ত যে কোনো উপায়ে ক্ষমতা দখল করিতে চায় এবং যুদ্ধ অনেকদিন স্থায়ী হয়।

তুরস্ক ও ইরান যেহেতু কোনো ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল না তাই তাহারা ঔপনিবেশিক শাসনের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভের বিপ্লবে জড়িত হয় নাই। তৎপরিবর্তে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করে। এই দুই দেশে সংগ্রাম এবং পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব একই সঙ্গে কাজ করে। তবে আরবিভাষী দেশগুলি স্বাধীনতা সংগ্রামে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, আরবগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময় আধুনিকতার দিকে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই, তবে সেই পদক্ষেপ কোনো পরিকল্পনা মোতাবেক বা সরাসরি প্রচেষ্টার মাধ্যমে হয় নাই।

১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিসরে নেপোলিয়নের আগমনকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করা হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের কোনো পাঠকের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত নহে যে, তাঁহার অভিযানের দ্বারাই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছে বা পাশ্চাত্য

ভাবধারা মিসরের মাধ্যমে সেই তারিখ হইতে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি অঞ্চলই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসে। মিসরে পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকাশ সিরিয়া-লেবাননের পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, যদিও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর ইহার প্রভাব অতি স্বল্পই ছিল এবং ইরানের উপর প্রায় ছিলই না।

তাঞ্জিমাত

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সুলতান আবদুল মজিদ (১৮৩৯-১৮৬১ খ্রিঃ) সাম্রাজ্যের নামজাদা লোকদিগকে গুলহানেহ্ (প্রাসাদের গোলাপ বাগান) -এর মধ্যে একত্রিত করেন এবং তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রী দ্বারা একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া শোনান, যাহাকে হাত্তিশরীফ বা 'মহৎ ফরমান' বলা হয়। ২৭ বৎসর পর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি একই সুলতান আরেকটি বিবৃতি জারি করেন যাহাকে হাত্তি হুমায়ুন বা 'রাজকীয় ফরমান' বলা হয়। উভয়টি চাপে পড়িয়া জারি করা হয় এবং কতকাংশে ইউরোপীয় সরকারসমূহকে শান্ত করিবার জন্য। এতদ্‌সত্ত্বেও ঐগুলি ওসমানীয় সাম্রাজ্যে এক সংস্কার যুগের উদ্বোধন করে, যাহাকে তাঞ্জিমাত বলা হয়। তবে উল্লেখ করিতে হইবে যে, তাঞ্জিমাত অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন গোলযোগের দরুন যতটুকু আসিয়াছে ঠিক ততটুকু উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পরিবর্তনের দরুনও আসিয়াছে।

ওসমানীয় রাষ্ট্র ইসলাম প্রচারের এক সামরিক ছাউনিমাত্র। সুলতানগণ শুধু দার-আল-ইসলাম ও ইসলামী ভূখণ্ড সম্প্রসারণ করেন নাই বরং বিজয় অভিযানের দ্বারা শক্তিশালীও হন এবং কর ও যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দ্বারা সাম্রাজ্যকে সম্পদশালীও করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যকে কাঁপাইয়া তোলে এবং ওসমানীয়গণ তিন দিকে হুমকির সম্মুখীন হয় ঃ অর্থনৈতিক দিকে, রাজস্ব হারাইবার ফলে, রাজনৈতিক দিকে ক্ষমতা হারাইবার ফলে, এবং মানসিক দিকে, ইসলামের ভূখণ্ড সম্প্রসারণে তাঁহাদের অপারগতার ফলে।

এইসব কারণেই তৃতীয় আহমদের (১৭০৩-১৭৩০ খ্রিঃ) প্রধান উজির ইব্রাহীম পাশা সংস্কারের প্রচেষ্টা চালান। তিনি অনুভব করেন যে সামরিক ব্যাপারে ওসমানীয়দের পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ সেলেবিকে তিনি ফ্রান্সে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে তাহাদের দুর্গ ও কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিয়া ওসমানীয় সেনাবাহিনীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করিতে বলেন। রিপোর্টের একটি ফল হইল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনৈক ইব্রাহীম মুতাফাররিকা তাঁহার পাঠকদিগকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এইসব কিছু উলামা ও জান-নিসারীদের দাপটে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ফলে তৃতীয় আহমদকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং প্রধান উজিরকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়।

আমলাগণ একবার যখন এই নূতন জ্ঞানের স্বাদ লাভ করে, সংস্কারের প্রচেষ্টা তখন পুরাদস্তুর চলিতে থাকে। এইসব আমলারা প্রশাসনের জন্য ছিল অপরিহার্য। আমলারা সাম্রাজ্যের শিক্ষিত শ্রেণী এবং তাহাদিগকে বলা হয় আহ্‌ল আল-কালাম বা কলমের লোক। শেষ পর্যন্ত তাহারাই তাঞ্জিমাতের পুরোধা হয়। ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে মুদ্রাকর ইব্রাহীম মুতাফাররিকা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রথম পুস্তক প্রকাশনা করেন, এবং ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে

সামরিক অফিসারদিগকে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে সম্ভবত আমলাতান্ত্রিকদের সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার প্রকাশ করা হয়। ইহাতে বলা হয় যে, নিত্যনূতন সমস্যাবলীর সহিত তাল রাখিবার জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন করা।

সুলতান সেলিম (১৭৮৯-১৮০৭ খ্রিঃ) প্রথম সংস্কারক সুলতান। তিনি 'কলমের লোকদিগকে' রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করিতে বলেন। তাঁহার সময় হইতে সংস্কারের ধারা শুধু সামরিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বরং বেসামরিক এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও প্রযোজিত হয়। এইসব রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ে যতই দ্বিমত থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে সকলেই একমত হয় যে, পাশ্চাত্যেকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদিগকে আনয়ন করিতে হইবে। তবে বিশেষ কিছু ফল লাভ ইহাতে হয় নাই, কারণ সাম্রাজ্যে এইগুলি কার্যে পরিণত করিবার প্রণালীর যথেষ্ট অভাব তখনও বিরাজমান ছিল। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে নিজাম-ই-জদীদ বা নূতন সামরিক পরিকল্পনা ছিল প্রথম। যদিও সেলিমের অধিকাংশ সংস্কার রিপোর্টের ওপর সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জান-নিসারীগণ শংকিত হইয়া উঠে এবং সেলিমকে পদচ্যুত করিয়া চতুর্থ মুস্তাফাকে সিংহাসনে বসায়। তবে এই ব্যবস্থায় কিছুই হয় নাই, কারণ 'রুশুকের কমরেডগণ' (Comrades of Ruschuk) নামে খ্যাত আরেকটি উপবিপ্লবের দ্বারা মুস্তাফাকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে দ্বিতীয় মাহমুদকে (১৮০৮-১৮৩৯ খ্রিঃ) সিংহাসনে বসানো হয়।

যে বিদ্রোহের দ্বারা দ্বিতীয় মাহমুদ ক্ষমতায় আসেন তাহার পিছনে যেহেতু আমলাতান্ত্রিকগণ প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাই উভয়পক্ষের মধ্যে 'সানাদি ইতেফাক' নামে একটি সহযোগিতামূলক দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এই দলিল অভিজাত সম্প্রদায় ও উলামাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবহেলা না করিয়া মাহমুদ আমলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার একটি দুঃসাহসিক কাজ হইল জান-নিসারীদিগকে কর্মচ্যুত করা, তবে তিনি অন্যান্য কাজও করেন। আমলাদিগকে তিনি বেতনভুক করেন এবং প্রশংসামূলক কার্যের জন্য তাহাদিগকে উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি ডাক বিভাগ গঠন করেন এবং একটি বিশেষ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। ফলাফলের দিক হইতে সবচাইতে সুদূরপ্রসারী সম্ভবত বিচার পরিষদ গঠন করা যদ্দারা উলামাদের নিকট হইতে তাঁহাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একচেটিয়া অধিকার ছিনাইয়া লওয়া হয় বলিয়া মনে হয়, সেই একচেটিয়া অধিকার হইল আইন ব্যবসায়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বৈদেশিক মন্ত্রী পারভেজ এফেন্দী যখন সরকারের চারিটি স্তর উল্লেখ করেন তখন তিনি উলামাদের নাম উল্লেখ করেন নাই।

মাহমুদ উদারপন্থী ছিলেন না। সমসাময়িক কয়েকজনের ন্যায় তিনি ছিলেন কুসংস্কারবর্জিত স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু আনুগত্য চাহিতেন। সুলতানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি পুস্তক রচনা করিবার জন্য তিনি শেখ উল-ইসলামকে বাধ্য করেন। তাঁহার সুলতানের প্রতি আনুগত্যের কারণসমূহের সারাংশ নামক গ্রন্থে সেই ধর্মীয় নেতা এই বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য ২৫টি হাদিস উদ্ধৃত করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্টা হইয়াছে-এই ভাবধারা দ্বিতীয় মাহমুদ ত্যাগ করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি সম্ভবত ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া যান এবং বিশ্বাস করেন যে, ক্ষমতার আলোকে সংস্কার

সম্ভব, ধর্মের আলোকে নহে। সম্ভবত এই মন্তব্যটি তাঁহার যে, এখন হইতে আমি আমার প্রজাদিগকে 'মুসলমান' হিসাবে দেখিতে চাই, 'মসজিদে' খ্রিস্টান হিসাবে দেখিতে চাই শুধু গীর্জায় এবং ইহুদি হিসাবে দেখিতে চাই শুধু তাঁহাদের ধর্মমন্দিরে (Synagogue)। ইহার ফল স্বরূপ ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে হাত্তি শরীফ ফরমান জারি হয় এবং তাহা তাঞ্জিমাতের সূচনা করে।

হাত্তি শরীফ এবং হাত্তি হুমায়ুন এই দুইটি ফরমানকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ফরমান হিসাবে চিহ্নিত করিলে বাড়াবাড়ি করা হয়, কারণ মাহমুদ (যিনি পথ প্রস্তুত করেন) এবং আবদুল মজিদ (যিনি তাঞ্জিমাত সম্ভব করেন) উভয়েই স্বেচ্ছাচারী। অপরদিকে, শুধুমাত্র ইউরোপীয় শক্তিসমূহের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি করা হইয়াছে বলিলে মূল সূত্রই হারাইয়া যায়। তাঞ্জিমাতের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক সরকার উভয়টির বীজ বপন করা হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান উদারনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে শান্ত করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহা আবার কিছুকার যাবত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও প্রশাসনিক আলোড়ন হইতেও উত্থিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমলাদের অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঞ্জিমাত একটি প্রাসাদ বিপ্লব। সরকারি ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয় 'কলমের লোকদের' হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে।

পতনোন্মুখ পুরাতন দুই প্রতিষ্ঠান- শেখ-উল-ইসলামের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান উজিরের নেতৃত্বে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় এবং 'নূতন' সামরিক ব্যবস্থাকে মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে ন্যস্ত করা হয়। এইসব মন্ত্রীবর্গের অধীনে সাম্রাজ্যের শিক্ষিত ও ধর্মনিরপেক্ষ আমলাদিগকে ন্যস্ত করা হয়। আমলাতন্ত্রের সদস্যদের কেউ কেউ হয়তো উলামাবিরোধী ছিল, কিন্তু কার্যত কেউই ইসলামী বিরোধী ছিল না। তাহারা যতদূর সম্ভব মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে পরিহার করে। ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহ তাহারা বন্ধ করে নাই তবে তৎসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও চালু করে। ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহ ধর্মীয় আইন বিশারদ তৈয়ার করিতে থাকে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়সমূহ আইন বিশারদ ছাড়াও বেসামরিক প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সামরিক অফিসার তৈয়ার করে। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থাকে ক্রমশ ফ্রান্সের অনুকরণে পরিবর্তন করা হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বেসামরিক আইনগুলি বিধিবদ্ধ করা হইলে শুধু ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনগুলি, যথা- বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শরিয়তের আওতায় রাখা হয়।

উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও তাঞ্জিমাত যুগে সরকার শিক্ষার্থীদিগকে পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বালিকাদের জন্য প্রথম উচ্চ বিদ্যালয় খোলা হয়। দুই বৎসর পর আমেরিকান কনগ্রেগেশনালিস্ট মিশনারী (American Congregationalist Missionary) সাইরাস হ্যামলিন (Cyrus Hemlin) রবার্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে শুধু বুলগেরিয়া, গ্রীক ও আর্মেনীয় বংশের খ্রিস্টান ছাত্রগণ ইহাতে যোগদান করে, কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানগণও এই কলেজের পৃষ্ঠপোষকতা করে। এই প্রতিষ্ঠান এবং বালিকাদের আমেরিকান কলেজ তুরস্কের আধুনিকতার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয় বিজ্ঞান সমিতি (Ottoman Scientific Society) গঠিত হয় এবং ইহার পর এই ধরনের আরও অনেক সমিতি গঠিত হয়। এই ধরনের সমিতিতে ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত যুবকগণ তাঁহাদের

অভিজ্ঞতা আলোচনা করেন এবং কবি ও লেখকগণ তাঁহাদের ভাবধারা প্রকাশ করেন।

তাঞ্জিমাত যুগ তুর্কি লেখকদের এক নূতন শ্রেণী প্রস্তুত করে যাহারা তুর্কি সাহিত্যকে শৈলী ও বিষয়বস্তু উভয় প্রকারে উন্নত করে। এই লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন ইব্রাহীম শিনাসী, যিনি পাঁচ বৎসর প্যারিসে অতিবাহিত করেন। তুর্কি শিক্ষামন্ত্রণালয়ে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পর তিনি তার্জমানি আহ্‌ভাল নামক একটি বেসরকারি খবরের কাগজের সম্পাদকমন্ডলীর পদে কাজ করেন। এই পত্রিকা ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা, তাসভিরি এফকার (Tasviri Efker) এর সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকে এবং অতঃপর মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। আড়ম্বরপূর্ণ শৈলী হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পুরোধা এবং তাঁহার অনুবাদকের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে বিদেশী ও শালীন ভাবধারাকে সহজ তুর্কি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। তাঁহাকে অনুকরণ করেন জিয়া পাশা, যিনি রুশোঁ মলিয়ারের (Molliere) অনুবাদ করেন, আহমদ মিধাত, ছোটগল্প লেখক এবং আহমদ জেভ্‌দাত, যিনি তুর্কি ভাষা হইতে আরবি ও ফার্সি শব্দসমূহ বাদ দিবার জন্য একটি আন্দোলন চালু করেন।

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আবদুল মজিদ কর্তৃক জারিকৃত হাত্তি শরীফ আইনের সার্বভৌমত্ব, সমস্ত প্রজাবৃন্দের সমতা এবং বিচারের নিরপেক্ষ প্রয়োগ অনুমোদন করে। যুগের উৎসাহে তুর্কিগণ তাহাদের দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইউরোপীয় কোট ও পাজামা পরিধান করে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং পাগড়ির পরিবর্তে ফেজ টুপি পরিধান করে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে একই সুলতান কর্তৃক জারিকৃত হাত্তি হুমায়ুন আরও ব্যাপক। ইহা বিশেষভাবে বৈদেশিক চাপের ফলে জারি করা হয়। ইহা সম্ভবত কাগজে-কলমে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীভূত করে এবং মুসলমানগণ কর্তৃক ভোগ করা সমস্ত অধিকার ও সুবিধাদি খ্রিস্টানদের জন্যও উন্মুক্ত করে। ইহার দ্বারা কর প্রদান, সামরিক চাকুরি ও শিক্ষার সমতা বুঝায়। ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ ও কৃষিজাত সংস্কারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু এইসব সংস্কার ও ঘোষণাবলী বাধা-বিপত্তিহীনভাবে হয় নাই। উলামাগণ অলসভাবে বসিয়া ছিলেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমদের সাহায্যপুষ্টও হন। বিদেশী শক্তিবর্গ, যাহারা নিজেদের দেশের উদারপন্থী লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সংস্কারে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও এখন তুর্কি সংস্কারকদিগকে সাহায্য করা বন্ধ করে। দুর্বল সাম্রাজ্যকে আধুনিক প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা শক্তিশালী করিবার চাইতে তাহারা ইহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণ করিতেই অধিক উৎসাহী হইয়া উঠে।

মিল্লাত প্রথায় সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মোটেই উৎসাহী ছিলেন না, কারণ নূতন সাম্য প্রথায় তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উপর কোনো ক্ষমতার অধিকারী হন না। প্রথমবারের মত সর্বস্তরের খ্রিস্টানগণ সেনাবাহিনীতে চাকুরি করিবার সুযোগ লাভ করে এবং মুসলমানদের ন্যায় একই হারে কর প্রদান করে। তাহাদের এক বিরাট অংশ সমানাধিকারও দাবি করে, আবার মিল্লাত প্রথার দ্বারা তাহারা যেসব সুবিধাদি ভোগ করিত তাহাও দাবি করে। একজন তুর্কি লেখক বলেন যে, তাঞ্জিমাতের লোকজন ইউরোপ হইতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আনয়ন করে। ইহার ভিতর তুর্কিগণ গণতন্ত্র পছন্দ করে আর খ্রিস্টানগণ করে জাতীয়তাবাদ। ইহার প্রমাণ হইল গ্রীক, সার্বিয়ান, রুমানিয়ান প্রভৃতিদের

একের পর এক সংঘটিত স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, যাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিহ্নিত করে।

নব্য-ওসমানীয়গণ (Young Ottomans)

তাঞ্জিমাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায় নব্য-তুর্কি সমালোচকগণ। ইহারা অভিযোগ করে যে আমলাগণ একটি নূতন ওসমানীয় সমাজ সৃষ্টি করিবার চাইতে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিতেই অধিক আগ্রহী। এইসব যুবকদের অধিকাংশই সেই আমলাদের অংশবিশেষ এবং ইহাদের কেউ কেউ সুলতানের অনুবাদ সংস্থার কার্যেও নিযুক্ত। তাহারা পাশ্চাত্যের সহিত সুপরিচিত এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। ইহাদের কিছুসংখ্যক লোক ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে সেকালের ইউরোপ প্রচলিত কাঠামোতে দেশপ্রেমিক সংঘ (Partiotic Alliance) নামে একটি গোপন সংস্থা গঠন করে। তাহারাই নব্য যুবকদের অগ্রগামী দল—যাহারা রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে আধুনিকায়নের বিরোধী। তাহারা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে পুনর্জীবিত করিবার পক্ষপাতী। সুস্পষ্টভাবে ইহাদিগকে নব্য-ওসমানীয় বলা যাইতে পারে। তাহাদের স্থিতিকাল তাঞ্জিমাত ও নব্য-তুর্কিদের মাঝামাঝি।

এই নাম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ এইসব লোক, তাঞ্জিমাতের আমলাদের বিপরীত, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র উভয় আদর্শ গ্রহণ করে। তাহাদের জ্ঞাত একমাত্র জাতি হইল ওসমানীয় সাম্রাজ্য, তাই তাহারা একটি প্রকৃত জাতি গঠন করিবার কাজে লাগিয়া যায়। ইহা এমন একটি কাজ যাহাকে বিগত সাড়ে পাঁচ শতাব্দী যাবত উপেক্ষা করা হয়। সমস্যা ছিল পর্বত প্রমাণ, বিশেষত যেহেতু সাম্রাজ্যের অ-তুর্কিগণ ইতোমধ্যে তাহাদের স্বাধীন জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি বাস্তবায়ন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু নব্য ওসমানীয়গণ নির্বিকার। তাহারা ইসলামকে তাহাদের জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক ও মতবাদ সম্বন্ধীয় ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা সম্ভবত অবগত ছিল যে ইসলামের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে তাহারা সাম্রাজ্যের অমুসলিম প্রজাসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবে, কিন্তু এইসব জনসাধারণ ইতোমধ্যেই বিভিন্ন বিদ্রোহে জড়িত হইয়া পড়ে। অপরদিকে তাহারা সাম্রাজ্যের অ-তুর্কি মুসলমান প্রজাদের সমর্থন আশা করে। তাহারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শক্তি দ্বারা একত্রে সন্নিবিষ্ট সীমিত প্যান-ইসলামী মতে বিশ্বাস করে। বস্তুত সাম্রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক আরবিভাষী শিক্ষিত গণ্যমান্য প্রজা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কিছুকালের জন্য ওসমানীয় ভাবধারা আলোচিত হয় ও আরবি সাহিত্যে লিখিত হয়। কিন্তু সামনে দেখা যাইবে, ইহা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ আরবগণ জাতীয়তাবাদের প্রতি ইতোমধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া তুর্কিদের সঙ্গে নিজেদের ভাষা জড়াইয়া ফেলিতে রাজি হয় নাই।

নব্য-ওসমানীয়দের, ইউরোপের এই ধরনের আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর ন্যায় নিজেদের কোনো সুস্পষ্ট কর্মপন্থা ছিল না। কেউ কেউ সন্ত্রাসের পক্ষে রায় দেয়, আবার কেউ কেউ সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে এবং আরেকদল সুলতানকে নিজেদের মতে দীক্ষিত করিবার আশা পোষণ করে। নিজেদের আদর্শ ও কর্মপন্থায় ভিন্নমত পোষণ করিলেও তাহারা যেভাবেই হউক নিজেদের গোপন সংস্থায় মিলিত হয় এবং একসঙ্গে কাজ করে। নব্য-ওসমানীয়গণ একটি ইসলামী ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যযুগের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বুদ্ধিজীবীগণ যেখানে তাঁহাদের ভাবধারা কোরআন, ইসলামী রাজনৈতিক দার্শনিকগণ, বাস্তব

উপদেশাবলী এবং তুর্কি-ইরানি ধর্মনিরপেক্ষ আইনের[১] বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়াছিলেন, সেখানে নব্য-ওসমানীয়গণ তাহাদের ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে কোরআনের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলে। তাহাদের পূর্বে এবং পরে আগত বহু মুসলমান সংস্কারকদের ন্যায় তাহারা ইসলামের সেই খাঁটি মদিনা খেলাফতের যুগে ফিরিয়া যাইতে চায়, সেই খেলাফতকে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয়।

নব্য-ওসমানীয়দের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী, কল্পনাবিদ এবং লেখক সম্ভবত নমিক কামাল (মৃঃ ১৮৮৭ খ্রিঃ)। তিনি তাঞ্জিমাতের একজন সফল সমালোচক। তাঁহার মতে তাঞ্জিমাত কিছুটা আধুনিকতা আনয়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু জনগণকে অভ্যন্তরীণ শোষণ হইতে রক্ষা করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে এবং জাতিকে বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্তি দিতে পারে নাই। এই লেখক ও গুণী কবি বক্তাশি দরবেশ পরিবারভূক্ত এবং যুবক বয়সে তিনি ফরাসি দর্শনের তুর্কি অনুবাদ পাঠ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে তিনি ইসলাম ও আধুনিকতার সংমিশ্রণের জন্য চেষ্টা করিয়া যান। তিনি 'হুররিয়াত' নামক পত্রিকায় বিস্তারিতভাবে তাঁহার ভাবধারা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা নব্য-ওসমানীয়দের মুখপাত্র এবং ইহা বিভিন্ন সমস্যাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিচার করে। তাঁহার পরে আগত নব্য তুর্কিদের মতো তিনি তুর্কি হিসাবে নিজেদের ব্যাপারে আগ্রহী নহেন, কিংবা মধ্য এশিয়ার প্রাক ইসলামী তুর্কিদের ব্যাপারেও তাঁহার কোনো আগ্রহ নাই। তাঁহার পূর্বে আগত তাঞ্জিমাত আমলাদের প্রতিকূলে, তিনি শরিয়তের গুরুত্ব এবং ইসলামের মূল আদর্শ পালন করিবার কথা বলেন। তিনি একজন ওসমানীয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাতান (আরবি ওয়াতান)'পিতৃভূমি' ও মিল্লাত 'জাতি' ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা হয়। প্রথমোক্তটি শীঘ্রই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীটি ব্যবহৃত হয় অধিকাংশই অনারব লোকদের মধ্যে।

ইসলামের প্রতি নব্য-ওসমানীয়দের ঝোঁক থাকিবার ফলে কিছুসংখ্যক উলামাও ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। মোটের উপর নব্য-ওসমানীয়গণ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্দেহের চোখে পতিত হয়। তাহাদের কেন্দ্রস্থলে পুলিশ হানা দেয়। এতদসত্ত্বেও নমিক কামাল, উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ মিধাত, সাংবাদিক জিয়া এবং অন্যান্যদের মতো নব্য-ওসমানীয়গণ ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে সিংহাসনে আনয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ধূর্ত সুলতান বলকানদের ভবিষ্যৎ পুনর্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্মেলন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সম্মতি দান করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৩রা ডিম্বের নব্য-ওসমানীয়গণ এই শাসনতন্ত্র রচনা করে। তিনি মিধাত পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন, এবং নমিক কামালকে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করিতে ওয়াদা করেন। সুলতান আবদুল হামিদকে একজন উদারনৈতিক শাসক মনে করিয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মেলন স্থগিত করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে তিনি শিকায় তুলিয়া রাখেন এবং মিধাত ও নমিক কামালকে নির্বাসিত করেন। তিনি পরিষদ আপাতত বন্ধ করিয়া দেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হয় জেলে পুরেন অথবা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নব্য-ওসমানীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১৭।*

নব্য-ওসমানীয়গণ সম্ভবত আধুনিক যুগে ইসলামের প্রথম মতাদর্শী যাহারা পাশ্চাত্যের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' গুণাবলী গ্রহণ করিয়া ঐগুলিকে ইসলামে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ব্যর্থ হয় কারণ তাহাদের মদিনা খেলাফতের অকৃত্রিমতার চিত্র তাহাদের কল্পনার রচনা মাত্র। তদুপরি জনগণতান্ত্রিক সরকারের মতবাদের সহিত খাপ খাইবার জন্য তাহারা ইসলামের ব্যাখ্যায় অনেক বাড়াবাড়ি করে। উদাহরণস্বরূপ, বাইয়া বা আনুগত্য এবং মাশওয়ারা বা পরামর্শকে তাহারা আধুনিক গণ সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সরকারের সহিত তুলনা করে। ইসলামে নবনির্বাচিত খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অধিকার শুধু গুটি কয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পরামর্শের মতবাদ হইল জনসাধারণের জন্য যে সরকার, উহাকে শক্তিশালী করা, কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা নহে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইসলামে সরকার অর্থ আল্লাহর সরকার, জনগণের নহে। অতএব "সরকার জনগণের সম্পত্তি, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা" -এই আদর্শ ইসলামী শিক্ষায় মিলে না। এই প্রবাদটি এইভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে -"আল্লাহর সরকার, তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা এবং জনসাধারণের জন্য।"

নব্য-ওসমানীয়গণ ইসলামের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে ব্যর্থ হইলেও তাহারা তুর্কিদের মধ্যে নূতন গুণাবলীর জন্ম দিতে সক্ষম হয়। ওসমানী লেখকগণ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনুকরণে বার বার সুলতানদিগকে সৎপরামর্শ দান করে, যাহা ইতোমধ্যে পাঠকদের নিকট নিশ্চয়ই সুপরিচিত হইয়া উঠে। "সেনাবাহিনী ছাড়া সরকার হয় না, অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না, প্রজাসাধারণ ছাড়া অর্থ হয় না।"[১] উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে নব্য-ওসমানীয়গণ উপরোল্লিখিত আপ্তবাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং নূতন গুণাবলীতে উজ্জীবিত। তাহারা লেখে, স্বাধীনতা ছাড়া নিরাপত্তা হয় না, নিরাপত্তা ছাড়া প্রচেষ্টা হয় না, প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নতি হয় না, উন্নতি ছাড়া সুখ আসে না।"

নব্য তুর্কিগণ (Young Turks)

১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কর্তৃক শাসনতন্ত্র মূলতবী রাখার পর হইতে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহা পুনরায় চালু করিতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হিসাবে বিরাজ করেন। ওসমানীয় ইতিহাসের অত্যন্ত দুরূহ সময়ে দেশের ঘটনাবলীকে প্রভাবান্বিতকারী এই ব্যক্তি, পরস্পরবিরোধী চরিত্রের অধিকারী। প্রথমে ইউরোপীয়গণ তাঁহার প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যে, তাহারা এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করে, তিনি হয়তো দ্বিতীয় মহৎ সুলায়মান হইতে পারেন। অবশ্য পরে তাহারা তাঁহাকে 'অভিশপ্ত আবদুল' হিসাবে অভিহিত করে। তাঁহার নিজস্ব প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে 'জল্লাদ' নিষ্ঠুর রাজন বা ইলদিজের রাক্ষস নামে উল্লেখ করে, যদিও ইহাদেরই কোনো কোনো প্রজা তাঁহার প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করে। দুইটি বিষয়ে তাঁহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক কিছুর ব্যাপারে তিনি সন্দেহপরায়ণ। সমগ্র সাম্রাজ্যে তাঁহার একটি গুপ্তচর দল ছড়ানো এবং ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আরেকটি দল কাজ করে। বিদেশী রাজধানীগুলিতে তাঁহার দালাল নিযুক্ত থাকে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নহে, বরং তাঁহার নিজস্ব প্রজাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য। দ্বিতীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা। সুলতানের ক্ষমতা সীমিতকারী যে কোনো কার্যকলাপের তিনি বিরোধী। পিতার সংস্কারমূলক

---

১. *উপরে, দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৬৩, ২০৫।*

কার্যাবলী হইতে তাঁহার শিক্ষা রাশিয়ার তৃতীয় আলেকজান্ডার স্বীয় পিতা হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন উহারই অনুরূপ।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় আলেকজান্ডার জার হইবার পর তিনি তাঁহার পিতামহ প্রথম নিকলাসের চরণরেখা অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং 'স্বেচ্ছাচারিতার শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাসের' কথা ঘোষণা করেন এবং 'স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বজায় রাখিবার ও রক্ষা করিবার' ... ওয়াদা করেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসনতন্ত্রকামীদিগকে নির্বাসনে প্রেরণ করিবার সময় তিনি তাঁহার পিতামহ সুলতান মাহমুদকে অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন যে "একমাত্র ক্ষমতার দ্বারাই জনসাধারণকে বশ করা যায়, যাহাদের অভিভাবকত্ব আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন।" সেই পরিবর্তনের যুগে আবদুল হামিদ ও আলেকজান্ডার উভয়েই তাঁহাদের পিতামহদের যুগে বিদ্যমান অবস্থাকে উত্তম মনে করেন, যদিও সে যুগের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক কোনো অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ছিল না।

এই স্বেচ্ছাচারী সুলতান তাঁহার গুপ্তচরের জাল লইয়াও দেশের ভিতরে ও বাহিরে নূতন তুর্কি দেশপ্রেমিকদের সভাসমিতি বন্ধ করিতে কিংবা সাম্রাজ্যের ভিতরে অ-তুর্কি লোকদের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে ব্যর্থ হন। ইহাদের মধ্যে আর্মেনীয়গণ ও কুর্দগণ প্রবল সমস্যা হইয়া উঠে। কারণ তাহাদের অবস্থান ছিল পূর্বে এশিয়া মাইনরে—সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আর্মেনীয়গণই অধিক ভয়াবহ হইয়া উঠে, কারণ তাহারা খ্রিস্টান এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে তাহাদের অনেক বন্ধু বিদ্যমান। বস্তুত বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮) মধ্যে তাঁহাদের রক্ষাসূচক একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। অন্যান্য মিল্লাতের ন্যায় আর্মেনীয়দের নিজস্ব সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে। তাহাদের বিত্তশালী শ্রেণী আর্মেনীয় চার্চের ধর্মযাজককে স্বীকার করে। এই কারণে ওসমানীয় প্রথা চালু থাকিবার মধ্যে তাহাদের স্বার্থ জড়িত।

অধিকাংশ আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বলিয়া তাহারা স্বীয় স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে। ১৮৮০-১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের নিজস্ব গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাসমূহ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন হইলেও এইগুলির উদ্দেশ্য ছিল-স্বাধীনতা। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত আর্মেনীয় সংস্থাগুলিকে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত করা হয়, যাহা দাশ্‌নাকতজুতুন (Dashnaktzutun) নামে পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক ও আমেরিকান প্রটেস্টান্ট মিশনারিগণ অনেক আর্মেনীয়কে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহারাই একমাত্র মিল্লাত যাহারা পাশ্চাত্যের গ্রীক অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট শক্তিসমূহের সমর্থন লাভ করে। আবদুল হামিদ তাহাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হন, অবশ্য শঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তিনি অস্থির কুর্দদিগকে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। তাহাদের বল্গাহীন বাড়াবাড়ির ফলে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর্মেনীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অযথা তাহাদের স্বধর্মীদের সমলোচনা করেন বলিয়া মনে হয়। তিন বৎসরে প্রায় ১০০,০০০ আর্মেনীয় প্রাণ হারায়, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইউরোপ মোটেই হস্তক্ষেপ করে নাই। অপরদিকে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাইজার উইলহেলম ওসমানীয় সুলতানের নিকট তাঁহার দ্বিতীয়বারের সফরে গমন করেন। ফিলিস্তিনের পথে তিনি সালাহ্‌উদ্দীনের সমাধিতে একটি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং একজন আরব শেখের ন্যায় তিনি ইসলামকে রক্ষা করিতে ওয়াদা করেন। যে কেউ কল্পনা করিতে পারে, এই দৃশ্য কাইজারের মাতামহী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট

তেমন উপভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাঁহার নিজের ১০০,০০০,০০০ কোটিরও অধিক মুসলিম প্রজা ছিল।

ইতোমধ্যে নব্য-ওসমানীয় মতবাদের উত্তরাধিকারিগণ একদলে মিলিত হয় এবং সুলতানকে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজের একদল ছাত্র ইব্রাহীম আধমের (তেমো) নেতৃত্বে একতা ও উন্নতির কমিটি (Committee of Union and Progress) নামক একটি সংঘ গঠন করে। এই সংঘ পরে বেশ পরিপুষ্ট ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সুলতানের গুপ্তচর দল এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে, এবং ইহার সদস্যবৃন্দ দেশের বাহিরে পলায়ন করে। একদল মিসরে গমন করে এবং তাহাদের জনৈক সদস্য মুরাদ বে, মিজান নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। আরেক দল প্যারিস গমন করেন এবং তাহাদের জনৈক সদস্য আহমদ রেজা, মিশভারত নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে এই পত্রিকা দুইটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। মুরাদ বে নব্য-ওসমানীয়দের ভাবধারা সমর্থন করেন। তিনি একজন প্যান-ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, যিনি মনে করেন যে মুসলমানদিগকে একই ছাদের তলায় রাখিবার পক্ষে ইসলাম যথেষ্ট উদার। সমস্যা সমাধানকল্পে তাঁহার মত হইল সুলতানকে সরাইয়া দেওয়া, শাসনতন্ত্র চালু করা, ইসলামকে সাম্রাজ্যের কষ্টিপাথর হিসাবে গ্রহণ করা এবং সমস্ত জাতিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বপক্ষে আনয়ন করা। প্রায় এই সময় আবদুল হামিদ প্যান-ইসলামী ভাবধারার ভবিষ্যত সম্পর্কে সজাগ হন। মুরাদ বে তাঁহার বেশ কিছুসংখ্যক অনুসারীসহ বিপ্লবী শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া যান এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতানের সহিত মিলিত হন। এই সম্মেলনের সহিত তৎকালে ইস্তাম্বুলে অবস্থানকারী আফগানির হাত ছিল কিনা জানা যায় নাই।

তবে আহমদ রেজা ভিন্ন ভাবধারার লোক। তিনি কখনও ইসলাম প্রত্যাখ্যান না করিলেও তিনি অগাস্ট কমটের (August Comte) শিষ্য এবং প্যান-ইসলামী মতবাদের কখনও চিন্তা করিতেন না। কমটের বাস্তব দর্শন তাঁহাকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করে, ফলে ওসমানীয় জাতীয়তাবাদের চেয়ে তিনি তুর্কি জাতীয়তাবাদেরই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হন। তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক গুপ্ত সংস্থার সদস্য ছিল। তাহারা তুরস্কে অনেকগুলি আশ্রয় নির্মাণ করে।[১]

সুলতানের শ্যালক দামাদ মাহমুদ পাশা এবং তাঁহার দুই পুত্র সাবাহ্ আল-দ্বীন ও লুতফুল্লাহ্‌র পলায়নের ফলে প্যারিসের বিপ্লবীগণ বেশ সাহায্য লাভ করে। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে রাজ পলাতকদের প্যারিসে আগমনের ফলে তুরস্ক ও ইউরোপে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। দামাদ মাহমুদ পাশা তাঁহার পরিশ্রমের ফল দেখিয়া যাইবার মত দীর্ঘদিন বাঁচিয়া ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র সাবাহ্-আল-দ্বীন আহমদ রেজাকে লইয়া ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্যারিসে প্রথম ওসমানীয় উদারপন্থীদের সম্মেলন আহ্বান করেন। উপস্থিত ৪৭ জন সদস্যদের মধ্যে ছিল আলবেনীয়, আরব, আর্মেনীয়, কার্কাশিয়ান, গ্রীক, ইহুদি, কুর্দি ও তুর্কি। সাবাহ্ আল-দ্বীন ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। একমাত্র সুলতানকে পদচ্যুত করিবার বিষয়ে সম্মেলনের সকলেই একমত হয়। জাতীয় সংখ্যালঘুগণ বিদেশী শক্তির সহিত মিলিয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, অমুসলিমগণ বংশের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভাব প্রকাশ করে এবং এমনকি অ-তুর্কি

---

১. *প্রায় একই সময় ইরানে গুপ্ত সংস্থা প্রথা চালু করা হয়। নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৭৮।*

অমুসলমানগণও জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠে। সাবাহ্ আল-দ্বীন ফেডারেল ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, পক্ষান্তরে আহমদ রেজা তুর্কি জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত আহমদ রেজাই জয়লাভ করেন।

সম্ভবত রেজার প্রভাবে, কিন্তু পৃথকভাবে সামরিক স্কুলের একদল গ্রাজুয়েট ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ভাতান (ওয়াতান) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুস্তাফা কামাল নামে একজন যুবক অফিসার, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর আধুনিক তুরস্কের প্রথম আতাতুর্ক বা প্রেসিডেন্ট হন। কিন্তু সেই সময় নেতৃত্ব থাকে তালাত বে, এনভার (আনোয়ার) পাশা ও জামাল বের হাতে। তাঁহারা ছাত্রদল, গুপ্ত সংস্থার সদস্যদের আশ্রয় কেন্দ্র ও দরবেশ শ্রেণীগুলির মাধ্যমে তাঁহাদের বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করেন। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন সংস্থাসমূহকে ভাঙ্গিয়া পুরাতন 'ঐক্য ও উন্নতির কমিটি' নামে একত্রিত করা হয়। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহারা সুলতানের বিরুদ্ধে একটি সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। জনগণ এই বিপ্লব গ্রহণ করে শুধু আবদুল হামিদের কুশাসনের জন্য নহে বরং রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের কার্যকলাপের ভয়েও। তাহাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া ইউরোপের ত্রি-পক্ষীয় সন্ধিতে যোগদান করে এবং ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের সহযোগিতায় ইরানকে প্রভাব-প্রতিপত্তিগত ভাগে বিভক্ত করে।[২] তুর্কিগণ আশংকা করে যে তাহাদিগকে হয়তো একইভাবে ভাগ করা হইবে।

কিন্তু ধূর্ত আবদুল হামিদ এই বিপ্লবে বিচলিত হন নাই। তিনি ইহাকে স্বাগত জানান এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করেন। কয়েক সপ্তাহের জন্য আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে। মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিগণ একত্রে উল্লাস করে, মুসলমান উলামা ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকগণ পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন এবং আনোয়ার পাশা সবাইর সমতা ঘোষণা করেন। সুযোগ পাইলে নব্য-তুর্কিগণ হয়তো একটি গর্ব করিবার মতো জাতি গঠন করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা সে সুযোগ লাভ করে নাই। একই বৎসর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি বসনিয়া অধিকার করে এবং বুলগেরিয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল আবদুল হামিদ কর্তৃক সংঘটিত উপ-বিপ্লব সুলতান ও শরিয়তের কর্তৃত্ব ঘোষণা করে। তবে সেনাবাহিনী বিপ্লবের পক্ষে থাকে এবং ২৭শে এপ্রিল আবদুল হামিদ পদচ্যুত হন ও তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মুহাম্মদ সুলতান হন, যিনি বিশ বৎসরে একটি পত্রিকাও পাঠ করেন নাই।

ঘটনার এইখানেই শেষ নহে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়া বিদ্রোহ করে এবং ইটালি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপলী অধিকার করে। তুরস্ক ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও পরাজয় বরণ করে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, মান্টেনিগ্রো ও গ্রীস ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় এবং প্রথম বলকান যুদ্ধের সূচনা করে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ওসমানীয়দের পরাজয়ের দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয় নাই, কারণ বিজয়ীগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইহা পুনরায় ওসমানীয়দিগকে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে। শান্তি স্থাপিত হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে এবং ওসমানীয়দের নিকট ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের মাত্র ১১,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড নিজেদের হাতে অবশিষ্ট থাকে। এক বৎসর পর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহা ওসমানীয়দিগকে পুনরায় যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে এবং গোটা সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

---

২. *নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৭৫।*

এবং তবু ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পর শান্তি স্থাপিত হইলেও নব্য-তুর্কিগণ সফলতা লাভ করিত কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। আবদুল হামিদের পদত্যাগের পর পার্লামেন্টের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে আহমদ রেজা সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাঁহাকে প্যারিস হইতে আহ্বান করা হয়। তালাত, আনোয়ার ও জামাল এই তিনজন নেতার দ্বারা দেশ শাসিত হয়। পুরাতন পন্থীদের ওসমানীয়বাদ এবং সাবাহ্ আল-দ্বীনের যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদের পরিবর্তে রেজার তুর্কি জাতীয়তাবাদ স্থান লাভ করে। নব্য-তুর্কিগণ তুর্কি ভাষা ও প্যান- ইরানি আদর্শের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য একত্র করিতে চায়। প্যান-তুরানি আদর্শ তুর্কিদিগকে মধ্য এশিয়ার তাতারগণ ও প্রসিদ্ধ চেঙ্গিস খানের সহিত সংযুক্ত করে। তাঁহারা দেশকে সম্পূর্ণ তুর্কি হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কর্মসূচি প্রণয়ন করে ও তুর্কি ওজাক (গৃহ) প্রতিষ্ঠা করেন - যেখানে জিয়া গোকাল্প, হেলিদ এদিব ও অন্যান্যদের ন্যায় বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ তুরানের ইতিহাস ও তুর্কিদের গুণাবলীর উপর বক্তৃতা দান করেন। তবে এই কর্মসূচি অ -তুরানিদের জন্য দমনমূলক হইয়া দাঁড়ায়, ফলে ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অ-তুর্কি লোকদের, বিশেষত আরবিভাষী মুসলমান হিসাবে সাম্রাজ্যের প্রতি তবুও সহানুভূতি ছিল, তুর্কি ভাষার খাতিরে তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করিবার চাপে পড়িয়া সেই সহানুভূতি তাহারা হারাইয়া ফেলেন। ১৯১৪-১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মহাযুদ্ধ সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। জামাল বে সামরিক উপদেষ্টা হইয়া আফগানিস্তানে চলিয়া যান, তালাত বে এক আর্মেনীয়ের হাতে জার্মানিতে নিহত হন এবং শেষ পর্যন্ত প্যান-তুরানি আদর্শ সমর্থক আনোয়ার পাশাও সেই আদর্শের জন্য তুর্কিস্থানে নিহত হন।

তাঞ্জিমাত লইয়া সূচিত তুর্কি জাগরণের ঘটনাবলী বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়—ওসমানীয় আদর্শ, প্যান-ইসলামী আদর্শ এবং প্যান-তুরানি আদর্শ। অতঃপর ইহাকে সৈনিক সংস্কারক মুস্তাফা কামালের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যিনি ইহাদের সবগুলি ত্যাগ করিয়া এশিয়া মাইনরের তুর্কিদের সাধারণ তুর্কি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে সফলতা লাভ করেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
আরবিভাষী জনগণের জাগরণ

বিভিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাবলী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবিভাষী লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। তাহারা মিসরের মাধ্যমে ও লেবাননের আমেরিকান এবং ফরাসি মিশনারীদের কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে এবং নব্য-ওসমানীয় ও নব্য-তুর্কি আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবেরও পূর্বে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আরব উপদ্বীপে দেশীয় ওয়াহাবি আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক হইতে এই আন্দোলন সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সহিত এমন সাদৃশ্যমূলক যে কেউ কেউ ইহাকে ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব বলিয়া বিবেচনা করে। ওয়াহাবি আন্দোলন পর্যালোচনা না করিয়া পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রতি ইসলামের প্রতিক্রিয়া বুঝা সম্ভব নহে। ওয়াহাবি আদর্শ আরব উপদ্বীপের বাহিরে বিস্তার লাভ না করিলেও ইহার ভাবধারা প্যান-ইসলামী আদর্শকে প্রভাবান্বিত করে এবং ইহার মূল আরব প্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্যান-আরবীয় আদর্শে যথেষ্ট অবদান রাখে।

মুহাম্মদ ইবনে আবদ্ আল-ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১৭৯২) ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন এবং তাহাতে এক টলটলায়মান ও রুগ্ন সমাজ লক্ষ্য করেন। কয়েক বৎসর পর জিয়া পাশা নামে একজন ওসমানীয় বুদ্ধিজীবীও ইউরোপ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেন "আমি কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করি এবং তাহাদের নগর ও প্রাসাদসমূহ দেখি। আমি ইসলামের রাজ্যেও ভ্রমণ করি এবং যাহা আমি অবলোকন করি তাহা শুধু ধ্বংস। পরবর্তী মুসলমানগণ ইসলামী বিশ্বকে ইউরোপের সহিত তুলনা করিয়া তাহাতে অনেক অভাব দেখিতে পায়, অথচ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাব ইসলামী বিশ্বকে কোরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং ইহাতে অনেক অভাব দেখিতে পান। তিনি ইউরোপ সফর করেন নাই, কারণ তিনি নিশ্চিত যে ইসলামকে শিখাইবার মতো কোনো কিছুই কাফেরদের নাই। তৎপরিবর্তে তিনি কোরআন ও রাসুলুল্লাহর (সঃ) জীবনে ফিরিয়া যান এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার সমস্ত কোরআন বহির্ভূত প্রভাব পরিত্যাগ করেন। ইবনে আবদ আল-ওয়াহাবের মতানুসারে এইসব প্রভাবের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহর অন্তর-অবতরণ সম্পর্কীয় সুফী বিশ্বাস, বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদ এবং সাধারণ লোকদের মাজার পরিদর্শন ও রাসুলুল্লাহ (সঃ) এবং ইমামদের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিবার রীতি। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং এই হিসাবে তিনি মনে করেন যে দরবেশ, দরগাহ্, মাজার, তসবিহ্মালা ও জ্বিনসমূহে বিশ্বাস করা ইসলাম বিরোধী। তিনি একজন আরব এবং এই হিসাবে তিনি প্রচার করেন যে ইসলাম অনারবদের, বিশেষত পারস্যবাসী ও তুর্কিদের সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হইয়া যায়। তিনিই আবার প্রথম ব্যক্তি যিনি সুলতান খলিফার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

তাঁহার অনুসারিগণ নিজদিগকে মুয়াহিদিন (ঐক্যবাদী) বলে এবং অন্যান্য মুসলমানদিগকে তাহারা পৌত্তলিক' বলিয়া আখ্যায়িত করে। তাঁহারা রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁহার প্রথম যুগের অনুসারীদের যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং হাম্বলী মজহাব[১] অনুসারে কোরআন এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ) সুন্নতের আইন-কানুন যথাযথবাবে পালনের কথা ঘোষণা করেন। প্রথম যুগের ইসলামের নীতি অনুযায়ী তাঁহারা অস্ত্রধারণ করেন এবং পৌত্তলিকদিগকে দীক্ষিত করিবার পথ গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ ইবনে সউদ নামক একজন গোত্রপতি এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং নিজের বাহুবল এই কাজে নিয়োজিত করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রিয়াদ নগরী অধিকার করা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ সাধারণ্যে পরিচিত ওয়াহাবিগণ পশ্চিমে মক্কা ও মদিনা অধিকার করে এবং উত্তরে কারবালা ও নাজাফ অধিকার করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের মতানুসারে আরবগণ দ্বিতীয় জাহিলিয়া (অজ্ঞতা) যুগে নিপতিত এবং তাঁহারা খাঁটি ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করিতে ও আরবদিগকে বাঁচাইতে অগ্রসরমান।

সুলতান-খলিফা এই হুমকিতে নীরব থাকিতে পারেন না, আবার সাম্রাজ্যের সুদূর কোণে সংঘটিত এই ধরনের একটি বিদ্রোহ দমন করিবার মতো শক্তিও তাঁহার নাই। ফলে তিনি মিসরের মুহাম্মদ আলীর নিকট আবেদন করেন, যিনি ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে সেই আবেদনে সাড়া দেন। কয়েক বৎসর স্থায়ী এক অভিযানে মুহাম্মদ আলীর পুত্র ইব্রাহীম ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবিদিগকে পরাজিত করেন এবং মক্কা ও মদিনা পুনর্দখল করেন। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবিগণ সুলতানের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এই যুদ্ধ চলিতে থাকে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, যখন মুহাম্মদ ইবনে রশিদ রিয়াদ অধিকার করেন এবং ইবনে সউদের পরিবারকে কুয়াইতে নির্বাসিত করেন। এই স্থান হইতেই ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারি ২০ বৎসর বয়সের আবদ আল-আজিজ ইবনে সউদ, ওয়াহাবিদের শেখ, গোপনে রিয়াদে অবস্থিত রশিদী প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া গভর্নরকে হত্যা করেন। সেইখান হইতেই তিনি শেষ পর্যন্ত সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

ওয়াহাবিদের সুস্পষ্ট ভাবধারা, তাহাদের একক উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা মিসর-ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মনে বিদ্যমান সংশয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষোক্ত লোকদের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী আনুগত্য কাজ করে। ধর্মগত দিক হইতে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর খ্রিস্টান এবং হরেক রকম মতবাদের মুসলমান ড্রুজেস ও একটি ছোট ইহুদি সংখ্যালঘু বিদ্যমান। রাজনৈতিক দিক হইতে কেউ কেউ ওসমানীয় সাম্রাজ্য চায়, কেউ কেউ স্বাধীনতা চায়, আবার কেউ কেউ ওসমানীয় অধীনে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষপাতী। তাহারা সবাই আরবি ভাষায় কথা বলিলেও তাহাদের অনেকেই, বিশেষত মিসরীয়গণ নিজদিগকে আরবি বলিয়া বিবেচনা করে না। কারণ আরব জাতির মতবাদ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে রূপ পরিগ্রহ নাই। ফলে কোন আন্দোলন প্রথম আসে তাহা সঠিকভাবে বলাও যায় না এবং ইহা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নহে।

প্যান-ইসলামী আদর্শ

আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নব্য-ওসমানীয়দের কেউ কেউ যেমন নমিক কামাল প্রমুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আওতায় সীমিত আকারের প্যান-ইসলামী আদর্শের কথা চিন্তা

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১৩।*

করেন। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এই ভাবধারায় উৎসাহ প্রদান করেন অংশত তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যের অ-তুর্কি লোকদের আনুগত্য লাভ করিবার জন্য এবং অংশত ইউরোপীয় শক্তিবর্গের চাপ লঘু করিবার জন্য— যে শক্তিবর্গের অধীনে অনেক মুসলমান প্রজাও বিদ্যমান। আরবিভাষী লোকজন যেহেতু ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্ববৃহৎ মুসলিম জনশক্তি এবং তাহাদের ভাষায় জন্য প্যান-ইসলামী আদর্শ প্রচারের পক্ষে অতি উত্তম তাই সুলতান তাহাদের মধ্য হইতে বেশ কিছুসংখ্যক লোক তাঁহার স্বপক্ষে আনয়ন করেন।

আবদুল হামিদ কর্তৃক আমন্ত্রিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী হইলেন আলেপ্পোর শেখ আবুল হুদা, যিনি ওসমানীয় দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ওয়াহ্যাবি মতবাদের বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেন যে ইসলামে খেলাফত একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বয়ং খলিফা আল্লাহর বিধি-নিষেধ কার্যকরী করিবার মাধ্যম। বিশ্বাসীগণ "(খলিফা) ন্যায় করিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং অন্যায় করিলে ধৈর্য ধারণ করিবে।" আবুল হুদার প্যান-ইসলামী আদর্শ সাম্রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে সীমিত এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আবদুল হামিদের দাবি জোরদার করা।

জামাল-আল-দীন-আল-আফগানী

উনবিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী নিঃসন্দেহে জামাল-আল-দ্বীন-আল-আফগানী (১৮৩৯-১৮৯৭ খ্রিঃ) , যাঁহার সীমারেখা শুধু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং ইসলামের সমস্ত উম্মাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁহার জীবন এত ঘাতপ্রতিঘাতমূলক, তাঁহার রচনা এত অনলবর্ষী ও প্রখর এবং ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার পরিকল্পনা এত বিভিন্নমুখী এবং সময় সময় এত পরস্পরবিরোধী যে পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্পর্কে এখনও শেষ কথা লিখিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে আফগানিস্তানের অধিবাসী বলিয়া দাবি করেন, যদিও মূলত তিনি একজন পারস্যবাসী। তিনি নিজেকে সুন্নি বলিয়া জাহির করেন যদিও তিনি একজন শীয়া। এমন অনেকেই আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন যে তিনি শাসনতন্ত্রবাদী নহেন। সমগ্র জীবনে তিনি একজন শক্তিশালী মুসলমান শাসকের খোঁজ করেন যাঁহার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত ও একগ্রন্থীভূক্ত করিতে পারেন। তিনি নিন্দাসূচকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ইহাকে ইসলামের প্রধান শত্রু মনে করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন অনেকেই আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে তিনি বৃটিশের একজন গুপ্তচর।

আফগানী বা ইরানে পরিচিত আসাদাবাদী, একজন যোগ্য, কার্যকর ও অস্থির আন্দোলনকারী ছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের দর্শনশাস্ত্রে অনেক বেশি আগ্রহী এবং উহার চাইতে অনেক আগ্রহশীল রাজনীতিতে। রাজনীতিতে তিনি কল্পনাবিদ নহেন বরং কর্মবিদ। অধিকাংশ কর্মবিদের ন্যায় তাঁহার মধ্যে নিজের মতবাদকে অতি সহজভাবে তুলিয়া ধরিবার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে তুলিয়া ধরিবার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ওয়াহাবিদের ন্যায় তিনি প্রথম চারি খলিফার যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন। ওয়াহাবিদের তুলনায় আফগানী ইসলামকে যুক্তিবাদের গুরুত্বের উপর বিশ্বাসী। তাঁহার মতে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ, যথা-বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুতের ন্যায় আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে কোরআনে লুক্কায়িত উল্লেখ

রহিয়াছে।[১] মানুষের একমাত্র করণীয় হইল আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে অনুধাবন করিবার জন্য নিজের যুক্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল, তাঁহার মতে ইসলাম একটি শক্তি এবং ঘটনাচক্রে ইহা একটি ধর্ম।

তাঁহার একটি অতি পছন্দনীয় প্রবাদ বাক্য হইল, 'ইসলামে একজন মার্টিন লুথারের প্রয়োজন', এবং সম্ভবত তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁহার মতে ইসলাম অনুরূপ একজনকে লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি সংস্কারকের কলমের চাইতে ধর্মযোদ্ধার তরবারিকে অধিক পছন্দ করেন। ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আশা করেন যে, ইরানের শাহ ওসমানীয় সুলতানকে খলিফা হিসাবে স্বীকার করুন। বিনিময়ে সুলতান কর্তৃক ইরানের স্বাধীনতা স্বীকার করা এবং শীয়া পবিত্র নগরী কারবালা ও নাজাফ সেই দেশের নিকট ফেরত দেওয়া উচিত। ইহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল সমস্ত মুসলিম দেশসমূহ ইস্তাম্বুলে তাহাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রেরণ করিয়া এক সম্মেলনে মিলিত হউক এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক। ইরানের শাহ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। অবশ্য ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নেই। তবে অনতিবিলম্বে শাহ আফগানীর এক শিষ্যের হাতে নিহত হন।

ইহা সুস্পষ্ট যে একজন দক্ষ আন্দোলনকারী হিসাবে আফগানী স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বন করিতে আগ্রহী। তিনি ইসলামের একতা প্রচার করেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহার আধিপত্যের ব্যাপারে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং যাহারা তাঁহার পথের অন্তরায় তিনি তাহাদের হত্যা করিবার বৈধতা স্বীকার করেন। কিছুকালের জন্য তিনি সত্যসত্যই বৃটিশের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন এবং পরে আবার রুশদের সাহায্য কামনা করেন। তাঁহার শীয়া মতবাদ যেহেতু একটি অন্তরায় তাই তিনি নিজেকে আফগানিস্তানের লোক বলিয়া দাবি করেন যাহাতে সবাই নিশ্চিতরূপে তাঁহাকে একজন সুন্নি হিসাবে গণ্য করে (অধিকাংশ আফগানী সুন্নি মতাবলম্বী)। তিনি প্যারিস, লণ্ডন ও পিটার্সবার্গে গমন করেন যাহাতে ইসলামের পুনর্মিলনের জন্য ইহাদের যে কোন সাম্রাজ্যের সাহায্য তিনি লাভ করিতে পারেন। ইসলামী বিশ্বে তিনি একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক শাসকের সন্ধান করেন, যে কোন শাসক, যিনি ইসলামের একতা আনয়ন করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী। তিনি মিসরের খেদিভ, ইরানের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের নিকট গমন করেন। ইহাদের প্রত্যেকে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যবহার করেন এবং পরে চলিয়া যাইতে দেন। তিনি তুলনামূলকভাবে সুলতান আবদুল হামিদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তিনি পুনরায় ইস্তাম্বুল গমন করেন, কিন্তু আফগানীর আনুগত্য যেহেতু ইসলামের প্রতি, ওসমানীয় বংশের প্রতি নহে, তাই ধূর্ত সুলতান সসম্মানে তাঁহাকে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখেন এবং সেখানেই তিনি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

---

১. *বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানীর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীগণ দাবি করেন যে, কোরআনে রেডিও, টেলিভিশন, এটমিক এনার্জি ও মহাশূন্যের রকেট নিক্ষেপ বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে।– অনুবাদক*

মুহাম্মদ আবদুহু

প্যান-ইসলামী আদর্শের আরেকজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯-১৯০৫ খ্রিঃ)। তিনি আফগানীর একজন শিষ্য হইলেও চিন্তাবিদ হিসাবে খ্যাত এবং আরও অধিক প্রভাবের অধিকারী। ভবঘুরে শিক্ষকের তুলনায় আবদুহু মিসরের জীবন ও সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও কিছুকালের জন্য তিনি আফগানীর রাজনৈতিক কার্যাবলীতে আকৃষ্ট হন, তাঁহার অন্তর ইহাতে ছিল না এবং তিনি তাঁহার সফল জীবন শিক্ষা ও সংস্কারে অতিবাহিত করেন। ইসলাম যে হুমকির সম্মুখীন এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার শিক্ষকের সহিত একমত, কিন্তু এই হুমকি যে খ্রিস্টান ধর্মের দ্বারা এই ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন স্বয়ং মুসলমানদের কার্যাবলীর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের অপব্যাখ্যা করা হয়। আবদুহু বিশ্বাস করেন যে, ইসলামকে পাশ্চাত্যের হুমকির মোকাবিলা করিতে হইবে এবং তাহা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বারা করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই, বরং ইসলামের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের দ্বারাও ইহা সম্পাদন করা সম্ভব। আবদুহু আধুনিক মুসলিম বিশ্বে প্রথম জনহিতকর সামাজিক সেবাসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কর্মশক্তি শিক্ষামূলক সংস্কারে ব্যয় করেন। মুসলিম জাহানের রাজধানীগুলিতে আফগানী অনুসৃত সম্পূর্ণ রাজনীতিধর্মীয় কূটনীতি তিনি পরিহার করেন এবং তৎপরিবর্তে শাসকদিগকে শিক্ষামূলক সংস্কার উদ্বোধন করিবার জন্য সম্মত করাইবার পরামর্শ দিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষকের বিরাগভাজন হন।

প্রথম শতাব্দীর খাঁটি ইসলামকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে তিনি ওয়াহাবিদিগকেও অনুকরণ করেন, কিন্তু তাহাদের প্রতিকূলে ইসলাম প্রচারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার নূতন পন্থা এবং এমনকি ইসলাম প্রচারের জন্য আধুনিক দর্শনের ক্রমবিকাশও তিনি গ্রহণ করেন। তিনি তকলিদ বা অতীত লোকদের অনুকরণের বিরোধিতা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, ইজতিহাদ বা কোরআনের ব্যাখ্যার পথ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। শেষোক্তটি সুন্নি ইসলামের অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু তিনি কখনও শিক্ষার ইউরোপীয় আদর্শের পক্ষপাতী নহেন। তিনি অনুভব করেন যে, মুসলমানদিগকে ইউরোপীয়দের ন্যায় অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হইবে। তিনি ইসলামকে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন। কোরআনের উপর তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সহনশীল, নৈতিকতাপূর্ণ ও সুদক্ষ। ইহা একজন স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী উভয় নীতিজ্ঞানমুখী।

জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিজেকে রক্ষণশীল মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়, যাহারা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল। তাঁহারা অভিযোগ করেন, 'ইনি কি ধরনের শেখ, যিনি ফরাসি ভাষায় কথা বলেন, ইউরোপ ভ্রমণ করেন, পাশ্চাত্য পুস্তকাদি অনুবাদ করেন, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দান করেন, তাহাদের পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনা করেন, এমন সব ফতওয়া জারি করেন যেগুলি প্রাচীনগণ কখনও জানেন না, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং দরিদ্র ও দুর্ভাগাদের জন্য চাঁদা আদায় করেন। তিনি যদি একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আপন গৃহ ও মসজিদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে দাও। তিনি যদি ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের লোক হন তবে আমাদের মতানুসারে তিনি সেই পথে বাকি মুসলমানদের চাইতে অধিক কর্মঠ।"

আবদুহু একজন মিসরীয়। জাতীয়তাবাদী আরাবি পাশা পরিচালিত খেদিভ বিরোধী ও

বিদেশী শক্তি বিরোধী বিদ্রোহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন মিসরের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করেন এবং ফলে তাঁহার ভাবধারা মুসলিম উম্মার ব্যাপক জাতীয়তাবাদ হইতে ঈষৎ পরিবর্তিত। তিনি একটি দেশের মুসলমানদের ঐক্যকে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্য সূত্রের শক্ত সংযোজনী গ্রন্থি বলিয়া মনে করেন। ইহা হইল প্রাচীন পন্থী প্যান- ইসলামী আদর্শ, কিন্তু আবদুহ্ কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন হইল, কোনো জাতির মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী থাকিলে সেখানে ধর্মনির্বিশেষে তাহাদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করিতে হইবে। অপরদিকে তিনি মতবাদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার একজন সমালোচক।

পরে আগত অসংখ্য মুসলিম চিন্তাবিদের ন্যায় তিনি সর্বদা দুইটি বিষয় লইয়া চিন্তা করেন। একটি হইল ইসলামের দাবি, যাহা একজন মুসলমানের নিকট হইতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা এবং অপরটি হইল আধুনিক সভ্যতার দুর্নিবার দাবি, যাহা তাহাদিগকে ভিন্নভাবে চলিতে বাধ্য করে। এই দুইটি অসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইলে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ইসলামের নৈতিক ও মতবাদমূলক দিকগুলির সহিত আপোস করা যায় না। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অস্থিরতা বিদূরিত হয় নাই এবং এক সময় তিনি প্রাচীন পন্থীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন, কারণ তিনি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন, আবার আধুনিক পন্থীদের দ্বারাও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন কারণ তিনি মোটেই অগ্রসর হন নাই।

প্যান-আরবি আদর্শের সূচনা

ইসলামের খাঁটি বিশ্বজনীন ভাবধারা সত্ত্বেও ইহার সহিত আরববিবাদের একটি সুবিমল সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিতীয় খলিফা ওমর নিশ্চয়ই আরবদিগকে বাকি মুসলমান হইতে উচ্চমানের বলিয়া বিবেচনা করেন। অনারব মুসলমানদিগকে শুধু 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উমাইয়াগণ এই আরব প্রাধান্যকে আরও জোরদার করেন এবং আরবিভাষাকে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের উপর চাপাইয়া দেন। আরবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চলিয়া যাইবার পর রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে আরববাদ তিরোহিত হয়, কিন্তু ভাষার সহিত সম্পর্কযুক্ত আরববাদ থাকিয়া যায়। খাঁটি মুসলমানগণ সাধারণত বিশ্বাস করে, "যে ব্যক্তি রাসুলুল্লাহকে ভালবাসে, সে আরবদিগকে ভালবাসে- যে ভাষায় অত্যুত্তম গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ হয়।" মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্র এই কথা প্রচলিত আছে যে, "আরবি ফেরেশতাদের ভাষা।" যাহাই হউক, উনবিংশ শতাব্দীতে আরবিভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ এবং প্যান-আরবি আদর্শের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ইহার ব্যবহার, যাহা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি লাভ করে, প্রধানত ফারটাইল ক্রিসেন্টের খ্রিস্টানদের কার্যাবলীর দ্বারা এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের উৎসাহ প্রদানের দ্বারা কার্যকরী হয়।

মুসলমান প্রতিবেশীদের তুলনায় সিরিয়া-লেবাননের অধিকাংশ খ্রিস্টান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। প্যান-ইসলামী আদর্শের কর্মসূচির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন লাভ করিবার জন্য আবদুল হামিদ হেজাজ রেলপথের কাজ সমাপ্ত করেন-যাহাতে হজ্বযাত্রা সহজতর হয়, পবিত্র নগরীগুলির ভবনাদি মেরামত করেন, আরবদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষী হিসাবে আরবি সৈন্য পছন্দ করেন। তবে, খ্রিস্টানদিগকে এইসব বদান্য-বিবেচনা হইতে দূরে রাখা হয়। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, তাহাদের আনুগত্যের অভাবে খ্রিস্টানগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও

প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। লেবাননের মেরোনাইটদের ব্যাপারে ফরাসি ক্যাথলিকদের ধর্মীয় উৎসাহ এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্টদের ধর্মীয় আগ্রহ পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল আনয়ন করে। ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো মিশনই তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মিশনদের মধ্যে একটি নিঃশব্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। উভয়ে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল খোলে, উভয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলীবিদ্যা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনুষদ সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করে। ফরাসি প্রভাব কিছুটা সীমিত, কারণ রোমান ক্যাথলিকগণ শুধু মেরোনাইট খ্রিস্টানদিগকে শিক্ষা দিতে ও শক্তিশালী করিতেই অধিক আগ্রহী। তদুপরি ফরাসি সংস্কৃতি প্রচারে আগ্রহী হিসাবে তাহারা ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে আমেরিকান প্রটেস্টান্টগণ সমস্ত আরবিভাষী লোকদের মধ্যে খ্রিস্টান বাণী প্রচারে দেশীয় ভাষা ব্যবহার করে। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাহারা বৈরুতে প্রথম আরবি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমস্ত অগ্রগামী প্রটেস্টান্ট মিশনারীদের ন্যায় তাহারা বাইবেল গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করেন। কর্নেলিয়াস ভ্যান ডাইক (Cornelius Van Dyke), যিনি একজন প্রসিদ্ধ আরবি পণ্ডিতে পরিগণিত হন, এই পরিকল্পনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং দুইজন লেবাননি-বাটরাস আলবুস্তানী (১৮১৯-১৮৮৩ খ্রিঃ) (Butrus al-Bustani and Nasif al-Yazizi) এবং নাসিফ আল-ইয়াজিজী (১৮০০-১৮৭১ খ্রিঃ) তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করেন। ইয়াজিজী আরব ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর লেখেন এবং তাঁহার কবিতায় প্রাচীন আরবির প্রশংসা করেন। ইনিই ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত প্রথম ঘোষণা করেন যে, ওসমানীয় শাসন হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাদের কাজ করা উচিত। বাটরাস একজন স্কুল শিক্ষক ও অত্যন্ত উন্নতিশীল লেখকে পরিণত হন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম আরবি সাময়িকী 'আল-জিনান' প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা ১৬ বৎসর ধরিয়া আরবিভাষী বিশ্বে আধুনিক চিন্তাধারার উপর পাঠ্য হিসাবে কাজ করে।

সিরিয়ান প্রটেস্টান্ট কলেজ, পরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইহার ছাত্রগণ নাহ্দা নামে একটি জাতীয় নবজাগরণের নেতৃত্ব দান করে-যাহা শুধু আরবিভাষার বিভিন্নমুখী প্রতিভাই পুনরাবিষ্কার করে নাই বরং পাশ্চাত্যের ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও প্রবর্তন করে। এইসব অগ্রনায়কগণ বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতিসমূহ চালু করেন এবং এইসব সমিতিতে আরবি জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত প্রভাবশালী সাময়িকী দুইটির মধ্যে একটি হইল 'আল-মুকতাতাফ'। ইহা ইয়াকুব শরুফ ও ফারিস নিমর নামক সিরিয়ান প্রটেস্টান্ট কলেজের দুইজন গ্রাজুয়েট ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। অপর সাময়িকীর নাম আল-হিলাল', যাহা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে জুর্জী-যায়েদান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উভয় সাময়িকীর সম্পাদকদ্বয় ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ পরে আবদুল হামিদের গুপ্তচরদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কায়রোর অপেক্ষাকৃত মুক্ত আবহাওয়ায় পলায়ন করেন। এই সকল ব্যক্তি ও আরও অনেকে যাহাদের মধ্যে শিবলী শুমাইল (১৮৫০-১৯১৭ খ্রিঃ) এবং ফারাহ আনতুন (১৮৭৪-১৯২২ খ্রিঃ) কিছু কিছু বিষয়ে একমত হন।

প্রথম ও প্রধান হইল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। ইহার একটি নিজস্ব বিশ্বজনীন মূল্য এবং ইহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গোপন বিষয়ের চাবিকাঠি রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। সমস্ত কিছুর ঐক্যের ভিত্তি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সেই ঐক্যকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা 'তাওহীদ' শব্দ ব্যবহার করেন, সেই একই ভয়ানক শব্দ যদ্বারা ইসলামে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা হয়। তাঁহাদের অধিকাংশই ডারউইনের মতবাদের দ্বারা মুগ্ধ হন এবং তাহাদের নিকট প্রগতির বাস্তবতা ইউরোপীয় লেখকদের ন্যায়ই, যাঁহাদের কার্যাবলীকে তাঁহারা আরবিতে অনুবাদ করেন।

দ্বিতীয়ত, তাহারা ধর্মনির্বিশেষে জাতির ঐক্য এবং ইহার সমস্ত নাগরিকদের সাম্যে বিশ্বাস করে। জাতি বুঝাইবার জন্য তাহারা কখনও ওয়াতান (পিতৃভূমি), কখনও কউম (জনসাধারণ) বা কখনও উম্মা বলে, যদ্বারা বিংশ শতাব্দীতে ইহা পরিষ্কার রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল তখন মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি ও দ্রুজেস সবাই একই উম্মার সদস্যভুক্ত হয়।

তৃতীয়ত, তাহারা বিশ্বাস করে যে, নূতন বিজ্ঞান ইহার মধ্যে নূতন আইন ও নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অতীতের আইনের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য পরিত্যাজ্য, তা সে ইসলামের শরিয়ত হউক অথবা খ্রিস্টানদের বিধিবদ্ধ আইন হউক। তদুপরি ইহা জনগণকে বিভক্ত করিয়া ফেলিবে এবং বৈষম্য ও বিবাদ সৃষ্টি করিবে।

চতুর্থত, পার্থিব ব্যাপারে তাহারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের-মুসলিম অথবা খ্রিস্টান, পৃথকীকরণে বিশ্বাস করে। এই দুইটির সংমিশ্রণে উভয়কে কলুষিত করিবে এবং ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলে চিন্তার স্বকীয়তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে। তাহাদের অধিকাংশ, সবাই নহে, ধর্মীয় লোক এবং তাহাদের কেউ কেউ খ্রিস্টান হইলে, এতদূর পর্যন্ত বলে যে আরবদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনীয় বিষয় হিসাবে ইসলামকে ইহার সম্মানিত আসন প্রদান করা উচিত।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবি করত খ্রিস্টানগণ মুসলমানদের সহিত শুধু সমান অধিকারই দাবি করে না বরং সমাজের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে সমান ও বাস্তব অংশ দাবি করে। অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষে একই নীতি গ্রহণ করিবার অর্থ হইল এতদিন পর্যন্ত তাহারা যে প্রাধান্য লাভ করিত, তাহা ত্যাগ করা। প্যান-ইসলামীদের মতে, এমনকি আবদুহুর ন্যায় একজন সহিষ্ণু ও উদার ব্যক্তির মতেও ইহার অর্থ হইল সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম যে প্রাধান্য লাভ করিত, তাহা অস্বীকার করা।

কিন্তু মুসলমানগণ যতই দলে দলে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্পর্শে আসিতে থাকে এবং যতই তাহারা ওসমানীয় সুলতানের নীতিসমূহের প্রতি অনাসক্ত হইতে থাকে ততই তাহারা এই সমস্ত ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের নব্য-তুর্কি বিপ্লব এবং ইহার তুর্কি জাতীয় করিবার কর্মসূচি আরবিভাষী মুসলিম যুবকদিগকে খ্রিস্টানদের সহিত একই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। কেউ কেউ খ্রিস্টান সংগঠনসমূহে যোগদান করে এবং অন্যান্যগণ আল-ফাতাত জাতীয় মুসলিম দলসমূহ গঠন করে, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। আবার অনেকে, যাহারা অতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহারা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির ন্যায় আরব-তুর্কির দ্বৈতরাজতন্ত্র কামনা করে। গোপনে কায়রো বা ইউরোপে বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে বৃটিশগণ তাহাদের সুবিধামত ব্যবহার করে।

স্থানীয় জাতীয়তাবাদ

ওসমানীয়গণ লেবানন ও আরব উপদ্বীপের কিছু অংশ ব্যতীত অধিকাংশ ফারটাইল ক্রিসেন্ট এক অঞ্চল হিসাবে পৃথক সরকারের অধীনে শাসন করে। ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মিসর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক হইতে আলাদা ছিল। মুহাম্মদ আলীর আগমন এবং পরবর্তী মিসরের ইতিহাসে মিসরীয় ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের জনগণের ব্যবধান আরও বিস্তৃত করে। অতএব মিসরের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে নিজদিগকে পৃথক জাতি হিসাবে চিন্তা করা সহজতর হয়। মুহাম্মদ আলীর সংস্কারের ফলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তদ্বারা তাহাদের পক্ষে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা সহজ হয়।' মিসর-মিসরিদের' এই ধ্বনি মিসরে উঠে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অথচ ইহার সহিত সিরিয়া সিরিয়দের বা ইরাক ইরাকিদের এই ধরনের কোনো ধ্বনি উত্থিত হয় নাই।

অপরদিকে ইসলামী শিক্ষার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে অতি প্রভাবশালী কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার আফগানী ও আবদুহুর ন্যায় শিক্ষকগণ ইসলামের দাবিসমূহ ঘোষণা করেন। তদুপরি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্য যে কোনো অংশের চাইতে যেহেতু মিসরে স্বাধীনতা অধিক তাই সিরিয়া ও লেবাননের বহু লেখক কায়রোতে চলিয়া যান, এবং তাহাদের পত্র-পত্রিকা সেখান হইতে প্রকাশ করেন। তাই মিসর ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বিদ্যমান সমস্ত প্রকার আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। সেখানে প্যান-ইসলামীগণ যেরূপ কাজ করিবার সুযোগ পায় অনুরূপ প্যান-আরবিয়গণও সুযোগ পায়। মুসলিম ঐতিহ্যবাদীগণও স্থান লাভ করে, ধর্মনিরপেক্ষগণও বিরাজ করে। এমন মিসরীয়ও সেখানে বিদ্যমান যাহারা নিজদিগকে 'জাতি' হিসাবে বিবেচনা করে এবং অন্যদের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই মনে করে, যদিও তাহারা আরবি ভাষায় কথা বলে, অথবা মুসলমান অথবা উভয়টিই। ব্যাপারটি আরও ঘোরালো মনে হয় যখন দেখা যায় প্যান-ইসলামীগণ, প্যান-আরবিগণ ও মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণের প্রত্যেকের পরস্পরের সহিত বিভিন্ন সম্পর্ক অথবা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরূপ আনুগত্য বিদ্যমান।

মিসরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরবর্তী বিদেশী মহাজনদের প্রাধান্য অনেক কিছু আনয়ন করে এবং তৎসঙ্গে হিজর-আল ওয়াতানিয়া নামে জাতীয় দলও আনয়ন করে-যদ্বারা পরে আরবি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত আদর্শের সহিত একমত না হইলেও আবদুহু ইহাতে যোগদান করেন। তাহাদের উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ওসমানীয় বা আরব বা এমনকি মুসলমান হিসাবেও নহে বরং মিসরীয় হিসাবে। একজন মুসলমান (আবদুল্লাহ্ নাদিম), একজন খ্রিস্টান (আদিব ইসহাক) ও একজন ইহুদি (ইয়াকুব সানু) 'জাতীয়' অর্থাৎ মিসরীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরবর্তীকালে বৃটিশগণ জয়লাভ করিলে ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলে অনেকেই নূতন সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে, আবার আবদুহুর ন্যায় অন্যান্যগণ শিক্ষার উন্নতি এবং অন্যান্য সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এক নূতন পুরুষের আগমন ঘটে যাহারা বৃটিশের আগমনের পূর্বে বিদ্যমান মিসরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নহে। তাহাদের মতে বৃটেন মিসরকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে উদ্ধার করে নাই বরং ইহা শাসন চাপাইয়া দেওয়া একটি বিদেশী শক্তি। স্বভাবতই বৃটিশ মনোভাব এই যুবকদিগকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। লর্ড ক্রোমার ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বৃটিশ ব্যক্ত করে যে মিসর জাতি নহে, তাই মুসলমান হউক বা অমুসলমান হউক দেশপ্রেম বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অপর পক্ষে ক্রোমার বলেন, মিসরের বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্রিত করিয়া 'একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায়' পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ "লাভ করিতে

কয়েক বৎসর সম্ভবত কয়েক পুরুষ লাগিবে ... ।" অবশ্য পরোক্ষ অর্থ হইল, বৃটিশ কয়েক বৎসর-সম্ভবত কয়েক পুরুষ মিসরে অবস্থান করিবে—যতক্ষণ না সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়।

মিসর যে একটি জাতি নহে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮ খ্রিঃ)। তিনি প্রমাণ করেন যে ইহা একটি জাতি। তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি। কাহারও মতে তিনি একজন নেতা আবার কাহাও মতে তিনি একজন প্রতারক। ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অপরিণত মৃত্যুর ফলে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর মনে একজন প্রকৃত নেতার আসন লাভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে মিসর একটি জাতি কিন্তু ব্যাপক আকারের, যাহা একাধারে ওসমানীয়, মুসলিম ও প্রাচ্যদেশীয়। তবে আপাতত মিসরীয়গণ কর্তৃক তাহাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত শেষোক্ত তিনটিকে অপেক্ষা করিতে হয়। বৃটিশদিগকে মিসর হইতে বাহির করিবার জন্য একসময় তিনি ফরাসির সাহায্য কামনা করেন এবং তাই ফরাসি কর্তৃক আলজিরিয়া অধিকারে তিনি বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি এবং আরও অনেক মিসরীয় আরববিবাদের সমালোচনা করেন এবং বিশেষত সিরিয়দিগকে অপছন্দ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে জাতীয়তার ভিত্তি ভাষা, ধর্ম বা গোত্রীয় বংশ নহে বরং দেশ। মিসরীয়গণ যদি বলিতে পারেন 'মিসর আমার দেশ' তবেই মিসর একটি জাতি হইতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিসরে তিনটি দল গঠিত হয়। প্রথম পিপল্স (উম্মা) পার্টি যাহার সদস্যভুক্ত থাকেন আবদুহু ও তাঁহার বন্ধুগণ, যাঁহারা প্যান-ইসলামী হিসাবে প্রথমত মুসলমান, দ্বিতীয়ত মিসরীর এবং তৃতীয়ত ওসমানীয় ও আরব। দ্বিতীয় দল কন্সটিটিউশনাল রিপর্ম পার্টি (Constitutional Reform Party)। ইহা বৃটিশের আর্শিবাদ লইয়া খেদিভের বন্ধুবর্গ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই দলের উদ্দেশ্য হইল পূর্বাবস্থা বজায় রাখা। তৃতীয় দল হইল কামিল পরিচালিত ন্যাশনাল পার্টি। ইহাদের মতে মিসরের আসন সর্বপ্রথম এবং ইসলাম ও ওসমানীয়বাদের আসন পরে। ন্যাশনাল পার্টির আদর্শ শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মিসরীয় জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে মিসরীয়বাদই সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পারস্যের জাগরণ

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আরবগণ কর্তৃক বিজিত জাতিগুলির মধ্যে পারস্যবাসিগণই একমাত্র প্রধান অংশ যাহারা জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, পারস্যবাসিগণ প্রায় সর্বদাই নিজদিগকে অন্যান্য মুসলমানগণ হইতে পৃথকভাবে রাখিয়াছে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহারা নিজদিগকে অন্যান্য মুসলমানগণ হইতে পৃথক মনে করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারা অন্যান্যদের বিরাগভাজন হয়। পৃথক জাতি হিসাবে তাহারা নিজদিগকে প্রকাশ করে কখনও ধর্মীয়ভাবে যথা প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে 'ব্লাকশার্ট' 'হোয়াইট শার্ট', 'রেডশার্ট' বিদ্রোহের দ্বারা।[১] কখনও ইহা প্রকাশ করে সাহিত্যের মাধ্যমে, যথা শু'বিয়া আন্দোলন ও ফেরদৌসীর কবিতার দ্বারা।[২] ইহা কোনো সময় রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ করা হয়, যথা সাফ্‌ফারীয়, সামানীয় ও অন্যান্যদের আংশিক সফল বিদ্রোহের দ্বারা। ইহারা পরে স্বায়ত্তশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। কখনও ইহা প্রকাশ করা হয় সাংস্কৃতিকভাবে যথা মোঙ্গল যুগে পারস্যবাসিগণ কর্তৃক আরবিভাষী লোকজন হইতে পৃথক তাহাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার দ্বারা।

পারস্যবাসিগণ নিজদিগকে বিশেষ বা অদ্বিতীয় মনে করিলেও তাহারা অন্ততপক্ষে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বা ইহার অংশ হিসাবে বিরাজ করে। পারস্যবাসিগণ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আরবি ভাষার ব্যাকরণ লেখে, যদিও তাহারা এ ভাষা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। একটি ধারাবাহিক ইসলামী ধর্মতত্ত্ব লিখিবার ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ অবদান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাহারা ইহা পালন করিতে অস্বীকার করে। ইসলামের ইতিহাসে তাহারা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ভাবী বংশধরদের জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করে—কিন্তু যেভাবেই হউক তাহারা নিজদিগকে ইহার অংশ বলিয়া মনে করে না। সাধারণভাবে পরিচিত 'ইসলামী' এবং ভুলক্রমে পরিচিত আরব সংস্কৃতির শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে পারস্যবাসীদের অবদান অনেক বেশি। তাহাদের কবি ও স্থাপত্যশিল্পীদিগকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাহাদের শিল্পকলা ওসমানীয়দের মসজিদ ও ভবনসমূহের শোভা বর্ধন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল হইতে দিল্লী পর্যন্ত অধিকাংশ শিল্পকলা ছিল পারস্য এবং সংস্কৃতির লক্ষণ ছিল ফার্সি ভাষায় কথা বলার মধ্যে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই কথা ব্যক্ত করা যে, পারস্যবাসিগণ আরব অথবা তুর্কি হইতে শুধু পৃথক নহে বরং তাহারা এই পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, যাহা তাহাদিগকে নিন্দনীয় করিয়া তোলে এবং এই গর্বের জন্য তাহাদিগকে কঠোরভাবে শাসন করা হয়। সাফাভীয় যুগে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে শীয়া মতবাদ গ্রহণ না হইলে পারস্যবাসিগণ আরও

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৯৭, ৮৬, ৮৭।*

২. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৮৯।*

কোণঠাসা হইয়া যায়। সাফাভীয় যুগে ইরান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকিলেও কোনো সাংস্কৃতিক মতবিনিময় হয় নাই। সাংস্কৃতিক দিক হইতে ইরান অমুসলিম বিশ্ব হইতে পৃথক থাকে এবং শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা বাকি মুসলিম জাহান হইতেও পৃথক হইয়া যায়। ইরান ইসলামী বিশ্বের মধ্যেই থাকে কিন্তু কিছুতেই ইহার অংশ হিসাবে নহে। সাফাভীয় ও অন্যান্য শাহদের ক্ষমতা যতই কমিতে থাকে শীয়া উলামাদের প্রভাব ততই বাড়িতে থাকে এবং পরিণতিতে ইরান সম্পূর্ণভাবে একঘরে হইয়া যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইরানে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়। এইসব আন্দোলন পারস্যবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। ইরানে আফগানীর উৎসাহিত প্যান-ইসলামী দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভ্যন্তরীণ প্রাচীর ধ্বংস করা যাহা পারস্যের শীয়াদিগকে বাকি মুসলমান হইতে পৃথক করিয়াছে। "শাসনতন্ত্রবাদীদের" উদ্দেশ্য হইল, ইরানকে বাকি পৃথিবী হইতে আলাদাকারী সেই প্রাচীর ধ্বংস করা। সকল ক্ষেত্রেই বিপুল সংখ্যক শীয়া উলামা ও তাঁহাদের শিষ্যগণ এই উভয় প্রাচীরকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন।

পারস্যবাসিগণ যে কঠোর স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তোলে তাহা ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তাহাদের জাতি গঠনের কাজে সহায়তা করে। সেই দশম শতাব্দীতে ফেরদৌসী এই মনোভাব ব্যক্ত করে, ইরান না থাকিলে আমার বাঁচিবার সার্থকতা নাই। মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের উনবিংশ শতাব্দীর তুর্কি লেখক নমিক কামালকে আধুনিক মতে ভাতান, বা পিতৃভূমি ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করা হয়, অথচ পারস্য কবি সাদীকে (মৃঃ ১২৯১ খ্রিঃ) আমরা 'পিতৃভূমির ভালবাসা', বা হোব্ব এ -ভাতান প্রবাদ দ্বারা এমন এক ভাবের সমালোচনা করিতে দেখি যাহা সম্পূর্ণ আধুনিক। তিনি বলেন 'ওহে সাদী'। ভাতানের ভালবাসা একটি মহৎ মনোভাব। কিন্তু কেউ (ইহার জন্য) বিপন্নভাবে মরিতে পারে না, কারণ সেখানেই তাহার জন্ম।'

এইসব মনোভাবকে জাতীয়তাবাদ হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল বলিয়া বিবেচনা করা হয়, অথচ ইহাকে কি নামে অভিহিত করা হইবে তাহাও সঠিক বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল পারস্যবাসিগণ পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ধার করিয়া আধুনিক জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তোলে এবং তৎসঙ্গে তাহারা তাহাদের নিজস্ব জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কেও সজাগ থাকে। তুর্কি ও আরবি ভাষী লোকদের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলাম, ওসমানীয়বাদ, আরবিবাদ ও তুরানিবাদের খাপ খাওয়ানো মুশকিলের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পারস্যবাসীদের এইরূপ কোনো অসুবিধা ছিল না। উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে তুর্কি ও আরবগণ, বিশেষত আরবগণ এখনও যেখানে স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে ব্যস্ত, সেখানে পারস্যবাসিগণ ইতোমধ্যেই সেই স্বাতন্ত্র্য গঠন করিয়া লইয়াছে।

বাবী-বাহাইজম (Babi-Bahaism)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সুন্নি ইসলামের একটি দেশীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে ওয়াহাবিবাদ আলোচনা করিয়াছি। বাবী-বাহাইজম শীয়া ইসলামের একটি দেশীয় সংস্কার আন্দোলন। স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ধ্বংস করিবার ব্যাপারে ইহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। বাবিজম একটি খাঁটি ইরানি ও শীয়া আন্দোলন এবং কোনো বিদেশী প্রভাব ইহাতে নাই অথচ বাহাইজমের মধ্যে বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান।

বাবী-বাহাইজম দ্বাদশ শীয়া ইমামতের অন্তর্ভুক্ত শেখী ধর্মমতের একটি শাখা। ইহাদের মতানুসারে দ্বাদশ ইমাম, যিনি লুক্কায়িত এবং একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেন, এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করেন এবং সেই ব্যক্তিটিকে বলা হয় বাব অথবা দরজা। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে শেখী দলের নেতা, দক্ষিণ ইরানের শিরাজ নগরীর মীর্জা আলী মুহাম্মদ (১৮২১-১৮৫০ খ্রিঃ) নিজেকে বাব বলিয়া দাবি করেন। পরে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনিই 'ঐশীবাণীর স্থল' এবং স্বয়ং লুক্কায়িত ইমাম। তিনি স্বয়ং লুক্কায়িত ইমাম বলিয়া দাবি করিয়াছিলেন কি না তাহা সঠিক বলা যায় না, কারণ বায়ান নামক তাঁহার গ্রন্থে বার অতীন্দ্রিয় শব্দাবলী ব্যবহার করেন, নিজেকে একটি আয়না বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহার সম্পর্কে বলেন, "যাহাকে আল্লাহ প্রকাশ করিবেন।" তবে ইহা সুনিশ্চিত যে তিনি মনে করেন, তিনি একটি নূতন যুগ এবং নূতন বর্ষপঞ্জি সম্বলিত একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিতেছেন যাহাতে ৯ ও ১৯ সংখ্যাদ্বয়ের কিছু অতীন্দ্রিয় গুণাবলী রহিয়াছে।

দেশের সমগ্র অঞ্চলে এই দাবির অনুসারী পাওয়া যাইবার অর্থ এই যে, জনসাধারণ উলামা ও দেশের সাধারণ অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের ন্যায় বাবী অস্ত্রধারণ করে এবং নূতন রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হয়। শীঘ্রই দক্ষিণ কেরমান ও ইয়াজদ্ তাহাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ইহা দক্ষিণাঞ্চলীয়দের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলীয়দের বা এই ধরনের কোনো আন্দোলন নহে যেরূপ জনৈক ঐতিহাসিক দাবি করিয়াছেন। কারণ ইহার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত বারফরোসে এবং আরেকটি ঘাঁটি প্রস্তুত করা হয় উত্তর-পশ্চিম ইরানের জান্জানে। শাহ্ ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উলামাগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান, কিন্তু আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেশের অনেক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জানজানের বাবীগণ একটি অবরোধ এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিহত করে।

বাব স্বয়ং বন্দী হন এবং পরে পারস্য সরকারের একটি ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে তাব্রিজে নিহত হন। তাঁহার দুইজন অনুসারী বাব হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ পারস্য শাহ নাসির আল-দ্বীন শাহকে হত্যার চেষ্টা করে। ইহার প্রতিশোধে ব্যাপক ধরপাকড় ও অত্যাচার আরম্ভ হয়। বা'বীগণ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবার সময় যে সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও স্বার্থহীনতা প্রদর্শন করে তাহা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ইহার নেতাদের শিক্ষার চেয়ে অধিক কার্যকরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

বা'বের মৃত্যুদণ্ডের পর বা'বীদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে থাকেন উত্তর ইরানের মাজান্দারানের দুইজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহাদের একজন ইয়াহইয়াকে বা'ব এই দলের নেতা বলিয়া মনোনয়ন দান করেন, এবং সোবেহ্-এ-আজল বা 'অনন্ত প্রভাব' উপাধি প্রদান করেন। অন্যজন হোসেন আলীকে বাহাউল্লাহ বা 'আল্লাহর শোভা' উপাধি দেওয়া হয়। উভয় ভ্রাতাসহ অসংখ্য বা'বীদিগকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বাহাউল্লাহ দাবি করেন যে, তিনি 'সেই ব্যক্তি যাহার মধ্যে খোদা আত্মপ্রকাশ করিবেন যেরূপ বা'ব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইয়াহইয়া এই দাবির নিকট মাথা নত করেন নাই এবং এই দুই দলের মধ্যে সংগঠিত সংঘর্ষের সুযোগে ওসমানীয় সরকার এই দুই ভ্রাতাকে পৃথক করিয়া ফেলে। সোব্হ-আজলকে সাইপ্রাস এবং বাহাউল্লাকে ফিলিস্তিনের আক্রায় নির্বাসিত করা হয়।

তবে বাহাউল্লাহ্ এই সংঘর্ষে জয়লাভ করেন এবং বাহাইজম বা'বীজমের স্থান দখল করে। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে বাহাউল্লাহর মৃত্যুর পর বাহাইদের মধ্যে আরও যে সকল মতবিরোধ

হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র লইয়া যে 'বাহাই বিশ্বধর্ম' জন্মলাভ করে তাহা এই কাহিনীর অংশ নহে।[১] বা'বীজম ইরানে একটি জাতীয় ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে বাহাউল্লাহ, বিশেষত তাঁহার পুত্র আবদুল বাহার নেতৃত্বে বাহাইজম আন্তর্জাতিকতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে ইরানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা পারস্যের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবগুলির প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। শীয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যাঁহারা বাহাইজম ও পাশ্চাত্যকরণের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা এই দুইটির একটিকে অপরটি হইতে পৃথকভাবে দেখেন। তাঁহারা বাহাইজমের বিরোধিতা করেন কারণ ইহা নূতন মতবাদ প্রচার করে এবং তাঁহারা যে কোনো নূতন জিনিসকে বাহাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। বাহাইগণ পাশ্চাত্যকরণের প্রতি তেমন উৎসাহী না হইলেও তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সমস্ত আধুনিক ভাবধারার জন্য তাহাদিগকে দায়ী মনে করা হয়। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে, পারস্যের বাহাইগণ নূতন ভাবধারার প্রতি উৎসাহী, যদিও তাহারা ইহার মূল উদ্যোক্তা নহে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাহাইজম ইহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি হারাইয়া ফেলে এবং ইহার আধুনিকী করণের প্রভাব তিরোহিত হয়। ইরানে বাহাইদের সংখ্যা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইহাদিগকে দমন করা হয়। তাহাদের কোনো আইনসম্মত মর্যাদা ছিল না।

ইরানে আফগানী

প্যান-ইসলামী আদর্শ সর্বাঙ্গীণভাবে ইরানের ন্যায় শীয়া দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। সুন্নিদের দূষিত প্রভাব হইতে নিজস্ব ইসলামকে পৃথক রাখিবার জন্য পারস্যের উলামাগণ ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য অতি জোরালো ও ধুরন্ধর ব্যক্তি বিধায় প্যান-ইসলামী আফগানীর স্বল্প সংখ্যক অনুসারী ইরানের শাহের সন্নিকটে কাজ করিয়া যায়। তাঁহার সক্ষম বয়ঃকালে আফগানী মাত্র দুইবার ইরান গমন করেন। উভয়বারই তিনি তেহরানের এক ধনী ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকাংশ সাক্ষাৎপ্রার্থী সাধারণ লোক, আলেম নহে। উভয় বারে তিনি নাসির আল-দ্বীন শাহের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

আফগানী প্রথম ইরান সফর করেন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তাঁহার তিরস্কারমূলক কথাবার্তা শাহ ও তাঁহার পারিষদবর্গকে এমন রাগান্বিত করে যে শীঘ্রই তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণকারী হাজী আমিন-আল-জারব-এর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। আমিন অতঃপর আফগানীকে লইয়া রাশিয়া গমন করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় ইউরোপ সফরের সময় শাহ্ মিউনিখে আফগানীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। আফগানী দাবি করেন যে, একটি বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে রাশিয়া প্রেরণ করা হয়। শাহ তাঁহার কাজ শেষ হইলে ইরানে ফিরিয়া যাইতে বলেন। আফগানীর স্বীয় বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি কুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী আমিন আল-সুলতানের স্বপক্ষে পিটার্সবার্গ গমন করেন। উদ্দেশ্য হইল করুন নদী ও ইহার তীরবর্তী এলাকায় নৌ-চলাচলের জন্য গ্রেট বৃটেনকে যে অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়, রুশদিগকেও অনুরূপ অনুমতি দান করিবার বিষয়ে রুশদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা। ইরানের পক্ষে ক্ষতিকর এরূপ একটি কাজে যাইতে আফগানীর সম্মত হওয়া রাজনৈতিক উস্কানীদাতা হিসাবে তাঁহার সুবিধাবাদের পরিচায়ক। অপরদিকে আফগানীর

---

১. *যুক্তরাষ্ট্রে এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল ইলওনিসের ইউলমেটে অবস্থিত। তাহাদের নয় পার্শ্ববিশিষ্ট ধর্ম-মন্দির একটি সুপরিচিত নিদর্শন।*

পরিচয় জানা সত্ত্বেও শাহ তাঁহাকে পুনরায় ইরানে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবার দ্বারা সম্ভবত তাঁহার মনের হতবুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় সফর প্রথমটির মতই। সম্ভবত আফগানী পুনরায় ওসমানীয় খলিফার অধীনে ইরানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান সহকারে ইসলামের একতার পরিকল্পনার উপর জোর দেন। এইবার শাহ এতই রাগান্বিত হন যে, আফগানী নিজেকে নির্বাসন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থ শাহ আবদুল আজিমের মাজারে আসন বা ব্যাস্ত গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে তাঁহাকে জোরপূর্বক ইরান হইতে বহিষ্কার করা হয়।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে যে বৎসর আফগানীকে বহিষ্কার করা হয় সে বৎসরই একটি বৃটিশ কোম্পানিকে কুখ্যাত তামাক অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়।[১] সমগ্র দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আফগানী এই ব্যাপারে মুখ খোলেন নাই। উলামাদের মতে এই অনুমতিপত্র তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীরে আরেক ভাঙ্গন। আফগানীর কোনো সহযোগিতা ছাড়াই তাঁহারা অনুমতিপত্রের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাঁধায়। শাহ কর্তৃক তিরস্কৃত হইবার পর তাঁহার বিরুদ্ধে আফগানীর ঘৃণা এত প্রবল আকার ধারণ করে যে তিনিও উলামাদের সঙ্গে হাত মিলান; অথচ ইহার পূর্বেও তিনি উলামাদের বিরোধিতা করেন। শাহ এবং অনুমতিপত্রের বিরোধিতা করিয়া তিনি সামাররা ও শিরাজের মুজতাহিদদের নিকট পত্র লেখেন। একটি পত্রে তিনি লেখেন হাজী মীর্জা মুহাম্মদ হাসান শিরাজীর নিকট তিনি ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ ফতওয়া জারি করেন। এই চিঠির ফলে তামাক ধর্মঘটের জন্য, পরে পারস্যের পুনর্জাগরণের জন্য এবং পরবর্তী ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের জন্য আফগানীর প্রশংসা করা হয়। অনুমতিপত্রের পরাজয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সম্মিলিত কর্মপন্থার দ্বারা পারস্যবাসিগণ শাহের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সক্ষম। ফলে ইহা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে পরিণত হয়।

যাহা হউক, আফগানী ইস্তাম্বুল গমন করেন এবং তাঁহার শাহ বিরোধী কার্যকলাপ চালাইয়া যান। ইরানের প্যান-ইসলামী দল ছিল খুবই ছোট এবং কেরমানের একজন কবি শেখ আহমদ রুহী ইহার নেতৃত্ব দান করেন। নাসির আল-দ্বীন শাহকে তিরস্কার এবং ইসলামের সুলতান হিসাবে আবদুল হামিদের প্রশংসাকারী তাঁহার কবিতার দ্বারা ইসলামের একতার জন্য আফগানীর পরিকল্পনা এবং সেই একতায় ইরানের মর্যাদা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পরবর্তীকালে কেরমানের মীর্জা রেজা নামক আফগানীর একজন প্যান-ইসলামী শিষ্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে নাসির আল-দ্বীন শাহকে হত্যা করে।

পাশ্চাত্যের প্রভাব

পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যক্ষভাবে এবং তুরস্ক ভারতবর্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইরানের স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় পারস্যের প্রথম ঋণ হয় সামরিক সাজ-সরঞ্জামে ও প্রশিক্ষণে। ফতেহ্ আলী শাহের (১৭৯৭-১৮৩৪ খ্রিঃ) রাজত্বকালে এবং রুশ-পারস্য যুদ্ধের সময় বিদেশী অফিসারবর্গ পারস্য-সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু নাসির আল-দ্বীন শাহের সুচতুর প্রধান উজীর মীর্জা তকী খানই শক্তিশালী ভিত্তিতে আধুনিকতা আনয়ন করেন।

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৪৩।*

আমীর-এ-কবির নামে সাধারণত পরিচিত এই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি মুহাম্মদ শাহের সুদক্ষ উজীর কায়েম মাকামের এক বাবুর্চি ও আর্দালীর পুত্র। নাসির আল-দ্বীন যখন শাহজাদা ও আজারবাইজানের গভর্নর, তখন আমীর-এ-কবির তাঁহার প্রধান অফিসার হিসাবে এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে শাহজাদার ভগ্নীকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে নাসির আল-দ্বীন অভিষিক্ত হইবার সময় মীর্জা তুর্কী খানকে প্রধান উজীর বানানো হয়। তাঁহার তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত গদিনসীন সময়ে ইরানকে আধুনিকতার প্রতি পরিচালনা করিবার ব্যাপারে তিনি যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশি অবদান রাখিয়া যান। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তাঞ্জিমাত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁহার পিটার্সবার্গ সফরের সময় তিনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই ইরানের মুক্তি নিহিত।

তিনি সরকার পুনর্গঠিত করেন, ইউরোপের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ দান করেন, বাজার ও মালগুদামসমূহ নির্মাণ করেন এবং সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব সম্ভবত ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে দার-আল-ফনুন বা কলা ও বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, যাহা পরবর্তীকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই কেন্দ্রে ইউরোপ হইতে শিক্ষক আনা হয়, যদ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আমীর-এ-কবীরকে এই পদে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শক্তিশালী শত্রু ছিলেন উলামাগণ, যাঁহাদের অতি কার্যক্ষম বন্ধু ছিলেন সম্রাজ্ঞীমাতা। পুত্রের উপর তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং জামাতার মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ মীর্জা তকী খানকে বরখাস্ত করা হয় এবং এক বৎসর পর কাশানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একমাত্র ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত পার্শ্বে থাকেন তিনি হইলেন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী, শাহের একমাত্র ভগ্নী।

ছাত্রদের মাধ্যমে ইরানে পাশ্চাত্য প্রভাব আসে। এইসব ছাত্র সেই ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইউরোপ সফর করেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা শিক্ষক, পত্রিকা প্রকাশক, অনুবাদক ও গ্রন্থকার হন। ইরানে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সরকারি গেজেট হিসাবে আমীর-এ কবির দ্বারা। নিষেধাজ্ঞার ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেশের বাহিরে প্রকাশিত হয়, এবং চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আসে। দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার মধ্যে একটি হইল আখতার (তারা), যাহা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। রুহীর প্রভাবে এই পত্রিকা কিছুকাল যাবত প্যান-ইসলামী আদর্শ প্রচার করে, কিন্তু পরে ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারার উদ্যোক্তা হয় এবং ইরানে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরেকটি পত্রিকা কানুন (আইন), ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক মলকম খান, নাসির আল-দ্বীন শাহের অতি ঘনিষ্ঠ এবং ইংল্যাণ্ডে তাঁহার দূত হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু মলকমের প্রগতিশীল ভাবদারা শাহ সহ্য করিতে পারেন নাই, কারণ পাশ্চাত্যকরণের মধ্যে তিনি তাঁহার বিপদ দেখিতে পান এবং তাই জনগণকে তিনি এতই অজ্ঞ রাখেন যে তাহারা জানিত না, স্বয়ং শাহের ভাষায়, 'ব্রাসেলস্ একটি শহরের নাম নাকি এক ধরনের বাঁধাকপি'। মলকম খান সহজ ফার্সি ভাষায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় লেখেন। তিনি সর্বদা আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বর্ণমালা পরিবর্তন করিতেও চেষ্টা করেন এবং ইরানে ফারামুশখানা বা 'ক্ষমাগৃহ' প্রবর্তন করেন।

পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কলা ও বিজ্ঞান গবেষণাগার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের অনুবাদ ও প্রকাশনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। আজারবাইজানের আবদুর রহমান তালেবফ এবং জয়নুল আবেদীন মারাঘেই নামক দুইজন ব্যবসায়ী ও গ্রন্থকার বিপ্লবের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেন। ককেশাশে বহুদিন বসবাসকারী তালেবফ রসায়নবিদ্রায় ও পদার্থবিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন এবং এইসব বিষয়ের ন্যায় সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি বিষয়াদির উপর তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার একটি অতি জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম আহমদ। ইহা এক পিতা ও তাহার পুত্র আহমদের মধ্যে কথোপকথন। একটি শিশুর সাধারণ ভাষায় পিতা ইউরোপের উন্নতি ও ইরানের অবনতির কথা আলোচনা করে।

আহমদের চেয়েও অধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল মারাঘেয়ী রচিত 'ইব্রাহীমের ভ্রমণ বৃত্তান্ত'। ইব্রাহীম কায়রোতে বসবাসকারী এক পারস্যবাসী ব্যবসায়ীর পুত্র। ইরান কিরূপ তাহা সে দেখিতে যায়। তাহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা, পুরোহিত শ্রেণীর শঠতা এবং কর্মকর্তাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাহারা পড়িতে পারে তাহারা ইহা নিজেরা পাঠ করে এবং অন্যান্যদেরকে চায়ের দোকানের আসরে পড়িয়া শোনায়।

ইরানের জাগরণে বিদ্যালয়সমূহও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনবিংশ শতাব্দীতে সরকার প্রতিষ্ঠিত দার-আল-ফনুনই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়, কিন্তু আজারবাইজান, জিলান ও অন্যান্য প্রদেশের উদারপন্থী ব্যবসায়িগণ পাশ্চাত্য ধারার বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এইগুলির আদর্শ হইল আমেরিকান, বৃটিশ ও ফরাসি মিশনারিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ। ফরাসি ল্যাজারীয় মিশন ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তাব্রিজে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে দেশের অন্যান্য অংশেও বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করে। আমেরিকানগণ তাহাদের কাজ আরম্ভ করে আজারবাইজানের উরুমিয়্যায় (পরবর্তী রেজাইয়া), ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে এবং বৃটিশগণ ইসফাহানে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে। উভয়ে হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এই বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তেহরানের আলবুর্জ কলেজ বিশেষত দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইহার সুদীর্ঘকালীন ও প্রিয় অধ্যক্ষ ডঃ এস এম জর্দান সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র আমেরিকান, সম্ভবত একমাত্র বিদেশী যাঁহার মর্মরমূর্তি তাঁহার গুণমুগ্ধ জনগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। মহিলাদের সাময়িকী প্রকাশনার ব্যাপারেও তাহারা সর্বপ্রথম। তেহরানের আমেরিকান গার্লস স্কুলের গ্রেজুয়েটদের সহায়তায় মিসেস আর্থার বয়েস্ কর্তৃক সম্পাদিত 'দি ওয়ার্ল্ড অব উইমেন' (মহিলা জগৎ) ১২ বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ইহা মহিলাদের এই ধরনের আরও অনেক সাময়িকীর অগ্রদূত।

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবগুলির মধ্যে পারস্য বিপ্লব সম্ভবত অদ্বিতীয় এই অর্থে যে, সেনাবাহিনীর ইহাতে করণীয় তেমন কিছু ছিল না। সামরিক বা বেসামরিক কোনো শক্তিশালী ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক কোনো দায়িত্বও ইহাতে নাই। এই বিপ্লব পরিচালিত হয়, অনেকটা বিশৃঙ্খলভাবে, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত প্রভাবশালী লোক এবং মধ্যম-উদারপন্থী উলামাগণের দ্বারা। পারস্যের বিপ্লবে বাজারের ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া পারস্যের বিশেষত আজারবাইজান ও জিলানের ব্যবসায়ীগণ উত্তরে রাশিয়ায় গমন করেন। নিজনি নভগর্দের (Nizhni Novgorod) বার্ষিক মেলায় পারস্যের অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে। তদুপরি ইউরোপের

নিকটতম রাস্তা হইল রাশিয়ার মধ্য দিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হাজার হাজার পারস্যবাসী বাকুর তৈল উত্তোলন ক্ষেত্রে এবং রাশিয়ার অন্যান্য শিল্পগুলিতে কাজ করে। এইসব লোকজন ইরানের তুলনায় রাশিয়ার শুধু উন্নতিতেই মুগ্ধ হইয়া ফিরে নাই বরং যেসব ভাবধারা রাশিয়ায় ১৯০৫ ও ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সাধন করে ঐসব দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়া আসে।

পারস্য বিপ্লব

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যক্তি বা দলবিশেষ এই বিপ্লবের পথ নির্দেশ করে নাই বা বিভিন্ন ভাবধারার লোকদিগকে এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে নাই। এইসব কিছুতে উলামাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং ইউরোপপন্থী বিশিষ্ট লোকদের তাহাদের নিজস্ব উদ্দেশ্যে কাজ করে। এই উভয় পন্থীদের মাঝখানে আবদ্ধ ব্যবসায়িগণ সম্ভবত উলামাদের চেয়ে পাশ্চাত্যপন্থীদের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। ইহা কোনো পরিকল্পিত বিপ্লব নহে, বরং সংঘটিত হইয়াছে মাত্র।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফ্র আল-দ্বীন শাহের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ইরানের অবস্থার কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। সুযোগ সন্ধানী প্রধান উজির আমিন আল সুলতান ভারপ্রাপ্ত কর্মাধক্ষ থাকেন এবং অবস্থাভেদে কখনও বৃটিশদের এবং কখনও রুশদের পক্ষাবলম্বন করেন। রুগ্ন এবং দুর্বলচিত্ত শাহ চিকিৎসা (তিনি যকৃতের রোগী ছিলেন) ও ইউরোপের রাজন্যবর্গের আপ্যায়ন লাভের জন্য ইউরোপ গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। শাহের দুইটি সফরের ফলে রাশিয়া ও বৃটেন উভয়ের নিকট ইরানের করের বোঝা বৃদ্ধি পায়। বেলজিয়ান শুল্ক পরিচালকের নূতন রুশঘেঁষা শুল্কনীতির ফলে চিনির দাম বাড়িয়া যায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর একদল ব্যবসায়ী ইহার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে এবং সমস্ত বাজার বন্ধ করিয়া দেয়। সরকার বেত্রাঘাত করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ১৩ই ডিসেম্বর দুইজন মধ্যপন্থী মুজতাহিদ সৈয়দ মুহাম্মদ তাবাতাবায়ী ও সৈয়দ আবদুল্লাহ বাহবাহানীর নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার উলামা ও ব্যবসায়ী নিকটবর্তী শাহ আবদুল আজিমের মাজারে অবস্থান ধর্মঘট করে। সেখানে তাহারা একটি বিচারালয় দাবি করে।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি শাহ জনসাধারণের ইচ্ছা পূরণ করিবার ওয়াদা করিয়া একটি ফরমান জারি করেন। মসজিদ প্রাঙ্গণে এই ফরমান পড়িয়া শুনান হইলে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায় এবং পারস্য জাতি দীর্ঘজীবী হউক এই ধ্বনি বারংবার শোনা যায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীবর্গ শাহকে এই ওয়াদা ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া সফল হন।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে এক বিরাট সংখ্যক উলামা ও তাঁহাদের অনুসারী তেহরানের প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে বিশিষ্ট কোম-এর মাজারে অবস্থান ধর্মঘট করে। একই সময়ে ১৩০০০ পাশ্চাত্যপন্থী, ব্যবসায়ী, বণিক ও অন্যান্যগণ তেহরানের বৃটিশ কার্যালয়ের মাঠে অবস্থান ধর্মঘট করে। অবস্থান গ্রহণ করা বা বাস্ত (Bast) ইরানের একটি সম্মানিত নিয়ম-পদ্ধতি, কিন্তু অবস্থান গ্রহণের সচরাচর স্থান হইল দরগাহ্, মসজিদ, শাহের আস্তাবল এবং ইদানীং প্রাদেশিক টেলিগ্রাফ অফিস, যাহার সহিত শাহের প্রাসাদের তার যোগাযোগ রহিয়াছে সম্ভবত তাই। বিদেশী রাষ্ট্রের কার্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করা নূতন নিয়ম, তবে বৃটিশদের অনুমতিক্রমে ইহা করা হয়। রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপ্লবীগণ গ্রেট বৃটেনের উদার ও গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রণালীর জন্য ইহার পক্ষাবলম্বন করে। অপরদিকে গ্রেট বৃটেনও বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করে, কারণ এই নীতি রাশিয়াকে আঘাত

করে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট মুজাফ্ফর আল-দ্বীন শাহ্ একটি শাসনতন্ত্র ও একটি পার্লামেন্ট বা মজলিশ প্রদান করেন। প্রথম মজলিশের নির্বাচন সমাজের বিভিন্নশ্রেণীর যথা শাহজাদা, উলামা, অভিজাত, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সংস্থাসমূহের সদস্যভুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম মজলিশ কৃষকশ্রেণী ব্যতীত সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। ইহার প্রথম কাজ হইল ৪০০,০০০ পাউন্ড অংকের একটি ইঙ্গ-রুশ যুক্ত ঋণ প্রত্যাখ্যান করা এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়াম শুল্ক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করিতে শাহকে বাধ্য করা।

১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি শাহের মৃত্যুর ফলে নব্য বিপ্লবী আন্দোলন জটিলতার সম্মুখীন হয়। নূতন শাহ মুহাম্মদ আলী রাশিয়ার ক্রীড়নক এবং বিপ্লবের বিরোধী হিসাবে পরিচিত। তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় তিনি শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেও তাঁহার কার্যাবলী ইহার বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাঁহার কার্যাবলীর প্রথমটি হইল প্রতিক্রিয়াশীল আমীন-আল-সুলতানকে প্রধানমন্ত্রী নামে পুনর্বহাল করা।

শাসনতন্ত্র প্রদান করিবার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসে। মাসে মাসে সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই সংখ্যা ৪০০-এ উন্নীত হয়। নূতন শাহ্ তাঁহার মজলিশ-বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করিবার সাথে সাথে সংবাদপত্রগুলি কবিতা, গদ্য, ব্যঙ্গরচনা, রম্যরচনা, ও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে শাহ্ ও প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে বিদ্রূপ করে। স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন গান রচনা করা হয়। দেশের সর্বত্র বিবাহের গায়কদল এইসব গান পরিবেশন করে এবং তৎসঙ্গে এই বাণীও ছড়াইয়া দেয়, যাহা জনগণকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে উস্কানীতে উৎসাহ প্রদান করে।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন যে একটি 'অতি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের' একচেটিয়া ব্যাপার নহে তাহার সর্বোত্তম উদাহরণ সম্ভবত আঞ্জুমন বা পরিষদসমূহের আবির্ভাবে। সমগ্র দেশে প্রকৃত অর্থে শত শত আঞ্জুমন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর প্রতিফলিত করিবার জন্য গঠিত হয়। প্রতিটি আঞ্জুমনে অর্ধ ডজন হইতে ১০০ জন সদস্য থাকে। কোনো কোনোগুলি ধর্মীয় দল, কোনো কোনোটি শিক্ষা সমর্থন করে এবং গণশিক্ষার ক্লাস পরিচালনা করে; আবার কেউ প্রচারপত্র বিলি করে এবং কয়েকটি সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে বিপ্লব বিরোধী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে। আঞ্জুমনসমূহের কার্যাবলীর পরিচালনা করিবার জন্য বিপ্লবের কোনো কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল না। প্রত্যেকটি ইহার নিজস্ব আইন-কানুনের অধিকারী। সন্ত্রাসবাদী আঞ্জুমনগুলি, যেইগুলি রাশিয়ার সমসাময়িক নাস্তিক ও সামাজিক বিপ্লবী শ্রেণীগুলির ন্যায়, নিজস্ব বাধ্যব্যক্তি বাছিয়া লয়। পরিকল্পনা ও কর্মসূচির অধিকারী কোনো নেতা ইহাদিগকে একত্রে সন্নিবেশিত করিতে পারিত কিন্তু অনুরূপ এক নেতা তখনও উদয় হয় নাই।

আমীন আল-সুলতানের প্রত্যাবর্তন এবং অর্থের প্রয়োজনীয়তার দরুন ঋণের প্রশ্ন পুনরায় উত্থিত হয়। মজলিশ রাশিয়া বা ইংল্যাণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার বিরোধী, অথচ আমিন-আল-সুলতান ইহার পক্ষপাতী। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে আগস্ট প্রধানমন্ত্রী মজলিশ ত্যাগ করিবার সময় এক সন্ত্রাসবাদীর গুলীর আঘাতে নিহত হন। হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে। হত্যাকারীর দেহে একটি কাগজে লেখা পাওয়া যায়, 'আব্বাস আকা, আজাররাইজানে অর্থবিনিময়কারী, আঞ্জুমনের সদস্য, জাতীয় শিষ্য বা ফেদাই নম্বর ৪১।

অবশ্য আঞ্জুমনের নাম কাগজে লেখা ছিল না। এই ধনের গোপন সন্ত্রাসবাদী সংস্থার সংখ্যা ছিল অনেক, এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাহারা আরও অনেককে গোপনে হত্যা করে।

সেই হত্যার দিনই একটি ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পারস্য বিপ্লবের উপর এই চুক্তি সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই চুক্তি 'প্রাচ্য প্রশ্নের' ফলশ্রুতি, যাহা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একযোগে থাকিবার অক্ষমতা প্রকাশ করে। ইউরোপের আকাশে সংযুক্ত জার্মানির আবির্ভাব এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলীতে কাইজার উইলহেলমের একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে রাশিয়া ও বৃটেন নবাগতের বিরুদ্ধে একটি 'যুক্তফ্রন্ট' দেখাইতে চায়। ইরান, আফগানিস্তান ও তিব্বতের ব্যাপারে তাহারা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া উভয়ে যেহেতু ইরানের ব্যাপারে আগ্রহী, তাই তাহারা সেখানে প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা চিহ্নিত করিয়া লয়। উত্তরাঞ্চলে একটি রেখা ইয়াজ্দ হইতে উত্তর-পূর্বে ইরান-আফগান সীমান্ত ও মাসহাদের পূর্ব পর্যন্ত এবং আরেকটি রেখা উত্তর-পশ্চিমে যাইয়া কেরমানশাহের পশ্চিমে ইরান-তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত রাশিয়ার প্রভাব থাকে। রুশ এলাকার মধ্যে ইরানের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলি পড়ে। পক্ষান্তরে প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা হিসাবে বৃটিশগণ শুধু 'বৃটিশ' বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব কোণটুকু লাভ করে। দেশের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ অধিকাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। এইরূপ একটি অসম বন্টন প্রমাণ করে যে, বৃটেন তখনও ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উদগ্রীব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে তখনও তৈল আবিষ্কৃত হয় নাই। পারস্যবাসিগণ সঠিকভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে যে এই ধরনের চুক্তি তাহাদের দেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। 'গণতান্ত্রিক' বৃটেন হইতে অনেক কিছুর প্রত্যাশী পারস্য বিপ্লবীগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদিগকে ঠকানো হইয়াছে। এই বিশ্বাস আরও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, কারণ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এইসব ঘটনাপ্রবাহ হইতে তাহারা আরও অনেক শিক্ষা লাভ করে।

তবে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে বিপ্লবীগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ লাভ করে নাই, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাহ্ তাহাদের উপর কঠোর হইয়া উঠেন। এক নাগাড়ে অনেকগুলি আন্দোলন ও প্রতি আন্দোলনের পর কর্ণেল লিয়াখানভের নেতৃত্বে একটি কোসাক রেজিমেন্ট শাহের আদেশে তোপের মুখে মজলিশ উড়াইয়া দেয়। বহুসংখ্যক বিপ্লবীকে বন্দী করা হয়, তাহাদের নেতাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট বিপ্লবীগণ দেশত্যাগ করে। মনে হইল শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন শেষ, কিন্তু জনগণের মধ্যে আন্দোলনের সমর্থক থাকিয়া যায়। তিনটি কেন্দ্র শাসনতন্ত্র রক্ষায় টিকিয়া থাকে ঃ তাব্রিজ, ইসফাহান ও রাস্ত।

তাব্রিজিগণ সাত্তার খান ও বাকের খানের[1] নেতৃত্বে সরকারি বাহিনীকে শহরে প্রবেশে বাধা দান করে এবং পরিণামে শাহ ও রুশ সৈন্যগণ কর্তৃক নয় মাসেরও অধিককাল অবরুদ্ধ থাকে। মিঃ হাওয়ার্ড বাস্কেরভীল নামক তাব্রিজের মিশনারি স্কুলের একজন যুবক আমেরিকান শিক্ষক তাঁহার কাজে ইস্তাফা দান করিয়া বিপ্লবীদের দলে যোগদান করেন। তিনি তাহার নিজস্ব কিছু প্রশিক্ষণ দান করেন এবং বুভুক্ষু জনতার জন্য খাদ্য আনিবার মানসে একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তিনি নিহত হন এবং তাঁহার কবর বিপ্লবের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

---

১. *'খান' আসল খান নহে, বরং প্রায় সমস্ত পারস্যবাসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি সম্মানিত উপাধি। ১৯৩৪ সনে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হইলে ইহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়া যায়।*

তাব্রিজের সাহসিক বাধা অন্য কেন্দ্রগুলির জাতীয়তাবাদীদিগকে সময় ও উৎসাহ দান করে। নেতা সরদার আসাদের নেতৃত্বে বখতিয়ার গোত্র শাসনতন্ত্রের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং তেহরান অভিমুখে যাত্রা করে। পরে দেখা যায় বখতিয়ারিগণ বিপ্লবের ভাবধারার চাইতে তাহাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপরই অধিক আস্থাশীল কিন্তু সেই সময় তাহাদের সহযোগিতা শাসনতন্ত্রবাদীদের পরম উপকারে আসে। উত্তরে রাস্তে দাসনাকৃযতুন (Dashnaktzoutun) নামে আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদীদের এক বিরাট অংশসহ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও তেহরান অভিমুখে যাত্রাকরে। রাস্ত বাহিনী সিপাহদারের সাধারণ পরিচালনাধীনে থাকে, কিন্তু প্রকৃত আধিপত্য থাকে সরদার মহী এবং আর্মেনীয় ইয়াফ্রেম খানের হাতে। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই বাহিনী তেহরানে মিলিত হয় এবং ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই রাজধানী অধিকার করে। শাহকে পদচ্যুত করা হয় এবং পরদিন তাঁহার যুবক পুত্র আহমদকে শাহ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

তাব্রিজের অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্রবাদিগণ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়, কিন্তু তাহারা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। রুশ ও বৃটিশদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাক্তন শাহকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবসরকালীন ভাতা প্রদান করা হয় এবং প্রফুল্লচিত্তে ইউরোপে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তদুপরি বখতিয়ার দলপতি সরকার আসাদ বা রাস্তের সিপাহদার কেহই প্রকৃত শাসনতন্ত্রবাদী নহে। ইহা ছাড়াও উলামা ও পাশ্চত্য শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর দ্বিতীয় মজলিশের অধিবেশনে দুইটি পৃথক দল দৃষ্ট হয়, একটি বিপ্লববাদী এবং অন্যটি বিবর্তনবাদী। প্রথমোক্তটি সোস্যাল ডেমোক্রেটস্ নামে পরিচিত এবং তাহারা ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ভূমি সংস্কার, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামলূকভাবে লোক নিয়োগ, বিশ্বজনীন শিক্ষা, ভূমি বন্টন ইত্যাদি নীতিতে বিশ্বাস করে। অপর দলটি সোস্যাল মডারেটস্ নামে পরিচিত। উলামা এবং অধিকাংশ অভিজাতবর্গ ও জমিদার এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা শুধু মুহাম্মদ আলী শাহের বাড়াবাড়িরই বিরোধিতা করে।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর গৃহীত শাসনতন্ত্রের ক্রোড়পত্রে সর্বপ্রথম এই দলীয় বিভক্তি দেখা যায়। জাতীয়তাবাদীগণ একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার মাশ্রুতেহ্ দাবি করে, - যাহার ভিত্তি হইবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাস করা আইনের উপর, অথচ উলামাগণ দাবি করেন মাশ্রুয়া, অবাথ মুসলিম শরীয়তের শাসন। উভয় দলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, কিন্তু তাহারা যে সমঝোতায় উপনীত হয় তাহা শাসনতন্ত্রের ক্রোড়পত্রে পরিস্ফুট হয়। এই দলিলের দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত হয় যে মজলিশে উলামাদের পাঁচজন প্রতিনিধি থাকিবেন। তাঁহাদের বিবেচনা মত কোনো আইন ইসলামের বিরোধী হইলে সেগুলির উপর তাঁহাদের প্রতিষেধক (Veto) ক্ষমতা থাকিবে। তবে দ্বিতীয় ধারা যে কখনও কার্যকরী হয় নাই তাহাতেই প্রমাণ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীগণ কখনও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে নাই।

দ্বিতীয় মজলিশের আয়ুষ্কালে এই দুই দলের বিবাদ প্রকাশ্য ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নাজাফের উলামাগণ সোস্যাল ডেমোক্রেটদিগকে সমাজচ্যুত করে, অপরদিকে

গোপনে আঞ্জুমনসমূহের সদস্য দ্বারা অনেক মডারেটগণ নিহত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের অধিকাংশ সময় মজলিশ দেশ চালাইবার জন্য অর্থ যোগাড় করিতে ব্যয় করে। তাহারা যেহেতু রাশিয়া ও বৃটেন হইতেও ঋণ গ্রহণ করিবার বিরোধী, আবার জার্মানি হইতেও ঋণ লইতে অপারগ, সেইহেতু মজলিশ অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ অনুমোদন করে। জনগণ ইহাকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে এবং মহিলাগণ টাকা প্রদান করিবার জন্য তাহাদের অলংকারাদি বিক্রয় করে।

ইতোমধ্যে মজলিশ হৃদয়ঙ্গম করে যে তাহাদের বিদেশী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। রাশিয়া ও বৃটেন হইতে এই ধরনের সাহায্য চাওয়া কল্পনাতীত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিতও তাহাদের অভিজ্ঞতা তেমন সন্তোষজনক নহে। কিন্তু আমেরিকান মিশনারিদের প্রভাব, বাস্কেরভিলের আত্মদান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নীতির ফলে স্বভাবতই পারস্যবাসিগণ এই ধরনের সাহায্যের জন্য আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মর্গান শুস্তার আরও বেশ কিছুসংখ্যক সহকারী সমভিব্যাহারে ট্রেজারার জেনারেল হিসাবে ইরানে আগমন করেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পারস্যবাসীদের মধ্যে শুস্তার খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং মজলিশের সোস্যাল ডেমোক্রেট সদস্যদের নীতির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইহা সম্ভবত বখতিয়ার ও মডারেটদিগকে হতাশ করে, কারণ তাহারা ইহা দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের মনস্থ করিয়াছিল। শুস্তার অনুভব করেন, নিয়মিত কর আদায় হইলে দেশ যথেষ্ট রাজস্বের মালিক হইবে। কোনো কোনো জমিদার কর প্রদান হইতে নিস্তার লাভের জন্য নিজদিগকে রাশিয়া ও বৃটেনের 'আশ্রিত' বলিয়া ঘোষণা করেন। ট্রেজারি বাহিনী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আর অপরদিকে মালিকগণ বিদেশী দূতাবাসগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশগণ ইহার প্রতিবাদ করে এবং দেখা যায় যে, বৃটিশগণও তাহাদের সহিত সংবেদনশীল।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রুশ সরকার শুস্তারকে বরখাস্ত করিবার জন্য পারস্য সরকারের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। অতঃপর আরেকটি চরমপত্র প্রদান করা হয়, যাহাতে বলা হয় যে, ইরান কোনো বিদেশীকে উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে চাহিলে রুশ ও বৃটিশ সরকারের অনুমতি লাগিবে। শীঘ্রই তৃতীয় চরমপত্র আসে। ইহাতে দাবি করা হয় যে, রাশিয়া ইরানে যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। বৃটিশের নিকট পারস্যবাসিগণ আবেদন জানাইলে সে শুধু রুশ চরমপত্র মানিয়া লইতেই উপদেশ দেয় নাই বরং দক্ষিণ ইরান দখল করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করে। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ রুশ ও বৃটিশ পণ্য পরিত্যাগ, বাজার বন্ধ ও যুদ্ধের মোকাবিলা দাবি করিয়া আগাইয়া আসে। বিপ্লবের মহার্ঘ সময় উপনীত হয় যখন মজলিশের সদস্যগণ একযোগে চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে।

তবে সামসাম আল সালতানেহ বখতিয়ারীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ও মজলিশ বন্ধ করিয়া দেন এবং ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর শুস্তারকে বরখাস্ত করেন। আরিফ কাজভিনী নামক এক জনপ্রিয় বিপ্লবী কবিতা রচয়িতা একটি গান রচনা করেন। শুস্তারের প্রস্থানের অনেক পরেও এই গান লোকের মুখে মুখে শুনা যায়।

"ধিক সেই অতিথি সেবকের যে তাকে অভুক্ত
অবস্থায় টেবিল হইতে উঠাইয়া দেয়,
ইহা ঘটিবার চেয়ে তোমার জীবন তাহার জন্য
কোরবানি কর
শুস্তার যদি পারস্য হইতে চলিয়া যায় তবে পারস্য
যথার্থই পরাজিত হইয়াছে
ওহ্ তুমি যদি সত্য পুরুষ হও, পারস্যকে
এইভাবে পরাজিত হইতে দিও না।"[১]

এইভাবে পারস্য বিপ্লবের এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়। উলামা ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিবাদ, জাতীয়তাবাদীদের ভিতর একতার অভাব এবং সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহা ব্যর্থ হয়। রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের হস্তক্ষেপের ফলেও ইহা ব্যর্থ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পারস্যবাসিগণ আশংকা করে যে, আঁতাত পক্ষ জয়লাভ করিলে ইরানকে নিশ্চয়ই রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে ভাগ করা হইবে। অতএব তাহারা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পক্ষ অবলম্বন করে। আঁতাত পক্ষ জয়লাভ করে, কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবের দরুন সাময়িকভাবে রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে ইরানকে বিভক্ত করা হয় নাই।

---

১. মৃত. ই. জি ব্রাউন কর্তৃক ফার্সি হইতে ইংরেজিতে অনূদিত।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জি

Adams, C.C. *Islam and Modernism in Egypt.* London : Oxford University Press, 1933.

Ahmed. Jamal M., *The Intellectual origins of Egyptian Nationalism,* New York : Oxford University Press, 1960.

Anderson, M. S., *The Eastern Question,* New York : The Macmillan Company, 1966.

Antonius, George, *The Arab Awakening : The Story of the Arab National Movement* (4th ed.), Beirut :Khyyat's 1961.

Berkes, Niyazi, *The Development of Secularism in Turkey.* Montreal : McGill University Press, 1964.

Browne, E. G., *The Persian Revolution,* London : Frank Cass, 1966.

Curzon, George. *Persia and the Persian Question.* London : Frank Cass, 1966.

Earle, Edward Mean, *Turkey, the Great Powers and the Baghdad Railway : A Study in Imperialism,* New York : The Macmillan Company, 1923.

Emin, Ahmed, *The Development of Modern Turkey as Measured by Means of its Press,* New York : Columbia University Press, 1968.

Herold. J.C. *Bonaparte in Egypt.* London : Hamilton, 1962.

Hoskins, Halford L., *British Routes to India,* New York : Longmans, Green & Co, 1928.

Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age 1898-1798* London : Oxford University Press, 1963.

Hurewitz, J. C., *Diplomacy in the Near and Middle East (Vol. I, 1535-1914),* Princeton, N.J,: D. Van Nostrand Co. 1956.

Issawi, Charles, ed, T*he Economic History of the Middle East. 1800-1914,* Chicago : University of Chicago Press, 1966.

Jach, Ernest, ed., *Background of the Middle East.* New York : Cornell University Press, 1952.

Keddie, Nikki R., *Religion and Rebellion in Iran, The Iranian Tobacco Protest of 1891-1892,* London : Frank Cass, 1966.

An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writing of Sayyid Jamal al-Din 'al-Afghani.' Berkeley, Calif : University of California Press, 1968.

Kedourie, Elie, *Afghani and 'Abduh : An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam,* London : Frank Cass, 1966.

Lendes, David S., *Bankers and Pashas, International Finance and Economic Imperialism in Egypt.* Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1958.

Daniel, *The Passing of Traditional Society : Modernizing the Middle East.* Glencoe, III : The Free Press, 1958.

Mardin, Serif, *The Genesis of Young Ottoman Thought - A Study in Modernization of Turkish Political Ideas.* Princeton, N. J. : Princetion University Press. 1962.

Marlowe, John, *Arab Nationalism and British Imperialism : A Study in Power Politics,*

London : The Cresset Press, 1961.

Puryear, Vernon J., *Napoleon and the Dardanelles*, Berkeley, Calif : Unviersity of California Press, 1951.

Ramsaur, Ernest E., *The Young Turks*, Princeton N. J. : Princeton University Press, 1957.

Rifaat, Mohammed. The Awakening of Modern Egypt. London : Longmans, Green & Co., 1957.

Saunders, J. J., ed., *The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion*, Englewood Cliffs., N. J., : Prentice Hall, 1966.

Shuster, Morgan, *The Strangling of Persia*. New York : The Century Co., 1912.

Von Grunebaum, G.E. ed., *Unity and Variety in Muslim Civilization*. Chicago : University of Chicago Press, 1955.

Yale, William, *The Near East*. Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Press, 1958.

Amin, Osman, *Muhammad Abduh* (trans. C. Wendell). Washington. D. C., : American Council of Learned Societies, 1953.

Young. C.T., ed., *Near East Culture and Society*. Princeton. N. J., : Princeton University Press, 1951.

Zeine, Zeine N., *Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism*. Beirut : Khayats. 1958.

The Struggle for Arab Independence. Beirut : Khayat's 1960.

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

নূতন তুরস্ক

প্রথম মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যোগদান করা সম্ভবত অনিবার্য হইয়া পড়ে। রাশিয়া পুরাতন শত্রু এবং অতীতের অভিজ্ঞতা তুর্কিদিগকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে তাহারা সর্বদা বৃটিশ ও ফরাসিদের উপর নির্ভর করিতে পারে না, বিশেষত তাহারা যখন রাশিয়ার মিত্র। অপরদিকে জার্মানি একটি নূতন শক্তি যাহার সঙ্গে তাহাদের কোনো তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় নাই। সাম্রাজ্যে জার্মানদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং কাইজারের সফর (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ খ্রিঃ) বেশ সৌহার্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তদুপরি সাম্রাজ্য পরিচালক ত্রিরত্ন—জামাল, আনোয়ার ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তুর্কি বিশ্বাস করে, জার্মানির আগমনের ফলে রাশিয়া ও বৃটেনের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া যাইবে।

অবশ্য যুদ্ধ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। বিভিন্ন রণাঙ্গনে তুর্কি সৈন্যদের সাহসিকতা এবং গ্যালিপুলিতে তাহাদের জয়লাভ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। জার্মানির পরাজয়ের অনেক পূর্বেই ওসমানীয়গণ পরাজয় বরণ করে। 'ধ্বংসের মুখে' কথটি সুবিবেচনামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। কারণ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মুদ্রসের সন্ধির পর মিত্রশক্তি বিশেষত গ্রেট বৃটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্য সাধন করিবে এবং কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার বিরূদ্ধে একটি কার্যকরী মধ্যরাষ্ট্র হিসাবে কাজ করিবে। 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিটি' এখনও উপকারী। ইহাকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পরিচালনাধীন হাসপাতালে জীবিত রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই তুর্কিগণ এই রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া নূতনভাবে কাজ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুর্কিদের নিকট যুদ্ধকালীন চারি বৎসরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চারি বৎসরই অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেন্ট উডরু উইলসনের বাণীই সম্বল হিসাবে থাকে, তিনি বলেন ঃ 'বর্তমান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তুর্কি অংশটুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে হইবে।' যুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫-১৯১৭ খ্রিঃ) গোপন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিত্রশক্তিবর্গ এশিয়া মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লয়। ওসমানীয় রাষ্ট্রের জন্য শুধু উত্তর আনাতোলিয়া অবশিষ্ট থাকে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। সম্ভবত ক্ষতিপূরণস্বরূপ দার্দানালিসের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রীসের নিকট হস্তান্তর করিতে গ্রেট বৃটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ফ্রান্স ও ইটালি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে রাজি হয়।

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে লইয়া পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাঁস করিয়া তাহাদের প্রাক্তন মিত্ররাষ্ট্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। তবে ইহা অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে নাই এবং তাহা ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই আগস্ট স্বাক্ষরিত সেভারসের সন্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। একমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় গোপন চুক্তি দ্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখণ্ডসমহের নূতন বিন্যাসের মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক করা হয়, কিন্তু ইস্তাম্বুল তুর্কি আধিপত্যে থাকিয়া যায়। পূর্বে, রাশিয়াকে প্রদত্ত অবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু, গণভোটের অধিকার সহকারে কুর্দদিগকে স্বায়ত্তশাসন এবং এক বৎসরের মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

ভূখণ্ডের ভাগবাটোয়ারা ছাড়াও তুর্কি সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৫০,০০০ এ সীমিত করিয়া ইহাকে মিত্রশক্তি অথবা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ সাপেক্ষ রাখা হয়। বৃটেন, ফ্রান্স ও ইটালির প্রতিনিধিত্বে গঠিত একটি অর্থনৈতিক কমিশনের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্পণ করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং তুর্কিদিগকে স্বীয় সীমান্তভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হয়। কোনো কোনে ঐতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চুক্তি তুর্কিগণ হয়ত গ্রহণ করিত যদি গ্রীকদিগকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে না হইত। গ্রীস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতাব্দী ছিল। তাহাদিগকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তুর্কিদের সহ্য করার পক্ষে অতি তিক্ত ব্যাপার। গ্রীকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুর্কিদিগকে জাগরিত করে নাই, বরং সেভারসের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া রাষ্ট্র গঠন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুর্কিদের নবজাগরণে সহায়তা করে। অবশ্য ইহার সকল কিছুই হয়ত চাপানো যাইত কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশা, পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, যিনি তুর্কিদিগকে একত্রিত করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন।

মুস্তাফা কামালের কথা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। একজন যুবক অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেসে (Committee of Union and Progress) যোগদান করেন। ১৯-৮ খ্রিস্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁহার কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কোন সময় তিনি নব্যতুর্কিদের নীতি ও কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত হন নাই যাহারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিত। ত্রিরত্নের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়, কিন্তু তাঁহাকে একপাশে ঠেলিয়া ফেলা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্যালিপুলির প্রতিরক্ষায় তিনি জাতীয় সম্মান লাভ করেন। অবশ্য যুদ্ধের শেষভাগে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মোহমুক্তি ঘটে। দুর্ঘটনাবশত নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা হয়ত জানা যাইবে না, কিন্তু ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে আনাতোলিয়ায় তাঁহাকে তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মে তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কৃষ্ণসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন। এই তারিখটি পরে সমস্ত তুরস্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়।

অবতরণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে সামনে আগত কঠিন পরাধীনতার বিষয় অবহিত করেন। বলশেভিকগণ এইসব গোপন বিষয়াদি পূর্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আরজেরুমে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এশিয়া মাইনরের প্রতিরক্ষার জন্য কমিটি গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া ওসমানীয়

পার্লমেন্টের নূতন নির্বাচন দিবার জন্য তিনি সুলতানের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। সুলতান এই কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুস্তাফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা। ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান এবং জেনারেল বাকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত। নবম বাহিনী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে। মুস্তাফা কামাল যে শক্তিশালী, সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত।

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ইস্তাম্বুলে জমায়েত হয়। বৃটিশগণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, এ ধরনের পার্লামেন্টের সহিত তাল মিলাইয়া চলা দুরূহ ব্যাপার এবং তাই তাহারা প্রতিনিধিবর্গকে বন্দী করে ও ইহাদের কিছুসংখ্যককে মাল্টায় প্রেরণ করে। সুলতান জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হন। শেখ-উল-ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ফতওয়া ঘোষণা করেন যে সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটিই ইসলামবিরোধী। পক্ষান্তরে মুস্তাফা কামাল আনাতোলিয়ার উলামাদিগকে একত্রিত করিয়া শেখ-উল-ইসলামের বিরোধী একটি পাল্টা ফতওয়া জারি করেন। নিষিদ্ধ ওসমানীয় পার্লামেন্টের স্থলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল আংকারায় গ্র্যান্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী প্রতিষ্ঠা করে।

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তুরস্কে বস্তুত দুইটি সরকার চলিতে থাকে, কিন্তু আংকারায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সরকারই অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয়। মুস্তাফা কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ইহাদের একটি হইল মিত্রশক্তির আত্মকলহ। যুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেন্টকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দারুণ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ইহা চরম শত্রুতায় পর্যবসিত হয়। তদুপরি তুরস্কে বৃটিশদের তুলনায় ফরাসিদের অনেক ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বিদ্যমান। ফরাসি মহাজনদের চিন্তা ছিল, পাছে বলশেভিকদের ন্যায় তুর্কি জাতীয়তাবাদীগণও সমস্ত ঋণ বাতিল ঘোষণা করে। ইটালিয়গণ গ্রীকদের আগমনে অসন্তুষ্ট হয়। অধিকন্তু ইস্তাম্বুলে ইটালির কমিশনার কাউন্ট ফরজা (Count Sforza) জাতীয়তাবাদীদের বিজয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ফ্রান্স ও ইটালি উভয়ে যুদ্ধে জড়িত না হইয়া যতদূর সম্ভব লাভবান হইতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে তাহারা বৃটিশদের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এইভাবে অর্থনৈতিক অনুমতিপত্রের বিনিময়ে তাহাদের এলাকা ছাড়িয়া দিয়া ইটালি ও ফ্রান্স মুস্তাফা কামালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়।

মুস্তাফা কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবত সোভিয়েত ইউনিয়ন। বলশেভিকদের মার্ক্স মতবাদীগণ পূর্ব ঘোষিত সর্বহারার বিপ্লবের জন্য ইউরোপের দিকে তাকাইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক 'এশিয়া প্রথম' -এর সমর্থক বিদ্যমান ছিল, যাহারা ইরান ও তুরস্কের প্রতি দৃকপাত করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বলশেভিকগণ জার-রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিকগণ মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। অনেকে এতদূর পর্যন্ত বলে যে তুরস্কের লাল পতাকা ও রাশিয়ার লাল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। মুস্তাফা কামাল কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত তাল মিলাইয়া চলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি কমিউনিস্ট শেফি দেগমার সোস্যালিস্ট ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস পার্টি (Socialist Workers and Peasants Party) প্রতিষ্ঠা করেন যাহা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি হইয়া যায়।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে কার্যকরী সংসদে একজন তুর্কি অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল তুরস্কের অবস্থা স্বীয় আয়ত্তাধীন করিবার পর কমিউনিস্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং দেগমারসহ অনেককে কারারুদ্ধ করেন।

বলশেভিকগণ তাহাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এবং তাই মুস্তাফা কামালকে সামরিক সাহায্য দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু লেনিনের সরকারের সহিত বন্ধুত্ব থাকিবার ফলে তুর্কিদের মনোবল দৃঢ় থাকে এবং ইহা তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। জেনারেল কাইয়াজিম বাকেরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাত হইতে কার্স অধিকার করিলে বলশেভিকগণ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্স, আর্দাহান এবং এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তুর্কিদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই মার্চ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেন।

গ্রীক-তুর্কি যুদ্ধ

গ্রীকগণ ছিল বৃটিশের পদলেহী। জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচি বানচাল করিবার জন্য তাহারা বৃটিশের অনুচর হিসাবে কাজ করে। তদুপরি তাহাদের পুরাতন শত্রু তুর্কিগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রীকগণ অতি প্রফুল্ল হয়। এই পরাজয়ে তাহারা এশিয়া মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিরাট সুযোগ দেখিতে পায় এবং সম্ভবত বাইজেন্টাইনদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ইস্তাম্বুলের আধিপত্য লাভের স্বপ্নও দেখে। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে গ্রীকগণ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্মারনায় অবতরণ করে।

মুস্তাফা কামালের প্রবল বাধার সম্মুখে ওসমানীয় রাষ্ট্রকে শাসন করিবার বৃটিশ পরিকল্পনা ধুলিসাৎ হইয়া যায়। এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করিবার পর বৃটিশ জনগণের একটা অংশ তুরস্কে জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে। তদুপরি ইংল্যাণ্ডের পরিচিত্ত ও উদার জনমত এই আত্মনিয়ন্ত্রণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমর্থন করে নাই। এই অবস্থায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাত্র করণীয় কাজ হইল মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে গ্রীকদিগকে সাহায্য করা। গ্রীকরাও এই ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠে।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে গ্রীক সেনাবাহিনী স্মারণা হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথমদিকের রাজধানী ব্রুসা তাহারা অধিকার করে। এইসব বিজয় সহজে লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের পূর্বে তাহারা আর একটি আক্রমণ পরিচালনা করিবার সময় পায় নাই। পুনরায় তাহারা সফলতা লাভ করে এবং আঙ্কারার নিকটবর্তী কুতাইয়া দখল করে। গ্রীক অগ্রগতির প্রথম বাধা আসে সাফারিয়ার যুদ্ধে (২৪শে আগস্ট-১৬ই সেপ্টেম্বর)। এক বৎসর পর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তুর্কিগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণে তাহারা সম্মুখের সবকিছু ভাসাইয়া চলে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রীকদিগকে তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। উভয় পক্ষেই অত্যাচার চলে। পশ্চাদপসারণের সময় গ্রীকগণ অত্যাচার করে এবং স্মারণা দখলের পর তুর্কিগণও ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রীক স্বপ্ন ধুলিসাৎ হয় এবং মুস্তাফা কামাল ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হন।

ল্যুজ্যানের চুক্তি

জাতীয়তাবাদীদের হাত হইতে প্রণালী রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশকে সাহায্য করিতে লয়েড জর্জ তাঁহার প্রাক্তন মিত্রদের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও ইটালি প্রণালী হইতে তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে। গ্রেট বৃটেনের তখন যুদ্ধ করিবার মতো অবস্থা নাই এবং সৌভাগ্যবশত মুস্তাফা কামাল পশ্চিমা শক্তিবর্গকে খোঁচাইতে চান নাই। ফলে মুদাইনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদনুসারে পূর্ব থ্রেস ও আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং মুস্তাফা কামাল প্রণালীর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন।

ততদিনে সেভার্সের চুক্তি কার্যহীন হইয়া পড়ে। একটি দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ল্যুজ্যানে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিবদমান প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশের লর্ড কার্জন এবং তুরস্কের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত। দাম্ভিক কার্জন তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নারাজ, অপরদিকে ইসমত পাশা অনুভব করেন যে অবস্থা তাঁহার অনুকূলে এবং তাই তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। প্রধান বিষয়াদি হইল তৈল সমৃদ্ধ মৌসুল প্রদেশ যাহা তুর্কিগণ দাবি করে এবং উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নীতি যাহা লর্ড কার্জন ছাড়িতে রাজী নহেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত হয় এবং পুনরায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। এই সময় লর্ড কার্জন উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্মেলনে ল্যুজ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তুরস্ককে সমগ্র এশিয়া মাইনর, প্রণালী ও পূর্ব থ্রেসের মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাতিল করা হয়। জাতিপুঞ্জের আওতায় প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়ারম্যান একজন তুর্কি হইবেন বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনাবাহিনীমুক্ত করা হয় কিন্তু তুরস্ককে ইস্তাম্বুলে ১২০০ সৈন্য রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুলের গ্রীক অধিবাসী এবং পশ্চিম থ্রেসের তুর্কিগণ ছাড়া তুর্কি ও গ্রীকগণ লোক বিনিময়ে সম্মত হয়। মৌসুল প্রশ্নটি জাতিপুঞ্জের এখতিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চারি বৎসরের ধৈর্য, আত্মদান, কূটনীতি ও যুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার সহকারিগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেন। কামালী তুরস্ক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু ইহা অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

তুর্কি সংস্কারসমূহ

মুস্তাফা কামালের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাই শেষ নহে বরং একটি নূতন তুরস্ক গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে তুর্কিদিগকে সুযোগ প্রদানের একটি পন্থা মাত্র। ইহা জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী সংস্কারের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের প্রবর্তিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মসূচি তাঞ্জিমাত হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক তুর্কি বুদ্ধিজীবী সংস্কারক প্রস্তাব করেন ও আলোচনা করেন। মুস্তাফা কামাল যে মৌলিক ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা নহে বরং তাঁহার অবদান হইল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলি ভাবধারা হইতে একটি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নব্য ওসমানীয় নহেন বরং একটি নব্য-তুর্কি শিশু এবং প্যান তুর্কির তুলনায় তিনি একজন সাধারণ তুর্কি। তাঁহার তুর্কিকরণের ভাবধারা অতুর্কিদের উপর তুর্কি ভাষা ও সংস্কৃতি চাপাইয়া দেওয়া নহে বরং তুর্কি ভাবধারা এমনকি অ-তুর্কি অঞ্চল ও লোকজন হইতে মুক্তি লাভ করা।

এই ভাবধারার কিছু কিছু প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকাল্প (১৮৭৬-১৯২৪) সামঞ্জস্য বিধান করেন। মুস্তাফা কামালসহ অনেক তুর্কি জাতীয়তাবাদী তাঁহার রচনায় প্রভাবান্বিত হন। গোকাল্প্ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আলাদা করেন এবং তুর্কি জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গাঁথিয়া লইবার" প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে বিগত সংস্কারকদের গলদ হইল পাশ্চাত্যের সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের সভ্যতার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। গোকালপের মতানুসারে সভ্যতাসমূহ একটি অপরটির তুলনাহীন বলিয়া এইগুলি মিশিয়া যায় না। তুর্কিদের কর্তব্য হইল প্রাচ্য সভ্যতা হইতে মুক্ত হওয়া, তুর্কি সংস্কৃতি পুনর্জীবিত করা এবং তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গাঁথিয়া ফেলা। গোকাল্পের নিকট তুর্কি সংস্কৃতি হইল কিছুটা আদর্শ গ্রাম্যরীতি, ইসলাম এবং কিছুটা আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণ, তবে এইগুলি তুর্কি ভাষার মাধ্যমে। ধর্মীয় ব্যাপারে তুর্কিবাদ হইল তুর্কি ভাষায় কোরআন তেলাওয়াত করা, আযান দেওয়া ও নামাজ পড়া। আইনগত দিক হইতে ইহা দ্বারা আধুনিক আইন প্রবর্তন করা বুঝায় এবং নৈতিকতার দিক হইতে ইহা দ্বারা বুঝায় তুর্কিদের প্রাচীন যুগের 'গণতন্ত্রে' ফিরিয়া যাওয়া। তুর্কিবাদকে বলা হয় একটি "বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন", কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। অবশ্য তুর্কিবাদ "আমাদের মহান মুস্তাফা কামালের ... পিপ্লস পার্টিকে" সমর্থন করে, কারণ তিনি "দেশকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষাকে প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন ..." অর্থাৎ তুর্কি নামে। গোকাল্প্‌কে শেষের দিকে তুর্কি জাতীয়তাবাদের দার্শনিক বলা হয়, যে জাতীয়তাবাদের রূপদানকারী ও উৎসাহদাতা হইলেন কামাল আতাতুর্ক।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসে সম্মেলন আহ্বানকারী পূর্ব এশিয়া মাইনর প্রতিরক্ষা কমিটি (Committee for the Defence of Fastern Asia Minor) ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্রমশ পিপল্স পার্টি বা হাক ফিরকাশি (Halk Firkasi) -তে রূপান্তরিত হয়। এই দল ছয় দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে, যাহাকে 'কামালের ছয় নীতি' বলা হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এইগুলিকে তুর্কি শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। অবশ্য এই ছয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমস্ত সংস্কার এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া প্রবর্তন করা হয়। এইসব নীতি হইল ঃ

১। প্রজাতন্ত্রবাদ, যাহা জনগণের সার্বভৌমত্ব সূচনা করে।
২। জাতীয়তাবাদ, যাহা তুরস্ককে তুর্কিদের বলিয়া দাবি করে এবং অ-তুর্কি জনগণ সংবলিত অঞ্চলসমূহের উপর ইহাদের আধিপত্য অস্বীকার করে।
৩। জনগণবাদ, যাহা মিল্লাত প্রথা বাতিল করে এবং আইনের চোখে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের সমতা ঘোষণা করে।
৪। রাষ্ট্রবাদ, যাহা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গঠনমূলক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।
৫। ধর্মনিরপেক্ষতা, যাহা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠা করে।
৬। সংস্কারবাদ, যাহা জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্য ও দৃষ্টান্ত পরিবর্তন ও ছাঁটাই করিবার একাগ্রতার উপর জোর দেয়।

এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভয়াবহ গোলযোগ, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও উপরের নীতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। অধিকন্তু এইসব নীতি ও অন্যান্য সংস্কারসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্য সভ্যতার

পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুর্কিগণ প্রাচ্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নিজদিগকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে চেষ্টা করে।

ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য করিবার নীতি প্রত্যাখ্যান করে, তাই ইহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং সমস্ত কার্যাবলীকে স্বীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা হজ্ব নহে, বরং সরকার ও বাণিজ্য, শান্তি ও যুদ্ধ, যৌন বিষয়াদি, বিবাহ ও তালাক এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছদ, কোরআন ও হাদিস অথবা রীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা নিয়মিত এবং প্রায় অবশ্য পালনীয়। ফলে আলোচ্য সংস্কারগুলির প্রত্যেকটির সহিত ইসলামের সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু পর্যন্ত তুরস্কের সরকার ও জনগণের প্রধান কার্যাবলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া নূতন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১। **সুলতানাত বিলুপ্তি :** গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এবং বৃটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে। আতাতুর্কের অন্তরে সম্ভবত সুলতানের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম হইতেই, কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসের সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ সুলতানের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি মিত্রপক্ষের হাতে 'বন্দী'। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসেও এমনকি শেখ-উল-ইসলাম কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করিবার পরও আংকারার হাজী বৈরাম মসজিদে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এসেম্বলী সুলতানের 'পবিত্র' আত্মার জন্য মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও তাহারা জনসাধারণকে 'বন্দী' হইতে সুলতানকে 'উদ্ধার' করিতে বলে। এইসব মন্তব্য সম্ভবত সুলতানের কপট নিরাপত্তার জন্য প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও এইগুলির মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইল আংকারার জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামনা করে নাই, বরং একটি শাসনতান্ত্রিক সুলতান আশা করিয়াছিল। এমনকি সুলতান ও তাঁহার পরিবার একটি বৃটিশ জাহাজে করিয়া নির্বাসনে যাইবার সময়ও তাঁহার চাচাত ভাই আবদুল মজিদকে খলিফা বলিয়া ন্যাশনাল এসেম্বলী তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করে।

২। **খিলাফতের বিলুপ্তি :** সুলতানাতের বিলুপ্তির দ্বারা অনেক তুর্কি দুঃখিত হয়, কিন্তু খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের সুন্নি মুসলমানগণ মর্মাহত হয়। এই সিদ্ধান্তও অতি সাবধানে লওয়া হয়। আতাতুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন এবং আংকারায় উলামাদিগকে এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সিভাসে প্যান ইসলামী সম্মেলন আহ্বানও তিনি নীরবে অনুমোদন করেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলী সদস্যদের এক-পঞ্চমাংশ ছিল উলামা। আতাতুর্কের সহচরদের অনেকেই একটি উদার ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে আতাতুর্ক সম্ভবত মনে করেন যে রাষ্ট্র ইসলামী হইলে উদার হইতে পারে না। তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও সুলতান আবদুল মজিদ অভিন্ন। সর্বদা ইহা অভিন্নই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমতা ছাড়া খিলাফতের পদ বিধিবিরুদ্ধ। প্রশ্নটি এসেম্বলীতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ খলিফার

পদ বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমানের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে তুরস্ক হইতে বহিষ্কার করা হয়। ওসমানীয়গণ ৬২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। খিলাফত প্রতিষ্ঠানটি অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা হয় নাই।

৩। **ইসলামী আইনের বিলুপ্তি ঃ** সুলতানাত ও খিলাফতের বিলুপ্তির দ্বারা সাধারণ তুর্কিদের দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। অবশ্য খিলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলি সুদূরপ্রসারী সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয় যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং সমস্ত দেশকে আন্দোলিত করে। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল ইসলামী আইন বা শরিয়তের বিলুপ্তি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের বিচার সংক্রান্ত সংস্কার ধর্মীয় বিচারালয়সমূহকে বাদ দিয়া তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইটালীয় দণ্ডবিধি চালু করে। এই বিধির ফলে উলামাগণ অকেজো হইয়া যান। আইন ব্যবসায়ে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। একমাত্র যাঁহারা পাশ্চাত্য আইন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বস্তুত ইসলামী আইন শিক্ষার সমস্ত বিদ্যালয়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিভাগ এত ছোট হইয়া যায় যে ইহাকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। শেখ উল-ইসলামের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে প্রধানমন্ত্রীর পদের সহিত দুইটি সংস্থা সংযুক্ত করা হয়। এই সংস্থাগুলির কাজ হইল সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনা করা। উহাদের একটির নাম ধর্মীয় কার্যাবলী সংস্থা (Bureau of Religious Affairs)। ইহা ধর্মপ্রচারকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করে, ধর্মীয় ভাষণ পরীক্ষা করে এবং শরিয়তের বিভিন্ন দ্বিমতের উপর উপদেশ দান করে। দ্বিতীয়টির নাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্থা (Bureau of Religious Foundation) বা আওকাফ। ইহা ধর্মীয় দান সম্পত্তি পরিচালনা করে।

ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন চালু করা হয় এবং সম্ভবত কিছু সংখ্যক নেতা ইহার দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাকে ধর্মীয় মনোভাব হইতে পরিবর্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দিকে ফিরাইবার আশা করেন। সরকারি নীতি হিসাবে ধর্মতন্ত্রকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করা হয় নাই বরং জাতির ধর্মীয় স্বভাবকে পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক বলেন, "আমরা এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি" এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে "বাঁচিবার একমাত্র উপকরণ" বলিয়া মনে করি।

৪। **ইসলামী পঞ্জিকার বিলুপ্তি ঃ** যে বৎসর শরিয়ত বাদ দেওয়া হয় সেই একই বৎসর (১৯২৬) মুসলিম পঞ্জিকার পরিবর্তে খ্রিস্টান পঞ্জিকা চালু করা হয়। বহু বৎসর ধরিয়া বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম চান্দ্র তারিখ এবং পশ্চিমা সূর্য তারিখ উভয়ই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় তারিখগুলি মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে সম্পন্ন হইত। তবে রাষ্ট্র পাশ্চাত্য পঞ্জিকা প্রবর্তন করে এবং নাগরিকদিগকে সর্বতোভাবে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দেশ প্রদান করে। প্রাচ্য হইতে দূরে সরিতে এবং পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ হইবার পক্ষে ইহা আরেকটি পদক্ষেপ। পঞ্জিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজধানীও পরিবর্তন হয়। নূতন মনোভাবের পক্ষে ইস্তাম্বুল অতি ওসমানীয় এবং 'বিদেশী'। আংকারা আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে 'প্রকৃত' তুর্কিদের বাস। ইস্তাম্বুলে অসংখ্য মসজিদ স্থাপিত হয় নাই। তদুপরি আংকারা শহর একটি কৃষিপ্রধান জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া সরকারি কর্মকর্তাগণ ওসমানীয়দের ন্যায় চতুর্দিকে বসবাসকারী তুর্কি চাষীদিগকে অবহেলা করিতে পারে না।

৫। আরবি বর্ণমালার বিলুপ্তি ঃ প্রাথমিক যুগের দিগ্বিজয়ীদের আশানুরূপ বিভিন্ন ভাষাভাষি মুসলমানগণ আরবি ভাষা গ্রহণ না করিলেও আরবি বর্ণমালা গ্রহণ করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শব্দ না বুঝিলেও কোরআন পড়িতে পারা। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি এসেম্বলী আরবি বর্ণমালার স্থলে তুর্কিভাষার প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন করে। আতাতুর্ক তুর্কি ভাষায় কোরআন অনুবাদ করিয়া নূতন বর্ণমালায় তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। তিনি তুর্কি ভাষায় আযান দিতেও আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুর্কি ভাষায় নামাজ পড়াইবার চেষ্টা করেন। সমস্ত মুসলমানদিগকে তুর্কি ভাষায় নামাজ পড়াইতে তিনি পারেন নাই; কিন্তু বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নূতন বংশধরগণ আরবি ভাষায় কোরআন পড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে। শুধু অত্যন্ত খাঁটি মুসলমানগণ তাহাদের সন্তানদিগকে আরবি বর্ণমালা শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করে।

বর্ণমালা পরিবর্তনের পিছনে জনসাধারণকে কোরআন তেলাওয়াত বিমুখ করিবার কোনো উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না। তিনি নিরক্ষরতা দূর করিতে চান এবং একটি সমন্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তুর্কি ভাষা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। তিনি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন তুর্কির পক্ষে লাতিন বর্ণমালার মাধ্যমেই সহজে লেখা-পড়া শেখা সম্ভব। তিনি এবং এসেম্বলীর সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে এক একটি কাল বোর্ড লইয়া গ্রামে ও শহরে যান এবং প্রমাণ করেন যে মাধ্যম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ নূতন বর্ণমালা উদ্ভাবনের ফলে বিঘ্নিত হয়, কিন্তু তবুও ইহা কার্যকর হয়। এই প্রথমবারের মতো সর্বত্র তুর্কিগণ বুঝিতে পারিল একটি শব্দ কিভাবে লিখিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৬। উপধি বিলুপ্তি ঃ বে, পাশা ইত্যাদি উপাধি প্রচলন জনগণবাদ নীতির বিরোধী, যে নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওসমানীয় যুগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করা হইত এবং ইহা একটি মিথ্যা শ্রেণীবিভেদ সৃষ্টি করিত। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হয় এবং তুর্কিদিগকে পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কোনো দুই পরিবারকে একই নাম গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না, তবে যদি প্রথম গ্রহণকারী অনুমতি দেয় তাহা হইলে সরকার কোনো আপত্তি করে না। অনেককে খাঁটি তুর্কি নাম গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই মুস্তাফা কামালকে এসেম্বলী আতাতুর্ক বা জাতির পিতা নাম প্রদান করে।

৭। পুরুষদের তুর্কি পোশাক বিলুপ্তি ঃ রাশিয়ার প্রসিদ্ধ পিটারের ন্যায় আতাতুর্ক তাঁহার পাশ্চাত্যকরণ কর্মসূচির মধ্যে তুর্কিদিগকে ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করিতে বাধ্য করেন। নিঃসন্দেহে উভয় জননেতা মনে করেন যে, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তনের দ্বারা একজন লোকের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন হইতে পারে। কোনো লোকের ইউরোপীয় টুপি পরিধান তাহার ইউরোপীয় ভাবধারা প্রকাশের ক্ষেত্রে সহায়কও হইতে পারে। তুর্কিদিগকে ফেজ পরিধান করিবার অনুমতি প্রদান করিলে তাহারা হয়তো ইউরোপীয় কোট ও ট্রাউজার পরিধান করিতে আপত্তি করিত না কিন্তু আতাতুর্ক হ্যাট (ইউরোপীয় টুপি) পরিধানের উপর জোর দেন। তুর্কিগণ হয়তো ভুলিয়া গিয়াছিল যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতার চিহ্ন হিসাবেই ফেজ প্রবর্তন করা হয়। অবশ্য ফেজ এককভাবে মুসলিম রীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু হ্যাট তাহা নহে। নামাজের সময় মুসলমানগণ মস্তক আবৃত করে।

নামাজের একটি ভঙ্গি যেহেতু প্রণত হওয়া এবং কপাল মাটিতে স্পর্শ করা তাই ইউরোপীয় হ্যাট সমস্যা সৃষ্টি করে। কিন্তু তুর্কিগণ অভ্যাস পরিবর্তন করে; বিশ্বাসীগণ টুপি ছাড়া নামাজ পড়িবার অভ্যাস করে অথবা হ্যাট পিছনের দিকে দিয়া নামাজ পড়ে।

৮। **পর্দা বিলুপ্তি ঃ** কোনো বিনম্র মহিলা কোরআনের নির্দেশ মোতাবেক চলিতে চাহিলে তাহার পোশাক হইবে মোটামুটি একটি রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মচারিণীর ন্যায়। যে পর্দা মহিলাদের মুখমণ্ডল আবৃত করে তাহার মূল কোথায় কেহ জানে না। কিন্তু যদিও ইহা অ-কোরআনী তবুও এই রীতি ইসলামের বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সর্বত্র পালন করা হয়। নারীদের মুক্তিদানের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে এই পর্দা উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তুর্কি মহিলাগণ জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে তাহাদিগকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়। বহুবিবাহ প্রথা বিলোপ করা হয় এবং শীঘ্রই মহিলাদিগকে শিক্ষিকা, উকিল, ডাক্তার, কেরানি এবং এমনকি গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলীর সদস্য হিসাবেও দেখা যায়।

৯। **মক্তব বিলুপ্তি ঃ** ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা উলামানের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রত্যেক মসজিদের সহিত সাধারণত একটি বিদ্যালয়ও থাকিত। ছোট ছোট শহরে মসজিদগুলি বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এইগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ এবং ইসলামের মূল রীতিনীতিগুলি পালন করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া। যাহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চাহিত তাহারা ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঞ্জিমাত আন্দোলনের সময় হইতে ইউরোপীয় ধরনের বিদ্যালয় গড়িয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলির সংখ্যা ছিল খুবই কম। প্রজাতন্ত্রের সময় উলামাদের নিকট হইতে শিক্ষা ছিনাইয়া লওয়া হয়। সরকার পাশ্চাত্য ধরনের বিদ্যালয় নির্মাণ করে এবং শিক্ষাকে সার্বজনীন ও অবৈতনিক বলিয়া ঘোষণা করে। শিক্ষা অবৈতনিক করা সহজ হয় কিন্তু বিশ্বজনীন করিতে কয়েক যুগ লাগিবে।

১০। **সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে শুক্রবার বিলুপ্তি ঃ** ইহা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে করা হয়। ইহার যুক্তি ছিল ধর্মতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। যুক্তি দেওয়া হয় যে, মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি প্রধান ধর্ম, ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলামের উদ্দেশ্য একই, অর্থাৎ সপ্তাহে একদিন বিশ্রামের জন্য রাখা। ইহুদিদের শনিবার, খ্রিস্টানদরে রবিবার এবং মুসলমানদের শুক্রবার নিছক দৈবাৎ মাত্র এবং প্রধান বিষয়ের সহিত ইহার কোনো মিল নাই। তদুপরি পাশ্চাত্যের সমস্ত জাতিগুলির বিশ্রামের দিন রবিবার হওয়ায় এবং তুর্কিদেরও ইউরোপীয় হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকায় তাহাদেরও রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসাবে লওয়া উচিত। আরও উল্লেখ করা হয় যে শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসাবে লওয়ার মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতিরও সম্ভাবনা। তুরস্কের অধিকাংশ ব্যবসা ইউরোপের সহিত, যাহারা রবিবারে ব্যবসা বন্ধ রাখে। তুরস্ক যদি শুক্রবারের উপর জোর দেয় তবে সপ্তাহে তাহাদের তিন দিন ক্ষতি হয়, কারণ মাঝখানে পড়িয়া শনিবারও বাদ যায়। তুরস্ক অত দিন ক্ষতির কল্পনা করিতে পারে না। সমস্ত মুসলিম দেশের মধ্যে তুরস্কই একমাত্র দেশ যেখানে শুক্রবার জাতীয় ছুটির দিবস নহে।

১১। **অ-তুর্কি শব্দের বিলুপ্তি ঃ** তুর্কি ভাষা প্রচুরভাবে আরবি ও ফার্সি হইতে শব্দসম্ভার ধার করে। তুর্কি লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণ এই দুই ভাষায় যথেষ্ট লেখেন এবং কথা বলেন। জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ তাহাদিগকে বুঝিত না কারণ তাহারা আরবি ও ফার্সি জানিত না। জনগণের নিকট পৌছিবার খাঁটি আগ্রহ লইয়া এবং একটি বোধগম্য জাতীয়তাবাদের

চাপে জাতীয়তাবাদীগণ যতদূর সম্ভব আরবি ও ফার্সি শব্দ বাদ দিয়া তদস্থলে 'তুর্কি' শব্দ ব্যবহার করে। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র-পত্রিকাগুলি এইসব শব্দের তালিকা প্রকাশ করে। অনেক ক্ষেত্রে তুর্কি প্রতিশব্দ না থাকিলে আরবি ও ফার্সি শব্দের স্থলে ইউরোপীয় শব্দ ব্যবহার করে। একই উৎসাহে তাহারা অনেক স্থানের নামও পরিবর্তন করে, যথা-ইজমিরের স্থলে স্মারণা এবং ইদির্নের স্থলে আদ্রিয়ানোপল।

গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে যাহা পরবর্তী বৎসরগুলিতে তুর্কি প্রজাতন্ত্রকে বিষম সমস্যায় ফেলে তাহা হইল অর্থনীতির ক্ষেত্রে। উপরোল্লিখিত সংস্কারগুলির কোনোটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ ছিল আরও জনপ্রিয়হীন। ওসমানী যুগে লোক বিনিময় এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আর্মেনিয়দের একচেটিয়া দেশ ত্যাগের ফলে প্রজাতন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর অভাব দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া উঠে।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে ফরাসি বিশেষজ্ঞগণ সরকারকে অর্থনীতি জীবনের সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ দেয়। কৃষিকার্য, শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ, বাণিজ্য ও আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করিবার জন্য নূতন নূতন ব্যাংক খোলা হয়। পরিকল্পনার সমস্ত দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং তামাক, লবণ, মাদক দ্রব্য, দিয়াশলাই, তাস, গোলাবারুদ ইত্যাদিতে সরকারের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়, কারখানাসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ ও ব্যবসায় উৎসাহ প্রদান করা হয়। ক্রমশ রেলপথ জাতীয়করণ করা হয়। এইগুলির উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাধীন করা, এবং এইগুলি করিতে যাইয়া তুর্কিদিগকে অনেক পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ করিতে হয়।

ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক এই সংস্কারসমূহ সহজে সাধিত হয় নাই। আতাতুর্কের ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার দ্বারা না হইলে এইগুলি করা কিছুতেই সম্ভব হইত না। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্র ঘোষণা করা হয় এবং সার্বভৌমত্ব জনগইেণর নিকট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে আতাতুর্ক ছিলেন এমন এক স্বেচ্ছাচারী যাঁহার কথাই ছিল আইন। তাঁহার কোনো কোনো সহকর্মী তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। আবার কেউ কেউ তাঁহার কতিপয় সংস্কারের উপর আপত্তি উত্থাপন করেন। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক ধরপাকড়ে ইহাদের কেউ কেউ প্রাণ হারান এবং গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নায়ক জেনারেল কাইয়াজিম বাকের এবং ঔপন্যাসিক ও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণী সম্ভবত প্রথম তুর্কি নারী হালিদা আদিব প্রমুখ নির্বাসিত হন। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে আতাতুর্কের পিপলস্ পার্টি জয়লাভ করিলে কতকটা উৎসাহিত হইয়া এবং কতকটা আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি এক বক্তৃতা দান করেন, যাহা ছয়দিন পর্যন্ত চলিতে থাকে। "১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মে আমি সামসূনে অবতরণ করি" বলিয়া তিনি আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন এই বলিয়া "আমাদের জাতি মরিতে পারে না, কখনও যদি এইরূপ হয় তবে বিশ্ব এই শবদেহ বহন করিতে ব্যর্থ হইবে।"

আতাতুর্ক একজন উপকারী স্বেচ্ছাচারী, যিনি কখনও দেশ ও জাতি হইতে পৃথক নহেন। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দাতার ন্যায়। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে একটি বিরোধীদল গঠন করিতে বলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পিপলস্ পার্টি একমাত্র দল হিসাবে বিরাজ করে, তবে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ জন স্বাধীন সদস্য নির্বাচিত হন। ক্ষমতা প্রয়োগ ছাড়া সংস্কার সাধন ব্যর্থ হইত। আতাতুর্কের স্বেচ্ছাচারিতা যে

কার্যকর তাহার প্রমাণ এই যে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন মতামতের সুযোগ দেওয়া হইলে অধিকাংশ সংস্কার বাতিল হইয়া যায়। অবশ্য ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের অবাধ নির্বাচনের পর অধিকাংশ সংস্কার বহাল রাখা হয়।

বৈদেশিক নীতিতে তুরস্ক সাবধানী ও শান্তিপূর্ণ ভাবধারা গ্রহণ করে। রাশিয়ার সহিত ইহার সম্পর্ক সঠিক থাকে, তবে কমিউনিজমের বিষয় লইয়া তাহারা পৃথক হইয়া যায়। আতাতুর্ক পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ থাকেন। মৌসুল প্রশ্নে তাঁহাকে আপোস করিতে হয়। মৌসুলের উপর আধিপত্য ছাড়িয়া দিবার বিনিময়ে তুরস্ককে প্রাপ্যাংশের শতকরা দশভাগ প্রদান করা হয়। ভূমধ্যসাগরের আলেকজান্দ্রাতা (ইসকান্দরুন) বন্দরের ব্যাপারে ফরাসিদের সহিত মত বিনিময়ে তিনি সফল হন; ফরাসিগণ সিরিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও এই বন্দর তুরস্ককে ছাড়িয়া দেয়। প্রণালীর প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত তুরস্কের সন্তুষ্টি মাফিক মীমাংসা করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জুলাই মন্ত্রু সম্মেলন (Montrue Convention) ডাকা হয় এবং ইহাতে সোভিয়েত ইউনিয়নও অংশগ্রহণ করে। হিটলারী ভূত এবং তাহার সহিত মুসোলিনির ক্রমবর্ধমান বন্ধুত্বের ফলে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তুরস্কের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিতে উদ্বুদ্ধ হয়। শান্তির সময় এবং যে যুদ্ধে তুরস্ক নিরপেক্ষ সে সময় প্রণালীতে সবার জন্য অবাধগতি। তুরস্ক যুদ্ধে জড়িত হইলে সে সময় শুধু তুরস্কের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির জাহাজের জন্য প্রণালীর গতি অবাধ। এইগুলির চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য আইনগুলি হইল আন্তর্জাতিক প্রণালী কমিশন (International Straits Commission) বিলোপ, যদ্বারা তুরস্কের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুর্কিদিগকে প্রণালী সামরিকীকরণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

আতাতুর্ক ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর ক্যান্সার রোগে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু হয় অপরিণত বয়সে এবং তাহা হয় অতি পরিশ্রম, অতিমাত্রায় মদ্য পান এবং উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপনের ফলে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর তিনি একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। কৃতজ্ঞ জাতি তাঁহার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোক প্রকাশ করে। ৫০০ বৎসরের মধ্যে প্রায়-প্রথমবার কোনো রক্তপাত ছাড়া শাসনতন্ত্রে বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী একজন উত্তরাধিকারী ইসমত ইনুনুর নিকট তুরস্কের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মিসর—স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কয়েক মাস পর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর গ্রেট বৃটেন প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে, মিসর গ্রেট বৃটেনের আশ্রিত রাজ্য এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কোনো অধিপত্য ইহার উপর নাই—যুগ যুগ ধরিয়া ইহা বাস্তব হিসাবেই প্রতীয়মান হইতেছিল। অবশ্য মিসরের উপর ওসমানীয়দের আধিপত্য ছিল খুবই মামুলী। গ্রেট বৃটেনের সৌভাগ্যবশত বৃটিশবিরোধী খেদিভ আব্বাস হিলমী তখন ইস্তাম্বুলে ছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয় এবং তাঁহার চাচা হোসাইন কামিলকে তাঁহার স্থলে বাছিয়া লওয়া হয়। নূতন শাসককে আর খেদিভ বলা হয় না, বরং 'সুলতান' পদে উন্নীত করা হয়।

মিসরে তাহাদের কার্যাবলীর উপর বৃটিশ গর্ব করে। দুর্যোগপূর্ণ একটি দেশে তাহারা শান্তি স্থাপন করে এবং দেউলিয়া একটি জাতিকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। মিসরীয়দিগকে তাহারা একটি সুযোগ্য শাসনব্যবস্থাও প্রদান করে। কিন্তু সেখানে ব্যর্থতাও বিদ্যমান এবং নব্য মিসরীয়গণ শুধু সেইগুলিই দেখে। সুযোগ্য শাসনব্যবস্থার সহিত খাপ খাইবার জন্য মূলত কোনো সামাজিক পরিবর্তনই আনয়ন করা হয় নাই। তুর্কি-মিসরীয়গণ তখনও শাসক শ্রেণী। অধিকাংশ জমির মালিক তাহারা এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনরাই। ফালাহীন বা কৃষকগণ তখনও কুঁড়েঘরে বাস করে, কর প্রদান করে এবং বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদান করে। উলামাদের প্রচারকৃত ধর্মীয় আইনে গরিবদের জীবিকার সংগ্রাম অথবা ধনীদের অলস জীবন সম্পর্কে কোনো উল্লেখই নাই বলিয়াই মনে হয়। ব্যাংক, ব্যবসা, জাহাজ চলাচল এবং অর্থনীতি বিদেশী বৃটিশ, ফরাসি, ইটালীয়, গ্রীক, আর্মেনীয় ও অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণে, যাহারা তাহাদের বিদেশি পাসপোর্টের দ্বারা উপভূম্যাধিকারী সুবিধা ভোগ করে। এবং কোনো অনিশ্চয়তা ব্যতিরেকে সমস্ত সুযোগ লাভ করে। বস্তুত বৃটিশ সরকার সেখানে ছিল শুধু তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য।

মিসর তুলনামূলকভাবে উন্নতশীল ও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে এবং যতই ইহা অনুরূপ হয় ততই বৃটিশ তাহাদের ক্ষমতা ত্যাগ করিতে নিরুৎসাহ হয়। সুখ্যাত বৃটিশ কমিশনার লর্ড ক্রোমার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মিসরীয়দের ব্যাপারে কৃপামূলক মনোভাব পোষণ করেন এবং বলেন যে, তাহাদের (মিসরীয়দের) মধ্যে দায়িত্ব এড়াইবার ভাব বিদ্যমান এবং মিসরের প্রশাসনের ব্যাপারে তাহাদের উপর আস্থা রাখা যায় না। ক্রোমারের সময় শাসনব্যবস্থা সুদক্ষ পিতৃসুলভ এবং ন্যায়পরায়ণ থাকে। তবে তাঁহার উত্তরাধিকারী গর্স্ট্ ও কিচেনার তাঁহাদের যোগ্যতা বা ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা মিসরীয়দিগকে মোহিত করিতে ব্যর্থ হন। ক্রোমারের অধীনে মিসরীয়দের দ্বারা পূরণকৃত পদসমূহ আরও অধিক বেতন দিয়া ইংরেজগণ দ্বারা পূরণ করা হয়। বিদেশী অনুমতিপত্র শিকারি মুনাফাখোর ও সুদখোরে দেশ ছাইয়া যায় এবং তাহারা উপভূম্যাধিকারী সুযোগের অপব্যবহার করে। প্যান ইসলামি ও উলামাগণ সাধারণভাবে বৃটিশ-খ্রিষ্টান শাসনে আক্ষেপ করে। শিক্ষিত প্রশাসক, অধ্যাপক,

আইনজ্ঞ ও সাংবাদিকগণ ইউরোপীয় উদারনৈতিক লেখক ও রাজনীতিবিদদের গ্রন্থসমূহ হইতে পাতার পর পাতা লইয়া ঐগুলি বৃটিশদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বৃটিশ লেখকদের উদ্ধৃতি দেওয়া মিসরীয় জাতীয়তাবাদের একটি প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

রাজনৈতিক দিক হইতে সচেতন প্রায় সমস্ত মিসরীয় বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। বৃটিশদিগকে বহিষ্কার করিবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য ছাড়া তাহাদের আর কোনো কাজ ছিল না। তাহারা হইল সাংবাদিক, ছোটছোট জমিদার, যুবক, ইংরেজদের অধীনে কাজ করিতে অনিচ্ছুক বয়োজ্যেষ্ঠ বুর্জুয়াগণ, প্যান-ইসলামিবাদী, হতাশ রাজনীতিবিদ এবং স্বাধীন মিসর প্রত্যাশী জাতীয়তাবাদিগণ। খেদিভ আব্বাস হিলমী স্বাধীনতা দাবি করেন এবং কিছুকালের জন্য জাতীয়তাবাদীদের হাতে হাত মিলাইয়া বৃটিশদের বিরুদ্ধে কাজ করেন। এক নব্য পুরুষের আগমন ঘটে, যাহারা ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ অধিকারের পূর্ববর্তী মিসরের অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং তাই বৃটিশদের কার্যকলাপের কোনো প্রশংসাই তাহারা করে না। তদুপরি পুরাতন পুরুষের ন্যায় সহিষ্ণুতা না থাকায় তাহারা আরও আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করে।

যাহা হউক, যুদ্ধের বৎসরগুলি মোটামুটি শান্তিতেই কাটে। মিসরে হাজার হাজার বৃটিশ, অস্ট্রেলীয়, নিউজিল্যান্ড ও ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করে। সামরিক আইন জারি করা হয় এবং সেনাবাহিনী সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। সমগ্র যুদ্ধের সময় রুশদী পাশা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন। মিসরীয়গণ কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের পক্ষে থাকিলেও তাহারা ইহা প্রদর্শন করে নাই। এতগুলি বিদেশী সৈন্যের অবস্থানের ফলে জাতীয়তাবাদিগণ মর্মাহত হইলেও তাহারা বৃটিশ সমর প্রস্তুতিকে নস্যাৎ করিতে চেষ্টা করে নাই। সামরিক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ের ফলে ভীষণ অভাব ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কিন্তু কোনো দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ফ্রান্সে পশ্চিম রণাঙ্গনে বৃটিশগণ বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যবস্থা করে, কিন্তু কেহই প্রকাশ্যে কোনো আপত্তি উত্থাপন করে নাই, এমন কি দৈনিক বাধ্যতামূলক শ্রম প্রদানকারী কৃষকগণও কোনো আপত্তি করে নাই। মিসরের সুলতান হোসাইন কামিল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান এবং তাঁহার ভ্রাতা ফুয়াদ উত্তরাধিকারী হন।

ওয়াফ্দ্ পার্টি

যুদ্ধের পর যে অভ্যুত্থানের আরম্ভ হয় তাহাতে বৃটিশদের শান্তিপূর্ণ নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। তবে এই আঘাত ও আশ্চর্যের বিনিময়ে তাহারা তাহাদের হস্ত সুদৃঢ় করে এবং মিসরীয়দের সমস্ত দাবির প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। মিসরীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়, কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয় উডরু উইলসনের চৌদ্দ দফা, বিশেষত তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শের দ্বারা। প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদার দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যের নেতৃস্থানীয় জাতীয়তাবাদীদের মনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কম নহে। তাহাদের সকলেই প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে চায়, এবং আশা করে যে উইলসনের উপস্থিতি ও প্রভাবের দ্বারা তাহারা তাহাদের বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ এবং স্বীকৃতি লাভ করিবে।

মিসরীয়গণও যাইতে চায় এবং যে ব্যক্তি তখন নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তিনি হইলেন সা'দ জগলুল পাশা (১৮৫৭-১৯২৭ খ্রিঃ)। তিনি আবদুহুর বন্ধু এবং আফগানীর এককালের ছাত্র। বিচারক হিসাবে তিনি আধুনিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী মিসরের আইন সংস্কারে তৎপর হন।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ক্রোমারের অধীনে তাঁহাকে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ক্রোমারের সহিত তিনি বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন। সম্ভবত গর্স্ট ও কিচেনারকে অপছন্দ করিতেন বলিয়া তিনি মন্ত্রীপদে ইস্তাফা দেন এবং মিসরীয় পরিষদে ডিপুটি হিসাবে নির্বাচিত হন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে একটি প্রতিনিধিদল (ওয়াফ্দ্) লইয়া যাইবার জন্য তিনি বৃটিশ কর্মকর্তাদের অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি পাইলেন না। অতঃপর তিনি লন্ডনে যাইয়া বৃটিশ কর্মকর্তাদের নিকট মিসরের অভিযোগ পেশ করিবার অনুমতি চান, কিন্তু তাহাও অস্বীকার করা হয়। বৃটিশগণ যুক্তি প্রদর্শন করে যে মিসরীয়দের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য জগলুল 'নির্বাচিত' হন নাই। ইহা সত্য কথা, কিন্তু তাহারা বুঝিতে পারিল না যে, তিনি অধিকাংশ জাতীয়তাবাদীদের মনের ভাবই ব্যক্ত করিতেছেন। প্যারিস যাইবার অনুমতি চাহিবার জন্য জগলুল প্রধানমন্ত্রী রুশদী পাশাকে সম্মত করান। রুশদীও প্রত্যাখ্যাত হন এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা প্রদান করেন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম মাসগুলিতে জগলুল ওয়াফ্দ্ পার্টি গঠন করেন এবং এইদলের সহায়তায় তিনি সুলতানকে একজন নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিবার ব্যাপারে বাধা প্রদান করেন। প্রত্যুত্তরে বৃটিশ জগলুল ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করেন। জগলুলকে মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। ততদিনে প্রতিনিধি দল (ওয়াফ্দ্) প্রেরণ করা একটি প্রসিদ্ধ দাবিতে পরিণত হয় এবং হাজার হাজার লোক ওয়াফ্দ্ পার্টিতে যোগদান করে। জগলুলের নির্বাসন এক বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। দাঙ্গা, সাধারণ ধর্মঘট, বিদেশীদের ঘর জ্বালানো এবং বৃটিশ সৈন্যদের হত্যা করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ কিছুদিন পর যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা মিসরকে প্রকম্পিত করে তন্মধ্যে ইহা প্রথম।

প্রত্যুত্তরে বৃটিশগণ তাহাদের কব্জা আরও মজবুত করে। কিন্তু সাধারণ ধর্মঘটের নেতৃবৃন্দ 'প্রতিনিধিদলের' উপর জোর দেন। শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য জেরুজালেম বিজয়ী লর্ড এল্লেন্‌বীকে মিসরে পাঠানো হয়। শেষ পর্যন্ত যাইবার অনুমতি দেওয়া ছাড়া বৃটিশের গত্যন্তর রহিল না। প্যারিসে অথবা পরে লন্ডনে তিনি তেমন কোনো সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দেশে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং বিজয়ীবেশে ফিরিয়া আসেন।

আংশিক স্বাধীনতা

বৃটিশগণ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে একটা সমঝোতার প্রয়োজন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী গোলযোগের যুগে নিজেদের অভ্যাস মতো অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবার জন্য তাহারা একটি কমিশন প্রেরণ করে। অপরদিকে ওয়াফ্দ্ দল, এমন এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে যাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে অধিকাংশ আরব নেতৃবৃন্দ অনুসরণ করে—তাহারা কমিশন বর্জন করে।

কমিশনের প্রধান লর্ড মিলনার ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার অনুসন্ধান কার্য শেষ করেন এবং তাঁহার সুপারিশ পেশ করেন। একটি 'স্বাধীন' মিসরের সহিত নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী আশ্রিত (Mandate) অবস্থা ত্যাগ করিয়া একটি সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষর করিবার জন্য বৃটিশ সরকারকে বলা হয়। মিসরে একটি শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শর্তানুযায়ী মিসরের প্রতিরক্ষা, ইহার বৈদেশিক সম্পর্ক 'পরিচালনা' এবং সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব বৃটিশের হাতে থাকিবে। জগলুল কর্তৃক শর্তগুলি প্রত্যাখ্যান করিবার ফলে আপোষ ব্যর্থ হয়। বৃটিশগণ জগলুলকে বাদ দিয়া একটি সমঝোতায় আসিতে চেষ্টা করে কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে আরও দাঙ্গা ও রক্তপাত হয়। জগলুল ও তাঁহার

কয়েকজন সহকর্মীকে পুনরায় নির্বাসিত করা হয়। এইবার তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করা হয় এডেনে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি বৃটিশ একতরফাভাবে আশ্রিত অবস্থা নাকচ করে মিসরের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সুলতান ফুয়াদ রাজা বা মালিক উপাধি গ্রহণ করেন। (সুলতানের অর্থও রাজা, কিন্তু সম্ভবত ওসমানীয়দের সহিত সাদৃশ্য থাকিবার ফলে ইহা বাদ দেওয়া হয়)। এইভাবে আরবিভাষী জনগণের মধ্যে সর্বপ্রথম মিসর অন্ততঃপক্ষে আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। নূতন ব্যবস্থায় তেমন কিছু পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। চারিটি বিষয়— যেইগুলিকে 'সম্পূর্ণভাবে বৃটেনের মহিমান্বিত সরকারের এখতিয়ারে রাখা হয়' সেইগুলি হইল-

১। মিসরের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা,

২। মিসরের প্রতিরক্ষা,

৩। বৈদেশিক স্বার্থ ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা,

৪। সুদানের নিয়ন্ত্রণ।

৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ফুয়াদ একটি শাসনতন্ত্র জারি করেন। ইহাতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাজার হাতে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তিনি পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন, মন্ত্রিবর্গ নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতে পারেন অথবা ইচ্ছা করিলে আদেশ বলে শাসন করিতে পারেন। তিনি প্রতিষেধক ক্ষমতার মালিক হন, যাহাকে শুধু দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা বাতিল করা যায়। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন এবং সিনেটের দুই- পঞ্চমাংশ সদস্য নিযুক্ত করিতে পারেন। শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি সাধারণ নির্বাচনও ঘোষণা করা হয়। সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে সাদ জগলুল মিসরে ফিরিয়া আসেন। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ওয়াফদ্ পার্টি বিপুল ভোট লাভ করে—১৯৯ আসনের প্রতিকূলে মাত্র ২৭ টি আসন বিপক্ষে যায়। জগলুল প্রধানমন্ত্রী হন এবং সঙ্গে সঙ্গে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা পরিবর্তনের জন্য চাপ দেন। তিনি মিসর ও সুদানের সম্পূর্ণ সার্বভৌমত্ব দাবি করেন।

ওয়াফদ্ পার্টি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করে। ইহা ব্যাপক জনসমর্থনের অধিকারী ও একটি জনপ্রিয় দল। ওয়াফদ্ শুধু আপোসই করে নাই, বরং ধর্মঘট, দাঙ্গা এমনকি সন্ত্রাসবাদী কার্যাবলীও পরিচালনা করে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে অধিকাংশ সময় ইহা পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। প্রধানমন্ত্রীর পদ, যে পদে নিযুক্তি রাজার একচেটিয়া অধিকার, সাধারণত ওয়াফদ্ বিরোধী ব্যক্তির হাতেই থাকে। ফলে মন্ত্রী পরিষদ ও পার্লামেন্ট সর্বদা ঝগড়াতেই লিপ্ত থাকে এবং ইহাতে জয়লাভ করে সাধারণত রাজা অথবা বৃটিশ কিংবা উভয়ে। মিসরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলও ছিল। একটি হইল মুহম্মদ মাহমুদ পাশা কর্তৃক ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত লিবারেল কনস্টিটিউশনাল পার্টি (Liberal Constitutional Party)। ইহা সাধারণত অভিজাতবর্গ ও জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। আরেকটি হইল ইয়াহ্ইয়া ইব্রাহীম পাশা কর্তৃক ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত ইউনিয়ন (ইত্তেহাদ) পার্টি। ইহা রাজপ্রাসাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তৃতীয় দল হইল ইসমাইল সিদ্কী কর্তৃক ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত পিপলস (শার্ব) পার্টি। ইহা প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বের দ্বারা গঠিত এবং তেমন কোন জনসমর্থন লাভ করে নাই। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াফদ্ পার্টি দুইভাগ হইয়া যায় এবং বিদ্রোহীগণ আহমেদ মাহের ও নুক্রাশী পাশার নেতৃত্বে সা'দী ওয়াফদ পার্টি গঠন করে। এই

সমস্ত দল ওয়াফদ্ পার্টির চাইতে অধিক সংযত। তাহারা বৃটিশ অথবা রাজা অথবা উভয়ের সহিত সহযোগিতা করিতে রাজি থাকে।

জাতীয়তাবাদিগণ মোটামুটিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উপেক্ষা করে কারণ তাহারা বৃটিশদিগকে বহিষ্কৃত করিবার প্রচেষ্টায় তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করে। বস্তুত তাহারা সমস্ত অপবাদ বৃটিশদের উপর আরোপ করে এবং বিশ্বাস করে যে বৃটিশগণ মিসরে এক দরজা দিয়া বাহির হইলে অপর দরজা দিয়া উন্নতি ও প্রগতি প্রবেশ করিবে। অপর দিকে বৃটেন তখনও ভারতবর্ষের রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করিতে আগ্রহী এবং মিসরে বিদেশী অর্থনৈতিক স্বার্থসংরক্ষণে ব্যগ্র। সাম্রাজ্যের প্রয়োজনীয়তাসহ 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়া বৃটিশগণ তেমন কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। জনসাধারণ ও জমিদারের উপর কর বোঝা ছিল তখনও প্রকাণ্ড। মিসরের লম্বা আঁশের তুলা যেহেতু পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ তাই বৃটিশ টেক্সটাইল কারখানাগুলির চাহিদা পূরণ করিবার জন্য আরও অধিক জমি তুলার চাষে চলিয়া যায়। ১৯১৭ হইতে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ- এই ২০ বৎসর মিসরের জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চাষোপযোগী জমি পূর্বের ন্যায় রহিয়া যায়, ফলে জীবিকার মান নিম্নস্তরে নামিয়া যায়।

১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে আরও দাঙ্গা সংঘটিত হয় এবং একই বৎসর ১৯শে নভেম্বর মিসরীয় সেনাবাহিনীর বৃটিশ প্রধান সেনাপতি এবং সুদানের গভর্নর জেনারেল লী স্ট্যাক্ আততায়ীর হাতে নিহত হন। বৃটিশগণ এই বিদ্রোহের কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং দোষী ব্যাক্তিদের শাস্তি, ক্ষমা প্রার্থনা ও ১৫,০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করে। তদুপরি তাহারা রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে এবং সুদান হইতে মিসরীয় বাহিনী অপসারণের আদেশ প্রদান করে। তাহারা আরও দাবি করে যে অর্থনীতি, বিচার ও স্বরাষ্ট্র বিভাগে বৃটিশ উপদেষ্টা রাখিতে হইবে। সব চাইতে মারাত্মক দাবি সম্ভবত সুদানের জাজিরায় চাষাবাদের এলাকা সম্প্রসারণ করিবার হুমকি। এই কাজ নীল নদের পানি জলসেচের জন্য ফিরাইয়া দিবে এবং ফলে মিসরের পানির প্রবাহ কমিয়া যাইবে। নীল নদী ছাড়া মিসর হইতে পারে না। নীল নদের প্রবাহ যেহেতু সুদান হইতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাই সুদানের সরকারের সহিত সদ্ভাব সর্বদাই মিসরের কাম্য।

ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান

১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দে জনৈক মুহাম্মদ আহমদ নিজেকে মুসলমানদের মুক্তিদাতা মেহদী (মসিয়াহ) বলিয়া দবি করেন। ইহার দ্বারা প্রসিদ্ধ মেহ্দী আন্দোলন আরম্ভ হয়, যাহা সুদানকে কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রকম্পিত করে। আরাবি বিদ্রোহের ফলে মিসরের অবস্থা তখন খুবই জটিল এবং তাই মেহ্দী লইয়া কেউ (বৃটিশ বা মিসরীয়) চিন্তা করিবার সুযোগ পায় নাই। ফলে তাহার ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ করে এবং খার্তুমে অবস্থিত ইঙ্গ-মিসরীয় সেনাবাহিনী বিপদগ্রস্ত হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ক্রোমার এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল জর্ডনকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনি এই কাজে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন এবং ফলে মেহ্দীর সমগ্র সেনাবাহিনী কর্তৃক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যান। একযুগেরও অধিককাল পর্যন্ত মেহদী সমগ্র সুদানের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার মেহ্দীর রাজধানী দঙ্গোলা দখল করেন এবং দুই বৎসর পর ওমদারমানের যুদ্ধে মেহদীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। ইহার ফলে বৃটেন ও মিসরের মধ্যে একটি চুক্তি হয় যাহাকে সাধারণত "কনডোমিনিয়াম" (যৌথ শাসন) বলা হয়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারিতে স্বাক্ষরিত

এই দলিলের দ্বারা সুদান বৃটিশের পছন্দমতো কিন্তু খেদীভ কর্তৃক নিযুক্ত একজন গভর্নর জেনারেল কর্তৃক শাসিত হয়। সুদানের আইন প্রণয়ন করেন গভর্নর জেনারেল এবং মিসরের আইন সেখানে অচল। মিসরীয় পণ্য দ্রব্য সেখানে যায় আমদানি কর ব্যতিরেকে, অথচ বৃটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া সুদানে কেউ কোনো রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিতে পারে না। ক্রীতদাস প্রথা রহিত করা হয় এবং ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাসেলস্ এ্যাক্টের দ্বারা আমদানি, বিক্রয় এবং গোলাবারুদ ও মদ্য প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইহার পর হইতে এই অঞ্চলকে "ইঙ্গ-মিসরীয় সুদান বলা হয়, কিন্তু সুদানে মিসরের প্রভাব স্বীয় ভূখণ্ডের চাইতেও ক্ষীণ।

কনডোমিনিয়াম (যৌথ শাসন) যেহেতু ইতিমধ্যে সুদানের উপর মিসরের আইনানুগ স্বার্থ স্বীকার করিয়াছে সেহেতু সুদান হইতে মিসরীয় সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের বৃটিশ দাবিকে জগলুল অত্যাচারমূলক বলিয়া বিবেচনা করেন। আবার নীল নদের পানির গতি পবির্তন করিয়া জজিরায় জলসেচের হুমকিকে অনেক মিসরীয় নেতা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর বলিয়া অভিহিত করেন। এই চরমপত্রের প্রতিবাদে জগলুল পদত্যাগ করেন। এবং জিওয়ার পাশা মন্ত্রী হন। তিনি এই চরমপত্র গ্রহণ করেন, অবশ্য বৃটিশ জজিরায় জলসেচ ব্যতীত চরমপত্রের বাকি সমস্ত শর্তগুলি আদায় করিয়া লয়। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের দাঙ্গার ফলে মিসরীয় কার্যাবলীতে বৃটিশগণ অপেক্ষাকৃত প্রবল আধিপত্য লাভ করে এবং মিসর সুদানের ব্যাপারে সকল প্রভাব হারাইয়া ফেলে।

১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে সা'দ জগলুল পরোলোকগমন করেন। তাঁহার পর ওয়াফদ্ পার্টির নেতৃত্ব নাহাস পাশার উপর অর্পিত হয়। অবশ্য নেতৃত্ব পরিবর্তনের ফলে বৃটিশ ও ওয়াফদ্ পার্টির মধ্যে মত বিনিময় সহজতর হয় নাই। মূল সমস্যাসমূহ থাকিয়া যায়। বৃটিশ একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি চায় যাহার দ্বারা বৃটিশ আধিপত্য বজায় থাকে, অথচ ওয়াফদ্ চায় মিসর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ এবং সুদানের উপর কর্তৃত্ব। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে আলোচনা ভাঙ্গিয়া যায়। পাঁচ বৎসরের পূর্বে এই আলোচনা পুনরায় শুরু হয় নাই। জগলুলের মৃত্যু, অন্যান্য দলের অস্তিত্ব এবং রাজার প্রকাশ্য বৈরীভাবের ফলে ওয়াফ্দ্ পার্টি দুর্বল হইয়া যায়। এই দুর্বল অবস্থা সত্ত্বেও ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে ওয়াফদ্ পুনরায় নির্বাচনে জয়লাভ করে। রাজা ফুয়াদ ওয়াফদ্ পার্টির একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিবার পরিবর্তে পার্লামেন্ট বন্ধ করিয়া দেন, পিপলস্ পার্টির নেতা সিদকী পাশাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ফুয়াদ কর্তৃক জরিকৃত নূতন শাসনতন্ত্রে তিনি নিজেকে আরও অধিক ক্ষমতা দান করেন এবং একটি দুইস্তরের পরোক্ষ ভোট প্রদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা তিনি এবং সিদকী পাশা কোনো কার্যকর প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন।

মিসরের স্বাধীনতা

১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ইথিওপীয়ায় ইতালীয় অভিযানের ফলে ইঙ্গ-মিসরীয় সম্পর্কের ধারা পরিবর্তিত হয়। বৃটিশগণ সুয়েজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আরও বিব্রত বোধ করে, কারণ তাহারা মিসরে ইতালীয়দের বৃটিশবিরোধী প্রচারণায় শংকিত হয়। মোটের উপর বৃটিশগণ মিসরীয়দের সহিত একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ব্যাপারে আগ্রাহান্বিত হইয়া উঠে। এক বৎসর পূর্বে শক্ত মানব সিদকী পাশা স্বাস্থ্যহীনতার দরুন পদত্যাগ করেন এবং অন্যান্য দলগুলিসহ ওয়াফদ্ পার্টি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে তাহাদের অসন্তোষ আর গোপন রাখে

নাই। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা ফুয়াদ ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন, কিন্তু বৃটিশ পরামর্শের প্রতিকূলে তিনি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র পুনরায় চালু করেন। তদনুসারে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ওয়াফদ্ পার্টি পুনরায় জয়লাভ করে। ফুয়াদ ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরলোক গমন করেন এবং তদস্থলে তাঁহার ১৬ বৎসর বয়স্ক পুত্র ফারুককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মিসরীয়গণ ফুয়াদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং ফারুককে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে। কিন্তু মিসরীয় দৃশ্যের পর্যবেক্ষকগণের চোখে ইহা একটি পরস্পরবিরোধী ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একদিকে মিসরীয়গণ রাজতন্ত্র ও রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, অপরদিকে তাহারা পরপর প্রাসাদ দলকে পরাজিত করে এবং রাজতন্ত্র বিরোধী ওয়াফদ্ পার্টিকে নির্বাচিত করে।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ওয়াফদ্ পার্টি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, কোমল ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। চারি বৎসরের সিদকীর "একনায়কত্ব" নাহাস পাশা ও ওয়াফদ্ পার্টিকে শিক্ষা প্রদান করে যে, রাজনীতি সম্ভাব্যতার কৌশল, অবিমিশ্রতার দাবি নহে। তদুপরি সমস্ত দলের মিসরীয়গণ ইতালির হুমকি সম্পর্কেও শংকিত হয় এবং মনে করে যে প্রভু হিসাবে ইতালীয়গণ বৃটিশদের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্য নহে। বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ বৃটিশ ও মিসরীয়দের জন্য একটি চুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

বৃটিশগণ নূতন প্রধানমন্ত্রী নাহাস পাশার সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে আগস্ট মিসরকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করিয়া একটি সন্ধির চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রথম অধ্যায়ে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, "মহামহিম (ইংল্যান্ডের) রাজা ও সম্রাটের সেনাবাহিনীর মিসরের উপর সামরিক অধিকার বাতিল হইল।" অতঃপর ষোলটি অতিরিক্ত অধ্যায়ে মিসরের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়। ইহাতে মিসরীয়দের পক্ষে দেখা যায় দুই দেশের মধ্যে রাষ্ট্রদূত বিনিময়, জাতিপুঞ্জে মিসরের সদস্যপদ লাভ, উপ-ভূম্যাধিকারীস্বত্ব বিলোপ, সুদানে মিসরীয় বাহিনীর প্রত্যাবর্তন এবং সুদানে বাধাহীন মিসরীয় বসতির আইনগুলি সংযুক্তকরণ। ইহার প্রতিকূলে এমন কতকগুলি ধারাও ইহাতে সন্নিবেশিত করা হয়, যাহার দ্বারা মিসরের সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়। এইগুলি হইল, গ্রেট বৃটেনকে মিসরের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়, আর মিসরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় যুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেনকে "সমস্ত সুবিধাদি ও সহযোগিতা ... বন্দর, বিমান বন্দর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের সুবিধাদি প্রদান করা।" তদুপরি সুয়েজ খালের প্রতিরক্ষার জন্য তথায় অনূর্ধ্ব ১০,০০০ সৈন্য ও ৪০০ পাইলট রাখিবার অনুমতিও গ্রেট বৃটেনকে দেওয়া হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০ বৎসরের জন্য।

বৃটেন তেমন কিছু দান করে নাই, কিন্তু মিসরীয়গণ তাহাদের আশাতিরিক্ত লাভ করে। ফলে ওয়াফদ্ পার্টি এই চুক্তি গ্রহণ করে এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর মিসরীয় পার্লামেন্ট ইহা অনুমোদন করে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ৮ই মে মিসর জাতিপুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করে। কিছু কালের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও অল্পবয়স্ক রাজার পরিচালক হিসাবে নাহাস পাশা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ফারুক বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় প্রাসাদ ও ওয়াফদ্ পার্টির পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। রাজা নাহাস পাশাকে বরখাস্ত করেন এবং অ-ওয়াফ্দি মাহ্মূদ পাশাকে নিয়োগদান করেন যিনি পার্লামেন্টের মোকাবিলা করেন। কয়েক বৎসর পর ওয়াফ্দ পার্টি ইহার সচেতনতা ও প্রভাব হারাইয়া

ফেলে। নাহাস পাশা জগলুলের ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন না। ওয়াফদ্ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা নেতৃত্ব লাভ করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ শিকারি হন তাঁহাদের কেউকেউ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে এবং অন্যান্যগণ বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু তাঁহাদের জনপ্রিয়তার উৎস সেই বৃটিশ বিরোধী উৎসাহও শেষ হইয়া যায়। পরবর্তীকালে নব্য জাতীয়তাবাদিগণ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের চুক্তিকে 'শটগান বিবাহ' হিসাবে বিরোধিতা করে এবং ওয়াফদ্ পার্টিকে ইহার জন্য দায়ী করে।

সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ

মিসরের নেতৃবৃন্দ দুইটি মহাযুদ্ধেই বৃটিশদের পক্ষে থাকিবার ফলে তাঁহারা সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। বৃটিশগণও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ উৎসাহী ছিল তাহার পরে অধিক আগ্রহী হয় নাই। বস্তুত বৃটিশগণ দেশকে করায়ত্ত রাখিয়াও ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে একতরফাভাবে এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের সহিত চুক্তির মাধ্যমে মিসরের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোনো বিশেষ মহলের সতর্ক পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির দরুন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট শহরের অধিবাসীবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং অন্যত্র যেখানে সেনানিবাস বিদ্যমান ছিল সেখানে সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা জমিয়া উঠে। শহুরে লোকজন প্রচুর লাভবান হয় এবং কর্ম ও খাদ্যান্বেষী কৃষকগণ শহরের দিকে ছুটিয়া যায়। শহরগুলিতে জমির দাম বৃদ্ধি পায় এবং ঘরভাড়া ৬০ শতাংশ হইতে ১০০ শতাংশে উঠিয়া যায়। তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শহরগুলিতে দ্রুতগতিতে গৃহনির্মাণ কাজ চলিতে থাকে। এইসব কিছু দ্বারা একটি নব্য ধনীশ্রেণী জন্মলাভ করে , যাহা পুরাতন বিত্তশালী লোকদের সহিত যোগদান করে এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও পেশাগত শ্রেণী সংবলিত একটি রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি করে। ইহারা নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি রক্ষা করিবার জন্য সম্মিলিত হয় এবং তৎসঙ্গে গ্রেট বৃটেন হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইবারও প্রয়াস পায়।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের চাহিদা মিটাইবার জন্য কিছুসংখ্যক শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যাংকের মাধ্যমে সুতা, সিল্ক, পশম, সিগারেট, সাবান, জাহাজ চলাচল, বীমা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য কারখানাও ক্রমশ গড়িয়া উঠে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মিসরীয় শিল্পসংস্থা (Egyptian Federation of Industries) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ সদস্য সংখ্যা ৪৩০-এ উন্নীত হয়। একটি নূতন বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয় যাহা উন্নতিশীল এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নতিশীল কিন্তু মার্জিত রুচির শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আরও সুসংগঠিত মধ্যবিত্তের সহিত মিলিত হয়। এই বণিজ্যিক শ্রেণী ভূপতিশ্রেণীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায় নাই বরং ইহার সহিত মিশিয়া যায় এবং মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ সংরক্ষিত শাসক শ্রেণীর জন্ম দেয়। জনসংখ্যার বাকি ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে, ইহাদের ৯০ শতাংশ অশিক্ষিত।

নূতন কল-কারখানা নিত্য নূতন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং এই চাহিদা পূরণ করিবার দ্বারা জীবনের গতি ও মূল্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। সংবাদ সংস্থা, বেতার ও টেলিফোনের ন্যায়

নূতন শিল্পকারখানাসমূহও এক নূতন ধরনের শিক্ষা দাবি করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকে, প্রত্যেকটি অপরটি হইতে পৃথক এবং প্রত্যেকটি ইহার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পবিত্র আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তখন সগৌরবে বিদ্যমান, যাহা ইহার চারি দেওয়ালের বাহিরের পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় পুরাতন ধর্মীয় শিক্ষা চালাইয়া যায়। আজহারের অধিকাংশ শেখ আধুনিকতা প্রত্যাখ্যান করেন এবং কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এমনকি নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনে বিশ্বাসী মুহাম্মদ আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিও কোনো মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের আয়োজন করেন নাই। আজহারিগণ মতবাদের উপর কোনো বিতর্কে অবতীর্ণ হন না। অপরদিকে আধুনিক স্কুলসমূহ আজহারের প্রতি বিরূপ এবং তাহারা তাহাদের নিজস্ব জীবনপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। তাহারা যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচি সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য হইতে ধার করা এবং সম্পূর্ণভাবে আজহারের প্রভাবমুক্ত, কারণ আজহার পুরাপুরিভাবে শরিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার আগমন মিসরে তেমন ধীর গতিসম্পন্ন নহে। পুরুষগণ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে, মহিলাগণ পর্দা ছাড়া বাহির হইয়া আসে, ইউরোপীয় আইন জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং বাল্যবিবাহ বিলুপ্ত হয়। নব্য ধনীশ্রেণী যতই পাশ্চাত্যমুখী হইয়া উঠে, শেখগণ ততই আরও কঠোর হইয়া উঠেন এবং একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ বিস্মৃত হন।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের স্বাধীনতার সময় বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় দিক হইতে মিসরে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। এইগুলির দুইটি দল অর্থাৎ আজহারের অতিগোঁড়া শ্রেণী এবং আবদুহুর ন্যায় মধ্যপন্থী সংস্কারবাদী শ্রেণীর সহিত আমরা ইতিমধ্যে পরিচিত। তৃতীয়টি জঙ্গী মুসলিম শ্রেণী এবং চতুর্থটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্যোক্তা।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood)

অন্ততঃপক্ষে তিনটি কারণবশত জঙ্গী মুসলিম শ্রেণীগুলির জন্ম হয় যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ পরে পর্যন্ত মিসরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। একটা হইল বৃটিশদের উপস্থিতি এবং ভক্ত-মুসলমানদের মধ্যে খ্রিষ্টানদের দ্বারা শাসিত হইবার অপমানজনিত অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণ হইল মিসরীয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি দ্রুত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশাপাশি মুসলিম আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতি। তৃতীয় কারণ হইল, তুরস্কভীতি এবং মিসরীয় দৃষ্টিতে সে দেশের ইসলামহীনতা। তুর্কিগণ কর্তৃক খেলাফত বিলোপের ফলে আজহারের শেখগণ এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে খিলাফতের উপর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ৩৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসেন মিসরীয়। সম্মেলন কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়, তবে ইহা মিসরীয় ও অন্যান্য মুসলমানদের নিকট অবস্থার জটিলতা প্রকাশ করে।

জঙ্গী মুসলমানগণ হইল আরবের[১] মৌলিক নীতিবাদী ওয়াহাবি ও জঙ্গী জামাল আল-দ্বীন আফগানীর[২] আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। মিসরে দুইটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত জঙ্গী দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ, প্রভাবশালী ও সর্ববৃহৎ হইল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ

---

১. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৬১।

২. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৬২।

(Muslim Brotherood) জমিয়ত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন। সুয়েজ খালের ইসমাইলীয়া নগরে ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে হাসান আল-বান্না নামক ২২ বৎসরের একজন স্কুল শিক্ষক ইহা আরম্ভ করেন। তিনি এবং ছয়জন যুবক সহকর্মী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাহাদের পাথেয় হইল শুধুমাত্র ইসলামের যথেষ্টতায় প্রবল বিশ্বাসে চরম আস্থা। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে মিসর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইহা একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং ৪০ বৎসর পর বর্তমানেও ইহা গণ্য করিবার মতো একটি শক্তি। ইহার মিশনারি উৎসাহ ও সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে মধ্যযুগের অকপট ভ্রাতৃসংঘ[৩] (Brethren of Sincerity) নামক ইসমাইলীয়া দলের সহিত তুলনা করা চলে। জঙ্গীপনা ও প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে ইহা আরেকটি ইসমাইলীয় প্রতিষ্ঠান, আসাসীনদের অনুকরণ করে।

ভ্রাতৃসংঘের তেজস্বী ও সুদক্ষ যুবক নেতা ইসমাইলীদের ন্যায় শিয়া নহে বরং একটি কঠোর সুন্নি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিবার ওয়াহাবিদের ন্যায় মৌলিক নীতিবাদী হাম্বলি প্রতিষ্ঠানের অনুসারী। অবশ্য তিনি ইসলামী সংগঠনের কৌশল ধার করেন। ভ্রাতৃসংঘের সর্বময় নেতা হিসাবে হাসান আল বান্নাকে মুর্শিদ আল-আম বা সাধারণ পথ- প্রদর্শক বলা হয়। তাঁহার অধীনে কার্যরত বিশিষ্ট একটি উৎসর্গীকৃত দলকে বলা হয় দায়ি বা ভক্ত। ইসমাইলিরাও একই নাম ব্যবহার করে। কায়রোতে অবস্থিত এই আন্দোলনের সাধারণ কেন্দ্রস্থলকে বলা হয় দার এবং এইসব আধুনিক অফিসসমূহ হইতে সর্বাধিনায়ক কর্তৃক ভ্রাতৃসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচি প্রচারিত হয়।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ একটি জঙ্গী মনোভাবাপন্ন দল। ইসলামের স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বসময় কর্তৃত্ব এবং কোরআন ও সুন্নাহর অবিকল ব্যাখ্যায় ইহা বিশ্বাস করে। ইহা জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আদর্শ পুনর্জীবিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। তবে ওয়াহাবিদের তুলনায় ইহা সংস্কার এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রথানুসরণে বিশ্বাস করে। আবদুহুর মতো ভ্রাতৃসংঘ ইসলামি মতবাদের পুনর্বিস্যান প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। ইহা মুসলিম জীবনের ধর্মনিরপেক্ষ রূপদানের ঘোর বিরোধী এবং কোরআনী আইনের পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করে। ইহা প্যান-ইসলামি পন্থী, এবং সমস্ত মুসলমানদের সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে। "একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নামাজ বা রোজার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ভ্রাতৃসংঘ ঘোষণা করে।" ইহা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সরকার, তৎসঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য কোরআনের সহিষ্ণুতার উপর জোর দেয়, তবে সংখ্যালঘুদিগকে ইসলামের প্রতি অনুগত হইতে হইবে।

উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও ভাবধারাসমূহ বিভিন্ন উপায়ে কার্যে পরিণত করা হয় ও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিসরের বিভিন্ন নগর ও শহরে অবস্থিত ভ্রাতৃসংঘের শাখাসমূহ বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যস্কুল পরিচালনা করে ও ইসলামের উপর বক্তৃতা দেয়। বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য তাহারা দিনের বেলাও স্কুল খোলে। অতি গোঁড়াদের মতো ভ্রাতৃসংঘ মহিলা শিক্ষার বিরোধী নহে, কিন্তু কখনও তাহারা সহশিক্ষায় বিশ্বাসী নহে। শহরে তাহারা জনহিতকর কাজ করে, পীড়িতদের শুশ্রূষার জন্য ডাক্তারখানা স্থাপন করে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিনা পয়সায় খাদ্য বিতরণ করে। তাহাদের মিশনারিগণ মসজিদে প্রচারকার্য চালায়। প্রত্যেক সদস্যকে তাহার জীবনের পাপকার্য ত্যাগের শপথ করিতে হয় এবং অন্যদিগকেও এই কার্য হইতে বিরত

৩. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১১৭।

রখিতে হয়। শরিয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রহিয়াছে জুয়াখেলা, নৃত্য, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র, মদ্যপান ইত্যাদি। ভ্রাতৃসংঘের একটি যুব সংগঠনও থাকে। প্রায় ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকগণ কাশ্‌শাফে যোগদান করে। ইহা অনেকটা স্কাইটিং-এর ন্যায় এবং তাহাদের কাজও প্রায় এক রকম। অতঃপর যুবকদল একটি আধা-সামরিক সংগঠনে যোগ দেয় এবং গোপনে কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে।

ভ্রাতৃসংঘের সদস্যপদ গোপন রাখা হয় বলিয়া ইহার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ভ্রাতৃসংঘের প্রায় ৫০০ শাখার সদস্য সংখ্যা ছিল ৫,০০,০০০। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাত ইহার শাখা ২০০০-এ দাঁড়ায় এবং সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০,০০০ এ। ভ্রাতৃসংঘের আয়ের উৎসও অনুরূপ অজ্ঞাত। প্রাথমিক সদস্যগণ ছিল অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্র, কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যে তাহারা তাহাদের কেন্দ্রস্থল কায়রোতে স্থানান্তর করিয়া তাহাদের সদস্যভুক্তির ভিত্তি বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়। তাহারা একটি ছাপাখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যথা ইসলামি ট্রানজাকশান কোম্পানি (Islamic Transaction Company), ইখওয়ান স্পীনিং এন্ড উইভিং কোম্পানি (The Ikhwan Spinning and Weaving Company) এবং কমার্শিয়াল এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (Commercial and Engineering Company)। মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নীতিবাক্য হইল, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর" এবং তাহাদের প্রতীক হইল দুইটি তরবারির মাঝখানে কোরআন। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভ্রাতৃসংঘ একটি নিমজ্জিত বরফ খণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, কারণ ইহার অধিকাংশ কার্যাবলী গোপনীয় থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহা আরও প্রকাশ্যরূপ লাভ করে এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্যোক্তাগণ

মিসরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাগণের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের ন্যায় কোনো সংগঠন ছিল না। সম্ভবত নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন তাহারা এইরূপ কোনো সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। তদুপরি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদিগণ এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে কোনো মতবাদ সৃষ্টি করিতে তাহারা নারাজ এবং মতবাদমূলক কোনো সংগঠনের গণ্ডী অনুসরণ করিতেও তাহারা পরান্মুখ। কেউ কেউ আবার অজ্ঞেয়বাদী এবং তাই ইসলাম বা কোনো ধর্ম সম্পর্কে তাহারা অতি অল্পই তোয়াক্কা করে। আবার অনেকেই খাঁটি মুসলিম, যাহারা মনে করে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সরকার হইতে ইহা পৃথক হওয়া উচিত। অজ্ঞেয়বাদী হউক বা বিশ্বাসী হউক, দুইটি ব্যাপারে তাহারা একমত। প্রথম তাহারা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্ত্বায় এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয়ত মিসরীয় জীবনে তাহারা 'ইসলামি সংস্কৃতির' উপর জোর দেয়। জীবনের অন্যান্য ধারার সহিত ইসলাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কোনো নাস্তিক যদি বলে যে, সে মুসলমান নহে তবে ইহার দ্বারা বুঝাইবে যে, সে মিসরীয় নহে। ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে। কোনো কোনো ধর্মনিরপেক্ষবাদী ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ইহা পালন করে, কিন্তু জাতির উপর ইহা চাপাইতে নারাজ।

দুইটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষতা ভাবধারার উন্মেষ সাধনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন তিনি সম্ভবত তাহা হোসেন (জন্ম ১৮৮৯)। এই অন্ধ

প্রভাবশালী ব্যক্তি, শিক্ষক এবং মানবীয় গুণের অধিকারী আজহার ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন। বলিতে গেলে তিনি আজহারের ধর্মীয় মৌলিকতাবাদী এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছা, যেমন ফ্রান্সে দেখা যায়, উভয়টিই প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে তাঁহার ভালোবাসা ও প্রশংসা অপরিসীম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালবাসা হইতেই তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে প্রশংসা করিতে শেখেন। ফ্রান্সে থাকাকালে তিনি উত্তর আফ্রিকার ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন সম্পর্কে লেখেন। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফরাসি স্ত্রী লইয়া তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার সমস্ত উৎসাহ শিক্ষায় ব্যয় করেন।

শিক্ষার উপর তিনি উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত ও বিভিন্ন প্রবন্ধ লেখেন। তবে তাঁহার অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'প্রাক-ইসলামি কবিতা' ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং 'মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ', ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি মুসলিম বিশ্বকে মর্মাহত করে এবং তাঁহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া আখ্যায়িত করে। দ্বিতীয়টি আধুনিক মিসরীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কিছু কিছু বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি স্থাপন করে।

তাঁহার প্রাক-ইসলামি কবিতা গ্রন্থে তাহা হোসেন মোয়াল্লাকা[১] নামে পরিচিত অনেকগুলি কবিতায় পাণ্ডিত্বে আধুনিক সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন এবং এইগুলি আদৌ প্রাক-ইসলামি কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা তুমুল আন্দোলন ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় সম্প্রদায় আশংকা করে, যে কোনো প্রাচীন মূল বচনের উপর সমালোচনামূলক পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হইবে এবং ঐশীবাণীর সঠিকতার উপর সন্দেহ আরোপ করা হইবে। তদুপরি আরবি ভাষাকে এত পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং কোরআন পাঠ এত অলঙ্ঘ্য যে ইহার কোনো পরিবর্তনের দ্বারা ঈমান বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক রচনা করা হয় এবং হোসেনের পুস্তক প্রত্যাহার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হোসেনই সম্ভবত প্রথম মুসলমান যিনি কোরআনের উপর সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে উৎসাহ প্রদান করেন।

'মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ' গ্রন্থখানি রচনা করা হয় ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের জন্য কিছু কর্মসূচি প্রদানের উদ্দেশ্যে। মিসরের উপর ইউরোপীয়দের বিশ্বাস এবং ইউরোপের পদাংক অনুসরণ করিবার মিসরীয় ওয়াদার নিদর্শন স্বরূপ ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তিকে তাহা হোসেন আদর্শ হিসাবে তুলিয়া ধরেন। তাঁহার মতানুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে এবং ইহা উপলব্ধি করা যায় যখন লক্ষ্য করা যায় যে ইহা মানুষের কার্যাবলীতে গতি সঞ্চারের জন্য যুক্তির স্বাধীনতা দান করে এবং মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহা ধর্মের স্বাধীনতা দান করে। এই চরম লক্ষ্যে পৌছিবার জন্য মিসরকে তাহার স্বাধীনতার উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে গ্রীক-রোমান সভ্যতার সহিত মিসরের সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায় মিসর ইউরোপের একটি অংশ বিশেষ। তিনি তুর্কি সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকালপের সমতুল্য।[২] কারণ গোকালপের ন্যায় তিনিও বলেন যে, মিসরীয়দের উচিত ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করা, ইহার ধর্ম নহে এবং

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩০।*
২. *উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৯২।*

তাহাদের মিসরীয় সংস্কৃতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষা জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তুর্কিগণ আরবি ও ফার্সি ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পারস্যবাসিগণ আরবি ও তুর্কি ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহা হোসেন আরবির অতি প্রশংসা করেন, ধর্মের খাতিরে নহে বরং জাতির খাতিরে। এমন কি তিনি খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে ব্যবহৃত দুর্বল আরবিকে উন্নত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসেন যাহাতে মিসরীয় খ্রিষ্টানগণ বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় তাহাদের রীতিনীতি পালন করিতে পারে।

সীমিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ লইয়া মিসরীয়গণ মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে। অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শী হইতে মৌলিক নীতিবাদী মুসলমান যাহারাই এই ব্যাপারে মাথা ঘামায় তাহারা মিসরের প্রতি অথবা ইসলামের প্রতি অথবা উভয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার বিষয়ে চিন্তা করে। তাহারা নিজদিগকে 'আরব' বিলয়া বিবেচনা করে না এবং তাই ফারটাইল ক্রিসেন্টের জনগণের কার্যাবলীতে অনেকেই নিজদিগকে জড়িত করে নাই। যুদ্ধের শেষ বৎসরগুলির ঘটনাবলী ইহুদিবাদের প্রেতাত্মা এবং যুব মিসরীয় নেতাদের একঘরে নীতির বিরোধিতা অবস্থার বেশ পরিবর্তন সাধন করে এবং মিসরকে 'আরব জাতীয়তাবাদের' কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ফারটাইল ক্রিসেন্টে সাম্রাজ্যবাদ

কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে ভারতবর্ষের সহিত বৃটিশদের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়। ফলে মিসর ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত তাহাদের বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে বৃটিশ এই জীবন-রক্ষাকারী যোগাযোগের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নীতি নির্ধারণে ওসমানীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা জার্মানগণ বৃটিশদিগকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাহাদের সমস্ত উপনিবেশগুলিতে ব্যতিব্যস্ত করিতে সচেষ্ট হয়। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ এবং আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আহ্বান দিবার জন্য তাহারা তুর্কিদিগকে উপদেশ দেয়। জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরবিভাষী মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে শত্রুভাব গড়িয়া তোলা। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর সমস্ত পবিত্রতা লইয়া সুলতান খলিফা জিহাদ ঘোষণা করেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয়। ইয়ামান, দক্ষিণ আরবের কিছু গোত্রিয় শেখগণ এবং বেশ কিছুসংখ্যক ভারতীয় প্যান-ইসলামি ছাড়া ফারটাইল ক্রিসেন্টের অধিবাসীবৃন্দ এই জিহাদে কোনো সাড়াই প্রদান করে নাই। কেউ কেউ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ক্রিসেন্টের আরবিভাষী অধিবাসীদের ওসমানীয়বাদকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দের নব্য তুর্কি বিপ্লব অ-তুর্কিদের উপর তুর্কিদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করে। ওসমানীয় পার্লামেন্টে আরবিভাষী লোকদের প্রতিনিধিত্ব খর্ব করা হয়। তদুপরি তাহারা তুর্কি ভাষার খাতিরে আরবিত্যাগ করিতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান তাহাদের খ্রিষ্টান বন্ধুদের প্যান-আরবি ভাবধারায় আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক মুসলিম সংস্থাসমূহ গঠন করে এবং ইহাতে মুসলমান, খ্রিষ্টান ও দ্রুজেসগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবলিত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবিতে একত্রিত হয়। বাগদাদ হইতে বৈরুত পর্যন্ত এই ধরনের প্রায় এক ডজনেরও অধিক সংস্থা গঠিত হয়, আবার ইহাদের কোনো কোনোটি গঠিত হয় ওসমানীয় সেনাবাহিনীর আরব অফিসারদের দ্বারা। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধের প্রাক্কালে গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাসমূহের ২৪ জন প্রতিনিধি প্যারিসে একটি সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ওসমানীয় শাসন হইতে স্বাধীনতার আহ্বান জানায়। যুদ্ধের প্রথম বৎসরগুলিতে তুর্কি ত্রিজন-শাসনের একজন সদস্য জামাল পাশা সিরিয়ায় তুর্কি বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন। আরবদের বিরুদ্ধে তাঁহার নিষ্ঠুরতা গোপন সংস্থাসমূহের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াইয়া তোলে।

বৃটিশগণ এইসব তুর্কি-বিরোধী আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে সজাগ এবং স্বভাবতঃই তাহারা এই তুর্কিবিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল

এলেনবির নেতৃত্বে সিনাই এলাকায় পরিচালিত অভিযানও তখন সুবিধা করিতে অপারগ হয় এবং জেনারেল টাউনসেন্ডের নেতৃত্বে ১৩,০০০ সৈন্যের একটি বৃটিশ সেনাবাহিনী ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে মোসোপোটামিয়ায় আত্মসমর্পণ করে। ওসমানীয়গণ আরবদের কোনো বিদ্রোহ আশা করে নাই, কিন্তু বৃটিশগণ একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করিতে তৎপর হইয়া উঠে। ফারটাইল ক্রিসেন্টের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত গোপন সংস্থাসমূহ শহর নিয়ন্ত্রণকারী তুর্কিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার মতো শক্তিশালী ছিল। অবশ্য সে সময় তুর্কিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার মতো যথেষ্ট প্রভাব ও স্বাধীনতার অধিকারি ছিলেন দুইজন আরব নেতা। তাঁহাদের একজন ওয়াহাবিদের নেতা ইবনে সউদ, যিনি পারস্য উপসাগরের পাড়ে আরব উপদ্বীপের পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহার পৈতৃক রাজ্য নজদ পুনর্দখল করিয়া তথায় শাসনরত। অপরজন ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান কর্তৃক মক্কার শরীফ পদে নিযুক্ত হোসেন। তিনি রসুলুল্লাহর (সঃ) বংশ হাশেমি গোত্রের একজন সদস্য এবং কার্যত লোহিত সাগরের পাড়ে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হেজাজের শাসক।

ইরানের সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় আমরা ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং লন্ডনের বৃটিশ সরকারের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার কোম্পানি বিলোপ করিয়া স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের গুরুত্বের দরুন ইহাকে একটি পৃথক বিভাগের মাধ্যমে শাসন করা হয়। এবং ইহা উপনিবেশিক দফতরের আওতাধীন ছিল না। বৃটিশ মন্ত্রিপরিষদে ভারতবর্ষের জন্য একজন সেক্রেটারি থাকেন এবং কালক্রমে যেসকল ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করেন তাহারা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেন যদ্বারা প্রত্যেক নীতি ভারত প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট বৃটেনের একটি প্রধান আগ্রহ হইল ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার রাখা। ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারি ব্যক্তিবর্গ যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত এবং ভারতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া দাবি করেন, তাই তাঁহারা মনে করেন যে 'নেটিভদের' (স্থানীয় অধিবাসী) সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা তাহারা 'লন্ডন সরকারের' চাইতে ভাল জানেন। তবে লন্ডন দিল্লির নীতি নির্ধারণী ব্যাপারগুলি ছাড়িয়া দিতে নারাজ। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত লন্ডন সরকার ও 'ভারত সরকারের' মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কখনো কখনো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইরান ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের বৃটিশ নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফারটাইল ক্রিসেন্টে অনুসৃত নীতি সম্পর্কে লন্ডন ও নয়াদিল্লির সহিত মত বিরোধ হয়। ভারতীয় মুসলমানগণ ইসলামের খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনি হইলেন ওসমানীয় সুলতান এবং তিনি গ্রেট বৃটেনের সহিত যুদ্ধরত। ভারত সরকার আশা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমাগণও খলিফার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হইবে। অতএব তাহারা আরবদের মধ্যে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত করাইবার বিরোধী। তাহারা পারস্য উপসাগরের শেখদের সতি বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করে এবং ইবনে সউদকে নজদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা ইহাদের সবাইকে কর প্রদান করে এবং সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বন্ধুভাবাপন্ন থাকে।

অবশ্য লন্ডন সরকার তুর্কিদের বিরুদ্ধে আরবদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংঘটিত করাইবার নীতি গ্রহণ করে। বৃটিশগণ হোসেনের ওসমানীয় বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও

ওয়াকিফহাল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ মনোভাব জানিবার জন্য মিসরে বৃটিশ উপ-রাষ্ট্রদূত লর্ড কিচেনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কিচেনার যুদ্ধ সচিব হিসাবে মক্কার শরীফ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিসরের হাইকমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমাহনকে উপদেশ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে শরীফ হোসেন তাহার ওসমানীয় সমর্থক তৃতীয় পুত্র ফয়সলকে দামেস্ক প্রেরণ করেন। তাহার আনুগত্য সম্পর্কে তুর্কিদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সিরীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করাও ছিল এই দামেস্ক সফরের উদ্দেশ্য। এই সফরেই ফয়সল ধর্মনির্বিশেষে আরব জাতীয়তাবাদী মত গ্রহণ করেন। তিনি ফাতাত গোপন সংস্থার একজন সদস্য হইয়া যান এবং ইহার নেতাদের সহিত তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাব্যতা এবং বৃটিশ সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই নেতৃবৃন্দ ফয়সলকে 'দামাস্কাস প্রটোকল' নামক একটি দলিল প্রদান করেন। এই দলিলে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার শর্তাবলী উল্লেখ থাকে। শরীফ হোসেন এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে পরবর্তী চুক্তিসমূহ এই দলিলের শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া স্বাক্ষরিত হয়।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই হইতে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই মার্চ পর্যন্ত ক্রিসেন্টের আরবদের পক্ষে শরীফ হোসেন এবং গ্রেট বৃটেনের পক্ষে স্যার হেনরি ম্যাকমাহন দশটি পত্র বিনিময় করেন–যে গুলি 'হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ' (Hussain McMahon Correspondence) নামে খ্যাত। এই পত্রালাপে ইহার প্রকৃতি ও সচরাচর চুক্তির ভাষায় দুইটি বিষয় সম্পর্কে অলোচনা হয়। একটি বিষয় হইল ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে হোসেন ওয়াদা করেন এবং গ্রেট বৃটেন জয়ী হইলে 'আরবদের স্বাধীনতা সমর্থন' করিতে ওয়াদা করে। তাঁহার পত্রালাপে হোসেন সিরীয় জাতীয়তাবাদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রকাশ করেন এবং জোর দিয়া বলেন যে, 'একজন মুসলমান ও খ্রিষ্টান আরবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, তাহারা উভয়ে একই পূর্বপুরুষের বংশধর।' অধিকন্ত হোসেন বা সিরীয় জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিতে 'আরব' বা 'আরবজাতি' বলিতে মিসর, উত্তর আফ্রিকা অথবা দক্ষিণ ও নজদ বুঝায় না।

পত্রালাপের দ্বিতীয় বিষয়—'স্বাধীন আরব জাতির' সীমানা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে পত্রালাপের ভাষা বিশেষত ম্যাকমাহনের পত্রের ভাষা অত্যন্ত বিদঘুটে। গ্রেট বৃটেন আরব জাতির সীমানা এই বলিয়া সীমিত করে যে 'দামেস্ক হোম্‌স, হ্যামা ও আলেপ্পো জিলার পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়ার অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আরব বলা যায় না; এবং তাই দাবিকৃত এলাকা হইতে এই অঞ্চলগুলি বাদ দেওয়া উচিত।' শরীফ হোসেন এই এলাকা বলিতে আধুনিক লেবানন এবং ইহার উত্তরের উপকূলীয় এলাকা বুঝেন, বিশেষত এই জন্য যে ম্যাকমাহন এই অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তদুত্তরে হোসেন বলেন যে, উপরোল্লিখিত সীমা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি সাময়িক মাত্র এবং আশা করেন যে, যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত তাঁহার বুঝাপড়ার ব্যাপারে গ্রেট বৃটেন তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

যুদ্ধের পর হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ এবং বিশেষত উপরোল্লিখিত সীমারেখার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা এক তিক্ত বিতর্কের সূত্রপাত করে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বর্ণনার 'দামেস্ক জিলার পশ্চিমে ...' বলিতে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত কিনা। আরবগণ জোরের সহিত বলে যে, ফিলিস্তিনও আরব রাষ্ট্রের অংশবিশেষ এবং ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের পর হইতে একের পর এক সমস্ত বৃটিশ সরকারগুলি স্বীকার করে যে, উপরোল্লিখিত বাক্য দ্বারা সিনাই হইতে তুরস্ক পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ বুঝায় এবং তন্মধ্যে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত। অথচ ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে

স্বয়ং স্যার হেনরি ম্যাকমাহন বলেন যে, 'তিনি বাদশাহ হোসেনের প্রতি তাঁহার ওয়াদায় ফিলিস্তিনকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।' এই প্রসিদ্ধ বিতর্ক সম্ভবত ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে 'ওয়েস্টারম্যান দলিল' (Westerman Papers) দ্বারা মীমাংসা হয়। স্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইনস্টিটিউট এই দলিলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে। পত্র সংকলনের মধ্যে বৃটিশ বৈদেশিক অফিসের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত দুইটি দলিলও অন্তর্ভুক্ত। এই দলিলগুলি প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মর্কিন প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়েস্টারম্যানের হাতে পড়ে। তিনি এই দলিলগুলি হুভার ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তর করেন এবং উপদেশ দেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে যেন এগুলি খোলা না হয়। দলিলগুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে, আরবদিগকে দেওয়া বৃটিশ প্রতিশ্রুতির মধ্যে ফিলিস্তিনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আরবদিগকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে বৃটিশ ভঙ্গ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কাউকে ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই। হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ বন্ধ হইবার ছয়মাস পর সাইকস্-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) সম্পাদন করিয়া বৃটিশ সরকার আরবদিগকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ইহা হইল গোপন ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের অংশবিশেষ এবং যাহা সম্পর্কে আরবগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ম্যাকমাহনের প্রতিশ্রুতির জোরে আরবগণ ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই জুন ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শাহজাদা ফয়সলের পরিচালনায় এবং প্রসিদ্ধ কর্ণেল টি. ই. লরেন্সের উপদেশে আরব সৈন্যগণ তুর্কি সৈন্য সামাবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সমগ্র তুর্কি যোগাযোগ লাইনে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যায়। আরব অফিসারদের অধিকাংশ ছিল সিরিয়ার ফাতাত গোপন সংস্থার এবং ইরাকের আহ্দ সংস্থার সদস্য। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাহারা আকাবা বন্দর অধিকার করে, যদ্দারা ১৯১৭ খ্রিষ্টব্দের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল এ্যাল্লেনবি কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার সহজতর হয়। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ফয়সল ও তাঁহার সৈন্যগণ বিজয়ীবেশে দামেস্কে প্রবেশ করেন। সাইকস্-পিকট চুক্তি স্মরণ করিয়া বৃটিশ সরকার জেনারেল এ্যাল্লেনবিকে দামেস্কে যাইয়া ফয়সল ও লরেন্সের কার্যাবলীতে বাধা প্রদান করিতে আদেশ করে। তবে ফয়সাল একটি 'সম্পূর্ণ স্বাধীন আরব শাসনতান্ত্রিক সরকর' গঠনের কথা ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি তুর্কিদের পিছু ধাওয়া করেন এবং উত্তরে হোম্স ও হ্যামা অধিকার করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তুর্কিগণ মার্জদাবিকের প্রান্তরে আত্মসমর্পণ করে। ইহা সেই একই প্রান্তর যেখানে ১৫০৮ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সেলিম সিরিয়া জয় করেন।

সাইকস্-পিকট চুক্তি

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধরত ত্রিপক্ষীয় (বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) আঁতাতের সদস্যদের মধ্যে তিনটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি হইল ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই মার্চের কন্সটান্টিনোপল চুক্তি, যদ্দারা উত্তর সিরিয়ার কিয়দংশ এবং এশিয়া মাইনরকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। দ্বিতীয়টি হইল ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিলের লন্ডন চুক্তি। ইতালি যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহার ভাগের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দাবি করিলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুই চুক্তি দ্বারা ফারটাইল ক্রিসেন্টকে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর বৃটিশ হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের ব্যাপারে ফ্রান্সকে অবহিত করে এবং পরামর্শ দেয় যে, তাহাদের উভয়ের একত্রে বসিয়া ফারটাইল ক্রিসেন্টে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। তদনুসারে বৃটেনের স্যার মার্ক সাইকস্ এবং ফ্রান্সের চার্লস জর্জেস পিকট ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরে রাশিয়া ও ইতালি এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়। আরবদিগকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সামান্যতম সম্মানও প্রদর্শন না করিয়া ফারটাইল ক্রিসেন্টকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। রাশিয়ার হস্তক্ষেপের দরুন পবিত্র স্থানগুলির জন্য ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিক করা হয়। অবশিষ্ট অংশ হাইফার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে একটি সরল রেখা উত্তর পূর্বে পারস্য সীমান্তে মৌসূল পর্যন্ত টানিয়া ভাগ করা হয়। এই রেখার উত্তর অংশ ফ্রান্সের এবং দক্ষিণ অংশ গ্রেট বৃটেনের। তদুপরি উত্তর অংশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি সরাসরি ফরাসির আওতাধীন এবং অপরটি তাহার 'প্রভাবাধীন'। অনুরূপভাবে দক্ষিণ অংশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, একটি সরাসরি বৃটিশ আওতাধীন এবং অপরটি তাহার 'প্রভাবাধীন'।

সাইক্স-পিকট চুক্তি ছিল গোপন কিন্তু ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বলশেভিকগণ ইহা তাহাদের বিজয়ের পর সাধারণের মধ্যে ফাঁস করিয়া দেয়। তুরস্কের জামাল পাশা বাদশাহ হোসেনের নিকট এই চুক্তি প্রেরণ করেন এবং পৃথক একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন। হোসেন বৃটিশদের নিকট ব্যাখ্যা চাহিয়া পাঠান এবং তাহারা তিনবার তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে একটি আরব রাষ্ট্র গঠনে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য দান করিবে। আরবগণ এই সকল নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করে, সম্ভবত তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের পরাজয়ের মুখে একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তি নিরর্থক। আরবগণ ভালোর আশায় বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে নাই।

ইহুদিবাদ ও বালফার ঘোষণা

ফারটাইল ক্রিসেন্টে সদ্যাগত আরব জাতীয়তাবাদ প্রারম্ভেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছাড়াও ফয়সাল ও তাঁহার আরব জাতীয়তাবাদী উপদেষ্টাদিগকে অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলাও করিতে হয়। সিরিয়া—লেবাননের খ্রিষ্টানগণ, বিশেষত মেরোনাইটগণ মুসলমানদের নিকট হইতে পৃথক এবং একটি বিদেশী শক্তির আশ্রয় দাবি করে। উদারপন্থীদের 'আরববাদ' বিরোধী স্থানীয় উলামাদের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত প্যান-ইসলামিগণ একটি ইসলামি রাষ্ট্র দাবি করে। আবার হেজাজ ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের বেদুইনগণ বিশেষ কোনো রাষ্ট্রেরই তোয়াক্কা করে না। আরব জাতীয়তাবাদ শান্তি ও সময় পাইলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিত, যদি না ইহাকে এক নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করিতে হইত। এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ইহুদি জাতীয়তাবাদ। ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে এই জাতীয়তাবাদ দৃশ্যে অবতরণ করে।

ইহুদি জাতীয়তাবাদ বা ইহুদিবাদের উৎপত্তি হিব্রু ধর্মীয় ইতিহাসে নিহিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে—ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ইসলাম- যাহাদের একে অপরের সহিত ধর্মতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান, একমাত্র ইহুদি ধর্মই পৃথক। ইহুদিরা বিশ্বাস করে যে ইহার অনুসারিগণ জন্ম,

ঐতিহ্য এবং ইব্রাহীম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক ইহার নিকট প্রদত্ত বিশেষ অঙ্গীকারের ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হইতে পৃথক। অধিকন্তু, প্রাচীনকালে কানান এবং আধুনিককালে ফিলিস্তিন নামে পরিচিত এই বিশেষ ভূখণ্ডটিকে আল্লাহ ইহাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যেখানে তাহারা অপরের সহিত আন্তঃবিবাহাদির সংশয় হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহাদের ধর্মচর্চা করিতে পারিবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কানানে ইহুদিরা কখনও একমাত্র বসবাসকারী ছিল না। যশুহর সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত আদি অধিবাসিগণ নিশ্চিহ্ন হয় নাই, বরং সে দেশেই থাকিয়া গিয়াছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দীকালের মধ্যে ইহুদি ধর্মে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি হইল পুরোহিত ধারা যাহা রীতি ভিত্তিক, সাধারণত পৃথক থাকিবার নীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় অলঙ্কার বর্জিত। অপরটি হইল প্রত্যাদিষ্ট ধারা, যাহা রীতিনীতি বিরোধী, সাধারণত সহ অবস্থানে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনকারী। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে বেবিলনীয় বন্দীদশা, বিশেষত শেষ রোমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহুদিগণ ক্রমশ বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যেখানেই যায় তাহারা সেখানেই এই দুই চিন্তাধারা সঙ্গে লইয়া যায়। প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদিগণ জেরেমিয়াহ্, ইসাইয়া, মিকাহ্ ও অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট মনীষীদের উপদেশ অনুসরণ করে। ইহারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইহুদিদিগকে যেখানেই থাকুক "ঘর নির্মাণ করিতে ... বাগান তৈয়ার করিতে, বিবাহ করিয়া পুত্রকন্যা জন্ম দিতে" উপদেশ প্রদান করেন, "কারণ সেই শান্তির মধ্যেই তোমরা শান্তি পাইবে।" কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদিগণ ধর্মসঙ্গীত ১৩৭ (Psalm 137)-এর লেখকের ন্যায় মনীষীদের উপদেশ অনুকরণ করে। ধর্মসঙ্গীত ১৩৭-এর লেখক বলেনঃ "ওহে জেরুজালেম, আমি যদি তোমাকে ভুলিয়া যাই তবে আমার ডানহাত নিশ্চিহ্ন হোক, আমার জিহ্বা তালুর সঙ্গে লাগিয়া যাক, যদি আমি তোমাকে স্মরণ না করি, যদি আমি জেরুজালেমকে আমার সর্বোচ্চ আনন্দে স্থান দান না করি।" প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদিগণ মন্দিরকে "সব লোকের উপাসনা গৃহ" বলিয়া মনে করে, কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদিগণ ইহাকে শুধুমাত্র ইহুদিদের জন্য বলিয়া মনে করে। এই শ্রেণী মনে করে মসিয়াহ্ আল্লাহ্র রাজত্ব সৃষ্টি করিবেন; অপর শ্রেণী মনে করে তিনি দাউদের রাজত্ব সৃষ্টি করিবেন।

এই আলোচনার প্রকৃত কথা এই যে পুরোহিত শ্রেণীর অনুসারিগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বংশপরম্পরায় ইহুদিদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে দেশেই তাহারা বাস করুক না কেন সেখানে তাহারা "আগন্তুক"। একমাত্র ইয়ম কিপুর বা প্রায়শ্চিত্তের দিন (Day of Atonment) ব্যতীত সমস্ত ইহুদি পর্বগুলিই জাতীয় পর্বের ন্যায়। শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রার্থনার পর প্রত্যেক ইহুদি পরিবার 'আগামী বৎসর জেরুজালেমে'- এইরূপ কামনা করিয়া মদ্যপান করে এবং প্রার্থনার সময় প্রত্যেক ইহুদি জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পর্ব কামনা করিয়া মদ্যপান কিংবা প্রার্থনায় জেরুজালেমের মুখ করিবার অর্থ এই নহে যে অধিকাংশ ইহুদি কানান বা ফিলিস্তিনে যাইয়া বসবাস করিতে চায়। ইহা অনেকটা মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবার ন্যায়। কেউ কেউ জেরুজালেম যায় তীর্থ পালনের উদ্দেশ্যে, আবার ফিরিয়া আসে কিন্তু সেই নগর বা দেশকে কখনও তাহারা ভুলিয়া যায় না। তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে এবং যখনই তাহাদের উপর অত্যাচার হয়, তখনই "প্রত্যাবর্তন" এবং 'দাউদের রাজত্বের' কথা তাহাদের মানসপটে ফুটিয়া উঠে।

রাজনৈতিক ইহুদিবাদ

ইউরোপের নব জাগরণ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম হইতে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নকরণের যুগে পশ্চিম ইউরোপে ইহুদিদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইহুদি আস্তানাসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়ার আওতায় আগত ধর্মভীরু ইহুদিগণ প্রত্যাদিষ্ট শ্রেণীকে পুনর্জীবিত করে এবং শাশ্বত ইহুদিধর্ম প্রবর্তন করে। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের শাশ্বত ইহুদিগণ "সত্যের রাজত্বের" কথা বলাবলি করে এবং নিজদিগকে আর "একটি জাতি নহে, বরং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করে। এবং এইজন্য ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন, হারুনের পুত্রদের অধীনে কোরবানীর পূজা পুনরারম্ভ বা ইহুদি রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কোনো আইনের প্রত্যাশা তাহারা করে না।" অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইহুদি পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় তাহাদের বিভিন্ন আস্তানায় বসবাস করে, যেখানে নব জাগরণের ছোঁয়া কখনও প্রবেশ করে না। তাহারা সর্বত্র খ্রিষ্টান ধর্মান্ধতা ও ইহুদি নিধন যজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। তাহাদের বেশ কিছুসংখ্যক লোক মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আসা সত্ত্বেও গোঁড়া ইহুদি থাকিয়া যায় এবং আশা করে যে একদিন মসিয়াহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত দেশ ফিলিস্তিনে লইয়া যাইবেন এবং পুনরায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে থিওডর হেরজেল নামে একজন ইহুদি বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক তাঁহার ভিয়েনা পত্রিকার জন্য প্রসিদ্ধ ড্রেফুস বিচার পর্যবেক্ষণ করেন। একজন ফরাসি অভিজাত কর্তৃক কৃত একটি অপরাধের দোষ সম্পূর্ণভাবে ফরাসি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফুসের ঘাড়ে চাপানো হয় প্রধানত এই জন্য যে তিনি একজন ইহুদি। ড্রেফুসকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং জেলে আবদ্ধ রাখিবার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে সেমিটিক-বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ খেলিয়া যায়। কোনো কোনো উদারপন্থী এই জুয়াচুরি প্রকাশ করিয়া ড্রেফুসকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিলেও থিওডর হেরজেল এই শিক্ষা ভুলিয়া যান নাই। নব জাগরণের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে ইহার অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সত্ত্বেও যদি এইরূপ সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের গোপন ধারা চলিতে থাকে তবে ইহুদিদের একমাত্র ভরসা হইল ইউরোপ ত্যাগ করা এবং নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই মনোভাব তিনি তাঁহার "ইহুদি রাষ্ট্র" (Der Judenstaat) নামক গ্রন্থে ব্যক্ত করেন এবং আধুনিক ইহুদিবাদ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

প্রারম্ভ হইতে ইহুদিবাদ হইল উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি চিন্তাধারার সংমিশ্রণ। একটি হইল 'প্রতিশ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তনের' ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা– যাহা ইহুদি-বিরোধী কার্যকলাপ এবং অত্যাচার হইতে পলায়নের প্রয়োজনের দ্বারা জোরদার হয়। অপরটি হইল উনবিংশ শতাব্দীর উদার ও বিচিত্র জাতীয়তাবাদ, যাহা রাষ্ট্রকে উঁচু করিয়া দেখে এবং ইহার মধ্যে মানবতার দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের সোপান অবলোকন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রচলিত চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপন করিবার দ্বারাই সেমিটিক বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। ইহা তৎকালীন কিছুসংখ্যক অ-ইহুদি উদারপন্থিদিগকেও অনুপ্রাণিত করে। সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপে ইহুদিগণ ভয় পায়, আর এই সকল উদারপন্থিগণ লজ্জিত হয়।

ইহুদিবাদ সংগঠনের প্রথম দিকে গোঁড়া ও উদারপন্থী ইহুদিদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়। গোঁড়া ইহুদিদের মতে ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অথচ ধর্ম নিরপেক্ষ

ইহুদিদের মতে রাষ্ট্রই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নহে। ধর্মনিরপেক্ষবাদী থিওডর হারজেল এবং তাঁহার কোনো কোনো সহকর্মী আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা যেখানেই পাওয়া যায় এরূপ একটি দেশের পরামর্শ দান করেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খাঁটি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নিকট ফিলিস্তিনের একটি আবেগময় আবেদন রহিয়াছে, যাহা অন্য কোনো স্থানের নাই। একবার ফিলিস্তিনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ধর্মীয় ও অজ্ঞেয়বাদী ইহুদিগণ উভয়ে এক যোগে সেই একক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ চালাইয়া যায়।

ইহুদি উপনিবেশিকতা

ফিলিস্তিন ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ। ইহাকে একটি ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজনের খাতিরে ইউরোপ হইতে দলে দলে ইহুদি আনয়ন করিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল সর্বস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। অতএব ইহুদিদিগকে তাহাদের স্বদেশী বাকি ইউরোপীয়দের ন্যায় একই পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিনে উপনিবেশ স্থাপন করিবার কাজ তদারক করা ও অর্থ জোগাইবার জন্য ইহুদিবাদিগণ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ প্রতিষ্ঠা করে, যথা 'ইহুদি কলোনিয়াল ট্রাস্ট (Jewish Colonial Trust) 'কলোনাইজেশন কমিশন' (Colonization Commission) ইহুদি ন্যাশনাল ফান্ড (Jewish National Fund) 'ফিলিস্তিন অফিস' (Palestine Office) এবং 'ফিলিস্তিন ল্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট কোম্পানি' (Palestine Land Development Company)। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা শুনিয়া হারজেল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সহিত একটি সাক্ষাতের আয়োজন করে এবং প্রস্তাব করেন যে সুলতান ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি উপনিবেশের অনুমতি দান করিরেন একটি ইহুদি অর্থনৈতিক পরিষদ সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈদেশিক ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে। আবদুল হামিদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, অবশ্য তিনি সীমিতসংখ্যক ইহুদিদিগকে ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করিবার অনুমতি দানের প্রস্তাব দেন, তবে তাহাদিগকে ওসমানীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। হেরজেল ও তাঁহার বন্ধুগণ ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি উপনিবেশের বিনিময়ে সমস্ত ইহুদিদের আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব দেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদিবাদীদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট বৃটেনই একমাত্র শক্তি যে তাহাদিগকে সাহায্য দিতে পারে। হেরজেল ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে সেসিল রড্‌সকে এবং ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে জোসেফ চ্যাম্বারলিনকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে হেরজেল পরলোকগমন করেন এবং কয়েক বৎসর পর ডাঃ চেইম ওয়াইজম্যান নামক একজন রসায়নবিদ ও মূল বৃটিশ নাগরিকের সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর ইহুদিবাদী আন্দোলনের দায়িত্ব অর্পিত হয়। হেরজেল ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ কয়েকটি বৃটিশ সরকারকে তাঁহাদের অনুরোধে সাড়া জাগাইতে ব্যর্থ হন, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদিবাদী ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির প্রথম ঘোষণা প্রকাশিত হয় বৈদেশিক সচিব লর্ড বালফার কর্তৃক অর্থ পরিবেশক লর্ড রথচাইল্ডের নিকট ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর লিখিত একটি পত্রের দ্বারা। এই পত্রই 'বালফার ঘোষণা' নামে পরিচিত।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর এই দুইটি সংক্ষিপ্ত বৎসরের মধ্যে গ্রেট বৃটেন তিনটি দলের সহিত মহৎ চুক্তি সম্পাদন করে, যেগুলি পরস্পরবিরোধী। গ্রেট বৃটেন বোকামি করিয়া বা ইচ্ছাকৃত অসদুদ্দেশ্যে এইগুলি সম্পাদন করিয়াছে বলিয়া মনে করা সম্ভবত ঠিক নহে। যুদ্ধের দুর্বিপাকে একটি 'দুর্ভাগ্যজনক ভুল' বলিয়া সমগ্র ব্যাপারটিকে উড়াইয়া দেওয়াও সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সুবিবেচনার সহিত বৃটিশ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য। কিন্তু কখনো অভাবিত কিছু ঘটিয়া গেলে সাম্রাজ্যের মঙ্গলার্থে পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং এই পরিবর্তনে কোনো পক্ষ বিরূপ হইলে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। ইহাই সাম্রাজ্যবাদী খেলার নিয়ম।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ নীতি ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, যদ্দ্বারা বৃটেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। অবস্থার পরিবর্তন না হইলে গ্রেট বৃটেন হয়ত তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিত। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষত ফ্রান্সের নিকট হইতে চাপ আসে। তাহারা ফারটাইল ক্রিসেন্টে স্বীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ করিবার দাবি করে। বৃটেন এতদঞ্চলের দক্ষিণ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে শুধু ফ্রান্সকে উত্তর ভাগ দান করিবার পর। ইহাই ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের সাইসক-পিকট চুক্তির মূল কথা। ফিলিস্তিনকে আন্তর্জাতিকীকরণের দাবি তুলিয়া রাশিয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া তোলে, কারণ, অত্র অঞ্চলে রুশ অর্থডক্স চার্চের স্বার্থ জড়িত। আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে ফরাসিগণও জড়িত হয়, কারণ পবিত্র স্থানগুলিতে তাহাদের স্বার্থও নিহিত। ইহা বৃটিশ নীতি নির্ধারকদিগকে বিশেষত ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, কারণ ফ্রান্সকে সুয়েজ খালের অত নিকটবর্তী হইতে দিবার ব্যাপারে তাহারা নারাজ। ইহুদিবাদিগণ সর্বদা যুক্তি প্রদর্শন করে যে, ফিলিস্তিনে জাতীয় আবাসভূমি হইলে অত্র অঞ্চলে গ্রেট বৃটেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং ফিলিস্তিনে একটি কৃতজ্ঞ ইহুদিবাদি সরকার সর্বদা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধু থাকিবে।

বৃটিশ সরকারের সহিত এই সহজ চুক্তির কঠিন বাধা আসে বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদ-বিরোধী ইহুদিদের পক্ষ হইতে। বালফার ঘোষণার মূলবচন পরীক্ষা করিলে ইহা পরিষ্কার হইয়া পড়ে। 'মহামহিম সম্রাটের সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদি লোকদের একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে সম্প্রীতির চোখে দেখে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করিবে, তবে পরিষ্কারভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, ফিলিস্তিনে বসবাসকারী অ-ইহুদি সম্প্রদায়ের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করে এইরূপ কোনো কাজ করা হইবে না অথবা অন্য যে কোনো দেশে বসবাসকারী ইহুদিদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হইবে না।'

শেষ বাক্যটি সংযুক্ত করা হয় ইহুদিবাদ-বিরোধী ইহুদিদের ভয় দূর করিবার জন্য। ইহারা ইহুদি সমস্যার সমাধান দেখিতে পায় সংমিশ্রণের মধ্যে, পৃথকীকরণের মধ্যে নহে এবং তাই একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হউক ইহা তাহারা চায় না। প্রথম বাক্যে'জাতীয় 'আবাসভূমি' বলিতে যে, 'জাতীয় রাষ্ট্র' বুঝায় তাহা ইহুদিবাদিগণ এবং সম্ভবত বালফারও হৃদয়ঙ্গম করেন। ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলনে রাষ্ট্রের পরিবর্তে 'আবাসভূমি' ব্যবহারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ইহুদিবাদের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ডঃ ম্যাক্স নরদও (Dr. Max Nordau)-এর

ভাষায় 'সুবিধাবাদের স্বার্থে' এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহুদিবাদিগণ সম্ভবত বিশ্বাস করে যে ফিলিস্তিনবাসীদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন না করিয়াই তাহারা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপন করিতে পারিবে। পরবর্তী ফয়সাল-ওয়াইজম্যান চুক্তির দ্বারা তাহা নিশ্চিত করা হয়।

বালফার ঘোষণা শ্রবণ করিবার পর বাদশাহ্ হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া যান। 'বর্তমানে বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলে' ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি বসতির অনুমতি দেওয়া হইবে –এই ব্যাপারে হোসেনকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরব ব্যুরোর অধিনায়ক হোগার্থকে কায়রো প্রেরণ করে। বৃটিশগণ ইহুদিবাদীদিগকে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে বাদশাহ হোসেনকে উপদেশ প্রদান করে এই জন্যও যে 'আরবদের বিষয়ে বিশ্বের ইহুদিদের বন্ধুত্ব তাহাদের সমর্থনের সমান, বিশেষত যে সকল দেশে তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান।' কিছুকাল পর একটি ইঙ্গ-ফরাসি যুক্ত ঘোষণা 'জনসাধারণের স্বাধীন নির্বাচিত' একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে আরবদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করে। বাদশাহ হোসেন ও ফয়সাল উভয়ে এই সব প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রলুব্ধ হন এবং সাইক্স্ -পিকট চুক্তির ন্যায় এইগুলিকেও গ্রহণ করেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইলে তিনটি দল ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বত্র বা কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। প্রথম ও শক্তিশালী দল হইল ইঙ্গ-ফরাসি দল। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে 'বৃহৎ চতুষ্টয়' গঠন করে এবং শান্তি সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স ঐক্যমতে পৌঁছিতে ব্যর্থ হয়। পূর্বাঞ্চলে ফ্রান্স যেহেতু কোনো যুদ্ধ করে নাই, তাই বৃটিশ সৈন্যগণ সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট তাহাদের অধিকারে রাখে এবং কোনো এলাকা ছাড়িয়া দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অপরদিকে ফ্রান্স সাইক্স্-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। তাহারা প্রায় ২০,০০০ ফরাসি সৈন্য লেবাননে আনয়ন করে এবং বৃটিশদিগকে এ স্থান ত্যাগ করার দাবি তোলে। এইদিকে বৃটিশগণ তেল সমৃদ্ধ মৌসুল এবং ফিলিস্তিনের 'আন্তর্জাতিকীকরণের' ব্যাপারে চুক্তির কিছু রদবদল প্রত্যাশা করে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তৃতা চালাকালীন বিবাদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্বিরোধের ফলে পরস্পরকে দোষী সাব্যস্তকরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তারের প্রত্যাশী দ্বিতীয় দলটি হইল ইহুদিবাদী সংগঠন। ইহুদিবাদিগণ আরবদের চাইতে অধিক শক্তিশালী, কারণ তাহাদের দাবি পূরণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য 'বৃহৎ চতুষ্টয়ের' দেশগুলিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে। বালফার ঘোষণাকে তাহারা তাহাদের ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হিসাবে রাখিতে চায় না। তাহারা ইহাকে মধ্যপ্রাচ্যের নীতি নির্ধারক সমস্ত কিছুর মধ্যে স্থান দিতে চায়। অবশ্য অনেক ইহুদিও রহিয়াছে যাহারা এই ইহুদিবাদী পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় আমেরিকান ইহুদি প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ইউরোপে অনেক নেতৃস্থানীয় ইহুদিও রহিয়াছেন যাহাদের মতে ইহুদিবাদ তাঁহাদের মর্যাদাকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে এবং আরও ব্যাপক সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের সুযোগ করিয়া দিতেছে।

ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রাধান্য প্রত্যাশী তৃতীয় ও দুর্বলতম দল হইল ফয়সালের প্রতিনিধিত্বে অত্র অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ। আরবগণ গ্রেট বৃটেনের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা দাবি করে। তাহারা তাহাদের আশা–আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত করে উড্রু উইলসনের উপর এবং তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শের উপর–যে আদর্শ ইঙ্গ-ফরাসি জোট ও ইহুদিবাদিগণ নিজেদের উপর ছাড়া অন্য কোথাও প্রয়োগ করিতে চায় না। দুর্বল আরবগণ নিজেদের অন্তর্বিরোধের দরুন আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণভাবে খ্রিষ্টানগণ এবং মেরোনাইটগণ একটি সংখ্যাগুরু মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হইতে ভয় পায়। মেরোনাইটদের পুরাতন রক্ষাকারী হিসাবে ফ্রান্স 'সিরিয়ান কমিশন' নামে একটি দল গঠন করে। এই কমিশন প্যারিস গমন করে এবং ফয়সাল ও তাঁহার মুসলিম আরবদের ইউনিয়নের বিরোধিতা করে। অধিকন্তু বাগদাদ ও দামেস্কের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। কেউ কেউ একটি যুক্তরাজ্য চান, আবার কেউ কেউ সম্ভবত বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া দুইটি রাষ্ট্রের এক ফেডারেশন পছন্দ করেন।

ফয়সাল লন্ডন গমন করেন এবং প্রথমবারের মতো সাইক্স্-পিকট চুক্তি সম্পর্কে অবগত হন। বৃটিশগণ তাঁহাকে ফরাসিদিগকে গ্রহণ করিতে বলে এবং ইহুদিবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁহার সম্মানে এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। ফয়সাল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বলিয়া যান, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে বাস্তব রাজনীতিতে এই সকল আদর্শের কোনো স্থান নাই। সম্ভবত এই বোধশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে ইহুদিবাদী সংগঠনের পুরোধা ওয়াইজম্যানের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই দলিলে ফয়সাল 'ব্যাপকহারে ইহুদিদের ফিলিস্তিন আগমন' গ্রহণ করেন, তবে শর্ত হইল "আরব কৃষক ও প্রজা-চাষীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।" অপরদিকে ইহুদিবাদিগণ 'ফিলিস্তিনে বিশেষজ্ঞদের একটি দল প্রেরণ করিয়া ফিলিস্তিনের তথা আরব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা জরিপ করিতে' সম্মত হয়। একটি 'আরব রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষে ফয়সাল স্বাক্ষর করেন, কিন্তু পরিণামে তাহা প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। এই চুক্তি পরবর্তী অনেক রক্তপাত হয়ত এড়াইতে পারিত যদি না আরব রাষ্ট্রবিরোধী সাইকস্-পিকট চুক্তি মাঝখানে থাকিত।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসন মনে করেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাঁহার চৌদ্দ দফা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমস্ত গোপন চুক্তিসমূহ বাতিল করিয়াছে। উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য জাতিপুঞ্জের হুকুমনামা প্রথার ভূমিকায় একটি আপোস করা হয়। ইহার ভিত্তি হইল এই যে, আরবগণ নিজস্ব সরকার গঠন করিবার ন্যায় উপযুক্ততা অর্জন করে নাই এবং একটি হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি তাহাদিগকে এই বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। প্রেসিডেন্ট উইলসন এই আদর্শ গ্রহণ করেন, কারণ ইহা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদর্শ প্রত্যাখ্যান নহে, স্থগিত করা মাত্র। কিন্তু কোন শক্তি কোন কোন এলাকায় হুকুমনামা লাভ করিবে তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। উইলসন ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি যুক্ত কমিশন প্রেরণ করিয়া জনমত যাচাই করিবার প্রস্তাব করেন। ফ্রান্স ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, বৃটেন কোনো মন্তব্য হইতে বিরত থাকে এবং ইহুদিবাদিগণ ইহার বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন অত্র অঞ্চলে কিং-ক্রেন কমিশন প্রেরণ করেন। কমিশন

উহার রিপোর্ট লইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে উইলসন পরাজিত ও রুগ্নব্যক্তিতে পরিণত হন। শুধু একটি ছাড়া তাঁহার চৌদ্দ দফার প্রত্যেকটি পরিবর্তন করা হয় কিংবা প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা কার্যকারিতা মূলতবি রাখা হয়। অবশিষ্ট একটি দফা, জাতিপুঞ্জ বাস্তব রূপ লাভ করে, কিন্তু তাঁহার স্বীয় দেশ উহা প্রত্যাখ্যান করে। তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নাই।

শান্তি সম্মেলন শেষ নাগাদ সাইক্স্-পিকট চুক্তি, ফিলিস্তিন ও হুকুমনামা লইয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। ইহুদিবাদিগণ বালফার ঘোষণাকে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা হিসাবে রূপদান করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য আরবগণ একটি তুর্কি মুসলিম প্রভুর–যাহার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করে–স্থলে দুইটি ইউরোপীয় খ্রিষ্টান প্রভুর পদসেবায় নিয়োজিত হয়।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়
হুকুমনামার (Mandate) অধীনে ফারটাইল ক্রিসেন্ট

হুকুমনামা প্রদানের একটি উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে একটি নূতন নামে তাহাদের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ চালাইতে পারে উহার ব্যবস্থা করা। ইহা হইল জাতিপুঞ্জের আশীর্বাদ লইয়া 'শ্বেতাঙ্গ লোকের বোঝা' বৃদ্ধি। হুকুমনামা–প্রথা সাইক্স্-পিকট চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করে নাই। ইহা লইয়া বৃটেন ও ফ্রান্স দুইটি সমস্যায় উপনীত হয়। একটি হইল ফিলিস্তিন, অপরটি হইল তৈল সমৃদ্ধ মৌসূল। উভয় সমস্যাই প্যারিস সম্মেলনের বাহিরে সমাধান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল স্যান রেমোতে ইহার নিষ্পত্তি হয়। গ্রেট বৃটেনকে ফিলিস্তিনের হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহুদিবাদীদের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, জাতিপুঞ্জ গ্রেট বৃটেনকে বালফার ঘোষণা কার্যকরী করিতে আদেশ দেয়। মৌসূল অঞ্চলে তৈল থাকার দরুন গ্রেট বৃটেন এই মর্মে সাইকস-পিকট চুক্তির রদবদল করিবার জন্য অনিচ্ছুক ফ্রান্সের নিকট ধর্ণা দেয়। এই অঞ্চলের উপর তুরস্কের আধিপত্য দাবি করিবার ফলে ব্যাপারটি আরও ঘোলাটে আকার ধারণ করে।

ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি

প্রাচীনকালে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ন্যায় উত্তর ইরাকেও তৈল রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাণিজ্যিক আকারে তৈল লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে উপদেশ দেওয়া হয়। একটি বিশেষ আদেশে ওসমানীয় সুলতান ও দ্বিতীয় আবদুল হামিদ মৌসূল ও বাগদাদ প্রদেশের অনুমতিপত্র 'বেসামরিক তালিকায়', অর্থাৎ নিজের নামে পরিবর্তন করেন।

১৯০৪ হইতে ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে অনেক বিদেশী তৈল অনুসন্ধানকারী দল অনুমতি লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। জার্মানগণ ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত দুৎসে ব্যাংকের (Deutche Bank) মাধ্যমে জড়িত হয়। ডি' আর্কির ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানির মাধ্যমে বৃটিশের স্বার্থ জড়িত থাকে। রয়েল ডাচ শেল কোম্পানি ইহার সহায়তাকারী এ্যাংলো-স্যাকশন তৈল কোম্পানির মাধ্যমে আগ্রহী হয়। শেষ পর্যন্ত তথাকথিত চেস্টার গ্রুপের মাধ্যমে মার্কিনগণও কথাবার্তা চালায়। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল হইতে মার্কিনদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য বৃটিশ, জার্মান ও ডাচ ব্যবসায়িগণ ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কি প্রেট্রোলিয়াম কোম্পানি গঠন করে। এই কোম্পানির অংশসমূহের মধ্যে বৃটিশ ৫০ শতাংশ এবং জার্মান ও ডাচগণ প্রত্যেকে ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ওসমানীয়দের সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হয় এবং ২৮শে জুন প্রধান উজির সাঈদ হালিম এক পত্রে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে, তাঁহার সরকার 'তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে এইগুলি (মৌসূল ও বাগদাদ) ইজারা দিতে এবং ... চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী ... স্বয়ং নির্ধারিত করিবার অধিকার রাখিতে রাজি।' প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে এই ব্যাপারে পরবর্তী কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়। কোম্পানি একটি সম্মতিপত্র ছাড়া কোনো অনুমতিপত্র লাভ করে নাই। পরবর্তী

বৎসরগুলিতে ইহার বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলা হয়।

এইদিকে মার্কিনগণের প্রতিনিধিত্ব করে চেষ্টার গ্রুপ। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এডমিরাল কলবি এম. চেস্টার নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন নৌবাহিনীর অফিসার পূর্ব এশিয়া মাইনর ও উত্তর মেসোপোটামিয়ায় রেলপথ নির্মাণের জন্য মহামান্য দরবার হইতে একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। রেলপথ চুক্তির মধ্যে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, কিরকুক ও মৌসুল হইয়া পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের উভয় পার্শ্বে ২০ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় তাহারা তৈলসহ অন্যান্য খনিজ দ্রব্যও অনুসন্ধান করিবে। তুর্কি গণপূর্ত মন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু বলকান যুদ্ধের ফলে অনুমোদন বিঘ্নিত হয় এবং ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুমোদন না পাওয়ায় এই অনুমতিপত্র অকেজো হইয়া যায়। পরবর্তীকালে এই অনুমতিপত্রের বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলা হয়।

বাহ্যত সাইক্স্ পিকট কেহই ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে এই সকল চুক্তিপত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার মধ্যে তাঁহারা তৈল সম্পর্কে বিবেচনা করেন নাই। তবে বৃটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা তৈল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁহাদের ধারণা তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানির অনুমতিপত্র কার্যকর। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকায় তৈলে অনুমতিপত্র বিসদৃশ্যকর। বৃটিশ বৈদেশিক সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই মে এক গোপন পত্রে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে এই অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনসুঁ (Clemenceau) লন্ডন সফরে গমন করিলে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মৌসুল তৈলের একটি অংশ এবং রুহরে ফরাসি দাবির পক্ষে বৃটিশ সমর্থনের বিনিময়ে ফ্রান্স গ্রেট বৃটেনকে স্থান দিতেও পারে। ইহার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নূতন চুক্তি অনুসারে তুর্কি পেট্রোলিয়ামের ২৫ শতাংশ শেয়ারের বিনিময়ে ফ্রান্স বৃটেনের নিকট মৌসুল প্রদেশ ছাড়িয়ে দেয়। এই ২৫ শতাংশের মূল মালিক ছিল জার্মানি। এই পরিবর্তন দেখাইবার জন্য নূতন মানচিত্র তৈরি করা হয় এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তবে স্যানরেমো চুক্তি তৈল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান দেয় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলে মার্কিন তৈল কোম্পানিগুলির আগ্রহ এবং মৌসূলের উপর তুর্কি জাতীয়তাবাদীদের দাবির ফলে বিষয়টি ঘোরালো আকার ধারণ করে। স্যানরেমোতে উপস্থিত একজন মার্কিন পর্যবেক্ষক তৈল অনুমতিপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মার্কিন তৈল কোম্পানিগুলির জন্য এক সংস্থায় একটি অংশ দাবি করে। মার্কিন যুক্তির ভিত্তি হইল সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করিয়াছে। তদুপরি, বৃটেন ও ফান্স কর্তৃক একটি তৈল-অনুমতিপত্রের উপর একচেটিয়া অধিকার লাভ মার্কিন অবারিত দ্বার নীতির পরিপন্থি। পরে যুক্তরাষ্ট্র চেস্টারের অনুমতিপত্র উত্থাপন করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে যে ইহাও তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানির ন্যায় বহাল রহিয়াছে।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বাদানুবাদ চলিতে থাকে এবং ল্যুজ্যানের (Lausanne) সম্মেলনে ইহা একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই সম্মেলনে আতাতুর্ক মৌসূল প্রদেশ দাবি করেন। এক সময় তুর্কি ও মার্কিনগণ একটি সমঝোতা লইয়া আলোচনা করে, যদ্বারা

মার্কিনগণ তুর্কিদিগকে মৌসূল লাভে সহায়তা করিলে বিনিময়ে তুর্কিগণ মার্কিনদিগকে মৌসূল তৈলদান করিবে। ইতোমধ্যে বৃটিশগণ বুঝিতে পারিল যে ইরানের[১] ন্যায় ইরাকের তৈল ব্যবসায়ে তাহারা মার্কিনদিগকে দূরে রাখিতে পারিবে না। জাতিপুঞ্জের পরিষদ মৌসূল প্রশ্নে গ্রেট বৃটেনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তুর্কিগণ বৃটিশদের সহিত সমঝোতায় আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব কিঞ্চিত সীমান্ত রদবদল এবং তৈল হইতে সেলামি বাবদ ১০ শতাংশ শেয়ার লইয়া তুর্কিগণ মৌসূল হইতে তাহাদের দাবি প্রত্যাহার করে। মৌসূল তৈলের শেষ মীমাংসার কাহিনী এই স্থলে বিবৃত করিবার পক্ষে খুবই জটিল। একটি নূতন পন্থা অনুযায়ী ইরাকি সরকার তুর্কি পেট্রোলিয়াম কোম্পানিকে ২৪ খণ্ড জমির অনুমতিপত্র দান করে। এই কোম্পানির পরিবর্তিত নাম 'ইরাক পেট্রোলিয়াম'। বৃটিশ, ফরাসি, ডাচ ও মার্কিন গ্রুপগুলির প্রত্যেকে ২৩.৭৫ শতাংশ লাভ করে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সার্কিশ গুলবেংকিয়ানের (Sarkis Gulbenkian) হাতে যায়। সার্কিশ ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের মূল অনুমতিপত্রে একজন দালাল, যিনি যেভাবেই হউক পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় নিজের স্থান করিয়া লন। এই বন্দোবস্ত যেহেতু শুধু ২৪টি খণ্ডের জন্য এবং ইরাকি সরকার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রতিযোগিতামূলকভাবে দিতে পারে তাই ইহাতে খুব প্রতিযোগিতা চলে এবং অধিকারের কলহ অনেকদিন চলিতে থাকে।

ফয়সাল এবং ফরাসিগণ

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, প্যারিস শান্তি সম্মেলন ফারটাইল ক্রিসেন্টের ব্যাপারে কোনো পরিষ্কার সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবি হইয়া যায়। ফয়সাল এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক আরব নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট উইলসনের কিং-ক্রেন কমিশনের উপর তাহাদের আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কমিশন ঐ এলাকা সফর করে এবং দুইটি হুকুমনামার সুপারিশ করে; একটি ইরাকে এবং অপরটি সিরিয়ায়। আরও সুপরিশ করে যে, বৃটেনকে ইরাকের হুকুমনামা ও যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার হুকুমনামা দেওয়া হউক, সিরিয়ার বিভক্তিকরণ মওকুফ করা হউক এবং ফয়সলকে সিরিয়ার শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ করা হউক। এই রিপোর্টে সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রান্সকে সিরিয়ার উপর হুকমনামা প্রদান করিলে যুদ্ধ বাধিবে। কিন্তু কেহই এই রিপোর্টের প্রতি কর্ণপাত করে নাই এবং এমনকি তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে ইহা প্রকাশও করা হয় নাই।

তবে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ফরাসি চুক্তির দ্বারা আরবগণ হতাশ হয়, যাহাতে দেখানো হয় যে, সাইক্স্-পিকট চুক্তি তখনও দাফতরিক নীতি। ফরাসি সেনাবাহিনী বৃটিশদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ফয়সলের প্রতিবাদ নিষ্ফল প্রতীয়মান হয়। ইঙ্গ-ফরাসি নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ফাতাত সোসাইটর নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মার্চ সিরীয় কংগ্রেস দামেস্কে মিলিত হয় এবং সিরিয়ার (তন্মধ্যে লেবানন এবং ফিলিস্তিনও শামিল) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহারা ফয়সলকে রাজমুকুট গ্রহণ করিতে আহ্বান করে এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। বৃটিশ ও ফরাসি সরকারদ্বয় কংগ্রেসের কার্যাবলী অগ্রাহ্য করে এবং স্যানরেমোর সম্মেলনের প্রস্তুতি চালাইয়া যায় যাহা ফারটাইল ক্রিসেন্টের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

---

১. *নীচে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৫৮, ৩৫৯।*

**তুরস্কের গোপন বিভক্তিকরণ ও সাইক্স-পিকট চুক্তি।
১৯১৫ খ্রীঃ -১৯১৭ খ্রীঃ**

ইস্তাম্বুল
রাশিয়া
আঙ্কারা
তুর্কী
ইজমির
ইতালীয়
মৌসুল
ইরান
ফরাসী
দামেস্ক
বাগদাদ
বৃটিশ
মিশর
০ ২০০
মাইল

ম্যাণ্ডেট প্রথা-১৯২০ খ্রীঃ

ইস্তাম্বুল
সোভিয়েত
রাশিয়া
আঙ্কারা
তুর্কী প্রজাতন্ত্র
মৌসুল
ইরান
ফরাসী
দামেস্ক
বাগদাদ
মিশর
০ ২৫০

ফরাসি ও সিরীয়গণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সিরিয়ায় নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত জেনারেল গোরোদ (General Gourand) ফয়সলের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে ফরাসি হুকুমনামা গ্রহণ করিতে, ফরাসি কাগজী মুদ্রা চালু করিতে, ফরাসিদের আলেপ্পো অধিকার স্বীকার করিতে, সিরীয় সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে, বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান বন্ধ করিতে এবং ফরাসিবিরোধী বিক্ষোভের জন্য দায়ী লোকদের শাস্তি প্রদানের দাবি করেন। সিরীয়গণ বাধা প্রদান করিতে চায় কিন্তু তাহাদের গোলাবারুদের পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মতো। ফয়সাল চরমপত্র গ্রহণ করেন যদ্বারা ফরাসি জেনারেল নিশ্চয়ই হতবাক হইয়া যান, কারণ তিনি আরও আটটি জটিল দাবি প্রেরণ করেন। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ফরাসিগণ সমগ্র সিরিয়া দখল করিতে চায়। ফলে, যুদ্ধ কিছুতেই এড়ানো গেল না। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই-এর সংঘটিত মাইসালানের যুদ্ধ অর্ধেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ফরাসি বাহিনীর আফ্রিকান, আলজেরীয়, মরক্কো ও সেনেগলী সৈন্যগণ দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৫শে জুলাই তাহারা শহরে প্রবেশ করে এবং ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর বিজয়ীবেশে প্রবেশের ২২ মাস পর ফয়সাল দামেস্ক ত্যাগ করেন। ফরাসিদের সহিত বৃটিশদের সুসম্পর্ক বিদ্যমান এবং আরবদের খাতিরে তাহারা উহা ভঙ্গ করিতে নারাজ। তবে তাহারা ফয়সালকে সসম্মানে তাহাদের এলাকায় গ্রহণ করে।

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জের পরিষদ সিরীয়া-লেবাননের উপর ফরাসি হুকমনামা এবং ফিলিস্তিন ও ইরাকের উপর বৃটিশ হুকুমনামা অনুমোদন করে। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র এই হুকুমনামাগুলি স্বীকার করিয়া লয়।

সিরিয়া-লেবাননের উপর হুকুমনামা

শুধু সিরীয় ও লেবাননীদিগকে স্বীয় শাসন শিক্ষালাভ করিতে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে ফরাসিগণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হুকুমনামা লাভ করিয়াছে– ইহা চিন্তা করা হাস্যাস্পদ। এখানে সেখানে সম্ভবত কোনো কোনো ফরাসি কর্মকর্তা এইরূপ চিন্তা করে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য লাভ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সম্ভবত ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যাহাদের কঠোর পরহিতকর উদ্দেশ্য রহিয়াছে; অতীতে যেরূপ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অপাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে ফরাসি সাংস্কৃতিক ছোঁয়াচ বিতরণ করিতে উচ্ছুক। সম্ভবত সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য ফ্রান্স অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদি বিসর্জন দিয়াছে, যাহা গ্রেট বৃটেন কখনও করিতে পারে নাই। ইহার সর্বোত্তম উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়, যেখানে মিসর ও ইরানের ন্যায় দেশে বৃটেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করে, অথচ তথায় ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবল।

লেবাননে ফরাসি স্বার্থ সুদূরপ্রসারী। ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেসঁ প্রেসিডেন্ট উইলসনকে নিশ্চিতভাবে বলেন যে, ফ্রান্সের সিরিয়ায় অবস্থান না করাটা 'জাতীয় অপমান যাহা একজন সৈনিকের যুদ্ধেক্ষেত্র ত্যাগ করিবার শামিল'। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, একই তেজস্বীতা প্রকাশ করিয়া ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল দ্য গল সিরিয়া-লেবানন হইতে বহিষ্কৃত হন।

এইরুপ জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া ফ্রান্স আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং যে সকল দল ফ্রান্সকে সমর্থন করে তাহাদের সহায়তা করে। এই সকল সমর্থনকারী ছিল সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান, আলাভি কুর্দ, আর্মেনীয় প্রভৃতি। সুপরীক্ষিত বিভক্ত

করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া ফরাসি রাষ্ট্রদূত জেনারেল গোঁরোদ ক্ষুদ্র দেশটিকে পাঁচভাগে ভাগ করেন। এইগুলি হইল ঃ

১। বৃহৎ লেবানন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে লেবানন ও এন্টি-লেবানন পর্বতমালা এবং ত্রিপলীর উত্তর হইতে ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভাগ।

২। লাতাকিয়া বা ত্রিপলীর উত্তরাংশে আলাভি সমুদ্রোপকূল,

৩। আলেপ্পো,

৪। দামেস্ক এবং

৫। জাবাল দ্রুজে বা দামেস্কের দক্ষিণে অবস্থিত দ্রুজে পর্বতমালা।

এই বিভক্তি প্রথম হইতেই অবাস্তব প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ফরাসি রাষ্ট্রদূতগণ বিভিন্ন প্রকারে রাষ্ট্রজোটের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুইটি পৃথক প্রশাসনের উন্মেষ ঘটে, একটি বৃহৎ লেবাননের জন্য এবং অপরটি অবশিষ্ট চারিটি ভাগের সম্মিলিত অংশের জন্য যাহাকে পরে সিরিয়া বলা হয়। এই দুইটির মধ্যে শাসনকার্যের দিক হইতে লেবাননই ফ্রান্সের জন্য সহজতর হয় এবং তাহাও সহজতর হয় প্রধানত মেরোনাইটদের জন্য কারণ তাহারা সর্বদাই ফরাসিদের সহিত সহযোগিতা করে।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ফয়সলের বহিষ্কার হইতে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত সিরিয়ার ইতিহাস হইল দাঙ্গা, বিদ্রোহ যুদ্ধের ইতিহাস। ইহার পিছনে দুইটি কারণ রহিয়াছে। একটি হইল, আরবিভাষী বিশ্বের অন্য যে কোনো এলাকার তুলনায় সিরিয়ায় আরব জাতীয়তাবাদ তখনও এবং বর্তমানেও অতি শক্তিশালী। এই সিরিয়া-লেবাননেই আরববিবাদ প্রথম শুরু হয় এবং সেই হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের সময় সিরিয়ায় ফাতাত সমিতিই প্রথম সম্মিলিত আরব রাজত্বের প্রস্তাব করে। ওসমানীয় প্রশাসনের সময় 'সিরিয়া' বলিতে লেবানন ও ফিলিস্তিন বুঝাইত। সিরীয়গণ কখনও পৃথক হইতে ইচ্ছুক ছিল না বা সক্ষমও হয় নাই। তদুপরি আরব ঐক্যের ব্যাপারে সিরীয়গণ একটি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে, কারণ দামেস্ক ছিল প্রথম ও একমাত্র সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ উমাইয়াদের রাজধানী।

সিরীয়বাসীদের বিপত্তির দ্বিতীয় কারণ হইল ফরাসিদের অযোগ্য প্রশাসন। মোটামুটিভাবে ফরাসিগণ হইল গর্বিত, নীচমনা, অনুপোযোগী, বিনীতভাবে পুরুষানুক্রমিক ও কঠোর। ধর্মানুসারে জনসাধারণকে বিভক্ত করাই তাহাদের মূলনীতি। কিন্তু সামরিক রাষ্ট্রদূতগণ, যাহারা সম্ভবত ফরাসিদের ঐতিহ্যবাদী ধর্মযাজক শ্রেণী বিরোধী নীতি সমর্থন করে না এবং তাই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য এবং ক্যাথলিক খ্রিষ্টানদিগকে বাকি ধর্মাবলম্বীদের চাইতে অধিক সুবিধা প্রদান করিবার জন্য বেশি বাড়াবাড়ি করে।

একদিকে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে সিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতার আগ্রহের ফলে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহার তাৎক্ষণিক কারণ হইল ক্যাপ্টেন কারবিলেটের নিবুর্দ্ধিতা, যিনি দ্রুজে নেতা সুলতান আল-আতরাশের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। আবার সমগ্র ব্যাপারটির উপর রাষ্ট্রদূত জেনারেল সারাইলের কঠোর ব্যবহার, যিনি দ্রুজে নেতৃবৃন্দকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। আতরাশ ভোজসভায় উপস্থিত হন নাই এবং পরে দ্রুজে এলাকায় একটি ফরাসি সৈন্যদলকে আক্রমণ

করেন। এই সংকেত পাইয়া দমেস্ক, হোমস্, হ্যামা ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সকল শহরে ড্রুজে নেতা ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। জেনারেল সারাইলের পরিবর্তে জেনারেল গ্যামেলিনকে আনয়ন করা হয়। তিনি ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে দামেস্কের বিরুদ্ধে সাঁজোয় বাহিনী ও বিমান সহযোগে অগ্রসর হন। তিনি নগর অধিকার করেন, কিন্তু প্রচুর প্রাণহানির বিনিময়ে। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্রোহ চলিতে থাকে। ফরাসিগণ একজন বেসামরিক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিলে যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়। সিরীয় জাতীয়তাবাদী দলগুলি আল-কুতলা-আল-ওয়াতানিয়্যা নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করে এবং স্বায়ত্তশাসন ও লেবানন ব্যতীত সমস্ত পৃথক প্রশাসনিক এলাকাগুলির ঐক্য দাবি করে। মাঝে মাঝে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আট বৎসর ধরিয়া জাতীয়তাবাদী ও ফরাসিগণ একটি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি, সরকারের বিন্যাস এবং স্বাধীনতার পরিমাণ লইয়া টানাহেঁচড়া করে।

যে কারণে গ্রেট বৃটেন মিসরীয়দের সহিত সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ হিটলারের উত্থান ও ইথিওপিয়ায় মুসোলিনীর অভিযান, সেই একই কারণে ফরাসিগণও সিরিয়াবাসীদের সহিত সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ধারাসমূহ একই বৎসরে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ধারাসমূহের ন্যায়। জাতীয়তাবাদিগণ নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং হাসিম আল-আতাশীকে প্রেসিডেন্ট ও জামিল মারদামকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে। বাহ্যত ফ্রান্স ব্যাপারটিকে তেমন আমল দেয় নাই কারণ সিরিয়ায় সে তাহার হুকুমনামার রাজত্ব এমনভাবে চালাইতে থাকে যেন কোনো চুক্তিই স্বাক্ষরিত হয় নাই। ফরাসি পার্লামেন্ট কখনও এই চুক্তি অনুমোদন করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার অবসান হয়।

ফরাসি সেনাবাহিনীর সদর দফতর এবং মেরোনাইটদের প্রতি ফরাসিদের সহানুভূতি থাকিবার ফলে লেবাননের অবস্থা সিরিয়ার ন্যায় তেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে নাই। লেবাননে জাতীয়তাবাদী খ্রিষ্টান, মুসলমান ও ড্রুজে বিদ্যমান, যাহারা সিরীয় জাতীয় দলের (Syrian National Party) সদস্য এবং ঐক্য ও স্বাধীনতা চায়। তবে মোটের উপর জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের সূচনা হইল সিরিয়ায়। সিরিয়ায় ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধের ফলে লেবাননিগণ কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে। তাহারা একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং চার্লস ডাব্বাসকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করে, কিন্তু ফরাসিগণ জোরালো কণ্ঠে বলিতে চায় যে লেবানন স্বাধীন কিন্তু সার্বভৌম নহে। শীঘ্রই ফরাসিগণ 'স্বাধীনতা' ছিনাইয়া লয় এবং শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে লেবাননের সহিত ফ্রাংকো-সিরিয়ান চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তির আয়োজন করা হয়। কিন্তু ফরাসিগণ সিরিয়াবাসীদের সহিত যে ব্যবহার করে লেবাননীদের সহিত উহার তুলনায় খুব ভালো ব্যবহার করে নাই। তাহারা শুধু হুকুমনামা ত্যাগ করে নাই এবং ফ্রান্সের 'সভ্য-করণের উদ্দেশ্য' কার্যে পরিণত করে নাই।

ইরাকের উপর হুকমনামা

সিরিয়ার উপর ফরাসি হুকুমনামার তুলনায় ইরাকের উপর বৃটিশ হুকমনামা অনেকটা শান্তিপূর্ণ। ইহা কতকাংশে অত্র অঞ্চলের উপর বৃটিশ অভিজ্ঞতার দরুন সম্ভব হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বৃটিশ আওতাভুক্ত হইয়া পড়ে

এবং বৃটিশ প্রতিনিধিবর্গ নিম্ন মেসোপোটামিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। তদুপরি বহুসংখ্যক বৃটিশ অফিসার হেজাজ সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহা এমন এক অভিজ্ঞতা যাহা ফরাসি অফিসারদের ছিল না। সিরিয়ার দলসমূহের ন্যায় ইরাকি রাজনৈতিক দলসমূহ চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। সিরীয়দের নীতি হইল 'সমস্ত কিছু অথবা কিছুই না'- এমন এক নীতি যাহা আরবগণ বার বার ইহুদিবাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছে। ইরাকিদের নীতি হইল 'লও এবং আরও চাও'। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে ইরাকে চরমপন্থীও নাই সামরিক অভ্যুত্থানও নাই।

প্রথম দিকে বৃটিশগণ বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয় কারণ ইরাকের কার্যাবলী প্রধানত ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'এ্যাংলো ইন্ডিয়ানগণ' ইরাকে আধিপত্য বিস্তার করিবার ব্যাপারে এমন নিশ্চিত হইয়া যায় যে তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গও লইয়া আসে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা এমনভাবে হাতে লয় যেন তাহারা চিরতরে এখানে থাকিয়া যাইবে। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আরনল্ড উইলসন একটি 'গণভোট' পরিচালনা করেন এবং তাহাতে দেখা যায় যে ইরাকিগণ গ্রেট বৃটেনকেই চায়, ভারত সরকারকে নহে।

ইরাকিগণ অবশ্য বৃটিশদিগকেও চায় না এবং তাহা ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত বিদ্রোহের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তি ঘোষণা এবং তৎসঙ্গে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মনোভাবের দরুন ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে একই সময় মিসরীয় জাতীয়তাবাদিগণ বৃটিশদের আধিপত্যের মোকাবিলা করে কামালপন্থিগণ আঁতাত কর্তৃক চাপানো 'শান্তি'কে বাধা দান করে এবং সিরিয়াবাসিগণ ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রায় ৬৫,০০০ সৈন্য আনিয়া, দশ লক্ষ ডলার খরচ করিয়া এবং উভয়পক্ষে প্রচুর হতাহতের পর লন্ডনের বৃটিশ সরকার ক্ষমতা দখল করে। অত্র অঞ্চলে পরিচিত ও সম্মানিত স্যার পার্সি কক্সকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৃটিশ কর্তৃক একটি জাতীয় ইরাকি সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ঘোষণা করেন।

তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি উইন্সটন চার্চিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের কায়রো সম্মেলনের হাতে হঠাৎ এক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। সাইক্স-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধারণ মত ছিল ফয়সাল সিরিয়ার বাদশাহ্ হইবেন এবং আবদুল্লাহ্ ইরাকের বাদশাহ হইবেন। বস্তুত সিরীয় জাতীয় কংগ্রেস ফয়সালকে সিরিয়ার বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করিবার সময় আবদুল্লাহকে ইরাকের বাদশাহ মনোনীত করে। গ্রেট বৃটেন ইহার বিপক্ষে ছিল না। তবে ফরাসি সরকার ফয়সালকে বহিষ্কার করিয়া ব্যাপারটিকে ঘোরালো করিয়া তোলে, যাহার ফল হইল বৃটিশদের হাতে দুইটি বাদশাহই আসিয়া পড়ে। দুই ভ্রাতার মধ্যে ফয়সালই অধিক জনপ্রিয়, তাই গ্রেট বৃটেন তাঁহাকে ইরাকের বাদশাহ বানাইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্যার পার্সি কক্স এমন আয়োজন করিলেন যাহাতে ইরাকিগণ ফয়সালকে তাহাদের বাদশাহ হইতে আহ্বান জানায়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তিনি অভিষিক্ত হন। আবদুল্লাহকে অতঃপর 'ট্রান্স-জর্ডনের' আমিরী প্রদান করা হয়। এই দেশ বৃটিশগণ সুবিধানুসারে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণ আকাবার উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া সৃষ্টি করে।

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পরবর্তী তিন বৎসর ফয়সলের নীতিবাদী জাতীয়তাবাদ বেশ খানিকটা ধাক্কা খায়। সিরীয়দের চরম

জাতীয়তাবাদ এবং সম্পূর্ণ বৃটিশ আনুগত্যের মাঝামাঝি একটি পথ তিনি বাছিয়া লইতে চেষ্টা করেন। গ্রেট বৃটেনও ভারত সরকারের প্রভাব হইতে মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে মুক্ত করিবার পর কিছুটা আপোসমূলক হইয়া পড়ে। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আবার বাদ দেওয়া হয়। এক চরম টানাহেঁচড়ার মধ্যে ইরাকের জানসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদিগণ যাহা দিতেছে তাহার চাইতে অধিক সুবিধাদি দাবি করেন। একজন আরব হিসাবে ফয়সালকে গ্রেট বৃটেন পুরাপুরি বিশ্বাস করে না, আবার বৃটিশের একজন বন্ধু হিসাবে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চোখেও সন্দেহাতীত নহেন। কিন্তু ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইরাককে স্বাধীনতা দিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা রক্ষা করিয়া চলেন। এই চুক্তি ছয় বৎসর পর স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির সদৃশ্য এবং ফরাসিদের জন্যও ইহা একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ। পারস্য উপসাগরের বসরায় একটি নৌঘাঁটি এবং বাগদাদের নিকটস্থ হাব্বানিয়া বিমানবন্দরে একটি বিমান ঘাঁটি রক্ষা করিতে গ্রেট বৃটেনকে অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় সমস্ত সম্পদ বৃটিশদের এখতিয়ারে তুলিয়া দিতে ইরাক রাজি হয়। ইরাককে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং হুকুমনামার শেষ চিহ্নও বিলুপ্ত হয়। ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ও ইরাক উভয়ে চুক্তিটি অনুমোদন করে এবং জাতিপুঞ্জে আসন লাভের ব্যাপারে ইরাক প্রথম আরব রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করে।

১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের চুক্তি লইয়া ইরাকি জাতীয়তাবাদিগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের দৃষ্টিতে গ্রেট বৃটেনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ইরাক সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না। তাহারা সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সহিত একযোগে সংগ্রাম করিতে চায়। অপরদিকে ইরাকে তৈলের অনুসন্ধান লাভ এবং তৈল অনুমতিপত্রের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরাক ধনী হইয়া উঠে। অনুমতি পত্র ৭৫ বৎসরের জন্য প্রদান করা হয় এবং ইরাক প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত তৈলে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা সেলামি হিসাবে লাভ করে। ইরাকিদের অনেকেই এই সম্পদে বাকি আরবদিগকেও অংশ দিতে অস্বীকার করে। তদুপরি 'স্টার্লিং ব্লকের' সদস্য হিসাবে ইরাকি মুদ্রা নিশ্চিত হয় অথচ ফরাসি ফ্রাংকের সহিত সম্পর্কযুক্ত সিরিয়ার মুদ্রা ছিল অনিশ্চিত।

ইরাকের শাসকচক্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক দলে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ থাকে, যাহাদের ভাগ্য পার্লামেন্টে প্রাপ্তভোটের সংখ্যা দ্বারা উঠানামা করে। মোটের উপর তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত, একদল গ্রেট বৃটেনের সহিত সদ্ভাব রাখিবার পক্ষে, আরেক দল ইহার বিপক্ষে। প্রথমোক্ত দলে থাকেন ন্যাশনাল পার্টি, প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং হুকুমনামার পূর্বে গঠিত পুরাতন আহদ পার্টি, যাহার প্রধান ব্যক্তি হইলেন জেনারেল নূরী আল-সাঈদ। যে সকল ব্যক্তিবর্গ গ্রেট বৃটেনের বিরোধিতা করে তাহারা ন্যাশনাল ব্রাদারহুড বা ইখা আল-ওয়াতানী দল গঠন করে, যাহার প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইলেন ইয়াসিন আল-হাশিমি ও রশিদ আল-জ্বিলানি।

ইরাকের জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধান আরও দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের মধ্যেই ইহা রহিয়াছে এবং এইজন্য ঔপনিবেশিক শক্তিবর্গ দায়ী নহে। ইরাকের ৫০ লক্ষ সংখ্যাগুরু অধিবাসী মুসলমান, কিন্তু তাহারা শিয়া, সুন্নী ও কুর্দ নামক তিনটি বিবদমান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শিয়া সংখ্যাগুরুদের শাসক সংখ্যালঘু সুন্নিগণ কখনও প্রথমোক্তদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, কারণ তাহাদের মধ্যে পারস্যপ্রবণতা বিদ্যমান। শিয়া ও সুন্নিগণ আরবি ভাষায় কথা

বলে; কিন্তু ধর্মত সুন্নী কুর্দগণ কুর্দি ভাষায় কথা বলে । তদুপরি তাহারা আধা-বেদুইন কুর্দদের অংশবিশেষ - যাহারা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করে এবং জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষী। ইরাকের অতি দুর্ভাগ্য দল সম্ভবত প্রায় ৯০,০০০ সিরিয়াকভাষী আসিরীয় খ্রিষ্টান। তাহারা পশ্চিম এশিয়া মাইনরের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। বৃটিশগণ আর্মেনীয়দের ন্যায় তাহাদিগকেও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আশা দেয় এবং তুর্কিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। বলশেভিক বিপ্লবের দরুন রুশ সৈন্যদের প্রত্যাহারের ফলে আসিরীয়দিগকে দক্ষিণে মেসোপোটামিয়ার দিকে ঠেলিয়া দেয়া হয়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সংগ্রামের সময় বৃটিশগণ ইরাকিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আসিরীয় সৈন্যদিগকে তালিকাভুক্ত করে এবং ফলে ইরাকিদের সহিত তাহাদের শত্রুতা গড়িয়া উঠে। পরবর্তী শান্তি আলোচনার সময় তুর্কিগণ আসিরীয়দিগকে তাহাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেয় নাই; যাহার ফলে তাহাদের বিরাট অংশ ইরাকে আটক হইয়া পড়ে। এইগুলি ছাড়া ছিল ১ লক্ষ ইহুদি যাহারা খ্রিষ্টীয় যুগের পূর্ব হইতে মেসোপোটোমিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল, ক্ষুদ্রসংখ্যক আর্মিনীয় এবং সাবিয়ান ও ইয়াজিদী নামে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে ইরাকের স্বাধীনতা লাভের পর ফয়সাল বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দলগুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করিতে চান। তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করা, সুন্নী ও শিয়াদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পকারখানায় উৎসাহ প্রদান, ভূমি সমস্যার সমাধান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করিতে মনস্থ করেন। তিনি নূরী আল-সাঈদকে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে বলেন এবং পরে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড পার্টির রশিদ আল-জিলানিকে তাহা প্রদান করেন। এই দল ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পার্লামেন্টে আধিপত্য বজায় রাখে। বাঁচিয়া থাকিলে ফয়সাল হয়ত সফলতা লাভ করিতেন, কিন্তু তিনি ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্র গাজীকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু রশিদ আল-জিলানি ও ইয়াসীন আল-হাশিমির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড-এর একনায়কত্বমূলক কার্যাবলীতে বাধা প্রাদান করিবার মত কোনো অভিজ্ঞতা বা সম্মান তাঁহার ছিল না।

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দল একত্রে মিলিত হয় এবং এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সরকারকে উচ্ছেদ করে। ফয়সলের মৃত্যুর পর ইরাকের ইতিহাসে অনেকগুলি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ইহাই প্রথম। এই সকল দলের একটি হইল আহলি দল। যুবক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত এই দল এক ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আরেকটি দল সামরিক অফিসারদের লইয়া গঠিত যাহারা জাতীয়তাবাদ চায় আবার তাহাদের নিজস্ব একনায়কত্ববাদও রাখিতে চায়। এই দুই দল আহলি দলের হিকমত সোলায়মান ও সেনাবাহিনীর জেনারেল বকর সিদকীর মাধ্যমে মিলতি হয় এবং ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সরকারকে উৎখাত করে। অনভিজ্ঞ যুবক বুদ্ধিজীবীগণ সেনাবাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয় এবং ফলে জেনারেল সিদকীর অধীন সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসীন হয়। অতঃপর সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়া যায় এবং ফলে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে জেনারেল সিদকী নিহত হন এবং আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এক বৎসর পর আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা জেনারেল নূরী আল-সাঈদ পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল ইরাকের সমস্যাসমূহের মাধ্যে একটি। অন্যান্য সমস্যাও ছিল। একটি হইল তৈলসমৃদ্ধ কুয়েত লইয়া গ্রেট বৃটেনের সহিত মত বিরোধ। ঐ অঞ্চলের

উপর বৃটেন একটি হুকুমনামার অধিকারী, অথচ ইরাকও তাহার মালিকানা দাবি করে। ফিলিস্তিনের ভাগ্য লইয়া ইহুদিবাদীদের সহিত যে সংঘর্ষ তাহাতেও ইরাক জড়িত। তাহা ছাড়া ছিল সংস্কারের সমস্যা এবং একদিকে ইরাকি জাতীয়তাবাদ অপরদিকে বৃহৎ আরব জাতীয়তাবাদ।

এই সকলের মধ্যে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল যুবক বাদশাহ গাজী এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি যেহেতু জনপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যাপারে সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদের সমর্থক, তাই অনেকেই তাঁহার মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ফয়সালকে বাদশাহ্ এবং মামা আবদুল ইলাহ্কে উপদেষ্টা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নূরী আল-সাঈদ প্রধানমন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন।

ট্রান্সজর্ডানের উপর হুকুমনামা

আবদুল্লাহ্কে যে ট্রান্সজর্ডানের আমীর হইতে বলা হয়, ২০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত সেই ভূখণ্ডের অধিকাংশই মরুভূমি এবং অধিবাসিগণ প্রায়ই বেদুঈন। সেই শূন্য দেশে আবদুল্লাহ্র শাসন সহজতর করিবার জন্য বৃটিশ তাঁহাকে মাসিক ৫,০০০ পাউন্ড ভাতা প্রদানের বন্দোবস্ত করে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অত্র অঞ্চলে গ্রেট বৃটেনের প্রভাব হুমকির সম্মুখীন হয় নাই। এই অঞ্চলে থাকিয়া বৃটিশ ইরাকের বিক্ষুব্ধ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং তাহা দমন করিবার আশা পোষণ করে; ফিলিস্তিনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করে এবং পারস্য উপসাগরের পথ পরিষ্কার রাখে। বার্ষিক এক লক্ষ পাউন্ড প্রদান করত—যাহা ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়, বৃটিশগণ এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে, যাহা পরবর্তীকালে সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়। আরব লিজিয়ন (Arab Legion) নামে খ্যাত সেই বাহিনী ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এফ. জি. পিক-এর পরিচালনাধীন থাকে এবং পরে উপাখ্যানের গ্লাব পাশার (স্যার জন গ্লাব) পরিচালনাধীন থাকে। ফারটাইল ক্রিসেন্টের সর্বাঞ্চলের সেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া এই বাহিনী গঠন করা হয় এবং ইহার পুরোধা হইল বেদুইন গোত্রসমূহের যুবকদল।

ট্রান্সজর্ডান সরকারের গঠন অতি সাধারণ। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতা আমীরের হাতে। তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য একটি কার্যকরী সংসদের সদস্যপদ বেদুইন ও অন্যান্য দলের মধ্যে সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। আম্মানে (রোমান যুগের ফিলাডেলফিয়া) নিযুক্ত বৃটিশ অধিবাসিগণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজেট, সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক কার্যাবলী পরিচালনা করে। ইরাকের বাদশাহ ফয়সলের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ হাশেমী বংশের প্রধান হন এবং ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান শাসন করেন। ক্রিসেন্টের আরবদের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা লইয়া আবদুল্লাহ নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে হাশেমীয় বংশের নামে তুলিয়া ধরেন এবং "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনকে" (The Great Syria Movement) সমর্থন করেন। ইহার ভাবধারা হইল হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপে উল্লেখিত বিষয়ের পুনরাবর্তন, যাহাতে হাশেমীয় বংশের অধীনে একটি সম্মিলিত ফারটাইল ক্রিসেন্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়। সৌদি আরব ও মিসর এবং সিরিয়া ও ইরাকের কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক দলের সহায়তায় লেবাননের খ্রিষ্টানগণ ইহার বিরোধিতা করে।

সৌদি আরব

যুদ্ধের ডামাডোল, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দাবি ও প্রতিবাদ এবং হুকুমনামা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিদ্রোহের মধ্যে পাঠক সম্ভবত সমস্ত ঘটনার সূচনাকারী বাদশাহ হোসেনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বস্তুত বাকি সকলেই সম্মানিত মক্কার শরিফকে ভুলিয়া গিয়াছেন ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে যিনি নিজেকে 'আরব দেশসমূহের বাদশাহ' বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই ধরনের একটি উপাধির অন্যান্য প্রত্যাশীদের শত্রুতে পরিণত হন, তিনি শেষ পর্যন্ত একজন রাজ্যহীন রাজায় পরিণত হন। কিছুকাল তিনি ভান করিয়া কাটান এবং নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য কোনো প্রচেষ্টাই চালান নাই। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও পরিক্রমা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, অথচ তিনি নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া যান। পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি বৃটিশদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন নাই, এবং ভার্সাই, স্যানরেমো, লুজ্যানে ও জাতিপুঞ্জের ন্যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিও দৃকপাত করেন নাই। ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তিনি ইতোমধ্যেই ভারতবর্ষের মুসলমান শ্রেণীর বিরাগভাজন হন। রাগ, গর্ব ও নিরুৎসাহের বশবর্তী হইয়া ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ তিনি 'সমগ্র ইসলামের খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁহার এই ঘোষণার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী নজদের বাদশাহ আবদুল আজীজ ইবনে সউদ স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ লাভ করেন। ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইবনে সউদ ভারত সরকারের বন্ধু এবং বৃটিশদের সহিত তাঁহার সন্ধিসূত্র বিদ্যমান। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ইবনে সউদ তাঁহার ওয়াহাবি যোদ্ধাদল লইয়া নির্বান্ধব ও অর্থাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হোসেনের পুত্রদ্বয় ফয়সল ও আবদুল্লাহ তখন সম্ভবত তাঁহাকে সাহায্য করিতে অসমর্থ; এবং বৃটিশদের নিকট তাঁহার প্রয়োজনও তখন শেষ। ওয়াহাবিগণ সম্মুখের সকল কিছু জয় করিয়া অগ্রসর হয়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি নাগাদ ইবনে সউদ পবিত্র নগরীদ্বয় এবং উপদ্বীপের প্রধান প্রধান অংশগুলির আধিপত্য অর্জন করেন। হোসেন সাইপ্রাসে পলায়ন করেন এবং তথায় বৃটিশগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ও সেন্ট মাইকেল পদক দ্বারা ভূষিত করে।

সম্ভবত নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মহানবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) উত্থানের পর আরব উপদ্বীপে আবদ আল-আজীজ ইবনে সউদের ন্যায় এইরূপ ক্ষমতাশালী ও সুনিপুণ নেতার উদয় হয় নাই। কিন্তু মক্কা ও মদিনার পবিত্র নগরীতে ওয়াহাবিদের আধিপত্যের ফলে ইসলামি বিশ্বে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওহাবিগণ গোঁড়া ধর্মানুসারী এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের উদার ধর্মচর্চার তাহারা বিরোধী এবং এই সকল মুসলমানদিগকে তাহারা 'পৌত্তলিক' বলিয়া মনে করে। কিন্তু আরব সরকারের সর্বোচ্চ আয় হইল হজযাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং এই আয় ত্যাগ করিবার কোনো ইচ্ছা ইবনে সউদের নাই। তাই ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই জুন তিনি মক্কায় একটি ইসলামি সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের ভয় দূর করা এবং তাহার ওয়াহাবি উলামাদিগকে অন্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রদান করা। মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ এই সুদীর্ঘ অবয়ব বিশিষ্ট বাদশাহর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানে মুগ্ধ হন। যুদ্ধের সময় কদাচ অনুষ্ঠিত হজব্রত পুনরায় নিয়ম মাফিক আরম্ভ হয়।

অতপর ইবনে সউদ গ্রেট বৃটেনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। উত্তরে ফিলিস্তিন, ট্রান্সজর্ডান, ইরাক ছাড়াও আরবের দক্ষিণ উপকূল এবং পূর্ব উপকূলের কিছু অংশে গ্রেট বৃটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বিদ্যমান। একটি মৌলিক সমস্যা ট্রান্সজর্ডানকে ব্যতিব্যস্ত করে, যাহার আংশিক কারণ এই যে আবদুল্লাহর পুনর্বাসনের জন্য গ্রেট বৃটেন তাড়াতাড়িতে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। আবদুল্লাহ ফয়সলের হাশেমীয় বংশের সহিত ইবনে সউদের বহুদিনের পুরাতন কলহ বিদ্যমান। এইগুলি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি দুইটি চুক্তির দ্বারা সমাধান করা হয়। একটি হইল ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২রা নভেম্বার স্বাক্ষরিত হাদ্দা চুক্তি, যদ্বারা ট্রান্সজর্ডানের সহিত সীমান্ত নিস্পত্তি করা হয়। অপরটি হইল ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের ২০শে মে স্বাক্ষরিত জেদ্দা চুক্তি, যদ্বারা গ্রেট বৃটেন সৌদি আরবের স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইবনে সউদ পারস্য উপসাগরের শেখ শাসিত রাজ্যসমূহে গ্রেট ব্রিটেনের বিশেষ স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হন। বস্তুত সৌদি আরবই প্রথম অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র, যাহা রাজনৈতিক সুবিধাদি বা সামরিক ঘাঁটির কোনো বিশেষ শর্তে আবদ্ধ নহে। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে বৃটিশ বাণিজ্য কিছুকালের জন্য চলিতে থাকে।

মহানবী হযরত মুহম্মদের (সঃ) ন্যায় ইবনে সউদের প্রধান কাজ হইল গোত্র প্রথা এবং তাহাদের মধ্যে বিরাজমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিগ্রহ শেষ করা। ওয়াহাবিদিগকে তিনি ছোট ছোট ভ্রাতৃসংঘে বা ইখওয়ানে গঠন করেন এবং বিভিন্ন মরুদ্যানে তাহাদিগেকে বসতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বসতিতে তিনি চাষাবাদের ব্যবস্থা করেন এবং মসজিদ ও বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এইসব বসতিসমূহ অনেকটা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের সামরিক শহরসমূহের ন্যায়। এইগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠনের ন্যায় সামরিক সংগঠনও বটে এবং সবগুলিই বাদশাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহ, কঠোর প্রশাসন ও ন্যায় বিচারের দ্বারা তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন।

আরবের ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মুখ্য কারণ হইল তৈল আবিষ্কার। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বাহরাইন দ্বীপে তৈল পাওয়া যায়। এক বৎসর পর, ২৯শে জুলাই বাদশাহ ইবনে সউদ কালিফোর্নিয়ার স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে ৬০ বৎসর মেয়াদি একটি অনুমতিপত্র প্রদান করেন। চুক্তি অনুসারে কোম্পানি শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবে এবং বাদশাহ্ সেলামি বাবদ প্রতি টন অপরিশোধিত তৈলের চারিটি সুবর্ণ শিলিং পাইবেন। খনন কার্যের প্রথম পর্যায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তির অনুকূলে তৈল পাওয়া না গেলেও কোম্পনি শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়া ইবনে সউদকে অতি প্রয়োজনীয় ৩০.০০০ পাউন্ড প্রদান করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের ফলে হজযাত্রার আয় ব্যাহত হয় এবং এবনে সউদ এই অর্থ দিয়া তাহা পূরণ করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ পারস্য উপসাগরের দাহরানে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। টেক্সাস তৈল কোম্পানি স্টান্ডার্ড-এর সহিত যোগদান করিলে নূতনভাবে ইহার নামকরণ হয় আরাবিয়ান আমেরিকান তৈল কোম্পানি (আরামকো)। সাজসরঞ্জাম ও বিদেশী লোকজন আমদানি এবং রাস্তাঘাট ও তৈল পরিশোধানাগার নির্মাণের ফলে বিভিন্ন গোত্রসমূহের যুবকদল শ্রম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা আরবের গোত্রসমূহের ইতস্তত ঘোরাফেরা ও বাদবিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ত্রিংশ অধ্যায়
ফিলিস্তিনের সংগ্রাম

বালফার ঘোষণা, পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জে ইহার অনুমোদন এবং মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আরব ও ইহুদিবাদী এই দুই জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী আর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত করে। উভয়েই ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য দাবি করে। ফিলিস্তিনী আরবগণ ইহা দাবি করে কারণ তাহারা ইহাতে বসবাস করে। ইহুদিবাদীগণ ইহা দাবি করে কারণ তাহাদের প্রভু, ইয়াওয়েহ (Yahweh) তাহাদিগকে এই ভূমির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, যে প্রতিশ্রুতিটি পরে বালফার কর্তৃক পাকাপাকি হয়; জাতিপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘ (United Nations) কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে ইহুদিবাদিগণের নিকট ইহা অতীন্দ্রিয় মহত্ত্বে পরিপূর্ণ একটি 'প্রত্যাবর্তন'। আরবদের নিকট ইহা আরেকটি বহিরাক্রমণ মাত্র। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয় পক্ষই ক্ষমতা প্রয়োগে বিশ্বাসী। ইহুদিবাদিগণ পাশ্চাত্যের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে তাহাদের নিজস্ব যোগ্যতার সহিত সংমিশ্রণ করিয়া যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে অবস্থানরত আরবগণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হইতে অনেক দূরে এবং তাই যুদ্ধের আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিতেও তাহারা অক্ষম এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলির সহিত পরিচিতও নহে। যতদূর দেখা যায় তাহারা শুধু এইদিকে সেইদিকে দুই একটি বিদ্রোহ করা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়া এবং দুর্বলতার দরুন "বিচারের" জন্য চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে। ইহুদিদের পক্ষে, যাহাদের অধিকাংশ লোক ফিলিস্তিনে বাস করে নাই, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যে যাহা দিয়াছে তাই গ্রহণ করা সহজতর হয়। তবে ফিলিস্তিনবাসিগণ, যাহারা এই দেশ তাহাদের বলিয়া মনে করে, কখনও আপোস করিতে রাজি নহে। তাহাদের মূলমন্ত্র হইল 'সবকিছু অথবা কিছুই না' আর ইহুদিদের নীতি হইল 'নগদ যাহা পাও হাত পাতিয়া লও এবং আরও চাও।'

বালফার ঘোষণার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইহুদিবাদিগণ সমগ্র ফিলিস্তিন ও সিনাই উপদ্বীপ করায়ত্ত করে, কিন্তু সংগ্রামের পরিসমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ৫০ বৎসরের ইতিহাস সাহসিকতা, ভীরুতা, সহানুভূতি, নিষ্ঠুরতা, ভয়, কুসংস্কার, কৃতিত্ব, হতাশা, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচারণা ও দারুণ মতবিরোধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সংগ্রামের মতানৈক্যের বিষয়গুলির অধিকাংশই সমাধান করা হয় নাই এবং এই বিষয়ের উপর শত শত খণ্ড গ্রন্থ লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত উপাদান ঐতিহাসিকদের নিকট এখনও আসে নাই। তাই একটি সম্পূর্ণ ও পক্ষপাতহীন বর্ণনা দান করা খুবই দুষ্কর। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্যাবলীর একটি রূপরেখা দিতে পারেন মাত্র কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি একপক্ষ বা অপরপক্ষ অথবা উভয় পক্ষের সমালোচনার সম্মুখীন হইবেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহুদিবাদের নিকট বালফার ঘোষণার 'জাতীয় আবাসভূমি'র অর্থ জাতীয় রাষ্ট্র। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং ইহার পর পুনঃ পুনঃ ইহুদিবাদি সংগঠনের প্রধান ডঃ চেইম ওয়াইজম্যান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বলেন, ফিলিস্তিন হইবে—

ইসরাইলী সম্প্রসারণ।
ইহুদীবাদী পরিকল্পনা
১৯১৯ খ্রীঃ
বৈরুত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা
মাইল
জাতিসংঘের
বিভক্তিকরণ
পরিকল্পনা
১৯৪৭ খ্রীঃ
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
মিশর
আকাবা
সৌদী
আরব
বিজিত এলাকাসমূহ
১৯৪৯ খ্রীঃ
বৈরুত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা
অধিকৃত এলাকাসমূহ
১৯৬৭ খ্রীঃ
বৈরুত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা
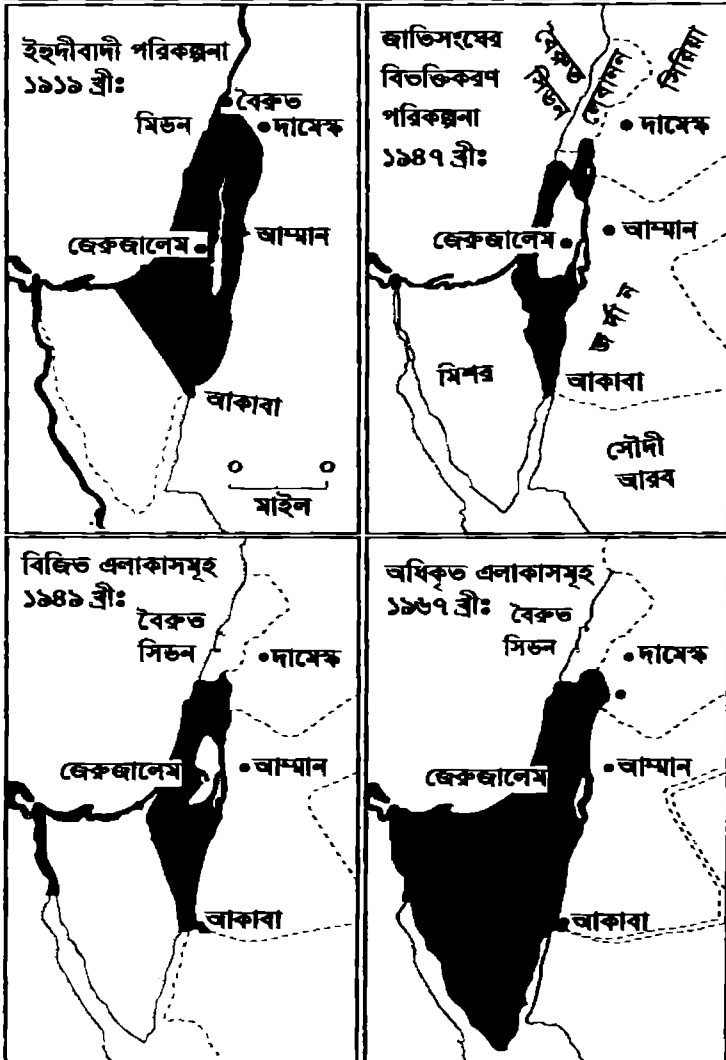
"ইংল্যান্ড বলিতে যেরূপ ইংরেজগণ বুঝায় অনুরূপ একটি ইহুদি রাষ্ট্র"। এইরূপ একটি লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হইল ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে ইহুদিদিগকে ফিলিস্তিনে স্থানান্তর করা এবং অপরটি হইল এইসব বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য স্থান জোগাড় করা। বালফার ঘোষণার পূর্বেও ইহুদিবাদিগণ গ্রামাঞ্চলে ইহুদিদের পুনর্বাসনে উৎসাহ প্রদান করে এবং যতদূর সম্ভব জনবহুল নগরীসমূহে পুনর্বাসন করিতে ইতস্তত করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে ইহুদিবাদিগণ এই দুইটি লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। উভয় কর্মসূচিতে তাহাদের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া ফিলিস্তিনী আরবগণ শঙ্কিত হয়।

কিং-ক্রেন কমিশন এই দুই কার্যসূচির গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং "ফিলিস্তিনকে শেষ পর্যন্ত একটি পুরাদস্তুর ইহুদি রাষ্ট্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য ইহুদিদের বাস্তুত্যাগের ব্যাপারে গোঁড়া ইহুদিবাদীদের ফিলিস্তিনী কর্মসূচিতে আমূল পরিবর্তন সাধনের" সুপারিশ করে। পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, "ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ইহুদিবাদবিরোধী মনোভাব অতি প্রবল এবং অতি সহজে ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারিগণ কমিশনের রিপোর্টের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত স্যানরেমো সম্মেলন গ্রেট বৃটেনকে ফিলিস্তিনের উপর হুকুমনামা প্রদান করে এবং দুই বৎসর পর জাতিপুঞ্জের পরিষদ ইহা অনুমোদন করে। হুকুমনামার মূল বচনে শুধু বালফার ঘোষণাই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বরং শান্তি সম্মেলনে ইহুদিবাদী প্রতিনিধি দল প্রদত্ত সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ইহুদি প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে, যাহারা 'ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্ষতিকারক' সমস্ত কিছু দেখাশুনা করিবার জন্য প্রশাসনের সহিত কাজ করিবে। 'এইরূপ প্রতিনিধি হিসাবে' ইহা ইহুদিবাদী সংগঠনকে স্বীকার করে। অধিকন্তু ইহুদি বাস্তুত্যাগে সহায়তা করিবার জন্য এবং সেদেশে এমনকি 'রাষ্ট্রীয় জায়গা এবং জনসাধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় পতিত জমিতে' পুনর্বাসনের কাজে সহায়তা করিবার জন্য ফিলিস্তিনের প্রশাসনকে আদেশ প্রদান করা হয়। ইহুদি প্রতিনিধি বা এজেন্সি হইল হুকুমনামার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী একটি সরকারের ন্যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুরূপ কোনো নিয়ম ফিলিস্তিনী আরবদের জন্য করা হয় নাই। বস্তুত হুকুমনামার ধারাগুলির মধ্যে আরবদের বিষয়ে কোনো উল্লেখও নাই। শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে 'অ-ইহুদি বা জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণী' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্যানরেমো সম্মেলনের অনতিকাল পরেই গ্রেট বৃটেন স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল নামক একজন প্রসিদ্ধ ইহুদিকে হাইকমিশনার নিযুক্ত করে। ২০০০ বৎসরেরও অধিককালের মধ্যে তিনিই ফিলিস্তিনের প্রথম ইহুদি শাসক। ইহার দ্বারা বৃটিশ কর্মকর্তাগণ আরবদিগকে প্রভাবিত করিতে চাহিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। তবে প্রকৃতপক্ষে স্যার হার্বার্ট, সম্ভবত ইহুদি হইবার দরুন, উল্টাভাবে আরব জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করেন। ইতিহাসের নির্মম অংশ হিসাবে স্যার হার্বার্টই হজ আমীন আল-হোসাইনীকে জেরুজালেমের মুফতি নিযুক্ত করেন। ইনি রাসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশধর বলিয়া দাবি করেন, আজহারে লেখাপড়া করেন, যুদ্ধের সময় তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করেন। মুফতি হিসাবে তিনি ধর্মীয় সম্পত্তির ওয়াকফ্‌র কর্মকর্তা হন, যাহার আয় ছিল বার্ষিক ৩০০,০০০ ডলার। তিনি সুপ্রিম কাউন্সিলের অধ্যক্ষ হন এবং পরে চরম বৃটিশ বিরোধী, ইহুদিবাদ বিরোধী ফিলিস্তিন উচ্চ কমিটির সভাপতি

হন। দ্বিতীয় মাহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ তাঁহার হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। তিনি তখন বার্লিন হইতে বেতারে মিত্রশক্তি বিরোধী ও ইহুদি বিরোধী বক্তৃতা প্রদানে লিপ্ত।

প্রথম ইহুদিবাদী বিরোধী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় জেরুজালেমে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি স্যার থমাস হেক্রোফ্‌ট্-এর সভাপতিত্বে একটি স্থানীয় কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে ইহুদিবাদী কর্মসূচিতে ভীত হইয়া আরবগণ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উৎসাহ প্রদান করে। তবে ঔপনিবেশিক দফতরের প্রধান হিসাবে উইনস্টন চার্চিল একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন, যাহাতে উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট হয়। তিনি জোর দিয়া বলেন, গ্রেট বৃটেনের ইচ্ছা নয় যে, "ফিলিস্তিন ইংরেজদের ইংল্যান্ডের ন্যায় ইহুদি রাষ্ট্র হউক।" তিনি ইহাও ব্যক্ত করেন যে, "ইহুদি জনগণ তাহাদের অধিকার লইয়া ফিলিস্তিনে বাস করিবে, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নহে।" হুকুমনামার ৩০ বৎসরের মধ্যে গ্রেট বৃটেন বালফার ঘোষণার দুইটি চরম বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে, তাহার একটি হইল ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা এবং অপরটি ইহল আরবদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা। উভয়টি যেহেতু একসঙ্গে সমাধা করা সম্ভব হয় নাই, তাই প্রথমে তাহারা প্রথমটি সমাধা করে এবং অবস্থাভেদে অপরটিও সমাধা করিতে চেষ্টা করে। ইহুদিবাদিগণ অবশ্য জোর দিয়া বলে যে, 'সমান গুরুত্বের' কোনো দ্বিপক্ষীয় দায়িত্ব গ্রেট বৃটেনের নাই। তাহারা দাবি করে যে, অ-ইহুদি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করাটা একটা গৌণ ও অপ্রধান ধারা', এবং তাই এই দলিলে প্রধান উদ্দেশ্যের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত নহে। সেই প্রধান উদ্দেশ্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে প্রাথমিক দাঙ্গার পর প্রায় আট বৎসর শান্তভাবে কাটিয়া যায়। হুকুমনামার সরকার ফিলিস্তিন আরব কার্যকরী কমিটি গঠন করিবার অনুমতি দান করে, যাহা আরবদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। ইহুদি এজেন্সির ন্যায় অনুরূপ সরকারি কোনো মঞ্জুরি এই কমিটির নাই। ইহুদি বাস্তুত্যাগী আনয়ন ও জমি দখলে ইহুদি এজেন্সি সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়া যায়। ইহুদি এজেন্সি ফিলিস্তিনে নূতন নূতন কলকারখানাও স্থাপন করে এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইহুদিগণ প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানার মালিক হয়। কিন্তু কারখানা স্থাপন বাস্তুত্যাগী ও জমি দখলের ন্যায় এইরূপ সমস্যা সৃষ্টি করে নাই।

ফিলিস্তিনী আরবগণ আশংকা করে যে দ্রুত ইহুদি বাস্তুত্যাগী পুনর্বাসনের ফলে তাহারা তাহাদের নিজস্ব দেশে হয়ত সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে। অবশ্য ইহাই ছিল ইহুদিদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য। ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর প্রথম লোকগণনা হয়, তাহাতে ফিলিস্তিনের অধিবাসীদের সংখ্যা অনুমান করা হয় ৭,৪৪০০০ তন্মধ্যে ৮৩,০০০ ইহুদি। ১৯২২ ও ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে আরবদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩ শতাংশ অথচ ইহুদিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০০ শতাংশ। ১৯৩১ হইতে ১৯৪০-এর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও আশংকাজনক। আরব জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩০ শতাংশ, অথচ ইহুদিদের লোকসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিদের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ অথচ ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইহা ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি লাভ করে।

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য সূত্র হইতে আমরা সহজেই কয়েকটি বিষয় অনুমান করিতে পারি। প্রথমত হুকুমনামার তারিখ হইতে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা তেমন বৃহৎ নহে। দ্বিতীয়তঃ অধিকসংখ্যক বাস্তুত্যাগী আসে পোল্যান্ড ও রাশিয়া হইতে। তৃতীয়তঃ ইহুদিবাদীদের শত প্রলোভন সত্ত্বেও এই বাস্তুত্যাগী অধিকাংশ

ফিলিস্তিনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে যাইতে চায়। চতুর্থতঃ সাধারণত অত্যাচার ও অন্যান্য অসুবিধার মধ্যেই শুধু ইহুদিগণ ফিলিস্তিনে যাইবার বিষয় চিন্তা করে। উদাহরণস্বরূপ ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বাস্তুত্যাগী আইনের ফলে সে দেশে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা যেখানে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে ৫০,০০০ ছিল সেখানে ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১০,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়, ফলে দেখা যায় সেই বৎসর ফিলিস্তিনে বাস্তুত্যাগীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। উপসংহারে বলা যায় যে, হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ এবং ইউরোপে তাঁহার নৃশংস ও ধারাবাহিকভাবে ইহুদি নিধন না হইলে ফিলিস্তিন ইহুদিদের একটি দুর্যোগ সৃষ্টিকারী জাতীয় রাষ্ট্র না হইয়া বরং একটি শান্তিপূর্ণ জাতীয় আবাসভূমিই হইত।

ফিলিস্তিনে অতি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই ইহুদি ও আরব উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অভাব ও ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। অবশ্য স্বীয় সদস্যদের দেখাশুনা করিবার জন্য ইহুদিবাদীদের দেশের বাহিরে বেশ মোটা তহবিল এবং ফিলিস্তিনে সুসংগঠিত দল বিদ্যমান। ইহুদিবাদীদের সংগঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হইল ইহুদি শ্রমিক ফেডারেশন, হিস্তাদ্রোত (Jewish Federation of Labour)। ইহা শুধু একটি ট্রেড ইউনিয়ন নহে বরং ইহা উৎপাদন ও বাজারজাত, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ব্যাংক ও বীমাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করে। আরবদের এইরূপ কোনো সংগঠন ছিল না এবং ফলে তাহারা অর্থনৈতিক সংকট আরও প্রবলভাবে অনুভব করে। নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের পক্ষে হিসতাদ্রাতের কার্যকলাপ আরব শ্রমিকদিগকেও উপকৃত করে। বিশেষত রেলপথ বিভাগে এবং ফিলিস্তিনের বন্দরসমূহের কিন্তু ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ৯০ শতাংশ ইহুদি মালিকানার কলকারখানায় আরব শ্রমিকগণকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।

ইহুদি এজেন্সির ভূমিনীতি যেরূপ গ্রামীণ আরবদের ঘৃণা উদ্রেক করে, বাস্তুত্যাগে অনুরূপ করে নাই। 'ভূমি হস্তান্তরের' প্রশ্নটি দুই দলের মধ্যে কাঁটার রূপ ধারণ করে। ইহুদিবাদিগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে যে, ইহুদি গ্রামীণ ও কৃষিপত্তনি ছাড়া একটি আদর্শ ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নহে। হুকুমনামার সরকার রাষ্ট্রীয় জমি তাহাদিগকে হস্তান্তর না করিলেও ইহুদিগণ আরবদের নিকট হইতে অতি উচ্চমূল্যে জমি ক্রয় করে। ফিলিস্তিনের ন্যায় শুষ্ক জমিতে কৃষকগণ প্রয়োজনের খাতিরে গ্রামের ছোট ছোট নদীর ধারে একত্রে বাস করে। গ্রামের চতুর্দিকে অবস্থিত জমির মালিক প্রায়শ একজন অনুপস্থিত আরব জমিদার, যিনি জেরুজালেম, বৈরুত বা দামেস্কে বাস করেন। জমিদার গোচারণ ভূমি ও পানির মালিক হইলেও সমস্ত গ্রামের লোক এইগুলি ব্যবহার করে। গ্রাম একটি সামাজিক ও কৃষি সংস্থা। বিক্রেতা আরব জমিদার হয়ত বেশ মুনাফা লাভ করিল কিন্তু এই হস্তান্তরের সমস্ত বোঝা গিয়া পড়িল আরব চাষীদের ঘাড়ে।

ইহুদিবাদীদের পরিকল্পনা হইল কৃষিভূমি ক্রয় করা এবং ঐগুলির উপর ইহুদি বাস্তুত্যাগীদিগকে বসতিস্থাপনে উৎসাহ দান করা ও কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহুদিদের ভূমি ক্রয়ের ফলে আরব চাষীদিগকে উঠিয়া যাইতে হয়। ইহুদি এজেন্সির শাখা ইহুদি জাতীয় তহবিল (Jewish Natioal Fund) কর্তৃক ক্রীত জমিকে 'জাতীয় জমি' বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং এইগুলিকে অইহুদিদের নিকট হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়া আইন পাস করা হয়। অধিকন্তু, ইহুদি সমবায়সমূহ বা যে -ই চাষের জন্য জমি লাভ করে তাহার জন্য আরব শ্রমিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আবাসচ্যুত আরব কৃষক কাজের সন্ধানে শহরে যাইয়াও অসুবিধার সম্মুখীন হয়; কারণ ইহুদি কারখানাগুলি তাহাকে কাজ

দিতে অসম্মত হয় অথবা কাজ দিলেও পারিশ্রমিক দেয় স্বল্প। অবশ্য এইখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে অধিকাংশ আরব শ্রমিক অশিক্ষিত এবং আধুনিক কারখানাসমূহের সহিত তাল রাখিয়া কাজ করিতে অক্ষম। যে সমস্ত কৃষক গ্রামে থাকিয়া যায়, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের গ্রামের নিকট আধুনিক আবাসস্থল অবলোকন করে, যেগুলির সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয়। এই নূতন আবাসগুলির লোকজন শুধু পৃথক ভাষা ও ধর্মই অনুসরণ করে না বরং চাষাবাদের পৃথক পন্থা ও আলাদা সামাজিক রীতিনীতিও অবলম্বন করে। অতএব আরবগণ এইসব নবাগতদিগকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

ফিলিস্তিনে ইহুদি পুনর্বাসনের অদ্ভুত-প্রকৃতির একটি হইল, ইহুদি তহবিলের অর্থ আসিয়াছে প্রধানত পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি পুঁজিপতিদের নিকট হইতে, যাহারা স্বাধীন ব্যবসায়ে খাঁটি বিশ্বাসী, আর এইসব অর্থগ্রহণ করিয়াছে পোল্যান্ড ও রাশিয়া হইতে আগত সমাজবাদী বা মার্কসপন্থী ইহুদিগণ যাহারা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদী পুনর্বাসনগুলির মধ্যে প্রধান হইল কিববুজ (Kibbutz) এবং মোসহাব (Moshav)। কিব্‌বুজ -এর ইহুদিগণ যৌথ চাষাবাদ ও যৌথ বসবাসের সহিত সাধারণ ভোজনালয় ও সাধারণ নার্সারী স্থাপন করে। সমস্ত মুনাফা জমা হয় যৌথ কোষাগারে এবং ব্যক্তি বিশেষ কোষাগার হইতে সাপ্তাহিক খরচপত্রের জন্য অর্থ লাভ করে মাত্র। অপরদিকে মোস্‌হাব একটি রীতিমত সমবায়, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্ব স্ব বাসগৃহ রহিয়াছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা তাহারা লাভ করে।

ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহুদিবাদী প্রতিষ্ঠানের এতসব উৎসাহ প্রদান সত্ত্বেও ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মাত্র ১৩.২ শতাংশ ইহুদি কৃষিকাজে যোগদান করে। তাহাদের প্রচেষ্টা সমধিক লক্ষ্য করা যায় শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইহুদিগণ ২০০০-এরও অধিক কারখানার মালিক হয় এবং প্রায় ৪৫০০০ শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল ফিলিস্তিন ইলেকট্রো কর্পোরেশন– জর্ডন ও ইয়ারমুক নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং ডেড্ সাগরের (Dead sea) নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিলিস্তিন পটাশ কোম্পানি।

ইহুদিবাদিগণ একটি সম্পূর্ণ হিব্রু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে, যাহাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যবসা, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং কারিগরি কলেজ ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত। ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদিদের চমৎকার কৃতিত্বগুলির মধ্যে একটি হইল হিব্রু ওল্ড টেস্টামেন্টের পুনরূপায়ন এবং আধুনিক শিল্পকারখানা ও কারিগরি সমাজে ইহার ব্যবহার।

ফিলিস্তিনে ইহুদিদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে যেগুলি নির্বাচিত পরিষদ দ্বারা গঠিত এবং যেগুলি কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করে। ফিলিস্তিনের ইহুদি বসতিস্থাপনকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অনেকগুলি রাজনৈতিক দল রাহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত দলই বিদ্যমান। আবার এক দলের মধ্যে অনেকগুলি দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ একজন ধর্মীয় সমাজবাদী ও একজন ধর্মনিরপেক্ষ সামাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যাপারে একমতের অধিকারী হইলেও তাহারা দুই দলের অন্তর্ভুক্ত।

ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ লইয়া ইহুদিদের মধ্যে যে মতের গরমিল তাহা আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহুদিবাদিগণ (Zionists) হুকুমনামার প্রশাসনের সহযোগিতা লইয়া একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। ইহুদিবাদিগণ তাহাদের পরিকল্পনায় আরবদিগকে বাদ দেয়। আধুনিক ইহুদিবাদীর প্রতিষ্ঠাতা হেরজেল তাঁহার 'ইহুদি রাষ্ট্র' নামক গ্রন্থে আরবদের কথা মোটেই

উল্লেখ করেন নাই। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনের (Anglo-American Commission of 1946) নিকট ইহুদি এজেন্সি এই কথা ব্যক্ত করে যে, একটি ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'যতটুকু সুসঙ্গত' ঠিক ততটুকু পরিমাণ ফিলিস্তিনের অইহুদি জনগণের অধিকার রক্ষা করা হইবে। ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ড্যাভিড বেনগুরিয়ান তাঁহার 'ইসরাইলের পুনর্জন্ম ও ভবিষ্যৎ' নামক গ্রন্থে বলেন, 'ইসরাইল রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের অংশ বিশেষ শুধু ভৌগোলিক দিক হইতে ...।' ইহুদিবাদীদের দুর্ভাগ্যজনক (কারণ ইহা সত্য নহে) কিন্তু শক্তিশালী নীতি হইল ইসরাইল জঙ্গভীলের প্রবাদ বাক্য 'দেশহীন একটি জাতির জন্য জনগণহীন একটি দেশ।'

ইহুদিবাদীদের প্রধান দল কর্তৃক অনুসৃত কাট-ছাটের নীতি রিভিশনালিস্ট (Revisionalist) নামে অভিহিত ইহুদিবাদীদের একটি দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহারা বৃটিশ হুকুমনামার বিরোধিতা করে এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি আলোচনায় ইহুদিবাদিগণ কর্তৃক উত্থাপিত মূল দাবি অনুযায়ী সমগ্র এলাকায় একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। সে সময় তাহাদের পেশকৃত মানচিত্রে অধিকাংশ ট্রান্সজর্ডান এবং সিরিয়া লেবাননের প্রধান এলাকা অন্তর্ভুক্ত। ইহুদিবাদীদের আরেক দল আবার ইহুদ (ঐক্য) দল গঠন করে। ইহার উদ্দেশ্য হইল আরবদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্মসূচির প্রবক্তা হইলেন হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস্ ম্যাগনাস (Judas Magnas), দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার (Martin Buber) এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীগণ, যাহারা ফিলিস্তিনে একটি দ্বিজাতিত্বমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

বিশাল কৃষি, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকল্পের সংগঠনকারী ইহুদি এজেন্সি আবার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীও পরিচালনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফিলিস্তিনের ইহুদি বসতিগুলি এবং আরব গ্রামগুলিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন ছিল। প্রত্যেক ইহুদি বসতির নিজস্ব রক্ষীবাহিনী ছিল। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে এইসব প্রহরীদল হ্যাশোমার (Hashomer) নামক একটি সংস্থা গঠন করে এবং হুকুমনামার যুগেও সম্ভ্রান্ত প্রহরী দল হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রত্যেক মহাযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনে প্রত্যাগত বৃটিশ সেনাবাহিনীর ইহুদি সুদক্ষ সৈন্যগণ বিভিন্ন গোলযোগের সময় ইহুদি বসতিগুলি রক্ষা করিবার জন্য হাগানাহ্ (Haganah) নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে। তাহারা যত্রতত্র প্রশিক্ষণ দান করে এবং বেআইনিভাবে অস্ত্রবহন করে। হিস্তাদ্রোত ও ইহুদি এজেন্সি তাহাদের অর্থ যোগায়। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ নগাদ হাগানাহ্ পরোক্ষভাবে বৃটিশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাহাদের কোনো কোনো সদস্য পুলিশ বাহিনীতে স্থান লাভ করে। আরেকটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান হইল ইরগুন (Irgun)। ইহা রিভিশনালিস্ট দলের যোদ্ধাদল, যাহারা বৃটিশ ও আরব উভয়ের সহিত যুদ্ধ করে। ইরগুনের চাইতেও অধিক জাতীয়তাবাদী দল হইল স্টার্ন-গ্রুপ বা 'ইসরাইলে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী'। তাহারা অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত থাকে। ইহুদি এজেন্সি ইরগুন ও স্টার্ন উভয় দলের সমালোচনা করে এবং তাহাদের সহিত কোনো সম্পর্ক স্বীকার করে না। এই অবস্থা ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সংগঠিত আরব রাষ্ট্রবর্গের সহিত যুদ্ধ পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং তখন সমস্ত যোদ্ধাদলকে একই পরিচালনাধীন আনা হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুদক্ষ ইহুদি সংগঠনের তুলনায় আরব জাতির সুসংহত কার্যাবলী বৈশিষ্ট্যহীন। প্রকৃতপক্ষে কোনো ক্ষেত্রে তুলনামূলক কোনো আরব দলই ছিল না। সুপ্রিম

মুসলিম কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা বিদ্যমান ছিল, যাহার দায়িত্ব হইল মুসলমানদের ধর্মীয় বিচার-সালিশ ও ধর্মীয় দানসত্রগুলির তত্ত্বাবধান করা, কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নে ইহার কোনো ভূমিকা ছিল না। আরবদের রাজনৈতিক কার্যাবলী আরব উচ্চ কমিটি (Arab Higher Committee) নামক বিভিন্ন দলের একটি ঐক্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত কিন্তু এই সকল কার্যাবলী ছিল অবিন্যস্ত ও অকেজো। মুসলিম কাউন্সিল ও উচ্চ কমিটি এই উভয় সংগঠনের প্রধান ছিলেন গোঁড়া বৃটিশ-বিরোধী ও ইহুদি-বিরোধী মুফতি হজ আমিন আল-হোসাইনী। আরবগণ হুকুমনামার সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিত, ইহার বাহিরে তাহারা কোনো সাহায্য লাভ করিত না এবং ইহুদিদের দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত কিছুর জন্য গর্ব করিতে পারিত না। ক্রমবর্ধমান ইহুদি ক্ষমতার মুখে তাহাদের হতাশার মধ্যে তাহারা প্রতিবাদ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না।

ইহুদিদের বিরুদ্ধে আরবদের প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধের সূচনা হয় ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে। জেরুজালেম, হেবরন ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে সংঘটিত এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষ হতাহত হয়। স্যার ওয়াল্টার শ' একটি তদন্ত কমিটির প্রধান হন এবং তাঁহার রিপোর্ট পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই ধরনের অনেক রিপোর্টসমূহের মধ্যে প্রথম রিপোর্ট। ইহা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে। ইহা আরবদের নিন্দা করে কিন্তু ব্যাখ্যায় বলে যে, হতাশার মধ্য হইতে তাহাদের আক্রোশ জন্ম লাভ করিয়াছে। ইহা সুপারিশ করে যে সরকারের উচিত, আরবদের ভীতি দূর করিবার জন্য বাস্তুত্যাগ, ভূমি বিক্রয় এবং ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করা।' ইহুদিগণ শ' রিপোর্টের মর্মার্থের প্রতিবাদ করে, ফলে ভূমি সমস্যা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন স্যার জন হোপ সিম্পসনের নেতৃত্বে আরেকটি মিশন প্রেরণ করে। বৃটিশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের (Passfield white paper) মূল ভিত্তি এই রিপোর্ট ইহুদিদের ভূমি ক্রয়কে বিধিসম্মত বলিয়া স্বীকার করে। তবে যে ধারায় ক্রয় করা জমিতে অইহুদি শ্রমিকদিগকে কাজে বাধা দান করে এবং অইহুদিদের নিকট উহা পুনরায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করে তাহার সমালোচনা করে; অপরদিকে প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র চরমপন্থী ইহুদি ও আরব উভয়ের মতামত প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাইকে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ প্রদান করে।

শ্বেতপত্র ইহুদিবাদীদের মধ্যে এইরূপ ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, ওয়াইজম্যান ইহুদিবাদী সংগঠন ও ইহুদি এজেন্সি উভয় সংস্থার সভাপতির পদে ইস্তেফা দান করেন। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদিবাদীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ এইরূপ জোরালো হয় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড বাস্তুত্যাগ ও ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াইজম্যানের ভীতি দূর করিবার জন্য তাঁহার নিকট একখানি পত্র লিখিতে বাধ্য হন। অতঃপর আসে আরবদের প্রতিবাদের পালা। তাহারা প্রধানমন্ত্রীর 'কৃষ্ণপত্রের' (Black Letter) প্রতিবাদ করে এবং পুনরায় বালফার ঘোষণার সমালোচনা করে।

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য বার আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এইগুলির অধিকাংশই বৃটিশ হুকুমনামার বিরুদ্ধে। ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন আরব রাজনৈতিক দলসমূহ জেরুজালেমের মুফতি হজ আমিন আল-হুসাইনীর নেতৃত্বে আরব উচ্চ কমটিতে (Arab Higher Committee) একত্রিত হয় এবং একটি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ, নাশকতামূলক কার্যকলাপ, ইহুদি সম্পত্তির ধ্বংস সাধন এবং ব্যাপক হাঙ্গামাও চলিতে থাকে। পরস্পরবিরোধী ওয়াদার নিজস্ব ফাঁদে পড়িয়া গ্রেট

বৃটেন কিছু করিতে অপারগ হয় এবং লর্ড পীলের নেতৃত্বে ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালে আরেকটি অনুসন্ধানকারি দল প্রেরণ করে। পীল কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দান এবং ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা এই উভয় কাজ গ্রেট বৃটেন একত্রে করিতে পারে না। অতএব ইহা সুপারিশ করে যে, হুকুমনামার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেশকে জেরুজালেম ও বেথেলহেম সহকারে ইহুদি ও আরব এই দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হউক।

দেশভাগের এই প্রথম প্রস্তাবে ইহুদিবাদী আরবদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়াইজম্যানসহ অনেক ইহুদিবাদী ইহা সমর্থন করে। কারণ ইহা কার্যত ইহুদিদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে। তবে ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিংশতি ইহুদিবাদী কংগ্রেস ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ ইহা বালফার ঘোষণার ওয়াদার পরিপন্থী। অবশ্য ইহা ভবিষ্যৎ বিবেচনার পথ উন্মুক্ত রাখে। আরবদের মধ্যে শুধুমাত্র ট্রান্সজর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ্ ইহা সমর্থন করেন। আরব উচ্চ কমিটি ইহার বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত প্যান-আরব কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং বালফার ঘোষণার রহিতকরণ দাবি করা হয়।

সিরিয়া সম্মেলনের অনতিকাল পরে আরব বিদ্রোহ পুনরায় ফাটিয়া পড়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত এখানে সেখানে বিদ্রোহজনিত সংঘর্ষ চলিতে থাকে। বৃটিশ সরকার জেরুজালেমের মুফতি এবং আরব উচ্চ কমিটির অন্যান্য চরমপন্থী সদস্যদের গ্রেফতার করিবার আদেশ দেয়, কিন্তু তাঁহারা লেবাননে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন অনেকটা অভ্যাসবশত দেশ ভাগ পরিকল্পনার উপর রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য উড্হেড্ কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু সরকার ইহার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে হিটলারের আবির্ভাব এবং জার্মান ইহুদিদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাগমনের ক্রমবর্ধমান দাবির ফলে ইহুদিবাদীগণ প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। ফিলিস্তিনে বস্তুত গৃহযুদ্ধই চলিতে থাকে। হ্যাগানাহ দল অস্ত্র বহন করিবার জন্য হুকুমনামার সরকার হইতে অনুমতি লাভ করে এবং গুপ্ত সংগঠন ইরগুনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সচল হইয়া উঠে।

আরেকটি কমিশন প্রেরণ করিবার পরিবর্তে গ্রেট বৃটেন ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারি লন্ডনে আরব ও ইহুদিবাদীদের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। মধ্যমপন্থী ও উগ্রপন্থী ফিলিস্তিনী আরবগণ ছাড়াও মিসর, ইরাক, সৌদি আরব ও ট্রান্সজর্ডানের নিকট হইতেও প্রতিনিধি দল আহবান করা হয়। প্রথমবারে মত ফিলিস্তিনী সমস্যা সমাধানের জন্য অ-ফিলিস্তিনী আরবদিগকেও আহ্বান করা হয়। অপরদিকে ইহুদিবাদী ও অ-ইহুদিবাদী ইহুদি এবং ইউরোপ ও যুদ্ধরাষ্ট্রের ইহুদিদিগকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আরবদের প্রত্যাখ্যানের ফলে সম্মেলন এমনকি প্রতিনিধিবৃন্দকে এক টেবিলে বসাইতেও অসমর্থ হয় এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের মেঘ পুনরায় ইউরোপীয় দিগন্তে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে এবং বৃটেনকেও জার্মান-হুমকি বিবেচনা করিতে হয়। ইহা কিছুতেই প্রত্যাশিত নহে যে, আরবগণ জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করুক। মিসরীয়গণ ও ক্রিসেন্টের আরবগণ বাহ্যত বৃটিশের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু ফিলিস্তিনের ব্যাপারে অসুখী এবং জার্মান অপপ্রচারের কি প্রতিক্রিয়া তাহাদের মধ্যে সূচিত হয় তাহা কিছুতেই বলা যায় না। আরেকটি মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করিয়া গ্রেট

বৃটেন ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্র পরিষ্কারভাবে আরবদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। ইহা দশ বৎসরে একটি স্বাধীন দ্বি-জাতিত্বমূলক ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে। ইহাতে পাঁচ বৎসরে ৭৫০০০ বাস্তুত্যাগীর ফিলিস্তিনে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং পরবর্তী বাস্তুত্যাগ আরবদের সম্মতির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জমি বিক্রয় কোনো কোনো অংশে বৈধ ঘোষণা করা হয়। কোনো কোনো অংশে সীমিত করা হয় কিন্তু অধিকাংশ ফিলিস্তিনে ইহাকে নিষিদ্ধ করা হয়। উভয় পক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ইহুদিবাদিগণ এই ক্ষেত্রে আরবদের চাইতে উগ্র মনোভাবের পরিচয় দেয়। সমগ্র ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং ইহুদি এজেন্সির চেয়ারম্যান বেনগুরিয়ান বৃটিশনীতির বিরোধিতা করিবেন বলিয়া ওয়াদা করেন।

অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা সত্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বিবদমান দলগুলিকে কিছুটা শান্ত করে। ইহুদিবাদীদের অভিরুচি পরিষ্কার। গ্রেট বৃটেন ও হিটলারের জার্মানীর মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধে ইহুদিবাদিগণ কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা প্রশ্নাতীত। বেনগুরিয়ানের ভাষায়, "আমরা শ্বেতপত্র লইয়া এমনভাবে সংগ্রাম করিব যেন কোনো যুদ্ধই নাই; এবং আমরা এমনভাবে যুদ্ধ করিব যেন কোনো শ্বেতপত্র নাই।" ইহুদিবাদিগণ একটি সম্পূর্ণ ইহুদি বাহিনী গঠন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বৃটিশগণ একটি ফিলিস্তিন পাইওনিয়ার বাহিনী গঠন করে এবং আরব ও ইহুদি উভয় স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। অবশ্য ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ বৃটিশগণ কিছুটা নরম হয় এবং ইহুদিদিগকে তাহাদের নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকাবাহী ব্রিগেড গঠন করিবার অনুমতি দান করে। আরবগণ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ব্যাপারে ইহুদিদের ন্যায় তেমন উৎসাহী ছিল না। ৯,০০০-এর অধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে নাই।

ইহুদিবাদী ও আরব উভয়েই জানিত যে বৃহৎ শক্তিবর্গের এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। পার্থক্য শুধু এই যে ইহুদিবাদিগণ সম্ভাব্য সব উপায়ে ভাগ্যকে তাহাদের স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে আরবগণ সবকিছু আল্লাহর হাতে ছাড়িয়া দিতে আগ্রহী হয়।

একত্রিংশ অধ্যায়
ইরান—পাহ্‌লভী যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইরান তাহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেও ইহা আঁতাত এবং কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের অসংখ্য যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রুশ ও তুর্কিগণ আজারবাইজানে যুদ্ধ করে, বৃটিশগণ দক্ষিণাঞ্চলে সাউথ পার্শিয়া রাইফেলস নামে একটি পারস্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে, এবং জার্মানগণ নাইদারমায়ার (Niedar-mayer) ও ওয়াসমুসের (Wassmuss) ন্যায় দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দালালদের মাধ্যমে আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে গোত্রসমূহকে ক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে যুবক সম্রাট আহমদ শাহ্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং তৎসঙ্গে ইরান কিছুটা পার্লামেন্টারি পদ্ধতির রূপ ধারণ করে। সরকার তখন রাজনৈতিক মধ্যপন্থী, গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও জমিদার অভিজাতবর্গের একটি যুক্তফ্রন্টের হাতে থাকে, যাহাদের অধিকাংশ লোক কয়েক বৎসর পূর্বেও শাসনতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে শুস্তারের বরখাস্তের সঙ্গে মজলিস বন্ধ হইয়া গেলে উদার গণতন্ত্রীদল যেহেতু বিশ্বাস করে যে আঁতাত দল জয়লাভ করিলে ইরানকে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিভক্ত করা হইবে সেহেতু তাহাদের সহানুভূতি জার্মানি ও তুর্কির স্বপক্ষে থাকে। ইউরোপে যাহারা পলায়ন করে তাহাদের অধিকাংশ বার্লিনে একত্রিত হয়। সেখানে উদার বিপ্লবীদের একজন পুরোধা তাব্রিজের হাসান তাকিজাদেহ ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কাভেহ্[১] (Kaveh) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করেন। উদারপন্থীদের মধ্যে যাহারা ইরানে থাকিয়া যায় তাহরা ওসমানীয়দের কাঁধে কাঁধ মিলাইবার জন্য সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া ইস্তাম্বুলে পৌঁছে।

জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

বার্লিন বা ইস্তাম্বুলের উদারপন্থিগণ ইরানের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করে নাই। তবে কিছুসংখ্যক উদারপন্থী কর্মধারা নিজেদের হাতে নেয়, একটি ছোটখাট অস্ত্রধারী দল গঠন করে এবং ইরানে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশসমূহ আজারবাইজান, জ্বিলান ও খোরাসানে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবত কস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত জ্বিলান প্রদেশে মির্জা কুচুক খান কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সরকার। তিনি ও তাঁহার অনুসারিগণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, ইরান হইতে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাঁহারা দাঁড়ি ও চুল কাটিবেন না। জ্বিলানের বনে অবস্থান করায় তাহারা বন-জঙ্গলের লোক নামে পরিচতি হয় এবং রবিনহুডের কায়দায় তাহারা নিজেদের ভরণ-পোষণ করে। কিছুকালের জন্য জার্মান ও তুর্কি অফিসারগণ জঙ্গলী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বৃটিশ ও রুশ

---

১. *কাভেহ্ পারস্যের কিংবদন্তীর এক কর্মকারের নাম, যে তাহার চামড়ার বহিরাবরণ উত্তোলন করিয়া একজন অ-পারস্য জাহ্‌হাকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করে। কাভেহের চামড়ার বহিরাবরণ পারস্য স্বাধীনতার স্মারক চিহ্নে পরিণত হয় এবং যুদ্ধ পতাকা হিসাবে ব্রবহৃত হয়। ইহাকে দারাফুশ-এ-কাভেয়ানী বলা হয়।*

যোগাযোগ লাইন ধ্বংস করিবার কাজে প্রশিক্ষণ দান করে। রুশ বিপ্লবের পর ইহসানুল্লা নামক আজারবাইজানের এক কমিউনিস্ট এজেন্ট ও কুচুক খানের বন্ধুর মাধ্যমে বলশেভিকগণ জঙ্গলীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে।

জঙ্গলীদের সহিত মস্কোয় অবস্থিত কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্ক কখনও জোরদার হয় নাই। একদিকে বলশেভিকগণ নিশ্চিত হইতে পারে না যে, ইরান মতবাদের দিক হইতে বিপ্লবের জন্য 'প্রস্তুত' কিনা, অপরদিকে জঙ্গলীদের মধ্যে একমাত্র ইহসানুল্লাহই খাঁটি কমিউনিস্ট, এবং নেতা কুচুক খান মনেপ্রাণে বলশেভিকদের সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে মনস্থির করিতে অপারগ। এতদসত্ত্বেও ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে বৃটিশ সৈন্যদিগকে জ্বিলান ত্যাগে বাধ্য করিবার ব্যাপারে তিনি বলশেভিকদের সাহায্য গ্রহণ করেন। বৃটিশ সৈন্যগণ রুশ বিপ্লবের পর উত্তর ইরান দখল করে। প্রাদেশিক রাজধানী রাশ্‌ত-এ জ্বিলানের একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হয়, কিন্তু শীর্ঘই জঙ্গলীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। একজন পারস্য জাতীয়তাবাদী হিসাবে কুচুক খান জ্বিলানকে রাশিয়ার একটি অংশে পরিণত করিবার বিরোধী। আবার একজন মধ্যমন্থী সমাজবাদী হিসাবে তিনি পারস্যের জমিদার ও ব্যবসায়ীদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবারও বিরোধী।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এ ব্যাপারে কোন নীতি গ্রহণ করিবে সে ব্যাপারে মস্কো তখনও মনঃস্থির করিতে পারে নাই। তৎসঙ্গে জ্বিলানে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হইবার ফলে মস্কো তেহরানের পারস্য সরকারের সহিত একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি মার্ক্সীয় বিপ্লব সংঘটিত হইবার মত ক্ষেত ইরানে তৈয়ার হউক। তিনি জঙ্গলীদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ফিরাইয়া আনেন। মির্জা কুচুক খান এইভাবে একাকী পারস্য সরকারি বাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জ্বিলানের পর্বতে পলাতক হিসাবে তিনি প্রচণ্ড শীতে মারা যান।

জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে সম্ভবত সমগ্র উত্তর উপকূল অধিকার করিবার ব্যাপারে মস্কোর অনীহার কারণ অনুমান-সাপেক্ষ ও সুদীর্ঘ — যাহা এখানে বিবৃত করা যায় না। তবু নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১। ইরান মার্ক্সীয় মতবাদ গ্রহণ করিবার মত যথেষ্ট উন্নত কিনা এই ব্যাপারে বলশেভিকদের মধ্যে সন্দেহ ছিল।

২। বলশেভিকগণ তখনও সাম্রাজ্যবাদের কার্যক্রম হিসাবে অন্যের দেশ দখল করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট আদর্শবাদী।

৩। জ্বিলানের এই ঝুঁকি গ্রহণকারী মধ্যস্থতাকারী আজারবাইজানের সোভিয়েতের সহিত মস্কোর মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল।

৪। গৃহযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও খুবই দুর্বল এবং এই বিষয়েও নিশ্চিত নহে যে, গ্রেট বৃটেন ইহাকে উত্তর-ইরানে অনুপ্রবেশ করিতে দিবে কিনা।

৫। মস্কো সম্ভবত বিশ্বাস করে যে, শুধুমাত্র একটি বা দুইটি প্রদেশের চাইতে বন্ধুত্ব ও প্রচারণার মাধ্যমে সে কোনোদিন সমগ্র দেশ পাইতে পারে।

৬। সেই ভূখণ্ড দখল না করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবত শুধু ভুলই করিয়াছে। শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশ পর জ্বিলান পরিকল্পনার একজন উদ্যোক্তা জাফর

পিশভেরি (Jafar Pishevari) পারস্যের আজারবাইজন প্রদেশে একটি বিছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইহা ছিল স্ট্যালিনের সময় এবং মস্কো পুনরায় তাহার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পারস্য সরকারের হাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদেরকে ধ্বংস হইতে দেয়।

ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ইরানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করে। উহাদের একটি হইল এই যে ইহা অন্ততঃপক্ষে দেশের মধ্যে বিদ্যমান ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটায়। এই বিপ্লব ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনকে অকেজো করিয়া দেয়; যদ্বারা এই দুই দেশ ইরানকে নিজেদের প্রভাবের অংশে বিভক্ত করিয়াছিল। রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে গ্রেট বৃটেনের পক্ষে শূন্যস্থান পূরণ করা, সমগ্র ইরান নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা এবং তদ্বারা ভারতবর্ষের জল স্থলপথ উন্মুক্ত রাখা ও সদ্য আবিষ্কৃত তৈলকূপগুলি নিয়ন্ত্রণ করা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। বৈদেশিক সচিব লর্ড কার্জনের স্বপ্ন ছিল, "ভূমধ্যসাগর হইতে পামীর পর্যন্ত এক নাগাড়ে কতকগুলি অধীন রাষ্ট্রের গ্রন্থি" সৃষ্টি করা তন্মধ্যে ইরান "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।" ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে পরাক্রান্ত বৃটিশ কূটনীতিজ্ঞ স্যার পার্শি কক্স (Sir Percy Cox) তেহ্রানে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে উপরোল্লিখিত নীতি কার্যকর করিতে বলা হয়।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ আবার প্যারিস শান্তি সম্মেলনের বৎসর, যাহার প্রতি উডরু উইলসনের আত্মনিয়ন্ত্রণের মতবাদ অনেক ছোট ছোট জাতিকে আকৃষ্ট করে। একগুচ্ছ দাবি সহকারে ইরানও একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ইরানকে সম্মেলনে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে বৃটিশ বিরেধিতা করে। উইলসন সমস্ত প্রতিনিধিদলকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতী এবং ইরানের ক্ষেত্রে ফ্রান্স এবং ইতালিও সম্মতি জ্ঞাপন করে, কিন্তু গ্রেট বৃটেন অসম্মত। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট নাগাদ ঘোষণা করা হয় যে, গ্রেট বৃটেন ও ইরান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, যে ব্যাপারে বেশ কিছুদিন যাবৎ আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। এই অখ্যাত চুক্তিতে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী হাসান ওসুক আল-দোলেহ্ এবং শাহজাদা ফিরুজ, যাঁহাকে তাঁহার চাচাত ভাই শাহ্ বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

সেই চুক্তি পরিষ্কারভাবে গ্রেট বৃটেনের স্বপক্ষে স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহা শুধু পারস্যের উদারপন্থীদের ভিতর নহে বরং যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের ন্যায় দেশেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। পারস্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের গতানুগতিক অঙ্গীকারের পর চুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পূর্ণ করিবার ওয়াদা করেঃ

১। পারস্যের যতগুলি বিভাগের জন্য প্রয়োজন গ্রেট বৃটেন ততগুলি উপদেষ্টা প্রদান করিবে। ইরান উপদেষ্টাদের খরচপত্র ও "যথেষ্ট দক্ষতা" প্রদান করিবে।

২। গ্রেট বৃটেন পারস্য সরকারের খরচে একটি পারস্য সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ দান করিবে।

৩। উপরোল্লিখিত কার্যের জন্য ৭ শতাংশ সুদের হারে ২০ লক্ষ পাউন্ড ঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং ঋণ প্রদানকারী ইরান "সমস্ত রাজস্ব ও শুল্ক আয়ের" মালিক হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

৪। "রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে" গ্রেট বৃটেন ইরানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিবে।

চুক্তিটি এমনভাবে স্বাক্ষরিত হয় যে, ইরান গ্রেট বৃটেনের পদানত হইয়া যায়। অনেক দিক হইতে ইহা ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মিসরের উপর এককভাবে চাপাইয়া দেওয়া চুক্তির ন্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পারস্যবাসীদের বিরোধিতার জন্য যতটুকু নহে তাহার চাইতেও বেশি যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য চুক্তিটি নাকচ হইয়া যায়। এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উডরু-উইলসনের আদর্শবাদের সহিত ইরানের তৈলের অনুমতিপত্র লাভের ব্যাপারে মার্কিন তৈল কোম্পানিসমূহের আগ্রহও মিলিত হয়। চুক্তি দ্বারা গ্রেট বৃটেনের দেওয়া এইরূপ একচেটিয়া অধিকার কোম্পানিগুলি পছন্দ করে নাই। অপরদিকে বৃটিশগণ এমন নিশ্চিত হইয়া যায় যে, তাহারা চুক্তিটি মজলিসের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পূর্বেই (কখনও ইহা অনুমোদিত হয় নাই) ইরানে তিনজন প্রধান উপদেষ্টা প্রেরণ করিয়া দেয়। আর্মিটেজ স্মীথকে অর্থনৈতিক বিষয়াদির জন্য, জেনারেল ডিকসনকে সামরিক বিষয়াদির জন্য এবং হার্বার্ট স্মীথকে শুল্ক বিষয়াদির জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এই চুক্তি কার্যকারী না হওয়ায় বৃটিশ সম্মানে আঘাত লাগে কিন্তু ইরানে তাহাদের প্রভাব অম্লান রাখিবার জন্য তাহারা শীঘ্রই আরেকটি পরিকল্পনা লাভ করে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বিধায় ইরানে একটি শক্তিশালী রুশ বিরোধী ও গ্রেট বৃটেনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সরকার সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য সফল করিবে– তাহারা অনুরূপ একটি পরিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করে।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের অভ্যুত্থান

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে ইরান বিশৃঙ্খলার আবর্তে নিমজ্জিত হয়। শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শক্তিশালীও ছিল না, শাসনতান্ত্রিকও ছিল না। মন্ত্রিপরিষদ এক শক্তিশালী ভূস্বামী হইতে আরেকজনের হাতে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। চুক্তির ব্যর্থতা এক শূণ্যতার সৃষ্টি করে, আবার জ্বিলানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে পারস্যের নেতৃবৃন্দ বলশেভিজম সম্পর্কে শংকিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল বেলায় সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা দূরীভূত হয়। কর্নেল রেজা খানের সেনাপতিত্বে এবং পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ জিয়া আল-দ্বীন তাবাতাবাইর সমভিব্যাহারে প্রায় ২৫০০০ কোসাক সৈন্য ৬০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাজভীন হইতে তেহরানে উপস্থিত হয় ও রাজধানী অধিকার করে। বলিতে গেলে কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই তাহারা রাজধানী করায়ত্ত্ব করে। সকালে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দলের সুপরিচিত অনেক ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করা হয়। ভীত সন্ত্রস্ত শাহ বাধ্য হইয়া সৈয়দ জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং রেজা খানকে সরদার -এ সিপাহ, বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক উপাধি প্রদান করেন।

সৈয়দ জিয়া একজন মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী ও মধ্যমপন্থি পত্রিকা রা'দ (বজ্র) -এর সম্পাদক। ইহা বৃটিশ সমর্থক সম্পাদকীয়ের জন্যও পরিচিত। উদারপন্থীগণ তাঁহাকে বৃটিশ সমর্থনের জন্য সন্দেহের চোখে দেখে, আবার সামাজিক দিক হইতে ভূস্বামীদের আস্থা অর্জন করিবার মত জনপ্রিয়ও তিনি নহেন। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যাবলী পুলাদ কমিটিতে (Pulad Committee) কেন্দ্রীভূত। বৃটিশগণ ইসফাহানে এই কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের সহিত তাঁহার একমাত্র সম্পর্ক হইল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ককেশাশে প্রেরিত পারস্য প্রতিনিধিদলে তাঁহার সদস্যভুক্তি। প্রতিনিধিদলটি বলশেভিক রাশিয়ার কবল হইতে স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রবর্গের সহিত একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

অপরদিকে রেজা খান সুদীর্ঘ, কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত একজন সামরিক লোক। সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তিনি রুশ পরিচালিত কোসাক বাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বলশেভিক বিপ্লবের পর পারস্যের কোসাক রেজিমেন্টের রুশ অফিসারগণ যখন আটক হইয়া যান, রেজা খান তখন পারস্য অফিসারদের একটি দলের নেতা। রুশদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহারা পূর্ণ রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেন। সামরিক জীবনে লালিত পালিত হইবার ফলে তাঁহার জাতীয়তাবাদের ধারা একটি সম্মিলিত সামরিক সরকারের হাতে ইরানের গৌরব প্রতিফলিত করে। রুশ অধিনায়কদের হাতে তাঁহার কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বাভাবতঃই বিদেশী বিরোধী, বিশেষত বলশেভিক ও রুশ বিরোধী।

রেজা খান ও সৈয়দ জিয়া, এই দুই ব্যক্তিকে যতটুকু জানা যায় তাঁহারা মেজাজ, শিক্ষা এবং প্রায় প্রত্যেক কিছুতে পরস্পর বিরোধী এবং একে অপরের নিকট অপরিচিত। তেহ্‌রানের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শাহ্‌আবাদে বিপ্লবের রাতে সম্ভবত প্রথমবারের মত তাঁহারা মিলিত হন। তদুপরি বিপ্লবের সফলতার পর তাঁহাদের পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত হয় নাই। বিপুলসংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়, কিন্তু ইহা পরিষ্কার যে, পূর্ব হইতে ইহার জন্য কোনো তালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। তাঁহারা উদারনীতিবাদী, মধ্যমপন্থী, রক্ষণশীল, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে গ্রেফতার করেন। কখনও কখনও জিয়া হয়ত একজনকে গ্রেফতারের হুকুম দেন আবার রেজা তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। বিপ্লবের পূর্বে সৈয়দ জিয়া তাঁহার মন্ত্রিসভাও বাছিয়া লন নাই। একটি তৃতীয় দল নিশ্চয়ই সমস্ত প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করে। সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বৃটিশগণই এই তৃতীয় দল বলিয়া অনুমান করা হয়।

গ্রেট বৃটেনের সামরিক প্রতিনিধি কর্নেল স্মীথ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি হাওয়ার্ডের সহিত জিয়ার বন্ধুত্বের দ্বারা ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হইয়া যায়। বিপ্লবের পূর্বে এই সকল লোক ও অন্যদের সহিত ঘন ঘন সাক্ষাৎ এবং "তাহাদের নিকট আধুনিক পারস্য কবিতা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা" করিবার জন্য বৃটিশ বন্ধুদের সহিত তাঁহার রাত্রিকালীন সাক্ষাৎকার ইহাকে আরও সপ্রমাণিত করে। অধিকন্তু কাজভীনে ছিন্নবস্ত্র পরিধানকারী এই সকল কোসাক সৈন্যগণ তেহ্‌রানে প্রবেশ করিবার সময় সুসজ্জিত বৃটিশ সামরিক পোশাক পরিধান করে। রাজধানীর দিকে কোসাক রেজিমেন্টের অগ্রাভিযান সম্পর্কে অবহিত তেহ্‌রান সরকার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য শাহ্‌আবাদে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ঘটনাচক্রে বৃটিশ লিগেশনের দুইজন প্রতিনিধিও সেই সঙ্গে গমন করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিবার মত যথেষ্ট টাকাও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তদুপরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস এই মর্মে এক স্বীকারোক্তি প্রচার করে যে এই সামরিক অভ্যুত্থানে তাহাদের হাত ছিলো।[১]

সৈয়দ জিয়া ও রেজা খান পারস্য সরকারের ক্ষমতা দখলের সময় বৃটিশদের সাহায্য লইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা ইরানের স্বার্থ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের নিকট

---

১. *রেজা খানের কোন জীবনচরিত নাই। ইনিই পরে রেজা শাহ হন। সৈয়দ জিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত করেন নাই। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও পন্থা পর্যালোচনার জন্য এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা এই বিষয় ও অন্যান্যের উপর ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়র (Praeger, 1965) পিটার এ্যাভেরি লিখিত বৃটিশ সমর্থক "মডার্ন ইরান" গ্রন্থ যদি পড়েন তাহা হইলে ভালভাবে জানিতে পারিবেন।*

জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এই ধরনের অভিযোগ ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের চুক্তি স্বাক্ষরকারী ওসুক আল-দোলেহ্-এর বিরুদ্ধে আনা যায়, জিয়া বা রেজার বিরুদ্ধে নহে। সৈয়দ জিয়ার সরকার তিন মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার ধরপাকড়ের শিকার হইয়া উদারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় মহলই তাঁহার শত্রুতে পরিণত হয়। শাহ হইতে নিচের দিকে সব ধরনের লোকের উপর তিনি কঠোর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই তৎপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সামরিক বাহিনী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রেজা খানের সমর্থক ছিল। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল রেজা খান যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ আরম্ভ হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সামরিক বাহিনী গেন্ডারমারীর (Gendermeria) ভবিষ্যৎ এবং বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টা দল লইয়া। রেজা খান চান সশস্ত্র বাহিনীকে একত্রীভূত করিতে ও বৃটিশদিগকে বরখাস্ত করিতে। সৈয়দ জিয়া উভয় প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন ও পরাভূত হন। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ২৪শে মে তিনি ইরান ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি ফিলিস্তিনে বাস করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও রুশ বাহিনী পুনরায় ইরানে প্রবেশ করিলে এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পদত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় ইরানে আগমন করেন। সৈয়দ জিয়া মনে করেন, কোনো বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ব্যাপক কোনো কিছু করা যায় না। বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে তিনি সর্বদাই গ্রেট বৃটেনের সমর্থক।

রেজা খান ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিদেশী প্রভাবমুক্ত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার ছাড়া কোনো কিছু করা যায় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ক্ষমতা দখলের সময় তিনি বৃটিশদের ব্যবহার করেন কিন্তু পরে একাধিকবার তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেন। কর্মজীবনে তিনি বিদেশী উপদেষ্টাদিগকে কাজে লাগাইতে বাধ্য হন; অথচ তাহাদের উপস্থিতিতে তিনি স্বস্তি বোধ করেন নাই এবং কখনও কোনো পরিকল্পনায় তাহাদিগকে কয়েক বৎসরের বেশি রাখেন নাই। এই ধরনের মনোভাব সুস্থ নহে। কিন্তু ইহা ভাবিবার বিষয় যে, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পারস্যবাসিগণ বিদেশী উপদেষ্টা ছাড়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করিতে পারিত কি? কোনো বিদেশী ঋণ ছাড়া কাস্পিয়ান সাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ সম্ভব ছিল কি?

ইরান-সোভিয়েত চুক্তি, ১৯২১

সামরিক বিপ্লবের পাঁচদিন পর প্রাক্তন পারস্য মন্ত্রিসভা ও মস্কোর মধ্যে স্থিরীকৃত একটি রুশ-পারস্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির তাৎক্ষণিক ফলাফল হইল জ্বিলান হইতে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ। ইহার পরে জ্বিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়। মির্জা কুচুক খান জ্বিলানের পর্বতে পলাতক হন এবং পরে শীতে মারা যান। রুশগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই চুক্তির ভাষ্য মূলত বলশেভিক সরকারের একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী নীতির ঘোষণা এবং সবেমাত্র বাতিল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ-পারস্য চুক্তির প্রতিকূলে একটি নজীর। এই চুক্তি অনুসারে রুশগণ ইরানকে সমস্ত রুশ সম্পত্তি, অনুমতিপত্র ও বিষয় আশয় প্রদান করে, তবে শর্ত হইল ইরান এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে (ধারা-১৩) যে, 'পারস্য জনগণের উপকারার্থে এইগুলি সংরক্ষণ করিবে।' অবশ্য এই চুক্তি জার সাম্রাজ্যবাদের এবং ভবিষ্যৎ রুশ শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদের কিছু চিহ্ন রাখিয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ক্যাস্পিয়ান মৎস্য অনুমতিপত্র এবং ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের মাসুলের আইন (Tarrif regulations) অপরিবর্তনীয় রহিয়া যায়। রাশিয়ায় খাদ্য সরবরাহের

জন্য মৎস্য প্রয়োজন এবং মাসুলও ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি নূতন ইরানি সোভিয়েত মৎস্য কোম্পানি গঠন করা হয় এবং ২৫ বৎসর মেয়াদি একটি অনুমতিপত্রও প্রদান করা হয়। কিন্তু মাসুল আর পরিবর্তন করা হয় নাই, ফলে পারস্যের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েতের একচেটিয়া ব্যবসার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ইরান রাষ্ট্রীয়ভাবে একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। মোটের উপর স্ট্যালিন ও রেজা শাহের অধীনস্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরানের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা স্বাধীন ব্যবসার অনুকূলে নহে।

৬নং ধারা পরবর্তীকালে ইরানের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। ইহাতে বলা হয় কোনো তৃতীয় শক্তি "রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্য ভূখণ্ডকে ঘাঁটি বানাইতে চাহিলে ..... পারস্যের অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করিবার অধিকার রাশিয়ার থাকিবে........।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহের সহিত ইরানের নিরাপত্তা চুক্তিসমূহে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অন্যান্য সময় ইরান আক্রমণ করিতে এই ধারা ব্যবহার করে।

পারস্যের তৈল ঃ দ্বিতীয় পর্ব

অনতিকাল পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ নং ধারা রহিত করিবার সুযোগ লাভ করে। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সৈয়দ জিয়া নির্বাচিত হইলে রেজা খান প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন নাই বরং গ্রেফতারকৃত সকলকে মুক্তিদান করেন। ইহাদের একজন, ওসুক আল-দোলেহ্-এর ভ্রাতা কাভাম আল সালতানেহ্ প্রধানমন্ত্রী হন। কাভাম পারস্য কূটনীতির সেই ভাবধারার অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়াকে নিরস্ত্র করিবার জন্য একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন। আধুনিক পারস্যের ইতিহাসে কাভামের নাম উত্তরাঞ্চলের তৈল ও মার্কিন অর্থনৈতিক মিশনের সহিত সংযুক্ত।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর পারস্য সরকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যদ্বারা পঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে উত্তরাঞ্চলের তৈল আহরণের জন্য স্টান্ডার্ড অয়েল কোম্পানিকে অনুমতি প্রদান করা হয়। ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানি এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে উত্তরাঞ্চলের তৈল আহরণের জন্য খোসতারিয়াকে ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুমতি প্রদান করা হয়।[১] এক লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে বৃটিশ সরকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নর্থ পার্শিয়া অয়েল নামে একটি কোম্পানি গঠন করিয়াছিল। তাহারা এখন দাবি করে যে একই অঞ্চলে তৈল আহরণের জন্য দুইটি দলকে অনুমতিপত্র প্রদান করিবার কোনো অধিকার পারস্য সরকারের নাই। অপরদিকে উত্তর-ইরানে মার্কিন স্বার্থে বাধা প্রদানকারী রুশগণ এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে, চুক্তির ১৩নং ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত কোনো অনুমতিপত্র কোনো তৃতীয় পক্ষকে প্রদান করিবার ব্যাপারে ইরান চুক্তিবদ্ধ। উভয় পক্ষের নিকট ইরানের উত্তর হইল, খোসতারিয়া চুক্তি যেহেতু মজলিস অনুমোদন করে নাই তাই শাসনতন্ত্র মোতাবেক ইহা অকেজো এবং এই কারণে কার্যকর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

এই বিষয় লইয়া বৃটিশ ও মার্কিনদের মধ্যে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলিতে থাকে। এই ব্যাপারে বৃটিশগণ সুবিধা লাভ করে কারণ পারস্য উপসাগর এলাকায় ইঙ্গ-পারস্য তৈল

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪৭।*

কোম্পানির তৈল রফতানির একচেটিয়া অধিকার বিদ্যমান এবং তাহারা স্ট্যান্ডার্ডকে দক্ষিণের কোনো বন্দর দিয়া তৈল প্রেরণ করিতে অনুমতি দান করে নাই। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বৃটিশ ও মার্কিন কোম্পানিগুলি একটি অংশীদারিত্বে রাজি হয়, যদ্বারা মর্কিনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। অবশ্য পারস্যবাসীরা রাজি হয় নাই কারণ উত্তরের কোনো ব্যাপারে বৃটিশ কোম্পানির কোনো অধিকার তাহারা চায় না এবং তাই সমগ্র পরিকল্পনাই তাহারা প্রত্যাখ্যন করে।

এই সময় সিনক্লেয়ার অয়েল কোম্পানি (Sinclair Oil Company) এই পরিকল্পনায় উৎসাহী হইয়া উঠে। স্ট্যান্ডার্ডের উপর সিনক্লেয়ারের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাখালিন দ্বীপের তৈল আহরণ ও বিশ্বে ইহা বাজারজাত-করণের অনুমতিপত্র লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সিনক্লেয়ারকে উহার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তরাঞ্চলের তৈল রফতানি করিবার সুযোগ দান করিবে বলিয়া মনে করা হয়। পারস্য মজলিশ ইতোমধ্যে 'যে কোনো স্বাধীন ও দায়িত্বশীল মার্কিন কোম্পানিকে' উত্তরাঞ্চলের তৈলের জন্য সরকারকে অনুমতিপত্র প্রদান করিবার ক্ষমতা অর্পণ করে। শর্তসমূহের একটি হইল অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানি পারস্য সরকারকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ প্রদান করিবে। ঋণের সমস্যাটি সহজ নহে, কিন্তু মনে হয় সিনক্লেয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের আশীর্বাদ লইয়া ইরানে আগমন করে এবং আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে।

সিনক্লেয়ার অয়েলের আলাপ-আলোচনা ও ইহার সহিত সংযুক্ত ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক দলাদলি, অপবাদ, লুট ও হত্যার উপাদান প্রদান করে। শুরুতেই ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মজলিশ যখন সিনক্লেয়ার অনুমতিপত্র অনুমোদন করে মজলিশ ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়া যায়। রিপোর্ট অনুসারে একজন লুণ্ঠনকারী কর্তৃক ইহা সংঘটিত হয়। এপ্রিল মাসে আমেরিকান ব্লেয়ার এন্ড কোম্পানি (American Blair and Company) ইরানের একটি ঋণের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য জনৈক জেমস ফর্বস্‌কে পাঠায়, কিন্তু বৃটিশগণ জোর দিয়া বলে যে যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ঋণের জন্য তাহারা দক্ষিণাঞ্চলের আবগারী শুল্ক পণ হিসাবে প্রদানের অনুমতি দিবে না। তারপর ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সিনক্লেয়ারের প্রতিনিধি ইরানে থাকাকালীন দুইটি ঘটনা দ্বারা তেহরান প্রকম্পিত হয়। প্রথমত অদ্ভুত ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পরে জানা যায় যে, শহরের একটি পানির ফোয়ারায় একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। শত শত রুগী ঐ স্থানে আরোগ্য লাভের জন্য গমন করে এবং হাজার হাজার লোক ইহা দেখিবার জন্য গমন করে। দ্বিতীয়ত ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানির একজন মার্কিন কর্মচারীর প্ররোচনায় যুক্তরাষ্টের ভাইস কনসাল্ মেজর ইম্ব্রী ঐ অলৌকিক ঘটনাস্থলের ছবি তুলিতে যান। তথায় জনতা কর্তৃক তিনি নিহত হন, অথচ তাঁহার সঙ্গীর কিছুই হয় নাই। সরকারি অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পুলিশ ঘটনাটিকে অন্যভাবে বিচার করে এবং তাহারা মার্কিনীটিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে নাই। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আরেকটি কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয় যাহাকে আমেরিকান টিপট ডোম স্ক্যান্ডাল (American Teapot Dome Scandal) নামে অভিহিত করা হয়, যাহাতে সিনক্লেয়ার কোম্পানিও বিজড়িত। পরিকল্পনায় ব্যর্থতার ব্যাপারে এইসব ঘটনাবলী কতটুকু দায়ী তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের তৈলের বিষয়টি আর উত্থাপিত হয় নাই।

রেজাশাহ্ পাহ্লভী

উত্তর-ইরানে মার্কিনীদিগকে জড়িত করিবার পারস্য সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে এতদ্বারা আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিভাগের অর্থনৈতিক উপেদেষ্টা ডঃ আর্থার মিল্স্-পাফ্কে ইরানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ডঃ মিল্স্পাফ্ ও তাঁহার দল ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে ইরান আগমন করেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য ইরানে কাজ-কর্ম সুসম্পন্ন করেন। মিল্সপাফের অর্থনৈতিক নীতিমালার কল্যাণে যুদ্ধমন্ত্রী রেজা খান সেনাবাহ্নীকে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দান করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন। বিদ্রোহ দমন, গোত্রগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের প্রত্যেক অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত করিবার কাজে রেজা খান এই সেনাবাহিনী ব্যবহার করেন। এই কাজে নৃশংস পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে রাস্তাঘাট দস্যুমুক্ত হয় এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম পূর্ণ বোঝা লইয়া কাফেলাসমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে দেশের সর্বত্র বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। সারা জীবন দস্যুতস্করের ভয়ে সন্ত্রস্ত বসবাসকারী জনসাধারণের নিকট ভোটের নিরাপত্তার চাইতে জীবনের নিরাপত্তাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে রেজা খান প্রধানমন্ত্রী হন। বিপ্লবের পর এই প্রথম একজন সামরিক ব্যক্তি সরকারের প্রধান হন। বস্তুত এই সময় প্রদেশসমূহের অধিকাংশ গভর্নরই সামরিক ব্যক্তি, এবং যাহারা বেসামরিক গভর্নর তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব-স্ব এলাকার সামরিক অধিনায়কদের প্রভাবাধীন থাকেন। মজলিশের পঞ্চম বৈঠকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সামরিক গভর্নর বা অধিনায়কের প্রভাবাধীনে। অনেক দিক হইতেই ইহা ইরানের আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাবহুল বৈঠক। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ইহাই শেষ বৈঠক, যেখানে প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতে সাহস করিয়াছেন।

নিঃসংকোচে বলা যায় যে, পারস্য বিপ্লবে রেজা খানের ভূমিকা ছিল ফরাসি বিপ্লবের জন্য নেপোলিয়নের ন্যায়। রেজা খান বিপ্লবের সন্তান আবার ইহার সমালোচকও। তিনি বিপ্লবের অনেক উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন, কিন্তু ইহার প্রক্রিয়ায় নহে। পঞ্চম মজলিশে তিনটি দল দৃষ্ট হয় : সংস্কারবাদিগণ যাঁহারা রেজা খানের কর্মসূচি ও প্রক্রিয়া উভয়টি সমর্থন করেন; সমাজতান্ত্রিক দল, যাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করেন কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিতে চান; এবং আলেম মদারেস-এর মতাবলম্বী অর্ধডজন 'সংখ্যালঘু' যাঁহারা বিভিন্ন কারণে রেজা খানের বিরোধিতা করেন। অবশিষ্টগুলি স্বতন্ত্র।

রেজা খান প্রধানমন্ত্রী হইবার পরেই আহমদ শাহ তাঁহার স্বাভাবিক সফরের একটা অংশ হিসাবে ইউরোপ গমন করেন।। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাবার্তা উঠে এবং সামরিক অধিনায়কদের প্ররোচনায় দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তারবার্তা আসিতে থাকে, যদ্বারা মজলিশকে কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য বলা হয়। কাজারের বিরুদ্ধে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায়, কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ মতবিরোধ দেখা দেয়। মজলিশের ভিতরে ও বাহিরে প্রজাতন্ত্রের উদ্যোক্তা দেখা যায় উদারপন্থী, মধ্যমপন্থী, সামরিক লোকজন ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে। এই প্রস্তাবনার বিরোধী হইলেন উলামাগণ ও বাজারের দোকানদারগণ যাহারা সাধারণত উলামাদের সমর্থন করেন। উলামাদের সহিত একমত থাকেন আলেম–সমাজবিরোধী ক্ষুদ্রসংখ্যক

উদারপন্থিগণ, যাঁহারা আদর্শগতভাবে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক কিন্তু গণতন্ত্র ও বেসামরিক শাসনের আদর্শের প্রতি যাঁহাদের একনিষ্ঠতার দরুন তাঁহারা এই বিশেষ আন্দোলনের বিরোধী - কারণ ইহা একজন 'একনায়ক ও একজন কোসাক' দ্বারা পরিচালিত।

তেহরানে জনসাধারণ আলেম সমাজের প্রভাবাধীন, তাই তাহারা প্রজাতন্ত্র ও রেজা খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যুবক উলামা বিরোধী কবি ইশকীর হত্যা অগ্নিতে ঘৃতাহূতি দেয়। এক কবি রেজা খানের একনায়কত্ব ও তাঁহার "বিন্যস্ত প্রজাতন্ত্রের" উপর বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন। দেয়ালের লিখন বুঝিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান রেজা খানের ছিল। তিনি দ্রুত তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত দরগাহ নগরী কোমে গমন করেন এবং প্রধান ধর্মীয় নেতাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া একটি ঘোষণা জারি করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে পারস্য সরকারের সর্মসূচির ভিত্তি যেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষা, তাই তিনি ও ধর্মীয় নেতাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা জনসাধারণকে "প্রজাতন্ত্রের আলোচনা বন্ধ করিতে বলিবেন এবং তৎপরিবর্তে .... ইসলামের ভিত্তি ও দেশের স্বাধীনতা মজবুত করিতে আমাকে জনগণ সাহায্য করিবে।"

প্রজাতন্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা কাজার বংশ রক্ষা পায় নাই। শাহ্ প্যারিস হইতে রেজা খানকে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করেন এবং মজলিশকে আরেকজনের নাম শুপারিশ করিবার জন্য বলেন। মজলিশ শাহের ইচ্ছা অমান্য করিয়া রেজা খানের জন্য শুপারিশ করেন। রেজা খান সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সদস্যবৃন্দকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া আহমদ শাহ্কে বরখাস্ত ও রেজা খানকে সাময়িক রাষ্ট্রপ্রধান করিয়া একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। একটি স্থায়ী পরিষদ গঠনের জন্য গণপরিষদের সভা আহ্বান করার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে। সদস্যদের অধিকাংশই এই দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর মজলিশ কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং একটি গণপরিষদের সভা আহ্বান করে।

মাত্র চারিজন সদস্য সাহস করিয়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ইহাদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া দৌলতাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করেন। ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক কিছুকালের জন্য ইরানের মধ্যেই রাজনৈতিক অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন; তাকীজাদা ও আলা নূতন শাহের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে তাঁহাদের বক্তৃতার মধ্যে কেউই আরামপ্রিয় আহমদ শাহ্ বা তাঁহার ভ্রাতা শাহজাদাকে সমর্থন করেন নাই। সকলেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন শুধু এই জন্য যে ইহা "শাসনতন্ত্র বিরোধী"। শুধু শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ হইবার চাইতে রেজার একজন কর্মক্ষম প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশের জন্য অনেক মঙ্গল। রেজা খান যদি কর্মক্ষম বাদশাহ হন তবে তিনি একজন একনায়ক হইয়া বসিবেন, শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ্ নহেন।

মজলিশের উদার ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান করিলেও ডঃ মোসাদ্দেকের সহিত একমত হন কিন্তু তাঁহারা সমস্যার যথাযথ সমাধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরের বিনিময়ে রেজা খান বাদশাহ্র পদকে নির্বাচনমূলক করিবার অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন যে পশ্চাৎ-দ্বার দিয়া হইলেও তাঁহারা একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট। অবশ্য ডিসেম্বর

মাসে গণপরিষদের সভা বসিলে দেখা গেল নির্বাচনমূলক শাহের কোনো উল্লেখই নাই, তৎপরিবর্তে একটি পাকাপোক্ত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রীদের নেতা সোলাইমান ইস্কান্দরি রাগান্বিত হইয়া যান কিন্তু তখন এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ইরান একজন নূতন বাদশাহ লাভ করে– রেজা শাহ্ পাহ্লভী।

রেজাশাহ্ ও সংস্কার

রেজা শাহ্ সাধারণ্যে জনপ্রিয়, কারণ তাঁহার সামরিক ক্ষমতা দেশে নিরাপত্তা আনয়ন করিয়াছে। দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামের লোকদিগকে আর অস্ত্র বহন করিতে হয় না। শাহের প্রচণ্ড আঘাত পড়ে গোত্রীয় নেতা ও উচ্চপদস্থ লোকদের উপর, কৃষকদের উপর নহে। শিক্ষিত সমাজ ও উদারপন্থীদের মধ্যেও তিনি জনপ্রিয়। কারণ তিনি একজন খাঁটি সংস্কারক এবং সর্বান্তকরণে ইরানকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আরম্ভ করেন এবং ১৫ বৎসরেরও অধিককাল তাহা চালু রাখেন।

সমগ্র জীবনে সেনাবাহিনী তাঁহার বিশেষ আগ্রহের পাত্র হিসাবে বিরাজ করে। ইহার চাহিদা মিটাইবার জন্য তিনি তৈলের সালামির টাকা ব্যয় করেন, এবং ইহার লোকবলের চাহিদা মিটাইবার জন্য চালু করেন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা। এই সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ সংস্কার চালু করেন। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, বেতার ব্যবস্থা স্থাপন করেন এবং বৃটিশদের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ কোম্পানির ব্যবস্থা হস্তগত করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বোচ্চ গৌরব হইল ক্যাস্পিয়ান হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ। এই সুদৃঢ় পরিকল্পনা ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। চিনি ও চায়ের উপর বিশেষ করের সাহায্যে তিনি ইহা বাস্তবায়িত করেন এবং ইহার জন্য কোনো বিদেশী ঋণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। রেজা ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করেন নাই, কিন্তু বিদেশী ব্যবসা একচেটিয়া করেন এবং প্রত্যেক বাণিজ্যকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে বাধ্য করেন। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইরানের জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃটিশ ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক নোট চালু করিবার সুবিধা প্রত্যাহার করেন। ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্র বহির্ভূত নীতি বিলোপ করেন।

বাদশাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উলামাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ধর্মীয় ওয়াক্ফসমূহ তাঁহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়, পাশ্চাত্য আইনের স্বপক্ষে কিছু কিছু ইসলামি আইন বিলোপ করা হয় এবং সরকারি বিদ্যালয়সমূহে ইসলামি শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়। ইসলামি চান্দ্রপঞ্জিকা রহিত করা হয় এবং তদস্থলে পুরাতন পারস্য-জরথুস্ত্রের সৌর পঞ্জিকা ইহার মাস ও বৎসরের পারস্য নাম সহকারে চালু করা হয়। রসুলুল্লাহর (সঃ) পৌত্র হোসেনের মৃত্যু উপলক্ষে উদযাপিত এক মাসের শোক পালন তিন সপ্তাহে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তাহাও ধর্মীয় শোভাযাত্রা ছাড়াই উদযাপন করা হয়। চেয়ার প্রবর্তন করিয়া কিছু সংখ্যক মসজিদকে 'আধুনিকী' করা হয়। নামাজের আজানে বিরক্তি প্রকাশ করা হয় এবং মক্কায় হজ যাত্রায় নিরুৎসাহিত করা হয়।

রেজা শাহ্ সমস্ত উপাধি বিলোপ করেন এবং জনসাধারণকে পারিবারিক নাম বাছিয়া লইতে বলা হয়। তিনি স্বয়ং প্রাক-ইসলামি পারস্যের ইতিহাসে সম্মানিত পাহ্লভী নাম গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় পোশাকের স্বপক্ষে তিনি পারস্য পোশাক শিরস্ত্রাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের তালাক দিবার ক্ষমতা রহিত করেন এবং ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মহিলাদের পর্দা-প্রথা বিলুপ্ত করেন। তিনি ফার্সি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার প্রধান দায়িত্ব হইল ফার্সিভাষা হইতে সমস্ত ধার করা আরবি শব্দ বাধ দেওয়া। এই সকল কিছুতে এবং অন্যান্য সংস্কারে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেন। সংস্কারে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তিনি সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেন, পত্রিকার সংখ্যা মাত্র কয়েকটিতে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। হাত-পা বন্ধ মজলিশের সদস্যবৃন্দ মহামান্য শাহানশাহ্র স্তুতিগান করিতে থাকেন মাত্র।

পারস্যের তৈল ঃ তৃতীয় পর্ব

পারস্য সরকার কর্তৃক উত্তর-ইরানের তৈলের সহিত মার্কিনদিগকে জড়িত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানি দেশের তৈল আহ্রণ করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। করিগরি বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া ইরানে কোম্পানির অধিকাংশ প্রশাসনিক কর্মকর্তা গ্রহণ করা হয় ভারত সরকারের নিকট হইতে। এই সকল ব্যক্তিবর্গ তাহাদের পৈতৃক আধিপত্যের মনোভাবও তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসে এবং ভারতীয়দের ন্যায় পারস্যবাদীদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার আরম্ভ করে। অনেক দিন যাবৎ কোম্পানির সমস্ত লেনদেন ভারতীয় টাকায় সম্পন্ন হয় এবং শ্রমিকদিগকেও ঐ মুদ্রা প্রদান করা হয়।

ইরানে রেজা শাহ্র অধীনে একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তৈল কোম্পানির এই প্রশাসন এবং সরকারের সহিত এই সম্পর্ক বেশিদিন টিকিতে পারে না। ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি নূতন রাস্তা উদ্ভোধন করিবার জন্য শাহ্ খুজিস্তান গমনকালে তিনি কোম্পানির তৈল প্রতিষ্ঠানসমূহ সফর করিবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপরিবর্তে তিনি তাহাদিগকে এই মর্মে এক বাণী প্রদান করেন যে, কোম্পানির বিরাট লাভের অংশ হইতে ইরান যে 'যৎসামান্য দান' লাভ করে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন এবং তাই তিনি ডি, আর্কির অনুমতিপত্র (D' Arcy Concession) পুনর্বিবেচনা করিতে চান। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনা চলাকালে তৈলের সালামি অনেক কমিয়া যায় এবং পারস্য সরকার তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর অর্থমন্ত্রী তকিজাদা কোম্পানির নিকট এক পত্রে ডি' আর্কির অনুমতিপত্র নাকচ ঘোষণা করেন। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের কোনো অনুমতিপত্র মানিয়া চলিতে এই সরকার বাধ্য নহে। পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি নূতন অনুমতিপত্র বিবেচনা করিতে ইচ্ছুক। বৃটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং বিষয়টি জাতিপুঞ্জে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহের অসময় হস্তক্ষেপের ফলে বিচারালয়ের বাহিরেই ব্যাপারটির মীমাংসা হয়। তিনি অধৈর্য হইয়া উঠেন এবং ব্যক্তিগতভাবে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদন করেন, যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইরানের জয় ঘোষণা

করিলেও শেষ পর্যন্ত ডি, আর্কির অনুমতিপত্রের চাইতেও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়। চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে শাহ্ অনবহিত ছিলেন এবং কেউ তাঁহাকে বাধা দিতেও সাহস করে নাই।

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের অনুমতিপত্রে ইরানের জন্য দুটি বাহ্যিক সুবিধা পরিদৃষ্ট হয়, যদ্বারা রেজা শাহ্ সন্তুষ্ট হন। অনুমতিপত্রের সীমা বেশ ছোট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কোম্পানিও ঐ এলাকায় সম্পূর্ণ ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালায় এবং দেখে যে তাহাদের আওতাভুক্ত এক লক্ষ বর্গমাইলের মধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ তৈল বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত উৎপাদিত প্রতি টন তৈলের উপর সালামি ধার্য করিবার ফলে মন্দা সময়ের জন্যও ইরানে একটি সুনির্দিষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত হইয়া যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সময়ও ইরান অন্যান্য সাধারণ শেয়ারের মালিকদের ন্যায় ২০ শতাংশ মুনাফাই ভোগ করিবে। নূতন বন্দোবস্তে ইরানের বিপুল ক্ষতি হয় দুই দিক হইতে। এক ধারা অনুযায়ী কোম্পানীকে সমস্ত কর হইতে রেহাই দেওয়া হয় এবং অন্য ধারা অনুযায়ী অনুমতিপত্রের সময়সীমা ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ৬০ বৎসরের জন্য ধার্য করা হয়; যাহা পূর্বের অনুমতিপত্রের চাইতে ৩০ বৎসর বেশি।

রেজা শাহের সংস্কারের পুনর্মূল্যায়ন

অনেক লেখক রেজা শাহের সংস্কারকে আতাতুর্কের সংস্কারের সহিত তুলনা করেন; আবার অনেকে এমনও বলেন যে, রেজা শাহ্ তুর্কি সংস্কারকের পদাংক অনুসরণ করেন মাত্র। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয় এবং সম্ভবত তিনি তুর্কি একনায়কের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এই দুই ব্যক্তির পার্থক্য, বিশেষত দুই দেশের পার্থক্য বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। বস্তুত রেজা শাহের কোনো শিক্ষাদীক্ষা নাই। পৃথিবী সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নাই এবং কোনো সুচিহ্নিত কর্মসূচিও নাই। তিনি কোনো দল গঠন করেন নাই, কোনো বক্তৃতা প্রদান করেন নাই এবং প্রচার করিবার মত কোনো মতাদর্শ তাঁহার নাই। ইরানের সংস্কার, নির্বাচন, তাঁহার উপদেষ্টাদের পরামর্শ, তাঁহার ক্ষমতার প্রতি মোহ এবং তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

অধিকন্তু, সম্পদের প্রতি, বিশেষত খাস জমির উপর রেজা শাহের দুর্দমনীয় স্পৃহা ছিল। রেজা শাহ মারা যাইবার সময় তিনি দেশের ইতিহাসে শুধু সর্ববৃহৎ জমির মালিকই নহেন, বরং একজন হোটেল ও কারখানার মালিকও বটে। তিনি এই ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যাহাই তিনি করিতেছেন তাহা দেশের মঙ্গলার্থেই করিতেছেন। ইহা কতকাংশে সত্য, কিন্তু এই সব জায়গাজমির ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁহাকে অন্যদের উপর নির্ভর করিতে হয়, যাহারা আবার নিজেদের জন্য ব্যবসা একচেটিয়া করে এবং জমি করায়ত্ত করে। রেজা শাহ কর্তৃক সেনাবাহিনীকে অতি প্রাধান্য দিবার ফলে বেশ কিছুসংখ্যক অত্যাচারী সামরিক অফিসারের সৃষ্টি হয়, যাহারা জনসাধারণের উপর বিশেষত প্রদেশসমূহে নিজেদের সুবিধার্থে দমননীতি চালান। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে যুদ্ধের ঘনঘটা পুঞ্জীভূত হইতে আরম্ভ করিলে যে সেনাবাহিনীকে তিনি লালন-পালন করেন তাহারাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করিবার জন্য, একনায়কত্ব আরও সুদক্ষ করিবার জন্য তিনি হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিটলার সানন্দে উপদেষ্টা দল প্রেরণ করেন। সম্ভবত তাঁহার কোসাক ব্রিগেডের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া রুশদের

উপর বিরক্ত ছিলেন। তৈল ও অন্যান্য বিষয় লইয়া বৃটিশদের সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল, কিন্তু সেগুলির একটা সমাধান করা হইত। ইরান ও তুরস্কের ভিতর পুরাতন শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও শাহের অধীনে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাহা বেশ স্থায়ী হয়। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরস্ক মিলিয়া সা'দাবাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেন্টোর (Cento) অগ্রদূত হয়।

এতদসত্ত্বেও রেজা শাহ্ একজন সংস্কারক – যাঁহার শিক্ষাহীনতা তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যের পূজারি করিয়া তোলে, ইহার মূল তত্ত্বে নহে। ইউরোপে অসংখ্যা ছাত্রকে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি তাঁহার উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু শিক্ষার্থিগণ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করেন। গণতন্ত্রের বাহ্যিক খোলস তিনি রক্ষা করেন এবং গুটিকয়েক মজলিশের সদস্যই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধিত হয়। একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয় যাহারা নূতন যুগের ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টারে পরিণত হয়। পুরাতন খেতাবসমূহ বাতিল করা হয়। এবং এই সকল খেতাবধারীদের অনেকেই গণজীবন ত্যাগ করেন। সদ্যোত্থিত নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁহাদের শিক্ষা দ্বারা 'ডক্টর' বা 'মোহান্দ' (ইঞ্জিনিয়ার) জাতীয় নূতন উপাধি ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই সকল লোকজন ইরানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে রেজা শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য

পূর্ববর্তী যুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অতি অল্প সংঘর্ষই মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত হয়। তাহা সত্ত্বেও, ইহার সুকৌশল অবস্থান ও তৈল সম্পদ ইহাকে সর্বদাই চরম অবস্থায় রাখে।

তুরস্ক

তুরস্ক ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইউরোপকে দ্বিধাবিভক্তকারী আদর্শগত সংঘর্ষে তুর্কিগণ যোগদান করে নাই। তাহারা কমিউনিস্ট নহে বা ফ্যাসিস্টও নহে বা তাহারা সমাজতন্ত্রী অথবা পুঁজিবাদীও নহে। তুরস্কের শাসকবৃন্দ সামরিক লোক, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী, যাহারা মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। ইউরোপের প্রধান দেশসমূহের প্রতি তুর্কি মনোভাব তিনটি ধারায় ব্যাখ্যা করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে তুর্কিগণ রাশিয়ার প্রতি আস্থাহীন, অর্থনৈতিক কারণে তাহারা জার্মানিকে তথা তাহাদের ব্যবসা পছন্দ করে এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাহারা গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জীবনধারায় প্রলুব্ধ হয়।

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় তুর্কিগণ প্রণালীর ভাগ্য লইয়া সন্দিহান হইয়া পড়ে। তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী শুকরু সারা জগলু মস্কো গমন করেন কিন্তু শূন্য হাতে ফিরিয়া আসেন, কারণ রুশগণ চায় যে তুরস্ক প্রণালী বন্ধ করিয়া দিক এবং জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রুতি দিক। তুরস্ক ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং তৎপরিবর্তে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একটি পারস্পরিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে, যদ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করিবার কোনো অভিপ্রায় তুরস্কের থাকে না। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে তুরস্ক বৃটেন ও ফ্রান্সকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেও, মুসোলিনি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে তুরস্ক চুক্তির দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইলে তুরস্কে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের ন্যায় একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহাতে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। এই দিকে হিটলারের সেনাবাহিনী বলকান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি বাতিল করিবার জন্য জার্মানি তুরস্কের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য বিজয়ীর অসন্তোষ অগ্রাহ্য না করিয়া তুরস্ক নির্লজ্জভাবে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে জার্মানির সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তদ্বারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে। কাঁচামাল বিশেষত আকরজাত ধাতু (Chrome ore) বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

প্রায় সমগ্র যুদ্ধকালে তুরস্ক গুপ্তচর ও কূটনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ বিবদমান দেশসমূহের নাগরিকবৃন্দ বিনা বাধায় এখানে যাওয়া আসা করিতে পারিত। অর্থনৈতিক দিক হইতে যুদ্ধ প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। তুরস্কের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য, যথা আকর, তৈল, ছাগলোম, তামাক প্রভৃতির ক্রেতা পরস্পর-বিরোধী দেশসমূহে বিদ্যমান। বস্তুত এক পক্ষকে ক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আরেক পক্ষ চড়া দামে এইগুলি ক্রয় করে। দেশে প্রচুর বৈদেশিক

মুদ্রার সমাগম হয়, কিন্তু আমদানির জন্য এই মুদ্রা ব্যবহারের উপায় নাই। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বাজেটে ঘাটতি পড়িয়া যায়। তদুপরি তুরস্ককে এক বিরাট সেনাবাহিনী পালন করিতে হয় এবং অর্থ সমাগমের জন্য ব্যক্তিবিশেষের আয়ের উপর একটি বিশেষ কর ধার্য করিতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এই অর্থ নির্ধারণের জন্য বিশেষ কমিটিগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মোটের উপর গ্রীক, আর্মেনীয়, ইহুদি ও বিদেশীদের উপর এই করের বোঝা এবং কর আদায় না করিলে অত্যাচারের আপৎ নিপতিত হয়। এই বর্ধিত কর এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু ইহা তুরস্কের অ-তুর্কি নাগরিকদের মধ্যে একটি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে কারণ, জরুরি অবস্থার মধ্যে ইহাদের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপানো হয়।

তুরস্কের নেতৃবৃন্দ তুরস্ককে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখিবার জন্য যথেষ্ট উত্তম মনোভাব, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করে। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ কোন পক্ষ জয়লাভ করিতেছে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তখন তুর্কিগণ অবসর গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতিসংঘ সনদের সদস্য হইবার জন্য তাহারা জার্মানি, ইতালি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মিসর

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির তিন বৎসর পরও গ্রেট বৃটেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে নাই। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ আসিলে বৃটিশগণ চুক্তির শর্তসমূহ ব্যবহার করে এবং আরও অধিকসংখ্যক সৈন্য দেশে প্রেরণ করে। যুদ্ধের সময় মিসরীয়গণ বৃটিশদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই কিন্তু চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার বৃটিশ দাবির প্রতি মিসরীয় সরকার মাথা নত করে নাই। চক্রশক্তি জয়লাভ করিবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা বিজয়ীদের বিরক্তি উদ্রেক করে এমন কিছু করিতে চায় নাই। এই নীরব বাধায় বৃটিশ অসন্তুষ্ট হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাস ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশগণ ট্যাংক বহর লইয়া কায়েরোর আবদিন প্রাসাদ অবরোধ করে এবং একজন পুরাতন বৃটিশ বিরোধী প্রবক্তা ওয়াফ্‌দ পার্টির নাহাস পাশাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ অথবা দেশ ত্যাগ করিবার জন্য বাদশা ফারুককে চাপ প্রদান করে। ফারুক যদি বৃটিশ দাবি প্রত্যাখ্যান করিতেন তবে হয়ত আধুনিক মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া উঠিতেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেন। নাহাস পাশা অতঃপর বৃটিশদের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন।

নাহাস পাশা ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ মর্যাদায় থাকেন, কিন্তু বাহ্যত সরকারের মধ্যবর্তী দুর্নীতি দমন করিতে অথবা বাদশাহ ও তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান অস্থির অবস্থা দূরীভূত করিতে কোনো প্রচেষ্টাই নেন নাই। আল-আমীনের যুদ্ধে জেনারেল রোমেলের পরাজয়ের দ্বারা জার্মান বিজয়ের হুমকি দূরীভূত হইলে এবং মার্কিনগণ উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিলে বৃটিশদের নিকট নাহাস পাশার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়। বাদশাহ্ ফারুক এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। তিনি ওয়াফ্‌দ বিরোধী নেতা সা'দ পার্টির আহমদ মাহেরকে বাছিয়া লন এবং সরকার গঠন করিতে বলেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি একজন মিসরীয় যুবক কর্তৃক মাহের নিহত হন। সা'দ পার্টির দ্বিতীয়নেতা নুকরাশী পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দুইদিন পর তিনি জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মিসরও পরে জাতিসংঘ সনদের সভ্য হয়।

ইরাক

১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে নূরী আল-সাঈদ ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হন। পরপর পাঁচটি সামরিক অভ্যুত্থানের শেষ অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতায় আসেন। তিনি বৃটিশদের সহিত সহযোগিতা করিবার পক্ষপাতি এবং গ্রেট বৃটেন ও ইরাক প্রেট্রোলিয়াম কোম্পানি হইতে ঋণ ও সালামির অগ্রিম বাবদ ৭০ লক্ষ পাউন্ড গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি জার্মানির সহিত শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইরাকে বৃটিশ বিরোধী জনমত এবং জার্মানির সম্ভাব্য জয়লাভ এত প্রবল যে, বৃটিশ সমর্থক ইরাকি সরকারও নিজকে খুব বেশি জড়িত করিতে সাহাসী হয় নাই।

স্থানীয় রাজনীতি ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে নূরী আল-সাঈদকে জাতীয়তাবাদী রশিদ আল জ্বিলানির স্বপক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তেফা দিতে বাধ্য করে। ফিলিস্তিনের সংগ্রামে ইরাক জড়িত হইয়া পড়ে, কারণ একে তো একটি 'প্রতিবেশি আরব রাষ্ট্র' একটি শত্রু জাতি কর্তৃক 'আক্রান্ত' হয়, তদুপরি ইরাকের রাজকীয় পরিবার হাশেমীয় বংশের নেতৃত্বে ফারটাইল ক্রিসেন্টের ঐক্য সৃষ্টিকারী 'বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলন' তখন পুরাদস্তুর চলিতেছে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে ফিলিস্তিন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের সম্মেলনে ইরাককে আমন্ত্রণ করে। অধিকন্তু জেরুজালেমের মুফতি এবং বৃটিশ বিরোধী উচ্চ আরব কমিটির নেতা হজ্ব আমীন-আল হুসাইনী, যিনি লেবাননে পলায়ন করেন, তাঁহাকে বাগদাদে আশ্রয় দেয়া হয়। সিরিয়া ও ফিলিস্তিন বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় ইরাক প্যান-আরববাদের কেন্দ্র হইয়া উঠে। হজ্ব আমীন ইরাক সরকারের নিকট হইতে একটি মোটা অংকের বৃত্তিলাভ করেন এবং ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী রশিদ আল-জ্বিলানি বৃটিশদিগকে বালফার ঘোষণা পরিত্যাগ এবং স্বাধীন আরব ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করিবার জন্য অকপটে চেষ্টা করেন। বিনিময়ে ইরাক মিত্রপক্ষে যোগদান এবং চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে বৃটেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে জ্বিলানি ও তাঁহার সহ-জাতীয়তাবাদিগণ দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, চক্রশক্তির সহিত সহযোগিতা করিলে তাহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবেন। হজ্ব আমীন ইতিমধ্যে জার্মানির সহিত যোগাযোগ করেন। জ্বিলানি তাঁহার হাতে হাত মিলান এবং আংকারায় নিযুক্ত জার্মান প্রতিনিধি ফন প্যাপিনের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন।

বৃটিশগণ এই সকল কার্যকলাপ সহ্য করিতে পারে নাই এবং জ্বিলানিকে বরখাস্ত করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্‌কে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী ইস্তেফা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে ইরাকি পার্লামেন্টে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে জ্বিলানি জেনারেল তাহা আল হাসেমীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৪টা এপ্রিল চারিজন সেনাবাহিনীর কর্নেলের সহায়তায় জ্বিলানি একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। তত্ত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্ এবং নূরী আল-সাঈদসহ বেশ কিছুসংখ্যক মধ্যমপন্থী নেতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদশাহ্‌কে লইয়া পলায়ন করেন।

এই অভ্যুত্থানে জার্মানিদের হাত থাকিলেও তাহারা গ্রীসে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহার কোনো সুবিধাই তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইদিকে ইরাকিগণ হাব্বানিয়া বিমান ঘাঁটি অবরোধ করিয়া রাখে, আর ওদিকে বৃটিশগণ বসরায় সৈন্য অবতরণ করায়। চক্রশক্তির

সমর্থক ফরাসি ভিসি সরকারের অধীনস্ত সিরিয়ার মধ্য দিয়া জার্মানগণ ইরাকে ৫০ টি বিমান অবতরণ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বৃটিশদের উদ্ধারের জন্য ট্রান্সজর্ডান হইতে আরব বাহিনী তখন পৌঁছিয়া গিয়াছে। 'ত্রিশ দিনের যুদ্ধের' পরিণামে রশিদ আল-জিলানি, জেরুজালেমের মুফতি হজ্ব আমীন এবং তাঁহাদের আরও অনেক সমর্থক পরাজিত হন। তাঁহারা ইরানে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মানি গমন করেন। যুদ্ধের পর জিলানি ছদ্মবেশে একটি ফরাসি জাহাজে চড়িয়া বৈরুত গমন করেন এবং সেখান হইতে মরুভূমি পাড়ি দিয়া সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌঁছেন। তথায় বাদশাহ্ ইবনে সউদ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুদ্ধের পর মুফতি প্যারিসে গৃহবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তিনিও ছদ্মবেশে একটি মার্কিন সামরিক বিমান যোগে কায়রো গমন করেন। তথায় বাদশাহ্ ফারুক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যুদ্ধের শেষ নাগাদ নূরী আল-সাঈদ প্রধানমন্ত্রী থাকেন। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে ইরাক জাতিসংঘের প্রথম সদস্য হইবার গৌরব অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণ করিবার ব্যাপারে ইরাক অংশগ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইরাক বৈদেশিক মুদ্রায় সমৃদ্ধশালী। কিন্তু নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সিরিয়া-লেবানন

জার্মানগণ কর্তৃক ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়নক ভিসি সরকার ফরাসি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব দাবি করে। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে ভিসি সরকার জেনারেল দেঁজকে হাইকমিশনার নিযুক্ত করিয়া সিরিয়া-লেবাননে প্রেরণ করিবার পূর্বে বহুসংখ্যক ফরাসি অফিসার ও সৈন্য স্বাধীন ফরাসি বাহিনীতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে পলায়ন করে। জেনারেল দেঁজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া-লেবানন চক্রশক্তির স্বপক্ষে ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের খোলাখুলি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিরিয়া ও লেবাননিগণ ফ্রান্সের পতনকে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের একটি সুযোগ বলিয়া বিবেচনা করে। ফরাসি ফ্রাংকের অবমূল্যায়ন এবং ইহার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সিরিয়া ও লেবাননিদিগকে হরতাল ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ সহকারে স্বাধীনতা দাবি করিবার সুযোগ প্রদান করে। জেনারেল দেঁজ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

ইরাকি বিদ্রোহে বৃটিশ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহারা সিরিয়া-লেবাননে জার্মান সমাবেশের রাজনৈতিক ভয়াবহতা ভালভাবে উপলব্ধি করে। ফলে ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসি বাহিনী যথাক্রমে জেনারেল উইলসন ও জেনারেল কেঁত্র-র (General Catroux) অধীনে লেবানন ও সিরিয়ায় প্রবেশ করে। জেনারেল দেঁজ প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন কিন্তু মিত্র বাহিনীর বৈরুত ও দামেস্ক প্রবেশ রোধ করিতে সক্ষম হন নাই। জুলাই-এ ভিসি ফরাসি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে; যাহারা ফ্রান্স যাইতে চায় তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় এবং যাহারা থাকিতে চায় তাহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয়।

স্বাধীন ফ্রান্সের অধিনায়ক জেনারেল দ্য গলের প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল কেঁত্র লেবানন ও সিরিয়ায় নূতন গভর্নর নিযুক্ত করেন। জাতীয়তাবাদীদিগকে ইহা সন্তুষ্ট করিতে

পারে নাই, তাহারা জাতীয় স্বাধীনতা দাবি করে। বৃটিশগণ কায়রোয় অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্রের (Middle East Supply Centre) মাধ্যমে সিরিয়া- লেবাননের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে।' তাহারা এখন মুদ্রা পুনর্বিন্যাস করে এবং এই দুইটি এলাকাকে স্টার্লিং অঞ্চলের আওতাভুক্ত করিয়া লয়। ইহা দিবালোকের মত সত্য হইয়া দাঁড়ায় যে, বৃটিশগণ স্বাধীনতার দাবিতে জাতীয়তাবাদীদিগকে উৎসাহ প্রদান করে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে সিরীয়গণ একটি নির্বাচন পরিচালনা করে এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শুকরি আল-কুয়াতলীকে নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। আগস্ট মাসে লেবাননিগণও ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে এবং তাহাদের জাতীয়তাবাদী নেতা বিশার আল-খুরিকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাছিয়া লয়।

জেনারেল দ্য গলের অধীনে স্বাধীন ফরাসি জাতি অন্য ফরাসিদের মত ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অন্যথা করে নাই। তাহারা ক্ষমতা ত্যাগে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে, ধর্মঘট ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ফরাসিগণ লেবাননী প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার করে এবং লেবাননীগণ দেশের সমস্ত ফরাসি অধিকার বাতিল করিয়া ইহার জবাব দেয়। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র লেবাননী ও সিরীয়দিগকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দান করে এবং তাহারাও প্রত্যুত্তরে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাতিসংঘ সনদের সদস্য হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও জেনারেল দ্য গল 'ফরাসি আধিপত্যের' উপর জোর দেন। ফরাসি সেনাবাহিনী ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলের পূর্বে সিরিয়া ত্যাগ করে নাই এবং একই বৎসরের ডিসেম্বর পর্যন্ত লেবাননে থাকিয়া যায়।

ফিলিস্তিন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফিলিস্তিনের ইহুদিগণ যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বান্তকরণে বৃটিশদের সঙ্গে থাকে এবং ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের শ্বেতপত্র কার্যকরী করিবার ব্যাপারে বৃটিশদের বিরুদ্ধে থাকে। ফিলিস্তিনের আরবদের ব্যাপারে এতটুকু বলা যায় যে, বৃটিশদের বিরাগভাজন বা যুদ্ধ প্রস্তুতি বানচাল করিবার ব্যাপারে তাহারা কিছু করে নাই।

ফিলিস্তিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য সম্ভবত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে। ঘটনাটি হইল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে নিউইয়র্ক নগরীর হোটেল বিল্টমোরে অনুষ্ঠিত জরুরি ইহুদিবাদী কনফারেন্সে। এই কনফারেন্সে পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবেলা করিবার জন্য ইহুদিবাদী কর্মসূচী পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং ইহার পর হইতে ইহাকে 'বিল্টমোর কর্মসূচি' নামে আখ্যায়িত করা হয়। কনফারেন্স বালফার ঘোষণার 'মূল উদ্দেশ্য' বাস্তবায়িত করিবার আহ্বান জানায়, যাহার অর্থ করা হয়, একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইহা ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে, ইহার নিজস্ব পতাকাতলে একটি ইহুদি সেনাবাহিনী গঠন সমর্থন করে, ফিলিস্তিনে সীমাহীনভাবে ইহুদিদের বাস্তুত্যাগ চায় এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমির উন্নতি সাধনে ইহুদি এজেন্সিকে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদানের দাবি জানায়।

বিল্টমোর কর্মসূচির অধিকাংশ দাবি কোনো নূতন কথা নয়, অবশ্য কিছু নূতন অনুচ্ছেদ, বিশেষত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি পূর্বে এমন পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই। অতঃপর ধুয়া উঠে 'ইহুদি জাতীয় আবাসভূমির'—রাষ্ট্রের নহে। অবশ্য যাহা নূতন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা ইহল,

বিল্টমোর কনফারেন্সের পর ইহুদিদের মনোভার গ্রেট বৃটেনের উপর আস্থাশীলতার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আস্থাশীল হইয়া উঠে। প্রায় ৩০ বৎসরের অস্থিরতা এবং অসম বৃটিশ-ইহুদি সহযোগিতা শেষ হইয়া আসে। যুদ্ধরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান এবং ইহার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এমন বাস্তব যাহা ইহুদিবাদিগণ অবহেলা করিতে পারে না। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর কোঠায় বৃটিশ সাম্রাজ্য আংশিকভাবে ইহুদিবাদিদের উদ্দেশ্য সাধন করে। পরবর্তী যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনের জন্যে হাত বাড়ায়। বিল্টমোর কনফারেন্সে এই মনোভাব পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। সে দেশের ইহুদি ও অ-ইহুদি সংগঠনগুলি বিল্টমোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের দাবি জানায়। কংগ্রেসের উভয় পরিষদে ইহার উপর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং প্রধান জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং এমন কি স্থানীয় পদের নির্বাচনে ইহুদি সমর্থক দেয়ালপত্র উভয় প্রধান দলের নির্বাচনী প্রচারণার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহুদিদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতামতও দেখা যায়। ফিলিস্তিনে ইহুদ দলের (Ihud party) সদস্যবৃন্দ বিরুদ্ধ আওয়াজ উত্থাপন করেন। ইহাদের অধিকাংশ জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস ম্যাগনাসের (Judes Magnus) নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদল, দার্শনিক মার্টিন ব্যবার ও অন্যান্যগণ, যাঁহারা খাঁটি ইহুদি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। তৎপরিবর্তে তাঁহারা আরবদের সহিত আপোস চান, এবং একটি দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি ধর্মের আমেরিকান পরিষদ (American Council for Judaism) বিল্টমোর কর্মসূচির বিরোধিতা করে। ইহার সদস্যবৃন্দ, যাহারা সকলেই ইহুদি, বিশ্বাস করেন যে ইহুদি ধর্মের লক্ষ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার ন্যায় কোনো জাতীয়তাবাদ নহে, বরং ইহা আধ্যাত্মিক মিলনের একটি ধর্ম। অ-ইহুদিদের মধ্যে ফিলিস্তিনের আরবগণ খ্রিষ্টান ও মুসলমান—সকলেই বিল্টমোর কর্মসূচির বিরোধী। অবশ্য তাহাদের কোনো মুখপাত্র নাই, বিশেষত তাহাদের নেতা মুফতি একজন নাজী হইয়া গিয়াছেন। ট্রান্সজর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট আপিল করেন। আরবের বাদশাহ্ ইবনে সউদের সহিত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাক্ষাতের এক বৎসর পর তিনি আমীর আবদুল্লাহর নিকট যে পত্র লিখেন তাহা ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, আরবদের ক্ষতি হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে না।

যুদ্ধকালীন ফিলিস্তিনের কোনো আলোচনার মাধ্যমে ইউরোপে ইহুদিদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। ইউরোপীয় ইহুদিদের নির্বংশ করিবার জন্য নাজীগণ যে ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করে তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদি ও অ-ইহুদি সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়। একদিকে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলি এই সকল ভাগ্যাহতদের জন্য শুধু যেমন তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করে নাই, আবার অন্যদিকে ইহুদিগণও তেমনি এই সকল বাস্তুত্যাগীদের ধূয়া তুলিয়া তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দাবিকেও জোরদার করিয়া তোলে। কিছু ইহুদি এবং কিছু অ-ইহুদি গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদি বাস্তুত্যাগীদিগকে ইউরোপ হইতে বাহির করিয়া ফিলিস্তিনে আনিয়া বসায়। বৃটিশগণ যাহারা তাহাদের ভূমিকা ঈষৎ পরিবর্তন করিতে পারত, ইহুদি বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিবার জন্য জোর জবরদস্তির আশ্রয় লয়। এই বাস্তুত্যাগীদের হাজার হাজার লোককে বৃটিশ গ্রেফতার করিয়া সাইপ্রাসের বিভিন্ন শিবিরে রাখে। এই সকল শিবির ইহুদিদিগকে নিশ্চয়ই নাজী বন্দী শিবিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আরব লীগ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এই ঐতিহ্যবাহী বৃটিশ নীতি ত্রিমুখী। একটি হইল রাশিয়ার দক্ষিণ-মুখী বিস্তৃতি বন্ধ করিবার জন্য ইহাকে একটি মধ্যম রাষ্ট্র (Buffer State) হিসাবে ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি হইল ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা এবং তৃতীয়টি হইল ভারতবর্ষের রাস্তা কণ্টকমুক্ত রাখিবার জন্য ইহাকে ব্যবহার করা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল তৈলাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবত সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেন বাতিলকৃত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থলে ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের দ্বারা তাহার পুরাতন নীতি বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথাকথিত হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তি অনুরূপ নীতির সরাসরি ফল। সাইক্স্-পিকট্ চুক্তি ও বালফার ঘোষণা অবশ্য এই নীতি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের পরিবর্তে সৌদি আরব এবং উপসাগরে শেখ রাজ্যগুলি ছাড়াও পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সৈন্যগণ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ন্যায় সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসন বন্ধ করিবার জন্য বৃটিশদের এখনও একটি মধ্যম রাষ্ট্র প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষের রাস্তায় এখনও তাহাদের বন্ধুভাবাপন্ন লোকজনের প্রয়োজন। অতএব, গ্রেট বৃটেনের পুরাতন নীতি পুনঃপ্রয়োগের মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

সেই ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ফিলিস্তিনের উপর একটি সম্মেলন আহ্বান করে এবং প্রথমবারের মত আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে ইহার মধ্যে জড়িত করে। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে মে বৃটিশ বৈদেশিক সচিব এন্থনী ইডেন আরব ঐক্যের প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করেন এবং "বর্তমানে ঐক্যের চাইতে আরও শক্তিশালী ঐক্য" গঠন করিবার ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহের কথা বলেন। একই বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, "মহিমান্বিতের সরকার তাঁহাদের দিক হইতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে কোনো পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ সমর্থন দান করিবে।" ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী লোকদের মধ্যে প্যান আরবিদের ভাবধারা তখনও বিরাজমান বলিয়া ইডেনের মন্তব্যগুলি বেশ গ্রহণযোগ্য হয়। এই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে ইরাকের নূরী আল-সাঈদ ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ইরাক, ফিলিস্তিন, ট্রান্সজর্ডান, সিরিয়া ও সম্ভবত লেবাননের ঐক্যের প্রস্তাব করেন এবং আশা করেন যে, অন্যাগুলি পরে যোগদান করিবে। ইহাকে অনেকটা হাশেমীয় বংশের "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনে"র ন্যায় মনে হয় এবং তাই ইহা গ্রহণযোগ্য হয় নাই। মিসরের নাহাস পাশা পূর্বে প্যান-আরবদের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তিনি এখন "আরব ঐক্যের ব্যাপারে পরামর্শ করিবার জন্য" একের পর এক আরব সরকারকে আমন্ত্রণ করিতে শুরু করেন। এক বৎসর স্থায়ী পরামর্শের মাধ্যমে সিরিয়া ও ইরাক একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে, ট্রান্স জর্ডান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া এবং সম্ভবত লেবাননসহ একটি বৃহৎ আরব ঐক্যের কথা জোর দিয়া উত্থাপন করে, এবং মিসর, লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়ামন একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করিতে পারে।

বিল্টমোর কর্মসূচি আরবদিগকে ঐক্যের পথে কতটুকু বাধা প্রদান করিয়াছে বা বৃটিশদিগকে আরবদের ঐক্য আনয়নে কতটুকু উৎসাহ প্রদান করিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা

যায় না, তবে ইহার যে কিছু অবদান রহিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর উপরোল্লিখিত আটটি রাষ্ট্র আলেকজান্দ্রিয়া খসড়ায় (Protocal of Alexandria) দস্তখত করে। এই খসড়ায় তাহারা একটি আরব লীগ গঠন করিতে সম্মত হয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের একটি লীগ বা দলের চূড়ান্ত চুক্তি কায়রোয় স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে মার্চ। ইহা একটি সংযুক্ত পরিকল্পনার সুপারিশ করে এবং অনেকাংশে জাতিসংঘ সনদ দ্বারা উৎসাহিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র সার্বভৌম এবং লীগের সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্য পালনীয় নহে। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত তিনটি পরিশিষ্টের একটি ফিলিস্তিন সম্পর্কে। ইহা আইনগতভাবে ফিলিস্তিনকে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচনা করে, যে রাষ্ট্র তখনও ইহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। ফিলিস্তিনের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় না আসা পর্যন্ত এই চুক্তি লীগকে ফিলিস্তিনের জন্য একজন প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। যুদ্ধের শেষ নাগাদ এই প্রথমবারের মত আরব জাতীয়তাবাদ কঠোর ভিত্তিমূলক না হইলেও ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি আইনানুগ সংগঠন লাভ করে।

ইরান

স্মরণ করা যাইবে যে রেজা শাহ্ তাঁহার শেষের বৎসরগুলিতে হিটলারের সুযোগ্য একনায়কত্ব পছন্দ করেন। তিনি সম্ভবত চিন্তা করেন যে, নিজেকে বৃটিশ প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য জার্মানদিগকে ব্যবহার করিতে পারেন। যাহা হউক, জার্মানি কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারিগরি সাহায্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ইরান তাহার কাজে লাগায়। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ ইরানের ৪১ শতাংশেরও অধিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য জার্মানির সহিত গড়িয়া উঠে এবং বহুসংখ্যক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর ইরানে আসে। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে নাজী প্রচারণা আসে এবং ফন শিরাচের (Von Schirach) ন্যায় নাজী যুব নেতাও শুভেচ্ছা সফরে ইরানে আসেন। প্রথমবারের মত পারস্য সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু ধর্মীয় দল হইতে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিরোধিতা করে এবং পারস্যের বয়স্কাউট আন্দোলন নাজী যুব আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে পারস্যের প্রশাসনিক শ্রেণী বিশেষত সামরিক অফিসারবৃন্দ ছিলেন জার্মান সমর্থক। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে তখন জার্মানির সহিত অল্পস্বল্প ব্যবসা চলিতে থাকে।

জার্মানির রাশিয়া আক্রমনের ফলে ইরানের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সরবরাহের অসুবিধায় পড়ে। সরবরাহ প্রেরণ করিবার তিনটি রাস্তা, ইরান, মুরমানস্ক ও ভ্লাদিভস্তকের মধ্যে ইরানই একমাত্র সমস্ত মৌসুমের উপযোগী রাস্তা। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নিরপেক্ষ ঘোষণাকারী ইরানকে ইহার ভূখণ্ড দিয়া যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। রেজা শাহ্র প্রত্যাখ্যানের ফলে এই অনুরোধ আদেশে পরিণত হয়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ রেজা শাহ ও তাঁহার সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ জার্মান বিজয় আশা করেন এবং তাই অন্য কোনো অনুরোধে রাজি হইতে চান নাই। আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হইলে গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে ইরান আক্রমণ করে এবং সেনাবাহিনী তাসের ঘরের ন্যায় উড়িয়া যায়। রুশ ও বৃটিশগণ ইরান অধিকার করে এবং প্রবল চাপে পড়িয়া রেজা শাহ তাঁহার ২০ বসর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদ রেজা পাহলভীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করেন। প্রাক্তন

ইরান
এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ প্রভাবাধীন এলাকাসমূহ
কাসপিয়ান সাগর
সোভিয়েত
রাশিয়া
তাব্রিজ
রাস্ত
আলবুর্জ পর্বতমালা
জাতরাক
মাশহাদ
তেহরান
দামাবল পর্বত
কেরমান শাহ
রুশ প্রভাবাধীন
ইসপাহান
ইয়াজদ্
বীরজান্দ
আফগানিস্তান
টাইগ্রীস
ইউফ্রেটিস
শাত-আল-আরব
আবাদন
সিরাজ
কেরমান
পারস্য উপসাগর
সৌদী
আরব
বন্দর আব্বাস
পাকিস্তান
০ ২০০
মাইল

শাহ্‌কে মৌরীতাস দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরে জোহান্সবার্গে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রেজা শাহ্‌র প্রস্থান দেশে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। শাহ্ দেশত্যাগ করিবার পূর্বেই তাঁহার মজলিশের বাছিয়া লওয়া গুণগানকারী সদস্যবৃন্দ তাঁহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ তাহাদের পুরাতন জীবন ধারায় ফিরিয়া যায়, যেন মাঝখানে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে নাই। একইভাবে, এখানে একজন আজান দিতেছে, ওখানে একজন মহিলা মুখে পর্দা দিতেছে, ধর্মীয় লোকজন তাঁহাদের মাথায় পাগড়ী দিতেছেন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে রাস্তায় চলিতেছেন।

মিত্রশক্তিও এমনভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছুই ঘটে নাই। সোভিয়েত সৈন্যগণ উত্তরের প্রদেশসমূহ অধিকার করে এবং বৃটিশগণ দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে। উভয় দেশই তেহরানে দ্রুত তাহাদের সৈন্য প্রেরণ করে। পরে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিলে ইহার সৈন্যগণ বৃটিশদের সহিত দক্ষিণাঞ্চলে ভাগ বসায় এবং তেহরানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইরানই একমাত্র দেশ যেখানে মিত্রশক্তির তিনটি প্রধান দেশের সৈন্য এক সঙ্গে অবস্থান করে।

১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রশক্তির আগমন এবং একনায়কদের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে স্বাধীনতার যুগ ও একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়, কিন্তু মিত্রশক্তি তখন ইরানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চাইতে যুদ্ধ জয়লাভে অধিক আগ্রহী। ইহারা গরম মস্তিষ্ক ও অনিশ্চিত যুবক জাতীয়তাবাদীর চাইতে পরিচিত ও পরীক্ষিত পুরাতন লোকদের সহিত কাজ কারবার করিতে অধিক উৎসাহী। অতএব পুরাতন লোকজন থাকিয়া যায় এবং পুরাতন নিয়মে কাজকারবার শুরু করে। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে কাভাম আল-সুলতানেহ্ ২০ বৎসর পর পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে তিনি একটি তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। ২০ বৎসর পুর্বে তিনি যাহা করিয়াছিলেন এখন ঠিক তাহাই করেন। অর্থাৎ একজন মার্কিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আনয়নের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যে মর্যাদায় ছিলেন, ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে ডঃ আর্থার মিল্‌স্‌পাফ একই মার্যাদায় ইরানে আগমন করেন। দুর্ভাগ্যবশত ডঃ মিল্‌স্‌পাফ্‌ও রেজা শাহ্‌র ইরান শাসন ভুলিয়া যান এবং ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যেখানে ফেলিয়া যান সেখান হইতে কাজ আরম্ভ করেন। ফলে, তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অবশ্য যুব সমাজকেও অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে রাজনৈতিক দলগুলির উত্তম ফসলের বৎসর; প্রত্যেক দল একাধিক পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি লাভ করে, যাহাতে আজ একটি পত্রিকা নিষিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আগামীকাল আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। অধিকাংশ দলের কোনো জাতীয় কর্মসূচি নাই; হয়ত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে চায় অথবা শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধার করিতে চায়। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম তুদেহ্ (জনগণ) দল, যাহা একটি অতি উত্তম সংগঠন এবং জনসমর্থনের অধিকারী। ইহা মার্কস্‌পন্থী কিন্তু এমন সব জাতীয়তাবাদীও ইহাতে বিদ্যমান যাহাদের সমস্ত কথাবার্তা মস্কোর মনঃপূত নহে। এই দল কখনও ইহাকে কমিউনিস্ট বলিয়া ঘোষণা করে নাই কিম্বা জাতীয়করণের কথা বলে নাই। উত্তরাঞ্চলে এইদল অধিক শক্তিশালী। ইহা ছয়টি পত্রিকা সম্পাদনা করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভা অনুষ্ঠান ও ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে নির্বাচনে

মজলিশের একমাত্র ব্যতিক্রম হইল, আটজন তুদেহ্ দলের সদস্য ইহাতে স্থান লাভ করে। অবশিষ্টগুলি পুরাতনপন্থী।

উত্তরাঞ্চলে তুদেহ্ দলের মাধ্যমে সরাসরি সোভিয়েত রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য বৃটিশগণ ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানকালীন প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ জিয়াকে পুনরায় আনয়ন করে। ইনি তখন ফিলিস্তিনে বাস করিতেছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট বিরোধী ন্যাশনাল উইল দল (National Will Party) গঠন করেন। এই দল বিচার, খাসজমির পুনর্বন্টন এবং ইসলামকে রক্ষা ও সরকারি বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার দাবি তুলিয়া ধরে।

এই সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সৈন্যদের রাশিয়ায় যুদ্ধ সরবরাহ প্রেরণ এবং তাহাদের প্রচুর খরচপত্রের দ্বারা দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যবসায়িগণ এবং মিত্রশক্তির সরবরাহ যোগানকারী কন্ট্রাক্টরগণ সম্পদশালী হইয়া উঠে; জমির দাম ও ঘর ভাড়া বাড়িয়া যায়, এবং সাধারণভাবে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ বাড়িয়া যায়। স্বল্প শস্য উৎপাদনের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। পারস্যবাসিগণকে এমন কি তেহরানে রুটি কিনিবার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াইতে হয়।

পারস্যের বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার জন্য ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি বৃটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের সহিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে। ইহা দাবি করে যে ইরানে মিত্র বাহিনীর অবস্থানের অর্থ এই দেশ অধিকার নহে, এবং যুদ্ধ সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে। পরে, এই চুক্তির জোরে ইরানে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তেহরান কনফারেন্সের সমাপ্তিতে প্রেসিডেন্ট পরামর্শ দেন যে, তিনি চার্চিল ও স্ট্যালিন কর্তৃক ইরানের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুদ্ধের ব্যাপারে ইরানের অবদানের স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং অতলান্তিক সনদের আদর্শ স্মরণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। পারস্যবাসিগণ তাহাদের ক্ষতির বিনিময়ে পুরাতন ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইবার ভয়ে একটি তৃতীয় শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির উপর তাহাদের আশা স্থাপন করে। যুদ্ধোত্তর যুগে এই নূতন সম্পর্ক অনেক সুখী ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়।

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়
ইরান -শ্বেত বিপ্লব

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত পারস্য বিপ্লবের সময় হইতে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার রাশিয়া পারস্যের প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষাবলম্বন করে, আর গ্রেট বৃটেন পরিবর্তনকারী বিপ্লবীদের পক্ষে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় দেশ ইরান দখল করিলে দেখা যায় তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী বিপ্লবীদের পক্ষে, আর গ্রেট বৃটেন প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে। প্রাথমিক বৎসরগুলিতে বৃটিশগণ বিপ্লবীদিগকে সমর্থন করিয়াছিল তাহাদের নিজেদের স্বার্থে, গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার স্বার্থে নহে। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে দস্তখত করিয়া বা শুস্তারকে বরখাস্ত করিবার জন্য রুশীয় চরমপত্র মানিয়া লইতে পরস্য মজলিশকে পরমার্শ দিয়া বৃটিশরা পারস্য বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দ্বিধা করে নাই। অনুরূপভাবে ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে রুশরা পারস্যের কমিউনিস্ট ও আমূল সংস্কারকামীদের পক্ষে ছিল নিজেদের স্বার্থে, জনগণ বা বিপ্লবের স্বার্থে নহে। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তাহারাও তাহাদের কমরেডদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাহাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করে।

পারস্যের তৈল ঃ চতুর্থ পর্ব

স্মরণ করা যাইতে পারে, যুদ্ধের সময় ইরানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একটি হইল তুদেহ্, যাহা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সমর্থিত। এইদল প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কিছুসংখ্যক যুবকের দ্বারা যাহাদিগকে রেজা শাহ্ ইউরোপে প্রেরণ করেন এবং ফিরিয়া আসিবার পর "কমিউনিস্ট" হইবার অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেফতার করেন। আরেক দল হইল ন্যাশনাল উইল, ইহা সৈয়দ জিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বৃটিশ কর্তৃক সমর্থিত। কিছুকালের জন্য এই দুইদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই দলীয় ব্যবস্থার আশা দেখা দেয়। এই দুইদল যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লাভ করিত তবে ফলাফল কি হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইরানে তৈল বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের তৈল বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে এবং গোপন করিবার কিছু নাই যে, জার রাশিয়ার ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নও উত্তরাঞ্চলে অনুরূপ সুবিধা চায়।

যুদ্ধের শেষের দিকে এমন সব লক্ষণ দেখা যায় যে, মার্কিন তৈল কোম্পানিগুলি উত্তরাঞ্চলে তৈলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পুনরারম্ভ করিতে চায়। ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানি ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ন্যায় ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন "অনুপ্রবেশ অপছন্দ" করে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকাতে তাহাদের পক্ষে যেকোন অভ্যাগতকে তৈল ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিতে সুবিধা হয়। পারস্য মজলিশে এই প্রশ্ন লইয়া সুদীর্ঘ ও গরম বিতর্ক চলে। এইজন্য স্বতন্ত্র সদস্য ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক মজলিশ দ্বারা এক আইন পাস করাইতে সক্ষম হন যদ্দারা মজলিশের সম্মতি ছাড়া কোনো তৈল কোম্পানির সহিত অনুমতিপত্রের ব্যাপারে আলোচনা করিতে পারস্য সরকারকে

নিষেধ করা হয়। তবে তুদেহ্ দল "সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার" ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তরাঞ্চলের তৈলের অনুমতিপত্র দানের পক্ষপাতী। তাহাদের যুক্তি হইল দক্ষিণাঞ্চলের তৈলের ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের যেহেতু অনুমতিপত্র রহিয়াছে, অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নকেও উত্তরাঞ্চলে তৈলের অনুমতি দেওয়া উচিত।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করে। মহাযুদ্ধের শেষ দিবসে উত্তর পশ্চিমের আজারবাইজান প্রদেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং ইহার স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়। শীঘ্রই প্রমাণিত হয় যে, ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চাইতে অধিক প্রভাব প্রদর্শন করিয়া উত্তরের তৈলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তরে ইহার প্রাধান্য ব্যবহার করে। ডিসেম্বর নাগাদ তুদেহ্ দল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মেধাবী নীতিবাগিস খলিল মালেকীর নেতৃত্বে দলের জাতীয়তাবাদিগণ মস্কোর নিকট তুদেহ্র নতি স্বীকারের বিরোধিতা করে এবং তাহাদের নিজস্ব সমাজতন্ত্রী দল গঠন করে, যাহাকে কখনও কখনও তৃতীয় শক্তি বলা হয়।

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তুদেহ্র আজারবাইজানী সদস্যবৃন্দ 'ডেমোক্র্যাট' নামে তাহাদের নিজস্ব দল গঠন করে; তাব্রিজের গভর্নরকে বরখাস্ত করে এবং স্বায়ত্তশাসিত আজারবাইজান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তাহারা লাল বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। পারস্য সেনাবাহিনীর একটি দলকে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আজারবাইজান প্রেরণ করা হইলে লাল বাহিনী তাহাদিগকে প্রদেশে প্রবেশ করিতে বাধাদান করে। আজারবাইজান ডেমোক্র্যাটের নেতা হইলেন কুখ্যাত জাফর পিশভেরী, যিনি ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে জিলান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহন করেন এবং কমিউনিস্ট ভাবধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পত্তি সংস্কার আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইরানের কুর্দগণ মহাবাদে তাহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্র গঠন করে।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন, ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্যদের ইরান ত্যাগ করিবার কথা। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ২রা মার্চ নাগাদ মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যগণ দেশত্যাগ করে কিন্তু লাল বাহিনী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে। ইরান জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানায়। শেষ পর্যন্ত রাশিয়া কর্তৃক ইরান ত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনে বিশ্বজনমতের চাপ এবং গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবি বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একটি তৈলের অনুমতিপত্র লাভের নিশ্চয়তার পরেই শুধু ইহারা ইরান ত্যাগ করে।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে পারস্যের প্রধানমন্ত্রী আহমদ কাভাম স্ট্যালিনের সহিত আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধি দল লইয়া মস্কো গমন করেন। উত্তর ইরানে তৈল আহরণের জন্য একটি ইরানো-সোভিয়েত তৈল কোম্পানি গঠনের ব্যাপারে কাভাম রাজি হন। কোম্পানিতে ইরানের অংশ থাকে ৫১ শতাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪৯ শতাংশ। অনুমতি পত্রের মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২৫ বৎসরের জন্য। কাভাম স্ট্যালিনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, নূতন নির্বাচনে গঠিত মজলিশের মাধ্যমে তিনি এই চুক্তি অনুমোদন করাইতে চেষ্টা করিবেন, তবে শর্ত হইল রুশদিগকে ইরান ত্যাগ করিতে হইবে। স্ট্যালিন রাজি হন এবং কাভাম তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অগ্রসর হন। জাতিসংঘে

নিযুক্ত পারস্য প্রতিনিধি হোসাইন আলাকে তিনি ইরানের নালিশ প্রত্যাহার করিতে বলেন, তবে আলা ইহা পালন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং নালিশটি কার্যসূচির মধ্যে থাকিয়া যায়।

১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই মে লাল বাহিনী ইরান ত্যাগ করে। পারস্য সেনাবাহিনী আজারবাইজান ও কুর্দিস্তান পুনর্দখল করে এবং ঐ দুই প্রদেশের কমিউনিস্ট বিদ্রোহীদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। জাফর পিশভেরিসহ কতিপয় নেতা রাশিয়ায় পলায়ন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু বিঘোষিত নীতি—বিশ্বের সর্বত্র 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের' সাহায্য করা সর্বত্র পালিত হয়। কিন্তু তৈলের অনুমতিপত্রের বিনিময়ে এখানে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

জাতিসংঘ হইতে পারস্যের প্রতিবাদ প্রত্যাহারের ব্যাপারে আলাকে সম্মত করাইতে না পারিলেও প্রধানমন্ত্রী কাভাম স্বীয় দেশে অনেক শক্তিশালী ছিলেন। কমিউনিস্ট বিরোধী সৈয়দ জিয়াকে তিনি গ্রেফতার করেন এবং ন্যাশনাল উইল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ইরান-এ ডেমোক্রেটিক নামে তাঁহার নিজস্ব দল গঠন করিতে সচেষ্ট হন। ইহা তুদেহ্সহ সমস্ত দলের আঁতাত। এই দলের সংগঠন খুবই ব্যাপক এবং ইহার নিজস্ব উর্দিপরা 'জাতীয় মুক্তি প্রহরীর' (Guard of National Salvation) সংখ্যায় বৃহৎ। শুভেচ্ছা প্রদর্শন করিবার জন্য কাভাম তাঁহার মন্ত্রিসভায় তিনজন তুদেহ্ নেতাকে রাখেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ মজলিশের নির্বাচনে কাভাম ক্ষমতাসীন হন এবং তাঁহার দল সংখ্যাধিক্য আসনের অধিকারী হয়। তিনি ইরানো-সোভিয়েত তৈলের অনুমতিপত্রের বিষয়টি মজলিশে উত্থাপন করেন, কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নাকচ হইয়া যায়। মাত্র দুইজন সদস্য ইহার পক্ষে ভোট দান করেন। কাভাম পদত্যাগ করেন। তাঁহার দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং তুদেহ্ দলও দুর্নামের ভাগী হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাভামের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করিতে যাইয়া পারস্যে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি রুশদিগকে ঠকাইয়া ইরানের জন্য আজারবাইজান প্রদেশ রক্ষা করিবার ব্যাপারে বেশ সুচতুরভাবে কাজ করিয়াছেন। আবার অনেকে মনে করেন যে আজারবাইজান রক্ষা করিবার জন্য ইরানো-সোভিয়েত তৈল কোম্পানি প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি ক্ষতিকর কিছু দেখেন নাই। কারণ ইরানো-সোভিয়েত মৎস্য কোম্পানি বেশ কিছুকাল হইতে কার্যকর রহিয়াছে। ইরান ত্যাগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তাহাতে বাড়াইয়া বলিবার কিছুই নাই। স্ট্যালিনের নিকট বিশেষ পত্র এবং জাতিসংঘে প্রতিবাদের মাধ্যমে সে এই কাজ সম্পাদন করে। কাভামের ইরানো-সোভিয়েত তৈল প্রস্তাবের উপর মজলিশে ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইরানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এ্যালেন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, ইরান যেভাবে ইচ্ছা তাহার নিজস্ব সম্পদ বিলাইতে পারে, তৎসঙ্গে তিনি দেশ প্রেমিক পারস্যবাসীদিগকে এই প্রতিশ্রুতিও দান করেন যে, "তাহাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার ব্যাপারে মার্কিন জনগণ তাহাদের পূর্ণ সমর্থন দান করিবে।" শাহ একজন শাসনতান্ত্রিক নৃপতির ভূমিকা পালন করেন। আজারবাইজানের বিদ্রোহীদের দমন করিবার ব্যাপারে আপোস মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিতে যাইয়া তিনি সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সহিত আজারবাইজানেও গমন করেন এবং জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন।

যুদ্ধের পরিণাম (অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজনা)

উত্তরের প্রদেশসমূহ হইতে লালবাহিনীর অপসারণ এবং আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা ইরান খণ্ড-বিখণ্ড হইবার হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত করে নাই। একনায়ক রেজা শাহের নির্গমনের দ্বারা দেশ মুক্ত হয় নাই, বরং ইহা হারানো মর্যাদা ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং তাহাদের পৈতৃক শাসন পুনরারম্ভ করিবার জন্য সংখ্যালঘু শাসনের হাত মুক্ত করে। সংখ্যালঘু শাসক বলিতে তাহাদিগকে বুঝায়, যাহারা কখনও কখনও "এক সহস্র পরিবার" হিসাবে উল্লেখিত, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা শক্তিশালী এবং পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারদের দ্বারা সমর্থিত। এই সমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা শাসনতন্ত্র ও তাহাদের মনগড়া গণতন্ত্রের প্রতি মৌলিক সমর্থন দান করে এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই দেশ শাসন করে।

যেহেতু সংখ্যালঘু শাসন (Oligarchy) সদস্য ও তাহাদের সমর্থন দ্বারা মজলিশ পরিপূর্ণ এবং তাহাদের নিকট হইতে যেহেতু পূর্বাবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায় না, সেইহেতু পার্লামেন্ট ভবনের বাহিরে বিভিন্ন দল পরিবর্তনের জন্য হৈ-চৈ করে। বিদেশী সৈন্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। দেউলিয়াপনা একটি নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রথমবারের মত ইরানে এক বিরাট শিক্ষিত বেকার বাহিনী দৃষ্ট হয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটগণ এবং এমন কি যেসকল ছাত্র ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করে তাহারাই উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমূল সংস্কারকামীদের ডান ও বাম উভয় দলগুলি, যাহারা সীমাহীন বিক্ষোভ ও দাঙ্গা পরিচালনা করে তাহারা প্রায়ই বেকার শিক্ষিত লোকজন।

কিছু কিছু আমূল সংস্কারকামীদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। রেজা শাহের পদত্যাগের পর প্রাক্তন শাহ্ কর্তৃক বিলুপ্ত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সরকার ও ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলারা মুখে পর্দা দিবার অনুমতি পায়, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা পুনরায় চালু হয়; বেতারে কোরআন তেলাওয়াত হয়, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় অনুষদে পুরাতন ও বিলুপ্ত ধর্মীয় সিপাহসালার মসজিদ বিভাগ পুনরায় চালু করা হয় এবং হাজার হাজার লোককে মক্কায় হজ পালন করিতে যাইবার জন্য পাসপোর্ট দেওয়া হয়।

অবশ্য চরম ধর্মীয় কার্যাবলী তখন রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। এইগুলির একটি হইল ফেদাইয়ানে-ইসলাম, "ইসলামের ভক্তদল"। ইহার নেতা একজন অপরিচিত ধর্মীয় নেতা, যিনি মিসরের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের (Muslim Brotherhood) সংগঠনের পন্থা অবলম্বন করেন। বস্তুত তাহাদের সহিত যে এই নেতার সংযোগ রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন প্রমাণ বিদ্যমান। আরেকটি দল হইল আয়াতুল্লাহ্ আবুল-কাশেমের নেতৃত্বে মোজাহেদীন-এ ইসলাম, "ইসলামের যোদ্ধাদল"। ইনি একজন প্রভাবশালী আলেম, যিনি পরে মজলিশের সদস্য ও ইহার স্পীকার নিযুক্ত হন। এই দুইদল পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও একত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ডানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দল হইল ফ্যাসিস্ট প্যান-ইরানি দল (Fascist Pan -Iranist Party)- যাহারা জার্মান ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ধরনের চরম বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করে।

বামপন্থীদের মধ্যে তৈল ও আজারবাইজানের প্রচণ্ড আঘাত লাভ করিবার পরেও সুসংগঠিত তুদেহ্ পার্টি তখনও শক্তিশালী এবং সক্রিয় ছিল। ইহা ছাড়া আরও দুইটি দল বিদ্যমান। একটি হইল বুদ্ধিজীবী সদস্য ডঃ বাকাইর শ্রমিক দল (Toilers Party); একটি পূর্বোল্লিখিত খলিল মালেকির তৃতীয় শক্তি (Third Force)। এই সমস্ত দলও স্ট্যালিন বিরোধী কিন্তু ইহাদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মার্ক্সবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী বিদ্যমান। মধ্যখানে থাকে একদল যুবক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আইনবিদ, ডাক্তার ও শিক্ষক দ্বারা গঠিত ইরান দল (Iran Party)। ইহার সাধারণ নেতা একজন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও মজলিশের সদস্য আল্লাহ ইয়ার সালেহ।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকে যুবক শাহের অবস্থা আশাব্যঞ্জক মনে হয়। তিনি তখন পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও অরাজনৈতিক কিন্তু গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার কম বয়স এবং ইরানে বিরোধী সৈন্যের অবস্থানের ফলে দেশ তাঁহার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং তৎসহ সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সাহসিক ভূমিকার দ্বারা তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। সম্ভবত এই সকল অভিজ্ঞতা তাঁহাকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং আজারবাইজান ঘটনার পরে তাঁহাকে আরও কর্মঠ করিয়া তোলে। তিনিও অতঃপর দেশের কার্যকলাপে আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করিতে থাকেন। শাহের প্রথম কার্যাবলীর মধ্যে একটি হইল প্রথম বারের মত শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটি সিনেটের সংবিধান করা। ইহার দ্বারা শাহকে ৩০ জন সিনেটের সদস্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহার নিযুক্ত লোকদের অধিকাংশই পুরাতন সামরিক অফিসার ও গোঁড়া বুদ্ধিজীবী হইলেও শাহ দেশের কার্যাবলীতে বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

মার্কিনগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে চায় কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেই বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বৃত্ত যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ইরানকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ দেয়। একটি সাতসালা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করিবার জন্য পারস্য সরকার মার্কিন সংস্থা ও বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে। ফলে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৬৫ কোটি ডলার খরচের বন্দোবস্ত করা হয় এবং সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ইঙ্গ-ইরানি তৈল কোম্পানির সেলামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য হইতে এই পরিকল্পনার অর্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হয়। সরকার বৃটিশ তৈল কোম্পানির (British Oil Company) সহিত চুক্তির ধারাসমূহ পুনর্বিবেচনার জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। আশা করা হয় যে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তৈলে সেলামি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারা স্বচ্ছন্দে উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা যাইবে।

শাহ অনুসৃত কার্যকর কর্মপন্থার প্রমাণ সম্ভবত এই যে, তাঁহার জীবনের উপর পরিচালিত বিভিন্ন হামলার প্রথমটি পরিচালিত হয় ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। শাহের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি অতি সন্নিকট হইতে তাঁহার প্রতি পাঁচটি গুলি ছোঁড়ে। সৌভাগ্যবশত গুলি তাঁহার শরীরের উপর দিয়া আঁচড় কাটিয়া যায় মাত্র এবং তিনি হাসপাতাল হইতে বেতার মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে সক্ষম হন। সেই দুর্বৃত্তকে হত্যা করা হয় এবং তাহার ঘরে তল্লাসী চালাইয়া যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় তাহার সহিত তুদেহ্

ও মুসলিম দলগুলির সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে, তুদেহ্ দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইহার অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য ইহাতে গোলযোগ দূরীভূত হয় নাই। আজারবাইজান ও তৈল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন শাহ ও ইরানে অবস্থানকারী মার্কিনীদের বিরুদ্ধে বেতার প্রচার আরম্ভ করে।

সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, অথচ, এ. আই.ও. সি-র (Anglo-Iranian Oil Company) কর্মকর্তাদের সহিত আলাপ-আলোচনাও ফলদায়ক হয় নাই। এমতাবস্থায় শাহ স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য একটি ব্যক্তিগত আবেদন জানাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তিনি আগমন করেন এবং সমগ্র দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইরানের উন্নয়ন প্রকল্পে তেমন গভীরভাবে নিজেকে জড়াইবার জন্য আগ্রহী নহে। সম্ভবত চীনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার দ্বারা ইহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মার্কিন নেতাদের স্বল্প জ্ঞানের ফলে তাঁহারা ভীত হন, পাছে ইরান আরেকটি চীন ও শাহ আরেকজন চীয়াং কাইশেক বলিয়া প্রতীয়মান হন।

যাহাই হউক, বিফল মনোরথ শাহ শূন্য হাতে ফিরিয়া যান। কিন্তু তিনি সংস্কারের মনোভাব ত্যাগ করেন নাই। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে শাহ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারে জড়াইয়া ফেলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশাল জমিদারীকে সামাজিক জনকল্যাণের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে (Imperial Organization for Social Welfare) রূপান্তরের পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক এই সকল জমি সুবিধাজনক শর্তে তিনি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের বন্দোবস্ত করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজমারা নামক একজন জ্ঞানী সামরিক জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রাজমারা যুবক শ্রেণীর লোকদিগকে মন্ত্রিসভায় নিযুক্ত করেন এবং যে সকল কর্মকর্তা হয়ত অকেজো বা দুর্নীতিবাজ তাহাদিগকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। শাহ এই সকল উন্নতিতে সহায়তা করেন, কারণ তিনিও এইগুলি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তাহা ছাড়া তিনি মার্কিনদিগকে তাঁহার কার্যকলাপ দেখাইতে চান।

এই সকল কার্যকলাপ দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমদানি রফতানিব্যাংক (Export Import Bank) হইতে আড়াই কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করে। প্রাক্তন মিত্রশক্তির দেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল উদার সাহায্য প্রদান করে উহার তুলনায় এই স্বল্প অংকে পারস্যবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যায় এবং প্রথমবারের মত দেশে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার সুযোগ গ্রহণ করে এবং দুই কোটি ডলারের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে।

তৈল জাতীয়করণ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তৈলের সালামি ব্যবহার করিবার আশা করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ইরান তৈল কোম্পানি পারস্যের দাবি পূরণ করে নাই। মজলিশের তৈল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক সততা ও জাতীয়তাবাদের জন্য সুনামের অধিকারী।[১] বৃটিশদের মধ্যে চেতনার অভাব এবং মার্কিনীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখিয়া ডঃ মোসাদ্দেক বলেন যে, নিজেদের তৈলের মধ্যে আশানুরূপ অর্থ রাখিয়া বাদশাহকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমেরিকায় পাঠানো ইরানের

১. উপরে দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৭৪।

জন্য অপমানজনক। তিনি তৈল জাতীয়করণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিশের আটজন সদস্য, যাহাদের অনেকেই ইরান পার্টির সদস্য, ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি কোয়ালিশন গঠন করেন এবং জাতীয়করণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা 'নেতিবাচক নিরপেক্ষতার' (Negative Neutralism) আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন– রুশদিগকে যখন উত্তরাঞ্চলের তৈল দেওয়া হয় নাই, বৃটিশদের নিকট হইতেও দক্ষিণাঞ্চলের তৈল ছিনাইয়া লওয়া উচিত।

১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি নাগাদ খবর পাওয়া গেল যে, আরামকো (Aramco) সৌদি আরবের সহিত ইহার তৈল চুক্তি পরিবর্তন করিয়া আধাআধি মুনাফায় সম্মত হইয়াছে। এই খবর জাতীয়করণের পরিকল্পনাকে জোরদার করে। বৃটিশ কোম্পানি অতঃপর প্রধানমন্ত্রী রাজমারাকে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা বলিতে আসে, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। জেনারেল রাজমারা ইতোমধ্যে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ ইসলামের ভক্তদলের একজন সদস্য দ্বারা তিনি সিপাহসালার মসজিদে নিহত হন। ১৫ই মার্চ মজলিশ জাতীয়করণের নীতি অনুমোদন করে। ৩০শে এপ্রিল মজলিশ একটি নয় দফা আইন পাস করে এবং উহাতে কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দানের আইনও অন্তর্ভুক্ত হয়। বৃটিশ সরকার জাতীয়করণের প্রতিবাদ করে এবং বার বার উল্লেখ করে যে, এই ব্যাপারে ইরানের মধ্যস্থতা মানা উচিত। ইতোমধ্যে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রধানমন্ত্রী হোসাইন আলা উত্তরে বলেন, ইরান ও একটি তৈল কোম্পানির মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোনো অধিকার বৃটিশ সরকারের নাই। ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ করিয়া দেয় এবং ২৭শে এপ্রিল আলা পদত্যাগ করেন। ২৮শে এপ্রিল মোসাদ্দেক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং একই দিন ইরানে অবস্থিত কোম্পানির সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করিবার ব্যাপারে মজলিশ সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করে।

ঘটনাবলী অতি দ্রুত সংগঠিত হয় এবং সমস্যার সহিত জড়িত প্রায় সকলকে হতচকিত করিয়া তোলে। বৃটিশ আশ্চার্যান্বিত হয় যে হুমকি প্রদর্শনে, পারস্যের সম্পত্তি বন্ধ করায়, এমন কি পারস্য উপসাগরে যুদ্ধ জাহাজ প্রেরণেও ইরান ভীত হয় নাই। পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকগণ আরও আশ্চার্যান্বিত হয় যে, আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ হইয়া তাহার রাজস্ব আগমন বন্ধ হইলেও ইরান কাবু হয় নাই। পারস্যবাসিগণ আহ্লাদে আশ্চার্যান্বিত হয় যে, তাহারা বৃটিশ সিংহের লেজ পাকাইয়া টানিয়া লইতে সক্ষম। ইহাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্মিত হন ডঃ মোসাদ্দেক, এবং তাহা তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া। তবে মোসাদ্দেকের সবচাইতে বড় ভুল সম্ভবত এই যে, তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তা পরিমাপ করিতে সক্ষম ছিলেন।

দুই বৎসর স্থায়ী সংকটকালে অর্ধ ডজন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়, যেইগুলির অধিকাংশই জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব, কিন্তু সমস্যার সমাধান আনিতে ব্যর্থ হয়। বৃটিশ জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন করে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইরানের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য ডঃ মোসাদ্দেক নিউইয়র্ক গমন করেন। তাঁহার বক্তব্য হইল জাতীয়করণ একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আন্তর্জাতিক আওতায় পড়িবার মত বিষয় নহে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচনার আওতাভুক্ত কি-না তাহা যাচাই করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব কোর্টের স্মরণাপন্ন হয় কিন্তু কোর্ট ইরানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। কোর্টের রায় হইল সমস্যাটি অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই ইহা বিশ্ব কোর্ট অথবা জাতিসংঘের আওতার বাহিরে।

দুইজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ট্রুম্যান ও আইসেনহাওয়ার এবং বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। মোসাদ্দেক আবাদানের তৈল প্রকল্প বাজেয়াফত করেন এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু স্বদেশে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, জাতীয় ফ্রন্ট (National Front) হইল বিভিন্ন দল, স্বার্থান্বেষী মহল এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সংমিশ্রণ, যাহারা শুধু জাতীয়করণের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা চলিতে থাকিলে মতান্তরের সূচনা হয়। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে মজলিশ ইহার সপ্তদশ অধিবেশনে মিলিত হইলে মোসাদ্দেক ছয় মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা দাবি করেন। কিছুসংখ্যক সদস্য আপত্তি করিলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন। এই ধরনের হুমকির সাথে সাথে সাধারণত তুদেহ্ পার্টি এবং গোঁড়া মুসলিম দলগুলির সদস্যরা গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহাকে সমর্থন দিত।

সমস্যা যতই জটিল আকার ধারণ করে মোসাদ্দেকও তৎসঙ্গে আরও অধিক ক্ষমতা দাবি করেন। যতই তিনি ক্ষমতা দাবি করেন ততই তিনি বন্ধু হারাইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তুদেহ্ পার্টির সদস্যদের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শাহ্ তাঁহার প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এবং প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রিসভা ও মজলিশের মধ্যে মত বিনিময়ের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মোসাদ্দেক তখনও এত জনপ্রিয় যে তাঁহাকে বহিষ্কার করিতে শাহ্ পারস্যের সেনাবাহিনী এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে (C.I.A) সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট মোসাদ্দেককে বরখাস্ত এবং জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিয়া শাহ একটি আদেশ জারি করেন। মোসাদ্দেক আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন এবং আদেশ বহনকারী দূতকে গ্রেফতার করেন। 'রক্তপাত বন্ধ' করিবার জন্য ১৬ই আগস্ট শাহ ও সম্রাজ্ঞী সুরাইয়া দেশত্যাগ করেন। তিন দিনের জন্য তেহরান মোসাদ্দেকের অনুসারীদের হাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন। গোলযোগের দিন কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হইল মস্কোর ভূমিকা। তুদেহ্ পার্টির প্রথম প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় প্রোথিত শাহ ও তাঁহার পিতার সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গিতে থাকে। তুদেহ্ পার্টির সদস্যগণ সম্ভবত সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু মস্কোর কঠোর আদেশের ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকে। এইরূপ নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড লইতে হয়। কারণ অনতিবিলম্বে ক্ষমতায় আগত নূতন সরকার ইহাদিগকে বিভিন্ন মহল হইতে খুঁজিয়া বাহির করে এবং হত্যা করে। যাহারা নিষ্কৃতি পায় তাহারা দেশত্যাগ করে এবং কমিউনিস্ট দেশে অতি কষ্টে জীবন-যাপন করে।

১৯শে আগস্ট নাগাদ জেনারেল জাহেদী তেহরান প্রবেশ করেন এবং শাহের পক্ষে সমর্থন আদায় করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সৈন্যগণ মোসাদ্দেকের বাড়ি অবরোধ করিয়া অংশত ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাত্রি নাগাদ তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ সংবলিত শাহের আদেশ প্রকাশ করেন। ২২শে আগস্ট বিজয়ীবেশে শাহ্ তেহরান প্রবেশ করেন। মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁহার বিচার হয়। জাহেদীর প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারাও মোসাদ্দেকের অনুসারিগণ কাবু হয় নাই। জনসাধারণকে শান্ত করিতে আরও কয়েক বৎসরের প্রয়োজন হয়, যাহার ফলে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার মৃত্যুতে অল্প প্রতিক্রিয়া হয়।

মোসাদ্দেকের পুনর্মূলায়ন

ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের মধ্যে পারস্যবাসিগণ এমন এক লোকের সন্ধান পায় যাহাকে তাহারা অবচেতন মনে খোঁজ করে– একজন চরিত্রবান, উদ্যোগী এবং অনুসরণ করিবার মত জনপ্রিয় নেতা। ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে তামাক একচেটিয়া করণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দের শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য ধর্মঘট, ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে মর্গান শুস্তারের স্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জন্য বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তৈল জাতীয়করণ। বৃটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পারস্যের মূল বক্তব্য অনুধাবন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। বৃটিশগণ প্রথমে 'যুদ্ধজাহাজ' কূটনীতি দ্বারা পারস্য সরকারকে কাবু করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে এবং বিশ্বকোর্টে ব্যর্থ হইবার পর বৃটিশ পারস্যের তৈল উত্তোলন বন্ধ করিয়া দেয় এবং পারস্যের তৈল প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অন্যান্য ইউরোপিয়দিগকে পরামর্শ দেয় এবং মার্কিনীদিগকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করিতে বলে কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হয় নাই।

ইঙ্গ-ইরানি তৈল কোম্পানির প্রতি বৃটিশ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে তাকায়। পেশকৃত সমস্ত পরিকল্পনায় বৃটিশ শুধু কোম্পানির সম্পত্তির মূল্যই দাবি করে নাই, বরং ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি যে মুনাফা লাভ করিত তাহাও দাবি করে। পারস্য সরকার অবশ্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। বৃটিশ কোম্পানি সর্বদা মনে করে যে, তৈল উত্তোলন করিয়া সে ইরানের বিরাট উপকার করিয়াছে, কিন্তু পারস্যবাসীদের অকৃতজ্ঞতায় সে বিস্মিত হয়। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির এই বিরাট লাভ সামঞ্জস্যহীন। কোনো কোনো বৎসর এই লাভ ১৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। তাহাদের প্রকৃত মনোভাব এই যে বৃটিশদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত পারস্য সরকার তৈল হইতে কোনো আয়ই পাইত না।

অপরদিকে পারস্যবাসিগণ মুনাফার এক বিরাট অংশ দাবি করে। পারস্যের পরিদর্শকদিগকে হিসাবের খাতা দেখাইতে বার বার অস্বীকার করায় তাহারা অবাক হয়; বিদেশী কারিগরদের স্থলে পারস্যের কারিগর নিয়োগের ব্যাপারে বৃটিশদের অযথা বিলম্ব দেখিয়া তাহারা হতাশ হয় এবং কোম্পানি কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হয়। তৈলের সমস্ত সেলামি যেহেতু পারস্যের সেনাবাহিনীর জন্য খরচ হয় এবং জনগণের নিকট আসে নাই তাই মোসাদ্দেকের সমর্থক ছোট ছোট ব্যবসায়ী, বর্জুয়া গোষ্ঠী ও ছাত্রগণ কোম্পানি বন্ধ হইয়া গেলেও কোনো পরোয়া করে না।

গোলযোগের সময় পারস্যবাসীদের আশা ও গর্বের মূল প্রেরণা আসে ডঃ মোসাদ্দেক হইতে। কিন্তু আন্দোলনের আংশিক ব্যর্থতা এবং পারস্যবাসীদের অপমানের জন্যও তিনিই দায়ী। মোসাদ্দেক তৈল শিল্পের ব্যাপারে নিদারুণ উদাসীন থাকেন। তাহার জন্য প্রস্তুত নিখুঁত রিপোর্টগুলি হয়ত তিনি মোটেই পড়েন নাই অথবা পড়িলেও তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই– এইসব একজন নেতার দোষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। উদারহরণস্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন, ইউরোপে তাঁহার তৈলের চাহিদা এত ব্যাপক যে তাঁহার তৈল ক্রয়ের জন্য সেখানে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যাইবে। তাঁহার অবগত হওয়া উচিত ছিল যে গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র, বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদি আরবের বিশাল তৈল ক্ষেত্র হইতেও ইহা লইতে পারে। কার্যত তাহাই তাহারা করে। অধিকন্তু, তৈল পরিবহনের কোনো ট্যাংকার ইরানের নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় তৈল

কোম্পানিগুলি একে অপরের সহিত যোগসূত্র এবং তৈল রফতানি ও বাজারজাত করিবার ব্যাপারে তাহারা কিরূপ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে তাহা চার্টের সাহায্যে তাঁহাকে দেখানো হয়। বৃটিশ কোম্পানি জাতীয়করণের মোকাবিলা না করিলেও তৈল বাজারজাত করিবার ব্যাপারে ইরানকে অন্যান্য কোম্পানির উপর নির্ভর করিতে হইত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদ্দেক বৃটিশদের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত ঘৃণার নিকট একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে তাঁহার বিচার বিবেককে বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলি প্রকল্পের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পটিই সম্ভবত সর্বোত্তম। ইহা পারস্যের জাতীয়করণ আইনের সমস্ত ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু তবুও মোসাদ্দেক ইহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে ব্যাংক ইহার সরেজমিনে তদন্তের ব্যাপারে বৃটিশ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার উপর জোর দেয়।

সম্ভবত মোসাদ্দেকের সকলের চাইতে বড় অসুবিধা হইল তিনি বিপ্লবী নহেন। জাতীয়করণের উপর তিনি এতই অভিভূত হইয়া যান যেন ইহাই শেষ সংস্কারের জন্য একটি পদক্ষেপ নহে। তাঁহার কোয়ালিশন দল জাতীয় ফ্রন্টের সদস্যবর্গ পাছে অসন্তুষ্ট হন তাই তিনি অভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তিনি এমন কি শাহ্কে তাঁহার নিজস্ব জমি বন্টনে বাধা দান করেন, পাছে কোয়ালিশনের সদস্যবর্গ আঘাত পান। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসীদিগকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করিবার নেতা হিসাবে ডঃ মোসাদ্দেকের নাম পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে জেনারেল জাহেদী তৈলের ব্যাপারে একটি সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যান্ড ও ফ্রান্সের আটটি প্রধান তৈল কোম্পানির একটি সংস্থা জাতীয় ইরানি তৈল কোম্পানির তৈল আধা-আধি শেয়ারে উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাত করিবে। এই ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয় নাই, অবশ্য মোসাদ্দেকের প্রচেষ্টা না থাকিলে ইহাও হইত না।

শাহ্ এবং শ্বেত বিপ্লব

১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্টে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী তাঁহার আত্মনির্বাসন হইতে তেহরানে ফিরিবার সময় তাঁহার নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া আসেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত তিনি সাংবিধানিক নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করিয়া আসেন, কিন্তু ইহাতে তিনি বা দেশ কোনো উন্নতি লাভ করে নাই। ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ দেয়া হইলে তিনি নিজে শাসন করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া আসেন। তিনি বারংবার বলেন যে, দরিদ্র-প্রপীড়িত, রোগশোকে জর্জরিত লক্ষ লক্ষ লোকের উপর বাদশাহ হইবার পিছনে গৌরব নাই। তিনি তাঁহার জমির একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া জমিদারদের দ্বারা "বলশেভিক শাহ" উপাধিতে ভূষিত হন। সেই একই ভূস্বামিগণই ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে মজলিশ নিয়ন্ত্রণ করেন, প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরিয়া পান এবং মোসাদ্দেকের পরাজয়ে আশাহত যুবক শিক্ষিত জাতীয়তাবাদিগণ তাঁহাদের ভাবধারায় হতাশ মনোভাব গ্রহণ করেন।

কিছুসংখ্যক পুরাতন সামরিক অফিসারদের দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যুবক অফিসার তুদেহ্ পার্টিতে যোগ দেন। তবুও বেশির ভাগ সামরিক লোক তখনও রাজভক্ত। শাহ্ সাবধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সহিত ইরানের সম্পর্ক

উন্নত করিবার মাধ্যমে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের জুনে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের মৃতুর পর নূতন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন বন্ধু লাভ করিতে আগ্রহী। পরে ইরান বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করে। ইহা ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। বৃটিশদের সদস্যভূক্তির ফলে এই চুক্তি পারস্যবাসীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইরাক এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া সেন্টো (CENTO) হইলেও ইরান একজন শক্তিশালী সদস্য হিসাবে বিরাজ করে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শতাব্দী পরিবর্তনের পর হইতে একের পর এক পারস্য সরকারসমূহ বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিতে চেষ্টা করে। শাহ এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং "মার্কিন শিবিরে" যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদের মুখে ইরানে একটি মার্কিন সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে ইরান শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যই নহে বরং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজ-সরঞ্জামও লাভ করে। অবশ্য ইরান-মার্কিন চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের অন্যান্য অংশে সরকারি অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। ইরান ও তুরস্ক প্রমাণ করে যে, স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার সুদৃষ্টিতে থাকিবার জন্য নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নাই।

শাহ্ কৃষকদের মধ্যে তাঁহার জমি বন্টন অব্যাহত রাখেন। তাঁহার উৎসাহে মন্ত্রিসভা মার্কিন সাহায্য দ্বারা একের পর এক পাঁচসালা পরিকল্পনা উদ্ধোধন করে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার বাঁধ, সেচব্যবস্থা ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ করে। তৈল -শিল্প বিস্তার লাভ করে এবং এই খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়।

১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে নাগাদ শাহ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং জাতীয় ফ্রন্ট ও তুদেহ্ পার্টির কিছুসংখ্যক প্রাক্তন সদস্য ও অনুসারীর আস্থা অর্জন করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ রাজভক্ত হইয়া পড়ে এবং শাহ্ মনে করেন যে, তিনি এখন যে কোনো কাজে সক্ষম। তাঁহার অনুরোধে মজলিশে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যদ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা হয়। উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টনের জন্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে ভূস্বামীদের বাধ্য করা হয়। জমিদার সমর্থিত মজলিশ এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধনী যুক্ত করে যে, শেষ পর্যন্ত ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শাহের ভাষায়, "আমি বুঝিতে পারিলাম নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করিলে, উপদেশ দিলে .... বা প্রচলিত প্রাথমিক পন্থা অবলম্বন করিলেও কাজ হইবে না"। অতএব তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভাঙ্গিয়া দেন এবং নূতন নির্বাচন না দিয়া তিনি কার্যত সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রিসভা ভূমিসংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্যকরী করে। ৪০০ সেচ ব্যবস্থাযুক্ত এবং ৮০০ সেচ ব্যবস্থাহীন হেক্টরের অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত আয়করের বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আয়কর কম দিবার জন্য জমি অবমূল্যায়ন করেন নাই

এইরূপ জমিদারদের সংখ্যা অতি বিরল, তাই একটি "অন্যায়ের" ধূয়া উথাপন করা হয়, কিন্তু জমিদারদের করিবার মত কিছুই নাই। অবশ্য শাহও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এই বিষয়ের উপর তেমন গুরত্ব দেন নাই।

ইতিহাসে ইরানের শাহই সম্ভবত প্রথম রাজা যিনি একটি কৃষক আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে পল্লী সমবায়ের একটি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা বিপ্লবী কর্মসূচি পেশ করেন। পরে ইহার সহিত আরও তিন দফা যোগ করা হয়। একাটি জাতীয় গণভোটে শাহের এই "শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটাধিক্যে পারস্যবাসিগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নয়টি লক্ষ্য হইল ঃ ভূমিবন্টন, বনভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করিবার জন্য সরকারি মালিকানা কারখানাগুলির শেয়ার বিক্রয়, কারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, নির্বাচনের সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী গঠন, জনস্বাস্থ্য বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সাম্যগৃহ স্থাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় প্রধানত শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা, যাহারা দুই বৎসরের সামরিক জীবনের পরিবর্তে এই সকল উদ্ভাবনী কাজে তাহাদের সময় ব্যয় করে।

এইগুলি হইল সুদূরপ্রসারী সংস্কার। ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন ও মহিলাদের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হন। বিক্ষোভ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, কিন্তু শাহ্ অনমনীয়ভাব ধারণ করেন এবং অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, এমন কি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের নির্বাচনে একটি সম্পূর্ণ ভিন্নমতের মজলিশ গঠিত হয়। ইহার সদস্যবৃন্দ আধুনিকতা এবং শাহের শ্বেত বিপ্লবের কর্মসূচি বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। নূতন মজলিশে শাহ্ নবগঠিত নূতন ইরান দলের (New Iran Party) মাধ্যমে কাজ করেন। অন্যান্য দল ও ইহাদের সদস্যবৃন্দ মজলিশে থাকিলেও শুধু নিউ ইরানই শাহের মতামত কার্যকরী করে।

ইরানের সমস্যাবলীর সমাধান হয় নাই এবং এইগুলি সমাধান করিতে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ভুলত্রুটি থাকিতে পারে কিন্তু সূচনা সাধিত হইয়াছে। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে যুবক শাহ্ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হইবার পর অনেকে আশ্চার্যান্বিত হইয়াছে তিনি অভিষিক্ত হন নাই কেন। তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় যে, তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করিতে চান। অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাঁহার আট চল্লিশতম জন্ম বার্কিকীতে, ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। সেইদিন তিনি সম্রাজ্ঞী ফারাহকে অভিষিক্ত করেন- ইহা মুসলিম ইরানে সম্পূর্ণ নূতন একটি ঘটনা। পারস্যবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে, শাহ্ রাজমুকুট জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়
তুরস্ক–গণতন্ত্রের এক অগ্নিপরীক্ষা

জনগণের প্রতি কামাল আতাতুর্কের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র কীর্তি দুইভাগে ভাগ করা হয়। একটি হইল, বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় তুর্কিগণ নিজেদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়টি হইল, একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে তুর্কিগণ নিজেদের প্রতি কিরূপভাবে তাকায়। তুর্কিদের মধ্যে প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক এই উভয় প্রশ্নের গভীর ছাপ রাখিয়া যান। তাঁহার ভাবধারা ও নীতি অনুসরণ করিবার জন্য ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রিপাবলিকান পিপল্স পার্টি গঠন করেন। এই দল 'কামালবাদ' ও তাঁহার আদর্শ কার্যকরী করিবার মাধ্যম হইয়া উঠে।

আধুনিক তুরস্কের উপর আমাদের আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আতাতুর্ক তুরস্কের মুক্তি নিজদিগকে ইউরোপীয় বলিয়া ধারণা করিবার মধ্যে নিহিত দেখিতে পান। তাঁহার অসংখ্য সংস্কারের মাধ্যমে তিনি অনিচ্ছুক ও গোঁড়া তুর্কিদিগকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চালচলন ও ভাবধারা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করেন। কমিউনিস্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি করিলে আতাতুর্ক ও তাঁহার সহচরবৃন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠানাদি ও ভাবধারা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তুর্কিদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য হইলেও তাহাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ তুর্কিরা পছন্দ করিতে পারে না।

ট্রুম্যান নীতি (The Truman Doctrine)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক যুদ্ধের প্রায় শেষ নাগাদ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। অবশ্য যুদ্ধের পরে পরেই তুরস্ক লক্ষ্য করে যে সে ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রীক ব্যতীত সমগ্র বলকান রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে চলিয়া যায়। পারস্যের আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং কুর্দদের সম্ভাব্য স্বায়ত্তশাসন সফল হইলে তুরস্ক নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতাভুক্ত দেখিত। আধুনিক তুরস্কের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি জার রাশিয়ার চাইতে ভিন্ন হইবে না তাহা তুর্কিগণ বিশ্বাস না করিবার পিছনে কোনো যুক্তি নাই।

বস্তুত এই নীতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তুর্কিদিগকে বেশি দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও আর্দাহান দাবি করে। তৎসঙ্গে তাহারা প্রণালীতে ঘাঁটিও দাবি করে। তুরস্কের ইতিহাসে রাশিয়ার এই ধরনের দাবি নূতন নহে এবং তুর্কিগণও সর্বদা এই সকল দাবি প্রতিহত করিয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য মস্কোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সেলিম সোপের তাঁহার সরকারের সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উভয় দাবি যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁহার সরকারের গোচরীভূত করেন।

কিন্তু রুশগণ সেই চিরাচরিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রণালী তদারক করিবার জন্য ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মন্ট্রি (Motriux Convention) কনভেনশনের ২৯ নং ধারা মোতাবেক প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী প্রতি পাঁচ বৎসর শেষে এই চুক্তি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যেহেতু দ্বিতীয় পাঁচসালার বিরতি শেষ হয়, তাই ত্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি পরিবর্তনের মনঃস্থির করে। ফলে, মন্ট্রি চুক্তি পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র চারিটি প্রস্তাব পেশ করে। এইগুলি হইল প্রণালীর মধ্য দিয়া সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণসাগরীয় দেশসমূহের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সর্বদা চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণসাগরীয় দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোনো দেশের যুদ্ধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া, এবং চুক্তিটিকে সময়োপযোগী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা।

চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশ এই সকল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু তাহার দুইটি প্রস্তাবও বিবেচনার জন্য যোগ করে। প্রস্তাবগুলি হইল প্রণালী এলাকা কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রণালী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা। রাশিয়া পুনরায় প্রণালীতে স্থান করিবার জন্য তাহার চিরাচরিত খেলা আরম্ভ করে। কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রহিয়াছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, উকরাইন সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাশিয়া। ইহার অর্থ হইল একের বিরুদ্ধে চারি ভোট এবং ইহার গ্রহণ করা হইলে প্রণালীর কর্তৃত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। স্বভাবতই তুরস্ক ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাপারে তুরস্ককে সাহায্য করিবার মতো কোনো শক্তি বা উপায় গ্রেট বৃটেনের নাই। সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করিবার জন্য তুরস্ককে প্রায় ১০ লক্ষ লোক সশস্ত্র অবস্থায় রাখিতে হয়। তুরস্ককে অবরোধ করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীসের উপর চাপ দেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেস একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাহাকে ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) বলা হয়। রুশ চাপ প্রতিহত করিবার জন্য তুরস্ক ও গ্রীসকে শক্তিশালী করিতে ইহা ৪০ কোটি ডলার প্রদান করে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের নিকট ইহার অর্থ হইল "কমিউনিজমকে প্রতিরোধ" করা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ২৫০ কোটি ডলারে উন্নীত মার্কিন সাহায্য তুর্কি সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরস্ককে সাহায্য করিবার কাজে ব্যয় হয়।

ট্রুম্যান নীতি তুরস্ককে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং তদ্‌সঙ্গে একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে ইহাকে পাশ্চাত্য দেশভুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে উত্তর দিক হইতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন হইতে দক্ষিণ কোরীয় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিলে অগ্রগামী দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক প্রথম ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করে। এই সব সৈন্য জেনারেল ম্যাক আর্থারের অধীনে যুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কি সৈন্যদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং

তাহাদিগকে পাশ্চাত্য শিবিরের দিকে আর এক ধাপ আগাইয়া দেয়। বস্তুত ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্নিত হইবার তুর্কি আগ্রহ এত প্রবল যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু "এশিয়া কনফারেন্সে" প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তুর্কি সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা (NATO) গঠন করিলে তুরস্ক সদস্যভুক্তির আবেদন করে। ন্যাটো (NATO) দেশগুলির মধ্যে এমন সকল সদস্যও অবশ্য বিদ্যমান যাহারা তুরস্কের সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করে, কারণ ইহা আটলান্টিক দেশ নহে। কিন্তু ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীসের সহিত ইহাকেও সদস্যভুক্ত করা হয়। ইজমির ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্যসীমায় তুরস্কে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

তুরস্কের ন্যাটো ও ইউরোপীয় পরিষদের (Council of Europe) ন্যায় পশ্চিম ইউরোপীয় জোটসমূহে যোগদানের পরেই শুধু ইহা প্রাচ্যের দেশসমূহের সহিত বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সম্ভবত একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে প্রাচ্যের প্রতিবেশীদের সহিত সে পারস্পরিক আঞ্চলিক ও প্রতিরক্ষামূলক সমস্যাদি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে তুরস্ক পাকিস্তানের সহিত একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি প্রতিরক্ষার শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য ইরানের সহিত বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত অনেকগুলি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিসমূহের মধ্যে ইহা একটি। ইহার সদস্যবৃন্দ হইল ইরান, ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই চুক্তি হইতে ইরাকের পদত্যাগের পর ইহার নূতন নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা (Central Treaty Organization বা CENTO)। মধ্যপ্রাচ্যের "উত্তর গোলকে" তুরস্ক হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করা হয়।

একাধিক দলীয় গণতন্ত্র

জাতির জন্য প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি ঐতিহ্য হইল জাতির অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। ইহা কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রূপলাভ করে এবং তুরস্কের নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপল্স পার্টির প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। এই দফাগুলি হইল ঃ প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণবাদ, রাষ্ট্রবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংস্কারবাদ।[১] এইগুলি তুর্কি সরকার ও সমাজের নিম্ন কাঠামো। বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কোনোটিই বাদ দেওয়া হয় না।

আতাতুর্কের জীবদ্দশায় গণতন্ত্রের মতবাদ সংবলিত গণবাদের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা চালু করা হয় নাই। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করা হইলে কোনো সংস্কার সাধনই সম্ভব হইত না। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক সরকারের "রাজভক্ত বিরোধীদল" হিসাবে কাজ করিবার জন্য আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করেন, কিন্তু ইহা কার্যকরী হয় নাই রাজভক্ত বিরোধীদলের মতবাদটি নূতন, এবং ফলে বিতর্ক গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়। আতাতুর্ককে এই সিদ্ধান্ত বাদ দিয়া একদল দ্বারাই

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯২।*

শাসনকার্য চালাইতে হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিতে হয়।

যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জন্য তুরস্ককে মাসুল দিতে হয় ব্যাপক হারে। জনগণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও অব্যবস্থামূলক করভারে জর্জরিত হয়। আতাতুর্কের পার্টি হইলেও জনগণ ক্ষমতাসীন দলকে এইগুলির জন্য দায়ী করে। নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে ইসমত ইনুনুর হাতে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে ইনি আতাতুর্কের ন্যায় কঠোর নহেন। যুদ্ধ শেষে উদারতা দেখাইয়া প্রেসিডেন্ট ইনুনু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপ্‌লস পার্টির চারিজন নেতা, সেলাল বায়ার, আদনান মেন্দারেস, ফুয়াত কপরুলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করিয়া ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নূতন দল গঠন করে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিবার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক দল শুধু ৬০টি আসন লাভ করে। পরবর্তী চারি বৎসরে বিরোধী দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্য যথেষ্ট সময় লাভ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টি হইতে পদত্যাগ করিয়া কিছু লোক ন্যাশন পার্টি নামে একটি নূতন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। তুরস্কের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবাক হইয়া লক্ষ্য করেন যে, একটি একদলীয় একনায়কত্ববাদী দল ইহার নীতিমালা সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নির্বাচনে প্রায় পরাজয় বরণ করিবার মুখোমুখী হইয়া পড়ে। এই ধরণের ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে রিপাবলিকান পার্টি বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুন তুরস্কের ব্যবসায়িগণ অসন্তুষ্ট হয়; উচ্চমূল্যের দরুন শহরে লোকজন অসুখী হয়; ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বাজেয়াফ্‌ত করের দরুন অমুসলমানগণ নিষ্পেষিত হয় বলিয়া মনে করে, এবং চাষীগণ তাহাদের উৎপাদনের বিনিময়ে শিল্পোন্নয়নের দ্বারা নিজদিগকে অবহেলিত বোধ করে। অবশ্য জাতিকে বিভক্তকারী প্রধান বিষয় হইল আতাতুর্কের ছয় দফার দুই দফা। এই দুইটি হইল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রবাদ এবং ধর্মীয় বিষয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা।

আতাতুর্ককে বিপ্লবে সাহায্যকারী এই সকল বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই নীতিসমূহের বিরোধিতা করেন না, তবে তাঁহাদের বক্তব্য হইল রিপাবলিকান পার্টি এইগুলির অপব্যাখ্যা করে। রিপাবলিকান পার্টির সমালোচনার কারণ হইল ইহা রাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নহে। নগরীর কেন্দ্রস্থলসমূহে ব্যবসায়িগণ আরও অধিক ব্যক্তিগত ব্যবসা দাবি করে এবং আংকারার বুর্জুয়াগণ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায়। ডেমোক্রেটিক দল ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিরূপ ব্যাখ্যার জন্য এবং 'ধর্মের প্রতি বৈরীভাব পোষণের' কর্মসূচি প্রচার করিবার দায়ে সরকারকে দোষী করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে তাহারা ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্যকরী করিতে যাইয়া হয়ত বেশি বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে এবং ফলে এই ব্যাপারে আগ্রহী কৃষকদিগকেও শত্রুতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। ফলে মাতাপিতার লিখিত অনুরোধে সরকার বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রদান করে। সরকার সীমিত সংখ্যক লোককে মক্কায় হজ্ব করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করে, ইমাম প্রশিক্ষণের বিশেষ পাঠ্যসূচি গ্রহণ করে, আংকারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধর্মীয় অনুষদ প্রতিষ্ঠা

করে এবং ওসমানীয় সুলতান ও ওসমানীয় যুগের অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাধিসমূহ খুলিয়া দেয়। অবশ্য এই সকল পন্থাসমূহ রিপাবলিকান পার্টিকে বাঁচাইতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল বিপুল ভোটে জয় লাভ করে; ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬টি আসন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার হাত পরিবর্তন করে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে তুরস্ক

নূতন ন্যাশনাল এসেম্বলি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান সেলাল বায়ারকে প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেন্দারেসকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। নূতন সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করে, এবং নবাগত জাতিসমূহের জন্য ইহাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইখানেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে গণতন্ত্রের পথে শিক্ষিত একটি জাতি কিভাবে কোনো বিপ্লব ও রক্তপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তন করিবার মতো সুপরিপক্ব হয়। আবার এমন অনেকও রহিয়াছে যাহাদের ধারণা, পরবর্তী ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সামরিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাও বলা যায় যে, এইরূপ বিশ্বাস ও উৎসাহ অসময়োচিত। কিন্তু তুর্কি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কের গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করাও উচিত নহে।

১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে আসনের সংখ্যা কম হইলেও ডেমোক্রেটিক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের এই শাসনের যুগে প্রধান কর্মসূচি ছিল ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও রাষ্ট্রবাদের পুনঃব্যাখ্যা করা এবং নূতন ব্যাখ্যা কার্যকরী করা। অবশিষ্ট চারিটি নীতির মধ্যে প্রজাতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা আসন গ্রহণ করে যে তুর্কি সমাজের অতি ক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কেহই এইগুলি লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করে নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাহক গণবাদের নীতি — যাহা রিপাবলিকান পিপল্স পার্টির শাসনামলে অবহেলিত হয়, তাহা সেই পার্টির ইচ্ছানুযায়ীই এখন কার্যে পরিণত হয়। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণবাদের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষমতায় আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল সৃষ্টি হইবার আংশিক কারণ হইল এই দল বারংবার এই নীতি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের জন্য গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার সাধন করিবার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হইয়া পড়ে। অতঃপর বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আতাতুর্কের ন্যায় তুরস্কে সংস্কার চাপাইয়া দেওয়া বোধ হয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যে দুইটি বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও কিছুকাল এইরূপ চলিবার সম্ভাবনা এই দুইটি বিষয় হইল ধর্ম ও অর্থনীতি।

তুর্কি ধর্মনিরপেক্ষতা

আতাতুর্কের বিপ্লবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আতাতুর্কের নিকট ইহার অর্থ হইল জনজীবন হইতে ধর্মের প্রভাব একরকম উঠাইয়া দেওয়া। আতাতুর্কের অনেক সহচর জনজীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী হইলেও তাঁহারা আতাতুর্কের এই পন্থা পছন্দ করেন নাই, কারণ ইহার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহাদের ধর্মচর্চা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আতাতুর্ক একটি 'রাজভক্ত বিরোধী দল' হিসাবে প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল গঠন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহা পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন প্রধানত এইজন্য যে এই দল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করিবার ব্যাপারে সরকার 'বাড়াবাড়ি' করিতেছে বলিয়া সমালোচনা করে। দীর্ঘদিন

যাবত তুরস্কের অত্যন্ত বিতর্কমূলক আলোচনা সম্ভবত সীমা নির্ধারণ লইয়া। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলে তুর্কি সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভ্যাস পুনরায় চালু হইবার সমূহ সম্ভাবনা। আতাতুর্কের নিকট সমাধান অতি সাধারণ—তিনি দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক যদিও জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া বা নামাজের জন্য আযান দেওয়া নিষেধ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তুর্কি ভাষায় আযান দিতে বাধ্য করিয়া এবং যাহারা আরবি ভাষা ব্যবহার করে (ইসলামী নীতি অনুযায়ী) তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে তিনি আযান একরূপ বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে একাধিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হইবার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী রিপাবলিকান পিপল্স পার্টি বিশেষত গ্রামাঞ্চলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। অতএব তাঁহারা এই আইন শিথিল করেন এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, মক্কায় হজ্বে যাওয়া এবং অন্যান্য রীতিনীতি পালন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে 'পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা' অন্তর্ভুক্ত করে। নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেট দল আবিষ্কার করে যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ বিদ্যমান।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অধীনে নূতন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হইল আযানে আরবি ভাষা ব্যবহারের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। ইহার পরে আসে রমজান মাসে রোজা পালন, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা, ধর্মীয় আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিল, ইমাম প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মসজিদ নির্মাণ করা। এক সমীক্ষায় দেখা যায় দশ বৎসরের শাসনামলে ডেমোক্রেটিক দলের সরকার ৫০০০ মসজিদ এবং সমসংখ্যক সাধারণ স্কুল নির্মাণ করে। আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষবাদের ব্যাখ্যার অনুসারিগণের নিকট, যাহারা মসজিদ নির্মাণের বিরোধী, সমসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হইল এই নীতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। তুর্কি ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের রোষের কারণ হইল এই যে সরকার বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইনের বিপরীত কাজ করে। সমস্ত বিদ্যালয়ে এই ধর্মীয় শিক্ষা চালু করে, এবং যে সকল অভিভাবক তাহাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা চায় না তাহাদিগকে লিখিতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

এতদসত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করা বা তুর্কি প্রজাতন্ত্র গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোনো উদ্দেশ্য ডেমোক্রেটিক দল পোষণ করে নাই। কোনো কোনো দল ও ব্যক্তিবিশেষ অনুরূপ ভাবধারা চালু করিবার চেষ্টা করিলে সরকার ঐগুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইল, ধর্মকে গণ্ডীভূত করিবার আইন শিথিল করিলে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃপ্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বস্তুত ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গঠিত ন্যাশন পার্টি এই ব্যাপারে ডেমোক্রেটিক পার্টির তুলনায় আগাইয়া যায়। ইহা জাতির ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যাশা করে এবং প্রত্যেককে যে কোনো ভাষায় ধর্মপালন করিবার স্বাধীনতা প্রদানের দাবি জানায়। ইহা ধর্মীয় দানসমূহ বা ওয়াক্ফ্ সম্পত্তি উলামাদের নিকট ফেরত প্রদানের দাবিও উত্থাপন করে। লুক্কায়িত ধর্মীয় সংস্থা পুনরায় জনসমক্ষে বাহির হয়, কেউ কেউ পাশ্চাত্যকরণ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বক্তৃতা প্রদান করে। কেউ কেউ আবার এইরূপও বলে যে,

'তুরস্ককে ফিলিস্তিনে আরবদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত।' এই সকল দল বা লোকজনদের অধিকাংশকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বিতর্ক চলিতে থাকে। ধর্মের এই পুনঃপ্রকাশের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারে না ঃ ইহার অর্থ কি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক উপযোগিতামূলকভাবে ধর্মের ব্যবহার নাকি পুরাতন ব্যবস্থার পুনর্বহাল, নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি একটি নূতন ও সংস্কার সাধিত ইসলামের পুনর্জাগরণ।

নূতন রাষ্ট্রবাদ

ধর্মনিরপেক্ষবাদের চাইতেও অতি জরুরি ও অধিক জটিল হইল নূতন সরকারের অর্থনীতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মুদ্রাস্ফীতি এবং ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্ববর্তী দশকে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাতে জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। তদুপরি পঁচিশ বৎসরের স্থিতিশীল সরকারের আমলে তুরস্কে এক নূতন শ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ম্যানেজারের সৃষ্টি হয় যাহারা ডেমোক্রেটিক পার্টি কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। যুদ্ধোত্তরকালের তুরস্কের অবস্থা, ট্রুম্যান নীতি এবং বিপুল আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার দ্বারা তুরস্কের নেতৃবৃন্দ অতি দ্রুত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনের এই সুযোগ কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষত তুরস্ক ও ইরানে মার্কিন সাহায্যের স্বরূপ হইল সামরিক, এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল স্নায়ুযুদ্ধে উস্কানী দেওয়া। অধিকন্তু, উভয় দেশে সাহায্য নিয়ন্ত্রণকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্কিন সামরিক লোকজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বার্ষিক ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুর করে, এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে এক বৎসর মঞ্জুরিকৃত অর্থ কাজে লাগাইতে না পারিলে পর বৎসর মঞ্জুরি অর্থ কমাইয়া দেওয়া হয়। অতএব নিত্য নূতন কলকারখানা স্থাপন ও শিল্প বিস্তৃতির মাধ্যমে দ্রুত সে অর্থ খরচ করিবার প্রবণতা দেখা দেয়। মার্কিন সংস্থাসমূহের নিকট এই ধরনের খরচের অর্থ হইল কংগ্রেসের নিকট হইতে নূতন নূতন মঞ্জুরি লাভ করা, যে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল "মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম রোধ করা," তুর্কি জনগণের নিকট কলকারখানার অর্থ হইল "উন্নয়ন" এবং ক্ষমতাসীন দলের নিকট ইহার অর্থ হইল আরও অধিক ভোট।

অবশ্য উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন পন্থা। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশে একটি কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় হইতে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে কারখানা নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পর উৎপাদন আরম্ভ করিবার মতো যথেষ্ট পুঁজি তুর্কি সরকারের ছিল না। অতএব বিদেশী সাহায্যের আশায় মেন্দারেস সরকার ঘাটতি খরচের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইহার ঋণের পরিমাণ ১৩০,৪৬,০৪,৬৩৬ ডলারে দাঁড়ায়।

তবে ইহার অর্থ এই নহে যে কিছুই করা হয় নাই। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয় এবং অনেক কারখানার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে, দ্রুত শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত পূর্ত কর্মসূচির ফলে অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ পড়ে। প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস পরিকল্পনা অপছন্দ করেন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা অবহেলা করেন, অনুৎপাদনমূলক প্রকল্পে অর্থ ব্যয় করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মাণ কার্য চালান এবং দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সম্মুখীন করেন। তুর্কি অর্থনীতির শিক্ষানবিশগণ বলেন যে, এই সকল অপরাধের জন্য যাহারা অর্থ প্রদান করে তাহারাও কিয়দংশে দায়ী।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থান

ধর্মীয় শক্তির পুনরাগমনে ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ শঙ্কিত হয়, ব্যবসায়িগণ বহির্গত ও ভিতরগত মূল্যে হতাশ হয়, কারণ ইহার ফলে রপ্তানিতে মুনাফা হয় স্বল্প অথচ আমদানিতে খরচ পড়ে বেশি, এবং তুর্কি জনগণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়। যে কোনো সরকারের পতনের জন্য এই কারণগুলি যথেষ্ট, কিন্তু সামরিক বিপ্লবের কারণ হইল গণবাদ দমন, যদ্বারা ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতায় আগমন করে। এই দল ক্ষমতাসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে ক্রমশ দেশের একমাত্র দল হিসাবে রাখিতে চেষ্টা করে। ক্ষমতাসীন দল একটি রাজভক্ত বিরোধী দলের ব্যাপারে অভ্যস্ত। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে সরকার ২৫ বৎসর বা ততোধিক কাল হইতে কর্মরত সমস্ত জজবৃন্দকে অবসর প্রদান করে এবং রাজনৈতিক নিয়োগের সুযোগ দান করে। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য রাজনীতি নিষিদ্ধ করে এবং রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টির আসবাবপত্র বাজেয়াফ্ত করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে সরকার "রাজনৈতিক প্রচারণা" বন্ধ করিয়া দেয়, বিধিনিষেধের আইন চালু করে এবং সরকারের প্রতি 'জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট' করিবার অপরাধে সরকার বিরোধী পত্র-পত্রিকা বন্ধ করিয়া দেয়। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সরকার একটি আইন পাস করিয়া বিভিন্ন দলের কোয়ালিশন নিষিদ্ধ করে এবং কোনো দল যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সে দলকে সে প্রদেশের সমস্ত সদস্যের আসন প্রদান করে। এই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াও তাহারা ৪৭.৭ শতাংশ ভোটের অধিক লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ রিপাবলিকান পার্টি ৪০.৯ শতাংশ ভোট লাভ করে।

তুরস্কের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে মেন্দারেস সরকার দমননীতির দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে উৎসাহিত হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম হাঙ্গামা শুরু হয় এবং রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টির নেতা ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনুনু মাথায় আঘাত পান। ইহা ও অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সরকার একটি সৈন্যদল প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বিরোধী দল সরকারের অনেকগুলি অনিয়মিত কার্যাবলীর বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলে। ২রা এপ্রিল পুলিশ ইনুনুকে কায়সারী শহরে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে। তিনি আদেশপত্র ছিন্ন করিয়া ট্রেনে বসিয়া থাকেন। জনসাধারণ এই খবর শুনিতে পাইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করে এবং তাঁহার হস্ত চুম্বন করে। আরেকটি ঘটনায় সৈন্যগণ একটি পুলের উপর তাঁহার গাড়ির গতিরোধ করে। ইনুনু গাড়ি হইতে বাহির হইয়া সৈন্যদের নিকট হাঁটিয়া যান। সৈন্যগণ সম্মানসূচকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যাইতে দেয়।

প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮-২৯শে এপ্রিল এবং শীঘ্রই ইহা আঙ্কারায় ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্রগণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে, প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, মেন্দারেস পদত্যাগ কর"- এই মর্মে শ্লোগান দেয়। মে মাসে ইস্তাম্বুলে ন্যাটোর সম্মেলন চলাকালে ছাত্রগণ সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য বিক্ষোভের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। ২০শে মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু একটি রাষ্ট্রীয় সফরে আগমন করিলে আঙ্কারায় জনতা মেন্দারেস-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকৃত সামরিক অভ্যুত্থান যাহাকে কখনও কখনও বিপ্লব বলা হয় তাহা সংঘটিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে এবং মাত্র চারি ঘন্টা স্থায়ী হয়। রাজধানীর কৌশলের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি তাহারা অধিকার করে এবং প্রেসিডেন্ট সেলাল বায়ার ও প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেসকে গ্রেফতার করে। সামরিক অভ্যুত্থান

পরিচালিত হয় স্থলবাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল কামাল গুর্শেলের নেতৃত্বে। ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি নামক একটি সামরিক সরকারের তিনি নেতা নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রাথমিক কার্যাবলীর একটি হইল ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন বিভাগের অধ্যাপকদিগকে একটি সংবিধান রচনার কাজে নিয়োগ করা। সামরিক সরকার ১৭ সদস্যের একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে, যাহাদের ১৫ জনই বেসামরিক লোক এবং একটি ১৫ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে। এই কর্মসূচির মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ধর্ম, সাংবাদিক স্বাধীনতা, কফি আমদানি, বিদেশ ভ্রমণ সহজকরণ, সম্পত্তি হস্তান্তর ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সমস্ত বিষয়।

১৭ মাসের শাসনামলে ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি ৫০০০ অফিসার ও ১৪৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে চাকুরি হইতে অবসর প্রদান করে; এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রায় ৬০০ সদস্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচার ১১ মাস স্থায়ী হয়। কোর্ট ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন, ১৩৮ জনকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বিভিন্ন মেয়াদী কারাবাস প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী মেন্দারেস, বৈদেশিক মন্ত্রী জরলু ও অর্থমন্ত্রী পোলাটকান ব্যতীত বাকি সকলের মৃত্যুদণ্ড মওকুফ করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই বিচারের উদ্দেশ্য হইল তুর্কিদিগকে এই ধারণা প্রদান করা যে, যে কোনো সরকারের অপরাধীকেই শাস্তি পাইতে হইবে। পর্যবেক্ষকগণের বিশ্বাস, এই বিচারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল যাহাই থাক না কেন, ইহার দ্বারা মেন্দারেস ও ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রিয়তা, বিশেষত কৃষকদের মধ্যে কোনো অংশে ক্ষুণ্ন হয় নাই। কোনো কোনো নূতন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট পাইবার জন্য প্রকাশ্যে এই পার্টির নীতিমালা গ্রহণ করে।

সংবিধান রচনা করা হয় এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে ইহা অনুমোদন করিবার জন্য গণপরিষদের বৈঠক হয়। ৯ই জুলাই নূতন সংবিধান গণভোটে দেওয়া হয় এবং ৬০ শতাংশেরও অধিক লোক ইহা সমর্থন করে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের সংবধিান ছিল প্রজাতান্ত্রিক যদ্দ্বারা ন্যাশনাল এসেম্বলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ইহাতে যথেষ্ট ভারসাম্য ছিল না, নূতন সংবিধানে তুর্কিগণ বিভিন্ন চোরাপথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে, যে পথে কোনো ব্যক্তিবিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। ইহাতে অধিক দল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বেশ ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। আতাতুর্কের ছয়টি নীতিমালার মধ্যে শুধু চারিটি রাখা হয়। বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রবাদ বাদ দেওয়া হয়। সংবিধান ঘোষণা করে যে, "তুর্কি প্রজাতন্ত্র একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক রাষ্ট্র।" মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক। ইহাকে "ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির" উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে রাষ্ট্রবাদ ত্যাগ করা হইলেও একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে কোনো সংবিধানের ন্যায় ইহার কার্যকারিতা প্রকাশ পাইবে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় ইহাকে যাচাই করা হইলে।

দ্বিতীয় তুর্কি প্রজাতন্ত্র

বিচার চলাকালে ও সংবিধান রচনার সময় নূতন রাজনৈতিক দলসমূহ গঠিত হয় এবং তাহারা প্রতিশ্রুত নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। প্রায় ১১টি দল তালিকাভুক্ত হয় ও প্রাণবন্ত প্রচারণা শুরু করে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাত্র চারিটি দল পরিষদে

আসন লাভ করিতে সমর্থ হয়। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি ১৭৩টি আসন লাভ করে, জাস্টিস পার্টি ১৫৮টি, নিউ টার্কি পার্টি ৬৫টি এবং রিপাবলিকান পেজেন্টস ন্যাশনাল পার্টি ৫৪টি আসন লাভ করে। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় ইহা জাস্টিস পার্টির সহিত কোয়ালিশন করে। পরিষদ জেনারেল গুর্শেলকে প্রেসিডেন্ট ও ইসমত ইনুনুকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করে। এক বৎসর পর কোয়ালিশনের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলে পিপল্‌স্ পার্টি অন্য দুই দলের সহিত কোয়ালিশন করে এবং জাস্টিস পার্টিকে সরকার হইতে বহিষ্কার করে।

রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি অন্যান্য পার্টি হইতে অধিক ভোট লাভ করায় কেউ আশ্চর্যান্বিত হয় নাই। আতাতুর্কের দল হওয়া ছাড়াও ইহা ডেমোক্রেটিক পার্টির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিরোধিতার নেতৃত্ব প্রদান করে। তবে পর্যবেক্ষকগণ আশ্চর্যান্বিত হন জাস্টিস পার্টির শক্তি প্রদর্শনে। সাধারণত ইহা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লোকদের লইয়া গঠিত, যাহারা স্বল্প কর এবং শিল্পকারখানায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নীতি বেসরকারি লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতীদ; এইদল সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিলোপ চায় এবং ইহা সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী। জাস্টিস পার্টি মোটামুটিভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট লাভ করে।

নিউ টার্কি (নূতন তুর্কি দল) অর্থনৈতিক, উদার ও রাজনৈতিক প্রগতিশীল লোকজনদের সমন্বয়ে গঠিত, যাহারা রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। তাহারা কঠোর ধর্মনিরপেক্ষবাদী এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার দাবি করে। রিপাবলিকান পেজেন্ট্‌স্ ন্যাশনাল পার্টি (Republican Peasants National Party) সামাজিক রক্ষণশীলতা দাবি করে এবং তাহাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষবাদ বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ও জাস্টিস পার্টি গ্রামাঞ্চলের লোকদের সমর্থন লাভ করে, অপরদিকে রিপাবলিকান ও নিউ টার্কি পার্টি শহুরে লোকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।

তুরস্ক একটি পাশ্চাত্য দেশ নাকি প্রাচ্য এই প্রশ্নে সহজেই বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলের লোকজন দেশকে প্রাচ্যের দিকে টানে, অপরদিকে শহুরে লোকজন টানে পাশ্চাত্যের দিকে। এই ব্যাপারে মূল নিষ্পত্তির বিষয় সম্ভবত ধর্ম। ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ আতাতুর্ককে অনুসরণ করিতে চায় - যাহার অর্থ হইল স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চলিবে না এবং ধর্মীয় রাজনীতিতে আরবি ভাষা ব্যবহার চলিবে না। অপরদিকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চান, নামাজে আরবি ভাষার ব্যবহার চান এবং ধর্মীয় সমস্ত দানখয়রাতের তহবিল উলামাদের হাতে হস্তান্তর দাবি করেন। এই উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থানে রহিয়াছে মধ্যমপন্থী দল যাহারা ইসলামের "আংশিক" রীতিনীতি প্রবর্তন চায় কিন্তু এই প্রবর্তনকে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মধ্যমপন্থী আশঙ্কা করে যে, এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে ধর্মীয় শিক্ষার স্বাধীনতা, আরবি ভাষা, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, খেলাফত ইত্যাদি পুনরায় চালু হইবে। অতএব শেষ সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে হুকুমের দ্বারা নহে, বরং শিক্ষা চালুর মাধ্যমে এবং যত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলের লোকজন পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত হইয়া উঠে উহার মাধ্যমে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়
ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির পরাজয়, তৎসঙ্গে নির্বাচনে বৃটিশ শ্রমিক পার্টির জয়লাভ ইহুদিবাদীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। শ্রমিক দলের সদস্যবৃন্দ সাধারণত 'ইহুদিবাদী সমর্থক' এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্য রক্ষণশীল সরকারকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে; শ্বেতপত্রের দ্বারা ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন সীমিত করে। তবে এই ক্ষেত্রে ইহুদিবাদীগণ হতাশ হয়। বিরোধী দলের সদস্য মিসরের সমাজতান্ত্রিক আর্নেস্ট বেভিন ইহুদিবাদীদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর থাকেন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের নূতন বৈদেশিক সচিব হিসাবে তিনি আরবদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হন। তুরস্ক ও গ্রীসের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রবল চাপের মুখে, পারস্য আজারবাইজানের পৃথকীকরণের আন্দোলন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট বৃটেন আরবদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঝুঁকি লইতে পারে না। ফলে বেভিন তাঁহার পূর্বসূরীর নীতিই চালাইয়া যান।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবিলম্বে ফিলিস্তিনে ১০০,০০০ ইহুদি উদ্বাস্তু গ্রহণ করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এট্‌লিকে আদেশ দেন। বিনিময়ে এট্‌লি ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে মার্কিনীদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করে এবং সমস্যাটি পর্যালোচনার জন্য একটি ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন লন্ডন, জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ফিলিস্তিনে প্রেরণ করে। ইতোমধ্যে ইউরোপ ও পশ্চিম জার্মানিতে ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইহুদি বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মহাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ইহুদিবাদীকে যথার্থভাবেই দায়ী করা হয়। পাঁচ বৎসর পর, প্রায় একইভাবে ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আরব বাস্তুত্যাগীদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য আরব রাষ্ট্রবর্গকে দায়ী করা হয়।

বৃটিশ শ্রমিক সরকারের মনোভাবে ইহুদিবাদীদিগকে হতাশ করিলেও ইহা ফিলিস্তিনের ইরগুন, স্টার্ন ও অন্যান্য ইহুদি চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংস্থাসমূহের ক্রোধের উদ্রেক করে। সন্ত্রাসবাদীগণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এবং আধা-সরকারি ইহুদিবাদী শক্তি হ্যাগানাহ্ (Haganah)-এর সহিত তাহাদের কার্যালীর যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়, অপরদিকে ইহুদিবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে তাহাদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন। যাহাই হউক, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ হইতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে এই সকল গোপন ইহুদি দলসমূহের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। তাহারা বৃটিশ পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বোমা বর্ষণ করে এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদিগকে হত্যা করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে চরমপন্থী দলের একজন সদস্য বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ময়েনকে (Lord Moyne) কায়রোতে হত্যা করে।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন একটি বিবদমান পরিবেশ ও সাধারণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ইহার অনুসন্ধান কাজ চালাইয়া যায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের শীতকালে, এমনকি হ্যাগানার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দলও (পালমাখ) বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে। অক্টোবর মাসে তাহারা একটি শিবির আক্রমণ করিয়া ২০০ উদ্বাস্তুকে মুক্ত করে। এই সকল উদ্বাস্তু দলকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের শ্বেতপত্রের আইন ভঙ্গ করিয়া অন্যায়ভাবে আনা হয়। ঐ মাসের শেষের দিকে তাহারা তিনটি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের অবশিষ্ট মাসগুলিতে ইরগুন ও স্টার্নের চরমপন্থী গোপন সংস্থাসমূহ রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলে, তৈল শোধনাগারসমূহ উড়াইয়া দেয়, অস্ত্রাগারসমূহে হানা দেয়, ব্যাংক লুট করে, সেতু ধ্বংস করে এবং বৃটিশ সৈন্যদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। বৃটিশ প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয়, কারণ গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদি জনসাধারণের সাহায্যপুষ্ট। ইরগুনের সাহসিকতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ হইল জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক সদর দপ্তরে বোমা বর্ষণ, যাহাতে ৯০ জনের অধিক লোক নিহত হয়।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ইহার রিপোর্ট পেশ করে। ইহার উপসংহার পূর্ববর্তী কমিশনসমূহের রিপোর্ট হইতে তেমন পার্থক্যমূলক কিছু নহে। ইহার সুপারিশ হইল, ফিলিস্তিন কোনো ইহুদি বা আরব রাষ্ট্র হইবে না। দেশভাগের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী করিয়া রিপোর্টে বলা হয়, আরব ও ইহুদিদের অধিকারসমূহ সমভাবে রক্ষা করিতে একটি দ্বিজাতিত্ব ও দ্বিভাষী রাষ্ট্র গঠনই সমস্যার সমাধান। স্বাধীনতা দান করিবার মতো সুপরিপক্ব অবস্থা ইহা পায় নাই। ইহা সুপারিশ করে যে, 'জাতিসংঘের অধীনে একটি জিম্মাদারি চুক্তি (Trusteeship Agreement) কার্যকরী হওয়া সাপেক্ষে ফিলিস্তিনকে বর্তমানের ন্যায় হুকুমনামার অধীনে রাখা হউক।' ইউরোপের ইহুদি উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা নিরসনের জন্য কমিশন ১০০,০০০ ইহুদিকে ফিলিস্তিনে প্রবেশাধিকার দানের সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রকাশের দিন বিকালে তাঁহার পছন্দমত শুধু একটি সুপারিশ উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনুরোধ করেন যে ১০০,০০০ ইহুদিকে অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক। প্রধানমন্ত্রী এটলী অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, রিপোর্টটি 'সামগ্রিকভাবে এবং সমস্ত মর্মার্থ সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে।'

এই সমস্যার সমাধান লাভের আশায় বৃটিশ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আরব ও ইহুদিবাদী প্রতিনিধিবর্গকে লন্ডনে একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানায়। সম্মেলনে কোনো চুক্তির আশা পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে ব্যর্থতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সচিব বেভিন একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ হইল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সাল, এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচারাভিযানের মধ্যে একটি হইল নিউ ইয়র্কের গভর্নর পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নীরবতা অবলম্বনের জন্য একটি বৃটিশ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিউ ইয়র্কে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন এবং ১০০,০০০ ইহুদিকে অবিলম্বে ফিলিস্তিনে গ্রহণের দাবি জানান। পরদিন রিপাবলিকান গভর্নর-পদপ্রার্থী থমাস দিউই (Thomas Dewey) আরেক ধাপ অগ্রসর হন এবং বলেন যে ১৫০,০০০-ই বাস্তব সংখ্যা। কয়েক দিন পর রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট ট্যাফট এই সংখ্যাকে ১৭৫,০০০-এ উন্নীত করেন।

বৃটিশ দোটানায় পড়িয়া যায়। আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহাদের একমাত্র বন্ধু সম্ভবত ট্রান্সজর্ডানের আবদুল্লাহ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি বৃটিশ হুকুমনামা বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাকে বৃটিশগণ 'জর্ডানের হাশেমী রাজত্ব' নামক সার্বভৌম রাষ্ট্রের বাদশাহর পদে উন্নীত করে। ইরগুন ও চরমপন্থী স্টার্ন দলসমূহ ফিলিস্তিনে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তদুপরি, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে বেসেল-এ আহুত বিশ্ব ইহুদিবাদী কংগ্রেসে বৃটিশ সমর্থক চেইম ওয়াইজম্যান কংগ্রেসের সভাপতির পদ হারাইবার উপক্রম হয়। রব্বি হিল্লাল সিলভারের নেতৃত্বে মার্কিন ইহুদিবাদীগণ ফিলিস্তিনে বৃটিশ শাসনকে 'অবৈধ' বলিয়া সমালোচনা করে এবং ওয়াইজম্যানকে একজন মন্থরকর্মী এবং সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে শান্তকারী ও এমনকি একজন 'বিদ্রোহী' বলিয়া কটূক্তি করে। একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওয়াইজম্যান সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু মার্কিন ইহুদিবাদীগণ নেতৃত্ব দখল করে এবং বেনগুরিয়ানের নেতৃত্বে ইহুদি এজেন্সির আরও চরমপন্থী সদস্যদের সহিত সহযোগিতা করে।

জাতিসংঘ কমিশন

এই ধরনের অবিশ্বাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের পরিবেশে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠে যে অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হইলেও বৃটিশগণ এই সমস্যা সমাধানে অক্ষম। প্রথম মহাযুদ্ধে কপটতা ও ওয়াদার বরখেলাপ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ নীতিপ্রণয়নকারীদিগকে চাপিয়া ধরে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বৈদেশিক সচিব বেভিন ফিলিস্তিন সমস্যাটিকে জাতিসংঘে অর্পণ করিবার বৃটিশ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। ফিলিস্তিনের উপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (The United Nations Special Committee on Palestine বা UNSCOP) গঠিত হয় ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া। এই রাষ্ট্রগুলি হইল অস্ট্রিয়া, কানাডা, চেকোশ্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যান্ড, পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোশ্লাভিয়া। কমিটি ফিলিস্তিনে অবস্থানকালে ইরগুন আক্রার বন্দীশালায় এক দুঃসাহসিক অভিযান চালাইয়া অনেক ইহুদি বন্দী মুক্ত করে। সম্ভবত জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির উপকারার্থে ইহুদিবাদীগণ প্রায় ৪৫০০ ইহুদি উদ্বাস্তু লইয়া এক্সোডাস জাহাজের (SS Exodus) আগমনের সময়ও নির্ধারণ করে। বৃটিশ ইহা অবরোধ করে এবং ফ্রান্সে পুনরায় ফেরত পাঠায়।

জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (UNSCOP) একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করিতে ব্যর্থ হয়। ভারত, ইরান ও যুগোশ্লাভিয়া এই তিনটি দেশ একটি সংখ্যালঘু রিপোর্ট পেশ করে ও একটি সংযুক্ত ফিলিস্তিনের সুপারিশ করে। অবশিষ্ট দেশ ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদিদের মধ্যে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব পেশ করে। ইহুদিবাদীগণ বিভক্তি পছন্দ করে, অপরদিকে আরবগণ উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে জাতিসংঘের রাজনৈতিক কমিটিকে বিভক্তির পরিকল্পনা বিবেচনা করিতে হয়। ইহা ফিলিস্তিনকে ছয়টি অংশে ভাগ করে, তিন ভাগ আরবদের জন্য ও তিন ভাগ ইহুদিদের জন্য। বিভক্তি প্রত্যেক দলের সন্নিবেশনের ভিত্তিতে করিলেও প্রকৃতপক্ষে আরব রাষ্ট্রে পড়ে ১০০,০০০ ইহুদি (১ শতাংশ) এবং ইহুদি রাষ্ট্রে পড়ে প্রায় ৫০০,০০০ আরব (৪৮ শতাংশ)। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ইহুদিদিগকে ফিলিস্তিনের ৫৬ শতাংশ এলাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ৪৩ শতাংশ এলাকা দেওয়া হয় আরবদিগকে। অবশিষ্ট ১ শতাংশ এলাকা, জেরুজালেম ও বেথেলহাম, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

দশ বৎসরের জন্য একটি অর্থনৈতিক ঐক্য পরিকল্পনার শর্ত প্রদান করিয়া বিভক্তির উদ্যোক্তাগণ আরেকটি সারল্যের প্রমাণ দেয়। এই অর্থনৈতিক ঐক্য অনুসারে ইহুদি রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রকে সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু পরে তুমুল বিতর্কের মুখে বিভক্তির প্রধান যৌক্তিকতা সেই অর্থনৈতিক ঐক্যই চাপা পড়িয়া যায়। জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট বিভক্তি নীতির জন্য পাওয়া যাইবে-এইরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই। কোনো কোনো দেশ ইহার বিরোধিতা করে, বিশেষত ফিলিপাইন। ইহার প্রতিনিধি জেনারেল কারল্‌স রোমিউলো (Carls Romulo) ইহার বিরুদ্ধে তুখোড় বক্তৃতা দেন। চূড়ান্ত ভোটের তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু ইহাতে বিলম্ব করা হয়, অংশত এই জন্য যে ২৭শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ধন্যবাদের দিন (Thanks giving Day)। এই সময়ে মার্কিন কর্মকর্তাগণ যাহারা বিরুদ্ধে ভোট দিবে তাহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন বলিয়া জানা যায়। একের পর এক অনিচ্ছুক দেশগুলিকে লাইনে আনা হয়, শেষ পর্যন্ত এমনকি ফিলিপাইনের প্রতিনিধিও ভোট পরিবর্তনের আদেশ লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে তিনজনই এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে থাকায় ইহুদিবাদীদের সুবিধা হয়। অপর দুই সদস্য গ্রেট বৃটেন ও চীন ভোট দানে বিরত থাকে।

২৯শে নভেম্বর পরিষদের বৈঠক বসিলে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠে যে বিভক্তির পরিকল্পনা পাস হইবে। অতঃপর আরব প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘু রিপোর্ট বিবেচনার প্রস্তাব করে, অবশ্য ইতোপূর্বে তাহারা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আরবদের এই ধরনের অভ্যাস অনেক বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। কোনো একটি প্রস্তাব বা আয়োজন তাহারা প্রবলভাবে বাধা দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা গ্রহণের আশা ফুরাইয়া গেলে তাহারা আবার ইহাকে সমর্থন করে। বিভক্তিকরণের পরিকল্পনা ৩৩ ও ১৩ ভোটে গ্রহণ করা হয়, ১১ জন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকে। গ্রেট বৃটেন ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে সে হুকুমনামা বিলুপ্ত করিবে এবং ১লা আগস্টের পূর্বে ফিলিস্তিন ত্যাগ করিবে।

ফিলিস্তিন গৃহযুদ্ধ

জাতিসংঘের ভোটের অব্যবহিত পরেই ফিলিস্তিনী আরব ও ইহুদিবাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশ সৈন্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। তাহারা নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে অপসারণ ও অতি দ্রুত শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহ ত্যাগ করিবার ব্যাপারেই প্রধানত ব্যস্ত থাকে। আরবগণ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহ হইতে অস্ত্র লাভ করে এবং ইহুদিবাদীগণ অস্ত্র ক্রয় করে যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে। হাগানাহ, ইরগুন ও স্টার্নদলসমূহ আরও অস্ত্রের জন্য বৃটিশ অস্ত্রাগারসমূহে হানা দিতে থাকে। অনুমান করা হয় যে আরবদের সৈন্য সংখ্যা হইল প্রায় ৫০০০ যাহারা অনভিজ্ঞ, এবং বহুদূরে অবস্থানরত জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফতি দ্বারা পরিচালিত যিনি তখন কায়রোতে নির্বাসিত। অপরদিকে ইহুদিবাদিগণ আরও উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত এবং উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাহাদের অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।

উভয়পক্ষই সন্ত্রাসমূলক কাজ করে। ইহুদিগণ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে জেরুজালেমে অবস্থিত আরব মালিকানাধীন সেমিরাসিম হোটেল বোমার আঘাতে উড়াইয়া দেয় এবং আরবগণ ইহুদি মালিকানাধীন জেরুজালেম পোস্টভবন তোপের আঘাতে উড়াইয়া

দিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফেব্রুয়ারিতে রমলার জনবহুল বাজারে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। দুই দিন পর তেলআবিরের জনসমাগম কেন্দ্রে একটি বোমা বিস্ফোরণ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া হয়। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা হইল দিয়ার ইয়াসির নামক আরব গ্রামে হত্যাকাণ্ড। ২৯শে এপ্রিল হাগানাহ এই গ্রামটি দখল করে এবং ইরগুন-স্টার্ন দলের হাতে ইহার পাহারা দিবার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু ইরগুন-স্টার্নদলসমূহ ২৫৪ জন আরব পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়েদের হত্যা করে। ইহার কয়েকদিন পর আরবগণ জেরুজালেমের হাদ্দাসাহ্ হাসপাতালের দিকে গমনরত একটি ইহুদি গাড়ির বহর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া প্রায় ৮০ জন ডাক্তার, নার্স ও ছাত্রদলকে হত্যা করত প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আরব ও ইহুদি উভয়পক্ষের বেসামরিক লোকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, কিন্তু হাগানার অনুমতি ছাড়া কোনো ইহুদি তাহাদের ঘর ত্যাগ করিতে পারিত না, অথচ আরবদের অনুরূপ কোনো রক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল না। ১৫ই মে হুকুমনামা বিলুপ্তির সময় পর্যন্ত প্রায় ১৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু যুদ্ধক্ষেত্র ও রক্তারক্তির স্থান হইতে পলায়ন করে।

এই সকল রক্তপাত চলাকালীন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে দুইটি অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ চলিতে থাকে। নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘের হলঘরে যুক্তরাষ্ট্রের মত পরিবর্তিত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রস্তাব করে যে বিভক্তির পরিকল্পনা কার্যকর করিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক ফিলিস্তিনের জিম্মাদারী লওয়া উচিত। ১৬ই এপ্রিল ও ১৫ই মে'র মধ্যে ইহুদিবাদী ও তাহাদের সমর্থকদের কঠোর সমালোচনার মুখে এই প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। একদিকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিবর্গ বিভক্তি পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করেন, অপরদিকে বেনগুরিয়ান এবং ফিলিস্তিনের ইহুদি রাষ্ট্রের ন্যাশনাল কাউন্সিল ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে তেলআবিবে মিলিত হয় ও ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নূতন রাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন, অথচ তাঁহার দেশের প্রতিনিধিবর্গ তখনও জাতিসংঘে জিম্মাদারীর উপর বিতর্কে লিপ্ত। ডঃ চেইম ওয়াইজম্যানকে নূতন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং ডেভিড বেনগুরিয়ানকে প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৫ই মে প্রভাতে ছয়টি আরব রাষ্ট্র (মিসর, ইরাক, জর্দান, লেবানন, সৌদি আরব ও সিরিয়া) ইসরাইল আক্রমণ করে। ৬৫০,০০০ লোক অধ্যুষিত একটি জাতি ৪,০০০০,০০০ লোকের সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রকে পরাজিত করিলে ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত সৈন্য সংখ্যা বিবেচনা করিলে ব্যাপারটিক ভিন্নরূপ মনে হইবে। ছয়টি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের সৈন্য সংখ্যা ৭০,০০০ এর অধিক হয় নাই। ইহাদের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ সৈন্য সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তন্মধ্যে ৬০০০ হইল জর্দানের আরব বাহিনীর লোক। আরব বাহিনীর মোকাবিলায় ইসরাইলের পক্ষে দেখা যায় কমপক্ষে হাগানাহ্‌র ৬০,০০০ যোদ্ধাদল। এই সেনাবাহিনীতে থাকে বৃটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০০ অফিসার, প্রায় ২০,০০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদল এবং ৩০০ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী (পালমাখ)। ইরগুন ও স্টার্ন দলসমূহের কর্মক্ষম যোদ্ধার সংখ্য এক হাজারের অধিক নহে। তদুপরি ইসরাইলিদের সাহসিকতা ও তৎপরতা অবহেলা করিবার মতো নহে। তাহাদের মনোবল অতি উঁচু, কারণ তাহারা যুদ্ধ করে টিকিয়া থাকিবার তাগিদে। অপরদিকে আরবদের একনিষ্ঠ কোনো লক্ষ্যও নাই, সেনাপতিও নাই। অধিকাংশ আরব সৈন্য কেন যুদ্ধ করিতেছে তাহাও

জানে না এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দও কোনো না কোনো জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত।

প্রারম্ভে উভয় বাহিনীর সাজসরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল, কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদিবাদীগণ ইসরাইলের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করে এবং ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইহুদি স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের বিমান চালনা করে। এতদসত্ত্বেও প্রথমদিকে আরবগণ বেশ সফলতা অর্জন করে, মিসরীয়গণ নেগেভ অধিকার করে, জর্দান পুরাতন জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইরাকি সৈন্যগণ হাইফার ১৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছে। ১১ই জুন জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম শান্তি চুক্তির সময় দেখা যায় যে বিবদমান পক্ষগুলি মোটামুটি জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত ভূখণ্ডই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধ বিরতির শর্ত হইল বিবদমান পক্ষদ্বয় যেখানে আছে সেখানেই থাকিবে এবং নূতন কোনো সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নিজদিগকে শক্তিশালী করিবে না। উভয়পক্ষই চুক্তির দ্বিতীয়াংশ ভঙ্গ করে। আরবগণ অবশ্য অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দরুন সমগ্র এলাকা পরিবৃত করিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইসরাইলিগণ চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিপুল পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে উড়ন্ত দুর্গরাজি এবং বৃটেন হইতে ব্যু-ফাইটার জঙ্গী বিমান ইসরাইলে পাচার করা হয়।

সুইডেনের কাউন্ট ফোক বার্ণাডটকে জাতিসংঘের তরফ হইতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। ফিলিস্তিন ও জর্দান উভয় দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য ও একটি স্বায়ত্তশাসিত ইহুদি রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রস্তাবাবলী পেশ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী জেরুজালেম ও নেগেভ পড়ে আরবদের ভাগে এবং সমগ্র গ্যালিলী পড়ে ইসরাইলের ভাগে। আরব ও ইসরাইল উভয় পক্ষ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরবর্তী দশদিনের যুদ্ধে ইসরাইলিগণ বেশ এলাকা দখল করে। ১৯শে জুলাই জাতিসংঘ দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি আরোপ করে। আরব বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম এবং ইসরাইলিগণ নূতন জেরুজালেম দখল করে। কাউন্ট-বার্ণাডট তবুও এই সমস্যার একটি সমাধান লাভের প্রচেষ্টা চালাইয়া যান, কিন্তু ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর স্টার্ন দলের এক গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় সন্ধি অনেকটা প্রথম সন্ধির ন্যায়। ইসরাইলিগণ নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নেগেভ ও গ্যালিলী অঞ্চলে দুইটি আক্রমণ পরিচালনা করে। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিমান বাহিনী লইয়া ইসরাইলি সেনাবাহিনী মিসরীয়দিগকে নেগেভ হইতে এবং 'আরব মুক্তিবাহিনীকে' উত্তর গ্যালিলী হইতে হটাইয়া দেয়। ইতোমধ্যে ফিলিস্তিন বিষয় লইয়া জাতিসংঘে বিতর্ক চলে। জাতিসংঘ সচিবালয়ের রাল্‌ফ্ বাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকালী হিসাবে মনোনীত করা হয়। রড্‌স দ্বীপে তাঁহার সদর দফতরে তিনি আরব ও ইসরাইল প্রতিনিধিবর্গকে বিভিন্ন কক্ষে একত্রিত করেন (আরবগণ ইসরাইলিদের সহিত একই কক্ষে বসিতে অস্বীকার করে) এবং উভয় কক্ষে বারংবার আসা-যাওয়া করিয়া শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে প্রথম সন্ধি স্থাপন করিতে সক্ষম হন। পরে অন্যান্যদের সঙ্গেও সন্ধি হয়ঃ লেবাননের সহিত ২৩শে মার্চ, জর্দানের সহিত ৩রা এপ্রিল এবং সিরিয়ার সহিত ২০শে জুলাই একটি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং রাল্‌ফ্ বাঞ্চ তাঁহার প্রচেষ্টার জন্য শান্তির নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যদিও কোনো শান্তি তথায় প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

তিনটি জটিল সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। প্রথমটি হইল সীমান্ত প্রশ্ন। প্রত্যেক সন্ধি চুক্তিতে মিসর-ইসরাইল সন্ধির পাঁচ নম্বর ধারার ন্যায় একটি বাক্য সংযোজন করা হয়; তাহাতে বলা হয় 'সন্ধির সীমান্ত রেখাকে কিছুতেই রাজনৈতিক বা ভূগোলিক সীমান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না এবং ফিলিস্তিন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা কালে এই সন্ধি মোতাবেক উভয় পক্ষের কোনো অধিকার, দাবি ও অবস্থান বিবেচনা না করিয়া সীমান্ত নির্ধারিত হইবে।*' ইসরাইলকে তাহার মূল সীমারেখায় ফিরিয়া যাইবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পীড়াপীড়ি না করিবার অর্থ এই যে সম্ভবত জাতিসংঘে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ইহা চান না। ইসরাইলিগণ তাহাদের নূতন সীমান্তে যেইরূপ দ্রুতগতিতে ইহুদিদের 'বসতি' স্থাপন করে তাহাতে প্রমাণ করে যে কখনও একটি 'চূড়ান্ত মীমাংসার' আয়োজন করা হইলেও তাহারা ঐ অবস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে না। 'অস্থায়ী' সীমান্তের অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিবদমান সৈন্যদের অবস্থান। অসামরিক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয় ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়াইবার জন্য। ফলে গাজা অঞ্চলটি দেওয়া হয় মিসরকে, লেবাননের সীমান্তে যুক্তিসম্মত কোনো পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই এবং হুলাহ্ হ্রদের জলাভূমি ব্যতীত, তাহাও অসামরিক অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত সমগ্র গ্যালিলী সাগর ও জর্দান নদীর উপরিভাগ ইসরাইলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহর সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর তাঁহার হাতে দেওয়া হয়। ইহাতে পুরাতন জেরুজালেম অন্তর্ভুক্ত। কায়রোতে অবস্থানরত প্রাক্তন মুফ্তি হজ্ব আমিন আল হুসাইনী বাদশাহ আবদুল্লাহ কর্তৃক ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড অধিকার স্বীকার করেন নাই, কিন্তু বিরোধিতা কার্যকরী করিবার মতো কোনো ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এইভাবে 'অস্থায়ী' সীমান্ত মীমাংসায় ইসরাইলকে বিভক্তি পরিকল্পনার চাইতে ২০ শতাংশ অধিক ফিলিস্তিনী ভূখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

জেরুজালেম

দ্বিতীয় অমীমাংসিত সমস্যা হইল পুরাতন ও নূতন জেরুজালেম প্রশ্ন। নিকটস্থ বেথেলহেমসহ এই নগরীকে জাতিসংঘ আন্তর্জতিক নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রস্তাব করে। যুদ্ধের ফলে এই নগরের অবস্থা আন্তর্জাতিক নগরী হইতে কাটাতার ঘেরা একটি বিভক্ত নগরীর রূপ ধারণ করে। জর্দানিগণ পুরাতন জেরুজালেম ও বেথেলহেম নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদি ধর্মের অধিকাংশ পবিত্র দরগাহসমূহ বিদ্যমান। ইসরাইলিগণ নূতন জেরুজালেমের বৃহদাংশ অধিকার করে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক জেরুজালেমের নীতি ত্যাগ না করিলেও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারিগণ সন্ধির চুক্তিতে যে সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করেন তাহাতে জেরুজালেমকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ইসরাইল ও জর্দান কর্তৃক অধিকৃত এলাকা পৃথক ভূখণ্ডে পরিণত হয় এবং জেরুজালেম একটি বিভক্ত নগরী হিসাবে থাকিয়া যায়।

জেরুজালেমের আন্তর্জাতিকতার বিষয়টি জাতিসংঘের আলোচ্য বিষয়ে থাকিয়া যায় এবং ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রথম ২০ বৎসরের প্রত্যেক বৎসর প্রতিনিধিবর্গ জেরুজালেমের মর্যাদা লইয়া প্রস্তাব পাস করেন, কিন্তু ইসরাইল বা জর্দান কেহই এগুলির প্রতি কর্ণপাত করে

---

* *The Armistice Demarcation Line is not to be construed in any sense as a political or territorial boundary and is delineated without prejudice to rights, claims and positions of either party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question."*

না। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইল জেরুজালেমকে ইহার রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করে এবং নেসেট (Knesset) বা পার্লামেন্টসহ অনেক মন্ত্রিসভা তথায় লইয়া যায়। অবশ্য ইসরাইলে নিযুক্ত কূটনীতিবিদগণ ইহা স্বীকার করেন না এবং তাঁহাদের দূতাবাস তেলআবিবেই রাখেন। অধিকন্তু ইসরাইল ইহাও ভুলিয়া যায় যে জেরুজালেমকে অসামরিকী করিবার কথা, অথচ তবুও সে তাহার বাৎসরিক স্মরণযোগ্য সামরিক কুচকাওয়াজ এই নগরেই সম্পন্ন করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের 'ছয় দিনের যুদ্ধে' ইসরাইল পুরাতন জেরুজালেম অধিকার করিলে এই নগরীর আন্তর্জাতিকীকরণের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়।

আরব উদ্বাস্তু দল

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পর উত্থিত তৃতীয় ও অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যা হইল আরব উদ্বাস্তুদের ভাগ্য। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথমদিকে যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা যায় প্রায় ৭৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু মিসর (গাজা অঞ্চল), জর্দান, লেবানন ও সিরিয়ায় ইতস্তত ছড়ানো। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এত অধিক হইবার কারণ লইয়া পরস্পর বিরোধী মতামত পেশ করা হয়। ইসরাইল ও তাহার সমর্থকগণ সাধারণত দাবি করে যে আরব রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক বেতারের মাধ্যমে আরবদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া আক্রমণকারী বাহিনীতে যোগদান করত ইসরাইলকে পরাজিত করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইহাতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যে তাহারা তাহাদের দারাপুত্র পরিবারও কেন সঙ্গে লইয়া যায়। উত্তরে শুধু এতটুকু বলা হয় যে তাহারা তাহাদের শত্রুদের মধ্যে পরিবারবর্গকে রাখিয়া যাইতে চায় নাই। আরব লেখকবর্গ দাবি করেন যে, ইসরাইলে সদ্যাগত ইহুদি উদ্বাস্তুদের জন্য জায়গা করিবার উদ্দেশ্যে ইসরাইলি সৈন্যগণ আরব নারী পুরুষ ও শিশুদিগকে বেয়নেটের মুখে 'বিতাড়িত' করে। ফিলিস্তিনে নিযুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহের বেতার বার্তা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইসরাইলের দাবির সত্যতা প্রমাণিত না হইলেও ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে অনেক আরব তাহাদের বেতারে অতি আশাব্যঞ্জক আরব 'বিজয়ের' খবর শুনিয়া মনে করে যে তাহাদের বরং দেশ ত্যাগ করিয়া বিজয়ীদের সহিত দেশে ফেরাই উত্তম কাজ। অপরদিকে ইহাও প্রমাণিত হয় যে হাইফা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে ইহুদি মাইকের দ্বারা আরবদিগকে দেশত্যাগে উৎসাহ প্রদান করা হয়, কোনো কোনো গ্রামে ইসরাইলি সৈন্যগণ আরবদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এবং কোথাও কোথাও আরবদিগকে বহিষ্কারও করা হয়। এতদসত্ত্বেও, অধিকাংশ আরব অসংখ্য যুদ্ধ কবলিত লোকদের ন্যায় জীবনের ভয়ে যুদ্ধ হইতে পালাইতে চায় এবং গোলাগুলী শেষ হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার আশা পোষণ করে। অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইসরাইলি বাহিনী তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে দেয় নাই। ইউরোপ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ ইহুদি তাহাদের ঘরবাড়ি দখল করে এবং বিজয়ীগণ তাহাদের ক্ষেত খামারের ফসল ঘরে তোলে।

বস্তুত প্রত্যেক বৎসর জাতিসংঘ আরব উদ্বাস্তুদের তাহাদের ঘরবাড়িতে ফিরিবার অধিকারের আদর্শ দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে, কিন্তু ইসরাইল আরব উদ্বাস্তুদিগকে প্রবল গৃহশত্রু বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহাদিগকে ফিরিতে দেয় না। এইদিকে আরব দেশসমূহ একটি প্রাঞ্জল শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করিলে তাহাদের ঘরবাড়ি ও ক্ষেতখামারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও ইসরাইল নারাজ। অধিকাংশ উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করে এবং জাতিসংঘ রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সি (United Nations Relief and Work Agency or UNRWA), ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি, ওয়ার্ল্ড চার্চ সার্ভিস ও অন্যান্য জনহিতকর সংগঠন দ্বারা তাহাদের

ভরণপোষণ চলে। মিসর অধিকাংশ উদ্বাস্তুকে গাজা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে নিরুৎসাহ প্রদান করে। সিরিয়া, লেবাননে উদ্বাস্তু দল বিদেশীর ন্যায় বাস করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজন চাকুরির সংস্থান করে এবং নাগরিকত্বও লাভ করে। বহু সংখ্যক শিক্ষিত উদ্বাস্তু শিক্ষক হিসাবে কুয়েত ও সৌদি আরব গমন করে। ফিলিস্তিন নামের এক ফালি ভূখণ্ড দখলকারী একমাত্র জর্দানই উদ্বাস্তুদিগকে পরিপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দান করে। তাহা সত্ত্বেও, যাহারা শিবিরে বাস করে তাহারা নিরুদ্দিষ্ট জীবন যাপন করে এবং বছরের পর বছর এইভাবে বাস করিয়া তাহারা ফারটাইল ক্রিসেন্টের সাধারণ এলাকার দুঃখপূর্ণ একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করে।

একটি ইহুদিবাদী রাষ্ট্র

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ইসরাইল সম্ভবত অদ্বিতীয়, এই জন্য যে ইহাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি আশ্রয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং এই ধরনের যে সকল দেশ উদ্বাস্তুদের লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছে তাহারা ইহুদিদের আশ্রয়ের স্থান হিসাবে এই রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে। কিন্তু ইসরাইলের অদ্বিতীয় হইবার কারণ হইল ইহা একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ ইহুদি রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করে। তাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে পৃথিবীর সমস্ত ইহুদিদের 'একত্রীকরণের' জন্য ইসরাইল প্রস্তুত থাকিবে। ইসরাইল এই রাষ্ট্রে অ-ইহুদিদের প্রবেশ কখনও অস্বীকার করে নাই কিন্তু ইহার 'ইহুদিপনার' উপর এমন জোর দেওয়া হয় যে অ-ইহুদিগণ সর্বদা নিজদিগকে জলবহির্ভূত মৎস্যের ন্যায় মনে করে। ইহুদিবাদীগণ ইহুদিদিগকে শুধু আমন্ত্রণই জ্ঞাপন করে নাই, বরং তাহারা ইহাদিগকে আনয়নে সাহায্যও করে। নূতন রাষ্ট্রে তাহাদিগকে স্থান করিয়া দেয় এবং কর্মসংস্থানও করিয়া দেয়। বিশ্বের যে কোনো অংশের ইহুদি ইসরাইলে যাইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পূরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকতা লাভ করে। অ-ইহুদিগণ এইরূপ পারে না।

ফলে ইসরাইলে একটি বিতর্কের বিষয়, পূর্বেও ছিল এবং এখনও বিদ্যমান। তাহা হইল "ইহুদি কে?" মোটামুটিভাবে অন্তত আইনগতভাবে ইসরাইলিগণ একমত যে একজন ইহুদি হইবার জন্য আস্থা, বিশ্বাস বা আদর্শের কোনো প্রয়োজন নাই। ইসরাইলে খোদা ও তৌরাতে খাঁটি বিশ্বাসী অনেক লোক বিদ্যমান, আবার অনেক অজ্ঞেয়বাদী ও আদর্শহীন লোকও বিদ্যমান, কিন্তু সকলেই ইহুদি। একজন ইহুদি হইবার অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইল (সম্ভবত একমাত্র শর্ত) জন্ম। ইসরাইলের বিচারালয়ের রায় হইল যাহার মাতা "ইহুদি বংশের" তাহাকেই ইহুদি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। "ইহুদিপনার" উপর এইরূপ জোর দেওয়াটা ইহুদিবাদের দাবি ও কর্মসূচির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে ধর্মেরই হউক, ইসরাইলে আগত কোনো উদ্বাস্তু সে যে ইহুদি বংশোদ্ভূত এই কথা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাকে ইহুদি বলিয়া বিচেনা করা হয় না এবং তাই সে কোনো সুবিধাদি ভোগ করিতে পারে না ও "একত্রীকরণের" প্রয়োজনীয় আইনের আওতায় পড়ে না। সমালোচকের দৃষ্টিতে এইরূপ একটি রাষ্ট্র বর্ণগত, একান্ত ও আত্মকেন্দ্রিক।

প্রধানমন্ত্রী বেনগুরিয়ান ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি ইহুদিবাদী সম্মেলনে পৌরাণিক ইহুদিবাদী আদর্শ ব্যক্ত করেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইহুদি "তাহার সমগ্র

পার্থিব ও রাজনৈতিক জীবনে সে একটি অ-ইহুদি আধিপত্যের দাস;" একমাত্র ইসরাইলে "– যে মাটিতে আমরা বিচরণ করি যে বৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করি ... যে স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়–যে দেশের দৃশ্য আমরা অবলোকন করি এবং যে বৃক্ষতরুরাজী দ্বারা আমরা পরিবৃত– ইহার সকলগুলিই ইহুদি।" রাষ্ট্র এইরূপ সর্বাঙ্গীণ ইহুদিপনায়– এমনকি প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্যেও কোনো অ-ইহুদি পরিচিত পরিবেশ অনুভব করিতে পারে কিনা সন্দেহ। ইসরাইলে একটি "অ-ইহুদিবিরোধী" মনোভাব সর্বত্র পরিস্ফুট, যাহা অন্যান্য দেশে অনেকটা ইহুদিবিরোধী মনোভাবের সমতুল্য।

ইসরাইলী সরকার

ইসরাইলের নাগরিকদের মধ্যে যে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা নাই তাহা নহে। বরং বেশ সভ্যতার সহিতই বলা হয় যে ইসরাইলি সমাজ "বিশ্বের অত্যন্ত আইনানুগ সমাজগুলির অন্যতম।" ইসরাইল সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক ইহুদি উদ্বাস্তুগণ পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক বিভিন্নতা সঙ্গে লইয়া আসে এবং এইগুলিকে বৃটিশ পার্লামেন্ট্যারি পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রিত করে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের প্রথম নির্বাচনে নেসেটের (পার্লামেন্ট) ১২০টি আসনের জন্য ২১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনগণ কোনো একটি দলকে ভোট প্রদান করে, ব্যক্তি বিশেষকে নহে। দলগুলি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নেসেটে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২১টি দলে মধ্যে মাত্র নয়টি দল নেসেটে অন্তত একটি আসন লাভ করিবার মতো ভোট পায় (৫ শতাংশ)। উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে থাকে মাপাই, ম্যাপাম, জেনারেল জিওনিস্ট, হিরুত ও মিজরাখী।

মাপাই বা ইসরাইল শ্রমিক দল দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী দল এবং ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ হইতে এই দল প্রধানমন্ত্রীর পদ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা মার্কসীয় সমাজবাদী আদর্শ সংবলিত শ্রমিক দল। ইহার কোনো কোনো নেতা, যথা বেনগুরিয়ানের মতো ব্যক্তি, হুকুমনামার সময় ইহুদি এজেন্সির (Jewish Agency) সদস্য থাকেন। সম্ভবত বিরাট শ্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, হিস্তাদ্রোত (Histadrut)-এর উপর ইহার আধিপত্যের দ্বারা ভোটারদের মধ্যে ইহার ক্ষমতা বুঝা যায়।

মাপাইর পরে আরো বামপন্থী সম্মিলিত শ্রমিক দল বা ম্যাপাম। ইহা মার্কসীয় আদর্শ সম্ভূত এবং ইহুদিবাদকে ইহা সমাজবাদের পদানত মনে করে। ইহা একটি দ্বি-জাতিতত্ত্বমূলক (আরব-ইহুদি) রাষ্ট্র দাবি করে। ইহা বিল্টমোর কর্মসূচি[১] বিরোধী ছিল। এই দল নীতিগতভাবে গ্রামীণ, যৌথ ব্যবস্থাবাদী, পুঁজিবাদ বিরোধী ও নিরপেক্ষবাদী।

উপরোল্লিখিত দলসমূহের মধ্যে ডানপন্থী দল হইল লিবারেল পার্টি, যাহা বিভিন্ন শ্রেণীর একটি সংমিশ্রণ। তাহারা ইহুদিবাদ ব্যতীত অন্য কোন মতবাদ স্বীকার করে না এবং সময় সময় ইহাদিগকে জেনারেল জিওনিস্ট বা সাধারণ ইহুদিবাদীও বলা হয়। শহুরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই দলের সমর্থক বেশি এবং ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহা আস্থাশীল। প্রজাতন্ত্রের প্রথমদিকে ইহা ছিল ইসরাইলের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা হিরাত দলের দিকে ঝুঁকিয়া যায়। হিরাত পার্টি জেনারেল জিওনিস্টদের ডানপন্থী শাখা। হিরাত দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছে ইরগুন গ্রুপের কিছু কিছু নেতা। ইহা রিভিশনিস্টদের

---

১. *উপরে দ্রষ্টব্য; পৃঃ ৩৫৬।*

উত্তরাধিকারী, যাহারা ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন হইতে ট্রান্সজর্ডানের পৃথকীকরণের বিরোধিতা করে। এই দল অন্ধ দেশহিতৈষী এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে ইহা ইসরাইলের রাজ্য বিস্তারমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষপাতী।

ধর্মীয় দলগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল মিজরাখী ও মিজরাখী ওয়ার্কার্স। তাহাদের আদর্শ হইল ইহুদিবাদ (Zionism) ইহুদি ধর্মের মধ্যে নিহিত এবং তাই ইহুদি ধর্মকে ইহুদি জাতীয়তাবাদ হইতে পৃথক করা যায় না। তাহরা ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতির কঠোর উদ্যোক্তা। নেসেটে কোনো দল যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না তাই কোয়ালিশন সরকারের প্রয়োজন হয়। সম্ভবত যেহেতু ধর্মীয় দলসমূহ অন্যান্য দলসমূহের অর্থনৈতিক আদর্শের উপর কোনো প্রশ্ন তোলে না তাই সাধারণত ইসরাইলের প্রত্যেকটি কোয়ালিশন সরকারে তাহাদের সদস্যও থাকে। ধর্মীয় দলসমূহের সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য ম্যাপাই দল তাহাদের বিভিন্ন দাবি সমর্থন করে, যথা- ধর্মীয় শিক্ষা, আহার ও সাব্বাথের[২] আইন পালন, বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ এবং শূকর পালিবার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

সামাজিক অখণ্ডতা

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহার দরুন ইহা কতকগুলি বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইলের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৬,৫০,০০০। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে লোকসংখ্যা ৩,০০,০০০ লক্ষেরও বেশি বাড়িয়া যায়। প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তু যেহেতু কোনো অর্থনৈতিক সম্পদ ছাড়াই আসে তাই তাহাদের গৃহ নির্মাণ, কর্মের সংস্থান ও সাধারণ সামাজিক একত্রীকরণ এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর ইউরোপীয় ইহুদিদের (আশকেনাজিম, Ashkenazim) আগমন হ্রাস পাইলে আরবিভাষী দেশসমূহ, ইরান, তুরস্ক, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান হইতে 'প্রাচ্য দেশীয়' ইহুদিদের (সেপাহ্‌রাদিম, Sephardim) আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। 'ম্যাজিক কার্পেট' নামক এক প্রচেষ্টায় ৪৫০০০ হাজার ইয়ামানী ইহুদি আনয়ন করা হয়, আবার 'আলীবাবা' নামক এক প্রচেষ্টায় ইরাক হইতে ১১৪০০০ ইহুদি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রাচ্য দেশীয় ইহুদি ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

উদ্বাস্তুগণ নিজেদের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এমনকি আকৃতিও লইয়া আসে। তাহাদিগকে এক নূতন ভাষা শিক্ষা করিয়া এক জাতি হিসাবে বাস করিতে হয় ও কাজ করিতে হয়। তাহাদের স্ব স্ব দেশে তাহারা 'ইহুদি' হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু ইসরাইলে তাহারা হয় জার্মান, পোল, রুমানীয়, ইরাকি, ইয়ামানী, মিসরীয় বা মার্কিন। জার্মানগণ পোলদিগকে অপছন্দ করে, আবার ইউরোপীয়গণ প্রাচ্য দেশীয়দিগকে ঘৃণা করে। একত্রীকরণের জন্য ইসরাইলি সরকার মিশ্র সমবায় প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু এইগুলি পরে ত্যাগ করিতে হয়, কারণ সামাজিক বিভিন্নতার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, এমনকি কোনো কোনো সময় গোলাগুলীও চলে।

মোটামুটিভাবে, বিলম্বে আগমনকারী স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী এবং শুধু 'প্রাচ্য দেশীয়' হইবার দরুন ইচ্ছাকৃতভাবে ও ঘটনাচক্রে এই সকল ইহুদিকে অন্যান্য

---

২. *সাববাথ ইহুদির সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবস, শনিবার।*

ইহুদি হইতে পৃথক চোখে দেখা হয়। প্রায় সমস্ত উচ্চ বেতনের চাকুরি ইউরোপীয়গণ করায়ত্ত করে। ইউরোপীয় ইহুদিগণ এই বিষয়ে সজাগ যে বছরের পর বছর ধরিয়া পরিশ্রম ও আত্মদানের দ্বারা তাহারা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অতএব তাহারা মনে করে, প্রাচ্য দেশীয় ইহুদিদিগকেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে এবং তাই তাহাদের সমান ব্যবহার আশা করা উচিত নহে। ইউরোপীয় ইহুদিদের নিকট ইহা হয়ত যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত প্রাচ্য দেশীয়দের জন্য ইহা হজম করা খুবই কষ্টকর। ফলে, অনারব ও অ-ইউরোপীয় অনেক ইহুদি ইসরাইল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণী হইতে বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত লোকজন লইয়া গঠিত ইসরাইলি সেনাবাহিনী সংমিশ্রণের সর্ববৃহৎ স্থান। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে ইসরাইলের বিভিন্ন ভেদাভেদ এক হইয়া যায়। এতদসত্ত্বেও এই স্বল্প ভৌগোলিক পরিসরে সামাজিক অখণ্ডতা একটি সুদীর্ঘ ও কঠিন কাজ।

ইসরাইলি অর্থনীতি

ইসরাইলের অর্থনীতি সর্বদা দুর্বিষহ অবস্থায় বিরাজ করে। দেশটি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে বন্ধ্যা। নূতন উৎস অথবা সমুদ্রের পানি লবণাক্তহীন করিয়া যথেষ্ট পানির বন্দোবস্ত করা হইলে বড়জোর ৫০,০০,০০০ লক্ষ একর জমি চাষ করা যায়। ৪০,০০,০০০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ইহা মোটেই যথেষ্ট নহে। প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় ইসরাইলের রপ্তানির তুলনায় আমদানি আড়াই গুণ বেশি। ইসরাইল বহির্বিশ্বের ঋণ ও দানের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। এইগুলি আসিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দান, ইহুদি সম্পত্তি বিনষ্টের জন্য পশ্চিম জার্মানি হইতে 'ক্ষতিপূরণ', মার্কিন ইহুদিদের নিকট হইতে চাঁদা এবং তমসুক বিক্রয় দ্বারা। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসরাইলে যুক্তরাষ্ট্রের দানই সর্বোচ্চ। এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত ইহুদি আবেদনের (United Jewish Appeal) লক্ষ্য হইল ২৫ কোটি ডলার। কিন্তু এই ধরনের সাহায্য চিরকাল থাকিবে এইরূপ কোনো নিশ্চয়তা নাই।

এই ধরনের ব্যাপক অর্থনৈতিক অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জন্য ইসরাইলিগণ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইতোমধ্যে তাহারা বেশ উন্নতি লাভ করে। গ্যালিলী হ্রদ হইতে তাহারা পানি নিষ্কাশন করে ও ১০৮ ইঞ্চি পাইপ দ্বারা সেই পানি নেগেভে লইয়া যায়। প্রায় ৯০০০ শিল্প স্থাপন করিয়া অন্যূন ১০০,০০০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করে। এশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য আকাবা উপসাগরে তাহারা আইলাত বন্দরের উন্নয়ন করে এবং সেখান হইতে ভূমধ্যসাগরের হাইফা পর্যন্ত একটি তৈলের পাইপ লাইন বসায়। ইউরোপের বাজারে তাহারা জম্বীর ফল, টকবেগুন, জলপাই ও শশা রপ্তানি করে। তাহারা পর্যটনের উন্নয়ন সাধন করে এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর অধিকার করিয়া তাহারা বস্তুত 'পবিত্র ভূমির' পর্যটন ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলে। ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের অনেক পরিকল্পনা রহিয়াছে, কিন্তু অন্ততপক্ষে যতদিন ইসরাইল আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে ততদিন ইহা একটি দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকিবে।

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রবর্গ

ইসরাইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ইহার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রবর্গের সহিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া যাতায়াতের সমস্যা, বা আকাবা উপসাগর ব্যবহারে সমস্যা বা উদ্বাস্তুদের মর্যাদার সমস্যা মূল সমস্যার লক্ষণ মাত্র, অর্থাৎ অ-

ইহুদি অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। সম্ভবত আরবগণ যদি ইসরাইলকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে কোনো দুরভিসন্ধিহীন ও বন্ধুভাবাপন্ন একটি 'ক্ষুদ্র জাতি' হিসাবে জ্ঞান করিতে পারিত তবেই একটি আপোস মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু বিশ্ব ইহুদি গোষ্ঠীর সহিত ইসরাইলের সম্পর্ক এবং 'সমস্ত' ইহুদিকে ইসরাইলে আনয়নের ব্যাপারে ইহুদিবাদীদের প্রকাশ্য আশাবাদ এই রাষ্ট্রকে আরবদের চোখে এক বিশালাকার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। আরবদের নিকট বিশ্ব ইহুদিবাদ কমিউনিজমের চাইতেও মারাত্মক। তাই তাহারা ইহার সহিত যুদ্ধ করে, ইহাকে একঘরে করে এবং ইহাকে তাহারা ভয় করে। ২০ বৎসরে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা ইসরাইলে সমগ্র ফিলিস্তিন, সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার একটি কৌশলগত জেলা দখল করিবার ফলে বুঝা যায় আরবগণ কেন ইহাকে একটি 'ক্ষুদ্র' জাতি মনে করে না। অপরদিকে, তিন দিক হইতে আরবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকায় ইসরাইল একটি দুর্বিষহ রাজনৈতিক অবস্থায় নিপতিত, যাহা তাহার বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার কারিগরি বিদ্যার দ্বারা ইসরাইল আফ্রিকার অনেক নূতন নূতন সৃষ্ট দেশসমূহের ন্যায় প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জন্যও এক বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। এইরূপ আশা পোষণ করিবার পূর্বে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। একটি হইল ইহুদিবাদী মতাদর্শের পরিবর্তন, যদ্দারা একটি সম্পূর্ণ ইহুদি রাষ্ট্র হইতে ইসরাইল একটি বহুজাতি সংবলিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।, যেখানে 'বর্ণ' বা ধর্ম নাগরিকত্ব লাভের চাবিকাঠি হইবে না। দ্বিতীয় হইল শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পরিত্যাগ করা, যাহা একটি ইউরোপীয় প্রোথিত জাতি হিসাবে ইসরাইল এতদিন 'প্রাচ্য দেশীয়' আরবদের প্রতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়
নূতন মিসর

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুলাইয়ের বিপ্লবের ফলে একটি নূতন মিসর আত্মপ্রকাশ করে। রোম কর্তৃক মিসর দখলের পর হইতে এই প্রথম মিসরীয়রা দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাইল– আরব, মামলুক, তুর্কী বা বৃটিশেরা নহে। বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতে থাকে তাহার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে সুদূরপ্রসারী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ আসিয়া পড়ে। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল, যে সরকার বিদেশী শক্তি বিরোধী শ্লোগানের পরিবর্তে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রদান করিল। এই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল কিছু সংখ্যক তরুণ অফিসার এবং মিসরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের দ্বারা। এই বিপ্লবটির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে যাহার মূল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিসরের নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের সরকার-বিরোধী অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মিসরে জাতীয়তাবাদের মুখপাত্ররা মিসরের মূলভূমির শতকরা ৩৭ ভাগ আবাদী ভূখণ্ডের মালিকে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর নিয়ন্ত্রণকারী এই দলটি মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের অর্ধেক মাত্র। এই মালিক গোষ্ঠীর আনুগত্যে ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাহাদের পরিবারেরা – যাহারা আমলাতান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। তাহারা গণপরিষদ, সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করিত। তাহারা এমন সব রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করিত যাহাদের বিভক্তির কারণ ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কোনো প্রকার সংস্কার পরিকল্পনা বা মতবাদ নহে। কৃষক, ছোট দোকানদার এবং ক্ষুদ্র কর্মচারি যাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ তাহাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করিতে হইত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসরকেও দুইটি বিপ্লবের মাধ্যমে আগাইয়া যাইতে হইয়াছে – একটি স্বাধীনতা, অপরটি সমাজ সংস্কার। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র জাতি কেন স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলিয়াছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকটি আত্মসম্ভ্রমশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকেই এই কারণেই এই নীতির পরিপোষকতা করিতে হইয়াছে। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা বা রাজা কেহই এই কথা উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত ভূমিহীন মিসরবাসী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারও কামনা করে। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধারণা অধিকতর গতি লাভ করে। এই সময় মিসরে শিক্ষা এবং অহমিকা বৃদ্ধি পায় যাহা সভ্য লোকদিগকে নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অসন্তুষ্ট করিয়া তোলে। এই অসন্তোষের কারণ রহিয়াছে। মিসরের জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া যাইতেছিল।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে জনসংখ্যার গতি ক্রমবর্ধমান। কিন্তু যে সকল অভিজাত ভূস্বামী এই ব্যাপারে কিছু করিতে পারে তাহারা ব্যাপারটিকে একবারেই গুরুত্ব প্রদান করিত না। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরীয় কৃষকদের গড় আয় ছিল ৬০ ডলার। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই আয় দ্রুতগতিতে ৩০ ডলারে নামিয়া আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৌর অঞ্চলে সাধারণ বেকারত্বের অভিশাপ নামিয়া আসে।

এই জাতীয় সংকটের মুখে রাজনৈতিক দলসমূহ শুধু স্বাধীনতার কথাই বলিতে থাকে। যে ওয়াফদ্ পার্টি স্বাধীনতার কর্মসূচির মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহারাও মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অভিষিক্ত হয় এবং সংস্কারের কর্মসূচি ব্যতীতই সন্তুষ্ট থাকিয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত তাহাদের ভিতরে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়াই থাকে। রাজার করণীয় হইল একটি রাজনৈতিক দলকে আরেকটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া ক্ষমতা এবং সুযোগ-সুবিধার সিংহভাগ আদায় করা। রাজা ফারুকের পূর্বপুরুষদের ভিতর খেদিব ইসমাইলের মতো অমিতব্যয়ী এবং সাঈদের মতো পেটুক এবং লোভী ছিলেন – যাহাদের সমস্ত দুর্বলতা তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অমিতব্যয়ী, লোভী, নারী লোলুপ, সৌখিন নৌকা বিশেষজ্ঞ, দামী ও দুষ্প্রাপ্য টিকেট এবং নগ্ন ছবি সংগ্রহকারী। যে পৃথিবী প্রলয়ঙ্কারী মহাযুদ্ধ দেখিয়াছে, যে এশিয়া আফ্রিকার দ্রুত রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন দেখিয়াছে সেই পৃথিবীর অধিবাসী হইয়া স্বাভাবিকভাবেই মিসরের শিক্ষিত সমাজ রাজার নিকট হইতে বেশি কিছু আশা করে।

ফ্রি অফিসার্স ক্লাব

সৈন্যবাহিনীতেও একজাতীয় তরুণ মিসরীয় ছিল। কোনো একসময় মিসরীয় সৈন্যবাহিনী সাধারণ লোকের আওতার বাহিরে ছিল। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে এই বাহিনীকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কারণ সমাজ এইদিকে আকৃষ্ট হয় এই জন্য যে, এই স্থানে সুশিক্ষা এবং পদোন্নতির সুযোগ সুবিধা বেশি। এই তরুণ অফিসারদের ভিতর জামাল আবদ আল-নাসের অন্যতম। ডাক বিভাগের একজন কেরানির পুত্র নাসের ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হাই স্কুলে ছাত্র থাকাকালে তিনি স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত বহু মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। তরুণ অফিসার হিসাবে তিনি মিসরীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য বহু অফিসারকে একত্রিত করেন। এই তরুণেরা মিসরের সেই শক্তির উত্তরাধিকারী যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় দীক্ষিত। তাহারা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে পাঠ করিয়াছেন, আরাবী, জগলুল ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ আবদুহুর ভাবধারা পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই অফিসারদের ভিতর অন্তত দুইজন কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন, চারি বা পাঁচজন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত–যাহারা কোনো বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নহে।

ফালুজা অবরোধ

এই কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এসব অফিসার তখন শুধুমাত্র ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ইসরাইল বিরোধী যুদ্ধের কথাই আলোচনা করিত না। স্মরণ করা যাইতে পারে

যে মিসর নেগেভ দখল করিয়াছিল এবং জর্দানের আরব বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য উত্তর দিকে চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতির সময় ইসরাইলিরা সদ্য সংগৃহীত নূতন অস্ত্র ও বিমানের সাহায্যে পাল্টা চাপ প্রদান করে এবং মিসরের সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশকে ফালুজায় অবরোধ করিয়া ফেলে। মিসরও তখন নূতন অস্ত্র লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজার দুর্নীতি এবং লোভের কল্যাণে সংগৃহীত অস্ত্রগুলি খারাপ, পুরাতন এবং অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়।

নাসের এবং তাহার বহু সংখ্যক বন্ধু তখন ফালুজায়। তাহারা তখন ফিলিস্তিনের যুদ্ধের পরিবর্তে সঙ্কটাপন্ন মিসরের কথাই বেশি আলোচনা করে, যাহা তখন নেকড়ের কুক্ষিগত। যুদ্ধে নিহত তাহার এক বন্ধুর শেষ কথা ছিল 'মিসরই আমাদের কাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র'। ফিলিস্তিনের পরাজয়ই তরুণ অফিসারদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল যে তাহাদের প্রথম কাজ হইল মিসরকে দুর্নীতি এবং লোভের গ্রাস হইতে মুক্ত করা। মিসরে ফিরিয়া আসিবার পর নাসের 'সিক্রেট ফ্রি অফিসার্স সোসাইটি' গঠন করেন – যাহার কাজ শুধু আলোচনা নহে বরং কাজ।

ওয়াফ্‌দ্‌ ও বৃটিশ

তরুণ অফিসাররা যখন বিপ্লবের পরিকল্পনা করিতেছিলেন তখন মিসরীয় সরকার কর্মকুশল ওয়াফ্‌দ্‌ নেতা নাহাস পাশার নেতৃত্বে বৃটিশদিগকে সুয়েজ খাল ত্যাগ এবং সুদানকে মিসরের হাতে অর্পণ করিবার জন্য চাপ প্রদানে ব্যস্ত। বৃটিশ চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এত ধীরে অগ্রসর হইতেছিল যে মিসরের চোখে তাহা অগ্রসর না হওয়ারই শামিল। বৃটিশের দাবি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের চুক্তির একটা ধারা অনুযায়ী কুড়ি বৎসর পর্যন্ত সুয়েজের উপর তাহাদের আধিপত্য থাকে। অর্থাৎ মিসরকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সুদানের ব্যাপারে বৃটেনের মতামত হইল এই যে তাহাদের সম্পর্কে কোনো প্রকার সিদ্ধান্তের আগে সুদানবাসীদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে চলিতে থাকে। অবশেষে নাহাস পাশা সম্ভবত ইরানের ডঃ মোসাদ্দেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এককভাবে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে চুক্তি বাতিল এবং ফারুককে সুদানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে খালের পাড়ে এবং অন্যত্র অবস্থানরত বৃটিশ সৈন্যকে হত্যার উস্কানী প্রদান করেন। সুয়েজ খালের মিসরীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের অবস্থার সেদিন অবনতি ঘটে। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বৃটিশ সরকার এই অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে গ্রামে গ্রামে সামরিক আইন জারি করে। এই সময় কায়রোর জনতা উত্তেজিত হইয়া পড়ে এবং তাহারা শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হয়। সরকারি প্ররোচনায় তাহারা পশ্চিমা ব্যবসাকেন্দ্র এবং বসতির উপর হামলা চায়লা। তাহারা থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও দোকানে লুণ্ঠন চালায়- আর অগ্নিসংযোগ করে। এই সময় উত্তেজিত জনতা কোনো প্রকার বাছ-বিচার করে নাই কিন্তু যখন লুণ্ঠন কাজ সমাধা হয় তখন দেখা গেল যে, এই কাজের ফলে প্রায় ১২০০০ মিসরীয় গৃহহারা হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই বৃটিশবিরোধী কার্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওয়াফ্‌দ্‌ পার্টির কার্যক্রম ব্যর্থ হইলে পর নাহাস পাশাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর কয়েক মাস যাবৎ শুধু সরকারই পরিবর্তন হইল- কেহই টিকিয়া থাকিতে পারিল না।

সামরিক অভ্যুত্থান

ইতোমধ্যে ফ্রি অফিসাররা তাহাদের পরিকল্পনা করিতেছিল। ফারুকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি কায়রোর এই ক্লাব বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ প্রদান করেন – প্রায় সমস্ত তরুণ সামরিক কর্মকর্তাগণ এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে জুলাই তরুণ অফিসাররা আঘাত হানেন। যেহেতু তাঁহারা সকলে ছিলেন তরুণ (গড় বয়স ৩৪) ও অজ্ঞাত সেই জন্যে তাঁহারা জনপ্রিয় সম্মানিত এবং বয়জ্যেষ্ঠ অফিসার জেনারেল মোহাম্মদ নাজিবকে নেতা হিসাবে কাজ করিবার জন্য বাছিয়া লন। জেনারেল এই পরিকল্পনার গুরুত্ব একটু দেরিতে উপলব্ধি করিলেও সময়মত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে ২৩শে জুলাই সকাল বেলা নাসের টেলিফোন যোগে নাজিবকে বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে আসিতে বলেন। 'আমরা যদি ব্যর্থ হই,' নাসের নাকি বলিয়াছিলেন, 'তাহা হইলে মনে করিব আপনি আমাদিগকে দমন করিয়াছেন।' আমরা যদি কৃতকার্য হই, আপনি নূতন মিসরের নেতা।' রাত একটা হইতে দুপুর পর্যন্ত সময়ে কোনো বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নাসের রাজধানী দখল করেন। ফারুক বৃটিশ হস্তক্ষেপের আশা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই হয় নাই। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো বৃটিশবিরোধী বা বিদেশী বিরোধী ধ্বনি ছাড়া মিসর হইতে দুর্নীতি ও উৎকোচ দূর করিবার ওয়াদা লইয়া একটি নূতন সরকার ক্ষমতায় আসে।

এই কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কোনো পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা যুবক অফিসারদের ছিল না। তাহারা দুর্নীতি দূর করিবার সংকল্প করে এবং আশা করে, যে কোনোও উপায়ে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বেসামরিক সরকার গঠিত হইবে। তাহাদের মতে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান হইলেন বাদশাহ্, যাহাকে ২৬শে জানুয়ারি তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ফারুক চিরতরে মিসর ত্যাগ করেন। এক বৎসর পর মিসরকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নাসের ও তাঁহার বন্ধুদের নিকট আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, এই বিপ্লবে জনতা উৎসাহজনকভাবে সাড়া দেয় নাই। 'অগ্রবাহিনী ইহার কর্তব্য পালন করিয়াছে।' তাঁহার 'ফিলস্ফী অব দি রেভল্যুশন' গ্রন্থে নাসের বলেন, 'ইহা অত্যাচারের দুর্গের প্রাচীর ধ্বংস করিয়াছে ... এবং ইহা জনতার সংস্থাগুলিকে তাহাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকে।' কিন্তু তাহারা শুধু বিশৃঙ্খলা, মতভেদ ও অলসতাই লক্ষ্য করে। অতঃপর তাহারা নিজেরাই ক্ষমতায় থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দিন দিন বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি

যুবক অফিসারগণ শুধু বৃটিশ-বিরোধী জিগিরের বলে ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। সম্ভবত এইজন্যই তাহারা বৃটিশদের সহিত উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশ একটা সমঝোতায় আসিতে সক্ষম হয়। সুদানের ব্যাপারে বৃটিশগণ সর্বদাই বলিয়া আসে যে সুদানীগণ নিজেরাই তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাছিয়া লইবে। স্বয়ং আধা-সুদানী জেনারেল নজীবের সুযোগ্য সহায়তায় মিসরীয় সরকার সমস্ত সুদানী দলগুলিকে মিসরের ন্যায় একই শিবিরে একত্রিত করিতে সমর্থ হয়। সুদানীগণ সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক হয় কারণ নূতন মিসরীয় সরকার নমনীয় এবং সুদানী জাতীয়তবাদ সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের

১২ই ফেব্রুয়ারি মিসর ও বৃটেন সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে একমত হয়। মিসরের সহিত সুদানের সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার জন্য তিন বৎসরের মধ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। নূতন মিসরীয় সরকারের জন্য এই চুক্তি এক বিরাট কৃতিত্ব। কারণ ইহা দ্বারা গ্রেট বৃটেনের মধ্যে মিসরের জনপ্রিয়তা যেমন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি সুদানী জাতীয়তাবাদীদের গভীর সহযোগিতাও মিসর লাভ করে।

পরবর্তী সমস্যা হইল সুয়েজ খাল এলাকা দখল করা। এখানেও একটি সরল পরিবেশে আলোচনা চলিতে থাকে। অনেকগুলি কারণ শেষ পর্যন্ত বৃটিশদিগকে এই প্রত্যয় প্রদান করে যে সুয়েজ খাল এলাকায় একটি ঘাঁটি রক্ষা করিবার আর কোনো অর্থ নাই। ফিলিস্তিনে তাহাদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে একটি শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি রাখা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তদুপরি হাঙ্গামার ফলে সমগ্র ব্যাপার বৃটিশ জনগণের গোচরীভূত হয়, যাহারা এই ধরনের ব্যাপারে তাহাদের স্বীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইতোমধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষ এখন আর কোনো সমস্যা নহে। উপরন্তু এটম বোমা আবিষ্কারের ফলে সম্ভবত এই ধরনের ঘাঁটি রাখা নিরর্থক। এই ব্যাপারে মার্কিন চাপ কতটুকু সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে গ্রেট বৃটেন খাল এলাকা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। একমাত্র শর্ত রহিল এই যে, তুরস্ক বা অন্য কোনো আরব দেশের উপর কখনও আক্রমণ হইলে তাহাদের জন্য খাল এলাকা পুনরায় দখল করিবার অনুমতি থাকিবে।

সুদান লইয়া ইঙ্গ-মিসরীয় দ্বন্দ্ব এবং সুয়েজ খাল এলাকার আপোস-নিষ্পত্তি হইবার ফলে যুবক অফিসারগণ মিসরের অভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয়। যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে কলুষমুক্ত করা এবং একটি 'খাঁটি' বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরল বিশ্বাসে তাহারা একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আলী মাহেরকে সরকার গঠন করিবার জন্য বাছিয়া লয়। ইনি দুর্নীতিহীন ও প্রগতিশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ইহা সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয় নাই। আমূল পরিবর্তন সাধন করিবার ব্যাপারে বৃদ্ধ লোকজন অতি গোঁড়া। ইহাদের অধিকাংশই যেহেতু জমির মালিকানার ব্যাপারে প্রবল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেইহেতু ইহাদের দ্বারা সামাজিক বিপ্লব আশা করা যায় না। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করিয়া যুবক অফিসারগণ রেভল্যুশনারী কমান্ড কাউন্সিল (Revolutionary Command Council, R. C. C.) গঠন করে এবং জেনারেল নজীবকে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর. সি. সি. সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ হইতে প্রায় ৮০০ বেসামরিক লোক বরখাস্ত করে এবং ১০০ পুরাতন সামরিক অফিসারকে অবসর প্রদান করে। তাহারা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ব্যতীত সমস্ত দল নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

আর. সি. সি. ও সংস্কার

অবাঞ্ছিত লোকজন হইতে সরকারকে মুক্ত করিয়া আর. সি. সি. প্রথমটায় দ্বিধাগ্রস্থভাবে সামাজিক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতরন করে। মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হইল ভূমি সংস্কার। একমাত্র জমিদারগণ ছাড়া প্রায় সকলেই ইহার স্বপক্ষে। অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের মতে সর্বোচ্চ জমির মালিকানা ৫০০ ফেদ্দান বা একরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং ইহার বাড়তি জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। মিসরের চরমপন্থীদলগুলি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা ৫০ হইতে ১০০ ফেদ্দানে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত

মনে করে। আর. সি. সি. ২০০ ফেদ্দানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মিসরে প্রতি একরে জমির ফলন যেখানে উচ্চ, ২০০ ফেদ্দান সেখানে যথেষ্ট, ফলে এই বন্টনের দ্বারা শুধু বড় বড় জমিদারগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাদশাহর বিশাল জমিদারী যেহেতু বাজেয়াফত করা হয় এবং ঐ জমি বণ্টন করা হয় নাই, সেইহেতু সরকার মিসরের সর্ববৃহৎ জমির মালিকে পরিণত হয়।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

নূতন সরকার শত্রুহীন থাকে নাই বরং ইহার বিপ্লবী হইবার সিদ্ধান্তে আরও শত্রুর উদ্ভব হয়। সরকারের শত্রুদিগকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম হইল পুরাতন রাজনীতিবিদগণ, যাহাদিগকে রাজনৈতিক কার্যাবলী হইতে বিরত রাখা হয়। দ্বিতীয় হইল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, যাহাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. অতি ধর্মনিরপেক্ষ ও চরমপন্থী। তৃতীয় হইল কমিউনিস্টগণ যাহাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. চরমপন্থীও নহে, যথেষ্ট আদর্শবাদীও নহে। চতুর্থ হইল ধনী ভূস্বামীগণ যাহাদের নিকট হইতে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভূমি সংস্কার আইনের দ্বারা জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীগুলি অর্থশালী এবং পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যুবক মিসরীয়দের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আর. সি. সি. পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র খর্ব করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করে। বিরোধী দলগুলির কোনো একক কর্মসূচি না থাকিবার ফলে ইহারা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে তাহারা এই একক কর্মসূচি লাভ করে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, জেনারেল নজীবকে নূতন শাসনের নামেমাত্র প্রধান হইবার জন্য আনা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আর. সি. সি-র হাতে, যাহার পুরোধা হইলেন নাসের। কিন্তু জেনারেল নজীব মিসরীয়দের নিকট খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকেই বিপ্লবের প্রকৃত নেতা বলিয়া ধরা হয়। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আর.সি. সি. কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোটের মালিক হইবার চাইতে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আরও ক্ষমতা প্রত্যাশা করেন। নজীব ও আর. সি. সি-র মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির মূল কারণ হইল বয়স। আর. সি. সি-র যুবক অফিসারদের বিশ্বাস, রাজনীতিবিদগণ বৃদ্ধ, দুর্নীতিবাজ ও কল্পনাবিহীন। তবে ৫১ বৎসর বয়স্ক নজীব এই রাজনীতিবিদদের কর্মক্ষম, কল্পনাপূর্ণ যৌবনের অগ্নিমূর্তির কথা স্মরণ করেন। তাঁহার নিজস্ব বয়ঃসীমার এই সকল রাজনীতিবিদদিগকে নজীব সম্মান করেন এবং সম্ভবত এই সকল লোক তাঁহাকে আরও ক্ষমতা দাবি করিতে উৎসাহিত করে। যাহাই হউক, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নজীব আরও ক্ষমতা দাবি করেন, যাহার অর্থ হইল পুরাতন সেই রাজনীতিবিদগণের পুনরায় ক্ষমতায় আগমন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে আর. সি. সি. জেনারেল নজীবের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে। ইহাতে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়, যাহা আর. সি. সি. মোটেই আশা করে নাই। বিরোধী দলগুলি জেনারেলকে ঘিরিয়া জমায়েত হয় এবং তাঁহার স্বপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আর. সি. সি. কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে- সম্ভবত ইহাই তখনকার একমাত্র করণীয় কাজ- এবং জেনারেল নজীবকে পুনর্বহাল করে। সমসাময়িক মিসরের ইতিহাসে পরবর্তী কয়েক মাস দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। জেনারেল নজীব আর. সি. সি. কর্তৃক সম্পাদিত কিছু সংস্কার বিলোপ করিতে অগ্রসর হন এবং জুলাই নাগাদ একটি পুরাদস্তুর বেসামরিক সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

ইতোমধ্যে নজীবকে কোণঠাসা করিয়া আর. সি. সি-র ক্ষমতা পুনর্বহাল করিবার জন্য

নাসের পর্দার অন্তরালে কাজ করিয়া যান। এপ্রিল নাগাদ আর. সি. সি-র. সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, সেনাবাহিনী ধর্মঘট করে, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং আর. সি. সি. জেনারেল নজীবকে প্রেসিডেন্টের পদে 'উন্নীত' করে ও নাসেরকে মিসরের প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্য নাসেরের জীবন নাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। ইহার ফলে আর. সি. সি. ভ্রাতৃসংঘকে বেআইনী ঘোষণা করা, জেনারেল নজীবকে গৃহবন্দী করা, এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিস্ট ও ভ্রাতৃসংঘের সদস্যমুক্ত করার প্রয়োজনীয় অজুহাত লাভ করে। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ নাগাদ নাসের বিপ্লবের প্রকৃত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দেশকে তিনি একটি সংবিধান প্রদানের ওয়াদা করেন।

নাসের ও আরব জাহান

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের একটি কঠিন কর্মসূচিতে জড়িত যে কোনো জাতি বৈদেশিক ব্যাপারে কিছুটা একাকিত্ব ও স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়োজন বোধ করে, যাহাতে সে নিজের দেশে শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে ও বিপ্লবকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। মধ্যপ্রাচ্যে আরবিভাষী দেশগুলির পক্ষে কোনো বিশেষ দেশের উপর তাহাদের চিন্তা ও কর্মধারা কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তুরস্কের পক্ষে ইহার জাতীয়তাবাদকে শুধুমাত্র তুর্কিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সহজতর হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতে তাহাদের ভাষা পৃথক। তাহারা অবশ্য মুসলমান, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা তাহারা সরকারিভাবে প্রতিবেশীদের সহিত ধর্মীয় একাত্মতা ছিন্ন করে এবং ফলে নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া তাহারা অধিকতর মাথা ঘামাইতে সক্ষম হয়। এমনকি পারস্যবাসীদের পক্ষেও প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিজেদের জাতীয়তাবাদের তেজস্বিতা রক্ষা করা সহজ হয়। ভাষা ও ধর্মীয় দিক দিয়া তাহারা তাহাদের পশ্চিমা প্রতিবেশী হইতে ইতোমধ্যেই পৃথক, এবং আফগানিস্তানের ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপ করে না, যদিও ফার্সি সেখানকার সরকারি ভাষা।

মিসরের জন্য ইহা সহজতর নহে। স্বাধীন অফিসারগণ মিসরকে মুক্ত করিবার জন্য বিপ্লবের পরিকল্পনা করে– ইহা যেরূপ সত্য অপরদিকে ইহাও স্মরণ রখিতে হইবে যে 'আরব স্বার্থ' প্রতিরক্ষার জন্য ফিলিস্তিনে যুদ্ধরত অবস্থায় পরিকল্পনার কিয়দংশ প্রণয়ন করা হয়। ভাষা ও ধর্মীয় বন্ধনে তাহারা ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির সহিত আবদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই কথা সত্য যে, মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণ নিজদিগকে 'আরব' বলিয়া মনে করিত না; কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। মোটের উপর রাষ্ট্রসমূহের লীগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গ্রেট বৃটেনই নাহাস পাশাকে ব্যবহার করে, কায়রো লীগের সদর দফতর হয় এবং মিসরীয়গণ ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

তবে, শুধু জাতীয়তাবাদের জন্য মিসর আরবিভাষী দেশসমূহের কার্যকলাপে জড়িত হয় নাই। নাসেরের নীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেরাউনের সময় হইতে সিনাই ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের মধ্য দিয়া মিসর বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে। ক্রিসেন্টের ভাগ্য অনেকাংশে মিসরের ভাগ্যও নির্ধারণ করে। এই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল সেই

ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিন্ন করে এবং তাই ইহাকে মিসরের হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মধ্যমপন্থী জেনারেল নজীবের বক্তব্য হইল দক্ষিণ নেগেভের মধ্য দিয়া মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের সংযোগ থাকিলে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভে তাঁহার কোনো আপত্তি নাই।

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও আরবিভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে নাসেরের জনপ্রিয়তার ফলেও মিসর এই সকল দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে। এই সকল ব্যাপারে নিরাসক্ত থাকিতে চাহিলেও নাসের তাহা পারেন নাই। ফিলিস্তিনে পরাজয়ের পর মিসরই প্রথম দেশ, যে নিজের আত্মশুদ্ধি করিয়া নিজ পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। নাসের এই বিপ্লবের পুরোধা এবং আরবিভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যমণি। মিসর একটি আদর্শ দেশ এবং নাসের সেই দেশের আদর্শ নেতায় পরিণত হন।

তাঁহার 'ফিলসফী অফ দি রেভল্যুশন' (Philosophy of the Revolution) গ্রন্থে নাসের মিসরীয় বিপ্লবের ভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম হইল আরব ভাগ, যাহা 'আমরা যেরূপ ইহার অংশ বিশেষ, ইহাও আমাদের অংশ বিশেষ...।' দ্বিতীয় হইল 'আফ্রিকা, নিয়তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যাহার এলাকায় পড়িয়াছি...।' এবং যে সংগ্রামে ইহা লিপ্ত 'উহাতে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা জড়িত হই।' তৃতীয় হইল ইসলামী ভাগ 'যাহার সহিত আমাদের সংযোগ শুধু ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা নহে, বরং ইতিহাসগতভাবেও আমরা সংযুক্ত।' নাসেরই সম্ভবত প্রথম মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি প্যান-আরববাদ ও প্যান-ইসলামবাদ উভয়ের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন, যাহা মূলত পরস্পরবিরোধী। প্যান-আরবদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্ম বা অন্য কোনো ধর্মের স্থান নাই। অপরদিকে প্যান-ইসলামবাদ ইসলামের মধ্যে আরবিবাদ স্বীকার করে না। আরব বিশ্বে বেশ শক্তিশালী প্যান-ইসলামী মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ এবং ধর্মনিরপেক্ষ প্যান-আরবিদের মধ্যে বিদ্যমান বৈরীভাবের ফলে এই ধরনের সংমিশ্রণ কার্যকর কিনা তাহা বিবেচনা করার সময় এখনও আসে নাই।

নাসের আবার প্রথম মিসরীয় নেতা যিনি মিসরের ভাগ্য আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সংযুক্ত করেন। ইহা একটি অলিখিত পন্থা, ইতিহাসে যাহার কোনো নজীর নাই। নাসেরের 'বিভক্তিকরণের' মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি 'মিসরীয় ভাগকেই বাদ দিয়াছেন। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফিলিস্তিন যুদ্ধে নাসের ও তাঁহার বন্ধুগণ ফিলিস্তিনে যুদ্ধ করেন কিন্তু '(তাঁহাদের) স্বপ্ন ছিল মিসর।' ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নাসেরের ন্যায় প্যান-আরবিদের চিন্তাধারায় ফিলিস্তিন, মিসর ও অন্যান্য আরব দেশসমূহ একটি 'আরব জাতিতে' পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও, 'দি ফিলসফী অব দি রেভল্যুশন'-এর মতে এবং পরবর্তীতে নাসেরের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমস্ত ভাগের কেন্দ্রস্থল কায়রো। আফ্রিকাবাসীগণ ও অনারব মুসলমানগণ সম্ভবত এইরূপ একটি আদর্শে তেমন মনোযোগ দেয় নাই; কিন্তু আপামর আরবিভাষী লোকদের মধ্যে এই আদর্শ হারাইয়া যায় নাই। ইরাকি ও সিরীয়গণ বিশেষত উন্মত্ত হইয়া উঠে, কারণ তাহারা নিজেদের রাজধানী, বাগদাদ বা দামেস্ককে প্যান-আরববাদ অথবা প্যান-ইসলামবাদের কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিবেচনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণের ঘটনাবলী কিয়দংশে মিসরের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম ঘটনা সম্ভবত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের বাগদাদ চুক্তি

সম্পাদন। এই চুক্তিতে ইরাকের সদস্য হওয়াটাকে নাসেরের পক্ষে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাগদাদ চুক্তিকে নাসের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নবরূপায়ণ বলিয়া মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাককে অস্ত্র প্রদানের দ্বারা মিসর শঙ্কিত হয়। দুই দেশের মধ্যে শুধু জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নহে, বরং ইরাক ইহার রাজতন্ত্র, জমিদারী আভিজাত্য ও গোঁড়ামি লইয়া নাসেরের বিরোধিতার কেন্দ্রস্থলও হইয়া উঠিতে পারে, অতএব এই চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার প্রচারণার সর্বশক্তি ব্যয় করেন।

তদুপরি, মিসরীয় সীমান্তে ইসরাইলের বেশ কিছু আক্রমণের দ্বারা মিসরীয় বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং ইহা নাসেরের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির আগ্রহ প্রবলতর করিয়া তোলে। তিনি পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে নারাজ এবং তাহা আংশিকভাবে ইসরাইলের জন্য, এবং আংশিকভাবে মিসরের নিরপেক্ষতা ও চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। অন্যান্য আরব নেতৃবৃন্দের ন্যায় নাসের ইসরাইলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হন এবং মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা উচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ হইতে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খাইয়া মিসর শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চেকোস্লোভাকিয়া হইতে অস্ত্র লাভের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহের উপর পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ হয় এবং ইহা অত্র অঞ্চলের দেশগুলির জন্য সোভিয়েত জোট হইতে অস্ত্র ক্রয়ের পথ সুগম করে।

আসওয়ান বাঁধ

এই সকল পরিক্রমা সত্ত্বেও রেভল্যুশনারি কমান্ড কাউন্সিলের (Revolutionary Command Council) প্রধান কর্মসূচির মধ্যে থাকে অভ্যন্তরীণ সংস্কার। মিসরের প্রধান সমস্যা নির্ণয় করা খুবই সহজ, অবশ্য ইহার সমাধান যদিও তত সহজ নহে। মিসরের প্রয়োজন বুভুক্ষু জনতার জন্য আরও খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও জমি এবং বাড়তি জমিতে জল সেচের জন্য আরও পানি। উচ্চ মিসরের উঁচু আসওয়ান বাঁধকে আরও উঁচু করিলে আরও পানি পাওয়া যায়, কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণ করিতে কোটি কোটি ডলারের প্রয়োজন। এই অর্থের জন্য মিসর যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র গ্রেট বৃটেন ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় এই অর্থ প্রদানের আয়োজন করে।

তবে মিসর এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করে, সম্ভবত এই আশায় যে সে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান শীতল যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সুবিধা আদায় করিবে। নাসের দাবি করেন যে, 'কোনো শর্ত ছাড়াই' সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁহাকে আরও অধিক অর্থ ঋণ দিতে উচ্ছুক, অবশ্য এই দাবি রুশগণ অস্বীকার করে। নাসের চীনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের' বিরুদ্ধে দীর্ঘ বাদানুবাদে লিপ্ত হন, যাহাতে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন। তদুপরি ইসরাইলে গোপন আক্রমণ চালাইবার জন্য তিনি বিশেষ গেরিলা দলের (ফেদাইয়ান) প্রশিক্ষণ আরম্ভ করেন। ব্যাপারটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত গড়াইয়া চলে। অতঃপর নাসের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস সমগ্র পরিকল্পনাটি হঠাৎ বাতিল করিয়া দেন। এই বাতিল করিবার জন্য ডালেস মিসরীয় অর্থনৈতিক অযোগ্যতাকে দায়ী করেন, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় প্রতীয়মান হয় যে

তিনি নাসেরকে অপমানিত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার এক সপ্তাহ পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই, নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

সুয়েজের জাতীয়করণ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুয়েজ খাল কোম্পানি সুয়েজ খাল পরিচালনা করে। ইহা মিসর ও ফ্রান্সে তালিকাভুক্ত (Registered) এবং মিসর ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিদ্যমান কোনো রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির সহিত জড়িত নহে। এই খাল পরিচালনার জন্য কোম্পানি ৯৯ বৎসরের অনুমতিপত্র লাভ করে এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ইহা মিসরীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরের কথা। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি অনুযায়ী এই খালকে মিসরের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মিসরের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আসওয়ানের ঋণ বাতিল করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই নাসের খালটি জাতীয়করণ করেন। কিন্তু নাসেরের নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার কোম্পানিকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাল পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রদান করিত কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নেতিবাচক এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লালিত প্রাচ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের মধ্যে বিদ্যমান মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইঙ্গ-ইরানি তৈল কোম্পানি জাতীয়করণ করা হইলে পাশ্চাত্য জগৎ পারস্যের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করে, মিসরের প্রতিও এখন অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করে। দুইমুখী পেরেকের ন্যায় এই মনোভাব প্রাচ্যের যোগ্যতা ও সাধুতা উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। খাল পরিচালনার ব্যাপারে মিসরীয়দের যান্ত্রিক যোগ্যতা ও জ্ঞান উভয়ের অভাব রহিয়াছে বলিয়া বলা হয়। তদুপরি, ইউরোপীয়গণ মনে করে যে খাল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসরীয়দিগকে বিশ্বাস করা যায় না। 'ইউরোপের প্রয়োজনীয় তৈলের অর্ধেকেরও অধিক তৈল খালের মধ্য দিয়া যায়, ফলে "ইউরোপের বায়ুনলের উপর মিসরের বৃদ্ধাঙ্গুলী থাকিবে' বিধায় বিভিন্ন জাতির এই কোম্পানিতে মিসর দায়িত্বশীলভাবে কাজ করিতে পারে না বলিয় মন্তব্য করা হয়।

মিসরকে নিরস্ত্র করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে। তাহারা মিসরের সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াফত করে, তাহাদের রিজার্ভবাহিনী তলব করে, নৌবাহিনীকে ভূমধ্যসাগরে ডাকিয়া আনে এবং সাইপ্রাসে অবস্থিত তাহাদের ঘাঁটির স্থল ও বিমান বাহিনী শক্তিশালী করে। খাল কোম্পানির কার্যে নিয়োজিত তাহাদের পাইলটদিগকে তাহারা ফিরাইয়া লইয়া যায় এবং অন্যান্য অ-মিসরীয় পাইলটদিগকেও পদত্যাগ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। খাল ব্যবহারকারী ১৮টি দেশের একটি সম্মেলন তাহারা আহ্বান করে এবং খাল পরিচালনার ব্যাপারে একটি "ব্যবহারকারীদের" কোম্পানি দ্বারা মিসরকে "সহযোগিতা" করিবার প্রস্তাব করে। জাতীয়করণকৃত কোম্পানিকে বৃটিশ ও ফরাসি জাহাজসমূহ নিয়মিত ভাড়া প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শদাতাগণ এই ব্যাপারে বিভক্ত হইয়া যায়। মার্কিনীগণ এই সকল সভা ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বান্তকরণে নহে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এই বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা

পরিষদে উত্থাপন করা হয়, কিন্তু পারস্যের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া কম লোকেই বিশ্বাস করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ খালের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ছয়টি নীতি ঘোষণা করে, যাহা বিজড়িত সকল দল কর্তৃক গৃহীত হয়।

ইসরাইলের মিসর আক্রমণ

আসলে ইঙ্গ-ফরাসি কর্তৃক জাতিসংঘের সুপারিশকৃত নীতি গ্রহণের ব্যাপারটি নিছক একটি ধাপ্পাবাজী। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ফ্রান্স ও বৃটেনের জ্ঞাতসারে ইসরাইল সিনাই আক্রমণ করে। পরদিন নাগাদ ইসরাইল ৭৫ মাইল অগ্রসর হয়। একই দিন ফ্রান্স ও বৃটেন উভয় পক্ষের নিকট যুদ্ধ বন্ধ করিয়া স্ব স্ব বাহিনীকে খালের দশ মাইল দূরে সরাইয়া লইবার জন্য একটি চরমপত্র প্রেরণ করে। নাসের ইহা মান্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ইঙ্গ-ফরাসি বিমান ও নৌবাহিনী মিসর আক্রমণ করে ও পোর্ট সাঈদ দখল করে। ইঙ্গ-ফরাসি-ইসরাইলী আঁতাত অতি উত্তম পরকল্পনা গ্রহণ করে এবং অতি দ্রুত খাল দখল করিয়া নাসেরের ক্ষমতাচ্যুতির আশা করে।

সোভিয়েত রাশিয়া হইতে তাহারা আপত্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু আক্রমণকারী বাহিনীসমূহ আশ্চর্য হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কঠোর নিন্দা লাভ করিয়া। খুব সম্ভবত এই আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয় মার্কিনীদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে এবং আশা করা হয় যে, কোনো প্রার্থী স্থির মস্তিষ্কে ৫০ লক্ষ ইহুদির ভোট হারাইবার জন্য ইসরাইলকে দোষী করিবে না। পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, বোধ হয় তাঁহার রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ইসরাইল ও ইহার দোসরদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তির মিলনকে হেলা করা যায় না। ডিসেম্বর নাগাদ ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীদ্বয় মিসর ত্যাগ করে এবং ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ নাগাদ ইসরাইলি সৈন্যগণ সিনাই, গাজা অঞ্চল ও তিরান প্রণালী ত্যাগ করে। ইসরাইলি-মিসরীয় সীমান্তের উভয় পার্শ্ব এবং তিরান প্রণালীর প্রবেশ দ্বার পাহারা দিবার জন্য একটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইসরাইল জাতিসংঘ বাহিনীকে ইহার মাটিতে পদার্পণে আপত্তি জ্ঞাপন করে কিন্তু মিসর কোনো আপত্তি করে নাই।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল নাগাদ সুয়েজ খালের পথ বন্ধ করিবার জন্য মিসর যে সকল জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল ঐগুলি পরিষ্কার করা হয়। মিসরীয়গণ অতি দক্ষতার সহিত খাল পরিচালনা করে এবং বস্তুত দ্বিমুখী জাহাজ চলাচলের জন্য ইহাকে প্রশস্ত করিবার বন্দোবস্ত করে। সাঈদ বন্দরের ধ্বংসলীলা, সিনাইয়ে পরাজয় এবং খাল হইতে হৃত রাজস্বের মাধ্যমে মিসর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ফল লাভের দ্বারা এই ক্ষতি 'পরিশোধ' হয়। আরবগণ বিমোহিত হয় যে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সমগ্র মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রভু ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন উভয়কে মোকাবিলা করিয়া নাসের জয়যুক্ত হন। তাঁহাকে সত্যিকারের আরব জাতীয়তাবাদের নেতা এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হইতে আরব জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়
আরব জাহানে একতা ও বিভিন্নতা

আরব ঐক্যের রহস্য

আরবিভাষী জনগণ অনন্য অস্তিত্বের খোঁজে লিপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে তাহারা একতার বিষয়ে আলোচনা চালায়, অথচ পূর্ববত পৃথকই থাকিয়া যায়; তাহারা একটি 'আরব জাতির' কথা বলে, অথচ এক ডজন ভিন্ন জাতির ন্যায় কাজ করে। তাহাদের একমাত্র অভিন্ন বিষয় হইল ভাষা ও ধর্ম। এসব পরিচয় ইংরেজিভাষী লোকজনকে একত্রিত করে নাই, বা স্পেনিশভাষী লোকদের মধ্যে এক জাতি হিসাবে নিজদিগকে পরিচয় দিবার মতো আগ্রহের জন্ম নেয় নাই। বস্তুত মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী দেশগুলির চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে সাদৃশ্যতা অনেক বেশি, অথচ শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী দেশগুলিই এক জাতিত্বের কথা বলে।

আরবিভাষী দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলির একটি হইল সরকারের স্বরূপ। এখানে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কত্ব, আধা-একনায়কত্ব এবং সর্বশ্রেণী হইতে পৃথক পারস্য উপসাগরের শেখতন্ত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষার মান এবং আধুনিক বিশ্বের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপীয় দোষ ও গুণাবলীর দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধ লেবানন ও মিসরের এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীর অবস্থায় বসবাসকারী সৌদি আরব ও ইয়েমেনের চাইতে ফ্রান্স ও ইটালির সহিত অধিক ভাবের মিল পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সৌদি আরব, কুয়েত ও ইরাকের ন্যায় 'বিত্তশালী' দেশগুলি মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য 'বিত্তহীন' দেশগুলিকে কেন তাহাদের সম্পদের ভাগ দিবে তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। এইসব কারণের সহিত হবু 'সংযুক্ত আরব জাতির' নেতৃত্ব লইয়া মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও শামিল করা যাইতে পারে।

এই ঐক্যের ভাবধারা সাধারণ লোকদের মধ্যে কতদূর গভীর তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর, তবে প্রশ্নাতীতভাবে শিক্ষিত সমাজ ইহা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত। ফলে প্রত্যেক আরবিভাষী দেশের ইতিহাস পৃথকভাবে বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুইটি বিষয়, একটি নেতিবাচক ও অপরটি ইতিবাচক, আরব দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা জীবিত রাখে।

নেতিবাচক বিষয় ইসরাইল। ইহার প্রতিষ্ঠা সমস্ত আরবিভাষী দেশসমূহকে রাগান্বিত করে, ইহার উপস্থিতি তাহাদিগকে হতাশ করে, ইহার বাস্তব ও কাল্পনিক আগ্রাসনী নীতি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্তু এই রাগ, হতাশা ও ভীতি আরবদিগকে মৌখিক ঐক্যের চাইতে অধিক কিছু দান করে নাই। প্রায়ই অভিন্ন শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও ভীতির দরুন বিভিন্ন দেশ একত্রিত হয়, যদিও তাহারা তাহাদের মতবাদ, সরকারের স্বরূপ ও নীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ব্যাপারে হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলন

একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমস্ত আরবদের ভীতি ও ঘৃণা থাকিতে পারে, কিন্তু এই ধরনের মনোভাব তাহাদিগকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে একত্রিত করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার দ্বারা যে কেউ নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে ইসরাইলের ব্যাপারে তাহাদের ঘৃণা ও ভীতি আরব দেশগুলিকে একে অপরের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কোনো কোনো মতভেদের ন্যায় গভীর নহে।

আরব ঐক্যের ইতিবাচক বিষয় হইল জামাল আবদ আল-নাসেরের ন্যায় জনপ্রিয় ও করিৎকর্মা নেতার উদয়। সালাহ্ আল-দ্বীন কর্তৃক ক্রুসেডারদিগকে (খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা) পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিবার পর ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের জনগণ সম্ভবত তাঁহার চাইতে অধিক জনপ্রিয় বা সত্যিকারের ক্ষমতাশালী নেতা লাভ করে নাই। ইয়েমেন হইতে মরক্কো পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক আরব বাজারে নাসেরের ছবি দেখা যায়। তিনি বৃটিশ সৈন্যদিগকে সুয়েজ ত্যাগের বন্দোবস্ত করেন, তিনি একজন দুর্নীতিপরায়ণ বাদশাহ্র কবল হইতে মিসরকে মুক্ত করেন; তিনি সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসি ইসরাইলি যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান; তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মান লাভ করেন এবং তিনিই ছিলেন আরব ঐক্যের আশাভরসা। এত কিছু সত্ত্বেও নাসের আরবদের ঐক্য সাধনে ব্যর্থ হন, কারণ তিনিও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলির উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হন নাই।

সিরিয়া ও আরব ঐক্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিকি শতাব্দীর ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবিভাষী দেশসমূহের ইতিহাস আংশিকভাবে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিদ্যমান স্নায়ুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ও নাসেরের নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যেক দেশের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। আরব ঐক্যের আগ্রহ এবং তাহা লাভে অসুবিধার ব্যাপারে সিরিয়া একটি অতি উত্তম উদাহরণ। সিরিয়া যথার্থভাবে নিজেকে আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদের আবাসস্থল হিসাবে দাবি করিতে পারে। ওসমানীয় 'সিরিয়ার' চারিটি স্বাধীন দেশে বিভক্তি (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইল) এবং তন্মধ্যে একটি বিজাতীয় সত্তা খাঁটি সিরীয় জাতীয়তাবাদীগণ কখনও স্বীকার করে নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও,সিরিয়াবাসীগণ কখনও এক সুরে কথা বলিতে পারে নাই, কারণ তাহারা ধর্মীয়, জাতিগত ও আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত। ৮৫ শতাংশ মুসলমানগণ সুন্নি, শীয়া, আলাভি, দ্রুজেস, ইসমাইলিয়া ও ইয়াজিদী শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বল্প সংখ্যক খ্রিস্টানগণও এক ডজন নামে বিভক্ত। প্রায় ১০ শতাংশ লোক আরবিভাষী নহে, যথা – কুর্দ, তুর্কমান ও কারকাসিয়ান। আরেক ১০ শতাংশ লোক বেদুঈন, যাহারা তাহাদের সংখ্যার চাইতেও অধিক বিভক্তি সৃষ্টি করে। কখনও কখনও দামেস্ক, হোমস, হ্যামা ও আলেপ্পো এই চারিটি নগরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হয়।

কোনো একটি বিশেষ সপ্তাহে একজন সিরিয়াবাসী সুন্নি হিসাবে অবশিষ্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; মুসলমান হিসাবে অ-মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; একজন প্যান-আরব ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিসাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; একজন দামেস্কবাসী হিসাবে সিরিয়ার বাকি শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; এবং একজন সিরীয় হিসাবে অন্যান্য আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। কিছুসংখ্যক সিরিয়াবাসী কোনোক্রমে এইসব বাধাবিপত্তির উর্ধ্বে উঠিতে পারিলেও তাহাদের স্বাতন্ত্র্য তাহাদের

সহযোগিতায় বাধা প্রদান করিবে। সিরিয়া আরব জাহানের প্রতিকৃতি, যে সিরিয়া শাসন করিতে পারে সে আরবদের একতাও আনয়ন করিতে পারে।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতার দুই যুগ সময়ের মধ্যে সিরিয়ায় প্রায় দশটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং সমসংখ্যক সংবিধান রচিত হয়। প্রত্যেক সরকার ইহার পূর্ববর্তী সরকারের কার্যাবলী রহিত করে। ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত ফিলিস্তিন যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পর পর তিনটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। কর্ণেল আদিব শিশাকলি কর্তৃক পরিচালিত শেষের অভ্যুত্থান বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। তাহাদের দ্বারা একটি সংবিধান রচিত হয় এবং সুদূরপ্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বলিত একটি জনহিতকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভূস্বামী ও গোঁড়া লোকদের বিরোধিতার দরুন শিশাকলি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটান, পার্লামেন্ট বন্ধ করিয়া দেন এবং রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একটি নূতন সংবিধান রচনা করেন, তাঁহার নিজস্ব আরব মুক্তি দল (Arab Liberation Party) গঠন করেন এবং নিজেকে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। অবশ্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে সমস্ত দলসমূহের একটি কোয়ালিশন দ্বারা শিশাকলি বহিষ্কৃত হন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানের পর অনুষ্ঠিত তুলনামূলকভাবে স্বাধীন নির্বাচনে বা'থ (পুনরুত্থান) পার্টি ১৫টি আসন লাভ করে। ১৪২টি আসন বিশিষ্ট পার্লামেন্টে ইহা খুব বেশি কিছু নহে, কিন্তু এই দল সিরিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে তাহা উল্লেখযোগ্য। প্যান-আরব ও সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ দুইটি দলের সংমিশ্রণে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে বা'থ পার্টির জন্ম হয়। ইহা শিল্প জাতীয়করণ, ভূমি বন্টন ও ব্যাপক সমাজ সংস্কারের উপর জোর দেয়। এই দলের নেতৃত্ব দান করেন মাইকেল আফলাক নামে একজন খ্রিস্টান এবং সালাহ্ আল বিতার নামক একজন মুসলমান। খাঁটি প্যান-আরব হিসাবে তাহারা 'একটি স্থায়ী উদ্দেশ্যপূর্ণ এক আরব জাতিতে' বিশ্বাস করে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বা'থপন্থীগণ প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং লেবানন, জর্দান ও ইরাকে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠন, মতবাদ ও প্রভাবের দিক হইতে সিরিয়ায় বা'থ-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইল কমিউনিস্ট পার্টি।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (The United Arab Republic)

কর্নেল শিশাকলিকে বহিষ্কার করিয়া একটি বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরও সিরিয়ার সমস্যার সমাধান হয় নাই। বামপন্থী দলগুলি, বা'থ ও কমিউনিস্ট উভয়েই রক্ষণশীল ও মধ্যমপন্থী রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক স্থিতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী রাজনীবিদগণ নাসেরের প্রভাবে আসেন এবং আশা করেন যে তিনি হয়তো তাহাদিগকে বামপন্থী আধিপত্য হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। বামপন্থী শিবিরেই মতবরোধ দেখা দেয়, কমিউনিস্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একাত্মতা চায়, কিন্তু বা'থপন্থীগণ স্বাধীন কর্মপন্থায় বিশ্বাস করে। কমিউনিস্টগণ সেনাবাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সিরীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Chief of Staff) জেনারেল আফিফ বিজরীকে সোভিয়েত সমর্থক দলে আনয়ন করে। কমিউনিস্টগণ যতই শক্তিশালী হয় ততই বা'থপন্থীগণ মিসরের সহিত সংযুক্ত হইবার বিষয় চিন্তা করিতে থাকে যাহা সিরিয়াকে কমিউনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিবে এবং সমস্ত আরবদের ঐক্যের দিকে এক ধাপ আগাইয়া দিবে।

প্রথমে বা'থপন্থীগণ নাসেরকে একজন সামরিক একনায়ক বলিয়া বিবেচনা করিত এবং মিসরে রেভল্যুশনারী কমান্ড কাউন্সিলকে মতবাদবিহীন একটি দল বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু সুয়েজ কোম্পানি জাতীয়করণ ও সিনাই যুদ্ধের পর নাসের নিজেকে নূতন ভাবধারা লইয়া পুনঃপ্রকাশ করেন। আর. সি. সি'র শ্লোগান - শৃঙ্খলা, একতা, কর্ম, অতঃপর গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সমবায় সমিতিতে পরিবর্তিত হয়। নাসের সমস্ত বিদেশী শিল্প ও সম্পত্তি 'মিসরীয়' করেন এবং তৎসঙ্গে অনেক মিসরীয় মালিকানাধীন ব্যক্তিগত শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। এইসব কার্যাবলীর দ্বারা তিনি বা'থপন্থীদের চোখে অতি প্রিয় হইয়া উঠেন। তাহারা নাসেরের দক্ষতার মধ্যে মতবাদ জাতীয় বিস্তৃতি যোগ করিতে চায় এবং সমস্ত আরব জাহানের ঐক্য সাধন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিবার ব্যাপারে তাঁহার জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা ব্যবহার করিতে চায়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে একটি কমিউনিস্ট সামরিক বিপ্লবে ভীত বা'থপন্থীগণ কায়রো গমন করিয়া সংযুক্তির আবেদন জানায়। অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব রাষ্ট্রবর্গের সংযুক্তির ব্যাপারে হতাশ হইয়া এই দুই দেশ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে - তাহা হইল একটি সম্পূর্ণ এককেন্দ্রিক ঐক্য। এই ঐক্যকে সমস্ত আরবদের ঐক্যের পথে একটি পদক্ষেপ বলিয়া অভিনন্দন জানানো হয়। ইউ. এ. আর. (U. A. R.)-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাসের সমস্ত আরবদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। পাছে অতিক্রান্ত হইয়া যায় এই ভয়ে জর্দান ও ইরাকের হাশেমীয় বাদশাহগণ একটি ফেডারেল ইউনিয়নের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু ইহা এমনকি ঐ দেশের নাগরিকদের নিকটও গ্রহণযোগ হয় নাই। ইউ. এ. আর. আরবদের ভবিষ্যৎ আশার স্থলে পরিণত হয়। কিন্তু এই আশা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

লেবানন ও আরব ঐক্য

স্মরণ করা যাইতে পারে যে লেবাননের লোকসংখ্যা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অসমান বিভক্তির ফলে ইহাকে আরব জাহানে একটি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ফেলে। মেরোনাইটগণ সাধারণত ইউরোপীয় সমর্থক, আবার মুসলমানগণ অন্যান্য আরব দেশসমূহের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কামনাকারী। গোঁড়া ও অন্যান্য খ্রিস্টানগণ আরববাদের পক্ষে মত প্রকাশ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও খ্রিষ্টান সংখ্যালঘুগণ একটি সংযুক্ত আরব মুসলিম দেশে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করে। প্রথমে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এবং সম্পূর্ণভাবে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে লেবানন স্বাধীনতা লাভ করিলে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট বিশর আল-খুরী একটি জাতীয় চুক্তির প্রস্তাব করেন। কেরানি হইতে ডিরেক্টর জেনারেল পর্যন্ত সমস্ত সরকারি পদসমূহ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারীর উপর ভিত্তি করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট হারে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করা হয়। চেম্বার অব ডিপুটিদের (Chamber of Deputies) আসনের সংখ্যা উঠানামা করিলেও সর্বদা ১১ গুণিতকে থাকে– অর্থাৎ ছয়জন খ্রিস্টান ও পাঁচজন মুসলমানের হার।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রমের পর এই অলিখিত জাতীয় চুক্তি হাল্কা হইয়া উঠে। মুসলমানগণ নিজদিগকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে' পরিণত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করে এবং একটি নূতন আদমশুমারীর দাবি জানায়, যাহাতে তাহারা নিশ্চিত হয় যে, লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রকাশ পাইবে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নাসের

একজন আরব জননায়ক হইয়া উঠিলে লেবাননের মুসলমানগণ তাঁহার অনুসারী হিসাবে পরিচয় দেয়। অপরদিকে মেরানাইটগণ আরও ইউরোপীয় সমর্থক হইয়া উঠে। মুসলমানগণ এবং কিছুসংখ্যক খ্রিস্টান লেবাননের প্রেসিডেন্ট চেমনকে অ-মেরোনাইটদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইউ. এ. আর-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাসের দামেস্ক সফরে আসিলে লক্ষ লক্ষ লেবাননী তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় গমন করে এবং এই ইউনিয়নে লেবাননের যোগদানের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে। এই ঘটনার সহিত চেমন সরকারের সাধারণ অসন্তোষ এবং চেমন কর্তৃক সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আরেক মেয়াদ ক্ষমতায় থাকিবার গুজব যুক্ত হওয়ায় মুসলমানগণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীগণ মিসর হইতে সামরিক সরবরাহ লাভ করে বলিয়া লেবাননী সরকার অভিযোগ করে এবং এই বিষয়টিকে আরব লীগে উত্থাপন করে। লীগ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লেবানন বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের পর্যবেক্ষক দল এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মের মাঝামাঝিতে লেবাননে বস্তুত গৃহযুদ্ধই আরম্ভ হইয়া যায়। অবশ্য তাহা খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে নহে। এই ক্ষেত্রে মেরোনাইট ধর্মীয় নেতারা চেমনের নীতির বিরুদ্ধে যান এবং আশংকা প্রকাশ করেন যে চেমনের নীতি আরব জাহানে সমস্ত খ্রিস্টানদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিবে।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই ইরাকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সে দেশে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা নাসের সমর্থক বিদ্রোহ বলিয়া সুনাম অর্জন করায় চেমন শঙ্কিত হইয়া উঠেন, পাছে লেবাননেও অনুরূপ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং তাই আইসেনহওয়ার মতবাদ (Eisenhower Doctrine) কার্যকরী করিবার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে অনুমোদিত এই বিতর্কিত মতবাদের উদ্দেশ্য হইল বহিরাক্রমণ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে সাহায্য করা। প্রেসিডেন্ট আইসেনহওয়ার এই আবেদনে সাড়া দেন। অতঃপর লেবাননে মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে।

ইরাকি বিপ্লব

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ইরাক সরকার ছিল যুবক বাদশাহ্ ফয়সালের নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক ভূস্বামী, গোত্রীয় শেখ, সামরিক অফিসার ও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের হাতে। তৈল সেলামীর মোটা অংক লাভ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের দারিদ্র্য ছিল হৃদয়বিদারক। পারস্যের তৈল শিল্প জাতীয়করণের ফলে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানি ইরাকি সরকারের সহিত মুনাফার ৫০-৫০ শেয়ারের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এই অংকের তেমন কিছু জনগণের নিকট যায় নাই। বিভিন্ন বেসরকারি প্রকল্পে তৈলের আয় ব্যবহার করিবার জন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয় কিন্তু এইসব প্রকল্পের অধিকাংশই ছিল ভূস্বামীদের উপকারার্থে।

মিসরের ভূমি সংস্কারের ফলে ইরাকি চাষীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরীয় যুদ্ধের দ্বারা নাসের ইরাকিদের চোখে পরমপ্রিয় জননায়কে পরিণত হন। বিপ্লবের ব্যাপারে ইরাকিগণ সিরিয়াবাসীদের সহিত টেক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে

দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩৪ হইতে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইরাকিগণ বিভিন্ন মাত্রার গোলযোগের মাধ্যমে আটটি বিপ্লব সংঘটিত করে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থান হইল জেনারেল আব্‌দ আল-করিম কাশেমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সহিত অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী দলসমূহের সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। ইহা মিসরীয় বিপ্লব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ ইহাতে সবাই সেনাবাহিনীর লোক ছিল না এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ইহাতে অনেক বেশি সংঘটিত হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হত্যা ও লুটতরাজকারী জনতাকে বাগদাদের রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বাদশাহ ফয়সল, যুবরাজ আবদুল ইলাহ ও প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-সাঈদকে হত্যা করে। বিপ্লবের বেসামরিক পক্ষে থাকে বা'থপন্থী কমিউনিস্ট এবং আরও কয়েকটি দলের সদস্যবৃন্দ।

হাশেমীয় রাজত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পর জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে ইরাকি সরকার জর্দানের সহিত স্বাক্ষরিত ফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া আসে। বাগদাদ চুক্তির সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীন উভয়কে স্বীকৃতি প্রদান করে। নাসের তাঁহার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন এবং সিরীয় বা'থপন্থীগণ ইরাকে তাহাদের দলীয় সদস্যদিগকে ইউ. এ. আর. (U. A. R.)-এ যোগদান করিবার আহ্বান জানায়। ইহাই হইল আরবদের সর্বকালের অতি ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ। সিরিয়া ও মিসরের ঐক্য বাস্তব রূপ লাভ করে, দৃশ্যত নাসের সমর্থক একটি দল ইরাকে ক্ষমতায় আসে, লেবাননে একটি প্যান-আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এমনকি ইয়ামনও ইউ. এ. আর-এর সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক করিতে সক্ষম হয়।

জর্দানের ভবিষ্যৎ

চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ জর্দানের যেন সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রের যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ হইতে হাশেমীয় বাদশাহকে প্রথমে বহিষ্কার না করিয়া জর্দান ইউ. এ. আর-এ যোগদান করিতে পারে না। জর্দানে হাশেমীয় পরিবারের অবস্থাও শোচনীয়, কারণ একটি স্থানীয় বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত বৃটিশ সরকার কৃত্রিম উপায়ে জর্দান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। ফিলিস্তিনের কিয়দংশ জর্দানের হাশেমীয় রাজত্বের সহিত অন্তর্ভুক্তির পর বাদশাহর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে।

জর্দানের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনী, যাহারা জর্দান নদীর পূর্ব তীর অধ্যুষিত বেদুঈনদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত এবং রাজনীতির দিক হইতে অধিক সজাগ। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং পরাজয়ে হতাশ এইসব ফিলিস্তিনীগণ জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহকে তাহাদের দুর্দশার জন্য প্রধানত দায়ী বলিয়া মনে করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিবার জন্য তাহারা তাঁহাকেই দায়ী করে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাহাদের একজন সদস্য জেরুজালেমের আক্‌সা মসজিদে বাদশাহ্ আবদুল্লাহকে হত্যা করে।

আবদুল্লাহর পুত্র তালাল তাঁহার উত্তরাধিকারী হন কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র হোসাইনের স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী বলিয়া পরিচিত হোসাইন প্রবল বাধাবিপত্তির মুখে দেশের ফিলিস্তিনী ও বেদুঈন লোকদের মধ্যে একটি সমঝোতার সৃষ্টি করেন। নাসেরের উত্থান ফিলিস্তিনীদের মনে নব আশার সঞ্চার করে। তাহারা নাসেরের মাধ্যমে ইসরাইলকে পরাজিত করিয়া তাহাদের

মৃতদেহ পুনরুদ্ধার করিবার পথ খুঁজিয়া পায়। হোসাইনের অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করে। তিনি ইউ.এ. আর-এ যোগদান করিতে পারেন না বা সিংহাসন ত্যাগ না করিয়া ইসরাইলের শান্তি স্থাপন করিতেও পারেন না। তিনি ইউ. এ. আর. কর্তৃক আক্রান্ত হইলে 'প্রতিরক্ষামূলক' ব্যবস্থা হিসাবে ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দখল করিয়া লইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাঁহার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের ফলে ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবদীগণ সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতায় থাকিবার ব্যাপারে সহায়তা করে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইরাকি বিপ্লবের পর হোসাইন প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন হন। তাই তিনি গ্রেট বৃটেনের নিকট আবেদন জানান এবং আরব প্রতিবেশীদের হাত হইতে জর্দানকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ২০০০ বৃটিশ সৈন্য আনয়ন করেন।

কাশেম ও নাসের

ইরাকের কাশেম জনগণের আশানুযায়ী প্যান-আরব বিপ্লবী বলিয়া প্রমাণিত হন নাই। আবার নাসের কর্তৃক অভিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলও তিনি নহেন। কমিউনিস্ট ও প্যান-আরব বামপন্থীদের একটি কোয়ালিশনের পুরোধা হিসাবে তিনি ক্ষমতায় আগমন করেন। তবে তিনি একজন ইরাকি জাতীয়তাবাদী, যিনি ইরাকের অ-প্যান আরবপন্থীদের সাথে স্বদেশের সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ নাসেরের সহিত ভাগাভাগি করিতে রাজি হন নাই। ক্ষমতায় আরোহণের ব্যাপারে তিনি বা'থপন্থী ও কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন এবং অতঃপর বা'থপন্থীদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম কর্নেল আবদ-আল সালাম আরিফ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের দুই দিন পর দামেস্কের নাসেরের সহিত জনগণের প্রশংসা কুড়ান। তিন মাস পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সহ তাঁহাকে বাগদাদ জেলে অবস্থান করিতে হয়।

প্রায় তিন বৎসর যাবৎ কমিউনিষ্টগণ ইরাকে স্বাধীন থাকে। তাহাদের বেশ উত্তম সংগঠন ও অনেক প্রকাশ্য দল থাকে। তাহারা একটি প্রকাশ্য 'গণ আদালত'ও প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহাতে তাহারা প্রাক্তন সরকারের সদস্যদের বিচার করে। এইসব বিচারে ইউ. এ. আর-এর প্রেসিডেন্ট নাসের সম্পর্কে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৌসূলে সংঘটিত একটি ইউ. এ. আর. সমর্থক কাশেম বিরোধী বিপ্লব নৃশংসভাবে দমন করা হয়। কয়েক মাস পর কাশেমের জীবনের উপর একটি আক্রমণের জন্য মিসরে নাসেরকে দায়ী করা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীগণ তাহাদের ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপক্রম হইলে সাধু-দর্শন ও সাধু-জীবন নির্বাহকারী জেনারেল কাশেম কসিউনিস্টদের সাহায়তায় 'ইরাক ইরাকিদের জন্য' এই ধুয়া উত্থাপন করে।

লেবাননে সমাধান

আরব ঐক্যের জন্য ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ একটি সঙ্কটাকীর্ণ বৎসর। এই বৎসর প্যান-আরবপন্থীগণ ইউ. এর. আর প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বে আনন্দ উপভোগ করে, আবার এই ঐক্য ভাঙ্গিয়া পড়িবার দুঃখও অনুভব করে। সর্বাগ্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায় লেবানন। মার্কিন সৈন্যগণ কোনো প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই কিন্তু তাহাদের উপস্থিতির ফলে গৃহযুদ্ধ বিরোধী পক্ষ চুপ হইয়া যায়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে জুলাই পার্লামেন্ট চেমনের উত্তরাধিকারী হিসাবে জনপ্রিয় জেনারেল ফুয়াদ শেহাবকে নির্বাচিত করে। নূতন প্রেসিডেন্ট

গৃহযুদ্ধে মুসলিম বিরোধী দলে নেতা রশীদ কারামীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমসংখ্যক খ্রিস্টান ও মুসলমান লইয়া গঠিত একটি নূতন 'উদ্ধারককারী মন্ত্রিসভা' পুনর্গঠন ও শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে।

ঘটনা পরম্পরা সম্ভবত অধিকাংশ লেবাননীকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, আন্তঃআরব স্নায়ুযুদ্ধে তাহাদের দেশের পক্ষে 'নিরপেক্ষ' থাকাই শ্রেয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের জন্য একটি 'নিরপেক্ষ সুইজারল্যান্ড প্রয়োজন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ইহার জনগণের অন্তর্নিহিত স্বাভাবের দরুন একমাত্র লেবাননই সেই ভূমিকা পালন করিতে পারে। প্রাচীন ফুনিসিয়ান (Phoenician) বলিয়া গর্বিত লেবাননীগণ আন্তঃআরব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারী হইবার চাইতে আরব জাহানের অর্থ বিষয়ক পরিচালনাকারী হিসাবেই ভাল করিতে পারে। লেবাননের অসংখ্য ব্যাংকে প্রায় সমস্ত আরব দেশেরই হিসাব (Account) রহিয়াছে, এবং ব্যাংকগুলিও এইসব দেশের অনেক শিল্প উন্নয়নেও অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। লেবানন অনেক সুবিধাদি উপভোগ করে। ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি হইতে এই দেশে সমুদ্র ও বিমান উভয় পথে প্রবেশ করা যায়। এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে প্রায়ই বিদ্যমান বাণিজ্যিক বা অর্থবিষয়ক কোনো জটিলতাও এখানে প্রায় নাই বলিলেই চলে। ফলে ইসরাইল ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রায় সমস্ত বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস লেবাননেও বিদ্যমান।

আরব দেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদদের জন্য একটি নিরপেক্ষ লেবানন প্রয়োজন। সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমান ও এমনকি সৌদি আরবে যতদিন বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব চলিতে থাকে, ঘটনাদৃষ্টে যেরূপ মনে হয়, পরাজিত পক্ষের জন্য নিরাপদ স্থান প্রয়োজন এবং নিজেদের বিভেদ দূর করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ স্থান। পারস্য উপসাগর ও সৌদি আরবে তৈল-সমৃদ্ধ শেখগণ সুইজাল্যান্ডের চাইতে লেবাননকেই সুন্দর ও অধিক সুবিধাজনক মনে করেন। লেবাননের শীতল পর্বতে তাঁহারা তাঁহাদের সুরম্য প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেন এবং কোনো দোভাষী ছাড়াই তাঁহারা ইউরোপের ভাল ও খারাপ জিনিসসমূহ উপভোগ করেন। বৈরুতের এক ডজনেরও অধিক দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রায় সবগুলিই কোনো না কোনো আরব দেশ কর্তৃক সাহায্যকৃত। লেবাননী পার্লামেন্টের আসন ও মন্ত্রিসভায় মুসলমানদের সংখ্যা এইসব দলের নেতৃবৃন্দের সমান সুযোগেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ইউ.এ. আর-এর বিলুপ্তি

লেবানন একটি খাঁটি আরব দেশ নহে বলিয়া ইহার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া অন্যান্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয় নাই। ইরাকের জেনারেল কাশেম যেহেতু প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী নহেন, তাই সিরিয়ার বা'থপন্থীগণ অসন্তুষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উভয় দিক হইতে সিরিয়ার সহিত স্বাভাবিকভাবে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে ইরাকের, মিসরের নহে। সিরিয়ার বা'থপন্থীগণ মিসরের নিকট ঐক্যের আবেদন জানায়, কারণ ইরাকের হাশেমীয় শাসকবৃন্দ নীতিগতভাবে তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। ইরাকি রাজতন্ত্রের পতনের ফলে ঐক্য আসে নাই এবং সিরিয়াবাসিগণ সর্বদা নিজদিগকে মিসরের হাতে নিষ্পেষিত দেখিতে পায়। তাই তাহারা এই ঐক্যের উপকারিতা সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

সিরিয়ার অন্যান্য দলসমূহ যথা- মধ্যমপন্থীগণ, রক্ষণশীল দল, সামরিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়িগণ ক্রমশ অনুধাবন করে যে ঐক্যের সমান অংশীদার হইবার পরিবর্তে সিরিয়া মিসরের একটি প্রদেশে পরিণত হইতেছে। মিসরীয় চাহিদার উপর ভিত্তি কিরিয়া আরোপিত অর্থনৈতিক নিয়মকানুনে ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ দুর্ভোগে নিপতিত হয়। সেনাবাহিনী বিরক্ত হয়; কারণ ইহা ইউ. এ. আর-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হাকিম আমেরের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। আমের সিরিয়ায় নাসেরের শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করেন। ঐক্যের অতি উৎসাহী উদ্যোক্তা বা'থপন্থীগণই সর্বাধিক দুর্ভোগে পড়ে। তাহারা তাহাদের নিজস্ব দলসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় এবং বিশ্বস্ততার সহিত আশা করে যে ইউ. এ. আর-এর নূতন ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি গঠন করিবার বেলায় তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। কিন্তু নাসের তাহাদিগকে সেই সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বস্তুত ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে বা'থপন্থীগণ সম্পূর্ণভাবে সরকার হইতে বহিষ্কৃত হয়। সম্ভবত কঠোরতম আঘাত আসে যখন নাসের জর্দান ও সৌদি আরবের ন্যায় প্রাক্তন শত্রুদের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন, যাহাদের বিরুদ্ধে নাসের ও বা'থপন্থীগণ উভয়েই অনেক প্রতিহিংসামূলক কাজ করিয়াছেন।

যে কারণেই হউক, নাসের সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে বর্তমান কৃষি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য বিবেচনা করেন নাই এবং সিরিয়ার উপর তাহার 'আরব সমাজবাদ' চাপাইয়া দেন, যাহা মিসরীয় চাহিদা অনুয়ায়ী সৃষ্ট। অপরদিকে সিরিয়ার বা'থ মতবাদীগণ নাসেরের মৌলিকতা অনুধাবন করে নাই। নাসের ক্ষেত্রভেদে মতবাদমূলক আদর্শ স্থাপন করেন বা পরিহার করেন। নাসের কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই ইরাকের নাসেরপন্থীদিগকে কাশেম কর্তৃক জেলে আবদ্ধ রাখিতে দেন নাই। আবার জর্দান ও সৌদি আরবের সাহায্য ছাড়া তিনি কাশেমকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন না। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মে নাসের জর্দানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আরবের বাদশাহ্ সউদকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে কায়রোয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তদুপরি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন নাসেরের বিরুদ্ধে কাশেমের সহায়তা করে ফলে নাসের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিতে বাধ্য হন।

অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের জুনে যখন কুয়েতের উপর ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে চাপানো বৃটিশ হুকুমনামা উঠাইয়া লওয়া হয়, এবং তৈলসমৃদ্ধ এই দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে কাশেম কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহা অধিকার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুয়েতের শাসক শেখ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রয়োগের আহ্বান করেন এবং বৃটিশ সৈন্য দ্বারা ইরাকের বিরুদ্ধে তাঁহার দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আদর্শগতভাবে একটি প্রকৃত আরব কর্তৃক একটি প্রতিক্রিয়াশীল শেখ শাসিত রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবার প্রচেষ্টায় ইউ. এ. আর-এর সমর্থন দান করিবার কথা। কিন্তু কাশেম নাসেরের পরম শত্রু এবং তাই তাঁহাকে এই কাজ করিতে দেওয়া যায় না। ফলে কাশেমের হাত হইতে কুয়েত রক্ষা করিবার ব্যাপারে নাসের কর্তৃক বৃটিশদের সহযোগিতা করিবার এই অসাধারণ ঘটনা আরবগণ অবলোকন করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে বৃটিশ সৈন্যগণ কুয়েত ত্যাগ করে এবং মিসর, জর্দান ও সৌদি আরবের সম্মিলিত সেনাবাহিনী অপর এক আরব দেশের হাত হইতে কুয়েতের প্রতিরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়।

মিসরবাসিগণ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরীয় অফিসারগণ একটি বিপ্লব সংঘটিত করেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আমের ও অন্যান্য মিসরীয় অফিসারবৃন্দকে সিরিয়া ত্যাগের আদেশ প্রদান করেন। নাসের এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন নাই এবং সিরিয়া ও মিসরের পৃথকীকরণ গ্রহণ করেন। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ একটি নির্বাচনের বন্দোবস্ত করেন; প্রায় সমস্ত পুরাতন দলসমূহ আসন লাভ করে (যদিও বা'থপন্থীগণ শুধু ১৮টি আসন লাভ করে) এবং ইউ. এ. আর-এর প্রায় সমস্ত কার্যাবলী নাকচ করে। আরব ঐক্যের মনোভাব সিরিয়া তবুও ত্যাগ করে নাই। ইহা একটি জাতীয় ঐক্য দলিল (National Unity Charter) প্রণয়ন করে এবং একটি 'স্বেচ্ছামূলক' সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। অভ্যন্তরীণ দিক হইতেও ইহা তেমন পরিবর্তিত হয় নাই কারণ ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সেখানে আর একটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার নেতৃবৃন্দ ইউ. এ. আর-এর কিছু কিছু সংস্কার পুনর্বহাল করিতে চেষ্টা করেন।

ইতোমধ্যে বা'থ দলে ইরাকি শাখা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ কাশেমের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব করে। বিপ্লবের নেতা আবদ আল-সালাম আরিফ, যাহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কাশেম রহিত করেন, কাশেম ও তাঁহার বামপন্থী সমর্থকদের মৃত্যুদণ্ড দান করেন। নাসের আরিফের নিকট তাঁহার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। বা'থ পার্টির সিরীয় মন্ত্রণাদাতা মাইকেল আফলাক তাঁহার ইরাকি সহকর্মীদের সহিত দীর্ঘ সভায় মিলিত হন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ সিরিয়ায় আরও একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বহুসংখ্যক সামরিক অফিসার ক্ষমতায় আসেন, যাহারা বা'থপন্থী না হইলেও ইহার ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিশীল। পুনরায় ইরাক, সিরিয়া ও মিসর এই তিনটি দেশ সংযুক্তির জন্য সভায় মিলিত হয় এবং প্রত্যেকটি সভা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভিতর শেষ হয়। এতকিছু সত্ত্বেও মিসরীয়, ইরাকি ও সিরীয় নেতৃবৃন্দ সংযুক্তির কথা বলেন এবং স্ব স্ব পতাকার নক্সায় তিনটি তারকা অনুমোদন করেন।

নাসের ও আরব সমাজবাদ

প্যান-আরববাদের জন্য নাসের তাঁহার প্রচুর জীবনীশক্তি ব্যয় করেন এবং ইহার জন্য তিনি শুধু 'ইউ. এ. আর.' নামটি রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই নাম চালু রাখিবার উপর তিনি প্রবল জোর দেন, শুধুমাত্র লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটা প্রতীক হিসাবে। তিনি অবশ্য স্বদেশের সংস্কার সাধন হইতে বিরত হন নাই। তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ কোনো সুনির্দিষ্ট মতবাদের কর্মসূচি ছাড়াই ক্ষমতায় আসেন। ফলে কোনো পূর্ব নির্ধারিত মতবাদের গণ্ডির ভিতর তিনি আবদ্ধ ছিলেন না, যদিও বিভিন্ন কর্মসূচি তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন ও দিন দিন অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন। সম্ভবত ভারতের নেহেরুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব, তাঁহার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর, সিরিয়ার বা'থপন্থীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ চাহিদার দরুন তিনি সমাজতন্ত্রের অনুরূপ একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ভূমি সংস্কার দ্বারা তিনি ইহা সূচনা করেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খাল কোম্পানি ও অন্যান্য অনেক বিদেশী ব্যবসা জাতীয়করণ করা হইলে শিল্প সংস্থাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকার একটি অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্থা শিল্প, বাণিজ্যিক, অর্থবিষয়ক ও কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতে শুরু করে। বস্তুত বিদেশী ব্যবসাসমূহ হাতে লইবার ফলে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ যেহেতু মাত্র দেড় শতাংশ লোকের হাতে যায়, তাই নাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথা- ব্যাঙ্ক, তুলা, সার, বীমা, লোহা, জনহিতকর কাজ, ইস্পাত ও কাপড় সমস্ত কিছু জাতীয়করণের আদেশ প্রদান করেন। শুধু ছোট শিল্পগুলি বেসরকারি লোকদের হাতে রাখিয়া দেন। সমস্ত বেতন সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ১০০০ মিসরীয় পাউন্ডের উর্ধ্বে সমস্ত আয়ের উপর ৯০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়। মাথাপিছু সর্বোচ্চ জমির মালিকানা নির্ধারিত হয় ২০০ হইতে ১০০ ফেদ্দানে। শ্রমিকদের উপকারার্থে বিশেষ আইন রচনা করা হয়। প্রত্যেকের একটির বেশি চাকুরি নিষিদ্ধ করিবার ফলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের চাকুরির সংস্থান হয়।

বস্তুত নাসেরের আমলের প্রথম দশ বৎসরের গৃহনির্মাণ, স্কুল, হাসপাতাল ও পঙ্গুদের জন্য আবাসগৃহ, সমাজকল্যাণ কেন্দ্র ও কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিসর গর্ব করিতে পারিত যাহা আর. সি. সি. (R. C. C.) ক্ষমতারোহণের পূর্বে অর্ধ শতাব্দীতেও হয় নাই। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে নীল নদ ব্যবহারের ব্যাপারে মিসর ও সুদানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং উচ্চ আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০ কোটি ডলারের একটি ঋণ মঞ্জুর করে। মিসরে আর. সি. সি. প্রথম সরকার যে জনসংখ্যা সমস্যার উপর গভীরভাবে চিন্তা করে এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করে। নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য আরও অসুবিধাদি বিরাজ করিলে সম্ভবত এইসব সংস্কারাদি, এমনকি আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত হইলেও জীবন যাত্রার মানে কোনো পার্থক্য সূচিত হইবে না। কিন্তু জনসাধারণের এইসব সংস্কার মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দেয়, এবং মিসরীয়দের মিসর দেশ প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে।

ইয়ামানের ঘটনা

আরব জাহানে ইহার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এবং নাসেরের জনপ্রিয়তার দরুন মিসরকে সমগ্র আরব জাহানে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীতে জড়িত থাকিতে হয়। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামানে সংঘটিত একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এক বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসে। নাসের এই বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইয়ামানের ব্যাপারে নাসেরের "হস্তক্ষেপকে" তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশবিশেষ বলা হয়ত ভুল হইবে। সম্ভবত ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শন ইহাতে ছিল, কিন্তু আরব ঐক্যের বিষয় চিন্তা করিলে, যাহাকে অধিকাংশ শিক্ষিত আরব একটি অতি আকাঙ্ক্ষিত 'বিষয়' বলিয়া বিবেচনা করে, সমগ্র আরব জাহানে যে কোন প্রগতিশীল আরব দেশের উচিত সর্বত্র সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সহায়তা করা।

ইয়ামান একটি নিভৃত দেশ। ১০০০ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত ইহা বহিঃপ্রভাব হইতে বঞ্চিত। জায়েদি শীয়া বংশানুক্রমিক ইমামগণ দ্বারা ধর্মতন্ত্র হিসাবে ইহা শাসিত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামান আরব লীগে যোগদান করে এবং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইহা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ফেডারেল ব্যবস্থায় ইয়ামান ইউ. এ. আর.-এ যোগদান করে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ইউ. এ. আর. বিলুপ্ত হইলে নাসের ইয়ামানের সহিত ফেডারেল আকারে সংযুক্তি নাকচ করেন। এক বৎসর পর ইয়ামানে একটি বিপ্লব হয় এবং নাসেরকে ইহাতে উস্কানী প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ইয়ামানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিসর বিপ্লবী সরকারের পক্ষাবলম্বন কার এবং সৌদি আরব বহিষ্কৃত ইমামের সাহায্য করে।

যুদ্ধ ছয় বৎসর স্থায়ী হয় এবং মিসর ইহার শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার ইয়ামানে খরচ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয় এবং মিসর ও সৌদি আরবকে গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখিবার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ইসরাইল আরব দেশসমূহ আক্রমণ করিবার সময় শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইলেও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ঐক্যের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরব দেশসমূহ তাহাদের চিরাচরিত পন্থায় ফিরিয়া যায়। ইহার সাধারণ অর্থ হইল সিরিয়া ও ইরাকে একটির পর একটি এবং আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ। শুধুমাত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধেই তাহারা ঐক্যমতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। যথারীতি সিরিয়াই অগ্রণী থাকে। তাহারা খাঁটি আরব এবং যে কোনো দেশের চাইতে ইসরাইলের প্রবলতম বিরোধী বলিয়া দাবি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসর ও সিরিয়াকে অস্ত্র প্রদান করে; ফ্রান্স ইসরাইলের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বিক্রয় করে এবং যুক্তরাষ্ট্র জর্দান ও সৌদি আরবকে কিছু সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রদান করে।

ইতোমধ্যে ইসরাইল আকাবা উপসাগরের আইলাত বন্দরের উন্নয়ন সাধন করে। আইলাত হইতে হাইফা পর্যন্ত সে একটি তৈলের পাইপ লাইন নির্মাণ করে, যাহার মধ্য দিয়া ইসরাইলের শিল্পসমূহে ব্যবহারের জন্য পারস্যের তৈল প্রবাহিত হয়। ইসরাইলের নিকট তৈল বিক্রয়ে সম্মতি প্রদানের দায়ে মিসর ইরানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইসরাইল জাতিসংঘের একটি নিষেধাজ্ঞাও ভঙ্গ করে এবং নেগেভ অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য জর্দান নদীর পানির গতি পরিবর্তন করে।

এইসব কারণে এবং ইসরাইল ও তাহার আরব প্রতিবেশীদের কিছু অমীমাংসিত সমস্যার দরুন মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইসরাইল ও মিসর সীমান্তে একটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষক বাহিনী নিয়োজিত থাকিবার ফলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোনো সংঘর্ষ হয় নাই। জর্দানের নাজুক অবস্থার দরুন সে ইসরাইলের সহিত তেমন গোলমাল করিতে পারে না। ইসরাইলি বসতি এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত নিরপেক্ষ বা অসামরিক এলাকায় ইসরাইলি অনুপ্রবেশের উপর হামলা চালাইবার জন্য সিরিয়া খুবই সুবিধাজনক অবস্থার অধিকারী। ইসরাইল মাঝে মাঝে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে নহে, বরং সীমান্তের নির্দোষ জর্দানী গ্রামসমূহের বিরুদ্ধে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জর্দানের প্রতিশোধ গ্রহণের অসামর্থ্যকে মিসর ও সিরিয়া হুসাইনের 'ইসরাইল সমর্থক নীতি' বলিয়া সমালোচনা করে।

ইসরাইল সিরিয়ার অপরাধের জন্য জর্দানকে কেন শাস্তি দেয় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যেহেতু একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি বিদ্যমান, তাই সম্ভবত ইসরাইল ভয় করে পাছে সিরিয়াকে আক্রমণ করিলে মিসরও ইহাতে জড়াইয়া পড়ে। তদুপরি ফিলিস্তিনী মোহাজেরগণ একটি নির্বাসিত সরকার এবং একটি 'ফিলিস্তিন মুক্তি ফৌজ' (Palestine Liberation Army) গঠন করিয়াছে। সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে এই মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ শিবির। ইসরাইল কর্তৃক জর্দান আক্রমণের ফলে এই ফৌজ জর্দানে আসিতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে ইসরাইল একটি 'প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ' চালাইবার এক ছুতায় জর্দান নদীর পশ্চিম তীর সে অধিকার করিয়া লইতে পারে। এই ধরণের একটি লক্ষ্য হিরাত পার্টি সর্বদাই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে।

যাহাই হউক, অবস্থা উত্তরোত্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে ইসরাইল ইহার ঊনবিংশ স্বাধীনতা বার্ষিকী পালন করে। এই উপলক্ষে সে জাতিসংঘের আপত্তির বিরুদ্ধে অ-সামরিকী জেরুজালেমে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এসকল্ ইসরাইলিদিগকে অবস্থার ভয়াবহতা স্মরণ করাইয়া বলেন যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সিরিয়ার ক্রমবর্ধমান উস্কানীর মোকাবিলা করিবার জন্য ইসরাইল 'প্রয়োজনীয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।' সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন কমান্ডো (গেরিলা) দলসমূহ ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নির্দেশে তাহাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়া তোলে। জাতিসংঘ বাহিনীর পিছনে লুক্কায়িত থাকিবার জন্য সিরীয়গণ নাসেরকে টিটকারী করে। ১৭ই মে ইউ. এ. আর. সমস্ত জাতিসংঘ বাহিনীকে মিসরীয় ভূমি ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানায়, জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট এই অনুরোধ পালন করিয়া মিসরীয় সৈন্যদিগকে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হইতে এবং আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালীর প্রবেশদ্বার নিয়ন্ত্রণকারী শার্ম আল-শেখ অধিকার করিবার অনুমতি দান করেন।

২২শে মে ইউ. এ. আর. ইসরাইলি জাহাজ ও ইসরাইলের জন্য সামরিক সাজসরঞ্জাম বহনকারী সমস্ত অ-ইসরাইলি জাহাজের জন্য আকাবা উপসাগর বন্ধ করিয়া দেয়। একটি আন্তর্জাতিক জলপথ বন্ধ করাটাকে ইসরাইল যুদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং সৈন্য মোতায়েন আরম্ভ করে। ৩০শে মে মিসর ও জর্দান ইহাদের যে কোনো একটির উপর যে কোনো হামলা প্রতিহত করিবার জন্য এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ৩রা জুন লিবিয়া মিসরীয় বাহিনীর সহিত যোগদান করে এবং পরদিন ইরাক মিসরীয়-জর্দানী আঁতাতে অংশ গ্রহণ করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেড়ী এইভাবে সম্পূর্ণ হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল; যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন ইসরাইলের সহিত এই ব্যাপারে একমত হয় যে তিরান প্রণালী আন্তর্জাতিক; ফ্রান্স এই বিবাদে ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। এমনকি মিসরও যুদ্ধ প্রত্যাশা করে কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু ইসরাইল ইহার উপর বাজি রাখিতে পারে না।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জুন সোমবার সকালে ইসরাইলি বিমান ও স্থলবাহিনী আক্রমণ চালায় এবং সিনাই হইতে সিরিয়া এবং সমগ্র জর্দানী সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলি বিমানসমূহ মিসরীয়, সিরীয় ও জর্দানী বিমান বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতঃপর সম্পূর্ণ বিমান আধিপত্যের সহায়তায় ইসরাইলি স্থল বাহিনীসমূহ সর্বত্র অগ্রসর হয়। সংক্ষিপ্ত ছয় দিনের মধ্যে ইসরাইলি সৈন্যগণ দক্ষিণে সুয়েজ খাল বরাবর, পূর্বে জর্দান নদী এবং উত্তর-পূর্বে গ্যালিলি হ্রদের বিপরীতে সিরীয় উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা নয় জন মিসরীয় জেনারেল, তিনি শতেরও অধিক অফিসার, হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী এবং লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রুশ নির্মিত সামরিক সাজসরঞ্জাম অধিকাংশ অক্ষত অবস্থায় আটক করে। 'ছয় দিনের যুদ্ধে' পুনরায় আরবদের অনৈক্য ও অক্ষমতা এবং ইসরাইলীদের 'ধৃষ্টতা ও একাত্মতা প্রকাশ করে'। মার্কিন অর্থ, ফরাসি বিমান এবং ইসরাইলি বিমানচালকদের সাহসিকতা ও দক্ষতার দ্বারা ইসরাইল আরবদিগকে এক মারাত্মক আঘাত হানে।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Agwani, M.S., ed. *The Lebanese Crisis, 1958:* A Documentary Study. New York : Asia Publishing House, 1965.

Avery, Peter, *Modern Iran*. New York : Frederick A. Praeger, 1965.

Banani, Amin, *The Modernization of Iran*, 1921-1941. Stanford, Calif : Stanford University Press 1961.

Ben-Gurion, David, *Rebirth and Destiny of Israel*. New York : Philosophical Library. 1953.

Binder, Leonard, *Idealogical Revolution in the Middle East*. New York : John Wiley & Sons, 1964.

Campbell, John C., *Defense of the Middle East*. New York : Frederick A. Praeger, 1960.

Cottam, Richard W., *Nationalism in Iran*. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1964.

Davis, Helen Miller, *Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle East*. Durham, N. C : Duke University Press, 1947.

Dickson, H. R. P., *Kuwait and Her Neighbours*. London : George Allen & Unwin Ltd, 1956.

Frye, Richard N., ed., *Islam and the West*, The Hague, Netherlands : Mouton, 1956.

Haim, Sylvia G., ed., *Arab Nationalism*, Berkeley, Calif : University of Califormnia Press, 1962.

Harris, Christina Phelps, *Nationalism and Revolution if Egypt*. The Hague, Netherlands : Mouton, 1964.

Harris, George L, *Iraq Ist People, Its Sociery, Its Culture*. New Haven, Conn : Human Relations Area Files Press, 1958.

Hay, Sir Rupert, *The Persian Gulf States*. Washington, D. C. : Middle East Institute, 1959.

Hitti, Philip K., *History of Syria*. London : Macmillan, 1951.

Lebanon in History, London : Macmillan, 1962.

Hourani, Albert H. *Syria and Lebanon :* A Political Essay, London : Oxford University Press, 1946.

Hurewitz, J. C, *The Struggle for Palestine*, W. W. Norton, New York : 1950.

Diplomacy in the Near and Middle East, (Vol. II, 1914-1956,)

Princeton, J. J. : D. Van Nostrand, 1956.

Issawi, Charles, *Egypt in Revolution : An Economic Analysis*, New York : Oxford University Press, 1963.

Khadduri, Majid : *Independent Iraq : A Study in Iraqi Politics Since 1932*, London : Oxford University Press, 1951.

Kinross, Lord, *Ataturk*, New York : William Morrow. 1965.

Lacqueur, Walter Z., *The Soviet Union and the Middle East*, New York : Frederick A. Praeger, 1959.

Middle East in Transition. New York : Frederick A Praeger, 1958.

Lebkicher, Roy, George, Rentz, and Max Steineke, *The Arabia of Ibn Saud,* New York : Russell F. Moore, 1952.

Lewis, Bernard, *The Emergence of Modern Turky,* London : Oxford University Press, 1961.

Lewis, Geoffrey, *Tureky, New York :* Frederick A. Praeger, 1955.

Lilienthal, Alfred, *What Price Israel.* Chicago : Henry Regnery, 1953.

Marlowe, John, *The Persian Gulf in the Twentieth Century,* London : The Cresset Press, 1962.

Nasser, Gamal Abd al. *Philosophy of the Revolution,* Cairo, 1954.

Neguib, Mohammed *Egypt's Destiny,* London : Victor Golanez. 1955.

Pahlavi, Mohammed Reza Shah, *My Mission for My Country,* New York : McGraw Hill, 1961.

Patai, Raphael, *The Kingdom of Jordan,* Princeton, N, J, : Princeton University Press, 1958.

Peretz, Don, *Israel and the Palestine Arabs,* Washington, D. C : Middle East Institute, 1958.

Rivlin, Benjamin, and Joseph Szyliowiez, ed, *The Contemporary Middle East,* New York : Random House, 1956.

Sayegh, Fayez A. ed., *The Dynamics of Neutralism in the Arab World.* San Francisco : Chandler Publishing Co, 1964.

Shwadron, Benjamin, *The Middle East Oil and Great Powers,* New York : Frederick A. Praeger, 1956.

Smith Wilfred C, *Islam in Modern History,* Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1957.

Sparrow, Gerald, *Modern Jordan,* London : George Allen & Unwin Ltd, 1961.

Upton, Joseph M. *The History of Modern Iran,* Cambridge, Mass : Harvard University Press. 1960.

Warriner, Doreen, *Land and Poverty in the Middle East,* New York, Oxford University Press, 1948.

Wenner, Manfred W. *Modern Yemen,* Baltimore : John Hopkins Univesity Press, 1967.

Weiker, Walter F. *The Turkish Revolution, 1960-1961,* Washington, D. C : Brookings Institution, 1964.

Weizmann, Chaim, *Trial and Error.* New York : Harper, 1949.

Winder, R. Bayly, *Saudi Arabia in the Nineteenth Century,* New York : St, Martins Press, 1956.

Zaideh, Nicola A. *Syria and Lebanon,* New York : Frederick, A. Praeger, 1957.

পরিশিষ্ট

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। অতি ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং ইহার সহিত মোকাবিলার দরুন আরবিভাষী লোকদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ইসরাইল ফিলিস্তিনের সমগ্র অঞ্চল তৎসঙ্গে সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার গ্যালিলী হ্রদের বিপরীতে জাওলান জিল্লা (গোলান উচ্চভূমি) দখল করে। ইসরাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সে 'পুরাতন' জেরুজালেম ও গোলান উচ্চভূমি অধিকার করে। আরবগণ শুধু ইসরাইলের অবস্থান স্বীকার করিতে রাজি হইলেই ইহা সরাসরি আরবদের সহিত বাকি অধিকৃত অঞ্চলের ভাগ্য লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। অপরদিকে আরবগণ তাহা করিতে রাজি – প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া যাহা তাহারা অস্বীকার করিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান করা – তবে যদি ইসরাইল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুনের পূর্বের সীমানায় তাহাদের সৈন্য সরাইয়া লয়। ইসরাইলিগণ ইহা পালন করিতে অস্বীকার করে। অধিকৃত ভূখণ্ডের আরব অধিবাসীদের শাসন করা একটি ক্রমাগত সমস্যার বিষয় হইলেও অধিকৃত এলাকার কোনো অংশ ইসরাইল ছাড়িবে কিনা সন্দেহের ব্যাপার। তাহা করিতে যাইয়া সে সুয়েজ খাল ও জর্দান নদীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত সহজ প্রতিরোধ্য সীমান্ত ত্যাগ করিয়া নেগেভ ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য সীমান্ত গ্রহণ করিবে।

আরব দেশসমূহের মধ্যে জর্দান ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক উৎস এবং পর্যটন রাজস্ব খাতে সবচাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা তাহার পুরাতন ট্রান্স জর্দান ভূখণ্ডে পরিণত হয়, যেখানে প্রায় কোনো অর্থনৈতিক উৎসাহ নাই। জর্দান নদীর পশ্চিম পাড়ের লক্ষ লক্ষ আরব উদ্বাস্তুও তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। জর্দান অর্থনৈতিক দিক হইতে সৌদি আরব এবং বিশেষত কুয়েতের দান ও ঋণের উপর আরও নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

মিসরের ভূখণ্ড, সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও নাসের তাঁহার ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক হইতেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। মিসরে এবং আরব দেশসমূহে তাঁহার প্রকাশ্য সমালোচনা হয় এবং অনেক বিরুদ্ধ লোকের সৃষ্টি হয়। মিসর খালের রাজস্ব হইতেও বঞ্চিত হয়, কারণ ইসরাইলকে খালের মধ্য দিয়া অবাধ যাতায়াত করিতে না দিলে সে খাল খুলিতে দিতে নারাজ। তদুপরি, 'জাম্বু' তৈলাধার তৈয়ার করিয়া অন্তরীপের পথে পারস্য উপসাগর হইতে ইউরোপের বন্দরসমূহে স্বল্প খরচে তৈল প্রেরণ করিবার ফলে সুয়েজ খালের আয় অনেক কমিয়া যায়। দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির দরুন মিসর প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইসরাইলের ভয়ে মিসর সোভিয়েত নৌ-বাহিনীকে পোর্ট সৈয়দ ও আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান প্রদানে বাধ্য হয়। মিসরকে প্রদত্ত বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবত এই মূল্যই দাবি করে। সে যাহাই হউক ফলাফল একই – বিদেশী বিজয়ীগণ মিসরের ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রবেশদ্বার সিনাই অধিকার করে এবং মিসরীয় বন্দরসমূহে রুশ যুদ্ধজাহাজসমূহ বাঁধা থাকে, যেখানে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজসমূহ অবস্থান করিত।

স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা আরবদের মধ্যে তেমন বড় রকমের কোনো ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। ইসরাইলের সহিত 'সম্মেলনের টেবিলে' বসিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবার ব্যাপারে তাহারা আপোসহীন, কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাহাদের ঐক্য আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতি মোটেই দূরীভূত করে নাই। নিজেদের পার্থক্য ও মতানৈক্য সত্ত্বেও সময় তাহাদের স্বপক্ষে বলিয়া আরবগণ বিশ্বাস করে। তাহারা জোরের সহিত বলে যে এমন এক সময় আসিবে যখন আরবগণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে সালাউদ্দিন যেরূপ খ্রিস্টান ধর্ম-যোদ্ধাদিগকে (Crusaders) পরাজিত করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে ইসরাইলকে পরাজিত করিবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, তৎসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থার পরপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের আনুপাতিক ভূমিকায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রেট বৃটেনের ক্ষমতা ও প্রভাব দ্রুত লয়প্রাপ্ত হইয়াছ। এডেন অধিকারে রাখা বা পারস্য উপসাগরে নৌবাহিনী মোতায়েন রাখিবার অর্থনৈতিক বোঝা ইহা বহন করিতে সক্ষম নহে। এতদ্‌সত্ত্বেও জর্দান, সৌদি আরব এবং পারস্য উপসাগরে শেখ শাসিত রাজ্যগুলির সহিত ইহার চুক্তি সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তাই ইহা এতদঞ্চলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সক্ষম।

ফ্রান্স অবস্থাভেদে ইসরাইল ও আরব দেশসমূহের মধ্যে উঠানামা করে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে মিসরের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সহিত আঁতাত করিবার পর ফ্রান্স ইসরাইলের অন্ধ সমর্থক হিসাবে বিরাজ করে এবং তাহাকে অস্ত্রশস্ত্রও সরবারাহ করে। "ছয় দিনের যুদ্ধের" পর পরই ফ্রান্স হঠাৎ ইহার আনুগত্য পরিবর্তন করে এবং যুদ্ধপূর্ব সীমান্তে ইহার সৈন্য প্রত্যাহার না করিবার জন্য ইসরাইলের সমালোচনা করে। প্রেসিডেন্ট দ্য গলের এই কাজে কেউ কেউ বিরক্ত হয় এবং অনেকেই অবাক হয়। কিন্তু পরিণতিতে ইহা মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিবার ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের আরবিভাষী দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এক রকম পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দরুন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের নীতিমালা সমর্থন করিতে এইরূপ বাধ্য হইয়াছে যে, কোনো কঠোর ভূমিকা পালন দূরে থাকুক, ইহা কোনো পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্তও লইতে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব ঘাটতি হওয়ার অর্থ হইল সর্বদা না হইলেও সাধারণত সমানুপাতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া। জার বা কমিউনিস্ট রাশিয়ার ইতিহাসের চিরাচরিত ভাবধারা হইল সেই দেশের সরকারের ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর এলাকায় ঘাঁটি রক্ষা করিবার আগ্রহ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য রাশিয়া অপ্রতিহতভাবে তুর্কি প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও ইরাকের উপর আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য রুশগণ সেই উদ্দেশ্য সফলে ব্যর্থ হয় শুধু তুরস্ক ও ইরানে বাধাবিপত্তির জন্য নহে বরং রুশ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের বিরোধিতার জন্যও বটে। ট্রুম্যান নীতিমালা এই পশ্চিম ইউরোপীয় নীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আরব জাহানে রুশ অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এবং তাহা বিশেষত মিসর ও সিরিয়ায় জোরদার হইতে থাকে। ইতিহাসে প্রথমবারের মত ভূমধ্যসাগরে রুশ

যুদ্ধজাহাজসমূহ ঘাঁটি লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়া প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ বা ইরানের উপর আধিপত্য লাভ করে নাই। সম্ভবত তুরস্ক বা ইরান ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার ছায়া তাহাদের উপর উল্লম্ফন ক্রীড়া করিবার ব্যাপারে সজাগ বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত বৈরী-নীতি অনুসরণ করে।

শেষ বিশ্লেষণে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতা প্রদর্শনীতে নহে, বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তাহাদের অতীত সংস্কৃতির সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের গুণের উপর নির্ভর করে। এই সংমিশ্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করিবে ইসলাম, যদিও ইহা প্রত্যেক দেশে সমান পরিমাণে নহে। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে তুরস্ক প্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পর সে অনুভব করে যে অতীতের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নহে। সম্ভবত পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে সে এখনও বিদ্যমান অতীত আদর্শ পুনরায় গ্রহণ করিতে বা পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিবে।

ইরান একদিকে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিতে যেরূপ ইতস্তত করে নাই, অপরদিকে সে মধ্যপ্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইতেও রাজি হয় নাই। কখনও সুসঙ্গত ও কখনও অসঙ্গত আদর্শ হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পাশাপাশি ইরানে অবস্থান করে। একটি সুস্পষ্ট সংমিশ্রণ হিসাবে গড়িয়া উঠা পর্যন্ত ইহা পরীক্ষাধীন থাকিবে এবং এই পর্যায়ে ইহা জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হইবে।

আরব জাহানের একটি সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস করা দুরূহ ব্যাপার, কারণ এখানে না আছে রাজনৈতিক ঐক্য, না আছে মতবাদমূলক সামঞ্জস্যতা। আরববাদের সহিত ইসলামের একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা তুর্কি বা পারস্য জাতীয়তাবাদের সহিত নাই। মোটের উপর হযরত মুহম্মদ (দঃ) একজন আরব, কোরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয় এবং প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীগণ মুসলিম সংস্কৃতিকে "আরব" সংস্কৃতি বলিয়া চিহ্নিত করে। সুতরাং কি ধরণের সংমিশ্রণ এখানে গড়িয়া উঠিবে তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই।

মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ, আরব, পারস্যবাসী ও তুর্কিগণ একটি অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিরাজমান, এবং তাহারা নিজেরাও একটি রেনেসাঁ, ধর্মীয় সংস্কার, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবে জড়িত–সবগুলি একই সাথে। তাহারা এমন একটি পরিবারের ন্যায় যে ভিতরে ও বাহিরে আপন গৃহ পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত। তাহারা ইহাতে বাস করিতে চায়, বন্ধুবৎসলও হইতে চায়, আবার ইহাও কামনা করে যে, বন্ধুরা তাহাদের পুনর্বিন্যাসকৃত গৃহের স্থাপত্য শিল্পের প্রশংসা যেমন করুক ঠিক তেমনই তাহাদের পরিত্যক্ত আসবাবপত্রের প্রশংসা করুক–সবগুলি একই সাথে। সম্ভবত এই কারণে ও অন্যান্য কারণে তাহারা বিশ্বে এমন সব দৃশ্য, মনোভাব, প্রত্যাশা ও আচরণ করে যেগুলিকে বহির্বিশ্বের লোকেরা মনে করে অবাস্তব, অকপট, একগুঁয়ে, গোঁড়া, নিষ্পাপ, যৌক্তিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ – সবগুলি একই সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর একটি কালপঞ্জী

৫৭০	হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জন্ম।
৬২২	হিজরত।
৬৩২	হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মৃত্যু।
৬৩৪	মুসলমানদের রাজ্যবিস্তার আরম্ভ।
৬৩৫	সিরিয়া বিজয়। কাদেশিয়ার যুদ্ধ।
৬৩৯	মিসর বিজয়।
৬৪০	ইরান বিজয়।
৬৫৩	কোরান প্রজ্বলন।*
৬৫৬	মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ। উষ্ট্রের যুদ্ধ।
৬৫৯	আলী হত্যা।
৬৬১	উমাইয়া বংশের ক্ষমতায় আগমন।
৬৮০	কারবালায় হোসাইনের মৃত্যু।
৭১১	স্পেন ও সিন্ধু বিজয়।
৭৫০	উমাইয়া বংশের পতন ও আব্বাসীয় বংশের উত্থান।
৭৫৪	আবু মুসলিম খোরাসানীর হত্যা।
৭৬৭	হানাফি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, আবু হানিফার মৃত্যু।
৭৯৫	মালেকি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, মালেক ইবনে আনাসের মৃত্যু।
৮১৩	মামুন কর্তৃক অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।
৮২০	শাফেয়ী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ীর মৃত্যু।
৮৩০	তুর্কিদের আগমন।
৮৫০	হাম্বলি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যু। ক্ষুদ্র রাজ্য যুগের আরম্ভ।
৯১০	মিসরে ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠা।
৯৫০	দার্শনিক ফারাবীর মৃত্যু।
৯৫৬	ঐতিহাসিক মাসুদীর মৃত্যু।
৯৭২	কায়রোতে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।
১০৩৭	চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ইবনে সিনার মৃত্যু।
১০৪৮	গণিতশাস্ত্রবিদ আল-বিরুনীর মৃত্যু।
১০৫৫	সেলজুকদের আগমন।
১০৭১	মাঞ্জিকার্তের যুদ্ধ।
১০৯৯	জেরুজালেমে ক্রুসেডারগণ (খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা)।
১১৩৭	সেলজুকদের পতন।
১১৭১	ফাতেমীয় বংশের পতন।
১১৮৭	হিত্তিনের যুদ্ধ, সালাউদ্দীন কর্তৃক ক্রুসেডারদের পরাজয়।
১২২০	চেঙ্গিস খানের অগ্রাভিযান।
১২৫২	মিসরে মামলুক শাসনের শুরু।
১২৫৮	বাগদাদের পতন। আব্বাসীয় বংশের পরিসমাপ্তি।

* *কোরআন প্রজ্বলনের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে তৃতীয় খলীফা ওসমান কোরআনের হেজাজী সংলাপকে আদর্শ সংলাপরূপে নির্ধারণ করেন। অন্যান্য সংলাপগুলিকে তিনি জ্বালাইয়া দেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হেজাজী সংলাপেই কোরআন অবতীর্ণ হয়।— অনুবাদক*

১২৬০ মামলুকগণ কর্তৃক মোঙ্গলদের পরাজয়।
১২৭৩ সুফী জামাল আল-দ্বীনের মৃত্যু।
অন্যূন ১৩০০ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শুরু।
১৩২৪ মার্কোপোলোর মৃত্যু।
১৩৬৯ তৈমুরলঙ্গের আগমন।
১৩৮৯ কসোভার যুদ্ধ।
১৪০২ তৈমুরলঙ্গ কর্তৃক বায়েজীদের পরাজয়।
১৪০৬ সামাজিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মৃত্যু।
১৪৫৩ কনস্টান্টিনোপলে পতন।
১৫০০ সাফাভীয় সাম্রাজ্যের শুরু।
১৫০৭ পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজদের আগমন।
১৫১৪ কলড্রনের যুদ্ধ।
১৫১৭ ওসমানীয়দের ফারটাইল ক্রিসেন্ট বিজয়।
১৫৯১ বৃটিশদের পারস্য উপসাগরে প্রবেশ।
১৫৯৯ ইউরোপীয় রাজধানীসমূহে পারস্যের প্রতিনিধিদল।
১৬৫৬ মুহাম্মদ কপরুলুর প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ।
১৬৫৭ তুর্কি ঐতিহাসিক হাজী খলীফার মৃত্যু।
১৬৮৩ তুর্কিদের ভিয়েনা অভিমুখে অগ্রসর।
১৬৯৯ কার্লোভিজের শান্তি চুক্তি।
১৭১৮ প্যাস্‌রোভিজের শান্তি চুক্তি।
১৭২২ সাফাভীয়দের পতন।
১৭৩৯ নাদির শাহের দিল্লী অধিকার।
১৭৫৭ ওয়াহাবি মতবাদের আগমন।
১৭৭৪ কুচুক কাইনার্জির চুক্তি।
১৭৮০ ইরানে কাজারদের উত্থান।
১৭৮৯ মিসরে নেপোলিয়ন।
১৭৯৫ তুরস্কে নিজাম-ই-জাদীদ।
১৮১১ মামলুকদের পতন।
১৮১৪ এ্যাংলো-পার্সিয়ান ডেফিনিটিভ চুক্তি।
১৮২৬ জান-নিসারিদের পরিসমাপ্তি।
১৮২৮ তুর্কম্যানচাই চুক্তি।
১৮৩১ মিসর কর্তৃক সিরিয়া বিজয়।
১৮৩৯ তুরস্কে হাত্তি শরীফ।
১৮৪০ মিসরে মোহাম্মদ আলী বংশের প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৪ ইরানে বাবের আবির্ভাব।
১৮৫১ ইরানে দারুল ফনুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন।
১৮৫৩ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ। সুয়েজ খাল কোম্পানি গঠিত।
১৮৫৬ তুরস্কে হাত্তি হুমায়ুন।
১৮৬০ দ্রোজ-ম্যারোনাইটদের যুদ্ধ।
১৮৬২ ওসমানীয় সাইন্টিফিক সোসাইটি, ইব্রাহিম শিনাসী।
১৮৬৯ সুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত।
১৮৮২ বৃটিশ কর্তৃক মিসর দখল।
১৮৮৭ তুরস্কের নমিক কামালের মৃত্যু।
১৮৮৮ সুয়েজ খালের উপর কনস্টান্টিনোপল সম্মেলন। (Constantinople Convention)
১৮৮৯ তুরস্কে কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস।

১৮৯০ ইরানে তামাকের কনসেশন।
১৮৯৪ তুরস্কে আর্মেনিয়ার হত্যালীলা।
১৮৯৭ প্রথম বিশ্ব ইহুদিবাদী সম্মেলন।
১৮৯৮ নাসির আল দীন শাহ্ কাজার নিহত।
১৯০৬ ইরানে শাসনতন্ত্র প্রদান।
১৯০৭ ইরান বিভক্তিকরণে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি।
১৯০৮ নব্যতুর্কি বিপ্লব।
১৯১১ ইরান হইতে শুসতার বহিষ্কৃত।
১৯১৫ হোসাইন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ।
১৯১৬ সাইক্স-পিকট চুক্তি।
১৯১৭ বালফার ঘোষণা।
১৯১৮ দামেস্কে ফয়সল বাহিনীর প্রবেশ।
১৯১৯ গোপন ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি। সামসুনে আতাতুর্কের অবতরণ।
১৯২০ স্যান-রেমো চুক্তি। সিরিয়া হইতে ফয়সল বহিষ্কৃত। স্যাভরসের চুক্তি।
১৯২১ ইরানে রেজাখান কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থান, ইরাকের বাদশাহ্ হিসাবে ফয়সল; ট্রান্সজর্দান প্রতিষ্ঠা। ফিলিস্তিনে প্রথম ইহুদিবাদ বিরোধী উত্থান।
১৯২২ গ্রীকদের উপর তুর্কি বিজয়। ইরানে মিলসপাফ মিশন।
১৯২৩ ল্যুজ্যানে চুক্তি। রেজা খান কর্তৃক ইরানের প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের রূপ লাভ।
১৯২৪ আরবে ইবনে সউদের উত্থান। খিলাফতের পরিসমাপ্তি।
১৯২৫ ইরানের শাহ রূপে রেজা পাহলভী।
১৯২৩-১৯৩৯ ইরান এবং তুরস্কের সংস্কার আন্দোলন।
১৯৩৩ নূতন ইঙ্গ-পারস্য তৈলচুক্তি।
১৯৩৬ প্রণালীর উপর মন্ট্রু কনভেনশন।
১৯৩৭ আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক এবং তুরস্কের মধ্যে সা'দাবাদ চুক্তি।
১৯৩৮ আতাতুর্কের মৃত্যু। ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলপথের নির্মাণ কার্য পরিসমাপ্তি।
১৯৩৯ ফিলিস্তিনের উপর বৃটিশ শ্বেতপত্র।
১৯৪১ মিত্রপক্ষের ইরানে প্রবেশ। রেজা শাহের সিংহাসন ত্যাগ। ইরাকে জ্বিলানীর অভ্যুত্থান। বৃটিশ কর্তৃক ইরাক সিরিয়া এবং লেবানন দখল।
১৯৪২ ইহুদিবাদীদের বিল্টমোর পরিকল্পনা।
১৯৪৪ আরব লীগ গঠিত।
১৯৪৫ আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।
১৯৪৬ লাল ফৌজের ইরান ত্যাগ। ফিলিস্তিনের উপর ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন।
১৯৪৭ ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ট্রুম্যান মতবাদ।
১৯৪৮ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ।
১৯৫০ তুরস্কে একদলীয় শাসনের অবসান।
১৯৫১ তুরস্কের ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ। ইরান কর্তৃক তৈল জাতীয়করণ।
১৯৫২ মিসরে নাসেরের অভ্যুত্থান।
১৯৫৩ ইরানে ডঃ মোসাদ্দেকের পতন।
১৯৫৪ বৃটিশদের মিসর ত্যাগ।
১৯৫৬ সুয়েজ খাল কোম্পানি জাতীয়করণ। ইঙ্গ-ফরাসি-ইসরাইলি বাহিনীর মিসরের উপর আক্রমণ।
১৯৫৭ আইসেনহাওয়ার মতবাদ।
১৯৫৮ মিসর ও সিরিয়ার সংযুক্তি। ইরাকে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি।
১৯৬০ তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান।
১৯৬১ দ্বিতীয় তুরস্ক প্রজাতন্ত্র। সিরিয়া-মিসর সংযুক্তির অবসান।
১৯৬২ ইয়েমেনে সামরিক অভ্যুত্থান।

১৯৬৩ ইরানে শ্বেত বিপ্লবের সূচনা।
১৯৬৭ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ইরানের শাহের অভিষেক।
১৯৭০ প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু। মিসরের নূতন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আনোয়ার সাদাত।
১৯৭০ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা প্রতিষ্ঠা।
১৯৭১ পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট। নূতন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
১৯৭৩ আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহের পতন। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দাউদ শাহের ক্ষমতা দখল।
১৯৭৫ মুসলিম বিশ্বের নব চেতনার উন্মেষ।
১৯৭৬ সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়সল ইবনে আবদ-আল-আজিজ আততায়ীর গুলিতে নিহত। খালেদ ইবনে আবদ-আল-আজিজের ক্ষমতারোহণ।
১৯৭৭ মিসরের প্রেসিডেন্টের শান্তি মিশনে জেরুজালেম গমন এবং ইসরাইলি পার্লামেন্টে ভাষণ দান।
১৯৭৮ দক্ষিণ লেবাননের ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলি সর্বাত্মক হামলা এবং লিতানি নদী পর্যন্ত এলাকা দখল। আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ও দাউদ শাহের পতন। নূর মোহাম্মদ তারাকির ক্ষমতারোহণ।
১৯৭৯ ইরানে ইসলামী বিপ্লব। মোহাম্মদ রেজা শাহের পতন এবং ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর অভ্যুদয়।
১৯৮০ ইরাক-ইরান যুদ্ধ আরম্ভ।
১৯৮২ ইসরাইল কর্তৃক লেবাননে সর্বাত্মক হামলা। আন্তর্জাতিক তদারকিতে পি. এল. ও. যোদ্ধাদের বৈরুত ত্যাগ।
১৯৮৩ বৈরুতের সাতিলা ও সাবরা নামক ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলি ছত্রছায়ায় ফালাঞ্জি খ্রিস্টানদের বর্বর হামলা। হাজার হাজার অসহায় নারী, শিশু হত্যা।
১৯৮৪ কাসাব্ল্যাংকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার চতুর্থ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
১৯৮৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ কর্তৃক পেরেসত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত নীতি (সংস্কার ও উন্মুক্ততা) ঘোষণা এবং মধ্যপ্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট।
১৯৮৬ মধ্যপ্রাচ্যে তৈল রাজনীতিতে সঙ্কট।
১৯৮৭ ইসরাইল অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকায় ইন্তিফাদাহ (গণবিক্ষোভ) আরম্ভ।
১৯৮৮ ইরাক-ইরান যুদ্ধ অবসান। জেনেভায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ অধিবেশনে পি. এল. ও. চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাতের ভাষণ।
১৯৮৯ লেবাননে খ্রিস্টান জেনারেল আউনের যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব কার্যকরীকরণ। সোভিয়েত সৈন্যদের আফগানিস্তান ত্যাগ।
১৯৯০ ইরাকি বাহিনীর কুয়েত দখল এবং কুয়েতের আমীর শেখ সাবাহর সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণ। উত্তর ও দক্ষিণ ইয়ামানের একত্রিকরণ। নূতন নাম ইয়ামান প্রজাতন্ত্র।
১৯৯১ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ২৭টি দেশ লইয়া গঠিত মিত্রবাহিনী কর্তৃক ইরাকে বিমান, জল ও স্থল হামলা এবং কুয়েত হইতে ইরাকের পশ্চাদপসারণ।
১৯৯২ ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনসহ আরব প্রতিনিধিদলের ওয়াশিংটনে প্রথমবারের মত সরাসরি শান্তি আলোচনায় যোগদান। আফগান মুজাহিদদের হাতে কাবুলের পতন এবং নজিবুল্লাহর কাবুল ত্যাগের মধ্য দিয়া আফগানিস্তানে সমাজতান্ত্রিক শাসনের অবসান।
১৯৯৩ পি. এল. ও- ইসরাইল শান্তি চুক্তি।
১৯৯৪ জর্দান ইসরাইল শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৯৫ সৌদি আরব- ইয়েমেন প্রজাতন্ত্র সংঘাত।
১৯৯৬ মানবিক কারণে তেলের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় ইরাককে অপরিশোধিত তেল বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান।
১৯৯৮ সৌদি আরব ও ইরানের প্রযুক্তি ও সহযোগিতা চুক্তি।
১৯৯৯ জর্দানের বাদশাহ হোসেনের পরলোকগমন। মরক্কোর বাদশাহ দ্বিতীয় হাসানের পরলোকগমণ।
২০০০ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের মৃত্যু।

নির্ঘণ্ট

উ

ফ

ভ

- ০ -